অবসর
১০ বর্ষ
১৩২০-২১

দুঁহু চাহে দুঁহু পানে স্থির নয়ানে।

অবসর।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

দশম খণ্ড।

শ্রীসুরেনচণ্ডী দত্ত কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

কলিকাতা,

৯২ নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট, "অবসর পুস্তকালয়" হইতে

শ্রীপঞ্চানন মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সূচী পত্র।

অবসর।

১০ম ভাগ, ১৩২০। ১ম সংখ্যা, ভাদ্র।

বর্ষান্তে।

বরষের পর তোমার দুয়ারে,
এসেছি জগতস্বামী ;
সারা বছরের শ্রান্ত-ক্লান্ত
জীবন লইয়া আমি।
ল'য়ে শত ত্রুটী, কর্ম্মক্ষেত্রে
হইয়াছি অগ্রসর ;
দুর্গম পথে প্রতিপদে বাধা,
কম্পিত কলেবর।
বর্ষার জল কর্দ্দমে ভরা,
পথ ঘাট চারি ধার ;
গগনের ঘনে গর্জ্জন গুরু,
দিক্‌দেশ অন্ধকার !
অজ্ঞান আমি, দুর্ব্বল, ভীরু,
সম্বল কিছু নাই ;
কর ধরি' প্রভু, চালাও আমায়,
বিপথে যেন না যাই।
বাসনা আমার করহ পূর্ণ
নিজগুণে, দাও বর ;
সার্থক হ'ক জন্ম-জীবন,
কর্ম্ম ও "অবসর।"

বিনিময়।

কুশ-উত্তোলন-পর্ব্ব প্রভাত কালেতে
মুনিপুত্রগণ সহ সত্যবান ধীর,
আহরিতে কুশরাশি প্রবেশে কাননে ;
কুসুমবিটপীঘেরা অপূর্ব্ব সে স্থান।
প্রভাত-শীতল বায়ু দুলাইয়া শাখা
বহিতেছে ধীরে, মাখি ফুল-পরিমল।
গাহিছে প্রণয়-গাথা বিহগ-বিহগী,
নীলাম্বরে রক্ত-রাগ পড়েছে পূরবে।

নব নব কুশ-রাশি দেখিয়া হরষে
তুলিতে লাগিলা যত্নে মুনিপুত্রগণ।
অশ্বপতিরাজ-সুতা সাবিত্রী ভামিনী
কিশোরী, সুন্দরী, তথা ফুল আহরণে
সখীসহ উপস্থিত ছিল সে সময়।
দূরে সত্যবান, দূরে সাবিত্রী সুন্দরী—
তথাপি কিসের টানে চাহিলা দু'জনে—
দিগ্‌দরশন যথা উত্তরাভিমুখে।
তড়িৎ-লহর-ছটা অঙ্গে অঙ্গে খেলে
দুঁহু চাহে দুঁহু পানে সুথির নয়নে।
জীবনের নব রবি উদিলা হৃদয়ে
মুহূর্ত্তে হইয়া গেল প্রাণ বিনিময়।

সাধক-কাহিনী।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস।

১২৪১ বঙ্গীয়াব্দের ১০ই ফাল্গুন বুধবারে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত কামারপুকুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়। যজমান-শিষ্যের কাজ করিয়া তদ্দ্বারা তাঁহার সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। ধর্ম্মযাজক ব্যক্তিগণের আর্থিক অবস্থা যেমন কষ্টকর,—চট্টোপাধ্যায় মহাশয়েরও তদ্রূপ ছিল। রামকৃষ্ণদেবের পূর্ব্ব নাম ছিল গদাধর। কিন্তু পিতার মনঃপূত না হওয়ায় রামকৃষ্ণ নাম রক্ষিত হয়। কারণ, তাঁহার অপর পুত্রদ্বয়ের নামের সহিত গদাধর নামের মিল হয় না। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রথম পুত্রের নাম রামকুমার, দ্বিতীয়ের নাম রামেশ্বর,—কাজেই তৃতীয় বা কনিষ্ঠপুত্রের নাম গদাধর পরিবর্ত্তন করিয়া রামকৃষ্ণ রক্ষা করেন।

এই রামকৃষ্ণ নাম আজ সমগ্র সভ্যজগতে পরিচিত। তাঁহার শিষ্যগণ এ নাম সুদূর ইয়োরোপ-আমেরিকা পর্য্যন্ত প্রচার করিয়াছেন। সেই সকল শিষ্য-গণের মধ্যে বিবেকানন্দ স্বামীই প্রধান। ইনি রামকৃষ্ণের মধুর উপদেশগুলি আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে বহুল প্রচার করিয়া আসিয়াছিলেন।

বিবেকানন্দ স্বামী।

রামকৃষ্ণ বাল্যজীবনে বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে উন্নতি করিতে পারেন নাই। কিশোরকাল পর্য্যন্ত যাত্রা, পাঁচালী ও আফআখ্‌ড়াই প্রভৃতি গান নিজ গ্রামেই হউক আর নিকটবর্ত্তী বিভিন্ন গ্রামেই হউক, শ্রবণ করিয়া বেড়াইতেন। সঙ্গীতে তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। নিজেও বেশ গাহিতে পারিতেন,—তাঁহার কণ্ঠস্বর বড় মধুর ছিল।

তাঁহার অগ্রজ রামকুমার কলিকাতার উত্তরাংশে রাণী রাসমণির দক্ষিণেশ্বর নামক স্থানের কালীবাড়ীতে পূজক ব্রাহ্মণের কার্য্য করিতেন। অষ্টাদশবর্ষ বয়সে রামকৃষ্ণও তথায় গমন করেন এবং ভ্রাতার সহিত একত্র বস-বাস করেন।

রামকৃষ্ণ হুগলী জেলার অন্তর্গত জয়রামবাটী নিবাসী রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। রামকৃষ্ণের পত্নীর নাম সারদাসুন্দরী—এখনও ইনি জীবিতা আছেন।

ইহার কিছু দিন পরেই রামকুমারের মৃত্যু হয়। রামকুমারের মৃত্যুর পর রামকৃষ্ণই কালিকাদেবীর পূজক হন। এই সময় হইতেই তাঁহার তত্ত্বজ্ঞানের আলোক হৃদয় ছাপাইয়া দিগন্ত ভাসাইতে উন্মুখ হয়। কামিনী ও কাঞ্চনের মায়া পরিত্যাগ করতঃ যোগাভ্যাসে মনঃসংযোগ করেন, এবং তদর্থে কালীমন্দির সংলগ্ন সুবৃহৎ উদ্যানের উত্তর পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করেন, এবং তৎপার্শ্বস্থ এক অশ্বত্থতলে আসন প্রস্তুত করিয়া যোগসাধনায় নিরত হন।

রাসমণির জামাতা মন্মথবাবু রামকৃষ্ণের তদানীন্তন অবস্থা দেখিয়া, তাহা ভান কি সত্য,পরীক্ষা করিবার জন্য অনেকপ্রকার কৌশলজাল বিস্তার করিয়াছিলেন। প্রথমে কলিকাতার অনেক নৃত্যগীত-নিপুণা যৌবন-সৌন্দর্য্যময়ী বারাঙ্গনা নিযুক্ত করিয়া দেখেন, কিন্তু তাহাতে রামকৃষ্ণদেবকে বিচলিত করিতে না পারিয়া, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া কাশী বৃন্দাবন ও অপরাপর তীর্থস্থানে লইয়া যান, এবং সেই সকল স্থানে বিবিধ প্রকার প্রলোভনে প্রলোভিত করেন। কিন্তু সর্ব্বপ্রকার পরীক্ষাতেই যখন মহাত্মা অচল-অটল থাকেন, তখন তাঁহাকে প্রকৃত যোগী বলিয়া স্বীকার করেন।

ইহার পরে তাঁহার অনেক শিষ্য যুটেন। তন্মধ্যে বিবেকানন্দ স্বামী, (নরেন্দ্রনাথ দত্ত) রামচন্দ্র দত্ত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি প্রধান।

১২৯৩ বঙ্গীয়াব্দের ৩১এ শ্রাবণ রবিবারে রামকৃষ্ণদেব দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫২ বৎসর হইয়াছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে ইঁহার গলনালীতে স্ফোটক হয়,—ক্রমে তাহা যন্ত্রণাদায়ক মন্দ অবস্থায় পরিণত হয়। তরল পদার্থ ব্যতীত অপর কিছুই ভোজন করিতে পারিতেন না। ক্রমে জীর্ণশীর্ণ হইয়া পড়েন। শিষ্যগণ চিকিৎসার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না,—কাশীপুরস্থ এক সুরম্য উদ্যানে চিকিৎসার জন্য

সর্ব্বশেষে অবস্থান করিতেছিলেন, এবং সেই স্থানেই সাধকের জীবন প্রদীপ নির্ব্বাপিত হয়।

রামকৃষ্ণদেবের এক সুমহতী ক্ষমতা এই ছিল যে, প্রচলিত ভাষায়, অল্প কথায় উদাহরণের সহিত যে সকল উপদেশ দিতেন,—প্রশ্ন করিলে যে উত্তর দিতেন, তাহার উপরে আর তর্ক করা চলিত না, এবং প্রাণের ত্বক্‌ ভেদ করিয়া মানুষের মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করিত। উদাহরণ স্বরূপ তাঁহার কয়েকটি মাত্র অমৃত-কথা এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

রামকৃষ্ণ কথামৃত,—

অন্যকে হত্যা করিতে বিশিষ্ট অস্ত্রের প্রয়োজন, কিন্তু একটি নরুণের দ্বারা আত্মহত্যা সাধিত হয়। অপরকে উপদেশ দিতে হইলে, অনেক শাস্ত্রপাঠের আবশ্যক হয়, কিন্তু আত্মোন্নতি করা সামান্য জ্ঞানেই সাধিত হয়।

* * * *

কাহারও সহিত তর্ক করা উচিত নয়। যেমন নিজের মত ভালবাস, তেমনি অপরকে তাহার মত বজায় রাখিতে দাও। তর্কে কোন কাজ হয় না। ভগবানের করুণা হইলে, আপন ভুল বুঝা যায়।

* * *

ক্ষেতের গর্ত্ত নিবারণ করিয়া চারার গোড়ায় জল না দিলে, সে জল যেমন চারার উপকার করিতে পারে না, তাহা গর্ত্ত দ্বারা শুষিয়া যায়,—তেমনি আসক্তি নিবারণ না করিয়া উপাসনাদি করিলে কোনই ফল হয় না। আসক্তিরূপ ছিদ্র দিয়া জ্ঞান বা উপাসনাদি নিম্নে চলিয়া যায়।

* * * *

এক ডুবে যদি রত্ন না পাও, ভাবিয়ো না, রত্নাকর রত্নহীন। ধৈর্য্যসহকারে সাধনায় প্রবৃত্ত থাক, ভগবানের করুণা মিলিবেই মিলিবে।

* * * *

একজন একটি কূপ খনন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। হাত কয়েক খনন করা হইয়াছে, এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, এ স্থানের উপর আমার সবিশেষ অভিজ্ঞতা আছে—নীচেয় কেবল বালি, জল নাই। আমি স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছি, সেখানে সুন্দর জল পাইবে। খনক সে স্থান ত্যাগ করিয়া উপদেষ্টার কথামত অন্যত্র খনন করিতে আরম্ভ করিল। আর একজন আসিয়া বলিল—এ কি করিতেছ হে? এখানে একটা কুয়া ছিল, এখানে হইবে কেন? ঐ জায়গাটায় খোঁড়, সুন্দর জল মিলিবে।

খনক তাহাই করিল। আবার আর একজন বলিল—একি! এখানে কি জল হয়, দেখিতেছ না, এ যে ভরাট মাটি—তোমার ডান পাশে বেশ কূপ হইবে। খনক সে স্থান ছাড়িয়া আবার ইহার কথা শুনিল। এইরূপে সে যত স্থান মনোনীত করিয়াছিল, ক্রমে ক্রমে এক একজন উপদেষ্টার কথায় তাহা পরিত্যাগ করিয়া, নূতন নূতন স্থানে খনন করিতে করিতে দিন কাটিয়া গেল,—কিন্তু কূপ সারা হইল না। এদিকে বর্ষা আসিয়া কাজ বন্ধ করিয়া দিল। সাধন সম্বন্ধেও অনেক স্থলে এইরূপ ঘটে.—উপদেষ্টা অনেক যুটে, এটা ওটা করিতে করিতে কোনটাতেই কাজ হয় না। অবশেষে হয় সে নাস্তিক হইয়া পড়ে, নয় জীবনের বর্ষা উপস্থিত হইয়া সমস্ত আয়োজন রুদ্ধ করিয়া দেয়।

* * * *

মাতা যেমন অবোধ শিশুর হাতে লাল চুষিকাঠি দিয়া তাহাকে ভুলাইয়া রাখেন, জগন্মাতাও তদ্রূপ আমাদের হাতে ধনাদিরূপ চুষিকাঠি দিয়া ভুলাইয়া রাখিয়াছেন। শিশু যদি চুষিকাঠি ফেলিয়া কাঁদিয়া উঠে, তবে মাতা যেমন ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লন, আমরাও তেমনি ধনাদিরূপ চুষিকাঠি ফেলিয়া দিয়া যদি কাঁদিতে পারি, বিশ্বজননী নিশ্চয়ই আসিয়া আমাদিগকে কোলে করেন।

* * * *

জলের সঙ্গে দুধ মিশিয়া যায়, কিন্তু দুধকে মাখন করিলে আর জলে মিশে না। মন অসৎ কার্য্যে ধাবিত হয় বটে, কিন্তু সচ্চিদানন্দকে মনে রাখিলে আর তার অসৎ সঙ্গ ভাল লাগে না।

* * * *

বাঘের মধ্যেও ভগবান আছেন, কিন্তু তাহার সম্মুখে যাওয়া উচিত নয়। কুলোকের মধ্যে ভগবান আছেন, কিন্তু তাহার সঙ্গ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

* * * *

জলমাত্রই নারায়ণ। কিন্তু সকল জল পানের যোগ্য নয়। তেমনি ব্রহ্মময় সব জিনিষ হইলেও সব ব্যবহারের উপযুক্ত নয়।

* * * *

একটি খোঁটা ধরিয়া ঘুরপাক খাইলে যেমন পড়িবার সম্ভাবনা নাই। তেমনি ভগবানকে আশ্রয় করিয়া যে কর্ম্মই কর, তাহাতে পতনের সম্ভাবনা নাই।

———

বিচারে বিপত্তি

সে অনেক দিনের কথা। পারস্যের রাজতক্তে শাহ অধ্যাসীন। তাঁহার বিশ্বাস,তিনি পরমেশ্বরের অংশ, এবং প্রজাকুলকে যথাবিধানে শাসন করিবার জন্যই ধরাধামে অবতীর্ণ। তাঁহার রাজনীতির মূলমন্ত্র—রাজা প্রভু, প্রজা ভৃত্য। ভৃত্যের কার্য্য প্রভুর পদানত থাকা,—প্রজার কার্য্য নীরবে রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করা। যে দুঃসাহসিক, প্রজার কষ্টের কাহিনী, রাজার অত্যাচার কাহিনী মুখ ফুটিয়া প্রকাশ করে, সে রাজদ্রোহী—অদৃষ্ট তাহার চির-নিরুদ্ধ, দুঃখ তাহার জীবনের চির সহচর ; বিনয়, সৌজন্য, ক্ষমা,—এসকল দরিদ্রের হৃদয়-বৃত্তি—রাজার ইহা শোভা পায় না। বিনয়, সৌজন্য প্রভৃতিতে রাজ-সম্ভ্রম বিনষ্ট হয়। কারণ, দেখা যায় যে, সামর্থ্য হীন লোকে—যথা সন্ন্যাসী মোহান্ত প্রভৃতিরাই বাধ্য হইয়া বিনয়ের আশ্রয় লইয়া থাকে। কাজেই শাহ বিনয়, সৌজন্য ও ক্ষমা একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। রাজার আচরণ রাজ-কর্ম্মচারীতে অধ্যাসিত হয়, অর্থাৎ রাজার চরিত্র রাজ-কর্ম্ম-চারিগণে ঔজ্জ্বল্য ধারণ করে। রাজার অত্যাচার-অবিচার দশ আনা হইলে কর্ম্মচারিগণের অত্যাচার সাড়ে আঠার আনা হইয়া থাকে। পারস্যের শাহ-সাহেবের রাজত্বেও তাহাই হইয়াছে। রাজা প্রজার উপরে দয়ামায়া-শূন্য—তাহাদের অভাব-অভিযোগের করুণ ক্রন্দনে তিনি কর্ণপাত করেন না। কর্ম্ম-চারিগণও সবলে প্রজাগণের বক্ষে অত্যাচারের বংশদণ্ড নিষ্পেষণ করিয়া থাকেন। শাহসাহেবের যিনি প্রধান উজীর, তাঁহার অত্যাচার-অনাচারে প্রজাকুল আরও আকুল। তাঁহার শাসন দণ্ডের ভীম আবর্ত্তনে পারস্যের লোক জীবনে মরণ যন্ত্রণা অনুভব করিত। তিনি লৌহ হস্তে প্রজাশাসন করি-য়াই ক্ষান্ত হইতেন না। তাঁহার বিলাস-অনলে অনেকের সুন্দরী কন্যা,ভগিনী ও স্ত্রীকে আহুতি দিতে হইত। শাহসাহেবকে উজীরসাহেবের অত্যাচারের বিষয় জানাইলে তিনি তাহা গ্রাহ্য করিতেন না। বলিতেন—রাজ্য শাসন করিতে লোকের অপ্রিয় হইতেই হয়। উজীর বিদ্বান্ ও সদ্বিবেচক, তিনি অত্যুত্তম বিচারক—তাঁহার বিচারে ভুল হয় না।

(২)

ক্ষমতা পাইয়া নিরীহ প্রজাগণের উপরে যত ইচ্ছা প্রভুত্ব করা যাইতে

পারে, কিন্তু যমরাজের উপরে কাহারও ক্ষমতা নাই—হঠাৎ উজীরের পত্নী-বিয়োগ ঘটিল। পত্নী-বিয়োগ তাঁহার যে এই প্রথম ঘটিল, তাহা নহে;—পর পর তাঁহার পাঁচটী পত্নী-বিয়োগ হইয়াছে। দেশের দুষ্ট লোকেরা কানাকানি করিত—তাঁহার পত্নী-বিয়োগে যমরাজের হাতের চেয়ে তাঁহার নিজ হস্তের ক্রীড়াই অধিক! নূতন পত্নী লাভের আশায় উজীর নিজে ইচ্ছা করিয়াই পত্নীগণকে যমরাজের নিভৃত নিকেতনে পাঠাইয়া দিতেন, নতুবা যমরাজের সাহসে এতদূর কুলাইত না। যে যাহাই বলুক, উজীরের পত্নীবিয়োগে দেশের মধ্যে একটা মহাভীতির সঞ্চার হইয়া পড়িল। কেননা, বিপত্নীক উজীরের মনের স্থিরতা নাই। এই সময়ে কতজন মূলা চুরি করিয়া যে ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলিবে, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে! আরও ভয়, যাহাদের সুন্দরী কন্যা বা ভগিনী আছে। যদি উজীরের সুনজরে পড়িয়া যায়, তবে তাহাদের জীবন-নাট্যের সুখের অঙ্ক চিরদিনের মত নিরুদ্ধ হইয়া যাইবে। একদিন উজীরমহোদয় গ্রামোপান্তবাসী এক বৃদ্ধ মৌলভিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মৌলভির বয়স হইয়াছে, কিন্তু দীর্ঘ ও সবল দেহ—দীর্ঘনয়ন, দীর্ঘবাহু, দীর্ঘ বক্ষঃ। মৌলভিসাহেব স্বয়ং শাহসাহেবের শিক্ষক,—সুতরাং তজ্জন্য কিছু গর্ব্বিতও বটেন, তাঁহার আর্থিক অবস্থাও নিতান্ত সামান্য নহে।

তখন বিকাল বেলা—এই মাত্র এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। বর্ষণার্দ্র ধরণীর বক্ষ হইতে একরূপ সিক্তগন্ধ বাহির হইতেছিল; এবং বৃক্ষ-শাখাগ্রে বসিয়া এতক্ষণ ভিজিয়া ভিজিয়া এখন মেঘমুক্ত সূর্য্যকর প্রাপ্ত হইয়া একটা কাক তাহার উচ্চ কঠোর কণ্ঠে বড় ডাকাডাকি করিতেছিল।

কাকের কঠোর শব্দকে নিতান্ত অযাত্রা ভাবিয়া মৌলভিসাহেব খোদাতালার নাম লইয়া উজীরসাহেবের ভবনে উপস্থিত [হইলেন। উজীরসাহেব মৌলভিসাহেবকে মাত্রাধিক অভ্যর্থনা করিলেন, এবং নিজাসনের পার্শ্বে উপবেশন করাইয়া স্বাগত প্রশ্ন করিলেন।

মৌলভিসাহেব জানিতেন,—মোল্লার মুরগী পোষা আর উজীরসাহেবের এই সমাদর, কার্য্যে উভয়ই সমান। যাহা হউক, তিনিও প্রতিসম্ভাষণ আদি করিয়া ডাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

উজীরসাহেব বলিলেন–"আপনার একটী সুন্দরী যুবতী কন্যা আছে, আমি তাহার পাণিপ্রার্থী।"

মৌলভিসাহেব শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার সেই লোকললামভূতা

অনিন্দ্য সুন্দরী কন্যা এই বৃদ্ধ পাত্রে সমর্পণ করিবেন। বিশেষতঃ উজীর-সাহেব নিতান্ত নিষ্ঠুর ও কোপন স্বভাব,—তদ্ভিন্ন গোপনে গোপনে লোকে বলিত যে, উজীরসাহেব কিছুদিন বিবাহিতা পত্নীকে সমাদরে রাখিয়া তৎপরে নিহত করিয়া থাকেন।

মৌলভিসাহেব বলিলেন—"উজীরসাহেব, আমার কন্যা আপনার উপযুক্তা নহে। সে অতিশয় লজ্জাশীলা ও ভীরু-স্বভাবা।"

উজীরসাহেব মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"সেই জন্যই আপনার কন্যা আমার মনোহরণ করিয়াছে।"

মৌ। কিন্তু আমি অন্য পাত্রের সহিত তাহার বিবাহ দিব স্থির করিয়াছি।

উ। আপনি বোধ হয় অবগত আছেন, পারস্যের মধ্যে এবান্দার অভি-লাষের বিরুদ্ধে কার্য্য করে, এমন কেহ নাই।

মৌলভিসাহেবও তাহা বুঝিলেন। বুঝিলেন, পাপাত্মা উজীরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করে, এমন কেহই পারস্যে নাই। কিন্তু হায়! অতঃপর কি গোলাপ তোড়ার ন্যায় মধুরতাময়ী কন্যাটীকে এই দুর্দ্দান্ত আত্মম্ভরির হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে!

উজীর শুনাইয়া দিলেন—ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, মৌলভিকে কন্যা দান করিতেই হইবে।

(৩)

পারস্যের রাজসভা এখন দুইটী বিষয় লইয়া ব্যস্ত—এক উজীরের বিবাহ, দ্বিতীয় শাহের একমাত্র পুত্রের কঠিন পীড়া। বিবাহের দিন নিকটবর্ত্তী। তাহার উদ্যোগ-আয়োজনে নগরবাসিগণ ব্যস্ত। অপর দিকে সম্রাট্-তনয় জীবনান্তকর কঠিন পীড়ায় শয্যাগত, তাহার জন্য পুরবাসিগণ উৎকণ্ঠিত। শাহপুত্রের নবাবসাহেব আখ্যা প্রদান করা হইয়া থাকে। নবাবসাহেব পিতার গুণে গুণী নহেন—তিনি প্রজাপ্রিয়, বিনয়ী, পণ্ডিত ও নিরহঙ্কার। শাহসাহেব বুঝিতেন, এরূপ দীন-ভাবাপন্ন পুত্র বা নবাবসাহেব ভবিষ্যতে রাজ-কার্য্য সুন্দরভাবে চালাইতে পারিবেন না। প্রজাকুল ভাবিত—কবে নবাবসাহেব শাহের গদিতে অভিষিক্ত হইয়া প্রজার চক্ষুর জল মুছাইয়া দিবেন? সেই নবাবসাহেবের কঠিন পীড়ায় সকলেই বিষণ্ন; এক দিকে বিবাহের বিপুল আয়োজন,—অন্যদিকে নবাব সাহেবের কঠিন

পীড়া। রাজ্যে মহা হুলস্থুল—একদিকে আনন্দ,—অন্যদিকে বিষাদ, একদিকে সংসার,—অন্যদিকে বৈরাগ্য; একদিকে উৎসাহ,—অন্যদিকে নিরুদ্যম বা ভয়; একদিকে মিলনের মধুর বাজনা;—অন্যদিকে মরণের বিরহ-হুঙ্কার।

নবাবসাহেবের কঠিন পীড়ায় শাহসাহেবও সমধিক চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তিনি রাজবৈদ্য বা হকিমসাহেবকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি মাসে মাসে বহু টাকা বৃত্তি লইয়া আসিতেছ—মাসে মাসে প্রচুর অর্থ তোমাকে প্রদান করা হয়,—কেন তাহা জান কি?"

হকিমসাহেব মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে করিতে বলিলেন—"আজ্ঞা তাহা জানি বৈ কি! আমি রাজ পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের রোগ নির্ণয় ও ঔষধের ব্যবস্থা করিব বলিয়াই আমাকে বৃত্তি দেওয়া হয়।"

শা। আপনি কি অবগত নহেন যে, আমার একমাত্র পুত্র, পারস্য সিংহাসনের ভাবিসম্রাট্ নবাবসাহেব পীড়িত?

হ। হাঁ, তাহা আমি অবগত আছি— এবং প্রত্যহই তাঁহাকে যথোপযুক্ত ভাবে ঔষধাদি দিয়া আসিতেছি।

শা। রোগের উপশম হইতেছে না কেন?

হ। বলিতে কি খোদাবন্দ, রোগ কি তাহাই স্থির করিতে পারি নাই, উপশম না হইবার কারণও কাজেই স্থির করিতে পারি নাই।

শা। মনোযোগ সহকারে শুনিয়া যাও হকিমসাহেব—কা'ল সকালেই যদি আমাকে নবাবসাহেবের রোগ কি তাহা স্থির করিয়া বলিতে না পার, তবে তোমার জানের খায়ের নাই।

হকিমসাহেব বিষণ্ণ মনে তথা হইতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার চিন্তা বাস্তবিকই কঠিন। তিনি রোগ নির্ণয়ে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও তাহাতে সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি যথাসাধ্য পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন, জীবন ধারণোপযোগী সকল যন্ত্রই অবিকৃত রহিয়াছে—কেবল দুর্ব্বলতা ভিন্ন রোগীর পীড়ার অন্য কোন লক্ষণ খুঁজিয়া পাইলেন না;—অথচ নবাবসাহেব ক্ষয় রোগীর ন্যায় দিন দিন মৃত্যুপথে অগ্রসর হইতেছিলেন।

হকিমসাহেবের মনে গভীর সন্দেহ,—রোগের উৎপত্তি কোথা হইতে? কারণ ব্যতীত কার্য্য হইতে পারে না,—যখন কার্য্য হইতেছে, তখন কারণ নিশ্চয়ই আছে। দূষিত রক্ত বা যন্ত্র বিশেষের আংশিক হানি অথবা কার্য্য-

করী শক্তিহ্রাস এ রোগের কারণ নহে। এ রোগের কারণ অন্যবিধ, কিন্তু সে কারণ কি? হকিমসাহেব মহাসমস্যায় পড়িলেন—কিন্তু তিনি নিরাশ হইবার লোক নহেন। আশায় বুক বাঁধিয়া এ দুর্ভেদ্য রহস্য ভেদ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

(৪)

পর দিবস যথাসময়ে হকিমসাহেবের ডাক হইল। হকিমসাহেব শাহের নিকট উপস্থিত হইলেন। শাহ দেখিলেন, হকিমের মুখ ম্লান নহে; বরং কিঞ্চিৎ আশা-ব্যঞ্জক। জিজ্ঞাসা করিলেন—"হকিমসাহেব, তুমি বোধ হয় নবাবসাহেবের রোগ নির্ণয় করিতে সক্ষম হইয়াছ? বল এ রোগের নাম কি?"

হ। হাঁ জাঁহাপনা, আমি রোগ নির্ণয় করিতে সক্ষম হইয়াছি।

শা। রোগের নাম—

হ। প্রেম। নবাবসাহেবের আহারে প্রবৃত্তি নাই; নিদ্রায় আসক্তি নাই, মনে উৎসাহ নাই, হৃদয়ে বল নাই—ইহার কারণ প্রেম।

শা। রোগ নিবারণের উপায় কি?

হ। নবাবসাহেব যাহার প্রেমে মুগ্ধ, তাহার সহিত মিলন ব্যতীত এ রোগ আরোগ্য হইবে না।

শা। নবাবসাহেব কাহার প্রেমে মুগ্ধ?

হ। এ প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারিলাম না, সে কথা ঘুণাক্ষরেও তিনি কাহাকে বলেন নাই। হাবে ভাবেও কিছু বুঝিবার উপায় নাই।

শা। কিন্তু এ রোগ নির্ণয়ে আমি সন্তুষ্ট হইলাম না। হয় ত তুমি নিজের মাথা বাঁচাইবার জন্য একটা বাজে কথার উদ্ভাবনা করিয়াছ। তুমি অত্যন্ত সুচতুর—এরূপ করা তোমার পক্ষে অসম্ভব নহে। যদি রোগ ইহাই হয়, তবে বলিয়া দেও—নবাবসাহেব কাহার প্রেমে মুগ্ধ, আমার একমাত্র পুত্রের জীবনের জন্য পারস্যে এমন কোন লোক নাই, যে কন্যা, ভগিনী বা পত্নী-দানে সম্মত না হইবে।

হ। আমাকে আর কিছু সময় দিন।

শা। না—নবাবসাহেবের শরীর ক্রমশঃই মন্দ হইতেছে। অদ্যই তোমাকে সঠিক সংবাদ দিতে হইবে।

হ। জাঁহাপনা, তাহাই হইবে। তবে কিয়ৎক্ষণ সময় দিতে আজ্ঞা

হউক। প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আ'জ রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই আমি আপনাকে জানাইব, কোন্ ভাগ্যবতী সুন্দরী নবাবসাহেবকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে। উজীরসাহেবের আ'জ বিবাহ—বৈকালে রাজ-প্রাসাদে অভ্যর্থনা-সভা হইবে। নগরের সকল সুন্দরীই এখানে আসিবে। আপনি কোন প্রকারে এই বন্দোবস্ত করিবেন যে, নবাবসাহেবের সম্মুখ দিয়া যেন প্রত্যেক রমণী একা যায়। আমি যেন অন্যমনস্কভাবে নবাবসাহেবের হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিব, এবং অতি সন্তর্পণে তাঁহার নাড়ীর গতি পরীক্ষা করিব। যাহার প্রতি প্রেমাসক্ত, তাহাকে দেখিলে, নবাবসাহেবের নাড়ী অতি দ্রুতবেগে চলিবে।

শা। উত্তম উপায়। কিন্তু প্রকৃত রমণীর সন্ধান পাওয়া গেল এবং তাহার সহিত নবাবসাহেবের বিবাহ দেওয়া গেল.—ইহাতেও যদি রোগ না সারে?

হ। বান্দার শির জামিন।

(৫)

যথাসময়ে রাজবাড়ীতে অভ্যর্থনা-সভা হইল। এক গৃহে পুরুষগণের, অপর গৃহে যোষিৎগণের বসিবার স্থান। নগরের যাবতীয় ভদ্রলোক, স্ত্রী, ভগিনী, কন্যা লইয়া অভ্যর্থনা-সভায় আগমন করিলেন। হকিমসাহেবের স্ত্রীও আসিলেন।

হকিমসাহেবের স্ত্রী অদ্বিতীয়া সুন্দরী। তাঁহার মনোরম গঠন-পারিপাট্য অপূর্ব্ব। যৌবন-শ্রী ও বস্ত্রালঙ্কারের অভিনব শোভায় সমাগত সুন্দরীকুল ম্লান হইয়া পড়িল। এমন কি মৌলভিসাহেবের কন্যা বা উজীরসাহেবের নববধূ অপেক্ষাও হকিমসাহেবের স্ত্রীর সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিল।

শাহ একখানি মূল্যবান সিংহাসনে উপবিষ্ট। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে বিবর্ণ ও বিমর্ষ যুবরাজ; হকিমসাহেব যুবরাজের হাত ধরিয়া নীরবে দণ্ডায়মান।

শাহ এক নিয়ম করিয়াছিলেন, আগে রমণীগণ একে একে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া সভাগৃহে যাইবে, পরে পুরুষগণ ঐ নিয়মে যাইবে। তাহাই হইল। হকিমসাহেবও ঔৎসুক্যের সহিত প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ফল যাহা হইল, হকিমসাহেবই তাহা বুঝিলেন।

উৎসব শেষ হইলে হকিমসাহেবকে নিজকক্ষে লইয়া শাহ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার পরীক্ষা সফল হইয়াছে?"

হকিমসাহেব তখন কাঁপিতেছিলেন। তাঁহার সমস্ত মুখে বিষণ্ণতার গাঢ় কালিমা। শাহ কিন্তু সে দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। হকিমসাহেব কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন,—"জঁাহাপনা, পরীক্ষা সফল হইয়াছে।"

শা। বেশ, বেশ, নবাবসাহেব কাহার প্রেমে উন্মত্ত ?

হকিমসাহেব দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন,—"তাহাকে জঁাহাপনাও চিনেন।"

শাহ হকিমের দীর্ঘ নিশ্বাস শুনিয়া ফিরিয়া চাহিলেন। চাহিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন, বলিলেন,—"হকিমসাহেব একি ! তোমার শরীর বিবর্ণ কেন, —ওরূপ ভাবেই বা উত্তর দিলে কেন ?"

হকিমসাহেব অধিকতর বিমর্ষ ও দুঃখব্যঞ্জকস্বরে কহিলেন,—"আনন্দিত হইবার আমার কোন কারণ নাই।"

তারপরে ঢোক গিলিয়া, ঘামিয়া, মুখ লাল করিয়া, কম্পিতস্বরে হকিম-সাহেব বলিলেন,—"যে রমণীর অভাবে নবাবসাহেব পীড়াগ্রস্ত, সে আমার স্ত্রী।"

শা। বাস্তবিক তোমার স্ত্রী পরমা সুন্দরী, তাহার সৌন্দর্য্যে কাহার না মন মুগ্ধ হয়, পুত্রের ভালবাসা অপাত্রে ন্যস্ত হয় নাই।

হকিমসাহেব নীরব। তাঁহার দেহ কম্পিত ও বিবর্ণ।

কিয়ৎক্ষণ পরে শাহ বলিলেন,—"এক্ষণে নবাবসাহেবের রোগ প্রতীকারার্থ তোমার স্ত্রীকে তাঁহার হস্তে অর্পণ—" কথা সমাপ্ত না হইতেই হকিম-সাহেব বলিলেন,—"তাহা অসম্ভব, আমি কখনই আমার স্ত্রীকে নবাব-সাহেবকে দিতে পারিব না।"

শাহসাহেবের চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, তিনি উজীরসাহেবকে ডাকিতে আদেশ করিলেন।

(৬)

মুহূর্ত্তমধ্যে উজীরসাহেব নিজ পদানুযায়ী গর্ব্বের সহিত বৈবাহিকবেশে রাজ-প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন এবং শাহকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইলেন।

শাহ, হকিমসাহেব ও নবাবসাহেবের সমস্ত বৃত্তান্ত উজীরসাহেবকে বলিলেন। এবং আদেশ করিলেন,—"ইহার বিহিত বিচার তুমিই কর।"

উজীর ঘৃণিতভাবে একবার হকিমসাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, —"উনি কি এই প্রস্তাবে সম্মত হইতেছেন না ?"

শাহও ভ্রুকুটী করিয়া বলিলেন,—"না।" উজীরসাহেব তখন গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিলেন,—"ইহা কি সম্ভব? এ প্রস্তাবে সম্মত না হইলে নবাব সাহেবের সুখ ইহজন্মের মত নির্ম্মূল হইবে, এমন কি ইহাতে তাঁহার জীবনেরও আশঙ্কা আছে। এরূপ অবস্থায় স্বার্থত্যাগ অবশ্য কর্ত্তব্য।"

হকিম বিষণ্ণমুখে বলিলেন,—"ইহাই কি আপনার সুবিচার?"

উ। নিশ্চয়। যদি ইহাতে অস্বীকৃত হও——

হ। তাহা হইলে কি হইবে?

উ। আমার বিচারে এ আদেশ পালন না করিলে, আপনার কঠোর কারাদণ্ড হইবে এবং আপনার স্ত্রীর সহিত সমস্ত সম্পত্তি নবাব বাহাদুরের হইবে।

হ। আমার অপরাধ?

উ। আপনি রাজাদেশ অমান্য করায় রাজদ্রোহী।

হ। উজীরসাহেব, আপনি যদি আমার মত অবস্থায় পড়িতেন—তবে কি করিতেন?

উ। কি করিতাম? নিশ্চয়ই আমি আনন্দের সহিত আমার স্ত্রীকে নবাবসাহেবের করে অর্পণ করিতাম। সম্রাটের জন্য স্বার্থত্যাগ পৌরুষের কার্য্য। সিংহাসনের ভবিষ্যৎ অধিকারীর জন্য আত্ম-বলিদান গৌরবের বিষয়।

শাহ উজীরের রাজভক্তি দেখিয়া, অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। উজীরের দৃঢ়তা দেখিয়া কিন্তু এইবার হকিমসাহেবের ভাবান্তর হইল। তাঁহার চক্ষু-জ্যোতি বিস্ফারিত হইল। অধরে ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা দিল। তিনি জানু পাতিয়া শাহের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"জঁাহাপনা, আমি মিথ্যা বলিয়াছি—আমাকে ক্ষমা করুন।" শাহ বিস্মিত-নয়নে হকিমসাহেবের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"কি মিথ্যা বলিয়াছ?"

হকিমসাহেব দৃঢ়তার সহিত বলিলেন,—"আমার স্ত্রী নবাবসাহেবের মনোহরণ করিতে সমর্থ বটে, কিন্তু তাহার অদৃষ্টে সে সৌভাগ্য ঘটে নাই।"

শাহ বলিলেন,—"তোমার স্ত্রী নয়—কে তবে?"

হকিমসাহেব বলিলেন,—"সে সৌভাগ্যবতী রমণী উজীরসাহেবের এবারকার নির্ব্বাচিতা পাত্রী মৌলভিসাহেবের কন্যা।

উজীরসাহেব ঘামিয়া উঠিলেন। দৃঢ়স্বরে বলিলেন—"অসম্ভব! নিজের দায়ে অব্যাহতি পাইবার জন্য এই মিথ্যার সৃষ্টি করিতেছ।"

হকিমসাহেব মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"কথনই নহে। প্রমাণ দেখাইব।"

তারপরে হকিমসাহেব শাহের অনুমত্যনুসারে মৌলভিসাহেব ও তাঁহার কন্যাকে সেখানে আনাইলেন। নবাবসাহেব যে সকল প্রেম-পত্র মৌলভি-কন্যাকে লিখিয়াছিলেন, তাহা শাহকে দেখাইলেন।

শাহ মৌলভিসাহেবকে বলিলেন,—"তুমি যদি এ সকল জান, তবে উজ্জী-রকে কন্যাদান করিতে উদ্যত হইয়াছিলে কেন?"

মৌলভিসাহেব নবাবসাহেবের শেষ পত্রখানি শাহের হাতে দিলেন। সে পত্রের সংক্ষিপ্ত কথা এই যে, আমার পিতা যখন উজ্জীরের সহিত আপনার কন্যার বিবাহের উদ্‌যোগী, তখন আমার কথা উত্থাপন করিবেন না। করিলে আমি আত্মহত্যা করিব।

উজ্জীর কাঁপিতেছিলেন। হকিমসাহেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"ধিক্ উজ্জীরসাহেব, এ প্রস্তাবে স্বীকৃত না হওয়া যে মহাপাপ! সম্রাটের জন্য স্বার্থত্যাগ পৌরুষের কার্য্য। সিংহাসনের ভবিষ্যৎ অধিকারীর মঙ্গলের জন্য আত্ম-বলিদান গৌরবের বিষয়।"

উজ্জীর অনেক কান্নাকাটি করিয়াছিলেন, কিন্তু শাহ তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া সেইদিনই মৌলভি-কন্যার সহিত নবাবসাহেবের বিবাহ দিয়াছিলেন।

ইহাতে নবাবের রোগোপশম হইয়াছিল।

এই ঘটনায় উজ্জীরের হৃদয় এতদূর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল যে, তিনি বিষয়-কার্য্য ও বিবাহ-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া মক্কায় চলিয়া গিয়াছিলেন; এবং সকলকে সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন—"যদি বিচারের ক্ষমতা একটুও পাও, তবে নিজে যে অবস্থায় পড়িলে অপরের নিকটে—যে সুবিচারের প্রার্থনা করিতে, তুমিও সেইরূপ বিচার করিয়ো। নতুবা বিচারে বিপত্তি অবশ্যম্ভাবী।"

স্ত্রী-চরিত্র।

এই বিশাল পৃথিবী বিশ্বশিল্পী পরম কারুণিক পরমেশ্বরের বিচিত্র শিল্পাবলীকে কল্লোলিনী স্রোতস্বিনী তরঙ্গলহরীর ন্যায় হৃদয়োপরি ধারণ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্ররূপে বিরাজমান। সেই শিল্প সমুদায়ের মধ্যে জীবনিবহ বিহগশ্রেণীতে বৈনতেয়ের ন্যায় স্রষ্টার অতুলনীয় সম্পদ! সাংখ্যমতে প্রকৃতি-পুরুষের সম্মিলনে এই অনন্ত সংসারের আবির্ভাব। পুরুষ সর্ব্বদা উদাসীনাবস্থায় বর্ত্তমান। প্রকৃতি সেই উদাসীন পুরুষ-সঙ্গতা হইয়াই অনিল-সম্মিলিতা প্রদীপ্ত হুতবহ-শিখার ন্যায় তেজঃপুঞ্জশালিনী এবং সৃষ্টি-স্থিতি প্রভৃতির অনন্যসাধারণ কর্ত্রী। সূর্য্যকর-প্রতিফলিত কাচপাত্রের ন্যায় প্রকৃতির গুণৌঘ প্রতিফলিত হওয়ায় পুরুষকে কর্ত্তা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। প্রকৃতি শক্তিমতী না হইলে পুরুষের অস্তিত্ব বাক্যমাত্রে পর্য্যবসিত হইত। সেই অসীম শক্তি প্রকৃতির প্রধান সাধক মানব। কারণ, বিদ্যার প্রভাবে মানবেরই প্রকৃষ্ট জ্ঞান-চক্ষু বিকাশ পায় এবং বিভূতির পূজক মানব প্রকৃতির সমুচিত সাধনাও করিতে পারে। সুতরাং করুণাময়ী প্রকৃতি মানবগণকে অশেষ গুণের আধার করিয়া গ্রহমণ্ডলীতে দিবাকরসদৃশ প্রাণিনিকর-শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন। মনুজগণ বিদ্যাবলে 'তত্ত্বমসি' জ্ঞানেরও ভাজন হইতে পারেন, কিন্তু তদিতর প্রাণীর প্রকৃষ্ট জ্ঞানার্জ্জনের সামর্থ্য নাই। এই সমুদয় কারণে মনুজগণ সর্ব্বোপরি আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইতেছে। স্ত্রী-পুরুষ লইয়াই তাহাদের সংসারাশ্রম গঠিত। নারীমূর্ত্তি প্রকৃতই যেন প্রকৃতির ছায়াবতার রূপে অবতীর্ণ হইয়া ভূলোককে স্বর্গায়মান করিতেছেন। অশেষ-করুণার আধার সরলহৃদয়া রমণী জননীরূপে নবোদিত শশধরের ন্যায় ননীর পুতলী সন্তানের পরিপালন এবং উর্ব্বর ভূমির ন্যায় শৈশবে ভবিষ্যজ্জীবনের উন্নতিপথ নিরাপদ করেন। অনন্তর যৌবনে সহধর্ম্মিণীরূপে স্ত্রী কর্ম্মি-পতির সৎকার্য্যে সমুৎসাহিনী এবং অকাতরে পতির সর্ব্ববিধ শান্তিপ্রদ কর্ম্মের অনুষ্ঠান-পরায়ণা। বার্দ্ধক্যে অন্ধের যষ্টি-সদৃশ পত্নীই বিশ্রাম ভূমি। যে সকল মহাত্মগণ ধ্রুব প্রহ্লাদের ন্যায় সৎকীর্ত্তির দ্বারা জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন এবং যাঁহারা বর্ত্তমানে আদর্শ পুরুষ বলিয়া সামাজিকগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত হইতেছেন, তাঁহাদের অধিকাংশের এতাদৃশ সমুন্নতির মূলীভূত

সপরিবারে কবি নবীনচন্দ্র

কারণ বিদুষী মাতৃদেবীর নিকট হইতে আশৈশবলব্ধ সদুপদেশ-নিবহ। মহাবীর অর্জ্জুনের ভার্য্যা সুভদ্রার যদি পুত্রকে ক্ষাত্রোচিত শিক্ষা প্রদানের ক্ষমতা না থাকিত, তবে কি অভিমন্যুর অসীম কীর্ত্তি-গাথা কাহারও শ্রবণ-গোচর হইতে পারিত ? সুতরাং জননী বিদুষী এবং সচ্চরিত্র-ভূষণে ভূষিতা হইলে উজ্জ্বল মণির ন্যায় সন্তান যে লোক-সমাজে বরেণ্য হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

"আকরে পদ্মরাগাণাং জন্ম কাচমণেঃ কুতঃ।"

সাধারণতঃ বামাকণ্ঠবিনির্গত বাক্যের মর্ম্ম-স্পর্শিত গুণ সমধিক প্রবল। মনস্বিনী দ্রৌপদীর যুক্তিপূর্ণ উৎসাহ-বাক্য শ্রবণ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই পাণ্ডবগণ বীরগণের শ্রেষ্ঠ আসন এবং সমুন্নতির চরম সীমায় পদার্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বিশেষতঃ মাতৃদেবীর ন্যায় ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম ত্রয়কে পালন করেন বলিয়া গার্হস্থ্যাশ্রম আশ্রম চতুষ্টয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সেই পরম পবিত্র গার্হস্থ্যা-শ্রমের প্রধান উপজীব্য দয়াদাক্ষিণ্যাধার সরলমতি রমণীগণ। মহাত্মা মনু স্পষ্টাক্ষরে অভিধান করিয়াছেন, যে ;—

"ন গৃহং গৃহমিত্যাহু গৃহিনী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে॥"

ভারতভূমি সুশীলা পতিপরায়ণা রমনী-মণ্ডলীর অলোকসামান্য প্রতিভায় সুদীর্ঘকাল হইতে অপরাপর দেশবাসিকর্ত্তৃকও সমাদৃত। স্ত্রী জাতিই চন্দ্রের ময়ূখমালার ন্যায় গৃহীর সংসার সমুদ্ভাসিত করিয়া কমলারূপে বিরাজ করেন। সেই সকল গৃহলক্ষ্মীর সুশীলতা ব্যতিরেকে গার্হস্থ্যাশ্রমের উৎকর্ষ ক্ষণকালের জন্যও সাধিত হইতে পারে না, অনন্ত স্রোতস্বিনী-প্রবাহ অবিরাম গতিতে পয়োধিজলে নিপতিত না হইলে তাহার বিশালতা কি অপ্রতিহত-প্রভাবে রক্ষিত হইতে পারে ?

জগতে যে বস্তু সমধিক মূল্যবান, ভগবান্ তাহার রক্ষার জন্য সমুচিত স্থান নির্ম্মাণ করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। জনগণ-লোভনীয় সমুজ্জ্বল মণি বিষধর ফণীর মস্তকে রক্ষিত। সেইরূপ এ সংসার-জলধির অমূল্যরত্ন রমণীরাজি চিরজীবন সৎপাত্র দ্বারা সমাদরে রক্ষিত হইয়া থাকে।

যথা মনুঃ—"বাল্যে পিতুর্ব্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রাণাং ভর্ত্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম্।"

পক্ষান্তরে চক্ষুঃ প্রীতিকর কুসুম-কীটের ন্যায় পীযূষ মধুর দুগ্ধে গোমূত্র-কণার মত পবিত্রতাস্পদ সমুদ্ধৃত গঙ্গোদককে কূপোদকবিন্দুর ন্যায় অশেষ গুণাধার রমণীশরীরে যদি কোনরূপে দুঃশীলতা-ব্যাধি প্রবেশ করিতে পারে, তাহা হইলে একপদে তাহার সমুদায় মাধুর্য্য লোপ পায়। এমন কি জ্যোৎস্না-প্রোদ্ভাসিত গগনে অকাল জলদোদয়ের ন্যায় সুরম্য হর্ম্ম্যশোভিত নগরে প্রলয় ভূকম্পের মত দুঃশীলা রমণীর প্রভাবে সৎকার্য্যোন্মুখ সংসার শোচনীয় দশায় নিপতিত হয়! শৈশবে পিতামাতার অনির্ব্বচনীয় স্নেহে প্রতিপালিত হইয়া বালিকা স্বভাবতঃই স্নেহশীলা হইয়া থাকে। এবং মাতৃদেবীর নিদেশ অনুসারে গৃহকর্ম্মশিক্ষা ও আচার রক্ষার প্রতি মনোনিবেশ করে। বালকগণ পিতার নিকট সদুপদেশ গ্রহণ করিয়া যেমন সমাজে যশস্বী হয়, বালিকাগণও সেইরূপ বিদুষী মাতার কৃপায় শিক্ষিত হইয়া পৌরস্ত্রী-সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হয়। স্নেহমূর্ত্তি জননীর উপদেশপ্রভা স্ফটিকস্বচ্ছ শিশুহৃদয়ে যত শীঘ্র প্রতিফলিত হয়, অন্যদীয় উপদেশ সেরূপ ঝটিতি কার্য্যকর হয় না।

অবগুণ্ঠনবতী নবোঢ়াকে দেখিলে স্বভাবতঃই লজ্জার প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া মনে হয়। এই লজ্জাশীলতাই নারী-জীবনের পবিত্রতা এবং ধীরতা রক্ষা করিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান সময়েও উদ্দাম-যৌবনা রমণীর নবকমলনিভ নয়নদ্বয় পরপুরুষ-নিশাকর দর্শনমাত্রেই নিমীলিত হইয়া থাকে। এবং তাহাদের ভুজযুগল মৃণাল-সদৃশ কোমল হইলেও গৃহকর্ম্ম নির্ব্বাহে প্রমত্ত মাতঙ্গের শুণ্ডদণ্ডের ন্যায় অসীম ক্ষমতা ধারণ করিতেছে। ভর্তৃগৃহে মাতা পিতা প্রভৃতি স্নেহ বন্ধু-বিরহে ব্যাকুলান্তঃকরণ হইলেও শ্বশ্রূাদি গুরুজনের সেবা এবং গৃহস্থলীর নৈত্যিক কর্ম্মের সুশৃঙ্খলা করিতে জলমিশ্রিত দুগ্ধ হইতে হংসীর জল পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুগ্ধপানের ন্যায় অবিচলিত ভাব প্রায়শঃই পরিলক্ষিত হয়। এই সময় হইতেই পতিভক্তি পূর্ণমাত্রায় তাহাদের হৃদয় অধিকার করে; কিন্তু লজ্জাশীলা যুবতী গুরুজনের সম্মান সম্পূর্ণ রক্ষা করিয়া প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে পতিশুশ্রূষায় আমরণ দীক্ষিত থাকে।

দময়ন্তী, সীতা এবং সাবিত্রী প্রভৃতি পতিগতপ্রাণা দেবীমূর্ত্তিদিগের চরিত্রাদর্শ গ্রহণ করিয়াই আর্য্য রমণীগণ শিক্ষাপথে অগ্রসর হন। প্রতিবিম্ব-গ্রহণে বিমল মুকুরের ন্যায় যিনি যত অধিক পরিমাণে তাহাদের চরিত্র অনুকরণ করিতে পারেন, তিনিই সমাজে সমধিক প্রতিষ্ঠায় কীর্ত্তিত এবং আদর্শ নারীরূপে পরিগণিত হইয়া থাকেন। পূর্ব্বে সুদক্ষ পৌরাণিকগণের মুখপদ্ম

হইতে মহাভারতাদির সদুপদেশপূর্ণ ব্যাখ্যামৃত পান করিয়া মধুলোলুপ ভ্রমরীর ন্যায় জ্ঞানপিপাসু রমণীগণ আত্মতৃপ্তি সম্পাদন করিতেন। এবং প্রায় প্রতিবৎসরই পল্লীতে পল্লীতে প্রধানতঃ গৃহপিঞ্জরবদ্ধ রমণীদিগের প্ররোচনায় সমাদরে কথকতার অনুষ্ঠান হইত। অনেক সময় উচ্ছৃঙ্খল পরিবারও সুললিত ভাষাপূর্ণ পুরাণবর্ণিত পূর্ব্বতন পুরুষীয় সৎকীর্ত্তিগাথা শ্রবণ করিয়া সাম্যভাব অবলম্বন করিত। বর্ত্তমানে শারদগগনে মেঘমালার ন্যায় ঐ পদ্ধতির প্রাচুর্য্য না থাকিলেও চপলার ন্যায় স্থলবিশেষে সাময়িক স্ফুরণের অভাব ঘটে নাই। বিশেষতঃ পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রভাবে মহিলাগণ বিদ্যার বিমল জ্যোতিঃ লাভ করিতে পারিতেছেন। তাঁহাদের অনেকেই রামায়ণ মহাভারতাদির বঙ্গানুবাদ অনুশীলন পূর্ব্বক আত্মোন্নতি এবং পরিবারস্থ শিক্ষোপযুক্ত বালক বালিকাগণকে সুশিক্ষা প্রদানে সমর্থ হইতেছেন। কেহ কেহ বা মহাত্মা হ্যানিমানের গ্রন্থ আয়ত্ত করিয়া গৃহচিকিৎসায় বেশ পটুতা দেখাইতেছেন। পক্ষান্তরে "অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী" রমণীর অভাব নাই। তাঁহাদিগের বিদ্যার সুফল অপেক্ষা কুফলই সমাজে প্রসূত হয়। এমন রমণীও দুর্ল্লভ নহেন,—যিনি রামায়ণে তারাচরিত্র এবং মহাভারতে দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী ইত্যাদি পরিশীলন করিয়া স্বীয় স্বল্পজ্ঞতানিবন্ধন সদর্থ গ্রহণে অসমর্থ হইয়া স্থূলদৃষ্টিতে অসদর্থ গ্রহণ দ্বারা সমাজ ও বন্ধুগণের দুঃখোৎপাদন করিতেছেন। অল্প শিক্ষিতার হোমিওপ্যাথিক ব্যাপারেও পূর্ব্ব প্রকারই ফলোদয় ঘটে।

প্রায়শঃ নারীগণ পুত্রকামনায় নানাপ্রকার ব্রত নিয়মাদির অনুষ্ঠানে রত থাকেন। ভগবৎকৃপায় কালক্রমে নবশশধরের ন্যায় একটি সন্তান ক্রোড়ে পাইলে তাঁহার আর আনন্দের পরিসীমা থাকে না। পুত্রের মুখকমল দর্শন মাত্রেই দশমাস দশদিন জঠরে ধারণ এবং নিদারুণ প্রসববেদনা অবলীলাক্রমে ভুলিয়া যান। ঐ সন্তান-রত্নটিপ্রযুক্ত পতি-পত্নী উভয়ের দাম্পত্য প্রণয়পয়োধি উদ্বেলিতাকৃতি ধারণ করে। মহাকবি কালিদাস যথার্থ ই লিখিয়াছেন;—

"অপত্যগ্রন্থি রেকোঽয়ং দাম্পত্যস্নেহসংশ্রয়াৎ।"

মহিলাগণ এইরূপ ভাগ্যবতী হইলে গার্হস্থ্যাশ্রমের অবশ্য কর্ত্তব্য অতিথি-সৎকার, গুরুসেবা এবং অহিংসা প্রভৃতি প্রায়শঃই অধিকতর যত্নের সহিত নির্ব্বাহে বিমুখ হন না। পুরুষগণ সাংখ্যদর্শনের পুরুষের মত উদাসীন নন। কিন্তু তাঁহারা গার্হস্থ্যের উপযোগী দ্রব্য সকল সংগ্রহ করিয়া প্রকৃতিরূপিণী সহধর্ম্মিণীর করে সমর্পণ পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত থাকেন। সংসারের উপচয়াপচয়

এবং সুযশ ও অযশ সমুদায় গুরুতর বিষয়ের প্রতি সম্যক্ লক্ষ্য রাখিয়া পতি-প্রাণা অকাতরে আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া থাকেন। স্ত্রী-চরিত্রের গহনতা অবগত হইয়া কোন মনীষী আবেগ সহকারে বলিয়াছেন ;—

"স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।"

শ্রীপ্রাণবন্ধু ভট্টাচার্য্য-সরস্বতী।

প্রার্থনা।

পরমেশ !

ভিক্ষা মাগিছি আজ,
করুণায় তব পারি যেন পিতা
সাধিতে পুণ্য কাজ।
ভিক্ষা মাগিছি আজ।

তুমিই—দিয়েছ দীক্ষা
মুক্তির পথ চরণ তোমার
এই তো তোমার শিক্ষা ;
তোমার কোলেতে লয়েছি জনম
তাই মাগি এই ভিক্ষা।

দয়াময় যে গো তুমি,
তোমার চরণ পারি গো পূজিতে
এই শুধু মাগি আমি।
তুমিই জগৎ-স্বামী।

আজি এ ক্ষুদ্র প্রাণ ;
মুক্তির তরে চরণ উপরে
বিনয়ে করিনু দান।

ক্ষুদ্র এ হৃদি-খান,
তারি মাঝে তব মূরতি আঁকিয়ে
নীরবে হইব ম্লান।

পিতা, তোমারই ও ছবিখান,
দেখিতে দেখিতে চির তরে যেন
ত্যজি এ ক্ষুদ্র প্রাণ।
আমি, মাগি শুধু এই দান।

শ্রীভোলানাথ বিশ্বাস।

শিক্ষার দোষ।

উপন্যাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ঘাটে।

"যা' বলিলাম, যেন আর কেহ শুনিতে না পায়, এমন কি সয়ার কানেও যেন না উঠে"—এই কথা বলিয়া সদ্যঃস্নাতা পারুল ঘাট হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল।

পারুলের সই চপলার তখনও স্নান সমাপ্ত হইয়াছিল না। সে পারুলের অনেক পরে আসিয়া পুষ্করিণীতে অবতরণ করিয়াছিল। পুষ্করিণীতে তখন আর কেহ ছিল না,—দুই সইয়ে অনেকক্ষণ গল্প হইল। প্রাণের গোপন-পুরে লুক্কায়িত অনেক কথা উভয়ে উভয়ের নিকটে আবৃত্তি করিল। পারুল অনেকক্ষণ আসিয়াছিল, কাজেই সে কথিত কাহিনীর মধ্যে একটি কথা যাহাতে কোনপ্রকারে প্রকাশ না হয়, তৎসম্বন্ধে সইকে সাবধান হইতে অনুরোধ করিয়া চলিয়া গেল।

উভয়েই যুবতী—উভয়েই সৌন্দর্য্যের নিখুঁত প্রতিমা।

পুকুরের নীলজলে প্রভাত-প্রফুল্ল পদ্মের মত দুইটী রমণী ছিল, একটি চলিয়া গেল,—অপরা অঙ্গ-মার্জ্জনা করিয়া স্নান সমাপ্ত করিল।

বৈশাখ মাসের পূর্ব্বাহ্ন বড় সুন্দর। পূর্ব্বদিন রাত্রে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল, সকালে রৌদ্র ফুটিয়াছে। ধরিত্রীর শীতল বক্ষে প্রভাত-সূর্য্যের হেম-ধারা পড়িয়া ঝিক্ ঝিক্ করিতেছিল এবং বর্ষণলঘু শুভ্র মেঘগুলা আকাশের প্রান্তভাগে পড়িয়াছিল।

কালের হিসাবে তখন বসন্ত-অন্ত; কিন্তু পল্লী-কাননে তখনও কুটজ মল্লিকা মালতী যুথিকা ফুটিয়া অযাচিতে গন্ধ বিলাইতেছিল,—তখনও নব

কিশলয়-কোমল-আসনে বসিয়া দধিয়াল শ্যামা কোকিল পাপিয়া মধুর গাথায় দিগন্ত ভাসাইতেছিল।

চপলা স্নানান্তে ক্ষুদ্র বৃহৎ বৃক্ষ-বল্লরী-সমাচ্ছন্ন সরু গ্রাম্যপথে গৃহে গমন করিতে লাগিল।

জনহীন পল্লী-পথে সে যখন ধীর-মন্থর গতিতে চলিয়া যাইতেছিল, তখন সেইপথে একজন পুরুষও গন্তব্য স্থানাভিমুখে গমন করিতেছিল।

উভয়ে সেই সরুপথে—উভয়ে বিপরীত দিক্‌গামী; সুতরাং চপলা পথের দিকে পৃষ্ঠ দিয়া—পথপ্রান্তের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষগুলির অতি সন্নিকটে গিয়া দাঁড়াইল, পুরুষটি চলিয়া গেল।

গেল কিন্তু তিন চারিবার চাহিতে চাহিতে গেল। সে গিয়াছে কি না, অথবা লোকটা কে কিম্বা অপর কোন কারণে চপলাও একবার সে দিকে চাহিয়া গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল।

পুরুষটি যুবক এবং ভদ্রবংশসম্ভূত। কিন্তু সেই আকর্ণবিশ্রান্ত চলনীলোৎপলদলতুল্য চক্ষুর চাহনীতে কিঞ্চিৎ কাতর হইল।

পুরুষটি চপলার অপরিচিত নহে।

চপলার সৌন্দর্য্য তাহার প্রাণে—সেই বৈশাখী প্রভাতে যেন একটু নবীন আনন্দের সৃষ্টি করিতেছিল.—সৌন্দর্য্য আনন্দদায়ক বটে, কিন্তু অনেক সময় আনন্দ রূপান্তরিত হইয়া যায়। যাহা আনন্দ, তাহা পাতকস্পর্শপরিশূন্য। অল্প একটু আনন্দের উত্তেজনার উপর সহসা চপলার দৃষ্টিবিক্ষেপ—সহসা সেই যুবকের প্রাণে একটা বেদনার ক্ষীণ ব্যথা জাগাইয়া তুলিল।

মালক্ষ্মীদের এইরূপ ফিরিয়া চাওয়াটা খুব ভাল কাজ নয়। অনেক সময় অনেক নর-পশুর ইহাতে নরক-জ্বালা উপস্থিত হয়। আবার কোথাও কোথাও এই সূত্র লইয়া অনেক অকাণ্ড-কুকাণ্ডও ঘটিয়া যায়।

চপলা সেই পাড়ার মেয়ে, সেই পাড়ার বৌ। শ্বশুরবাড়ীতে তাহার শ্বশুর ভাসুর দেবর প্রভৃতি কেহ না থাকায়, সে পথে চলিতে প্রায়ই মাথায় কাপড় দিত না। গ্রামের মেয়েরা যেমন ভাবে চলিয়া থাকে, চপলাও সেই ভাবে চলিত। হয় ত যখন শ্বশুর বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিত, তখন অঞ্চলাগ্রটুকু মাথার উপর তুলিয়া দিয়া ঘোমটার কার্য্য সম্পন্ন করিত।

কেবল চপলার কাছে নহে, আজ কা'ল ঘোমটার চলনটা বড়ই কমিয়া আসিয়াছে। বঙ্গে এক দিন ঘোমটা বড় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল।

চপলা স্নানান্তে ক্ষুদ্র বৃহৎ বৃক্ষ-বল্লরী-সমাচ্ছন্ন
সরু গ্রাম্যপথে গৃহে গমন করিতে লাগিল।
২২ পৃষ্ঠা।

স্বর্গবাসীরও পুণ্যক্ষয়ে পতন আছে। ঘোমটা. সুন্দরীগণের বদন-সৌন্দর্য্য একাধিপত্যে উপভোগ করিত। সে দিন বুঝি যায়—ঘোমটার বুঝি অধঃপতনকাল আসিয়াছে। কিন্তু জানেলার ধারে উজ্জ্বল নীলচক্ষু, আর ঘোমটার অন্তরালে নবনলিনসম্পুট সদৃশ রক্তোষ্ঠ, দেখিবার জিনিষ ছিল!

চপলা নির্ম্মল হৃদয়ে—পবিত্রচিত্তে যেমন যাইতেছিল, তেমনই যাইতে লাগিল,—যুবক একটু গোলযোগে পড়িয়া, যুবতীর কানে আপন রস-পরশ পঁহুছাইবার জন্য একটা গান ধরিয়া দিল,—এবং সেই গান গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল। গাহিতে গাহিতে গেল—

আঁখিতে আঁখিতে কত কথা
কহে ছিলে এঁকেছিলে কত ছবি মনে।
বিষাদে ডুবিয়া কত বিষাদ-বিধুরা বালা
কেঁদেছিল কত নিশি চাহি পথ-পানে।
নিশীথে ডাকিত পাখী
চমকি উঠিত চিত-চোর,
দক্ষিণ-পবনে ধীরে নড়িত গাছের পাতা
মনে হ'ত তুমি এলে মোর,
নিরাশা হাসিয়া শেষে ব্যথা দিত প্রাণে।

গানের সুর চপলার কানে গেল, কিন্তু সে তাহার কোন কথার অর্থ গ্রহণ করিল না।

যুবক কিন্তু ভাবিতেছিল, চপলা নিশ্চয়ই তাহার গানের প্রতি বর্ণের অর্থ সংগ্রহ করিয়া সমস্ত হৃদয়খানা তাহারই বসিবার জন্য মাজিয়া ঘসিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিতেছে এবং আজিকার সন্ধ্যাকালে পল্লীর সমস্ত স্ফুটনোন্মুখী ফুলকলিকাগুলি কুড়াইয়া আনিয়া সে আসনে পাতিয়া পুষ্প-শয্যা রচনা করিবে। হয় ত আ'জ রাত্রে আর যুবতীর নিদ্রা হইবে না,—চাঁদের জ্যোৎস্না মাখিয়া, মলয়ার হাওয়ায় কুন্তলরাজি উড়াইয়া, আঁচলে ফুলের বাস বাঁধিয়া লইয়া, বিরহ-শয়নে শুইয়া তাঁহারই কথা ভাবিবে।

আরও তিনি স্থির করিয়া গেলেন, তাঁহার মত সুন্দর, মনোহর, গুণী ও জ্ঞানী এগ্রামে দ্বিতীয় নাই। নতুবা চপলা তাঁহার এত অনুরক্ত কেন? চপলা যদি তাঁহার অনুরক্ত না হইবে, তবে ফিরিয়া চাহিবে কেন?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ননিলাল।

চাঁদের হাট ক্ষুদ্র পল্লী। এই ক্ষুদ্রপল্লীতে ননিলাল চক্রবর্ত্তীর বাস। তাঁহার পিতা যজমান-শিষ্য এবং কয়েক বিঘা নিষ্কর জমির আয় হইতে চিরদিন সুখ-শান্তিতে সংসার চালাইয়া পুত্র ননিলাল, দুইটী কন্যা ও বর্ষীয়সী গৃহিণীকে রাখিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

ননির পিতা মনে করিয়াছিলেন, যজমান-শিষ্যদ্বারা আ'জ কা'ল আর সেরূপ আর্থিক আয় হয় না,—যাহারা ইংরেজী বিদ্যা শিক্ষা করে, তাহারা প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে এবং সমাজে 'বাবু' নামে অভিহিত হইয়া সুখ-স্বচ্ছন্দে দিন অতিবাহিত করিয়া থাকে। অতএব তিনি একমাত্র পুত্র ননিকে ইংরেজী বিদ্যালয়ে পড়িতে দিয়াছিলেন।

ননি যখন প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করিয়া এক, এ, পড়িবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, সেই সময় তিনি স্বর্গারোহণ করেন, কাজেই খরচ-পত্রের অভাব হওয়ায়, ননির পড়া-শুনা বন্ধ হইয়া গেল,—সে চাকুরী করিবার জন্য কলিকাতায় ছুটিল। বিবাহটা চক্রবর্ত্তীমহাশয় জীবিতাবস্থাতেই দিয়া গিয়াছিলেন।

ননি যখন কলিকাতায় যায়, তখন সে ভাবিয়া গিয়াছিল, সে যখন প্রবেশিকা পর্য্যন্ত পড়িয়াছে এবং তাহার হাতের লেখা সহপাঠীদিগের মধ্যে সকলের চেয়ে উৎকৃষ্ট, তখন কলিকাতায় পঁহুছিবামাত্র কোন এক সাহেব তাহাকে ডাকিয়া লইয়া অন্ততঃপক্ষে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনের একটা চাকুরী দিবেই দিবে।

কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তাহার ভ্রম ভাঙ্গিয়া গেল। সে প্রতি কার্য্যালয়ে—প্রতি আফিষের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রতিদিন ভগ্ন-আশ হইয়া ফিরিয়া আসিয়া এই অভিজ্ঞতা লাভ করিল যে, কেবল প্রবেশিকা পর্য্যন্ত অধ্যয়ন, আর হাতের লেখা ভাল হইলেই চাকুরী হয় না,—হয়, আফিষের বড়বাবুর সম্বন্ধী, নয় জামাতা হওয়ার আবশ্যক।

তিনমাস ঘরের খাইয়া প্রতিদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে সন্ধান করিয়াও যখন কোন কাজের যোগাড় হইল না, তখন ননি পল্লী-ভবনে ফিরিয়া যাইবার উদ্যোগ করিল।

এই সময় এক অশ্বব্যবসায়ী সাহেবের আফিষে মাসিক পঞ্চদশ মুদ্রা বেতনের চাকুরী খালির সংবাদ পাইয়া সেখানে ছুটিয়া গেল।

সাহেব তাহার হাতের লেখা দেখিয়া এবং প্রবেশিকা পরীক্ষার সার্টি-ফিকেট দেখিয়া কার্য্যে মনোনীত করিলেন। ননিলাল সাফল্যের সহাস আনন লইয়া বাসায় ফিরিলেন।

বাসার বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহার অদৃষ্টকে শত ধন্যবাদ প্রদান করিল। কেন না, একে মাসিক পঞ্চদশমুদ্রা বেতনের চাকুরী, তদুপরি সাহেববাড়ী!

কিন্তু কথা উঠিল, তিনি ইহার মধ্যে খাইবেন কি, বাসাভাড়া দিবেন কি, আর বাড়ী পাঠাইবেন কি!

দুই একজন ভবিষ্যৎজ্ঞানে অনভিজ্ঞ বন্ধু সেইরূপ কথা উত্থাপন করিলেও অপরেরা বুঝাইয়া দিল,—অত চিন্তা করিলে আর চাকুরী করা চলে না, এবং এক দিনেই পঞ্চাশটাকা বেতনের চাকুরী মিলে না। ক্রমে উন্নতি হইবে।

সেই ভবিষ্যতের আশায় বুক বাঁধিয়া ননিলাল মনোযোগ সহকারে শ্বেতাঙ্গ প্রভুর আদেশ পালন করিতে লাগিলেন। তিন চারিমাস চাকুরী করিয়াও যখন বাসা খরচ বাদে বাড়ী একটি পয়সাও পাঠাইতে পারিলেন না, তখন নিতান্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

বর্ত্তমান সময়ে দ্রব্যাদি যেরূপ মহার্ঘ, তাহাতে মেসের খরচই পনর টাকায় সংকুলান হওয়া কঠিন,—বাড়ী যায় কি! বাড়ীতে এমন কোন সংস্থান নাই যে, তদ্দ্বারা বাড়ীর লোকের বারমাস চলিতে পারে। সম্পত্তির যাহা আয় আছে, তাহাতে কোনরূপে—কায়ক্লেশে বৎসরের মধ্যে তিন চারি মাস চলিতে পারে। অবশিষ্ট কয়েক মাস তাহারা কি খাইবে?

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি প্রাইভেট-টিউটারী করিতে মনস্থ করিলেন। তখন সকাল ও সন্ধ্যায় সেই কার্য্যের অনুসন্ধানে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিতে আরম্ভ করিলেন।

কয়েক দিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া এক দধি-দুগ্ধ বিক্রেতার দুইটী শিশু পুত্রের অধ্যাপক রূপে নিযুক্ত হইলেন। মাসিক বেতন হইল, ছয় টাকা। যাইতে হইবে দিনের মধ্যে দুইবার—একবার সকালে ও একবার সন্ধ্যায়।

দধিবিক্রেতা নিজে বর্ণজ্ঞানবিহীন, কিন্তু দধিদুগ্ধের অত্যন্ত লাভকর ব্যবসায়ে একখানি বাড়ী ও কিছু নগদ টাকা হাতে করিয়া পুত্র দুইটীকে ইংরেজী স্কুলে পড়িতে দিয়াছে। বড়টি ষষ্ঠ শ্রেণীতে এবং ছোটটি অষ্টম

শ্রেণীতে পড়িত। ননি একদিন বৈঠকখানায় বসিয়া ছাত্র দুইটীকে অধ্যয়ন করাইতেছিল,—গোপমহাশয় অদূরে বসিয়া একখানা ছিন্ন কাপড়ের উপরে রিপু করিতেছিলেন।

ননির বড় ছাত্রটি পাঠে নিতান্ত অমনোযোগী, এবং বহু চেষ্টাতেও কোন কথা তাহার বুদ্ধিগম্য করান যায় না। বয়স প্রায় সপ্তদশ উত্তীর্ণ হয়, এবং ষষ্ঠবর্ষ বয়স হইতে বিদ্যালয়ে গমন করিতেছেন,—কিন্তু তিনি তাঁহার পিতা এবং এযাবৎ অনেক শিক্ষকের প্রাণপণ যত্নেও ষষ্ঠ শ্রেণী উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। এক এক শ্রেণীতে তিন চারিবৎসর তিনি অবস্থান না করিয়া উপরে উঠেন না।

গলদ্ঘর্ম্ম হইয়াও যখন ননি তাহাকে উপক্রমণিকা ব্যাকরণের ব্যঞ্জন সন্ধির চতুর্থ সূত্রটি বুঝাইয়া উঠিতে পারিল না, তখন গভীর দুঃখের সহিত বলিল,—"না, বাপু; তোমার কিছু হবে না। অনর্থক কষ্ট করিয়া কি করিব! তোমরা নিতান্ত বোকা!"

পুত্রের নিন্দায় গোপমহাশয় অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। বক্রদৃষ্টিতে একবার ননির মুখেরদিকে চাহিয়া বলিলেন,—"আমি তখনই জানি, তোমার কাজ নয়। সে দিন যখন তুমি আমার দোকানের কাছ দিয়ে আস্‌ছিলে,—আমি ব'ল্লাম, দুধের ভাঁড়টা হাতে ক'রে নিয়ে যাও ত,—দোকানে লোকজন নেই, একটা খদ্দেরকে দু'হাঁড়ী চিনিপাতা দই দিতেই হবে—বাড়ী গেলে মাগীরা পেতে রাখবে,—তা' তুমি আন্‌লে না। সেই দিনই তোমার উপর আমার দেল চটেছে।"

ননির ছাত্র সুবিধা বুঝিয়া বলিল,—"পড়াতেও পারেন না, বাবা।"

বাবা সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ বলিয়া পুত্র সাহস করিয়া সে কথা বলিয়া দিল।

ননি বিস্মিত নয়নে একবার ছাত্রের দিকে, একবার ছাত্রের পিতার দিকে চাহিল। তারপর ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল,—"আমি দুধের ভাঁড় বহিয়া আনিব কেন? ভদ্রলোকের ছেলে,—মোট বহিব নাকি?"

ঘোষমহাশয় অবজ্ঞার স্বরে বলিলেন,—ইস্‌,—যার খেতে হয়, তার গেতে হয়। মাসে মাসে ছয়টা ক'রে টাকা খাও, এক ভাঁড় দুধ আন্‌তে পার না!"

ননি। সে আমায় দিয়ে হবে না।

ঘোষ। আগে যে মাষ্টার ছিল, সে ওসব কাজে কোন দিন না বলেনি।

ছাত্র। আর সে কেমন পড়াত। সে কি কোন দিন আমাকে বোকা ব'লেছে—বল না, বাবা?

ঘোষ। না, তা ত ব'লেনি,—বরং সুখ্যাতিই করিত।

ননি। প্রশংসা করিত—ভাল পড়াইত, তবে তোমার ছেলে তিন চারি বৎসর করিয়া এক এক ক্লাসে থাকে কেন?

ঘোষ। সে বলিত, ওতে লেখা পড়া ভাল হয়। গোড়া থেকে পাকা হ'য়ে যাওয়া ভাল।

ননি। গোড়া থেকে পাকা হ'তে হ'তে এণ্ট্রেন্স ক্লাস পর্য্যন্ত উঠিতে যে মাথার চুল পাকিয়া যাবে।

ঘোষ। শোন, মাষ্টার।

ননি। বল।

ঘোষ। তুমি আর আমার বাড়ী এস না।

ননি। আমার অপরাধ?

ঘোষ। তুমি ছেলে পড়াইতেও পার না—আমার কথাও শোন না।

ননি। ছেলে পড়াইতে পারি কি না, তাহা যখন তুমি বুঝিতে পার না, তখন আমার কোন কথা টিকিবে না। ফলকথা, তোমার ছেলে ভাল নয়।

ঘোষ। হুস্,—আমার ছেলে ভাল না। ও কত ইংরিজী কথা বলে—কেমন রামায়ণ পড়ে। তোমার কত পাওনা আছে?

ননি। এই এ মাসের সতর দিনের বেতন।

ঘোষ। শুক্কুর বারে এসে নিয়ে যেয়ো। আর তোমার আস্‌তে হবে না।

ঘোষপুত্রদ্বয় অবজ্ঞাভাবে উঠিয়া চলিয়া গেল। ননিও বিষণ্ণ মুখে, নিতান্ত ক্ষুব্ধচিত্তে সে বাড়ী পরিত্যাগ করিল।

মেসে আসিয়া ননি যখন চিত্তদাহ লইয়া আপনার নির্ণীত শয্যাটুকুর উপরে শুইয়া পড়িল, তখন মেসের ঝী আসিয়া তাহার নিকটে একখানা ডাকের পত্র দিয়া গেল।

পত্রখানা তাহার বাড়ী হইতে আসিয়াছে। ননির মাতা লিখিয়াছেন। পনরই বৈশাখ তাঁহার অক্ষয় তৃতীয়া ব্রতপ্রতিষ্ঠা,—অপরাপর উদ্যোগ তাঁহারা করিয়াছেন, ননিকে কেবল টাকা দশেক মূল্যের কয়েকখানি বস্ত্রের

তালিকা পাঠাইয়াছেন, এবং কাপড় কয়খানি লইয়া অবশ্য অবশ্য বাড়ী যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। সে দিন বৈশাখ মাসের তেরই।

— —

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রত্যাগমন।

পরদিবস যথাসময়ে সাহেবের নিকটে ননিলাল আবেদন করিল যে, তাহাকে সাত দিনের বিদায় দিতে হইবে।

সাহেব আবেদন পত্র পাঠ করিয়া অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন, এবং ননি-লালের এই অন্যায় প্রার্থনার কৈফিয়ৎ দিবার জন্য তখনই তলব করিলেন।

ননি হাজির হইয়া বলিল,—"হুজুর, আমার মা লিখিয়াছেন, তাঁহার ব্রতপ্রতিষ্ঠা, আমাকে বাড়ী যাইতেই হইবে।"

সাহেব। মায়ের অনুরোধে পুত্র বাড়ী যাইবে, ইহা কেবল অসভ্য বাঙ্গালী জাতির মধ্যেই শোভা পায়। আমি ছুটি দিব না।

ননি। সাহেব, আমার আর ভাই নাই, আত্মীয়-স্বজন নাই,—তারপরে গরিব মানুষ, বাড়ীতে দাসদাসী নাই, আমি না গেলে আমার মায়ের ব্রত সারা হবে না।

সাহেব। তুমি একটি গাধা,—এই অকিঞ্চিৎকর অজুহাতে কখনই ছুটি মিলিতে পারে না। হাঁ, যদি তোমার স্ত্রীর অসুখ-বিসুখ করিত,—তবে দুই একদিনের ছুটি পাইতে পারিতে।

ননি। সাহেব, আমরা বাঙ্গালী জাতি, আমরা মাতাকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জানি।

সাহেব। ঐ দোষেই ত জগৎ সমক্ষে তোমরা পূর্ণ সভ্য হইতে পারিতেছ না। যাও, কাজ করগে। ছুটি পাবে না।

ননি। অন্ততঃ তিন দিনের ছুটি দিতেই হইবে।

সাহেব। কিছুতেই না।

ননি। আমি আপনার কাজে নিযুক্ত হইয়া পর্য্যন্ত ছুটি লই নাই।

সাহেব। এখন মরসুমের সময় ছুটি মিলিবে না।

ননি। আমাকে যাইতেই হইবে।

সাহেব। আমি ছুটি দিব না, যাইবে কি প্রকারে?

ননি। যদি চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া যাইতে হয়, তবু যাইতে হইবে। না গেলে, মা ক্ষুণ্ণ হইবেন।

তখন সাহেব বাঙ্গালীজাতির মাতৃ-ভক্তিরূপ হৃদয়-দৌর্ব্বল্য অনুভব করিয়া নিতান্ত মর্ম্মাহত হইলেন, এবং ভবিষ্যতে বিলাতের কোন প্রবন্ধক্ষুধাতুর নূতন মাসিক পত্রে এতদ্বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিবেন স্থির করিয়া ননির বিষয় বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

ননির হাতের লেখা খুব ভাল। লেখাপড়াও বেশ জানে। তিনি কোন ভদ্র ইংরেজের নিকট বিশুদ্ধ ইংরেজীতে চিঠিপত্র লিখিতে জানেন না, ননি সে কার্য্য উত্তমরূপেই সম্পন্ন করিয়া থাকে। ননি আত্মকর্ত্তব্য পালনে কখনই উদাসীন নহে। মাসিক পঞ্চদশটি রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে তত কাজ অপরের দ্বারা পাওয়া দুর্ঘট। যদি ছুটি না দিলে সে কাজ পরিত্যাগ করিয়া যায়, তবে একটু ক্ষতি হইতে পারে,—ইহা বিবেচনা করিয়া, সাহেব বলিলেন,—"আরও বিনীতভাবে, আরও কাঁদাকাটা করিয়া ছুটির জন্য প্রার্থনা করা উচিত ছিল।"

ননি। সাহেব, আপনি মনিব—আপনি উপদেষ্টা ও অন্নদাতা,—আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, দয়া করিয়া তিন দিনের জন্যে আমাকে বিদায় দিন।

সাহেব। বেশ, তোমায় তিন দিনের জন্যে অবকাশ দিলাম,—কিন্তু এ তিন দিনের বেতন পাইবে না।

ননি। সাহেব, এটা কি উচিত হইল?

সাহেব। খুব দয়া করিয়াছি বাবু,—এমন ছুটি কিন্তু আর চাহিয়ো না। এখন যাও, কাজ করগে। তুমি কাজে বড়ই গাফিলতি করিতে আরম্ভ করিয়াছ।

ননি সে কথার আর কোন উত্তর করিল না। সে জানিত, চাকুরী করিতে হইলে, এরূপ মধুর বচন শ্রবণ করাই দৈনন্দিন ভাগ্যলিপি।

আফিসের কার্য্য সমাপ্ত করিয়া দিবাবসানকালে ননি বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। যেমন করিয়াই হউক, সাহেবের নিকটে তিনদিনের অবকাশ মিলিল,—অদ্য রাত্রে বাড়ী গেলে ব্রতসারার পরদিন পর্য্যন্ত সে বাড়ী থাকিতে পারিবে, কিন্তু তাহার মাতা যে কাপড়গুলি লইয়া যাইতে

লিখিয়াছেন, তাহা কোথা হইতে মিলিবে? ননির হাতে তখন দুইটী টাকার অধিক নাই।

ননি আর হাতে মুখেও জল দিল না। তখনই মেস্‌বাটীর বাহির হইয়া কয়েকজন বন্ধুবান্ধবের নিকটে গমন করিল,—উদ্দেশ্য কিছু ঋণ করা। কিন্তু কোথাও কিছু মিলিল না। তখন সেই ঘোষ মহাশয়ের নিকটে গমন করিল, এবং অতি বিনীতভাবে জানাইল,—"বিশেষ কার্য্যের জন্য আমি রাত্রেই বাড়ী যাইব, আমার পাওনাটা মিটাইয়া দাও।"

ঘোষমহাশয় টাকা দেওয়া দূরের কথা,—ননিকে কতকগুলি কটুকথা শুনাইয়া দিল। কেন না, শুক্রবারে টাকা দিবার কথা, ছোটলোক ও নিতান্ত কাণ্ডজ্ঞানহীন না হইলে কখনই তাহার পূর্ব্বে কেহ আসে না। ননি গালি খাইয়া ম্লানমুখে ফিরিয়া গেল।

তাহাদের মেসে যে মুদী চাউল-দাইল প্রভৃতি ওটনা দিত, তাহার একখানা কাপড়ের দোকানও ছিল। মেসের সম্বন্ধে ননিকে মুদী বিশেষরূপেই জানিত,—ননি টাকাদশেকের কাপড় ধারে দিবার জন্যে তাহাকেই ধরিল, এবং মাসকাবারে মূল্য দিবে বলিল।

'দুনো লাভে ধারে বিক্রয়' এই নীতিকথার অনুসরণ করিয়া মুদী কাপড়গুলি প্রদান করিল। কাপড় পাইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে ননি সেই দিন রাত্রের গাড়ীতেই বাড়ী চলিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মাতৃ-উপদেশ।

ননির বাড়ী আসিতে রাত্রি শেষ হইয়া গিয়াছিল, কাজেই বেলা প্রায় আটটা পর্য্যন্ত ঘুমাইতেছিল।

চপলা প্রত্যূষেই উঠিয়াছিল, কিন্তু স্বামীকে তখন ডাকিলে তাঁহার অসুখ করিতে পারে, মনে করিয়া ডাকে নাই। তদনন্তর গৃহকর্ম্ম সমাধা করিয়া পুষ্করিণী হইতে স্নান করিয়া আসিল। তখনও ননি নিদ্রিত।

চপলা আর্দ্রবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া শয়নকক্ষে গমন করিল—এবং অনেক বেলা হইয়াছে বলিয়া স্বামীকে জাগাইয়া দিল।

ননি উঠিয়া দেখিল, সম্মুখে সদ্যঃস্নাতা কুসুমের মত সদ্যঃস্নাতা চপলা। মৃদু হাসিয়া বলিল,—"স্নান পর্য্যন্ত যে সারা ?"

চপলাও মৃদু হাসিল। বলিল—"বেলাও যে আটটা।"

ননি। তাই ত,—অনেকক্ষণ ঘুমাইয়াছি।

চপলা। রাত্রে যে মোটেই ঘুম হয় নাই।

ননি। মা কোথায় ?

চপলা। সকালে উঠিয়া এতক্ষণ পর্য্যন্ত ব্রতের জিনিষের যোগাড় করিয়া ফিরিতেছিলেন, —এখন বাড়ী আসিয়াছেন।

ননি। তিনি কোথায় কি যোগাড় করিতে গিয়াছিলেন ?

চপলা। না, অন্য কোথাও না। এই পাড়ার মধ্যে ফুলটা মূলটা ?

ননি। ব্রত ত কা'ল,—আর সব জিনিষ সংগ্রহ হইয়াছে ?

চপলা। মা বড় গোছাল মেয়ে,—সব যোগাড় করিয়াছেন। তোমাকে কাপড়ের জন্যে লিখিয়াছিলেন,—আনিয়াছ কি ?

"হ্যাঁ, আনিয়াছি"—এই কথা বলিয়া ননি উঠিয়া বাহিরে গেল, চপলাও রন্ধন-গৃহে গমন করিল।

ননির মাতা রন্ধন গৃহের দাবায় বসিয়া তরকারি কুটিতেছিলেন। ননি গিয়া তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিল।

মাতা-পুত্রে অনেক কথা হইল। চপলা গৃহমধ্যে থাকিয়া রন্ধন করিতে করিতে সে সকল কথা শুনিতেছিল।

পুত্র ননিলাল বলিল,—"মা, আমার যে চাকুরী, তাতে নিজের পেটের ভাত যুটানই কষ্টকর। তোমাদিগকে পাঠাইব কি ?"

মাতা। যাক্ বাবা, এ সময় যে কাপড় ক'খানা আনিতে পারিয়াছিস্, সেই যথেষ্ট।

ননি। তাই কি টাকা দিয়া আনিয়াছি !

মাতা। তবে ?

ননি। ধার করিয়া—দোকানীকে মাসকাবারে টাকা দিব বলিয়া ধারে কিনিয়া আনিয়াছি।

মাতা। যে টাকা পাস্, তা' দিয়া যদি মেসের খরচই টানাটানি হয়, তবে মাসকাবারে দিবি কেমন করিয়া ?

ননি। দেখা যাবে—যদি এর মধ্যে একটা টুইসুনির যোগাড় করিতে পারি।

মাতা। দেখ্, এক কাজ কর্।

ননি। কি কাজ মা?

মাতা। চাকুরী করিয়া যদি এক পয়সাও বাড়ী না আসে, তবে বিদেশে পড়িয়া থাকিয়া, সে চাকুরী করিবার প্রয়োজন কি? পয়সা আসিবে না, তুইও ছুটি পাবি না,—আমার মতে এমন চাকুরী না করাই ভাল।

ননি। ভবিষ্যতের মুখ চাহিয়া পড়িয়া থাকিতে হয়।

মাতা। ভবিষ্যতে কি হইবে?

ননি। দু' পাঁচ টাকা বেতন বৃদ্ধি হইতে পারে।

মাতা। তাহা হইলে আর কি হইবে। সেই দু'পাঁচ টাকাই নয় বাড়ী পাঠাইতে পারবি। কিন্তু নিজের বিষয়কাজ দেখিতে পাবি না—বারমাস বিদেশে পড়িয়া থাকিতে হইবে,—কোন্ ভবিষ্যতে মাসে দু'পাঁচ টাকা পাঠাবি,—এমন কাজে প্রয়োজন নাই।

ননি। তবে কি করিব? যা, সম্পত্তি আছে, তাতে আর কি হবে?

মাতা। তোর বাপ এই সম্পত্তি আর যজমান-শিষ্যের কাজ করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার চালাইতেন,—তুইও তাই কর্। ঐ তোর ওবাড়ার খুড়োমহাশয়েরা যজমান-শিষ্যের কাজ করাইয়া ত সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। কা'ল অক্ষয় তৃতীয়া—কত জিনিষ পত্র নগদ টাকাকড়ি পাবে,—তুই বাপু, আমার চক্ষুর সম্মুখে থাকিয়া ঐ কাজই কর্।

ননি। আমি যে সে পথ হারাইয়া ফেলিয়াছি।

মাতা। কেন?

ননি। আমি সংস্কৃতও জানি না—দশকর্ম্ম করিতেও শিখি নাই।

মাতা। কত মূর্খতে ওকাজ করে, আর তুই পার্‌বি নে!

ননি। এক মূর্খতে পারে, কেন না, তার কোন জ্ঞান নাই; এমন কি মানাপমান পর্য্যন্ত বোধ নাই। আর পণ্ডিতে পারে। আমার মত মাঝামাঝি লোকের পক্ষে সকল দিকেই অন্ধকার।

পুত্রের এই সকল কাহিনী শ্রবণ করিয়া মাতা অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইলেন। তারপরে সাংসারিক অপরবিধ কথা আরম্ভ হইল। সে সকলের সহিত আমাদের উপন্যাসের কোন সম্বন্ধ না থাকায়, লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন বলিয়া মনে করা গেল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিদায়।

কোন প্রকারে ননির মাতার অক্ষয় তৃতীয়া ব্রত-প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। তৎপর দিবসই ননির অবকাশের শেষ দিন। ননি রাত্রির গাড়ীতে কলিকাতায় যাইবে।

আসন্নবিদায়ের মনোবেদনা বুকে করিয়া ননি যখন পাড়া হইতে বেড়াইয়া আসিয়া বহির্ব্বাটীস্থ নারিকেলতলায় দাঁড়াইয়া গাছের নারিকেল-গুলার অবস্থা পরিদর্শন করিতেছিল, তখন গ্রামের সীতানাথ বসুর পুত্র হীরালাল আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল।

হীরালালের বয়স ত্রিশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। গ্রামের বঙ্গবিদ্যা-লয়ে ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া পিতার সহকারিরূপে জমীদারী কাছারিতে কার্য্য করিতেছে,—হীরালালের পিতা গ্রামের তহশীলদার।

হীরালালের পিতা, পুত্রের বিদ্যাবত্তায় যথেষ্ট সন্তুষ্ট ছিলেন। পিতা বঙ্গ-ভাষায় মুদ্রিত গ্রন্থ অধ্যয়ন করাকেই শিক্ষার চরমোৎকর্ষ মনে করিতেন,—কেন না, তাহা পাঠ করা গেলেও অর্থবোধ করা বড়ই কঠিন। পুত্র অবাধে নাটক-নভেলগুলা পাঠ করিয়া যাইত এবং দুই তিনখানা বাঙ্গালা মাসিক পত্র ও একখানা সাপ্তাহিক কাগজ গ্রহণ ও পাঠ করিত। এবং মধ্যে মধ্যে সত্য-মিথ্যা সংবাদ কাগজে ছাপাইয়া বঙ্গভাষার লেখক হইবার দাবি রাখিত। এবং মধ্যে মধ্যে কবিতা রচনা করিয়া যে, মাসিক কাগজের সম্পাদকের নামে না পাঠাইত, তাহা নহে। দুঃখের বিষয়, তাহা মুদ্রিত হইত না। মুদ্রিত না হইলেই হীরালাল সে কাগজের গ্রাহক তালিকা হইতে নাম উঠাইয়া লইত এবং অপর কাগজে কবিতা প্রকাশের আশা পাইয়া গ্রাহক হইত। হীরা-লাল সর্ব্বদাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিত,—জামা-কাপড়ে দেহ আবৃত না করিয়া সে কখনও গৃহের বাহির হইত না। হীরালাল গান গাহিয়াও লোকের নিকটে প্রশংসা লইবার দাবি করিত। এযাবৎ যতগুলি গানের বই মুদ্রিত হইয়াছে, হীরালাল প্রায় তাহার সবগুলিই ক্রয় করিয়াছে। পাঠকপাঠিকার নিকট হীরালালের গান অপরিচিত নহে,—সেদিন যখন

চপলা স্নান করিয়া আসিতেছিল, হীরালাল তখন যাহা গাহিয়াছিল, অবশ্যই তাহা মনে আছে। অন্ততঃ এই আখ্যায়িকা সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সেটা একটু স্মৃতিপথে রাখিতেই হইবে।

ননি বড় কাহারও সহিত মিশিত না। তাহার স্বভাবই সেইরূপ। তথাপি পল্লীর হর্ত্তাকর্ত্তা তহশীলদারের পুত্র হীরালালের সম্বর্দ্ধনা করিল। বলিল,—"হীরুভায়া যে, ভাল আছ ত ?"

মৃদু হাসিয়া হীরালাল বলিল,—"ভাল আছি। তোমার চাকুরীতে সুবিধা কেমন ?"

ননি। চাকুরীর বাজার আ'জ কা'ল বড় মন্দ। তবে উপায় কি,—এক রকম চ'লে যাচ্চে।

হীরা। বৌ-ঠাক্‌রুণদের বাসায় লইয়া যাবেন নাকি ?

ননি। না ভায়া, যে চাকুরী, নিজের উদর চালান কঠিন,—তা' আবার পরিবার লইয়া যাইব !

হীরা। আর ওটা ভালও নয়—বাড়ী ঘর-দুয়ার সব নষ্ট হইয়া যায়। বিষয়-আশয়ের বন্দোবস্ত কিছুই থাকে না। তবে আ'জ কা'লকার ফ্যাসান কি না—তাই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম।

ননি। ফ্যাসান বটে, কিন্তু টাকায় কুলাইলে ত সব।

হীরা। সে ত ঠিক কথা। কবে যাওয়া হবে ?

ননি। আ'জ রাত্রেই।

হীরা। চাকুরের চাকুরী, না গেলে চলিবে কেন ? তবে মন খারাপ হয়।

ননি। বুড়ো মা আর পরিবারটি বাড়ী থাকে—মনটা উতলা হয় বৈ কি ; কিন্তু কি করি ? বিদেশে না গেলে ত আর পেট চলিবে না।

হীরা। তা' ভয় কি ! আমরা ত গ্রামে আছি। আমরা তোমাদের পৈতৃক যজমান। এখনই যেন অপরের দ্বারা কাজ করাইতেছি। যখন যা অভাব হয়, যখন যা প্রয়োজন হয়,—আমাকে সংবাদ দিলেই—আমি তাহা সম্পন্ন করিব। মধ্যে মধ্যে আসিয়া খবরাখবর লইয়া যাইব।

ঠিক এই সময় ননির মাতা সেই স্থানে আগমন করিলেন। তিনি ভাবিলেন, পুত্র বুঝি গাছের নারিকেলগুলা বিক্রয় করিবার বন্দোবস্ত করিতেছে।

ননিকে বলিলেন,—"নারিকেল কি বিক্রয় করবি ? ডাবগুলো ওবাড়ীর

রামের মা লইবে বলিয়াছে। ঝুনাগুলো যদি বিক্রয় হয়, তা' বিক্রয় কর্।"

ননি। না মা, ডাব বা ঝুনা আমি কিছুই বিক্রয় করিতেছি না। প্রয়োজন হইলে, তোমরাই বিক্রয় করিয়ো। হীরু ভায়ার সহিত অনেকদিন পরে দেখা হইল, তাই কথা কহিতেছিলাম।

ন-মা। তা কহিবে বৈ কি? হীরু বড় ভাল ছেলে।

ননি। হীরু বলিতেছে, মাঠাকুরাণীর যখন যাহা প্রয়োজন হয়, আমাকে যেন সংবাদ দেন, আমি তাহা সম্পন্ন করিয়া দিব। আমরা আপনাদের যজমান।

ন-মা। যজমান আবার নয়! তবে বাবা, তুই ওসব কাজ ছেড়ে দিয়ে আমার সকল দিক্ নষ্ট করিয়াছিস্। দেখ বাবা হীরু, আমি তোমার বাপের কাছে ক'দিন যাব যাব মনে করিতেছিলাম।

হীরু। কেন খুড়ীঠাক্রুণ?

ন-মা। রূপচাঁদ-পাড়ুই আমাদের একটা জমী রাখে,—তার খাজনা দেয় না।

হীরু। তার জন্যে বাবার কাছে যাইবার কোন প্রয়োজনই নাই। বাবা ওসকল কাজ মোটেই দেখেন না। আমাকেই সমস্ত করিতে হয়। আমি কা'লই তাকে ডাকাব,—আপনার যাইবার কোন প্রয়োজন নাই। আমি তাহাকে সঙ্গে করিয়া আপনার কাছে হাজির করিব, আর যাহাতে খাজনার টাকা দেয়,—তার ব্যবস্থা করিব।

ননি। দে'খ ভায়া, তোমার ভরসা বিশেষ রহিল।

হীরু। কোন ভাবনা নাই—খুড়ীঠাক্রুণ, আপনার খাজনাপত্র আমিই সব আদায় করিয়া দিব।

ননির মাতা ভাবিলেন, ইহা হইতে সুবিধা আর কি আছে! তহশীলদারের পাইক-পেয়াদা গেলে কোন্ বেটা খাজনা না দিয়া থাকিতে পারিবে? আমি মেয়েমানুষ বলিয়া যেমন তাহারা খাজনা দিতে চাহে না, তেমনি এবার দিবার পথ পাইবে না। তখন হীরুকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইলেন। ননিও কৃতজ্ঞতা জানাইয়া হীরুকে বিদায় দিল। হীরু হৃষ্টান্তঃকরণে ক্ষুব্ধ-লুব্ধ-নয়নে যেন কাহার অনুসন্ধান করিতে করিতে চলিয়া গেল।

রাত্রি এগারটার সময় আহারাদি অন্তে ননি স্ত্রীর নিকট বিদায় চাহিল।

চপলার মুখে বিষাদ-কালিমা ঘনাইয়া বসিল। আয়ত নয়ন দুইটী হইতে জলধারা বহিয়া গণ্ড প্লাবিত করিল। বলিল,—"পর্ণ-নীড় হইতে বিহগ উড়িয়া গেলে বিহগী যে ছটফট করে, তুমি কি তাহা দেখ নাই?"

ননিরও চক্ষুতে জল আসিল। কি বলিয়া স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিবে, তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। তাহারই তখন বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। প্রাণের ভিতর হইতে রুদ্ধ উচ্ছ্বাস যেন দুর্দ্দমনীয় বেগে বাহিরে আসিবার চেষ্টা করিতেছিল। কেবল বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কহিল,—"শীঘ্রই আবার আসিব।"

আঁচলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে চপলা বলিল,—"সপ্তাহে অন্ততঃ দু'খানা করিয়া পত্র দিয়ো। ভাল আছ শুনিলেও স্থির থাকিতে পারি।"

"দিব"—বড় ধরা গলায়, বড় ভরা আওয়াজে এই কথা বলিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ননিলাল বিদায় লইল, তারপরে মাতৃ-চরণে প্রণাম করিয়া ষ্টেসনাভিমুখে গমন করিল।

গ্রামের বাহির হইয়া ননি একবার বৈশাখী জ্যোৎস্নামাখা তরুশীর্ষ-সমাচ্ছন্ন সুপ্ত গ্রামখানির দিকে চাহিয়া দেখিল। গ্রামের সহিত তাহার যে এত দৃঢ় ভালবাসা, পূর্ব্বে সে তাহা ভালরূপ জানিতে পারে নাই। আজ যখন সে গ্রাম ছাড়াইয়া গ্রামের অস্পষ্ট বৃক্ষ-চূড়াগুলির প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিল, তখন তাহার অশ্রু-বাষ্পে হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিয়া কণ্ঠরোধ করিয়া ধরিল, এবং জগৎ-সংসারের সমস্ত দৃশ্য ছায়া-নির্ম্মিত মায়ামরীচিকার মত অত্যন্ত অস্পষ্ট জ্ঞান হইতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

———

বিবাহ-পদ্ধতি।

পুরাকাল হইতেই বিবাহ-পদ্ধতি সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বজাতির মধ্যে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তবে দেশভেদে ও ধর্ম্মভেদে, ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কোথাও বা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বাক্‌দানে, কোথাও বা অঙ্গুরী বিনিময়ে, কোথাও যুবক-যুবতীর উভয়ের সম্মতিতে আর কোথাও বা পাত্র-পাত্রীর পিতামাতার সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে।

সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে সকল দেশেরই রীতিনীতি ও সামাজিক নিয়মাবলী ক্রমেই পরিমার্জ্জিত হইয়া আসিতেছে ও সেই সঙ্গে স্থান ও সময় বিশেষে বিবাহ পদ্ধতিরও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে ও হইতেছে। কোথাও বা পুরাতন প্রথানুযায়ী এখনও পর্য্যন্ত এই কার্য্য সুসম্পন্ন হইতেছে।

লাপল্যাণ্ডবাসিগণ এখনও পর্য্যন্ত তাহাদের পূর্ব্বপুরুষপ্রবর্ত্তিত সামাজিক প্রথা বিবাহ সম্বন্ধে উল্লঙ্ঘন করে নাই। বিবাহের পূর্ব্বে বরকন্যার মধ্যে এক প্রকার দৌড়বাজী সেদেশে প্রচলিত আছে; লাপল্যাণ্ডবাসী কোন যুবক কোন যুবতীর পাণিগ্রহণাভিলাষী হইলে, নিকটস্থ কোন ময়দানে উভয়ের মধ্যে দৌড়বাজী হয়। এই দৌড়বাজীতে পাত্রের জয়লাভ বিশেষ আবশ্যক, নতুবা বিবাহের কোন সম্ভাবনাই থাকে না। পাত্রী প্রণয়াভিলাষিণী পরিলক্ষিত হইলে একদিকে যেমন পাত্রের বাজী জিতিবার আশা বলবতী হয়, পাত্রীর পিতামাতার অসম্মতি অন্যদিকে শুভসম্মিলনের পথে বিষম অন্তরায়; তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেহ বিবাহ করিতে উদ্যত হইলে কঠিন রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়; এমন কি জীবনদণ্ডেরও ব্যবস্থা হইতে পারে। সুতরাং কোন যুবক কোন যুবতীর প্রেমাভিলাষী হইলে, পাত্রীর পিতামাতার সন্তোষসম্পাদন ও তাহাদের সম্মতিগ্রহণ তাহার প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য—এবং সেইজন্য তাহাকে তাহাদের মনোরঞ্জনার্থে প্রথমেই আপন বন্ধুবর্গদ্বারা যুবতীর গৃহে একটী অঙ্গুরীয়ক, মদ্য ও অন্যান্য দ্রব্যাদির উপঢৌকন পাঠাইতে হয়। যুবককেও তৎসঙ্গে যুবতীর গৃহদ্বার পর্য্যন্ত অনুগমন করিয়া বহির্দ্দেশে তাহাদের আদেশ অপেক্ষায় দণ্ডায়মান থাকিতে হইবে; দ্রব্যগুলি গৃহীত হইলে কন্যার পিতা বর-প্রদত্ত মদ্য সেবন ও সম্মতি জ্ঞাপন করাইবেন। পরে বিবাহ কার্য্য সমাধা হইলে বরকে কন্যার সহিত তাহার পিত্রালয়ে এক বৎসর কাল অবস্থান করিতে হইবে।

রুশীয়াদেশের বিবাহ পদ্ধতি বড়ই কৌতুকাবহ।—সেণ্টপিটার্সবর্গের অবিবাহিতা যুবতীরা দলবদ্ধ হইয়া মনোমত পতিলাভের জন্য দিব্য বসন-ভূষণে সজ্জিতা হইয়া সন্ধ্যার প্রারম্ভে উদ্যান-বিহার করিয়া থাকে ; অবিবাহিত যুবকগণও মনোমত পত্নীলাভের আশায় এই স্থলে সমবেত হয়। ঘটনাক্রমে কোন যুবকের কোন যুবতীকে মনোনীত হইলে বিবাহ প্রস্তাব কোন বৃদ্ধার দ্বারা কন্যাকর্ত্তার নিকট প্রেরণ করিতে হয় ; ফলতঃ কন্যার সম্মতি বা অসম্মতি প্রকাশের ক্ষমতাই থাকে না। পুরাকালে রুশিয়া দেশের সর্ব্বস্থানে ইতর ভদ্র সকল শ্রেণীরই মধ্যে কন্যাকে তাহার বিবাহ দিনে একগাছি চাবুক লইয়া বর-সভায় উপস্থিত হইতে হইত এবং বিবাহের পর কন্যাকে সেই চাবুকটি বরের পদতলে রাখিয়া সর্ব্বতোভাবে নতজানু হইয়া তাহার বশ্যতা স্বীকার করিতে হইত। বলা বাহুল্য, এই প্রথা ক্রমেই লোপ পাইয়া আসিতেছে। বিবাহের দিনে কন্যার পিতা স্বীয় গৃহে একটি ভোজ দিয়া থাকেন এবং তাহাতে বর আপন আত্মীয় বন্ধুবর্গ ও পুরোহিত সমভিব্যাহারে যোগদান করেন। ভোজনাদি শেষ হইলে সকলে বর ও কন্যাকে লইয়া গির্জ্জায় গমন করেন ও তথায় বিবাহ কার্য্য ধর্ম্মযাজক দ্বারা সুসম্পন্ন হইয়া থাকে।

নরওয়ে দেশের বিবাহ পদ্ধতি অন্যরূপ। বিবাহকালীন কন্যাকে মাথার মুকুট, কোমরবন্ধ, নেকলেস, ব্রুচ এবং দুইটী অঙ্গুরীয়ক অতি অবশ্যই ধারণ করিতে হইবে এবং এই অলঙ্কারগুলি সেই জন্য সযত্নে সংরক্ষিত হয় ও বিবাহ দিনে কন্যারই প্রাপ্য বলিয়া পুরাকাল হইতে পূর্ব্বপুরুষগণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া আসিতেছে। বিবাহকালে কন্যার চক্ষু বাঁধিয়া দেওয়া হয় এবং এই অবস্থায় তাহাকে তাহার যুবতী সখীগণ পরিবৃত হইয়া নৃত্যে যোগদান করিতে হয়—নৃত্য করিতে করিতে কন্যা আপন মস্তকের মুকুট খুলিয়া নৃত্যকারিণী সখীগণের মধ্যে কোন একজনকে সেই মুকুট পরাইয়া দিবে। যে কুমারীকে এই মুকুট প্রদত্ত হইবে, জানিতে হইবে যে পরবর্ত্তীবারে তাহার বিবাহ হইবে। অদ্যাবধি এই প্রথা নীচ-শ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়।

ইতালিতে ও তত্রত্য ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিবাহ সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। তবে যাবতীয় ইতালীয়গণ মে মাসে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক। কন্যার পিতাকে সংসারে নিত্য প্রয়োজনীয় আসবাব দ্রব্যাদি যথাসম্ভব আপন কন্যাকে প্রদান করিতে হয়, এমন কি অনেক স্থলে বিবাহের পূর্ব্বদিনে কন্যার পিতাকে ঐ সকল জিনিষ বরের গৃহে প্রেরণ করিতে হয়।

আবার টাসকানি প্রদেশের বিবাহপ্রথা অন্যরূপ! টাসকানি যুবতী বিবাহের পূর্ব্বে বরের সহিত সাক্ষাৎ করিলে বা করিতে গেলে তাহাকে পদমর্য্যাদা হীন হইয়া পড়িতে হইবে। এই জন্য বিবাহকালে কন্যা আপন সহচরীবৃন্দ সমভিব্যাহারে বিবাহ-সভায় আসিতে পারে না। বিবাহের সময় কন্যাকে কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ ও সাদা টুপি পরিধান করিতে হয়।

সিফিলিতে কোন যুবক-যুবতী পরস্পর আকৃষ্ট হইলে কন্যাকে বিবাহ হওয়া পর্য্যন্ত বর-প্রদত্ত লাল রেশমি ফিতা মস্তকে ধারণ করিতে হয়; কন্যাকে এই সঙ্কেত-সূচক ফিতা প্রদত্ত হইলেই কন্যার পিতামাতা এই ফিতা-প্রেরকের মনোগত ভাব বুঝিয়া লয় এবং পাত্রটি মনোনীত হইলে তাহারা সানন্দে কন্যার বিবাহের আয়োজন করে; ঐ সঙ্কেত-ফিতাই এই দেশে যুবক যুবতীর একপ্রকার বিবাহ-জ্ঞাপক।

স্পেনদেশীয় কোন যুবক কোন যুবতীর পাণিগ্রহণাভিলাষী হইলে যুবককে আপন হৃদয় উচ্ছ্বাসজ্ঞাপক কোন সুললিত সঙ্গীত গাহিয়া যুবতীর নিকট মনোভাব ব্যক্ত করিতে হয়; যদি যুবকের প্রস্তাব যুবতীর মনোনীত হয়, তবে তাহাকে যুবকের পদপ্রান্তে গোলাপফুল কিম্বা কোন ফুলের মালা নিক্ষেপ করিয়া আপন সম্মতি জানাইতে হয়। স্পেনের কোন কোন স্থানে এই প্রথা নবদম্পতীর মধ্যে বিবাহকালেও অদ্যাবধি পরিলক্ষিত হয়।

অস্ট্রিয়ায় শুভ বিবাহ কোন শুভদিনেই সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে; বিবাহের দিন প্রাতে বরকে কন্যার বাড়ীতে জুতা, রুমাল ও অন্যান্য দ্রব্যাদি উপঢৌকন পাঠাইতে হয় ও তৎপরে কন্যার পিতাকেও বহুবিধ দ্রব্যসম্ভার সহ কন্যার স্বহস্ত নির্ম্মিত একটি সার্ট বরের নিকট উপঢৌকন পাঠাইতে হয়। বিবাহের পর কোন কোন স্থলে বর-কন্যা গৃহপ্রবেশের পূর্ব্বে সামান্য মদ্যপান করিয়া গ্লাসটি বাটীর ছাদের উপর দিয়া নিক্ষেপ করিয়া তবে গৃহে প্রবেশ করিয়া থাকে। সেই সময়ে বর ও কন্যার হস্ত পরস্পর বন্ধন করিয়া দেওয়া হয়।

সুইজার্ল্যণ্ডে কন্যার বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই কন্যাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য একজন ধাত্রী নিযুক্ত হয়। কেননা, বিবাহের পর দিবস কন্যার অনিচ্ছা সত্ত্বেও বর কন্যাকে লইয়া আপন বাসস্থানে প্রস্থান করে। কোন কোন স্থলে বাটী প্রবেশকালে কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া বরকে বাটী প্রবেশ করিতে হয়।

ফরাসিদেশে কন্যার বিবাহে বরকে প্রচুর যৌতুক দিতে হয় এবং এই যৌতুকই এই দেশে বিবাহের একটি প্রধান অঙ্গ। অর্থ অভাবে অনেক স্থলে

গরিবলোকের কন্যার বিবাহই হয় না। বিবাহের পাকাপাকি বর কন্যার পিতামাতা কর্ত্তৃক মীমাংসিত হয়; কোন কোন স্থলে ধর্ম্মযাজক দ্বারাও একার্য্য সমাধা হইয়া থাকে ; কোন স্থলে বিশেষতঃ কৃষক প্রভৃতি গরিবশ্রেণীর মধ্যে দর্জ্জির দ্বারায়ও এই কার্য্য করাইয়া লওয়া হয়। বিবাহের উপযুক্ত বয়স পুরুষের ১৮ ও স্ত্রীর পক্ষে ১৫ হইলেই আর কোন আপত্তি থাকে না।

এশিয়া মাইনর ও তৎসন্নিকটস্থ পার্ব্বত্যপ্রদেশে বিবাহ কালে বর-কন্যা উভয়কে নিকটস্থ কোন নদীর জলে দাঁড়াইয়া বিবাহ-শপথ লইতে হয়. আবার কোথাও বা বরকন্যা উভয়কে নদীতটে জানুপাতিয়া বসিয়া একত্রে পরস্পরের উভয় হস্ত জলে স্থাপন করিয়া শপথ করিতে হয়। নদীজলে এইরূপ শপথ প্রথা অনেক পাশ্চাত্য প্রদেশে প্রচলিত দেখা যায়।

হারভি দ্বীপের বিবাহ প্রথা অতি ভীষণ অথচ কৌতুকাবহ; বরের বাড়ী যদি নিকটবর্ত্তী স্থানে হয়, তাহা হইলে বর আসিবার সময় কন্যার পিতার লোকগণকে কন্যার বাটী হইতে বরের বাড়ী আসিবার সমুদয় পথটিতে সম্পূর্ণরূপে নতমুখে ভূমি স্পর্শ করিয়া শায়িত থাকিতে হইবে—বর তাহাদের দেহের উপর দিয়া পদব্রজে কন্যার বাটীতে পৌঁছিবে—দুর্ভাগ্যবশতঃ যদি বরের বাটী তত নিকট না হয়, কিম্বা কন্যার পিতার লোকবল তত অধিক না হয়, তাহা হইলেও সেই স্বল্প সংখ্যক লোককেই একবার উপরিউক্ত ভাবে শুইয়া, একবার উঠিয়া, পুনশ্চ শুইয়া ও উঠিয়া বরকে কন্যার বাটী পর্য্যন্ত পূর্ব্বের ন্যায় লইয়া আসিতেই হইবে।

জাপানের বিবাহ প্রথা অন্যরূপ। সাধারণতঃ বিবাহের জন্য নিকটস্থ কোন পর্ব্বতোপরি তাঁবু স্থাপন করিতে হয় এবং বিবাহ দিনে বর ও কন্যাকে আপন আপন আত্মীয় পরিজন সহিত জাঁকজমক করিয়া বাটী হইতে বহির্গত হইতে হয় এবং পরস্পর বিভিন্ন পথ দিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঐ পর্ব্বততলে সম্মিলিত হইতে হয়; তাহার পর উভয়ে একত্রে পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিয়া তাঁবু মধ্যে প্রবেশ করিবে ও ধর্ম্মযাজকের ইঙ্গিত মত নির্দ্দিষ্ট স্থানে বিবাহ বেদীর সম্মুখে উপবেশন করিবে ; উভয়ের অনুচর বৃন্দ পশ্চাতের আসন গ্রহণ করিবে। তৎপরে পুরোহিতের আদেশ মত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কন্যা তাহার হস্তস্থিত মশালটি প্রজ্বলিত করিবে এবং বর আপন মশালটি কন্যার মশাল হইতে জ্বালাইয়া লইয়া উভয়ের মিলন জ্ঞাপন করিলে, পুরোহিত ও সম্মিলিত সকলে জয়ধ্বনি করিয়া নবদম্পতীকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। বিবাহের পর

বিবাহবেদীর নিকট বৃষ বলির প্রথা জাপানীগণের মধ্যে প্রচলিত আছে। এই বলির পর বর ও কন্যা উভয়েই বরের বাটীতে গমন করে ও তথায় ক্রমাগত আটদিন ধরিয়া বিবাহভোজ চলিয়া থাকে; বিবাহ উপলক্ষে বর ও কন্যা সম্পূর্ণ শুভ্র পরিচ্ছদ পরিধান করিবে; এমন কি পরিচ্ছদে লোহিত বর্ণের লেশ মাত্রও থাকিবে না। জাপানীগণের মধ্যে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত, এতদ্ভিন্ন যুবক-যুবতীর বিবাহও সচরাচর হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার সংখ্যা অতি অল্প। কন্যার পিতা বিশেষ ধনবান হইলে কন্যাকে বহুমূল্য যৌতুকাদির সহিত একটি বুনিবার চরকা প্রদান করিয়া থাকেন। কন্যাকে পতির গৃহে গৃহস্থালীয় সকল কার্য্যই করিতে হয়; সুতরাং বিবাহের অগ্রে পিতার গৃহে তাহাকে সকল কার্য্যই শিক্ষা করিতে হয়।

চীনদেশের বিবাহ প্রথা অনেকটা আমাদের দেশের মত। বিবাহের পূর্ব্বে বর ও কন্যার কোষ্ঠী দেখিয়া তাহাদের রাশি গণ ইত্যাদির মিল হইলে, তবে বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হয়। সকল বিষয় বর ও কন্যার পিতামাতা কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ মীমাংসিত হইলে, বরের বাটী হইতে কন্যার জন্য সুন্দর, সৌখীন দ্রব্যাদির ভেট পাঠান হয়; পরে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। সচরাচর ফেব্রুয়ারি মাসই ইহারা বিবাহের প্রশস্ত সময় বলিয়া থাকে।

জাপানের মত চীনেও অল্প বয়সে পুত্রকন্যার বিবাহ হইয়া থাকে, কিন্তু সচরাচর কন্যার বয়স প্রায় চৌদ্দ বৎসরের ন্যূন হয় না। কেননা, অনেকের ধারণা চৌদ্দ বৎসর না হইলে কন্যা বিবাহের উপযুক্তাই নহে। সুতরাং বর ও কন্যার বয়স প্রায়ই সমান কিম্বা দুই চা'র বৎসরের মাত্র প্রভেদ হইয়া থাকে। জাপানের মত এদেশেও বিবাহের উপঢৌকন আসবাব দ্রব্যাদি বিবাহের পূর্ব্বে কন্যার পিতা কর্ত্তৃক বরের বাটীতে প্রেরিত হইয়া থাকে। বিবাহকালে কন্যাকে লাল রেশমি ওড়না দ্বারা আপাদমস্তক আবৃত করিয়া রাখা হয়; পরে সম্পূর্ণ ভূমিষ্ঠ হইয়া কন্যা স্বামীর চরণে প্রণাম করিলে স্বামী তাহার উপরের আবরণ স্বহস্তে খুলিয়া দিয়া প্রথম তাহার মুখদর্শন করে; পরে কন্যাকে এইরূপ ভাবে শ্বশুর ও শ্বশ্রূঠাকুরাণীর চরণে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া, অবশেষে বর ও কন্যা উভয়কে এইরূপ ভাবে একত্রে পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্দেশ্যে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে হয়।

শ্রীননীলাল সুর।

অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি।

এক দেহে দুই মূর্ত্তি—স্ত্রী ও পুরুষ। অসম্ভব,—তন্ত্রের এ বর্ণনা শুনিয়া তোমরা কি বিশ্বাস করিতে পার যে, ইহা সত্যের প্রতিকৃতি? প্রাণ এক—দেহ এক; কিন্তু অর্দ্ধেক পুরুষের ন্যায়, অর্দ্ধেক রমণীর ন্যায়। এমন দৃশ্য থাকা কি সম্ভব হইতে পারে? তন্ত্রে এ মূর্ত্তিকে অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি বলে। তান্ত্রিকগণ এই মূর্ত্তিকেই জৈবীসৃষ্টির আদিমূর্ত্তি বলিয়া থাকেন।

সকল দেশের সকল জাতির শাস্ত্রেই রূপক বড় আয়ুষ্মান রূপে বিরাজ করে। যে দর্শনশাস্ত্র বা যে দার্শনিক তত্ত্ব সূক্ষ্মের উপর সংস্থিত,—তাহা সাধারণের দুর্ব্বোধ্য—অজ্ঞেয়, কিন্তু রূপক ধর্ম্মশাস্ত্রের ভিতরে প্রবেশ করিয়া, তাহার সহিত একাঙ্গীভূত হইয়া, প্রত্যেক দেবমন্দিরে,—প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে বাঁচিয়া থাকে। দার্শনিক সূত্র সকল সাধারণ মানবের পক্ষে প্রতিপাল্য ধর্ম্ম হইতে পারে না;—তাই তাহাতে রক্ত-মাংস যোগ করিয়া, তাহার একটি স্থূল দেহাবয়ব গঠিয়া লইয়া, এক একটি রূপক প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয়। তন্ত্র বা পুরাণের দেবতাগণ এই রূপকসত্ত্বা। এই রূপকেই খ্রীষ্টিয়ানের আদম ও ইভ সয়তানের বিষফল ভোজন করিয়া মানবের আদি পিতা ও আদি মাতা হইয়াছেন। এই রূপক সত্ত্বাতেই তন্ত্রের এই অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তির প্রচার।

অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তির কথা বুঝিতে হইলে, আমাদিগকে অনেক তথ্যই ভাবিতে হইবে।

আগে কি ছিল? স্ত্রী ও পুরুষ দুই জাতি ছিল কি না? না না,—আগে এভেদ ছিল না। এক দেহে স্ত্রীত্ব ও পুংস্ত্ব দুইভাব ছিল। মানুষ তখনই পূর্ণ ছিল। অপূর্ণ জীবনের মিলনাকাঙ্ক্ষা তখন জৈবী জীবনে জাগরিত হইয়া একের পশ্চাতে অপরকে টানিয়া লইত না। "কলুর চোখ বাঁধা বলদের মত' একের পশ্চাতে অপরে ঘুরিয়া মরিত না। কেন ঘুরিবে? দুই ভাব—দুই তত্ত্ব এক দেহেই যে বিরাজিত ছিল। তৃষ্ণা আর জল যদি একস্থানে—এক আধারে থাকে, তবে অভাব আসিবে কেন? যখন এই পূর্ণতা—যখন এই দুইভাবের—দুই তত্ত্বের একত্র মিলন ছিল, সেই আদি-কালের মানবের যে মূর্ত্তি, তাহাই অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি। এ মূর্ত্তি মানবের

চিরপূজ্য। এখনকার মানুষও এই মূর্ত্তি লাভ করিতে ব্যগ্র ও সচেষ্ট। এই মিলনের যে গ্রন্থি-বন্ধন, তাহাই প্রেম। প্রেমই এ কার্য্য—বিছিন্ন তত্ত্ব দুইটীকে এক করিতে পারে। কিন্তু সে কথা বলিবার আগে, আদিকালে যে নর-নারীর দুইতত্ত্ব একশরীরে বাস করিত,—তাহার কিছু প্রমাণ সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য।

কিন্তু যাহা আমাদের আদি অবস্থা, তাহার প্রমাণ এই অন্ত্য অবস্থায় স্থির হয় কি করিয়া? যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ—যাঁহারা বৈজ্ঞানিক—যাঁহারা আমাদের হইতে অতীত ও ভবিষ্যৎভাবনাতৎপর,—তাঁহাদের চিন্তা অধ্যয়ন ব্যতীত অন্য উপায় নাই।

মনুসংহিতার জগদুৎপত্তি অধ্যায়ে ভগবান্ মনু বলিয়াছেন,—সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর অনন্ত বিরাজমূর্ত্তিকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন; তাহার একভাগ স্ত্রী (তত্ত্ব) ও অপর ভাগ পুরুষ (তত্ত্ব) *। গেডিস্ টমসন প্রভৃতি পাশ্চাত্য লিঙ্গতত্ত্ববিদ্গণও নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, জৈবিক স্ত্রীপুরুষভেদ আগে ছিল না। প্রাণিগণের আদিপুরুষ উভয় লিঙ্গাত্মক ছিল, এবং সেই আদিম মৌলিক উভয় লিঙ্গত্ব (Original hermaphrodism) হইতে বর্ত্তমান স্ত্রীপুরুষ ভেদ উৎপন্ন হইয়াছে।

এই ভেদ কেবল বাহ্যিক দৈহিক ভেদ নহে। ইহা সূক্ষ্মতত্ত্বের প্রভেদ।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন—য়্যানাবলিজিম্ বা সঞ্চয়িকা শক্তি ও ক্যাটাবলিবাজিম বা বিশ্লেষিকাশক্তি—এই দুই শক্তির মিলনেই পূর্ণ শক্তি। আদিকালে মানুষে ইহা ছিল। যখন স্ত্রী-পুরুষ পৃথক্ হইল, তখন উভয়ে উভয় শক্তি পৃথক্‌ভাবে অবস্থিত হইল। দর্শনে এই দুই সূক্ষ্মশক্তির নাম প্রকৃতি ও পুরুষ এবং তন্ত্রে মাতৃ-শক্তি ও পিতৃ-শক্তি। গর্ভস্থভ্রূণে সঞ্চয়িকা শক্তির আধিক্য হইলে কন্যা এবং বিশ্লেষিকা শক্তির আধিক্য হইলে পুত্র জন্মে।

এখন কথা উঠিতে পারে, গর্ভস্থভ্রূণে সঞ্চয়িকা বা বিশ্লেষিকা শক্তির আধিক্য হয় কেন?

এখানেও সেই দর্শনশাস্ত্রের—তন্ত্রশাস্ত্রের সৃষ্টি-কাহিনী। ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির সহিত জীবাণ্ডের উৎপত্তি একই ভাবে সম্পাদিত।

প্রকৃতি সত্ত্ব-রজ-তমোময়ী বা ঐষিকত্ব, কৌষিকত্ব ও বিশ্লেষত্ব প্রভৃতি গুণের সাম্য বা প্রসুপ্ত অবস্থার জন্য অকার্য্যকর পুরুষ তাহাতে অধিষ্ঠিত

* অর্দ্ধেন নারীং বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ।—মনুসংহিতা।

হইলে, তবে জগদ্বিকাশ। মাতৃ-রজঃ প্রসুপ্ত শক্তি বুকে লইয়া পিতৃবীজকে ধরিল,—অমনি তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির নিদ্রা ভঙ্গ হইল। সে অবস্থায় যে শক্তি, যে ইচ্ছা বা যে অংশ—তাহার ঘুম ভাঙ্গাইয়া তাহাকে অকার্য্য হইতে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিবে; তাহার লিঙ্গত্বে, তাহার বিশিষ্ট ধর্ম্মে, তাহার বিশিষ্ট ধর্ম্ম বা বিশিষ্ট লিঙ্গত্ব হইবে! অতএব মাতৃ-ইচ্ছা বা তাহার স্থূল অভিব্যক্তি স্বরূপ মাতৃ-অংশ যদি প্রবল হয়, তবে কন্যা এবং তদ্বিপরীত হইলে পুত্র জন্মে। *

ঋষি বলেন—জৈবীশক্তির কেন্দ্র ভিন্নতার এই দুই বিভাগ থাকিলেও দেহবদ্ধ চৈতন্যই তাহার একমাত্র আধার। ধর্ম্মদ্বারা সেই বদ্ধচৈতন্যকে মুক্ত করিতে হয়।

ধর্ম্ম কি? মহর্ষি কণাদ বলেন—যাহা হইতে অভ্যুদয় ও চূড়ান্ত কল্যাণ সাধিত হয়, তাহার নাম ধর্ম্ম। † কপিল বলেন,—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি করার যে উপায়, তাহাই ধর্ম্ম। ‡

কিসে কি হয়,—সব বলা যায় না। কিন্তু সেই দুটী শক্তির একত্র মিলন ব্যতীত যে, দুঃখ দূর হয় না—তাহা বলিতে পারা যায়। তৃষ্ণায় হাহাকার করিয়া ফিরিবে, না পথ হাঁটিবে? আগে তৃষ্ণা নিবারণ কর, তারপরে পথ হাঁটিয়ো।

দুই তত্ত্ব এক করিবার যে শক্তি, তাহাই প্রেম—প্রেমের সাধনায় মিলন,—মিলনে মানুষ অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি ধারণ করে। কিন্তু কতদিন চাহিয়া আছি—কতদিন সাগরকূলে বসিয়া আছি—আর কতদিন থাকিব?

---

* স্ত্রীপুংসয়োঃ সুসংযোগে যদ্যাদৌ বিসৃজেৎ পুমান্। শুক্রং ততঃ পুমান্ বীর্য্যো জায়তে বলবান দৃঢ়ঃ॥ অথ চেৎ বনিতা পূর্ব্বং বিসৃজেদ্রক্তসংযুতম্। ততো রূপান্বিতা কন্যা জায়তে দৃঢ়সংহিতা॥—অষ্টাঙ্গহৃদয়।

† যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ। বৈশেষিক দর্শন।

‡ অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ—সাংখ্যসূত্র।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

রাগ ও রাগিণীর মূর্ত্তি।

লীলাবিহারেণ বনান্তরালে চিন্বন্ প্রসূনানি বধূসহায়ঃ।
বিলাসবেশো ধৃতদিব্যমূর্ত্তিঃ শ্রীরাগ এষঃ কথিতঃ কবীন্দ্রৈঃ ॥

শ্রীরাগ।

শ্রীরাগের গান।

ভুবন ছানিয়া, যতন করিয়া আনিনু প্রেমের বীজ।
রোপণ করিতে গাছ সে হইল সাধন মরণ নিজ ॥
সই, প্রেম তনু কেন হৈলা।
হাম অভাগিনী দিবস রজনী সিঁচিতে জনম গেলা ॥
পিরীতি করিয়া সুখ যে পাইব শুনিনু সখীর মুখে।
অমিয়া বলিয়া গরল কিনিয়া খাইনু আপন মুখে।
অমিয়া হইত স্বাদু লাগিল হইল গরল ফলে।
কানুর পিরীতি, শেষে হেন রীতি, জানিনু পুণ্যের বলে
যত মনে ছিল, সকলি পূরিল, আর না চাহিব লেহা।
চণ্ডীদাস কহে পরশন বিনে কেমনে ধরিব দেহা ॥

শ্রীরাগ-পত্নী গৌরী।

গৌরী-রাগিণীর গান।

গৌরী—আড়াঠেকা।

বন হতে বনমালী আসিয়াছেন রঙ্গে।
শ্রীদাম সুদাম নাচিতেছে সঙ্গে॥
নানা বন অন্বেষিয়া, নানা কুসুম তুলিয়া,
সাজায়ে দিয়েছে শ্যামকে যা সেজেছে অঙ্গে।
রাখিতে গোপীর মান, শ্রীকৃষ্ণ করুণা নিধান,
বাঁশীতে তুলিয়ে রে তান গৌরী-প্রসঙ্গে॥

অবচিত।

(১)

কতবার ভেবেছিনু আপনা ভুলিয়া,
তোমার চরণে দিব হৃদয় খুলিয়া।
চরণে ধরিয়া তব কহিব প্রকাশি,
গোপনে তোমারে সখা কত ভালবাসি।
ভেবেছিনু কোথা তুমি স্বর্গের দেবতা,
কেমন তোমারে কব প্রণয়ের কথা ?
ভেবেছিনু মনে মনে দূরে দূরে থাকি
চিরজন্ম সঙ্গোপনে পূজিব একাকী ;
কেহ জানিবে না মোর গভীর প্রণয়
কেহ দেখিবে না মোর অশ্রু-বারিচয়।
আপনি আজিকে যবে শুধাইছ আসি,
কেমনে প্রকাশি কব কত ভাল বাসি !

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(২)

আমি দিবানিশি আকাশ পানে চেয়ে রৈ।
আমার মনে হয়,
মেঘের মাঝে, আমার মা বুঝি ঐ ॥

মা আমার অনন্তরূপিণী, মা আমার নীরদবরণী,
আকাশ নীলিম, অনন্ত অসীম,
তাই ভাবিনা তায়, আমার মা বৈ।

হোথা রবি-শশী-তারা, কিরণ ভাষে হেসে তারা,
বলে আয় আয় তোর মা হেথায়,
আমি হোথা যেতে পারি কই !

পাখী ভাসে মেঘের গায়, সে যে মায়ে দেখতে পায়,
আপন ভাষায়, গুণ গেয়ে যায়,
আমি শুধু কেঁদে সারা হই !

যে যাবার সে যাক্ গো সেথা, আমি মা বলিয়ে কাঁদবো হেথা,
বাসনা আমার বুঝিব এবার,
আমি মায়ের ছেলে হই কি নই।

শ্রীবিহারীলাল সরকার।

নানাকথা।

সাহিত্যসেবী বন্ধুবর্গের নিকট অবসর মাসিক পত্রের দশম ভাগের প্রথম সংখ্যা প্রেরিত হইল। যাঁহারা পুরাতন গ্রাহক, যাঁহারা অবসরের পোষক, যাঁহাদের করুণায় অবসর সমুন্নত, তাঁহাদিগকে আর কিছুই লিখিতে হইবে না। উপহারের পুস্তক দুই খানির মুদ্রণ প্রায় শেষ হইল,—খুব সম্ভব আশ্বিন মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতেই তাঁহাদিগের নিকট উহা ভিঃপিতে প্রেরিত হইবে। অবসরের বার্ষিক মূল্য সডাক ১।০ এক টাকা চারি আনা ও উপহার পুস্তকদ্বয়ের কেবল মাত্র ডাক মাশুল ও ভিঃপি কমিশন।০ চারি আনা, মোট দেড় টাকা দিয়া উপহার পুস্তক গ্রহণ করিবেন। নূতন গ্রাহকগণ অবিলম্বে গ্রাহক হইবার জন্য পত্র লিখিবেন।

এখন হইতে প্রত্যেক মাসের কাগজ প্রত্যেক মাসের সংক্রান্তির দিন নিশ্চয়ই প্রকাশ হইবে। কোন প্রকারে কাগজ না পাইলে পরবর্ত্তী মাসের প্রথম সপ্তাহে জানাইবেন, প্রতিকার করিব। ৺পূজার বন্ধের মধ্যেই আশ্বিন মাসের কাগজ বাহির হইবে, কেবল একমাসের জন্য ঠিকানা পরিবর্ত্তন কঠিন,—নিজ নিজ পোষ্টাফিষে বন্দোবস্ত করিবেন।

এ বৎসর এক পূর্ব্ববঙ্গেই গভর্ণমেণ্ট ম্যালেরিয়া নিবারণকল্পে ত্রিশ হাজার পাঁচশত বাষট্টি টাকা ব্যয় করিবেন। আর ঢাকায় মশক মারার জন্য ব্যয় হইবে, দুইশত কুড়ি টাকা। টাকা ব্যয় হইবে, কিন্তু ম্যালেরিয়া যাইবে কি? কুইনাইন বিতরণ, ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ ও গমনাগমন এ সকল ত গত-বৎসরেও হইয়াছিল,—কিন্তু ফল হয় নাই। আমরা বরাবরই বলিয়া আসি-তেছি—কেবল গভর্ণমেণ্টের টাকা খরচে দেশের রোগ দূর হইবে না। নিজে-দের দেশ, নিজেরা রক্ষা করা চাই!

মা আসিতেছেন! বর্ষার প্লাবনের চক্ষু জল এখনও ঘুচে নাই—দেশের লোক গৃহহারা, অন্নহারা—কতলোক কোলের ধন হারা—তথাপি মাতৃ-পূজার বিপুল আয়োজন হইতেছে। শুভঙ্করীর আগমনে দেশে আবার হাসি ফুটিবে। মা এবার গজে আসিবেন।—গজে চ জলদা দেবী,—সে ফল ফলিয়াছে, তবে এবারকার হাতীটা বুঝি ক্ষেপা—বড় বেশী ছড়াইয়াছে! এখন 'শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা'র আশা।

for favour of Exchange or Review

অবসর

এ সখি সুন্দরি, কহ কহ মোয় ;
কাহে লাগি তুয়া অঙ্গ অবশ হোয় ?
অধর কাঁপয়ে মৃদু ছল ছল আঁখি।
কাঁপিয়া উঠয়ে তনু কন্টক দেখি ॥
মৌন করিয়া তুমি কি ভাবিছ মনে।
এক দিঠি করি রহ কিসের কারণে ॥
বড়ু চণ্ডীদাসে কহে বুঝিলুঁ নিশ্চয়।
পশিল শ্রবণে বাঁশী অতত্ব সে হয় ॥

বঙ্গের প্রাচীন সংবাদ পত্র।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ২৩এ মে বাঙ্গালীর পক্ষে এক মহা আনন্দের দিন। এইদিন সুষুপ্ত বঙ্গের ক্রোড়ে "দর্পণ" দর্শন দান করিয়া তাহার চীৎকারে সমগ্র বঙ্গদেশ জাগরিত করে! মারকুইস্ অব্ হেষ্টিন্স্ তখন বঙ্গের মসনদে আসীন। কল্পিত রাজদ্রোহিতার ভয়ে ভীত না হইয়া প্রজাবৎসল হেষ্টিন্স্ যথাসাধ্য দর্পণের সহায়তা সাধন করিতে লাগিলেন। দর্পণের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র তিনি স্বহস্তে সম্পাদকের নিকট স্বীয় আনন্দ ও সহানুভূতি জ্ঞাপনপূর্ব্বক একখানি পত্র লিখেন। তিনি দর্পণের বহুল গ্রাহক বৃদ্ধি করেন এবং সম্পাদককে দর্পণের একখানি পার্শী সংস্করণ প্রকাশ করিতে বিশেষ উৎসাহিত করেন।

দর্পণে ভারতীয় ও ইউরোপীয়—এই উভয়বিধ সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় সর্ব্বশ্রেণীর পাঠকের নিকট দর্পণ শীঘ্রই সমাদৃত হয়। তদ্ভিন্ন দর্পণের ভাষাও অতি প্রাঞ্জল হওয়ায় অল্পমাত্র শিক্ষিত ব্যক্তিও ইহা পাঠ করিতে পারিত। দর্পণ সম্বন্ধে তদানীন্তন জনৈক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির উক্তি এই—"Throgh means of its correspondence, it elicited a great deal of valuable information regarding the state of the country in the interior. An aggrieved man felt half his burden removed, when he had sent a statement of the oppressions he lay under to the Darpan, and thus brought them to the knowledge of the public. The native officers of Government felt as a check on their misconduct, and dreaded its exposures. It was also the only channel of information to the natives in the interior and has in its day done some service to Government, by counteracting unfavourable rumours and strengthening the principle of loyalty." অর্থাৎ "সংবাদ প্রেরকের সাহায্যে দর্পণে বঙ্গের অতি পণ্ডগ্রামস্থিত সংবাদসমূহ প্রকাশিত হইত। দর্পণে কোন উৎপীড়িত লোক তাহার উৎপীড়নের বিষয় লিখিয়া সাধারণকে জানাইলে, তাহার যেন হৃদয়ের ভার অনেক পরিমাণে লাঘব

হইত। ফলে গবর্ণমেণ্টের ভারতীয় কর্ম্মচারীরা ভবিষ্যতে আর লোকের উপর দুর্ব্ব্যবহার না করিতে সাবধান হইত। এই পত্র গবর্ণমেণ্টেরও অনেক উপকার সাধন করিয়াছিল। অতি গণ্ডগ্রামস্থ প্রজাগণ এই পত্র পাঠে মিথ্যা জনরবে আস্থাশূন্য হইত এবং তাহাদের রাজভক্তি বর্দ্ধিত হইত।"

ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কোনরূপ বাদানুবাদ দর্পণে প্রকাশিত হইত না।

নিম্নে দর্পণের ভাষার কিঞ্চিৎ নমুনা প্রদর্শনের জন্য কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ।

পূর্ব্বে সমাচার দর্পণে লিখা গিয়াছে যে, গঙ্গাসাগর উপদ্বীপে লোক-বসতি ছিল, এমত অনুমান হয়। এইক্ষণে পদ্মপুরাণের অন্তর্গত ক্রিয়াযোগ-সারে দেখা গেল যে, গঙ্গাসাগরে চন্দ্রবংশীয় সুষেণ নামে রাজা রাজধানী করিয়াছিলেন। তাহাতে দিব্যন্তী নাম্নী নগরীর গুণাকর রাজার কন্যা সুলোচনা দায়গ্রস্তা হইয়া ঐ রাজার আশ্রয়ে পুরুষ-বেশে কাল ক্ষেপণ করিয়াছিল। পরে তালধ্বজ নগরের রাজা বিক্রমের পুত্র মাধব পূর্ব্বসূত্র ক্রমে সেই স্থানে আসিয়া সুলোচনাকে বিবাহ করিয়া এবং ঐ চন্দ্রবংশীয় সুষেণ রাজার এক কন্যাকে পরিণয়পূর্ব্বক রাজ্যের অর্দ্ধ প্রাপ্ত হইয়া ঐ গঙ্গা-সাগরে রাজধানী করিলেন ও অনেক কাল পর্য্যন্ত বসতি করিয়া পরে পুত্রাদি রাখিয়া পরলোক প্রাপ্ত হইলেন।"

রামমোহন রায় ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মপত্রিকা-প্রতিষ্ঠা করেন। জনৈক বিখ্যাত লোক বলিয়াছেন—"Its career was rapid, fiery, metoric and both from want of solid substance, and through excess of inflamation, it soon exploded and disappeared." অর্থাৎ ইহার গতি দ্রুত এবং তেজস্বী ছিল। কিন্তু সারগর্ভ কিছুই না থাকায় শীঘ্রই এই পত্রিকাখানি অদৃশ্য হয়।

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রিকানামে আর একখানি মাসিকপত্রিকা প্রকাশিত হয়। মৃত স্বামীর চিতায় জীবন্ত দেহ বিসর্জ্জনে স্ত্রীলোকদিগের অধিকার প্রদানই চন্দ্রিকাপ্রতিষ্ঠার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। আমরা নিম্নে চন্দ্রিকা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। অনুসন্ধিৎসু পাঠক ইহা পাঠে চন্দ্রিকায় প্রকাশিত বিষয়ের মোটামুটি একটা ধারণা করিতে পারিবেন। ১৮২২ সালে চন্দ্রিকায় এই সংবাদ কয়েকটী প্রকাশিত হয়—"জনৈক স্ত্রীলোকের স্বামী গয়ায় মৃত্যু-

মুখে পতিত হয়। বিচারক স্বামীর সহিত স্ত্রীকে দাহ করিতে নিষেধ করেন। ইহাতে সেই স্ত্রীলোকটী অগ্নিতে অঙ্গুলী প্রবেশ করাইয়া দিয়া বলিল যে, তাহার আগুন বলিয়া আদৌ ভয় নাই। ইহা দেখিয়া বিচারক তাহাকে স্বামীর চিতায় আরোহণ করিতে অনুমতি দেন।"

"একজন পত্র-প্রেরক জানিতে চাহিতেছেন যে, যদি বাসুকী দেবীর শির সঞ্চালনের জন্যই ভূমিকম্প হয়, তবে একই সময়ে সমস্ত দেশ নড়িয়া উঠে না কেন?"

"চব্বিশ পরগণায় জনৈক ব্রাহ্মণের ষোড়শবর্ষীয়া কন্যার অর্দ্ধশরীর কৃষ্ণ ও অপরার্দ্ধ শ্বেতবর্ণ।"

"১৮২৩—গৌড়ীয় সমাজে একটি সভার অধিবেশন হইয়াছিল। রামকমল সেন সেই সভায় বক্তৃতা করেন; প্রাচীন সাহিত্য ও ইতিহাসোদ্ধারই সভার বক্তব্য বিষয় ছিল।"

"১৮২৪—বেদাধ্যয়নে উৎসাহ প্রদানের জন্য কলিকাতায় একটি সভার অধিবেশন হইয়াছিল। রাধাকান্ত দেব ও দ্বারকানাথ ঠাকুর সেই সভার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।"

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে কৌমুদী সংবাদপত্র প্রচারিত হয়। রামমোহন রায়ের দল এই পত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। চন্দ্রিকার লুপ্তি সাধন ও চন্দ্রিকার আলোচ্য বিষয় সমূহের প্রতিবাদ করণই এই কৌমুদী প্রকাশের মুখ্যতম হেতু ছিল।

কৌমুদীতে নিম্নলিখিত বিষয়ে কয়েকটী প্রধান প্রধান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। (১) দেশীয়দিগের জন্য একটি দাতব্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা। (২) দেশীয় লোকদিগের নিকট সংবাদপত্রের উপকারিতা প্রদর্শন। গুরুবিশ্বাস। উত্তরাধিকারী-সূত্রে পৈত্রিক সম্পত্তি প্রাপ্তির বয়স পঞ্চদশের পরিবর্ত্তে দ্বাবিংশতি করা। (৩) যে সমস্ত বাবু এক কপর্দ্দকও দান করেন না, তাহাদিগকে উপহাস। হিন্দুর মৃতদেহ সৎকার ও খ্রীষ্টানদের মৃতদেহ কবর দিবার জন্য আরও কিছু বিস্তৃত জমী প্রদানের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন। বিদেশে এদেশীয় চাউল রপ্তানী নিষেধ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন। যখন হিন্দুদের মিছিল বহির্গত হয়, তখন ইউরোপীয়ানদের মোটরে করিয়া দ্রুত গতিতে গমনের প্রতিবাদ। (৪) কৌলীন্য প্রথায় বিবাহের অপকারিতা (৫) নাটকের অপকারিতা। বিদ্যাবিষয়ে প্রবন্ধ। ইত্যাদি।

ইহার পর "তিমির নাশক" নামে একখানি পত্র প্রচারিত হয়। শ্রীরামপুরের দর্পণের ন্যায় হিন্দুধর্ম্মের পোষকতা করা ইহার উদ্দেশ্য ছিল।

বঙ্গদূত, ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মে রবিবারে প্রকাশিত হয়। কিন্তু পরবর্ত্তী সংখ্যাতেই বঙ্গদূতের প্রকাশ-দিবস রবিবারের পরিবর্ত্তে শনিবার হয়। এই পত্রখানি মিঃ আর, মারটিন্, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর এবং রাম মোহন রায় প্রভৃতির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পত্রখানি বাঙ্গালা ও পারশী—এই উভয়বিধ ভাষায় প্রকাশিত হইত; যেহেতু বড়-বাজারের মহাজনেরা পারশী ভিন্ন বাঙ্গালা পড়িতে পারিত না।

বঙ্গদূতের পর প্রভাকর, চন্দ্রোদয়, মহাজন দর্পণ, ভাস্কর, চন্দ্রিকা, রসরাজ, জ্ঞানদর্পণ, সাধুরঞ্জন, জ্ঞানসঞ্চারিণী, রসসাগর, রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ, রসমুদ্গর, নিত্যধর্ম্ম-রঞ্জিকা, দুর্জ্জন দমন, তত্ত্ব-বোধিনী প্রভৃতি সাপ্তাহিক, অর্দ্ধ সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রাদি প্রকাশিত হয়।

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

দুইটী গৃহ।

লৌহগৃহ শ্বেতবর্ণে হইয়া শোভিত,
তৃণগৃহে বলে, "তুই জঞ্জাল পূরিত;
এক কণা অগ্নি যদি পড়ে তব গায়,
নিমিষে দগধ কর সংসার কৃপায়।"
তৃণগৃহ রাগভরে বলে, "পাপাশয়,
শ্বেতকুষ্ঠ গায়ে তোর বাক্য বিষময়,
নরের মস্তক তুই খাইলি শুষিয়া
আমি করি দীর্ঘজীবী, বিফল নিন্দিয়া,
মোর কোলে দীর্ঘজীবী হ'তেছে সুধীর,
এসেছ ধরায় তুমি খেতে নরশিরঃ।"

শ্রীপ্রাণবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

পরপারে।

(সত্যঘটনামূলক গল্প)

ডায়মণ্ড হারবার হইতে চারি মাইল দূরে সরিষা গ্রামে আমার শ্বশুরালয়। পুত্রগণ কলিকাতায় কর্ম্ম করেন বলিয়া, শ্বশুরমহাশয় দেশ ছাড়িয়া সপরিবারে বিদেশে থাকিতে বাধ্য হইয়াছেন। কালের করাল অত্যাচার ভিন্ন তাঁহার সংসারে আর কোন বিষয়ের অসচ্ছলতা নাই।

যখন জ্যেষ্ঠ বধূর অকাল মৃত্যুতে কাতর হইয়া দুই বৎসর কাল শ্বশুর-মহাশয় ভিন্ন ভিন্ন তীর্থ স্থান ভ্রমণ করিতেছিলেন,—তখন শ্বশ্রূঠাকুরাণী তিনটী পুত্র, একটি পৌত্র এবং এই অভাগিনী বধূকে লইয়া শোক তাপ পরিহার পূর্ব্বক, পূর্ব্বের ন্যায় স্থির ছিলেন। দেবরের বয়স অল্প বলিয়া এতদিন তাঁহার বিবাহ দেন নাই। জ্যেষ্ঠ বধূর মৃত্যুর পর শ্বশ্রূমাতা কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। শীঘ্রই দেবরের বিবাহ হইল। দিদিকে হারাইয়া একলা ছিলাম,—আবার দুইটী হইলাম।

আমাদের বাসার পার্শ্বে একঘর ভাড়াটিয়া ব্রাহ্মণ ছিলেন। সামান্য বেতনে তিনি কোন আফিসে কর্ম্ম করিতেন। সংসারের মধ্যে স্ত্রী এবং দুইটী পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্রটী সংস্কৃত কলেজে পড়ে, আর কনিষ্ঠ পুত্রটী তখন তিন বৎসরের শিশুমাত্র।

আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন জগৎ-জননী উমার পিত্রালয়ে আসিতে আর তিনদিন মাত্র অবশিষ্ট আছে। মায়ের আগমন সংবাদে সকলেই আনন্দিত ও হর্ষান্বিত।

বেলা দ্বিপ্রহর। আহারান্তে আপন কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র পার্শ্বস্থিত ব্রাহ্মণের বাসা হইতে রমণীর মর্ম্মভেদী করুণ চীৎকার আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। সেই হৃদয়বিদারক আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না। বাটীতে তখন কোন পুরুষ ছিলেন না। আমি ঝীকে ডাকিলাম। তাহাকে ব্রাহ্মণের বাটীতে পাঠাইয়া সংবাদ জানিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কিন্তু ঝীর আসিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। আর সেই করুণ চীৎকারের ঘাত-প্রতিঘাতে, আমি বড় অস্থির হইয়া পড়িলাম। স্বর্গীয়া দিদির গর্ভপ্রসূত আমার প্রাণাধিক মণীন্দ্রকে ব্রাহ্মণের বাটীতে পাঠাইলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঝী ফিরিয়া আসিয়া বলিল "ব্রাহ্মণের কনিষ্ঠ পুত্রটীর নিউমোনিয়া হইয়াছে। বাঁচিবার আশা নাই। ছেলেটীর অবস্থা এক্ষণে বড়ই খারাপ। ব্রাহ্মণ পুত্রের ঐরূপ অবস্থা দেখিয়াও, চাকরী যাইবার আশঙ্কায় আফিসে গিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রটীও পূজার বন্ধে স্বদেশে গিয়াছে। ব্রাহ্মণী এক্ষণে রুগ্ন শিশুটীকে লইয়া অকূল সাগরে পড়িয়াছেন। এই বিপদ অবস্থায় একটু সাহস দিবার লোক,—তাঁহার নিকট একজনও নাই। বাড়ীওয়ালার স্ত্রী, একবার ঘরের ধারেও আসে নাই। ছেলের অবস্থা খারাপ দেখিয়া. ব্রাহ্মণী ঐরূপভাবে কাঁদিতেছেন।"

ঝীর কথা শেষ হইতে না হইতে মণীন্দ্র আমার নিকট আসিয়া বলিল— "কাকীমা, আমি ব্রাহ্মণের আফিসের ঠিকানা জানিয়াছি। তাঁকে খবর দিবার জন্য আফিসে যাব কি কাকীমা? গাড়ী করে যাব,—কোচয়ানকে ঠিকানা ব'লে দিলে সে ঠিক পৌঁছে' দেবে। ব্রাহ্মণের আফিসে যাব কি কাকীমা?

আমি মণীন্দ্রের এই সৎ অভিলাষে বাধা দিতে পারিলাম না। একাদশ-বর্ষীয় মণীন্দ্রকে একলা না পাঠাইয়া ঝীকে তার সঙ্গে দিলাম।

উহাদিগকে ব্রাহ্মণের আফিসে পাঠাইয়াও আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি-লাম না। এইরূপ বিপদ অবস্থায় ব্রাহ্মণীকে সান্ত্বনা দিবার কেহ নাই শুনিয়া, প্রাণ বড় ব্যাকুলিত হইল। কিন্তু কি করিব? আমি কুলের বধূ। সদর চৌকাটের বাহির হইবার অধিকার আমার নাই। ব্রাহ্মণীর করুণ ক্রন্দনে স্থির থাকিতে না পারিয়া আমি শ্বশ্রূঠাকুরাণীর কক্ষে উপস্থিত হইলাম। উদ্দেশ্য,—তিনি যদি দয়া করেন। বিনীতভাবে তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিলাম; কিন্তু, আমার প্রাণের কথাটী তাঁহাকে বলিতে সাহসে কুলাইল না। দয়াময়ী শ্বশ্রূঠাকুরাণী আমার অস্থিরতা এবং ব্যাকুলতা সন্দর্শন করিয়া, মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন। অভয় দিয়া তিনি আমায় বলিলেন "বুঝ্‌তে পেরেছি বউমা! ব্রাহ্মণী অসহায়া, একটু সহায়তার জন্য—আমায় একবার তাঁর বাড়ীতে যেতে বলচো? তা'-মা, আমায় একথা বলতে এত সঙ্কুচিতা হচ্চো কেন? চল মা, তুমিও আমার সঙ্গে ব্রাহ্মণীর বাড়ীতে চল।"

২

মাতার সহিত ব্রাহ্মণের বাসায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, তিন বৎসরের শিশুটীকে বক্ষে লইয়া ব্রাহ্মণী প্রাণের আবেগে চীৎকার করিয়া চক্ষের

জলে বুক ভাসাইতেছে। এই হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দেখিয়া আমার প্রাণ যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। আমি ব্রাহ্মণীকে সান্ত্বনা দিতে আসিয়াছিলাম,—কিন্তু কি বলিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিব! আমার মুখে তখন কোন ভাষা যোগাইল না। মাতাঠাকুরাণী ব্রাহ্মণীকে নানারূপ মিষ্ট কথায় সান্ত্বনা দিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। আর আমি নির্ব্বাক,—নিশ্চল অবস্থায় তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

ব্রাহ্মণী এক একবার শিশুটীর প্রতি চাহিয়া মর্ম্মভেদী চীৎকার করিতে লাগিলেন। মা তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "ওমা কেঁদ না, খোকার ভাল চিকিৎসার জন্য আমি চেষ্টার ক্রটী করিব না। যত খরচ লাগে, আমি দিব।" তারপর আমায় একটু ভৎ র্সনা করিয়া তিনি বলিলেন "বউমা, দাঁড়িয়ে দেখচ কি? খোকাকে ওঁর নিকট হইতে লইয়া বিছানায় শোয়াইয়া দাও।" আমি অপরাধিনীর ন্যায় ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণীর নিকট অগ্রসর হইলাম। এতক্ষণ ব্রাহ্মণী একটীও কথা কহেন নাই। মায়ের আশ্বাস বাক্যে, জানিনা তার প্রাণ কতটা সান্ত্বনা পাইয়াছিল। আমি পুত্রটীকে ব্রাহ্মণীর ক্রোড় হইতে লইবার অভিপ্রায়ে হস্ত প্রসারণ করিলে, ব্রাহ্মণী কাতর দৃষ্টিতে আমাদের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "এই বিপদ অবস্থায় তোমরা আমার কে? তোমরা কি আমার মা?" কথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি আকুল প্রাণে কাঁদিয়া উঠিলেন। তাঁর সেই করুণ ক্রন্দনে,—আমিও কাঁদিয়া ফেলিলাম। তারপর মার ইঙ্গিতে, অশ্রুজল সম্বরণ করিয়া ব্রাহ্মণীর নাড়ীকাটা সর্ব্বস্ব ধনকে আমি আপনার ক্রোড়ে তুলিয়া লইলাম। কিন্তু হায়!—শিশুর আত্মা তখন কোন অজানিত স্থানে অন্তর্হিত হইয়াছে।

আমার অতীত স্মৃতি জাগিয়া উঠিল,—আমার প্রাণাধিক শিশু পুত্র অবনীর কথা মনে পড়িল। অনেক কষ্টে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া, অশ্রুসিক্ত লোচনে মায়ের দিকে চাহিলাম। শিশুটীকে তার জননীর ক্রোড় হইতে লইয়া, যখন আমি নিজ বক্ষে ধারণ করিয়াছিলাম,—তখন শ্বশ্রূমাতা বুঝিয়াছিলেন,—শিশুটী মৃত।

অনন্যোপায় বশতঃ মা ব্রাহ্মণীকে বলিলেন—"ওমা, তুমি একবার ওঠ, হাতে মুখে জল দাও। খোকা ততক্ষণ বউমার কাছেই থাক্।" মা ব্রাহ্মণীকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া—তাঁহাকে কক্ষের বাহিরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন। ব্রাহ্মণী মাতার অনুরোধ উপেক্ষা না করিয়া, তাঁহার সঙ্গে যাইবার

জন্য উঠিলেন। যাইবার সময় ব্রাহ্মণী পুত্রের মুখের দিকে পুনঃ পুনঃ চাহিয়া, ছল ছল কাতর নেত্র আমার চক্ষের উপর স্থাপন করিয়া একটী দীর্ঘ শ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। আমি বহু কষ্টে আপনাকে সংযত রাখিয়া বলিলাম,—খোকা আমার কাছেই থাক ;—আপনি চোখে মুখে একটু জল দিয়া আসুন। কোন ভয় নাই,—আপনি মার সঙ্গে যান। আর কোন কথা তখন আমার মুখ হইতে বাহির হইল না। প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল।

ব্রাহ্মণী আমার আশ্বাসবাক্যে আশান্বিতা হইয়া মার সহিত কক্ষের বাহির হইলেন। পরমুহূর্ত্তেই মণীন্দ্র এবং ঝীয়ের সহিত ব্রাহ্মণ তাঁহার বাসায় উপস্থিত হইলেন।

মণীন্দ্র আমার নিকট আসিয়া বলিল "কাকীমা, খোকার বাপ এসেছেন। ডাক্তার আন্‌বার জন্য খোকার বাপকে অনেক অনুরোধ করেছিলাম কাকীমা। কিন্তু তিনি কিছুতেই স্বীকৃত হন নাই। আমি তাঁর কথা না শুনিয়া একজন ভাল ডাক্তার আনিয়াছি। ভিজিটের টাকা গরীব ব্রাহ্মণ দিতে অক্ষম বলে ডাক্তার আনিতে অস্বীকৃত হয়েছিলেন। ভিজিটের টাকা তোমায় দিতে হবে কাকীমা ?"

মণির একথার উত্তর আমি কি দিব ? ঝীকে ইঙ্গিতে নিকটে ডাকিয়া সকল কথা বলিলাম। অবশেষে আমার চাবির থোলোটী মণির নিকট ফেলিয়া দিলাম। মণি টাকা আনিতে গেল।

৩

পুত্রের মৃত্যু সংবাদ ব্রাহ্মণের কর্ণে প্রবেশ করিতে অধিক বিলম্ব হইল না। ব্রাহ্মণ অস্থির হইয়া কক্ষ ত্যাগ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মণি ফিরিয়া আসিয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল—"কাকীমা, এখন কি করবে ?"

মণির এবম্বিধ সহানুভূতি দেখিয়া তাহার প্রাণে সাহস দিবার জন্য বলিলাম, "কি করবো বাবা ! সৎকারের জন্য দু'চার জন লোকের দরকার। এই বাড়ীওয়ালাকে একবার বলতো বাবা, যদি দু'চার জন লোক ক'রে দেন,—তাহাহইলে এই বিপদগ্রস্ত ব্রাহ্মণের বড় উপকার হয়। আর শোন বাবা, তোমায় একটা কথা বলি ;—তোমার এই বামন কাকাকে একটু নজরে রেখো। দেখো, যেন উনি কোথায় না যান। আমাদের বাড়ীতে এখন তুমি ভিন্ন এমন একজন পুরুষ নাই, যে ব্রাহ্মণের এই বিষম বিপদে একটু সাহায্য করেন। তোমাকেই বাবা, এখন সব দেখতে হবে।"

মণি অশ্রুসিক্ত লোচনে আমার প্রতি চাহিয়া বলিল "কাকীমা, কেঁদনা— আমি বাড়ীওয়ালাকে বল্‌চি। বামন কাকার এই বিপদের কথা যে শুনবে কাকীমা, সে সকল কাজ ফেলে রেখে—সাহায্য কর্‌বার জন্য ছুটে আসবে। তুমি ভেবো না কাকীমা।"

মার সহিত ব্রাহ্মণী সেই সময় কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মণি আমার নিকট আর বিলম্ব না করিয়া বাড়ীওয়ালার নিকট গমন করিল। ব্রাহ্মণী কক্ষে উপস্থিত হইয়া, আমার অতি সন্নিকটে উপবেশন করিলেন। চক্ষে জল-বিন্দু দেখা দিল। কাঁদিতে কাঁদিতে ব্রাহ্মণী আমায় বলিলেন "দিদি, স্বামী ভিন্ন এখানে আমায় দেখবার লোক আর কেউ নাই। বাড়ীওয়ালী দিদি একবারও এখানে আসেন না। উনি আফিসে চলে গেলে, আমি এই রুগ্ন শিশুকে বুকে করে' একলা পড়ে থাকি। কত কুচিন্তা মনে আসে, তা' আর তোমায় কি বলবো দিদি! এই বিপদ অবস্থায় তুমি আমার মা, তুমি আমার দিদি। দাও দিদি,—খোকাকে এইবার আমার কোলে দাও। দিদি,— দিদি! মুখে কি ব'লে এ উপকারের কৃতজ্ঞতা জানাব?"

ব্রাহ্মণী চক্ষের জলে বুক ভাসাইল।

ব্রাহ্মণীর মর্ম্মান্তিক হৃদয় বেদনা আমার ক্ষত বিক্ষত প্রাণে, পুনঃ পুনঃ যে কি আঘাত করিতেছিল,—তাহা এ জীবনে কখন ভুলিবার নয়। ব্রাহ্মণীর কথার উত্তর আমার ভাষায় যোগাইল না।

মা এই সময় ব্রাহ্মণীকে বলিলেন "ওমা! খোকা বউমার নিকট থাক্। তুমি ততক্ষণ একটু ঘুমাও। ক'দিন স্নান, আহার, নিদ্রা নাই। তোমারও তো শরীরের ভাল মন্দ আছে মা!"

ব্রাহ্মণীর হাত ধরিয়া মা নানারূপ বুঝাইতে বুঝাইতে তাঁহাকে পার্শ্বের কক্ষে লইয়া গেলেন। ব্রাহ্মণী মার কথায় একটীও প্রতিবাদ না করিয়া, কাষ্ঠ পুত্তলিকাবৎ তাঁহার অনুসরণ করিলেন। আমি মৃত শিশুটীকে ক্রোড়ে লইয়া নির্জ্জন কক্ষে চিন্তাস্রোতে ভাসিতেছিলাম, এমন সময় মণি আমার নিকট আসিয়া বিষণ্ন বদনে বিজড়িত কণ্ঠে বলিল "কাকীমা, বাড়ীওয়ালা কি নিষ্ঠুর! তিনি বলিলেন—'আমার বাপু এত কি দায় পড়েছে! যার দায়, সে করুক। আমার দ্বারা ওসব কিছু হবে না। এখন আমি কোথায় লোক খুঁজ্‌তে যাব! যাও,—আমার দ্বারা ওসব কিছু হবে না।' এখন কি উপায় কর্‌বে কাকীমা? আমি বাবার আফিসে যাই। তিনি যদি না

আসতে পারেন,—কাকাবাবুদের আফিসে গিয়া, তাঁদের ডাকিয়া আনি। কি আশ্চর্য্য কাকীমা! এ বিপদে উপকার করুতে চায় না, এমন লোকও আছে?" চোখের জল মুছিয়া মণি আমার নিকট হইতে আফিসে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। কিন্তু আমার অনুমতি দিবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন 'মণীন্দ্র! বাবা, তোমাদের মত লোক সংসারে সকলে নয়। যদি তোমাদের মত দেব-দেবী লইয়া পৃথিবী শোভিত হইত, তাহা হইলে,—মানব কখন দুঃখ ভোগ করিত না। বাবা, বাবা—এই বিপদ অবস্থায় তোমরা আমার পিতামাতা।"

ব্রাহ্মণ আকুল স্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। মণি আধ আধ ভাষায় তাঁহাকে কত সান্ত্বনা দিল। মণির অমিয়মাখা স্বরে ব্রাহ্মণ একটু স্থির হইয়া বিনীত ভাবে আমায় লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "মা, আমার ঐ শত্রুকে আপনার কোল হইতে নাবিয়ে দিন! আর কেন মা? শত্রুব সহবাস ক'রে—শত্রুতা বাড়াবার কোন প্রয়োজন নাই।"

ব্রাহ্মণের কথা শেষ হইতে না হইতেই পাগলিনীর ন্যায় ব্রাহ্মণী ছুটিয়া আসিয়া, মৃত শিশুকে আমার ক্রোড় হইতে ছিনাইয়া লইয়া, আপন বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। তারপর,—তারপর সেই মৃত শিশুর পাংশুবর্ণ শুষ্ক ওষ্ঠে ও গণ্ডে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বাছা,—বাছা আমার! বাবা আমার, কোথায় যাবে? আমায় ফেলে কোথায় যাবে বাবা? আমার বুক জুড়ান ধন;—আমার সর্ব্বস্ব ধন। ঘুমাও বাবা—আমার বুকে ঘুমাও।"

ব্রাহ্মণ আত্মসম্বরণ করিয়া স্ত্রীকে বলিলেন "আর কেন! খোকাকে আমার কোলে দাও। আমি একবার বুকে করি।"

ব্রাহ্মণী বিকৃত স্বরে বলিলেন "না, না,—তোমার কোলে খোকাকে দেব না। খোকাকে তুমি শত্রু মনে কর! কিন্তু দেখ,—খোকা আমার শত্রু নয়, শত্রু হতে পারবে না। আর,—আর শোন, ছেলেকে মা কখন শত্রু মনে করুতে পারবে না।

ব্রাহ্মণ অস্থির হইয়া পুনরায় স্ত্রীকে বলিলেন 'দেখ,—খোকাকে আমার নিকট দাও; চেয়ে দেখ,—ভাল করে একবার খোকার মুখখানি দেখ না। বাবা যে ঘুম ঘুমোচ্ছে—ও ঘুম এ জীবনে ভাঙ্গিবার নয়। আর কেন;—শত্রুর মায়ায় আর মিছে বদ্ধ হ'য়ো না। দাও, দাও খোকাকে আমার কোলে দাও।'

ব্রাহ্মণী স্বামীর কথা শুনিয়া, দৃঢ়ভাবে শিশুকে বক্ষে ধারণ করিয়া একবার করুণ স্বরে কাঁদিলেন। তারপর, জানিনা কি ভাবিয়া, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ব্রাহ্মণকে বলিলেন "নেবে! আমার খোকাকে কোলে নেবে,—নাও, নাও। বুক জুড়ান ধনকে একবার কোলে নেবে, নাও।"

স্বামীর ক্রোড়ে মৃত শিশুকে অর্পণ করিয়া, ব্রাহ্মণী আবেগ মিশ্রিত বাক্যে কহিলেন "খোকা আমার শত্রু নয়, খোকাকে শত্রু মনে ক'রো না। খোকা আমার বুক জুড়ান ধন,—আমার সর্ব্বস্ব।"

শিশুকে আপন ক্রোড়ে পাইয়া স্ত্রীর কথা শেষ হইতে না হইতে, ব্রাহ্মণ কক্ষ ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলেন। ব্রাহ্মণী তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিতেছিলেন,—আমি ধরিয়া ফেলিলাম।

পুত্রকে বক্ষে লইয়া ব্রাহ্মণ শ্মশান-অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সঙ্গে চলিল,—আমার প্রাণাধিক মণীন্দ্র।

তারপর সেই পুত্রহারা জননীর সেই শোচনীয় মর্ম্মভেদী অবস্থা সন্দর্শনে পাষাণ হৃদয় বাড়ীওয়ালারও প্রাণ বিগলিত হইয়াছিল। কারণ, তাকে বলিতে শুনা গিয়াছিল—"অত কান্না কিসের? ও রকম চীৎকার প্রাণে সহ্য হয় না। একটু চুপ কর।"

ব্রাহ্মণের পিতামাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণ স্বদেশে ছিলেন। মণীন্দ্রের বিশেষ অনুরোধে—শ্মশান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে ব্রাহ্মণ পিতাকে একখানি টেলিগ্রাম করিলেন। ঘটনার পরদিন ব্রাহ্মণের পিতা সস্ত্রীক পুত্রের বাসায় উপস্থিত হইলেন। শ্বশুর শাশুড়ীকে দেখিয়া ব্রাহ্মণীর পুত্রশোক দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। আহা! ব্রাহ্মণী একজন লোক অভাবে কতখানি যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন। দেশে তাঁর লোকের অভাব কি? তাই বলি, হায় রে বিদেশবাসী, আমরা বাধ্য হইয়া তোদের দ্বারে পড়ে থাকি,—তবু একটু সহানুভূতি করিতে পারিস্ না। এমনি নিষ্ঠুর তোরা?

পুত্রহারা অধীরা ব্রাহ্মণী—শোকতাপে জর্জ্জরিতা হইয়া, পঞ্চমীর দিন শয্যা গ্রহণ করিলেন। এ জীবনে আর তাঁহাকে সে শয্যা ত্যাগ করিতে হইল না। অষ্টমীর দিন রাত্রে ঘোর বিকার অবস্থায় ব্রাহ্মণী বলিলেন—— "বাবা আমার বুকে এস। তুমি আমার সর্ব্বস্বধন, তোমায় ফেলে আমি কি থাকতে পারি বাবা! এস বাবা, এস ধন। ডাক, ডাক আমায় মা মা বলে ডাক। খোকা,—তুমি আমার শত্রু নও বাবা। তুমি আমার বড়

আদরের—বড় স্নেহের অমূল্য নিধি। এস বাবা, আমি তোমায় কোলে নেব, আমার কোল যে শূন্য রয়েছে।"

বিকার অবস্থায় ব্রাহ্মণী মর্ম্মভেদী নানাকথা বলিতে বলিতে,—সন্ধি-পূজার সময়—পুত্রের পথ অনুসরণ করিলেন। মৃত্যুকালীন তিনি একবার মাত্র বলিয়াছিলেন—"মণি।" এই তাঁর শেষ কথা। তারপর—তারপর সব ফুরাইল। একটা সংসার মাটি হইল।

৪

উক্ত ঘটনার পর এক বৎসর অতীত হইয়া আবার ৺পূজা আসিল। সেদিন চতুর্থী। গতবৎসরের সেই করুণ হৃদয়-বিদারক ঘটনাবলী আমার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়া, প্রাণ চমকাইয়া দিল। নানা দুশ্চিন্তায়—যেন কি এক অমঙ্গল আশঙ্কায় শঙ্কিত থাকিয়া, সে দিন অতিবাহিত করিলাম। পঞ্চমীর দিন ছোট জায়ের মুখে শুনিলাম, মণির জ্বর হইয়াছে। যে অমঙ্গল আশঙ্কায় সদাই উদ্বিগ্ন ছিলাম,—শয্যাত্যাগ করিয়াই সেই অমঙ্গল সংবাদ ছোট জায়ের মুখে শুনিলাম। প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। আমি ছুটিয়া মণিকে দেখিতে গেলাম। গাত্রের উত্তাপ পরীক্ষা করিয়া বুঝিলাম, জ্বর সেরূপ প্রবল নহে। কিন্তু প্রাণ আমার সে কথা বুঝিল না। আমি সস্নেহে মণিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"মণি, বাবা আমার কেমন আছ? শরীরের কোন যন্ত্রণা হ'চ্চে কি বাবা?" মণি কোমল স্বরে উত্তর করিল, "না কাকীমা! সামান্য জ্বর হয়েছে, দু'চার দিনেই সেরে যাবে। তুমি ভেবো না কাকীমা!" মণির এই আশ্বাস বাক্যে আমি সাহস পাইলাম না। গত বৎসরের বিষাদমাখা কাহিনী আমার স্মৃতিপটে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। বহু আশঙ্কায় আমার প্রাণ উদ্বেলিত হইতে লাগিল। মণির শয্যাপার্শ্বে বসিয়া স্থিরদৃষ্টিতে আমি তার মুখাবলোকন করিতে লাগিলাম। স্বর্গীয়া দিদির কথা মনে পড়িল। তাঁর কত সাধের—কত আদরের মণি, যে মণিকে তিনি কখন চক্ষের অন্তরাল করিতেন না, যার অঙ্গে কুশাঘাত হইলে দিদি আমার সহ্য করিতে পারিতেন না; সেই স্নেহময়ী দিদি তাঁর প্রাণাধিক মণিকে আমার নিকট গচ্ছাইয়া, তাঁর সকল আবদারের—সকল স্নেহের 'ভার' আমার উপর অর্পণ করিয়া, তিনি এ সংসার ত্যাগ করতঃ অনন্তধামে লীন হইয়াছেন। মণি আমার প্রাণাধিক, আমার সর্ব্বস্ব। মণির জ্বর দেখিয়া আমি কোন প্রাণে স্থির থাকিব?

বাটীর পুরুষেরা মণির অসুখের সংবাদ শুনিয়া ডাক্তার আনিলেন। ডাক্তার ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেলেন। দুই তিন দিন গত হইল—মণির জ্বর নরম পড়িবার পরিবর্ত্তে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আর মণির অবস্থা দেখিয়া আমি পাগলিনীর ন্যায় মতিভ্রষ্টা হইলাম। মণির মুখ চেয়ে বাড়ীর সকলে দিদির শোক অনেকটা ভুলিয়াছেন। তার ভাল মন্দ কিছু হইলে, আমাদের সংসারের অবস্থা কি হইবে?

আমাকে নীরবে অশ্রুজল ফেলিতে দেখিয়া মণি ক্ষীণস্বরে বলিল, "কাকীমা, বামন কাকার সংবাদ এ পর্য্যন্ত আর পাওয়া গেল না। আহা, তিনি কত কষ্ট পেয়েছেন! মানুষ এত নিষ্ঠুর কি ক'রে হয় কাকীমা? আপনাদের বিপদ-আপদের বিষয় ভেবেও তারা লোকের সাহায্য করিতে একবারও আসে না।"

আমি মণিকে কথা কহিতে নিষেধ করিলাম। তারপর ডাক্তার আসিলেন। মণিকে ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া,—আমার দেবরকে বলিলেন, "কোন ভয়ের কারণ নাই।"

মণি বলিয়াছিল, "কাকীমা, সামান্য জ্বর হইয়াছে, দুচা'র দিনেই সেরে যাবে।" মণির এই আশ্বাস বাক্যে আমার প্রাণ তখনও প্রবোধ মানে নাই। তখন জানি নাই,—মন সাক্ষাৎ নারায়ণ। মন,—সকলই বুঝিতে পারে।

অষ্টমীর দিন সন্ধিপূজার পরক্ষণেই দিদির হৃদয়-কন্দরের সঞ্চিত রতন, আমার প্রাণাধিক মণি, তার অভাগিনী কাকীমাকে ফাঁকি দিয়া,—তার মার নিকট পালিয়ে গেল। কাকীমা ব'লে—আর ডাকলে না।

সেই মুহূর্ত্তে একজন লোক আমাদের সদর দরজায় আসিয়া ডাকিল, "মণীন্দ্র; মণীন্দ্র! আয় বাবা, একবার তোরে দেখি। আমি তোর সেই বামন কাকা। এক বৎসর তোর চাঁদমুখখানি দেখি নি। ও বাবা, আয়! ঐ যে সন্ধিপূজার শঙ্খঘণ্টার শব্দ শুনা যাচ্চে। ঠিক এই সময় তোর বামন কাকী আমায় পাগল করে চলে গেছে। আয় বাবা! মণি!

তখন আমার ভাসুর মহাশয় চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে, ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইলেন। ভাসুর মহাশয়কে দেখিয়া ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন,— "হ্যাঁ বাবা, মণি কোথায়? একবার ডেকে দেবে বাবা?"

ভাসুর মহাশয় অশ্রুবিগলিত নেত্রে—ঊর্দ্ধদিকে হস্তোত্তোলন করিয়া বলি-

লেন, "ব্রাহ্মণ, মণিকে দেখবার আশা বৃথা। তার দেখা এ জীবনে আর কেহ পাবে না। সে আর এখন এপারে নয়, সে ঐ পরপারে।

শ্রীমতী রাধারাণী দাসী।

"কবে।"

কবে এ পরাণে দেব,
ঢালিবে শান্তির ধারা!
তোমারি পবিত্র প্রেমে,
হইব আপন-হারা।
কবে মোহ কেটে যাবে
আলস ঘুমের ঘোর,
প্রাণ খুলে জয় তব
গাহিবে পরাণ মোর।
কবে দিবে আকুলতা
আমার হৃদয় ভরা।
ব্যথা-দীর্ণ মানবের
মুছাইতে অশ্রুধারা।
কবে যাবে প্রাণ হ'তে
গ্লানিময় অবসাদ।
সাধিতে তোমারি ব্রত
ভুলি সুখ-আশা সাধ।
মহা-কর্ম্ম পারাবারে
হে মোর হৃদয় রায়!
জীবন-তরণী যেন
চলে অনুকূল বায়।

শ্রীবেণীমাধব চৌধুরী।

জ্যোতিস্তত্ত্ব।

চন্দ্র।

(২)

তিথি। চন্দ্রের "দৃশ্য পৃষ্ঠ" স্থিত আলোকিত ভাগকে তিথি (Phase) বলে। শুক্ল প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এবং কৃষ্ণ প্রতিপদ হইতে অমা পর্য্যন্ত ত্রিশ দিনে চন্দ্র ত্রিশ তিথি প্রদর্শন করে। চন্দ্রের কক্ষা (ভ্রমণ পথ) যদি গোলাকার হইত, তবে চন্দ্র সতত পৃথিবীর সম-দূরে থাকিত এবং তাহার গতি সতত সমান থাকিত। সুতরাং ত্রিশ তিথি সমান হইত। কিন্তু চন্দ্রের কক্ষা গোলাকার নহে। চন্দ্র কখন পৃথিবীর দুরে থাকে, কখন নিকটে আইসে ; সুতরাং তাহার গতির কম বেশী হয়। এবং তিথির স্থিতি কম বেশী হয়। অর্থাৎ প্রতিপদ আদি তিথিতে চন্দ্র এক এক নক্ষত্র বিচরণ করে। এই বিচরণ কাল নক্ষত্র বিশেষ কম বা বেশী হয়, সুতরাং এক তিথি পূর্ণ হইতে যত সময় লাগে, অপর তিথি পূর্ণ হইতে তদপেক্ষা কম বা বেশী সময় লাগে।

চৈত্র মাসের শুক্ল প্রতিপদ হইতে ভারতে চান্দ্র বর্ষ অর্থাৎ সম্বৎ গণনা আরম্ভ হয়। মহারাষ্ট্র আদি প্রদেশে সম্বৎ প্রচলিত আছে।

মুসলমানগণের হিজরী সন চান্দ্র বৎসর। এবং মহরম মাসের ১লা শুক্ল তৃতীয়া হইতে নব বর্ষ গণনা আরম্ভ হয়। ১২ মাসের ৬ মাস ত্রিশ দিনে এবং ৬ মাস ঊনত্রিশ দিনে পূর্ণ হয়। ৩৫৪ দিনে বৎসর শেষ হয়—

নব বর্ষের আদি দিনের শুক্ল তৃতীয়ার চাঁদ মুসলমান রাজন্যগণের রাজ-পতাকা সুশোভিত করে।

সুসময়ে ইব্রো হইতে মেঘনা পর্য্যন্ত শশিকলা সুশোভিত কেতু উড্ডীন ছিল।

দৃশ্য পৃষ্ঠের পূর্ণিমার অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী। অদৃশ্য পৃষ্ঠের অমার অধি-ষ্ঠাত্রী দেবী অলক্ষ্মী। অদৃশ্য পৃষ্ঠের পূর্ণিমার অধিষ্ঠাত্রী দেবী উমা এবং দৃশ্য পৃষ্ঠের অমার অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্যামা। উমা ও শ্যামা চাঁদের এ পিট ও পিট। সূর্য্য মণ্ডলস্থিত রুদ্রদেবের ক্রোড়ে উমা ও শ্যামা যুগপৎ বিরাজমান থাকেন।

মাস। এক পূর্ণিমার রাত্রে চন্দ্র যে নক্ষত্রের সন্নিহিত থাকে, সেই নক্ষত্রটীকে চিনিয়া রাখ। ২৭ দিন ৮ ঘণ্টা পরে দেখিবে যে, চন্দ্র ২৭ দিনে ২৭ নক্ষত্র সঞ্চরণ করিয়া, রাশি চক্র পরিভ্রমণ অন্তে ঠিক্ সেই নক্ষত্রের

সন্নিহিত হইয়াছে। কিন্তু চন্দ্র পূর্ণিমা পায় নাই,—অপূর্ণ রহিয়াছে। রাশিচক্র পরিভ্রমণে চন্দ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ শেষ করিল; অথচ পূর্ণিমা পাইল না। ইহার কারণ এই যে, এই ২৭ দিন পৃথিবী ত বসিয়া নাই। পৃথিবী আপন কক্ষাতে ২৭ দিনে ২৭ অংশ অগ্রসর হইয়াছে। কাজেই চন্দ্র ঐ ২৭ অংশ অগ্রসর না হইলে বিপরীত পদ পাইবে না ও পূর্ণ হইবে না। ঐ ২৭ অংশ অগ্রসর হইতে চন্দ্রের দুই দিনের অধিক সময় লাগে। ২৯ দিন ১২ ঘণ্টা পরে চন্দ্র বিপরীত পদে উপনীত হইবে এবং পূর্ণিমা প্রাপ্ত হইবে। চান্দ্র মাস শেষ হইবে।

মল মাস। দ্বাদশ চান্দ্র মাসে অর্থাৎ ৩৫৪ দিনে এক চান্দ্র বর্ষ পূর্ণ হয়। সৌরবর্ষ ৩৬৫ দিনে হয়। উভয় বর্ষের পার্থক্য ১১ দিন। তিন বৎসরে উভয় বৎসরের পার্থক্য ৩৩ দিন হয়। চান্দ্র বর্ষ ও সৌর বর্ষের সামঞ্জস্য বিধান কল্পে প্রতি তৃতীয় সৌর বর্ষে ১৩ চান্দ্র মাস ভর্ত্তি করিয়া লইয়া এক চান্দ্র মাস খারিজ করা হয়। এই খারিজা মাসের তিথিগুলি ধর্ম্ম কর্ম্ম-বিবর্জ্জিত এবং নগণ্য। এই খারিজা মাসকে "অবম" "অধিক" বা "মল মাস" বলে।

এই গাণিতিক ফন্দিতে ত্রিবর্ষের উদ্‌বর্ত্ত ৩৩ দিনের ২৯॥ দিন এড়ান হইল। ৩॥ দিন মাত্র হাতে রহিল। ত্রিবার্ষিক সঞ্চয় ৩॥ দিন ক্রমে ৩০ দিনে পরিণত হইলে যথা সময়ে একটী অতিরিক্ত মল মাস কল্পনা করিলে সঞ্চয় কমিয়া পড়িবে।

ঋষিগণের পরম শ্লাঘা ও গৌরবের কথা যে, যখন (১) সুসভ্য য়ুরোপীয়গণ সৌরবর্ষের দিন সংখ্যা নির্ণয়ে শশব্যস্ত হইয়াছিলেন, তাহার বহু পূর্ব্বে তাঁহারা চান্দ্র ও সৌরবর্ষের দিন সংখ্যা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে স্থির করিয়া, তাহাদের সামঞ্জস্য সাধন করিতে পারিতেন এবং মল মাস-তত্ত্বে পারদর্শী ছিলেন।

ঋকৃবেদে (১।২৫।৮) আমরা এই ত্রয়োদশতম মাসের বা মল মাসের উল্লেখ পাই। যথা—

বেদ মাসঃ ধৃতব্রতঃ দ্বাদশঃ প্রজাবতঃ।
বেদ যঃ উপজায়তে॥

মাস নাম। ঋক্ বেদে (২।৩৬) মধু মাধব শুক্র শুচি নভঃ নভস্য এই ষট্ মাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঈষা উর্জ্জ সহস সহস্য তপঃ তপস্য

(১) খৃঃ পূঃ ৫০০ অনক্ষগোরস্ স্থির করেন যে ৩৬৫।০ দিনে বৎসর পূর্ণ হয়। গ্রীস দেশীয় অন্যান্য জ্যোতির্ব্বিদ অপেক্ষা এই জ্যোতির্ব্বিদের গণনা প্রায় ঠিক।

আদি ছয়মাস-নাম উল্লিখিত না থাকিলেও ঋতুমূলক মাসনাম বলিয়া তাহারা মধু মাধব আদি ঋতুমূলক মাস নামের পূরক বলিয়া পরিগৃহীত হইবে। মধু মাধব আদি সৌর মাসনাম।

কার্ত্তিক আদি মাসনাম চান্দ্র মাস-নাম। সাতাইশ নক্ষত্র মধ্যে কৃত্তিকা মৃগশিরা পুষ্যা মঘা উঃ-ফল্গুনী চিত্রা বিশাখা জ্যেষ্ঠা পূঃ-আষাঢ়া শ্রবণা পূঃ-ভাদ্রপদ অশ্বিনী—এই দ্বাদশ নক্ষত্র হইতে দ্বাদশ চান্দ্র মাসের নামকরণ হইয়াছে। কৃত্তিকা নক্ষত্রসংযুক্ত পৌর্ণমাসী হইতে কার্ত্তিক মাসের নামকরণ হইয়াছে। মৃগশীর্ষ নক্ষত্রসংযুক্ত পৌর্ণমাসী হইতে মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ) মাসের নামকরণ হইয়াছে। ইত্যাদি ইত্যাদি। চান্দ্র-সৌর-বর্ষ প্রচলিত হইলে অমরসিংহ রচিলেনঃ—

"মধুঃ দৈত্যে মধুঃ চৈত্রে"

কিন্তু সুদূর ভবিষ্যতে অয়ন-অংশ-গতির ফলে চৈত্র মাসে বর্ষার সমাগম হইবে। তখন মধু মাধবে পর-পুরুষগণ পুষ্পমধু-গন্ধ পাইবেন না, শ্রাবণী ধারায় অভিষিক্ত হইবেন।

"নূতন পঞ্জিকার" ব্যবস্থা মতে বৈশাখ মাস বৎসরের আদি হইয়াছে, কিন্তু গো-দাগা তা মানে না, সে হাঁকেঃ—

"কার্ত্তিক মাস বছরের গোড়া, গোরু দাগবি রে গেরস্থরা"

কার্ত্তিকী পূর্ণিমা তিথিকে য়ুরোপে Harvest moon বলে। শরৎশস্য সংগ্রহ হইতে এই নাম হইয়াছে। ভারতে শরৎশস্য সংগ্রহ হইলে বৎসরের শেষ হইত এবং কার্ত্তিকী পূর্ণিমা হইতে নব বর্ষ গণনা হইত। প্রাচীন কালে নববর্ষের প্রথম দিনে কার্ত্তিকী পূর্ণিমা তিথিতে "কৌমুদী উৎসব" মহা-সমারোহে নিষ্পন্ন হইত।

"বিদূষক। বৃষল! কৌমুদী-মহোৎসবস্য কিং প্রয়োজনম্।"

মৃৎশকটিকা প্রণয়ন কালে উৎসবের মূল তথ্য স্মৃতিপথের অতীত হইয়াছিল। কৌমুদী উৎসবের পতন হইলে পূজ্যপাদ গৌরাঙ্গের শিষ্যগণের প্রসাদে "রাস-যাত্রা" নামে উৎসবটী পুনর্জীবিত হইয়া সাধারণের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে।

মহারাষ্ট্রে কৃষকগণ অদ্যাপি লাঙ্গল স্কন্ধে লইয়া গৃহস্থের গৃহে গৃহে "মাঙ্গন" চাহে। বিলাতের কৃষকগণ Plough money চাহে। বঙ্গে পৌষ মাসে

রাখালগণ আমন ধান্য সংগ্রহের পর সুমধুর "হল বোল" গান করে এবং সঙ্গে সঙ্গে মাঙ্গন চাহে।

গ্রহণ।

পূর্ণিমার চন্দ্র ভূচ্ছায়া প্রবেশ করিলে চন্দ্রগ্রহণ ঘটে। যথাঃ—

ভূচ্ছায়াং প্রাঙ্মুখঃ চন্দ্রঃ
বিশতি অস্য ভবেৎ অসৌ॥ (সূঃ সিঃ)

বৎসরে চন্দ্রগ্রহণ তিনটীর অধিক হইতে পারে না। মোটে না হইলেও পারে।

অসভ্য অবস্থায় গ্রহণ দর্শনে মানব চিরদিনই ভয়ে বিহ্বল হইত ও হইতেছে। এবং কুসংস্কারের মোহবশে বিকট শব্দ দ্বারা মানব গ্রহণকালে অসুর রাহুকে তাড়াইতে চাহিত ও চাহিতেছে।

বিজ্ঞানের আলোক পাইয়া সুসভ্য মানব এখন গ্রহণকালে প্রকৃতির লীলাখেলা সন্দর্শনে অপার আনন্দে নিমগ্ন হইতেছে।

কিন্তু "গুণ হ'য়ে দোষ হ'ল বিদ্যার বিদ্যায়।"

ভারতের জ্যোতির্বিদ্‌গণ কঠোর শ্রমে গ্রহণের মূলতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া যে সুবিমল যশোরাশি লাভ করিয়াছেন, লোকমতের শাসনে পাত স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রাহু থাকা স্বীকার করিয়া, তাঁহারা সেই দিগন্তব্যাপী কালান্তস্থায়ী যশোরাশি নিষ্কলঙ্ক করিতে সাহস পান নাই। স্বাধীন গণিত কুসংস্কারের অধীন হইল। সিদ্ধান্তে কালি পড়িল।

ইউফ্রেটিস, নীল, টাইবার আদি নদীর তীর নিষ্কণ্টক হইয়াছে। জাহ্নবীর রাহুর দশা বাড়িতেছে।

ঋক্‌বেদে চন্দ্রগ্রহণের উল্লেখ নাই। অথর্ব্ববেদে (১৯।৯।১০) একস্থানে মাত্র চন্দ্রগ্রহণের উল্লেখ আছে।

কার্ত্তিকী পূর্ণিমার তিথিতে চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে "বেহুলার ভাসান" রচিত হইয়াছে। বহুলা (কৃত্তিকানক্ষত্র) এই ইতিহের বেহুলা সুন্দরী।

পূর্ণিমার চন্দ্র এই ইতিহের লখিন্দর (লক্ষ্মীন্দ্র)। রাহু এই ইতিহের সূত্রসঞ্চারী সর্প। (১) আকাশগঙ্গা এই ইতিহের জাহ্নবী নদী। এবং সুররঞ্জক পূষন্ দেব এই ইতিহের ধোপা। (২)

(১) সূর্য্য, পৃথিবী ও চন্দ্র সমসূত্রে পড়িলে গ্রহণ হয়।

(২) পূষন্। সূক্ত ঋক্ ১০।২৬।৬ "আ বাসাংসি মর্ম্মৃজৎ"।

পুরশ্চরণ।

গ্রহণ উপলক্ষে হিন্দু পুরশ্চরণ ব্রত পালন করেন। গ্রহণের প্রারম্ভ হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত তিনি যত সহস্র বীজ-মন্ত্র জপ করেন ; গ্রহণের অবসানে তিনি তাহার দশাংশ হোম করেন এবং হোম সংখ্যার দশাংশ তর্পণ করেন। এবং তিনি তর্পণ সংখ্যার দশাংশ ব্রাহ্মণ ভোজন দেন। এই চতুষ্পদ ব্রতের "প্রথম পদ" অর্থাৎ বীজমন্ত্র জপ গ্রহণ-বেলা সমাধা করিতে হয় বলিয়া এই ব্রতের নাম "পুরঃ চরণ।" টোলের ব্যাখ্যা স্বতন্ত্র।

চান্দ্রায়ণ।

পারসীগণ অগ্নিমণ্ডপে দস্তরের সমীপে পাপানুষ্ঠান নিভৃতে স্বীকার পূর্ব্বক, পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত গ্রহণে দক্ষিণান্ত করিয়া পাপ মোচন করেন। বেবিলন নগরে কারাবাস কালে য়িহুদিগণ এই "স্বীকার" (Confession) সহ ভাবী ত্রাণকর্ত্তার আবির্ভাবের আভাস পাইলেন।

সেই নজীরে আদি খৃষ্টীয়ানগণ গির্জাঘরে পাদ্রীর সমক্ষে নিভৃতে পাপানুষ্ঠান স্বীকার পূর্ব্বক দক্ষিণান্ত করিয়া পাপমোচন করেন।

ধর্ম্মক্ষেত্রে হৃদয়ের উচ্চতায় হিন্দুর পদবী দুরারোহ ছিল। পাপানুষ্ঠানে জীবন কলুষিত হইলে, অন্তে চন্দ্রলোক প্রাপ্তির বিঘ্ন হইবে,—এই আশঙ্কায় হিন্দু নিভৃতে নহে, সর্ব্ব সমক্ষে অতি কঠোর কৃচ্ছ্রব্রত ধারণে চান্দ্রায়ণ ব্রত পালন করেন। এমন কি, পাছে কোন অজানিত পাপ বশতঃ চন্দ্রলোকে গমনের বিঘ্ন হয়,—এই আশঙ্কায় হিন্দু কাম্য চান্দ্রায়ণ ব্রত পালন করেন। হিন্দুর সৌভাগ্য সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে। "তেজীয়সাং ন দোষায়" শ্রীমৎ-ভাগবতের এই নজীরে দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে। চান্দ্রায়ণ আদি প্রায়শ্চিত্ত দেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। প্রায়ঃচিত্ত অভাবে রোগীবিশেষের শব অস্পৃশ্য, এই ভয়ে মুমূর্ষু কালে কেহ কেহ করেন—প্রায়ঃচিত্ত পদান চন্দ্রায়ণ।

চান্দ্রসুধা।

কৃষ্ণপক্ষের প্রারম্ভ হইতে ত্রয়োদশী পর্য্যন্ত অমরগণ দিনে দিনে এক এক কলা চান্দ্রসুধা পান করেন। চতুর্দ্দশীর কলা পিতৃগণের পেয়।

ভূত চতুর্দ্দশী। কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার পরবর্ত্তী কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর নিশিতে প্রেত আত্মাগণ পৃথিবী পরিভ্রমণ করেন। ভূতগণের পথ প্রদর্শন জন্য ঐ

নিশিতে গৃহে গৃহে দীপ দান করিতে হয়। এই চতুর্দ্দশী চিত্রা নক্ষত্র সংযুক্ত বলিয়া ইহার আর এক নাম চিত্রা চতুর্দ্দশী।

বর্ষার অবসানে শাক মাত্রেই সুমিষ্ট হয়। এই চতুর্দ্দশীদিনে গৃহস্থগণ ১৪ শাক ভক্ষণে শাক ভোজনের পুণ্যে করেন। প্রাচীনকালের শাক-অষ্টকা, অপূপ-অষ্টকা এবং মাংস-অষ্টকা এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। চতুর্দ্দশীর ১৪ শাক ভোজন এবং পৌষ পার্ব্বণীর পিষ্টক ভোজন আদি তাহাদের স্থান অধিকার করিয়াছে।

ভূতচতুর্দ্দশীর নিশিতে ভূতগণের পৃথিবী পরিভ্রমণের প্রবাদ উপলক্ষ্য করিয়া নদিয়ার জাল গোপাল জাহির করিয়া ছিলেন যে, "১লা কার্ত্তিক রাত্তিরে, মরামানুষ আসিবে ফিরে।" নেড়ারা এ সংবাদে মুলুক ভাসাইল। অপরে এই দৈববাণীর প্রতি সন্দিহান হইলেও বৎসহারা জননীরা ধ্রুব বিশ্বাসে গৃহে গৃহে দীপ দানে সারা নিশি জাগিয়া ছিলেন। হতাশ্বাসে ভোরে যে কান্নার রোল উঠিয়াছিল, তাহা শুনিয়া জাল গোপালকে শত ধিক্কার দেয় নাই, এমন লোক দেখি নাই। এই মর্ম্মভেদী শোকোচ্ছ্বাস ঠাকুর কবির চিত্ত আকর্ষণ করিলে চিরস্মরণীয় হইবে।

চন্দ্রলোকে অন্তরীক্ষ নাই অর্থাৎ জল বায়ু মেঘ আদি নাই, সুতরাং তথায় পার্থিব প্রকৃতির জীব জন্তুর বাস থাকা অসম্ভব। এই কথা সুতীক্ষ্ণ দূরবীক্ষণের বলে য়ুরোপীয় তারা-দর্শকগণ বলিতেছেন। হিন্দু বহুকাল পূর্ব্বে চন্দ্রলোকে প্রেত-আত্মার আবাস নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। এবং প্রেত-আত্মার অমরত্ব কল্পে তাহাকে কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশীতে চান্দ্রসুধার শেষ কলা পানে অধিকারী করিয়াছেন। অমর প্রেত-আত্মা দেবত্ব লাভ করিয়া স্বেচ্ছাবিহারী হইবে না কেন?

অমা।

বারিবর্ষণে অমাতিথি শ্রেষ্ঠ। তাই ইন্দ্র অমার অধিদেবতা।
এই অধিদেবত্ব মূলে অহল্যা-হরণের ইতিহ রচিত হইয়াছে।

চন্দ্রসভা।

বিমল বিমানে পূর্ণিমার নিশিতে শশী মণ্ডলাকার সটা বিস্তার করেন। এ দৃশ্য সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। লোকমতে অমরগণ চন্দ্রের সভায় সমবেত হইয়া লোকহিত মন্ত্রণা করেন।

বিদেশে।

মিসরে শস্যশীর্ষ-পূর্ণ আড়ি শস্যাধিপত্নী Isis দেবীর কর-কমল সুশোভিত করে।

গ্রীসে Luna বা Artemis দেবী শবরী-বেশে শিকারে রত ছিলেন। Typhon স্বর্গ আক্রমণ করিলে বিড়াল রূপ-ধারণে ইনি ত্রাণ পান।

রোমে Diana দেবীও শবরী-বেশে শিকারে মত্ত ছিলেন। চন্দ্রকলা Diana দেবীর শিরোভূষণ। সিনীবালীর ন্যায় Diana দেবী সুপ্রসবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এল।

স্বপ্ন-চাতুরী।

অনন্ত এ সংসারের অতি ক্ষুদ্র কোণে,
কত যত্নে, কত সাধ কত আশা ল'য়ে
রচেছিনু স্বপ্ন-হার আপনার মনে,
হৃদয়ের অনাঘ্রাত প্রেম-ফুল দিয়ে।
কৌমুদী-বিধৌত এক শুভ্র রজনীর
শেষযামে এসেছিল বাঞ্ছিত আমার,—
কি সৌন্দর্য্য কি মাধুরী আহা! কি গভীর
প্রশান্ত আনন; মধুর চাহনি তার।
চঞ্চল অঞ্চল মোর, কম্পিত এ হিয়া,—
আনন্দে বিবশা আমি আপনা পাসরি
ছুটে গেনু কল্পনার প্রেমহার নিয়া
উপহার দিতে তার চরণ-উপরি।
আঁখির পলকে হায়, ভাঙ্গিল স্বপন,
ছিন্নহার পদতলে করি নিরীক্ষণ।

শ্রীভোলানাথ চৌধুরী ভারতী।

ভুল-ভাঙ্গা।

(গল্প)

সত্য যখন লোক-পরম্পরায় তাহার মাতৃসমা বৌ-দিদির মৃত্যু সংবাদ শুনিতে পাইল, তখন তাহার সংসারের উপর, রমণীর উপর একটা বিজাতীয় ঘৃণা জন্মিল। মনের মধ্যে তুষের আগুণ ধিকি ধিকি জ্বলিয়া উঠিল। জীবনের প্রতিও একটা বিষম ঘৃণা জন্মিল। আর মনোরমা? তাহার জন্যই ত এতটা ঘটিল। সত্যের মনে হইল, তাহার বউ-দিদির মৃত্যুর একমাত্র কারণ পত্নী মনোরমা! সে যদি ছল করিয়া তাহাকে মনোহরপুরে আটক না রাখিত, বৌ-দিদির কাতর প্রার্থনা-পূর্ণ পত্রগুলি আত্মসাৎ না করিত, তাহাদিগের বিরুদ্ধে ক্রমাগত তাহাকে উত্তেজিত না করিত, তবে কি এতটা ঘটিতে পারিত?

সত্যের মনে হইতেছিল, সকল দোষের জন্য দায়ী একমাত্র মনোরমা! সে না করিয়াছে কি? বৌ-দিদি যখন মৃত্যু শয্যায়, তখন তাঁহার কাতর আহ্বান-বাণী লইয়া গোকুল কতবার মনোহরপুরে আসিয়াছে! কতবার দ্বারবানের খোসামোদ করিয়া একবার সত্যকাকার সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়াছে, কিন্তু তাহার কোনটীই মনোরমার জন্য পূর্ণ হয় নাই। অবশেষে জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামহরি স্বয়ং আসিয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও সফলকাম হইতে পারেন নাই। সামান্য দ্বারবানের যে হৃদয় আছে, সুরসুন্দরীসমা মনোরমার তাহা নাই। বেচারী দ্বারবান যখন বৌদিদির মৃত্যুশয্যার কাতর আহ্বান-বাণী, মনিবপত্নীর কঠোর আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া, সত্যের কাছে বলিতে আসিল, তখন পিশাচী তাহার প্রতিদান স্বরূপ বেচারীকে সেই মুহূর্ত্তেই পদচ্যুত করিল। শুধু তাহাই নহে, অভিমানভরে স্বামীকে বলিল, —"তুমি ত আমার কোন কথাই বিশ্বাস ক'রবে না!, ও একটা ছল; তোমায় বাড়ী নিয়ে যাবার একটা নূতন কৌশল।"

রূপমুগ্ধ যুবক সত্য তখন রূপবতী পত্নীর কথা অবিশ্বাস করিতে পারিল না; কাজেই যে বৌ-দিদি মাতৃহারা সত্যকে মায়ের অধিক স্নেহে পালন করিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত আর শেষ সাক্ষাৎ করা ঘটিয়া উঠিল না। ওদিকে অভাগিনী বৌ-দিদি পুত্রশোকাতুরার ন্যায় "হা সত্য! হা সত্য!" করিতে করিতে পরলোকের পথে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার স্বামী ছিল, পুত্র ছিল, পুত্রবধূ ছিল, কিন্তু তবুও মৃত্যুকালে সত্যের নাম করিতে করিতেই

তাঁহার শেষ নিশ্বাস প্রবাহিত হইয়া গেল। বড় সাধের সত্য কিন্তু একবার শেষ দেখাও করিতে আসিল না। ইহাতে তিনি মনে যতই কষ্ট অনুভব করুন না কেন, ভ্রমেও একবার সত্য বা মনোরমার অমঙ্গল কামনা করেন নাই। মাতৃস্নেহ এমনি পদার্থ!

কিন্তু তিনি তাহা না করিলেও সকলের উপর যে একজন ভগবান আছেন, তিনি এ অবিচার সহ্য করিবেন কেন? সাধ্বীর শেষ উষ্ণশ্বাসে সত্যের হৃদয়ের সবটুকু শান্তি মুছিয়া গেল; আর মনোরমারও চিরদিনের সাধ,—যাহার জন্য সে কোমলহৃদয়া নারী হইয়াও পিশাচীর অধিক কঠোরা হইয়াছিল, সে সাধও অপূর্ণ রহিয়া গেল।

পরদিন প্রাতে উঠিয়া মনোরমা সত্যকে দেখিতে পাইল না। বাটীর সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়াও তাহার কোন সন্ধান মিলিল না। প্রথমে সে মনে করিল,—মনটা অত্যন্ত অস্থির হওয়ায় সত্য বোধ হয়, প্রাতঃভ্রমণে বাহির হইয়াছে, কাজেই চিন্তার কারণ বিশেষ কিছুই নাই। কিন্তু ক্রমে যখন বেলা বাড়িতে লাগিল, তখন মনোরমার চিত্তও সঙ্গে সঙ্গে অধিক চিন্তাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইল, কিন্তু তবুও সত্যের কোন সন্ধান মিলিল না। তখন মনো'র মনে একটা নূতন কথা জাগিয়া উঠিল। মনে করিল,—অত্যধিক চিত্ত-বৈকল্যে সত্য বোধ হয় দেশে চলিয়া গিয়াছে; আবার মনটা একটু শান্ত হইলেই মনোহরপুরে ফিরিয়া আসিবে। ইহাতে সে কতকটা নিশ্চিন্ত হইল বটে, কিন্তু একেবারে নিরুদ্বেগ হইতে পারিল না। নূতন ভয় আবার নূতন ভাবে তাহাব চিত্ত অধিকার করিয়া, তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল।

তাহার শ্বশুর-গৃহের একখানি চিত্রপট নয়ন সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। সে দেখিল,—সেই পল্লীগ্রামের বন-জঙ্গল-পূর্ণ অপরিচ্ছন্ন স্থান, ছোট বড় মৃৎ-কুটীর দূরে দূরে দণ্ডায়মান, বাটীর আশে-পাশে হরিৎবর্ণ ধান্যের ক্ষেত্র। বাটীর উঠানে মরাই বাঁধা সোনার বরণ ধান। সাধারণ লোকের চক্ষে বা কবির নিকট এসকল জিনিষের আদর থাকিলেও, মনোরমার নিকট তাহার কিছু-মাত্র আদর ছিল না। সে ধনীর কন্যা; আজন্ম ত্রিতল ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাসাদোপম বাটীতে লালিত; সম্মুখে সযত্ন-লালিত পুষ্পোদ্যান; তাহাতে কত যূথী, জাতী, বেল, মল্লিকার আকুল মদির-বাস। কাজেই এসব দেখিয়া শুনিয়া মনোরমার কবির সেই—

—"অবসর আর নাহিক তোমার,
আঁটি আঁটি ধান চলে ভারে ভার

গ্রাম-পথে পথে গন্ধ ভরিয়া উঠিছে পবনে।" গানটি উপহাস বলিয়া মনে হইত। সে ভাবিত, উপন্যাসে দেখি লোকে বেলা, যূথী, চেরী প্রভৃতির গন্ধেই মাতিয়া উঠে, কিন্তু বাংলাদেশের কবিগুলো কি পাগল!—তাহারা ধানের গন্ধেও পবনকে মাতিয়া উঠিতে দেখে!

শুধু যে বন-জঙ্গল-পূর্ণ ও মৃৎকুটীরে বাস বলিয়াই মনোরমা শ্বশুর-গৃহে যাইতে এতটা নারাজ, তাহা নহে। আসল কথা শ্বশুররা পল্লী-গৃহস্থ। তাঁহাদের গোলা ও ক্ষেত্রপূর্ণ শস্য থাকিলেও ঘর ভরা টাকা ছিল না;—আর পল্লীর সাধারণ নিয়মানুসারে গবাদি পশু ও গৃহকর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণের জন্য কোন চাকর দাসীও ছিল না; বধূদিগকে স্বহস্তেই সে সকল কর্ম্ম করিতে হইত। সেই জন্যই মনোরমার শ্বশুর-গৃহের উপর এতটা বিতৃষ্ণা। সে ধনীর কন্যা,—আজন্ম বিলাসলালিতা; কাজেই এ সকল নিকৃষ্ট কর্ম্ম করিতে বড়ই লজ্জা বোধ করিত। কাজের মধ্যে কেবল শিখিয়াছিল—নভেল পড়া। এই সকল কারণেই সে পিতাকে বলিয়া, অনেক কষ্টে—অনেক অশ্রু ত্যাগের পর, শ্বশুর-গৃহে গমন রদ করে এবং সত্যকে ঘরজামাই করে। অবশেষে পিতার মৃত্যুর পর তাহারা দুইজনে যখন তাঁহার বিপুল সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী হয়, তখন স্বামীকে সর্ব্বরকমে শ্বশুর-গৃহের সকলের সহিত সম্পর্ক-শূন্য করিবার অভিপ্রায়ে, সেখান হইতে যে সকল পত্র আসিত, তাহা সত্যকে না দিয়া অগ্নিমুখে সমর্পণ করিতে আরম্ভ করে এবং দ্বারবানদিগকে কঠোর আদেশ দেয়,—যেন সে গ্রামের কোন লোক তাহার বিনা অনুমতিতে সে বাটীতে প্রবেশ করিতে না পারে। ইহার ফল যাহা হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই ব্যক্ত করা হইয়াছে।

এক্ষণে তাহার ভয় হইল, পাছে অনুতপ্ত সত্য দেশে গিয়া সেই স্থানেই বাস করিবে স্থির করে! তাহা হইলেই তাহার এত দিনের শ্রম পণ্ড হইয়া যাইবে। আবার হয় ত সেই পূর্ব্বের মত সত্যদের পল্লীকুটীরে স্বহস্তে সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইবে। এই চিন্তায় মনোরমা অস্থির হইয়া পড়িল। বহুক্ষণ চিন্তার পর সে স্থির করিল, গোপনে একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে,—সত্য সেখানে কি ভাবে কালযাপন করিতেছে।

দুইদিন কাটিয়া গেলেও সত্য যখন ফিরিল না, মনোরমা তখন আর বেশ

নিশ্চিন্ত ভাবে বসিয়া থাকিতে পারিল না। সত্য গ্রামে কি ভাবে অবস্থান করিতেছে, তাহা জানিবার নিমিত্ত তথায় একজন লোক পাঠাইয়া দিল।

যথাসময়ে মনোরমার প্রেরিত লোক ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, সত্য সে গ্রামে আদৌ যায় নাই। মনোরমার ভয় ক্রমে আতঙ্কে পরিণত হইল। সত্যের অনুসন্ধানের জন্য দিকে দিকে লোক ছুটিল, কিন্তু ফল বিশেষ কিছুই হইল না। দিনের পর দিন,—সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিয়া গেল, কিন্তু সত্যের কোন সন্ধানই মিলিল না।

(২)

সেদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর সত্য যখন দেখিল, মনোরমা নিঃশঙ্কচিত্তে নিদ্রা যাইতেছে, তখন সে ধীরে ধীরে শয্যা ত্যাগ করিয়া গৃহের বাহিরে আসিল। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি,—ঘোর অন্ধকারে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন; সম্মুখের লোক অবধি চিনিবার উপায় নাই। সত্য ধীরপদ-বিক্ষেপে সদর দ্বার অতি-ক্রম করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মনে এতটুকু শান্তি ছিল না। অত্যন্ত বৈরাগ্যভরে সে স্থির করিল,—সংসার ছাড়িয়া সেই নবীন বয়সেই সন্ন্যাস ব্রত অবলম্বন করিবে।

সেই কথা ভাবিতে ভাবিতে রিক্ত হস্তেই সে অনেকটা পথ আসিয়া পড়িল। গন্তব্য স্থানের কোন ঠিক ছিল না। একবার মনে করিল, দাদার কাছে গিয়া রুদ্ধ শোকের বেগটা প্রশমিত করিয়া আসিবে, কিন্তু পরক্ষণেই সে ইচ্ছা ত্যাগ করিল। তাহারই জন্য বৌ-দিদির এই অকাল মৃত্যু, সে স্থলে সে লোকের নিকট মুখ দেখাইবে কেমন করিয়া?

প্রাতে যখন পূর্ব্বদিক আবির-রঞ্জিত করিয়া সূর্য্যদেব উদয়াচলে দর্শন দিলেন, সত্যের তখন চিন্তায় মন ভরিয়া উঠিল। এতক্ষণ অন্ধকারে আত্ম-গোপন করিয়া সে একরূপ ছিল ভাল, এক্ষণে শত পথিকের কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি তাহারই উপর আকৃষ্ট হইবে। করা যায় কি? ভাবিতে ভাবিতে বেচারা একেবারে অস্থির হইয়া পড়িল, চিন্তার উপর যথেষ্ট শ্রান্তি ও অবসাদও আসিয়া দেখা দিল। এককালে এতটা পথ পদব্রজে অতিক্রম করা কখনই তাহার অভ্যাস ছিল না, সুতরাং বিশ্রামের জন্য সোৎসুকে চতুর্দ্দিক দেখিতে লাগিল। আরও কিঞ্চিৎ পথ অতিক্রম করিবার পর, একটি ফল-ফুলের বাগান তাহার দৃষ্টি-পথবর্ত্তী হইল। সাহসে ভর করিয়া শ্রান্ত সত্য সেই উদ্যান-পথেই প্রবেশ করিল।

সেটী একটী সুবিস্তীর্ণ উদ্যান। আম, জাম প্রভৃতি বহুপ্রকারের ফল এবং নানা বর্ণের ফুল-গাছে পুর্ণ; সম্মুখে একটী নাতিক্ষুদ্র পুষ্করিণী; সুবিস্তৃত শান্ বাঁধান চাতালের উপর শয়ন করিয়া এক ব্যক্তি নিঃশঙ্কচিত্তে নিদ্রা যাইতেছিল। সত্য ধীরে ধীরে গিয়া পুষ্করিণীর স্বচ্ছ শীতল জলে হস্ত-মুখ প্রক্ষালিত করিয়া শ্রান্তি দূর করিবার জন্য ছায়াশীতল একটী ধাপের উপর বসিয়া পড়িল।

যে লোকটী নিদ্রা যাইতেছিল, সে একজন সন্ন্যাসী। অঙ্গে গৈরিক বাস, পার্শ্বে একটী লৌহনির্ম্মিত চিমটা, ভিক্ষার ঝুলি মস্তকে দিয়া সে এতক্ষণ বেশ আরামেই নিদ্রা যাইতেছিল। এক্ষণে ঘন-সন্নিবেশিত বৃক্ষপত্রের মধ্য দিয়া নবোদিত সূর্য্যের একটী কিরণ আসিয়া মুখে পড়ায়, তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। লোকটী নানা দেবতার নাম উচ্চারণ করিতে করিতে উঠিয়া বসিল। তাহার পর নিদ্রালস নেত্রে ঘাটের দিকে চাহিতেই সত্যের উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল। বারম্বার কটাক্ষপাত করিয়াও, সন্ন্যাসী যখন সত্যের পরিচয় বা উদ্দেশ্য অনুমান করিতে পারিল না, তখন সত্যকে আরও ভালরূপে নিরীক্ষণ করিবার জন্য জলের দিকে নামিতে লাগিল। হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া উঠিয়া আসিবার সময়ও বার কয়েক তাহার দিকে যে কৌতূহল-পূর্ণ দৃষ্টি না ফেলিল, তাহা নহে, কিন্তু তাহাতেও তাহার কৌতূহল কিঞ্চিৎ-মাত্র প্রশমিত হইল না।

অগত্যা সন্ন্যাসী আপন স্থানে ফিরিয়া আসিয়া এক ছিলিম গঞ্জিকা প্রস্তুত করিল। একটী সুদীর্ঘ টানে কলিকাটী প্রজ্বলিত করিয়া সত্যকে ডাকিল—"ওগো কোর্ত্তা! বলি শুন না।"

সত্য ধীরে ধীরে তাহার নিকট উঠিয়া আসিলে, সে তাহাকে আর একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া বলিল,—"তোমার নসীবে সুখ অনেক, কিন্তু এখন বড় মনের সুখ নাই।"

সত্য একেবারে গলিয়া গেল। বলিল,—"ঠাকুর, ঠিক অনুমান করিয়াছেন! মনে আমার কিছুমাত্র সুখ নাই, সংসারেও আর ফিরিবার ইচ্ছা নাই। এখন যদি ঠাকুর দয়া ক'রে চরণে স্থান দেন——"

সন্ন্যাসী বাধা দিয়া বলিল,—"হাঁ, হাঁ, কি বল তুমি! আমি তোমায় স্থান দিবার কে? সবার উপর ভগবান আছেন, সেই সব্‌বার স্থান ক'রবেন।"

"তা ত' বটেই, কিন্তু একটা উপলক্ষ চাই ত। আপনার মত যখন একজন সাধুর সাক্ষাৎ পেয়েছি, তখন আর আমি এ আশ্রয় ছাড়্‌চি না।"

"তবে এখন তুমি কি পথ ধরবে মনে ক'রচ ?"

'সন্ন্যাস ধর্ম্ম। তাই ত ব'লচি আপনার সঙ্গ ছাড়বো না।"

সন্ন্যাসী প্রথমে তাহাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু যখন দেখিল, তাহার সংকল্প অচল, তখন আর সে আজ্ঞা দিল না। ক্রমে সত্যের সহিত সন্ন্যাসীর আলাপ জমিয়া উঠিল। সন্ন্যাসী বলিল,—"বেটা, চেলা হইবি যখন তুই, তখন দুইটা বয়েদ শিখিয়ে রাখ। যখন লোকের বাড়ী যাব, তুই দুই চারিটে বাজে বয়েদ বলিয়া আমায় একজন মহাপুরুষ বলিয়া পরিচয় দিবি। পাওনাটা যাতে বেশী হয়, সর্ব্বদা সেই চেষ্টা করবি। আর এক কথা।— সন্ন্যাসী হইতে হইলে ঐ জামাকাপড় গুলো খুলে ফেল, আমার কাছে টেনী আছে, তাই একটা পরিয়ে ফেল।

সত্য ঐরূপ একটা কিছু ছদ্মবেশের আবশ্যকতা অনুভব করিতেছিল। সন্ন্যাসী যখন স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে এ হেন অমূল্য নিধি দান করিতে চাহিল, তখন সে আর অমত করিতে পারিল না। সংসারীর বেশ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী-প্রদত্ত বৈরাগীর ছদ্মবেশ পরিধান করিল। তবে সন্ন্যাসীর চরিত্রটা তাহার নিকট তত ভাল বলিয়া মনে হইল না; এরূপ লোকের সংসর্গে সে যে অধিক দিবস থাকিতে পারিবে, এরূপ তাহার অনুমান হইল না; কিন্তু তাহা বলিয়া বর্ত্তমানে যে অযাচিত ভাবে তাহাকে আশ্রয় দান করিতে চাহিল,—তাহাকে ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া সে ক্ষুণ্ণ করিতে প্রস্তুত নহে।

অতঃপর ক্রমে আর একটু বেলা বাড়িলে সন্ন্যাসী সত্যকে সঙ্গে লইয়া, লোকালয় অভিমুখে যাত্রা করিল। বলা বাহুল্য যে, সত্যের পরিত্যক্ত জামা ও কাপড় সন্ন্যাসিপ্রবর ইতিপূর্ব্বেই আপন সর্ব্বগ্রাসী ঝুলির মধ্যে পুরিয়া ফেলিয়াছিলেন।

সারাদিনটা নানারূপ বুজরুকি করিয়া ও মিথ্যা কথার আদ্য শ্রাদ্ধ করিয়া সন্ন্যাসী অনেকগুলি পয়সা উপার্জ্জন করিল। সত্য নীরবে তাহার কার্য্য-কলাপ দেখিয়া যাইতে লাগিল, মুখে একটী কথাও বলিল না, বা বাধা প্রদান করিল না; ক্রমেই সন্ন্যাসীর উপর তাহার অভক্তি বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু তথাপি নিরুপায়।

রাত্রে যখন আরও কয়েক জন সন্ন্যাসী আসিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইল, তখন সে স্থানে আর তিলমাত্রও সত্যের থাকিতে ইচ্ছা হইল না। সে দেখিল, সকলেই ধর্ম্মের ঢাক কাঁধে করিয়া মূর্ত্তিমান অধর্ম্ম! কয়েক জন

একত্রিত হইবামাত্র কে কত রোজকার করিল, তাহাই সোৎসাহে আলোচিত হইতে লাগিল। কেহ বলিল—একটাকা, কেহ পাঁচ টাকা, আবার কেহ চারি আনা মাত্র। তাহার পর কে কি উপায়ে উপার্জ্জন করিয়াছে, তাহারই আলোচনা করিতে লাগিল। সে পাপ-কাহিনী শুনিতে শুনিতে সত্যের প্রাণ ঘৃণায় ভরিয়া উঠিল। সন্ন্যাসী মাত্রেরই উপর তাহার বিজাতীয় ঘৃণা জন্মিল। ক্রোধে ঘৃণায় সে গাত্রোত্থান করিল; তাহা দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসী কহিল,—"ওহে! যাও কোথা? একবার ছিলাম চড়াও!" সেদিন তাহার উপার্জ্জন অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল, কাজেই সানন্দে সে সন্ন্যাসীদলকে এক ছিলাম গঞ্জিকা সেবন করাইতে চাহিল। সত্যের উপর সকল সন্ন্যাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ায় বেচারী সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। তখন আর তাহাদিগের সঙ্গ ত্যাগ করা হইল না। অগত্যা সে অনভ্যস্ত হস্তে গঞ্জিকা সাজিতে বসিল।

সন্ন্যাসীর দল তাহাকে লইয়া বেশ একটু কৌতুহল করিতে আরম্ভ করিল। কেহ বলিল,—"ন্যাকা আর কি, কিছু জানেন না, ওদিকে যে বাবা পেটের ভেতর কত গাঁজার গাছ গজিয়েছে, তার ঠিক নেই।" কেহ বলিল—"এই বুঝি হাতে খড়ি?—তা আমদানী কোথেকে? জেল ফেরৎ না ফেরারী আসামী?" ইত্যাদি নানা বিরক্তিকর প্রসঙ্গে তাহাকে উৎখেৎ করিয়া তুলিল, সে সে-সকল কথার কোন উত্তর না দিয়া আপন মনে কাজ করিয়া যাইতে লাগিল।

(৩)

সে-বার বৃন্দাবনে কি একটা উৎসব উপলক্ষে অসম্ভব জনতার সমাবেশ হইয়াছিল। নানা দুষ্পাচ্য ও অখাদ্য ভক্ষণ করিয়া, দলে দলে লোক মৃত্যু-মুখে পড়িতেছিল;—আর ধর্ম্মের সহচররূপে রামকৃষ্ণ মিসনের সেবক-দল অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করিয়া, তাহাদিগের যথাসাধ্য সেবা করিতেছিল।

রামহরি যখন দুরারোগ্য ওলাউঠা রোগাক্রান্ত হইয়া পথিপার্শ্বে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িল, তখন অনেকগুলি বিস্ময়-মূক দৃষ্টি তাহার উপর ন্যস্ত হইল বটে, কিন্তু কেহ সাহস করিয়া অগ্রসর হইতে পারিল না। অকস্মাৎ রামকৃষ্ণ মিসনের দুইজন সেবক আসিয়া অত্যন্ত আত্মীয়ের ন্যায় তাহাকে বক্ষে করিয়া লইয়া গেল; বিস্ময়মূক জনতা ভক্তিমিশ্রিত কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হইয়া তাহাদিগকে হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল। অদূরে দাঁড়াইয়া মনোরমাও এই দৃশ্য দেখিতেছিল; তাহার মনে হইল, উহারাই বাস্তবিক দেবতা! তাহার সেই কৌশল-শৃঙ্খলিত স্বামী সত্য যে এরূপ

উন্নত-হৃদয়, সে কথা সে এই প্রথম জানিতে পারিল। তখনই তাহার সমস্ত হৃদয়টা একটা আকুল আগ্রহে হায় হায় করিয়া উঠিল। মনে করিল,—সেই জনতার সম্মুখেই উদারহৃদয় সত্যের পা দুখানি ধরিয়া সে তখনই তাহার দুষ্কর্ম্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবে ;—আর বলিবে যে,তাহার ভুল ভাঙ্গিয়াছে ; যে ধনের গর্ব্বে সে এতদিন সারা পৃথিবীটাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিত, সে মোহ কাটিয়া গিয়াছে ; আজ সত্য যে মহৎ কর্ম্ম করিয়া সাধারণের প্রীতি-মণ্ডিত হইয়াছে, তাহার মূল্য মনোরমার অকিঞ্চিৎকর অর্থাপেক্ষা অনেক বেশী।

* * * * *

রামকৃষ্ণ মিসনের সেবাগৃহের একটী কক্ষে পড়িয়া রামহরি রোগ-যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল ; পার্শ্বে বসিয়া একজন সেবক অক্লান্তভাবে সেবা ও ঔষধ প্রদান করিতেছিল। শেষবার যখন ঔষধ প্রদান করিল, তখন সে এক বার ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিয়া চাহিল।

সেবক কম্পিত-কণ্ঠে ডাকিল,—"দাদা !"

পথিপার্শ্বে সর্প দেখিলে পথিক যেমন ত্রস্ত হইয়া উঠে, রামহরিও তেমনি বিচলিত হইয়া পড়িল। ভাল করিয়া তাহার দিকে আর একবার দেখিয়া বলিল—"কে তুমি ?"

সেবক তাহার পদে মস্তক রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"দাদা, অভাগাকে চিন্‌তে পার্‌ছেন না ? আমি যে আপনার ভাই !—সত্য।"

"কোন্ সত্য ? যার জন্যে তার স্নেহকাতর বউদিদির অকাল মৃত্যু হ'ল—পাষণ্ড একবার শেষ দেখাও করেনি, সেই সত্য তুমি ? তোমার হৃদয় এত মহৎ ?"

"দাদা ! দাদা ! সেই......।" সত্য আর বলিতে পারিল না ; রামহরির পা দুইখানি তাহার অজস্র অশ্রুধারে সিক্ত হইয়া উঠিল।

"কেঁদনা, কেঁদনা সত্য ! তা' তোমার আজ এ অবস্থা কেন ? শ্বশুরের অত সম্পত্তি কি সব শেষ ক'রে দিয়েছ ?"

"না দাদা, সবই ঠিক আছে. নেই কেবল আমার মনের শান্তি। যে মুহূর্ত্তে লোকের মুখে শুনলুম, আমারই জন্তে বৌদির অকাল মৃত্যু হ'য়েছে ; সেই মুহূর্ত্ত থেকেই আমার প্রাণের উপর একটা ধিক্কার জন্মে গেছে ; সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যেই এই দলে এসে মিশেছি।"

রামহরি স্নেহ-মিশ্রিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"লোকের মুখে শুন্‌লে

৫

এসেছে আজি বিশ্বমাতা, সঙ্গে লয়ে কমলায়
সংখ্যাতীত কম্বু-নাদে অম্বু-নিধি লাজ পায়।
আর্শী সম সরসী জল
স্নিগ্ধ-শ্যাম ধরণীতল
শারদ-শশী ঢল ঢল, নির্ম্মেঘ গগন গায়।
সিন্ধুসুতা বিরাজে যথা মলিনতা কি থাকে তায়?

(৬)

এসগো বাণি! বিদ্যারাণি! খুলিয়া জ্ঞান-গৃহ-দ্বার:
দেখাও মণি-হীরক-চুনী-পূরিও তব ভাণ্ডার॥
তটিনী-তটে কুঞ্জ-বনে
বাজুক বীণা মধুর স্বনে
গগনভেদী গভীর তানে উঠুক পুন সাম-গান।
নয়ন মুদি শুনুক ধরা অসার দেহ পাক প্রাণ॥

(৭)

এস গো শুভে পদ্মালয়ে! এস শুভ্রবরণে!
দুজনে মিলি অভাগা দেশে থাক—মিনতি চরণে॥
প্রতি পল্লী প্রতি পুরী
ধন-ধান্যে যাক্ ভরি
ছুটুক বেগে জীবন-তরী সুখ-সমীর-পরশে।
মোহ-তমসা পলাক দূরে, জ্ঞান-সূরয-পরশে॥

(৮)

সৌম্যবেশে বঙ্গদেশে এস গো রণরঙ্গিণি।
সিদ্ধি-দাতা-লম্বোদর—শক্তিধর-সঙ্গিনি!
করুণাময়ী জননী-বেশে
বিরাজ মাতঃ! দেশে দেশে
দয়িতারূপে প্রেমরসে হৃদয়-মরু-প্লাবিনি!
কভু বিধবা শুদ্ধমতি লোক-হিতকারিণি!

শ্রীচণ্ডীদাস মজুমদার বি, এ।

———
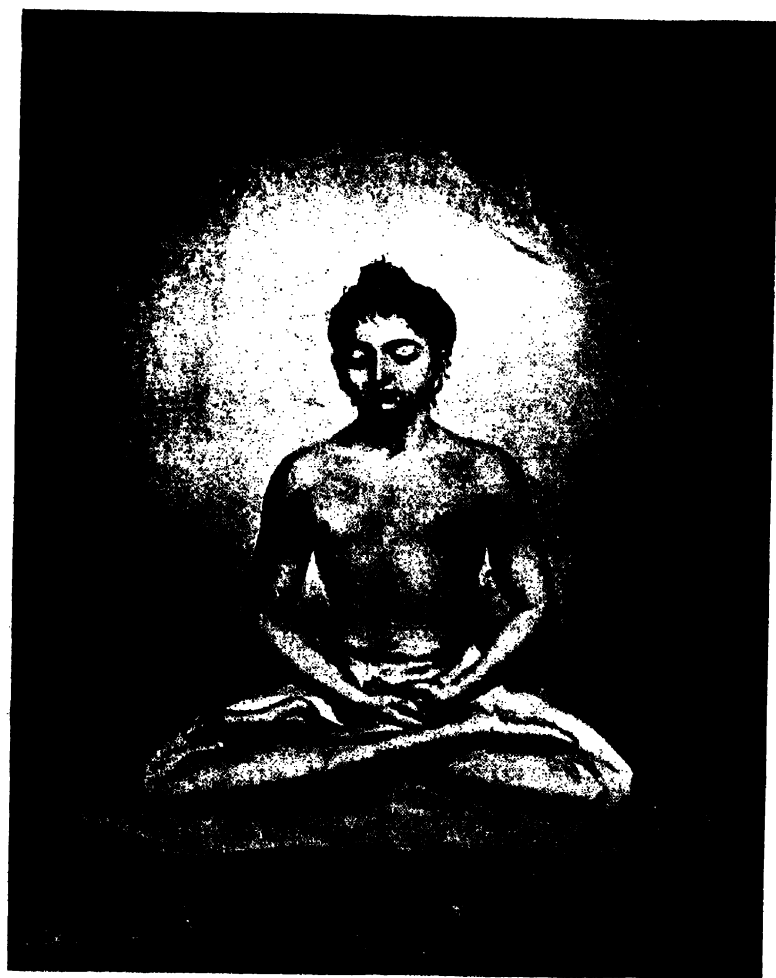
বুদ্ধ

শান্তং সদা প্রাণিবধাতিভীতং
বৃহজ্জটাজূটধরোত্তমাঙ্গম্।
তনূল্লসদ্গৈরিক গৌরবস্ত্রং
যোগীশ্বরং বুদ্ধমহং ভজেয়ম্॥

মূর্ত্তি-পূজা।

আত্ম-মত সমর্থনের জন্য সকলেই বদ্ধ-পরিকর। বিশেষতঃ ধর্ম্মের দিক দিয়া ইহা আরও প্রবলতর বলিয়াই বোধ হয়। বক্তৃতার ছটায়, তর্কযুক্তির ঘটায় সকলেই স্ব স্ব ধর্ম্মমতের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়া, ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী জনগণকে আত্মমতের অনুবর্ত্তী করিতে সর্ব্বদা সমুৎসুক। অনেক বিজ্ঞ ধর্ম্মপ্রচারক পর-ধর্ম্মের নিন্দা করিয়া স্ব-ধর্ম্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতেও পরাঙ্মুখ নহেন। এ বিষয়ে প্রাচীন হিন্দু ধর্ম্ম কিন্তু অন্যের অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে। ধর্ম্ম প্রচারে তাহার এইরূপ ঔদাসীন্য দেখিয়া,—ভিন্ন ধর্ম্মীকে গ্রহণ করিতে তাহার এইরূপ অনিচ্ছা দেখিয়া,—অন্যের কথার প্রতিবাদ করিতে উপেক্ষা প্রদর্শন দেখিয়া অপর অনেকেই কিন্তু তাহাকে আক্রমণ করিতে অধিক শক্তি নিয়োগ করেন। ফলে হিন্দুর এই নিশ্চেষ্টতার জন্য ক্ষতির আশঙ্কা অনিবার্য্য। একটা দৃষ্টান্ত দিব।

হিন্দুধর্ম্মে পরব্রহ্মের উপাসনাও আছে, আবার মূর্ত্তি পূজার বিধি ব্যবস্থাও আছে। ভিন্ন ধর্ম্মী প্রচারকগণের কেহ কেহ উভয় প্রথারই নিন্দা করেন; কিন্তু সকলেই প্রায় মূর্ত্তি পূজার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এই ভাবের বক্তৃতার প্রতিবাদ করিতে কেহই সেই বক্তৃতা-ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান না হওয়ায়, সাধারণের মনে বক্তার তর্ক-যুক্তিই প্রাধান্য লাভ করে। তাহার ফলে ক্রমে ক্রমে হিন্দুর বিশ্বাসের মূল শিথিল হইয়া পড়ে। এবং তা'র জন্য যে আচার-ভ্রষ্টতা ও নিষ্ঠার অভাব সমাজে প্রবেশ করে, তাহাতে সমাজের ক্ষতির আশঙ্কা অনিবার্য্য। এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। আজ আমরা হিন্দু ধর্ম্মের মূর্ত্তি-পূজার বিষয়ই আলোচনা করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিব, যে ইহা হিন্দু ধর্ম্মের নিন্দা কি গৌরবের বিষয়!

বাহ্য জগতে দেখিতে পাই, বিশাল মানব মণ্ডলীর সকল ব্যক্তিই এক আকারের নহে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে শারীরিক পার্থক্য যথেষ্ট বর্ত্তমান। কেহ কৃশ, কেহ স্থূল;—কেহ সুস্থ, কেহ রুগ্ন;—কেহ বলিষ্ঠ, কেহ দুর্ব্বল। আবার বুদ্ধি-বৃত্তিও সকলের সমান দেখি না। কেহ দুই মাসে যতটুকু লেখাপড়া শিক্ষা করিতে পারে, কেহ ছয় মাসেও ততটুকু শিক্ষা করিতে

পারে না। কেহ অনায়াসে সঙ্গীত শাস্ত্র আয়ত্ত করিতে পারে, কেহ আজীবনের সাধনায়ও সুরের পার্থক্য অনুভব করিতে পারে না। বাহ্য জগতের মত আধ্যাত্মিক জগতেও মনুষ্য মধ্যে শ্রেণী বিভাগ আছে। সাধারণ ধর্ম্ম প্রচারকগণের তাহা অনুভবের অতীত হইতে পারে; কিন্তু আর্য্য ঋষিগণ,—যাঁহারা লোকহিতের জন্য হিন্দুধর্ম্মের উপাসনা-পদ্ধতির ক্রম বিকাশ প্রদর্শন করিয়া, জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, সেই পূজনীয় ব্রহ্মবাদী আর্য্য ঋষিগণের নিকট এ তত্ত্ব অবিজ্ঞাত ছিল না। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, সকলের জন্যই এক ব্যবস্থা চলিতে পারে না। উদরাময়ের রোগীকে পলান্নের ব্যবস্থা না করিয়া বার্লির ব্যবস্থাই কর্ত্তব্য। তাঁহারা সেই ব্যবস্থাই করিয়াছেন। এখন আমরা ব্যবস্থাপকের উদ্দেশ্য না বুঝিয়া, পুষ্টিকর পলান্নের পরিবর্ত্তে বার্লির ব্যবস্থা দেখিয়া হাসি, আর প্রাণ ভরিয়া তাঁহাদিগকে কটূক্তি করি!

চিত্ত-শুদ্ধি ও ভগবানে দৃঢ়-ভক্তিই উপাসনার প্রধান অবলম্বন। কায়িক, বাচনিক ও মানসিক, উপাসনার এই ত্রিবিধ অঙ্গ। কিন্তু কেবল দণ্ডবতাদি কায়িক বা প্রার্থনাদি বাচনিক পন্থাই হিন্দুর নিকট উপাসনা নহে। না হইলেও ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ ও-সকল আমাদের মত অধম অধিকারীর জন্য উপাসনার মধ্যে রাখিয়াছেন। তাহারা ধ্যান-বলে বুঝিয়াছিলেন, ভগবানে ভক্তি রাখিয়া ঐ পথে চলিতে পারিলে, ক্রমে আমরাও একদিন বিশুদ্ধ-চিত্ত হইব ও উপাসনার উচ্চস্তরে আরোহণ করিতে পারিব।

প্রচলিত সকল ধর্ম্মের মধ্যেই দেখা যায় যে, নানাবিধ কৃত্রিম বাহ্য উপায়ের দ্বারা উপাসকের অন্তরে ভক্তি-সঞ্চারের যত্ন করা হইয়া থাকে। কেহ নির্দ্দিষ্ট গৃহে বসিয়া করুণস্বরে বক্তৃতা দ্বারা সমাগত উপাসকগণের চিত্তে ভগবদ্ভক্তি জাগ্রত করিতে যত্ন করে, কেহ সুমধুর সুর-সংযোগে সুকণ্ঠ গায়কের গানে সেই অপূর্ব্বভাব জাগাইতে চেষ্টা করে, কেহ পথে পথে খোল করতাল বাজাইয়া, উন্মত্তভাবে নৃত্য গীত করিয়া মহাভাবের সঞ্চার করিতে ইচ্ছা করে। আমাদের হিন্দু সমাজেও সম্প্রদায় ভেদে, ভাবোদ্দীপক নানারূপ উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। এগুলিও যে একেবারেই নিরর্থক, তাহাও নহে। এই সমস্ত কৃত্রিমতার দ্বারা যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। ব্যবহারের দোষে অনেক উপায় আবার অধঃপাতের পথও পরিষ্কার করে। স্থূল কথা এই যে, মনুষ্যত্ব অটুট রাখিয়া, সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখিয়া

এইরূপ উপায় অবলম্বন করা জগতের ধর্ম্মাচার্য্য আর্য্য ঋষিগণের অনভিপ্রেত ছিল না। তাঁহারা এই উপায়েই সাধারণ মানবগণকে ধর্ম্মের দিকে আকর্ষণ করিতেন,—সংসার-তাপ-দগ্ধ চিত্তে ভগবদ্ভক্তির শান্তি-ধারা বর্ষণের উপায় করিয়া দিতেন।

বোধ হয়, সাধারণ লোকের হৃদয়ে ভগবানের প্রতি ভক্তি উৎপাদনের জন্যই, পৌরাণিক ধর্ম্ম-ব্যাখ্যাকার মহর্ষিগণ মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছেন। শাস্ত্রেও লিখিত আছে যে, সাধকের উপকারার্থে ব্রহ্মের রূপ-কল্পনা। কিন্তু বুঝিয়া রাখিতে হইবে যে, এ কল্পনাও উচ্চাধিকারীর জন্য নহে, নিম্নাধিকারীর জন্য নির্দ্দিষ্ট। "নিরুপাধি আদি অন্ত রহিতের" ধ্যান ধারণা কি সকলেরই সাধ্যায়ত্ত? অসম্ভব! যখন সকলের মনের বল একরূপ নহে, যখন সকলের চিত্তবৃত্তি একরূপ নহে, তখন সকলেই যে সচ্চিদানন্দের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিবে, তাহা কোন ক্রমেই সম্ভবপর হইতে পারে না। জোর করিয়া এরূপ লোককে ভগবানের ধারণা করাইতে যাইলে, হিতে বিপরীত হইতে পারে,—নাস্তিক্য বুদ্ধির উদয় হইতে পারে। তাই এই সমস্ত দুর্ব্বল-চিত্ত লোকের সাধন পন্থা সুগম করিবার জন্য, তাহাদের চিত্তের অবস্থানু-সারে ব্রহ্মধ্যানের অবলম্বন স্বরূপ,—সেই নিরাকারের আকার কল্পনা করা হইয়াছে। ভগবানের করুণা-ব্যঞ্জক বক্তৃতা দ্বারা, মহিমা-ব্যঞ্জক গীতের দ্বারা সাধারণের মনে যে ভাবের উদ্রেক করা হয়, নিরাকারের আকার কল্পনা করিয়াও আর্য্য ঋষিগণ সেই ভাবের ভিতর দিয়া, সাধককে উচ্চস্তরে উঠিবার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।

মূর্ত্তিই ভগবান নহেন। পূজার পূর্ব্বে প্রতিমূর্ত্তিতে ভগবানের "আবাহন" করা হয়। পরে সেই প্রতিমূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া ভগবানের উপাসনার পর "বিসর্জ্জন" করা হয়। "আবাহনের" পূর্ব্বেও প্রতিমূর্ত্তি পুত্তলিকামাত্র, "বিসর্জ্জনের" পরেও পুত্তলিকা ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং যাহারা প্রতিমূর্ত্তির সাহায্যে ভগবানের পূজা করে, তাহারাও জানে যে, এই প্রতি-মূর্ত্তিই ভগবান নহেন। তিনি ক্ষণেকের জন্য এই প্রতিমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া আমাদের পূজা অর্থাৎ ভাব গ্রহণ করেন মাত্র!

আরও একটা কথা;—ভগবান আমাদিগের স্থূল ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহেন। আমরা কিন্তু তাঁহাকে পূজা করিবার জন্য, তাঁহার প্রতি ভক্তি বর্দ্ধনের জন্য, আমাদিগের স্থূল ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় গ্রহণ করি। কেহ তাঁহার মহিমা

শুনিয়া শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে, কেহ তাঁহার কীর্ত্তি-কথা কীর্ত্তন করিয়া বাগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে ভাবোদ্রেক করিয়া থাকেন। অনেক নিরাকারবাদী ভাবাবেশে নিরাকারের "চরণ" কল্পনাও করিয়া থাকেন। প্রকৃত পক্ষে দেখিতে গেলে এ সকলও যে শ্রেণীর উপাসনা, উপাসনার সুগমতার জন্য—ভাবোদ্রেকের জন্য দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্য লওয়াও সেই শ্রেণীর স্থূল উপাসনা। কেহ মনে মনে মূর্ত্তি গড়ে, কেহ শব্দের দ্বারা মূর্ত্তি গড়ে, আর কেহ বা প্রস্তর-মৃত্তিকার মূর্ত্তি গড়ে —প্রভেদ এই পর্য্যন্ত!

বেদ-উপনিষদ-প্রতিপাদ্য হিন্দু ধর্ম্মে মূর্ত্তিকল্পনা করা হয় নাই; কেননা, তখন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে নিম্নাধিকারী লোক ছিল না। থাকিলেও তাহা এত অল্প ছিল যে, তাহাদের প্রতি দৃষ্টি প্রদান করার সময় উপস্থিত হয় নাই। তা'র পর যখন অসভ্য অনার্য্য জাতি হিন্দু সমাজের আশ্রয় লাভ করিল, এবং তাহাদের সংসর্গে পতিত হইয়া, পুরাতন সমাজের জন সাধারণের চিত্ত-বৃত্তির অবনতির সূত্রপাত হইল, তখনই ঐ সকল ব্যক্তির হিতের জন্য আর্য্য ঋষিগণ পুরাণ-তন্ত্রের সাহায্যে ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিলেন এবং তাহাদিগের ধ্যান ধারণার উপযোগী করিয়া, ভগবানের মূর্ত্তি কল্পনা করিলেন। লেখা পড়া শিখিতে হইলে যেমন বর্ণ পরিচয় আবশ্যক, সঙ্গীত বিদ্যা শিখিতে হইলে যেমন সুর জ্ঞানের প্রয়োজন, ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইবার জন্য তেমনই প্রথমে যে সকল পদ্ধতির প্রয়োজন হয়, এই মূর্ত্তি পূজা তাহাদের মধ্যে অন্যতম। বালক অক্ষর লিখিতে শিখিবার আগে যেমন নানারূপ আঁকা বাঁকা দাগ পাড়ে, ক্রমে ঐরূপ দাগ পাড়িতে পাড়িতে অক্ষর শিখিতে শিক্ষা করে, ব্রহ্মবিদ্যাশিক্ষার্থীর মূর্ত্তি-পূজাও তেমনই দাগপাড়ামাত্র! সেই অনির্ব্বচনীয় অসীমের উপলব্ধির ইহাই সসীম সোপান। এই সোপান ধাপে ধাপে আরোহণ পূর্ব্বক অতিক্রম করিলে, গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা যত নিশ্চিত, এ সোপানে পদার্পণ না করিয়া উল্লম্ফনাদি অন্য উপায় অবলম্বন করিলে, অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা তত অনিশ্চিত।

অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিগণ একমাত্র ভগবানের একমাত্র নামকরণ করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন। হিন্দু কিন্তু তাঁহার নানা ভাবের নানাপ্রকার নামকরণ করিয়াছে। যিনি নিজে অনন্ত; তাঁহার গুণও অনন্ত, ভাবও অনন্ত; সুতরাং হিন্দুর নিকট তাঁহার নামও অনন্ত। হিন্দু যে মূর্ত্তি কল্পনা করে, তাহা ভগবানের মূর্ত্তি নহে, ভগবানের ভাবের মূর্ত্তি। নিরাকার ভাবকে

আকার প্রদান করাই হিন্দুর মূর্ত্তি-কল্পনার সার্থকতা। যে হিন্দু রাগ-রাগিণীর মূর্ত্তি-কল্পনা করিয়াছে, মানবের মনোবৃত্তির মূর্ত্তি-কল্পনা করিয়াছে, ঋতু পরিবর্ত্তনাদি নৈসর্গিক শোভার মূর্ত্তি-কল্পনা করিয়াছে, সেই হিন্দুই উপাসকের হিতার্থে উপাসনার পন্থা সুগমতর করিবার জন্যই, নিরাকার ব্রহ্মের ভাব-সমূহের মূর্ত্তি-কল্পনা করিয়াছে। তাই এই কল্পিত মূর্ত্তি সর্ব্বত্রই এক নহে—সকল মূর্ত্তিই এক নহে। সৃষ্টি-তত্ত্বের যে ভাব, তা'র মূর্ত্তি একরূপ; স্থিতিতত্ত্বের যে ভাব, তা'র মূর্ত্তি অন্যরূপ; আবার লয়তত্ত্বের যে ভাব, তা'র মূর্ত্তিও ভিন্নরূপ! ভগবানের বিদ্যা বা জ্ঞানের মূর্ত্তি একরূপ, ঐশ্বর্য্যের মূর্ত্তি অন্যরূপ! তিনি অনন্ত রূপের অনন্ত সাগর, এই সকল কল্পিত মূর্ত্তি সেই রূপ-সাগরের এক একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বুদ্‌বুদ মাত্র।

ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণ অন্ধ বিশ্বাসের কুসংস্কারবশে এই যুক্তিপূর্ণ সত্যের ধারণা করিতে পারেন না। পারিলেও আত্মমত অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এই সত্য স্বীকার করিতে চাহেন না। সে জন্য হিন্দুর ক্ষতি-বৃদ্ধি কিছু নাই। হিন্দু জানে এবং মানে, তাহার সনাতন সত্য ধর্ম্ম এই সকল বিশেষত্বেই জগতের মধ্যে গৌরবান্বিত।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কামিনী কটাক্ষ।

মদনকে ভস্ম ক'রে সে রুদ্র মহেশ।
বাড়াইল ধরাতলে দুঃখ-তাপ-ক্লেশ॥
দেহ ছিল—ছিল ভাল—হইয়া অনঙ্গ।
উড়ে এসে জুড়ে ব'সে করে কত রঙ্গ॥
আমি যেন আমি নই—তিনি যেন সব।
মনে জনমায় কাম—নাম মনোভব॥
ভাল হ'ত মদনে না দহি বিরূপাক্ষ।
যদ্যপি করিত ভস্ম কামিনী-কটাক্ষ॥

শ্রীদেবকণ্ঠ বাগ্‌চী।

সংস্কৃত-শিক্ষা।

বিলাস-লালসা-পরিপূরিত বিংশ শতাব্দীতে সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। এই শাস্ত্রের,—এই পবিত্র দেব-ভাষার আলোচনা করিতে হইলে, মানস-রাজ্যে আর্য্য-ভাবের সুপ্রতিষ্ঠা আবশ্যক। অনার্য্য-ভাবের বিন্দুমাত্রও ছায়া-পাত হইলে,—ভোগ-লালসা সামান্য রূপেও মানস-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, এ ভাষার চর্চ্চা হইতে পারে না। কঠোর-অধ্যবসায়, সম্যক্ কষ্ট-সহিষ্ণুতা, প্রবল ভোগ-বিতৃষ্ণা প্রভৃতি এ ভাষানুশীলনে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। দুঃখের বিষয়, এ যুগে অনেকেই প্রাগুক্ত-গুণনিচয়ের সম্যগধিকারী না হইলেও, অধ্যয়ন-ব্যয়-সংকুলনের ব্যবস্থাভাবে, অথবা কৌলিক-ব্যবসায়-রক্ষার্থ বাধ্য হইয়া সংস্কৃত চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। কাজেই, তাঁহারা আশানুরূপ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিতে পারেন না।

চতুর্দ্দিকস্থ সর্ব্ববিধ বিষয়, সর্ব্বদা আমাদিগকে ভোগ-মার্গে প্রধাবিত করিতে চাহিতেছে। বৈদিক-যুগের ঋষিগণের অবলম্বিত পথে,—তাঁহাদেরই আদর্শে একটী রমণীয় নিবিড় স্থানে অধ্যয়ন-ভবন প্রতিষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাহাতে ভোগ-লালসা সহজে হ্রাস প্রাপ্ত হওয়ার আশা করা যাইতে পারে। নতুবা, এই বিলাস-তরঙ্গে ভাসমান থাকিয়া, স্বয়ং তাহাতে বিতৃষ্ণ থাকা নিতান্ত সহজ-সাধ্য নহে।

আরামোপভোগার্থ সুকোমল গদি বিশিষ্ট কাষ্ঠাসন (চেয়ার), বিচিত্রা-বরণযুক্ত টেবিল, নয়ন-রঞ্জন কারুকার্য্যসমন্বিত কাচ-ময় আলোকাধার ও স্বর্ণাক্ষরাঙ্কিত, নানাবর্ণে সুরঞ্জিত, মূল্যবান্ কাগজে মুদ্রিত পুস্তক-রাজি সতত আশে-পাশে চক্ষু যুগলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে,—কোথাও বা তাহা সংস্কৃত-শিক্ষার্থীর পূর্ব্বতন-সহপাঠিগণের সবিলাস-অধ্যয়নের সামগ্রী হইয়াছে,—সহপাঠিগণও আবার চক্ষুর দোষাভাবেও সুবর্ণ-'ফ্রেম'-মণ্ডিত চস্‌মায় ভূষিত ও 'হ্যাট্ কোট-পরিহিত হইয়াছেন। আর সংস্কৃত-শিক্ষার্থীর জন্য ব্যবস্থা রহিয়াছে কি,—কুশ-নির্ম্মিত আসন, মৃণ্ময়-প্রদীপ ও হরিতালাদি লিপ্ত-'তোলট' কাগজে হস্তলিখিত পুরাতন পুস্তক; আর, সজ্জার মধ্যে উত্তরীয়ক। সংস্কৃতাধ্যায়ী স্বকীয় অবস্থার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, প্রাক্তন-সহপাঠী ও স্বীয় পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করতঃ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন!

বিলাস-ভোগের সুবিধাভাবে নিজের প্রতি,—এমন কি সংস্কৃত-শিক্ষার প্রতি, শ্রদ্ধাহীন হইয়া উঠিলেন! অবশ্য, ইহা হৃদয়ের দুর্ব্বলতা ব্যতীত কিছুই নহে। এ যুগে ঈদৃশ দুর্ব্বলতার কবল হইতে পরিমুক্ত হওয়া, অনেকের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। অনাকাঙ্ক্ষারূপ দৃঢ়-নৌকা না থাকিলে, এই তরঙ্গে নিমজ্জিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

এই বিলাস-ব্যসনে আকৃষ্ট না হইয়া, তৎপ্রতি সঘৃণ হওতঃ পূত-চরিত্র আর্য্যগণের চরমোদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া, পবিত্র-ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে যতটুকু মানসিক বলের আবশ্যক, দুর্ভাগ্য বশতঃ বর্ত্তমানে তাহা অধিকাংশ সংস্কৃত শিক্ষার্থীর মধ্যেই বিরল। ঈদৃশ প্রতিকূলাবস্থায় কেমন করিয়া উন্নতি-মার্গে অগ্রসর হওয়া সম্ভাবিত হইতে পারে? তাই বলিতেছিলাম, সংস্কৃত শাস্ত্রে শিক্ষালাভ করিতে হইলে প্রথমতঃ ভোগ-লালসা-পরিশূন্য হওয়ার নিতান্ত প্রয়োজন। নতুবা উন্নতির আশা সুদূর-পরাহত।

সংস্কৃত-শাস্ত্র ভোগবিলাসের অনুকূল নহে,—ইহা, ত্যাগী ও সংযমী হওয়ার উপদেশক; এ শিক্ষার পরিণামে বিলাস-বাহুল্য নাই,—বিলাসকে বিষবৎ পরিত্যাগ করাই এ শাস্ত্রের মূল মন্ত্র; সুপবিত্র নিরাকাঙ্ক্ষ জীবনই এ শাস্ত্রের চরম লক্ষ্য। যিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া প্রথম হইতেই বিপথে চলিবেন, তাঁহার প্রকৃত-শিক্ষা হইবে কেমনে? তিনি উভয়ের সংমিশ্রণে একটী 'বাবু পণ্ডিত' সাজিতে পারেন বটে, কিন্তু অর্থার্জ্জনেরও তেমন অনুকূল নহে, 'বাবুত্বে'রও সাহায্যকারিণী নয়, এমন শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া তাঁহাকে শুধু চির-অশান্তি ভোগ করিতে হইবে না কি? উদ্দেশ্য-ভ্রান্ত জনের শান্তি কোথায়?

শ্রীমুরারিমোহন ব্যাকরণতীর্থ।

সাধক-কাহিনী।

শাস্ত্রমতে বুদ্ধদেব শ্রীভগবানের নবম অবতার।

"ততঃ কলৌ সংপ্রবৃত্তে
সংমোহায় সুরদ্বিষাম্।
বুদ্ধো নাম্নাঞ্জনসুতঃ
কীকটেষু ভবিষ্যতি ॥"

শ্রীভগবানের এই অবতারের উদ্দেশ্য—

বুদ্ধ।

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতম্।
কেশবধৃত বুদ্ধশরীর
জয় জগদীশ হরে ॥"

জয়দেব।

বিষ্ণুপুরাণের মতে, অযোধ্যাধিপতি নরপতি সুজাতের পাঁচ পুত্র ও পাঁচ কন্যা হয়। তদ্ব্যতীত প্রধানা মহিষীর জেন্তি নাম্নী সখীর গর্ভে তাঁহার একটি পুত্র হয়। জেন্তির কৌশলে রাজা সুজাত জেন্তির পুত্র জেন্তকেই সিংহাসন প্রদান করেন।

সুজাতের পাঁচ পুত্র ও পাঁচ কন্যা অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। অনেক প্রজাও তাঁহাদের সমভিব্যাহারে গমন করেন।

ঐ পাঁচপুত্রের নাম—ওপুর, নিপুর, করকুণ্ডক, উল্কামুখ এবং হস্তিশীর্ষক। পাঁচ কন্যার নাম—শুদ্ধা, বিমলা, বিজিতা, জলা ও জলী।

সুজাত রাজার নির্ব্বাসিত ঐ পুত্র-কন্যাগণ বহুলোক সমভিব্যাহারে লইয়া হিমালয়ের উৎসঙ্গ প্রদেশে কপিল মুনির আশ্রম-সান্নিধ্যে মুনির আজ্ঞাক্রমে বাস করিতে লাগিলেন। এই কপিল সগরবংশধ্বংসকারী বা সাংখ্য-বক্তা নহেন। ক্রমে সেই স্থান একটি নগরে পরিণত হইয়া উঠিল। তখন সুজাত-পুত্রেরা উহাকে মহানগরীরূপে নির্ম্মাণ করিয়া কপিলা-বস্তু নাম প্রদান করিলেন। কপিলমুনির আশ্রম-সান্নিধ্য বলিয়াই বোধ হয়, ঐ নামকরণ করা হইয়াছিল। ক্রমে সেই নগরী জনসঙ্ঘে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম্ম ও বাণিজ্য ব্যাপারে সে স্থান সমগ্র ভারতে দর্শনীয় হইয়া পড়িল।

উত্তর সীমা হিমালয় পর্ব্বত, পূর্ব্ব সীমা সিকিম প্রদেশ, দক্ষিণ সীমা বঙ্গ, বিহার ও অযোধ্যা এবং পশ্চিম সীমা দিল্লী ও কিউমাউন দেশ। এই চতুঃ-সীমান্তর্গত নেপালরাজ্যমধ্যে কপিল-বস্তু নগর অবস্থিত। কপিল বস্তুর বর্ত্তমান নাম—কোহালা।

নগর সংস্থাপিত হইলে, জ্যেষ্ঠ ওপুর তথাকার রাজা হইলেন। ওপুরের পরে নিপুর, করকুণ্ডক, উল্কামুখ, হস্তিশীর্ষক প্রভৃতি রাজা হন। তদনন্তর সিংহহনু রাজ্যলাভ করেন। সিংহহনুর চারিপুত্র—শুদ্ধোদন, ধৌতদন, শুভোদন ও অমৌতদন। কন্যার নাম অমিতা। সিংহহনুর মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ শুদ্ধোদন সিংহাসন প্রাপ্ত হন। এই শুদ্ধোদন রাজার ঔরসে কোল-বংশীয়া তদীয়া প্রধানা ভার্য্যা মায়াদেবীর গর্ভে ভগবান্ বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন।

রাজা শুদ্ধোদনের পাঁচটী ভার্য্যা ছিল, তন্মধ্যে তিনি সর্ব্বগুণান্বিতা ভগবদ্ভক্তিপরায়ণা কর্ত্তব্যপরায়ণা সংযতেন্দ্রিয়া মায়াদেবীকেই সমধিক ভাল বাসিতেন। এই পাঁচ মহিষীসত্ত্বেও রাজা নিঃসন্তান ছিলেন। পুত্র হইতে পুন্নাম নরক ত্রাণ হয়, তাঁহার পুত্র হইল না, অতএব পুন্নাম ত্রাণের কোন উপায় নাই ভাবিয়া, রাজা শুদ্ধোদন সর্ব্বদাই বিষণ্ন থাকিতেন। স্বামীর বিষাদে মায়াদেবীও বিষণ্না ছিলেন।

একদা নিশীথে নিদ্রিতাবস্থায় মায়াদেবী স্বপ্ন দেখিলেন,—এক শ্বেতহস্তী শ্বেত পদ্ম শুণ্ডে ধারণ করিয়া, অতি ধীরে ধীরে তদীয় উদরমধ্যে প্রবেশ করিল। রাণীর নিদ্রাভঙ্গ হইলে স্বপ্নবৃত্তান্ত রাজাকে বলিলেন।

মহারাজ শুদ্ধোদন পরদিবস জ্যোতির্ব্বিদগণকে স্বপ্ন বৃত্তান্ত অবগত করাইয়া, ফলাফল নির্ণয় করিতে বলিলেন। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বলিলেন,—"মহারাজ! এক মহাপুরুষ মহিষীর গর্ভে আবির্ভূত হইলেন।" অপুত্রক রাজা পুত্র সম্ভাবনা বুঝিয়া পুলকিত হইলেন। স্বপ্নফল শ্রবণে রাণীও হর্ষান্বিতা হইয়া শ্রীভগবানের স্তব-স্তুতি করিলেন।

যথাসময়ে রাণী পূর্ণগর্ভা হইলেন। এই সময় তাঁহার ইচ্ছা হইল, পিত্রালয়ে গিয়া প্রসব করিবেন। রাজা স্ত্রীর প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্য ধাত্রী ও লোকজন সঙ্গে দিয়া তদীয় পিত্রালয়ে প্রেরণ করিলেন।

লুম্বিনী নামক উপবনের পার্শ্বদেশ দিয়া যখন রাণী মায়াদেবীর রথ গমন করিতেছিল, সেই সময় তাঁহার প্রসব বেদনা উপস্থিত হয়। রাণী রথ হইতে অবতরণ করিয়া পুষ্পতরুমূলে গমন করেন, এবং তথায় এক পুত্র প্রসব করেন।

সে-দিন বসন্তকালের পূর্ণিমা তিথি। তখনই কপিলা-বস্তুতে লোক সংবাদ লইয়া গেল। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া রাজা অতি সমাদরে ও সমারোহে নবজাত পুত্র ও নবপ্রসূতা পত্নীকে স্ব-ভবনে লইয়া গেলেন।

এই নবজাত শিশুই ভগবান বুদ্ধদেব। যীশু খ্রীষ্ট জন্মিবার প্রায় ৬২৩ বৎসর পূর্ব্বে ইঁহার জন্ম হয়।

মহারাজা শুদ্ধোদন পুত্রের জাতকর্ম্ম মহাসমারোহে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এবং পুত্রের নাম সর্ব্বার্থসিদ্ধ রাখিয়াছিলেন।

সর্ব্বার্থসিদ্ধ দিন দিন শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। দিন দিন তাঁহার দৈবী প্রতিভা পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং তাঁহার প্রগাঢ় চিন্তাশক্তির পরিচয় পাইয়া, সকলে স্তম্ভিত হইতে লাগিল। তিনি অপরাপর বালকের ন্যায় ক্রীড়া-কৌতুকে আসক্ত থাকিতেন না। ঈশ্বর চিন্তা আর জীবের পারলৌকিক মঙ্গল কামনার জন্যই তাঁহার সমস্ত সময় অতিবাহিত হইত। সময়ে সময়ে তিনি ঈশ্বর চিন্তায় এতদূর নিমগ্ন হইয়া পড়িতেন যে, কেহ ডাকিয়াও তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ করিতে সক্ষম হইত না।

ক্রমে যৌবন কাল উপস্থিত হইল। বুদ্ধদেবের পিতা পুত্রের বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হইলেন, কিন্তু পুত্রের ধর্ম্মভাব দেখিয়া, বিবাহে তাঁহার মতামত লওয়া প্রয়োজন-জ্ঞান করিয়া, প্রধান অমাত্যকে নিযুক্ত করিলেন।

বুদ্ধ অমাত্য কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া সপ্তাহ সময় লইলেন। তারপরে ছয় দিবস ধরিয়া বিবাহ করা কর্ত্তব্য কি না, তদ্বিষয়ে আন্দোলন করিলেন। পরে স্থির করিলেন,—সর্ব্ব ধর্ম্ম অপেক্ষা গার্হস্থ্য ধর্ম্মই সুখকর ও শ্রেয়ঃ। জগতে ধর্ম্মপ্রচার করিতে হইলে, গৃহস্থগণের যাহা শ্রেয়ঃ, তাহারই আদর্শ হইতে হয়। বনবাসী বা সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম সহজ। সপ্তম দিবসে অমাত্যকে বলিলেন,—"হাঁ, বিবাহ করিব। তবে জাতিভেদ করিবার প্রয়োজন নাই। যে কোন জাতির কন্যাই হউক, ধর্ম্মে, কর্ম্মে ও জ্ঞানে শ্রেষ্ঠা কন্যাই আমার গ্রহণীয়।"

তৎপরে নির্ব্বাচিতা দণ্ডপাণি শাক্যের তনয়া গোপার সহিত বুদ্ধের বিবাহ হয়। বুদ্ধের তখনকার নাম সিদ্ধার্থ।

ইহার কিছু দিবস পরে সিদ্ধার্থ একদিন ভ্রমণার্থ প্রমোদ কাননে যাইতেছিলেন,--পথে কতকগুলি জরাগ্রস্ত, মৃত ও মুমূর্ষু ব্যক্তিকে দেখিতে পান। তাহাদিগকে দেখিয়া তাঁহার করুণ প্রাণে এই তত্ত্বের উদয় হয় যে, কি দিয়া জীবের এ সকল জ্বালা জুড়ান যায়। সেই দিন হইতে তিনি ঐ চিন্তাতেই ব্যাপৃত ছিলেন। তারপরে স্থির করিলেন,—জ্ঞান ব্যতীত জীবের জ্বালা যাইবার নহে। অতএব জ্ঞানালোক দানে জীবের জ্বালা জুড়াইতে হইবে। জ্ঞান বিতরণের জন্য আমি আত্মবলি দিব।

তখন তাঁহার বয়স ঊনত্রিংশ বর্ষ মাত্র। এই সময়ে তাঁহার একটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল।

পুত্র জন্মিবার সপ্তম নিশিতে পিতাকে অনেক প্রকারে বুঝাইয়া, তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করতঃ, সিদ্ধার্থ ছন্দক নামক এক ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া গৃহত্যাগ করেন।

প্রভাতকালে তাঁহারা অনোমা নদীতটে উপস্থিত হন, এবং সেই স্থানে অঙ্গ হইতে রাজভূষণ খুলিয়া, ছন্দককে দান করেন ও তাহাকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে উপদেশ দিয়া, নিজে গৈরিক বস্ত্র পরিধান করতঃ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

সন্ন্যাসিবেশে অনেক দেশ পরিভ্রমণ করিয়া সিদ্ধার্থ বৈশালী নগরে উপস্থিত হন, এবং তথায় অড়ার পণ্ডিতের নিকট হিন্দু-শাস্ত্র-গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করেন। তদনন্তর রাজগৃহে রুদ্রক নামক এক যোগীর নিকট যোগ-সাধন প্রণালী শিক্ষা করেন। রাজগৃহ মগধের রাজধানী,—এই সময় তথায় বিম্বসার রাজত্ব করিতেছিলেন।

যোগ শিক্ষা করিয়া সিদ্ধার্থ নৈরঞ্জন নদীতীরে সাধন আরম্ভ করিলেন। যৎসামান্য তিল বা তণ্ডুল আহার করিয়া, শীত-বাত-আতপ সহ্য করিয়া ছয় বৎসর কাল উগ্র তপস্যা করেন। এই তপস্যার ফলে তাঁহার অজ্ঞানতা দূর হয়, আত্মদর্শন লাভ হয়। তিনি 'বুদ্ধ' হন।

এইবার তাঁহার কার্য্য আসিল। জীবকে জ্ঞানালোক দেখাইয়া, সংসার তাপ হইতে মুক্ত করাই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য। তদর্থে তিনি অনেকগুলি শিষ্য সংগ্রহ করেন। রাজা বিম্বসার প্রভৃতি ভারতীয় রাজন্যবর্গও তাঁহার জ্ঞানালোকে মুগ্ধ হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। বুদ্ধ ধর্ম্মের মূল কথা—অহিংসা, সদ্বাক্য প্রয়োগ করা, পরনিন্দা পরিহার করা, সদুপায়ে জীবিকা অর্জ্জন করা, সকলের সহিত সদ্ব্যবহার করা, আত্মজ্ঞান লাভ করা। বৌদ্ধধর্ম্মে জাতি-বিচার নাই। সকল বর্ণ—সকল ধর্ম্মী—সকল জাতি এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে।

বুদ্ধদেব অশীতি বৎসরকাল জীবিত ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, আসামের অন্তঃপাতী কুশী নগরে তাঁহার দেহ রক্ষা হয়; কেহ কেহ বলেন, বারাণসী ও পাটনার মধ্যবর্ত্তী গণ্ডক নদীতীরস্থ কুশী নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

বুদ্ধদেব বলিতেন—

সদিচ্ছা সতত হৃদয়ে রাখিয়ো।
সংযম জীবের শ্রেষ্ঠ সাধন।
অপ্রিয় বচন সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

স্ত্রী, পুত্র ও পিতামাতার অপ্রিয় আচরণ করা গৃহীর পক্ষে মহাপাতক।

পাপ কার্য্যকে মনেও স্থান দিতে নাই। মাদক দ্রব্য কখনও স্পর্শ করিতে নাই, সৎকার্য্যে অবহেলা করিতে নাই। একটু ত্রুটীতে ইহার বৃহৎ হইয়া দাঁড়ায়।

কষ্ট-সহিষ্ণুতা শিক্ষা না করিলে, প্রকৃত সুখের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না।

সুখ ও দুঃখে—নিন্দা ও সুখ্যাতিতে বিচলিত না হইয়া, কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হয়।

নিন্দুক সময়ে সময়ে অনেক উপকার করে। সে সমাজের কণ্টক নহে, তবে সে তাহার নিজের আত্মার কণ্টক নিজে।

একজন লোক যুদ্ধস্থলে হাজার লোককে জয় করিতে পারে, কিন্তু আত্মজয় করিতে খুব অল্প লোকেই পারে, যে পারে, সে-ই—বীর।

এ পাপ লঘু বলিয়া কখনও উপেক্ষা করিতে নাই। আগুণের একটু স্ফুলিঙ্গ মহানগরী বিদগ্ধ করিতে পারে।

ধর্ম্মশাস্ত্রের একটি কথাও লঙ্ঘন করিতে নাই। একটি লঙ্ঘন করিলে ক্রমে যে সকল গুলিই উপেক্ষা করা যাইবে না, তাহা কে বলিল!

অক্রোধ দ্বারা ক্রোধ জয় হয়। সাধুতার দ্বারা অসাধুতার জয় হয়। বিপরীত ভাবের দ্বারা সকলেরই জয় হয়।

প্রায় ২৫০৫ বৎসরেরও উপরে হইল, বুদ্ধদেব পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছেন,—এখনও তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম পৃথিবীর অধিকাংশ লোকে আচরণ করিতেছে।

আশা করা যায়, কালে বুদ্ধ ধর্ম্মই হিন্দু ব্যতীত পৃথিবীর অপর সকল ধর্ম্মী গ্রহণ করিবে। এখনই তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। ইয়োরোপের সর্ব্বত্র বৌদ্ধ ধর্ম্মের আলোচনা হইতেছে। জার্ম্মাণের জনৈক পণ্ডিত তাঁহার রচিত গ্রন্থে ভাব-ভঙ্গীতে প্রকাশ করিয়াছেন,—'এখন বিশেষভাবে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার করিলে এ দেশ রক্ষা পায়।' ইয়োরোপের অনেক মনীষীর নিকট বৌদ্ধ ধর্ম্মের সমাদর হইয়াছে ও হইতেছে। অনেক গোঁড়া খৃষ্টান সেই আলোচনার বিরুদ্ধে খৃষ্টধর্ম্মের বিবিধ ব্যাখ্যানে নিযুক্ত হইয়াছেন। বুঝি তাঁহাদের ভয় হইয়াছে,—বিশেষ চেষ্টা না করিলে, অতি অল্পদিনের মধ্যেই বৌদ্ধধর্ম্মের উজ্জ্বল আলোকে এদেশ ভাসিয়া যাইবে।

আমাদের বাড়ী।

সুখ-শান্তি-প্রেম-পূর্ণ নহে যক্ষপুরী
অলকা সুন্দর;—
মেঘ চুমা সেথা পড়ে নাক' বেতসের
তরঙ্গ উপর।
আছে হংসকুল, চরিতে জানে না তারা
মণিময় ঘাটে;
কুমুদ-কহ্লার-সাথে ফুটে সরোজিনী;—
—খালে বিলে মাঠে।
ফুটে না অশোক-গুচ্ছ রমণীর কম
বাম পদাঘাতে;

মুখ প্রক্ষালিত মদিরায় হাসে নাক'—
মহুয়া প্রভাতে।
করতালে নাচে নাক' পাপিয়া পিঞ্জরে—
ভুলাইতে ব্যথা ;
লতা কুঞ্জে গাহে বুঝি পিক পল্লী-মানবের
বিষাদের গাথা।
ম্যালেরিয়া প্রসবিনী বঙ্গভূমি মাঝে
ঘেরা নিরাশায়,—
গ্রামখানি শুয়ে আছে যেন বনলতা
তরু আগাছায়।
দক্ষিণে খেলে না বায়ু, পূর্ব্বে রবিকর
বাঁশ-বনে ঢাকা ;
ধন, ধান্য, স্বাস্থ্যহীন আছে কৃষকের—
সকরুণ ডাকা।
পশ্চিমে অশ্বত্থ আড়ে না জানায়ে কারো
সূর্য্য বসে পাটে ;
গোধূলি গেরুয়ারঙে ঢলে পড়ে সেই
পুকুরের ঘাটে।
অঙ্গনা পরে না আর কমনীয় ভালে
গুলপোকা টীপ ;
শব্দহীন, দীপ্তিহীন, সান্ধ্য-শুভ-শঙ্খ
সন্ধ্যার প্রদীপ।
এখনো কলসী কাঁকে সারি দিয়া সাঁজে
বধূ ঘাটে যায় ;—
মুখে হাসি নাই দীর্ঘশ্বাসে ফেরে ঘরে
শ্যামল সন্ধ্যায়।
আজো সেই ভাঙা 'নায়ে' পাটনী একেলা
গাঙে দেয় পাড়ি ;
এই বঙ্গপল্লী মাঝে সান্ত স্বর্গ-রূপে রাজে
আমাদের বাড়ী।

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।

বেলুন-বিহার।

সে কালে আমাদের দেশে বেলুনে মানুষ উড়িয়া থাকে, এ কথা শুনিলে সকলেই যারপর নাই বিস্ময়ান্বিত হইতেন। সে কালের লোকেরা মনে করিতেন যে, সময়ে সময়ে ফানুস উড়াইতে দেখিতে পাওয়া যায়, এ আবার কি! ফানুসে মানুষ উড়িতেছে! একেবারে শূন্যে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে! আবার ফানুস হইতে ছাতা ধরিয়া নিম্নে অবতরণ করিতেছে! এ সকল কথা তাঁহারা গল্প বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন। রামায়ণে পুষ্পক রথের কথা শুনা যায়, তাহাও এখন আমাদের দেশে হালি সভ্যতার গুণে গল্পে পরিণত হইয়াছে। আমাদের দেশের মত ইউরোপেও সে কালে সকলের এইরূপ ভ্রম ধারণা ছিল। যখন সুপ্রসিদ্ধ বেলুনবাজ ফরাসী দম্পতী ব্ল্যানচার্ড বেলুন যোগে পারি নগরী হইতে ইংলিশ চ্যানাল পার হইলেন, তখন হইতেই তখনকার লোকের মনে বেলুন বলিয়া একটী বস্তুর নাম ও তাহার সাহায্যে মানুষ আকাশে বিচরণ করিতে পারে, একথা বিশ্বাসের যোগ্য বলিয়া স্থান পাইল।

অধিক দিনের কথা বলিতেছি না, গত ২৪।২৫ বৎসরের মধ্যে যখন সুপ্রসিদ্ধ বেলুনবাজ স্পেনসার সাহেব কলিকাতায় গড়ের মাঠ হইতে বেলুনে উঠিয়া, শূন্যদেশ হইতে ছাতি ধরিয়া নিম্নে অবতরণ করিবেন বলিয়া, কলিকাতাবাসীকে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তখন কলিকাতাবাসী ইতর ভদ্র অনেকেই মহা আগ্রহে এই বিস্ময়কর দৃশ্য দেখিবার জন্য, উপর্য্যুপরি তিন দিন গড়ের মাঠে সমবেত হইয়াছিলেন। জনসমাগম এত অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহা প্রকাশ করা সুকঠিন। ইহা ভিন্ন ভিতরে প্রবেশের জন্য রাশি রাশি টিকিট পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়াছিল। এই হুজুগে ভাড়াটিয়া গাড়ীর গাড়োয়ানেরাও দুপয়সা বেশ কামাইয়াছিল। আমি শেষ দিনের গাড়ী ভাড়ার কথা বলিতেছি;—সেই দিন শোভাবাজার হইতে গড়ের মাঠের ভাড়া ১৫৲ টাকা পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছিল। তাহা ভিন্ন ট্রাম গাড়ীতে লোক বাদুড় ঝোলার মত ঝুলিয়া যাইতেও বাধ্য হইয়াছিল। উক্ত স্পেনসার সাহেব উপর্য্যুপরি দুই দিন বেলুনে উড়িতে অপারগ হইয়া, জনসাধারণের নিকট লজ্জায় ও ঘৃণায় ম্রিয়মাণ হইয়া, শেষে তৃতীয় দিবস সন্ধ্যাকালে

প্যারাস্যুট (ছাতি) ত্যাগ করিয়া শুধু বেলুন লইয়া শূন্যে উড়িলেন। তিন দিন কষ্টের পর ইহা দেখিয়াও লোকের বিস্ময়ের সীমা ছিল না। সাহেব কোথায় গেলেন, কোথায় পড়িলেন, কি হইল, দুইদিন যাবৎ কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। অতঃপর তৃতীয় দিবসে সংবাদ আসিল যে, তিনি চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতী বসির হাট নামক স্থানে বেলুন হইতে নিরাপদে অবতরণ করিয়াছিলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে উক্ত সাহেব পুনরায় কাশীপুরে রামলীলার মাঠ হইতে প্যারাস্যুট (ছাতি) সহ বেলুনে উড়িয়া আন্দাজ ২০০০।২৫০০ ফিট ঊর্দ্ধে বেলুন ত্যাগ করিয়া, যেরূপ সাহস ও কৌশলের সহিত প্যারাস্যুট (ছাতি) ধরিয়া, নিম্নে নিরাপদে অবতরণের দৃশ্য দেখাইয়াছিলেন, তাহা অদ্যাবধি সকলের মনে জাগরূক রহিয়াছে।

ইহার পর আরও একদিন তিনি গড়ের মাঠ হইতে R. C. Chatterjee ওরফে রামচন্দ্র বাবুকে সঙ্গে লইয়া বেলুনে উড়িয়াছিলেন। ইহার পর রামচন্দ্র বাবুও সাহেবের অনুকরণ করিয়া, বেলুনে উড়িয়া প্যারাস্যুট সাহায্যে নিম্নে নিরাপদে অবতরণ করতঃ, বাঙ্গালীর সাহসের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। ইহাদের পর মাঝে মাঝে বেলুনের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, সে গুলি তত উল্লেখ যোগ্য নহে। এইতো গেল বেলুনবাজ পুরুষের কথা; এইবার বেলুনবাজ স্ত্রীলোকের কথা পাঠকগণকে অবগত করাইব।

পূর্ব্বোক্ত ব্লানচার্ড দম্পতীর বেলুন বিহারের পর ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ৪৯ জন ইউরোপীয় রমণী ইংলণ্ড ও ফ্রান্স হইতে বেলুনে উড়িয়া ছিলেন।

এই সময়ে রমণীর বেলুন বিহার যেন রমণী-সমাজে একটা সখের ও ফ্যাসানের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। ইহা দেখিয়া জনৈক ফরাসী-লেখক বলিয়াছিলেন যে, ১৮১০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রমণীর বেলুন-বিহার ও প্যারাস্যুট সাহায্যে অবতরণ এত অধিক সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহাতে মনে হয় যে, পুরুষজাতি বোধ হয়, পুরুষত্ব ত্যাগ করিয়া, অমৃত বাবুর "তাজ্জব ব্যাপারের" মত অন্দরেই বাস করিবে; তাহার নিদর্শন কুমারী ক্ল্যাসারিয়ন যেরূপ অদ্ভুত কৃতিত্ব ও সাহসের বলে মৃদু বাতাসে বেলুন উড়াইয়া, প্যারাস্যুটের সাহায্যে নিম্নে অবতরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সমস্ত ইউরোপ একেবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিল।

বিজয়ার বিদায়।

অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, ম্যাডাম থিবল স্ত্রীজাতির মধ্যে ও জগতে প্রথম বেলুনবাজ রমণী। ইনি ফ্লুর‍্যাণ্ড সাহেবকে লইয়া লাইরন্স হইতে তৎকালীন সুইডেনের নরপতি ও অপরাপর দর্শক মণ্ডলীর সমক্ষে বেলুনে ৮৫০০ ফিট উর্দ্ধে উঠিয়াছিলেন। সেই সময়ে বায়ুর মৃদু গতিতে উর্দ্ধে প্রতি মাইল অতিক্রম করিতে ২২।।০ মিনিট করিয়া লাগিয়াছিল।

ইহার পর কিছুদিন পরে উক্ত ম্যাডাম থিবল বার্ণসউইকের ডিউককে লইয়া পুনরায় বেলুন বিহার করিয়াছিলেন। এইবারেও তিনি অদ্ভুত সাহসের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া ছিলেন।

ম্যাডাম ব্ল্যানচার্ড ম্যাডাম থিবল অপেক্ষা বেলুন বিহারে অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ১৮০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অনেকবার বেলুন বিহার করিয়াছিলেন ও শেষ বিহারেই দৈব দুর্ব্বিপাকে বেলুনেই মৃত্যুমুখে পতিতা হন। ইহার অদ্ভুত ও অসম-সাহসিক ব্যাপারে সকলেই অনুমান করেন যে, তিনি বেলুন বিহারের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়া, শেষে বেলুনেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া আপনার কার্য্য শেষ করেন। তাহার কারণ, (তিনিও একজন প্রসিদ্ধ বেলুনবাজের কন্যা ও বেলুন বিহারেই তিনি শান্তি ও আনন্দ পাইতেন।) তিনি নিজেই বলিয়া গিয়াছেন যে, আমি বেলুন বাজের কন্যা. পিতার কার্য্যের অনুকরণ করিয়াই আমি পৃথিবীতে প্রকৃত সুখী, ইহাতেই আমার শান্তি। বেলুনে উড়িবার জন্যই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি ও বেলুনেই আমার কার্য্য শেষ করিয়া, স্বর্গীয় পিতার নাম অক্ষয় ও অমর করিয়া যাইব।

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে মিষ্টার ভিন সাণ্টো লুনার্ডি তাঁহার প্রথম বেলুন বিহারে একটী বিড়ালী, একটী কুক্কুর ও একটী পারাবত লইয়া শূন্যমার্গে বিচরণ করতঃ, নিরাপদে সকলকে লইয়া নিম্নে অবতরণ করেন। ইহার পর পুনরায় ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি মিষ্টার বিগিল ও মিসেস সেজকে লইয়া বেলুন বিহার করেন। মিসেস সেজ,—ইনিই ইংরাজ রমণীর মধ্যে প্রথম বেলুন বিহার করেন। ইঁহাদের বেলুনের গতি ঘণ্টায় বিশ মাইল অতিক্রম করিয়াছিল।

কুমারী ষ্টক,—ইনিও রমণীর মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ বেলুন বাজ। ইঁহার এই কার্য্যের বিষাদমাখা কাহিনী শ্রবণ করিলে, অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। যখন মিষ্টার হারিস লণ্ডনের নিকটবর্ত্তী কোন পার্ক হইতে বেলুন বিবাহের জন্য প্রায় প্রস্তুত হইয়াছেন, এমন সময় কুমারী ষ্টক সেই স্থানে আসিয়া

তাঁহার সহিত বেলুন বিহারের জন্য নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। সেই সময়ে ইঁহার বয়স ১৮ বৎসর মাত্র। মিষ্টার হারিস তাঁহাকে লইয়া বেলুন-বিহারে প্রথমে একেবারেই অস্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু কুমারীর সবিশেষ অনুরোধে ও দর্শকমণ্ডলীর একমতে তিনি তাঁহাকে লইয়া তাঁহার রয়েল জর্জ্জকে শূন্যদেশে উড়াইলেন। হায়! দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাদের এ বিহার শুভ হইল না। রয়েল জর্জ্জ ৭ মিনিটের মধ্যে শূন্যে অদৃশ্য হইল। দুইদিন যাবৎ তাঁহাদের কোন সংবাদই পাওয়া গেল না, সুতরাং উভয়েরই পিতামাতা আত্মীয়স্বজন ও সুহৃদ্-মণ্ডলীর মধ্যে সকলেই উদ্বিগ্ন, চিন্তিত ও বিমর্ষভাব ধারণ করিলেন। নানা অনুসন্ধানের পর দুইদিন পরে হত-ভাগ্যদের নিশ্চল দেহ বেডিংটনের একস্থানে পাওয়া গেল।—তখন দেখা গেল যে, হতভাগ্য মিষ্টার হারিস মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন ও হতভাগিনী কুমারী ষ্টকের কেবল শ্বাস বহিতেছে, এই পর্য্যন্ত,—তাঁহারও মৃত্যুর সময় সন্নিকট, ইহা সকলেই বুঝিতে পারিলেন। যাহা হউক, উপযুক্ত সেবা ও শুশ্রূষায় কুমারী ষ্টক পুনর্জ্জীবন লাভ করিলেন। এই দুর্ঘটনার কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন যে, নিম্নে অবতরণকালে একটী বৃহৎ বৃক্ষের উপর রয়েল জর্জ্জ পতিত হইয়া উল্টাইয়া যায়, তাহার ফলে উভয়েই বেলুন হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন।

কুমারী ষ্টক এত আঘাত প্রাপ্ত হইয়াও বেলুনবাজী ভুলিলেন না। রয়েল জর্জ্জ হইতে পতিত হইবার পর শূন্যে বিচরণ করিতে তাঁহার আরও অধিক সাহস ও আগ্রহ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তিনি উপর্য্যুপরি অনেক বার বেলুনবিহারের পর শেষে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিতা হন। কুমারী ষ্টকের মত সাহস রমণী ও পুরুষের মধ্যে বেলুন বিহারে কেহ কখন দেখা-ইতে পারেন নাই।

ফরাসীদেশীয় জনৈক বিধবা যুবতী ম্যাডাম পল মাইয়ার গারনিয়ন বেলুন বিহারে এক সময় ইউরোপের সমস্ত সভ্যজাতিকে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন করিয়াছিলেন। ইনি ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের ক্রিমোর্ণ নামক স্থান হইতে বেলুনে উঠিয়া ডার্টফোর্ডএ অবতরণ করেন। শূন্যদেশে বেলুন ত্যাগ করিয়া যেরূপ সাহস ও কৌশলের সহিত প্যারাসুটের সাহায্যে, নিম্নে নিরাপদে অবতরণ করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনাতীত। ইনি যখন ডার্টফোর্ডে অবতরণ

করেন, তখন ঠিক সন্ধ্যার প্রাক্কাল! সেই সময়ে সেই পল্লীর কৃষকপত্নীদিগের বিস্ময়ের কথা তাঁহারই মুখ হইতে যাহা বিবৃত হইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

তিনি বলিয়াছেন যে,—যখন আমি প্যারাসুট ধরিয়া ডার্টফোর্ডে অবতরণ করি, তখন সন্ধ্যার কিছু বিলম্ব আছে, আমাকে শূন্য হইতে নামিতে দেখিয়া, দুইজন কৃষকপত্নী আমাকে দেবীজ্ঞানে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া গিয়া, তাহাদের আপন আপন স্বামীকে ডাকিয়া আনিয়া, আমার অবতরণের দৃশ্য উভয়কে দেখাইতে লাগিল; আমি তখন আন্দাজ প্রায় ১০০ ফিট উর্দ্ধে অবস্থিত। বায়ুর গতি মন্দ হওয়াতে আমাকে অতি সন্তর্পণে জীবনরক্ষার উপায় করতঃ নামিতে হইয়াছিল। আমি যতই তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম; তাহারা জানু পাতিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে "এস দেবী এস! তুমি আমাদের কুটীরে স্বর্গের আলোক প্রকাশ করিবে এস! আমরা বড় গরীব। তোমাকে পাইলে আর আমাদের কিছুরই অভাব থাকিবে না!" এইরূপ নানা কথায় সকলেই সমস্বরে আমার স্তুতিবাদ করিতে লাগিল। যদিও তখন বায়ুর গতি মন্দ ছিল, তথাপি আমি তাহাদের নিকটে অবতরণ করিতে পারিলাম না; তাহাদের গ্রাম ছাড়িয়া আমি অপর গ্রামে যাইয়া পড়িলাম। আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই কৃষক দম্পতী আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িয়া আসিয়া, সেই স্থানে উপস্থিত হইল ও করযোড়ে বিনীতভাবে বলিতে লাগিল, "দেবি! আমরা কি অপরাধ করিয়াছি যে, আমাদের ত্যাগ করিয়া হেথায় আসিলে? আমরা বড় গরীব! এস আমাদের কুটীরে এস! আমরা তোমাকে লইয়া যাইবার জন্য এতদুর আসিয়াছি—আমাদের নিরাশ করিও না!" তাহাদের এইরূপ কাতরোক্তিতে আমার হৃদয় গলিয়া গেল। তাহাদের সন্তোষ সাধনের নিমিত্ত আমি হাস্যমুখে তাহাদের কুটীরে যাইলাম। আমি অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছিলাম বলিয়া, তাহাদের নিকটে জল চাহিলাম, তাহারা অতি সত্বর জল আনিয়া আমার তৃষ্ণা নিবারণ করিল। বলিতে কি, তাহারা তখনও আমায় দেবী বলিয়া অনুমান করিতে লাগিল ও পরস্পরে বলিতে লাগিল,—"শূন্য হইতে কতদূরে আসিয়াছেন, তৃষ্ণা তো পাইবারই কথা!" আমি তখন তাহাদের এ অলীক ভ্রম ভাঙ্গিবার জন্য নানামতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম, কিন্তু আমার সকল চেষ্টাই বিফল হইল। তাহারা আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে সম্মত হইল না। তাহারা বলিল,—"আর কেন আমা-

দের ছলনা করিতেছ? আমরা বুঝিয়াছি, —তুমি দেবী। তোমার বাস স্বর্গে,—মানুষ যে স্বর্গ হইতে আসিতে পারে, ইহা কখন দেখি নাই বা শুনি নাই, তবে আমরা কি প্রকারে তোমার এ কথা বিশ্বাস করিব? যখন নিজগুণে দয়া করিয়া আসিয়াছ, তখন আমাদের ভুলাইয়া কোথাও যাইতে পারিতেছ না, আমরা আর তোমাকে ছাড়িব না। আমরা এখনই আমাদের গ্রামের ধর্ম্মযাজককে সংবাদ দিব, আমাদের গ্রামের ধর্ম্মমন্দিরে তুমি অবস্থান করিবে ও আমাদের গ্রামের কল্যাণ সাধন করিবে।" আমি তখন তাহাদের কথায় ও দৃঢ় বিশ্বাসে বড়ই বিপদে পড়িলাম। ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমি অতি কষ্টে ও কৌশলের সহিত তাহাদের আমার প্রতি এ অলীক ভ্রম ঘুচাইয়া দিয়া, তাহাদের কষ্টের লাঘবের জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব অঙ্গীকার করিয়া, তাহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

অঙ্গীকার মত আমি আমার আয়ের একচতুর্থাংশ প্রতিমাসেই তাহাদের সাহায্যের জন্য পাঠাইতে লাগিলাম! এই কার্য্যটি আমার কর্ত্তব্যের মধ্যে 'একটী' হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

আমার বেলুন যখন প্রথমে শূন্যমার্গে উঠিতে লাগিল, তখন তাহার গতি ঘণ্টায় ২৫ মাইল ছিল। আমি অনেকদূর উড়িয়া প্রথমে মনে করিলাম যে, এই স্থান হইতে প্যারাসুট ধরিয়া অবতরণ করা অতি দুরূহ, কারণ আমি যে স্থানে আসিয়াছি, সেইস্থানে বায়ুর গতি নিম্নদেশ অপেক্ষা বিশেষ মন্দ। কিছুক্ষণ পরে, বেলুন নিম্নে নামিতে লাগিল বলিয়া আমার অনুমান হইল ও পরে বুঝিলাম যে, বাস্তবিকই আমি নিম্নের দিকে ক্রমশঃই নামিতেছি। এই সুযোগে আমি তখন প্যারাসুটের সাহায্যে নিম্নে অবতরণ করিলাম। এই দয়াবতী বিধবা তাঁহার প্রতিবারের বেলুন বিহারের প্রসঙ্গ তিনি স্বয়ং পুস্তিকাকারে মুদ্রিত করিয়া, জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিয়া গিয়াছেন ও ঈশ্বরের কৃপায় প্রতিবারেই কোন না কোন সুস্থ পরিবারের সাহায্যের উপলক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

মিসেস গ্রেহামের মত বেলুনবাজীতে জীবন সঙ্কটাপন্ন করিতে, এমন কোন বেলুনবাজ পুরুষ বা স্ত্রীলোককে দেখা যায় নাই। এই যুবতীর মত এত অমানুষিক ও অসমসাহসিক কার্য্যে অগ্রসর হইতে অন্য কাহাকেও দেখি না। ইনি জীবনের শেষ পর্য্যন্ত বোধ করি, দুই তিন বার নিরাপদে অবতরণ করিয়াছিলেন, তদ্ভিন্ন অবশিষ্ট যত বার উড়িয়াছিলেন, ততবারই

একটা না একটা আকস্মিক দৈবদুর্ব্বিপাকে পতিতা হইয়া, নিজ জীবন বিষম সঙ্কটাপন্ন করিয়াছেন।

এই যুবতীর স্বামী মিষ্টার গ্রেহাম,—তিনিও একজন প্রসিদ্ধ বেলুন বাজ। আকাশ-মার্গে বিচরণ করিয়া ঊর্দ্ধের শোভা সন্দর্শন করিয়া, মনকে পরিতৃপ্ত করাই তাহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে পরিচালিত ছিল। কালে এই যুবতী পতির এইরূপ মনোভাব দেখিয়া নিজেও বেলুন বিহারে অনুরাগিণী হইয়া, নিজ উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়া পতির পদানুসরণ করিতে যত্নবতী হইলেন। তিনি যখন সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার পতির নিকট আপন মনোভাব ব্যক্ত করিলেন, তখন মিষ্টার গ্রেহাম তাঁহার পত্নীর কথায় হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। মিসেস গ্রেহাম পতির নিকট এইরূপে হাস্যাস্পদ হইয়া আপনাকে বিশেষ অপমানিতা জ্ঞান করিলেন ও তখনই পতিকে বলিলেন, ভাল! আমার কথা যখন তুমি হাস্যে উড়াইয়া দিলে, আমি যদি তোমার প্রকৃত পত্নী হই, তা'হলে দেখিবে, আমি নিশ্চয়ই বেলুনে উড়িব ও তোমায় দেখাইব যে, আমি ক্রমে তোমার মত এ কার্য্যে প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারি কিনা—আমি এ কার্য্যে প্রাণ পণ করিলাম। আমার এ প্রতিজ্ঞা কখনও ভঙ্গ হইবে না, ইহা তুমি নিশ্চয় জানিবে। পত্নীর এইরূপ বাক্যে মিষ্টার গ্রেহাম কিছুক্ষণের জন্য নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন ও পরে আপন মনে কি ভাবিয়া পত্নীকে বলিলেন,—ভাল তুমি কল্যই আমার সহিত বেলুনে উড়িবে। যদি তোমার এ বিষয়ে বিশেষ সাহস ও ধীরতার লক্ষণ দেখিতে পাই, তবে তোমায় একাকিনী বেলুনে উড়িতে কোন মতে নিষেধ করিব না। তখন জানিব—তুমি আমার উপযুক্ত পত্নী!

পতির এইরূপ বাক্যে মিসেস গ্রেহাম যারপরনাই আনন্দিতা হইয়া পতির সহিত নির্দ্দিষ্ট দিনে বেলুনে উড়িবার সমস্ত আয়োজন করিলেন। বেলুন ঠিক সময়ে দম্পতীসহ শূন্যে উড়িল! বেলুনটী এত অধিক ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিল যে, তাঁহাদের উভয়েরই শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইল, দারুণ শীতে সর্ব্বশরীর বরফের মত হইয়া গেল, খাদ্য দ্রব্য সকল ক্রমে জমিয়া যাইতে লাগিল, তাহা দেখিয়া মিষ্টার গ্রেহাম অতিশয় শঙ্কিত হইলেন ও মিসেস গ্রেহামের প্রতি ঘন ঘন সতর্ক কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন। পতির এরূপ ভাব দেখিয়া মিসেস গ্রেহাম হাস্যপ্রফুল্লিত বদনে বলিতে লাগিলেন,—স্বামিন্! তুমি বোধ হয় ভয় পাইয়াছ। আমি তো ভয়ের কোনই কারণ দেখিতেছি

না। আমি রমণী! আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ে যখন কোন ভয় বা ভাবনার লেশ মাত্রও নাই, তখন তুমি স্বভাবের দাস হইয়া এত ভয় করিতেছ কেন? আমার জন্য কিম্বা আমাকে লইয়া যদি তোমার ভয় হইয়া থাকে, আমিই যদি তোমার এই ভয়ের কারণ হইয়া থাকি, তবে এ ভয় তুমি মন হইতে শীঘ্রই দূর কর। আমি বেশ সুখে আছি! স্বভাবের শোভা দেখিতে দেখিতে আমার মন আনন্দ-সাগরে ভাসিতেছে! তোমার যদি ভয় হইয়া থাকে, তবে এস! আমার কর স্পর্শ কর! আমার কর স্পর্শে এখনই ভয় তোমায় ত্যাগ করিবে। পত্নীর এইরূপ আশ্বাসবাক্যে মিষ্টার গ্রেহাম যেন নবজীবন লাভ করিলেন। সেই সময়ে আর তিনি তত উর্দ্ধে শীত, গ্রীষ্ম বা অন্য কোন প্রাকৃতিক উৎপীড়ন কিছুই অনুভব করিতে পারিলেন না; তিনি যেন হৃদয়ে নব বল সঞ্চয় করিলেন। তখন তিনি বলিলেন,—প্রিয়ে! আমায় ক্ষমা কর; আমি সামান্যা রমণী ভ্রমে সেদিন তোমায় নিরাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম; আমি আপনাকেই অসম সাহসী মনে করিতাম, কিন্তু এখন দেখিতেছি, আমার সে গর্ব্ব খর্ব্ব হইল; আমি এতদিন মহাভ্রমে পতিত হইয়াছিলাম, আজ ঈশ্বরের কৃপায় আমার সে ভ্রম ঘুচিয়া গেল। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, তুমি বেলুন বিহারে আমাকেও পরাজয় করিয়া আপনাকে অক্ষয় অমর করিবে! তোমার কীর্ত্তিতে আমিও আমাকে ধন্য জ্ঞান করিব। এইরূপ আলাপনে উভয়েই প্রাকৃতিক সকল উৎপীড়ন একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ক্রমে বেলুন নিম্নে নামিতে আরম্ভ করিল. ইহা দেখিয়া তাঁহাদের আর আনন্দের সীমা রহিল না। ঈশ্বরের কৃপায় তাঁহারা নিরাপদে এসেক্সের চাকফিল্ড নামক স্থানে বেলুন হইতে অবতরণ করিলেন।

ইহার পর মিসেস গ্রেহাম অনেকবার একাকিনী বেলুনে উড়িয়াছিলেন; সময়ে সময়ে কখন কখন সঙ্গিনীসহ উড়িতেন। দুঃখের বিষয়, ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্না ছিলেন না। তিনি বেলুনে উঠিয়া অনেক সময় এরূপ মহা বিপদে পড়িয়াছিলেন যে, যাহাতে তাঁহার জীবন সংশয় হইবারই কথা।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা উভয়ে পুনরায় বেলুনে উড়িলেন। এবার বেলুন তত অধিক উর্দ্ধেও উঠে নাই, ৫০ ফিট মাত্র উর্দ্ধে উঠিয়া, বেলুনের গতিরোধ হইল। উভয়েই প্রমাদ গণিলেন! দুর্ভাগ্য বশতঃ সেই সময়ে বেলুনের

প্রধান রজ্জুটী ছিড়িয়া যাওয়াতে বেলুনটী কাৎ হইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে তখনই বেলুনে আগুন ধরিয়া গেল! আর রক্ষা নাই! এইবার উভয়কেই মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত হইতে হইবে;—এই ভাবিয়া তাঁহারা কাতরে ঈশ্বরকে ডাকিতে ডাকিতে চেতনা রহিত হইলেন! পরদিন প্রাতঃকালে দেখা গেল, তাঁহারা উভয়েই অজ্ঞান অবস্থায় একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণীতে ভাসিতেছেন। সৌভাগ্যক্রমে বেলুনের বসিবার অংশটী নৌকারূপ ধারণ করিয়া এ যাত্রা উভয়েরই প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল।

এইরূপ বিপদে পতিত হইয়াও তাঁহারা উভয়েই বেলুনে উঠিবার আশা ত্যাগ করেন নাই। পুনরায় সাহসের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা নূতন বেলুনে উড়িলেন। এইবারেও অধিকদূর উঠিতে না উঠিতে নিকটবর্ত্তী কোন কারখানার উচ্চ চিমনীতে বেলুনটী বাধা প্রাপ্ত হইয়া, সবেগে নিম্নতলে একটী ছাদের উপর পতিত হইল! এইবারেও উভয়কেই গুরুতর আঘাত পাইতে হইয়াছিল ও উভয়েই সে দারুণ আঘাতে জ্ঞানহারা হইয়াছিলেন।

পুনরায় তাঁহারা ডিভন সারারে বেলুনে উঠিয়া উভয়েই মৃত্যুমুখ হইতে আশ্চর্য্য রক্ষা পাইয়াছিলেন। তাঁহারা সমুদ্র গর্ভে পতিত হইয়া উভয়েই হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন। বেলুনটীও জলে পড়িয়া ফাঁসিয়া গেল; যদিও পূর্ব্ব হইতেই তাঁহারা সমুদ্র দেখিয়া আপনাপন প্রাণ রক্ষার্থ বেলুনেই কর্ক্‌চেণ্ট বাধিয়াছিলেন; তাহাতে কি হইবে, সমুদ্রের তরঙ্গে এক একবার তাঁহাদের উভয়কেই অগাধ জলে লইয়া যাইতেছে! এই ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া, জাহাজ হইতে অনেক নাবিক জলি বোট লইয়া জলে অবতরণ করিল ও বহুকষ্টে উভয়কেই জল হইতে উত্তোলন করিয়া এ যাত্রাও তাঁহাদের প্রাণ বাঁচাইল। সৌভাগ্য বশতঃ ঐ স্থানটীতে পোতাশ্রয় ছিল বলিয়া, এবারেও তাঁহারা পুনর্জ্জীবন লাভ করিলেন।

ইহার পর শেষবারে উভয়ে বেলুনে উঠিয়া, অতি অল্প সময়ের মধ্যে এত ঊর্দ্ধে উঠিয়া যাইলেন যে, ইহা দেখিয়া সমবেত দর্শকমণ্ডলী ভয়ে ও বিস্ময়ে তাঁহাদের বিপদের আশঙ্কা করিয়া, সকলেই একপ্রাণে ঈশ্বরের নিকট উভয়ের মঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন, হায়, তাঁহারা কোথায়! তাঁহাদের অবতরণের কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না! তাঁহাদের কি হইল, ঈশ্বর তাঁহাদের অদৃষ্টে কি লিখিয়াছিলেন, কেহই ঠিক করিতে পারিলেন না! তাঁহারা কোথায় গেল, কি হইল, আর কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না।

প্রসিদ্ধ বেলুন বাজ ম্যাডাম পইটিভিনের কথা এখানে উল্লেখ করা অতি আবশ্যক। ইনিও একজন ফরাসী রমণী। ইহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, ইউরোপীয় অন্য কোন দেশের রমণী অপেক্ষা ফরাসী বেলুন বাজ রমণীর সংখ্যাই অধিক। উক্ত ম্যাডাম পইটিভিন এত উচ্চ হইতে বেলুন ত্যাগ করিয়া প্যারাসুট ধরিয়া নিম্নে অবতরণ করিতেন, তাহা লেখনীতে বর্ণনা করা যায় না। এই বীররমণী ফ্রাঙ্কো প্রুসিয়ান যুদ্ধে উর্দ্ধে বেলুন হইতে শত্রুর গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণের জন্য ফরাসী গভর্ণমেণ্ট হইতে নিয়োজিতা হইয়া, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অধ্যবসায়ের সাহায্যে নানা কষ্ট সহ্য করিয়া, যুদ্ধ-শেষে ফরাসী সৈনিক বিভাগ হইতে এতদূর সম্মান ও সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন,—বোধ করি, কোন উচ্চপদস্থ কর্ম্মবীরের ভাগ্যেও কখন এরূপ ঘটে নাই। ম্যাডাম পইটিভিন রমণী হইয়া, স্বদেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, শূন্যে কখনও বা খাদ্যাভাবে, কখনও বা দৈব-দুর্ব্বিপাকে, কখনও শত্রুর অব্যর্থ সন্ধানে কত দিন কত কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন! আপন জীবনের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, স্বদেশের জন্য—স্বদেশবাসীর জন্য বীররমণী প্রকৃত বীরের মত কার্য্যই করিয়াছিলেন! ইহার অসম সাহস, কষ্টসহিষ্ণুতা ও কার্য্যগুণে মুগ্ধ হইয়া কোন বিশিষ্ট উচ্চপদস্থ মার্কিন সেনাপতি আজীবন তাঁহার যথেষ্ট সুখ্যাতি করিতেন, এমন কি সৈন্যদিগকে উত্তেজিত করিবার জন্য, উক্ত পইটিভিনের দৃষ্টান্ত সকলকে অনুকরণ করিতে বলিতেন। রমণীর ভাগ্যে ইহা অপেক্ষা অধিক সুখ আর কি হইতে পারে!

আরও একবার ম্যাডাম পইটিভিন উর্দ্ধ হইতে ভিসুভিয়স আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুদ্গম ও তৎকালীন অবস্থা দেখিবার জন্য কৌতুহলী হইয়া অমানুষিক সাহসের সহিত এন্নেপলস্ হইতে বেলুনে উড়িয়াছিলেন।

ইহার দুইদিন পূর্ব্ব হইতেই গিরিরাজ নিকটস্থ গ্রাম নগর শ্মশানে পরিণত করিবার মানসে, সর্ব্ববিধ্বংসী কালরূপে ভীমনাদে অগ্নি উদ্গীরণ করিতেছেন, ধরিত্রী তাহার এইরূপ ধ্বংসকারিণী মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া সভয়ে ঘন ঘন থর থর কাঁপিতেছেন, সাগরের জল উচ্ছ্বসিত হইতেছে, কোথাও বা গ্রাম নগর সাগর-গর্ভে নিমজ্জিত হইতেছে, কোথাও বা ধাতু-নিস্রবে গ্রাম প্লাবিত হইয়া একেবারে সকলেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে, কোথাও বা ভস্মস্তূপে জনপদ সমাক্রান্ত ও সমাচ্ছন্ন হওয়ায় সকলকেই জীবন্ত কবর মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইতেছে; এ হেন দুর্য্যোগে সকলেই

পইটিভিনকে এরূপ অসম-সাহসিক কার্য্যে নিষেধ করিতে লাগিলেন। কাহারও কথায় তিনি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ঈশ্বরের নাম লইয়া,সাহসে নির্ভর করতঃ বেলুন ছাড়িলেন। ঈশ্বরের কৃপায় তিনি অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই গিরিরাজকে নিম্নে রাখিয়া, আরও অধিক উর্দ্ধে চলিয়া গেলেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে, ভিসুভিয়স অতিক্রম করিবার সময় তিনি বোধ করিলেন যেন,তিনি বেলুনসহ পুড়িয়া ছাই হইয়া গেলেন, ধূম রাশিতে তাহার শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। তিনি সেই সময়ে অর্দ্ধ-চেতনাহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া, গিরিরাজের কার্য্য উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারেন নাই। ধীরভাবে প্রাকৃতিক কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবেন কি, এ ভয়ঙ্কর দৃশ্য দূর হইতে দেখিয়াই তিনি ভয়ে ও ভাবনায় অভিভূতা হইয়া পড়িয়াছিলেন। যাহা হউক, ঈশ্বরের কৃপায় অতি কষ্টে সেই স্থান অতিক্রম করিয়া, আরও উর্দ্ধে উঠিয়া শীতল সমীরণে তিনি যেন পুনর্জ্জীবন লাভ করিলেন। সমস্ত রাত্রি বেলুনে কাটিয়া গেল। কোথায় যাইতেছেন, কত উর্দ্ধে উঠিয়াছেন—অন্ধকারে স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি নিজ মুখে স্বীকার করিয়াছেন যে, তখন তাঁহার বেলুনের গতি ঘণ্টায় ৫০ মাইলেরও অধিক হইবে। তিনি সমস্ত রাত্রি ও পরদিনের অর্দ্ধাংশ বেলুনেই অবস্থিতি করিয়া, বেলা তিনটার সময়ে জেনিভা নগরে অবতরণ করেন।

বিবাহের পর হিন্দুমতে বিশেষতঃ বাঙ্গালার সামাজিক রীতিনীতি-অনুসারে যেমন মথুরাপুরীতে যোড়ে আসিবার প্রথা আছে, সেইরূপ খৃষ্টিয়ানদিগের বিবাহের পর "হনিমুন" নামক একটী প্রথা সর্ব্বদেশেই প্রচলিত আছে, অর্থাৎ বিবাহের পর নবদম্পতী অন্য কোন স্থানে যাইয়া, উভয়ে কিছুদিনের জন্য তথায় সুখ-স্বচ্ছন্দ উপভোগ করে। এই বেলুন বিহারে"হনিমুন"যাত্রা করিতে মিষ্টার ফ্ল্যামারিয়নের পূর্ব্বে কেহই কখন সাহস করেন নাই। তিনি বিবাহের পর সস্ত্রীক পারিনগরী হইতে বেলুন বিহারে স্পা নগরীতে হনিমুন যাত্রার সঙ্কল্প করেন। তাঁহাকে এইরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে ব্রতী দেখিয়া তাঁহার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলেই বার বার নিষেধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি কাহারও কোন কথায় কর্ণপাত করিলেন না; তিনি সকলকে বলিলেন, "যদিও আমি ভিন্ন এ কার্য্য অপরের মনোগত নয়, তথাপি আমি আমার জন্য, আমার সুখ, শান্তি ও হৃদয়-নিহিত অদ্ভুত রহস্য উদ্ঘাটনের নিমিত্ত এ কার্য্যে

ব্রতী হইয়াছি। আমার বিবাহিতা স্ত্রী যদি আমার সুখ-দুঃখের সমভাগিনী বলিয়া স্বীকার না করেন, তবে তিনি আমার সহিত যাইতে না পারেন! ইহা তাহার অভিমতের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে; আমি তাহাকে এ বিষয়ে অনুরোধ করিতে চাহি না। রমণীর সৌন্দর্য্য অপেক্ষা স্বভাবের সৌন্দর্য্যে আমার প্রাণ অধিক আকৃষ্ট হয়।" পরে অনেক বাক্-বিতণ্ডার পর স্বামী-স্ত্রী উভয়েই বেলুন বিহারে পারী নগরী হইতে স্পা-নগরীতে নিরাপদে অবতরণ করিয়াছিলেন।

আধুনিক সময়ে মিস বিউমণ্টের বেলুনবাজীই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি আলেকজেণ্ড্রা পার্ক হইতে বেলুনে উঠিয়া প্যারাস্যুটের সাহায্যে নিম্নে অবতরণ করেন। তিনি সর্ব্বপ্রথমে যখন বেলুনে উঠিলেন—তখন নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে. তিনি ৭০০০ হাজার ফিট উর্দ্ধে উঠিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে. এত উর্দ্ধে উঠিয়া আমি যারপরনাই ভয় পাইয়াছিলাম। নিম্নে পৃথিবীর দিকে অবলোকন করিয়া আমি একেবারে হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলাম। গ্রাম, নগর ইত্যাদি যাহার দিকে দৃষ্টিপাত করি, যেন সমস্ত পুতুলের বাড়ী ঘর বলিয়া মনে হইতে লাগিল। বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সকল যেন দূর্ব্বাদল অপেক্ষাও ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আমি প্যারাস্যুট ধরিয়া নামিতে সাহস করিলাম না। পরে বেলুন যখন ক্রমশঃই নিম্নের দিকে আসিতে লাগিল, তখন আমার হৃদয়ে সাহস ও বলের সঞ্চার হইল। আমি ৫০০০ হাজার ফিট উর্দ্ধ হইতে বেলুন ত্যাগ করিয়া প্যারাস্যুট ধরিলাম। তখন আবার বায়ুর গতি মন্দ হওয়াতে প্যারাস্যুট এত ধীরে পৃথিবীর দিকে আসিতে লাগিল ও সেই সময়ে আমার এত ভয় ও ভাবনা হইয়াছিল যে, তাহা বর্ণনাতীত। আমার মনে হইল, বুঝি এইবার শ্বাস-রোধ হইয়া আমার জীবন-লীলা সাঙ্গ হইল! ভাবিলাম,—এরূপ অসহায় অবস্থায় কে আমার সাহায্য করিবে? আমার যেন জ্ঞান লোপ হইতে আরম্ভ হইল! আমি একমনে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলাম। ইহা নিশ্চয় স্বীকার করিতে হইবে যে, একমাত্র তাঁহারই কৃপায় আমি ক্রমে পৃথিবী হইতে ২০০ ফিট মাত্র উর্দ্ধে আসিলাম। তখন অনুকূল বায়ুর সাহায্যে আমি অতি শীঘ্রই নিরাপদে নিম্নে অবতরণ করিলাম। সেই দিনের দুর্ঘটনার কথা মনে করিলে এখনও মস্তিষ্ক ঠিক রাখিতে পারি না। ইহার পর আমি গ্ল্যাসনো হইতে ১৫০০০ ফিট উর্দ্ধে

বেলুন ত্যাগ করিয়া প্যারাস্থট ধরিয়া নিরাপদে নিম্নে আসিয়াছিলাম ; কিন্তু বলিতে কি, সেই সময়ে প্রথমবারের মত আমার কোন ভয় হয় নাই।

মিসেস্ গ্রেহামের মত মিস বিউমণ্টের ভাগ্যেও অনেক দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। এক সময়ে তিনি এডিনবর্গে বেলুন হইতে পতিতা হইয়া কোন অট্টালিকার ছাদের উপরিভাগের কার্ণিস ধরিয়া জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। অন্যবারে এইরূপ কোন ছাদের জল নিকাসের পাইপ ধরিয়া রক্ষা পাইয়াছিলেন। আরও একবার ইংলিস চ্যানলে পতিত হইয়া সন্তরণে বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন বলিয়া, সেই বারেও ডুবিতে ডুবিতে রক্ষা পান। আরও একবার জ্বলন্ত এক্সপ্রেস ট্রেনের সম্মুখে পড়িয়াও জীবন রক্ষা করেন। মিস্ বিউমণ্ট সর্ব্বশেষে সকলের নিকট সমভাবে সহানুভূতি ও প্রশংসা লাভ করিলেন। কিন্তু হায়, হতভাগ্য গ্রেহাম-দম্পতী লোক-লোচনের বহির্ভাগে কোন্ অজানা অচেনা প্রদেশে জীবন্ত কি মৃত অবস্থায় চলিয়া গেলেন, কেহই তাহার কোনরূপ নিরাকরণ করিতে পারিল না। প্রশংসা ও সহানুভূতি বিধাতা তাঁহাদের ভাগ্যে বুঝি লেখেন নাই। উভয়ের এত চেষ্টা,—উদ্যম, বিনা প্রশংসা ও সহানুভূতিতে তাঁহাদের সহিত কোথায় ভাসিয়া গেল, কে বলিতে পারে।

শ্রীননীলাল সুর।

তারকেশ্বরে।

উচ্চারিছে ব্যোম মহাদেব
উচ্চকণ্ঠে ওহে দেবদেব
ব্যোমকেশ ঈশ্বর।
বিশ্বেশ্বর শশাঙ্ক-শেখর
গিরিশ ভবেশ হে শঙ্কর
শ্রীকণ্ঠ মহেশ্বর॥
ত্রিপুরান্তক নীললোহিত
রুদ্র ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিহিত
স্থাণু ত্রিশূলধারী।
বৃষধ্বজ ভব উমাপতি
গঙ্গাধর ভীম পশুপতি
মৃড় শ্মশানচারী॥

ত্রিলোচন হর জটাধারী
খণ্ডপরশু অন্নভিখারী
ধূর্জ্জটী স্মরহর।
বামদেব কৃশানুরেতস
বিরূপাক্ষ ঈশ কৃত্তিবাস
প্রমথাধিপ উগ্রশর॥
হে অন্ধকরিপু ফণিবিভূষণ
শম্ভু কপর্দ্দিন্ ভস্মবিলেপন
বৃষভ-আসন তারকনাথ।
তোমারি পূজার ধূপের গন্ধ
মন্ত্র-বাক্য-শ্লোকের ছন্দ
বহিছে পবন পবন-সাথ॥

শ্রীসুধাংশুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়।

জাতীয় কার্য্যের অবনতি।

ইদানীং দেশের সর্ব্বত্র মহা অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। ইহার কারণ, যাহার যাহা কর্ত্তব্য কর্ম্ম, জাতীয় ব্যবসা, তাহাতে অনৈক্য হইয়া পড়িয়াছে। একজনের কর্ম্ম দশজনে করিলে, নিশ্চয়ই তাহার অবনতি হয়। সুতরাং দেশের উন্নতির পরিবর্ত্তে অবনতি আসিয়া অধিকার করিয়া, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর উপস্থিত করিতেছে। প্রাচীনকাল হইতে কৃষক সম্প্রদায়েরা শারীরিক পরিশ্রম করিয়া, বসুমতীতে ফসলোৎপাদন করিয়া আসিতেছে, অধুনা ভদ্র-অভদ্র, ধনী-নির্ধন সকলেই কৃষকের ব্যবসায়ে হস্ত দেওয়ায়, সংসারে অভাব অনটন উপস্থিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ, শাস্ত্র-অধ্যয়ন, বেদপাঠ, যাগ-যজ্ঞ ও পৌরোহিত্য কর্ম্মে নিয়োজিত ছিলেন, কিন্তু আজকাল প্রায় সকল সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ কৃষিকার্য্যে মনোযোগী হইয়াছেন। তাঁহারা শাস্ত্র অধ্যয়নের পরিবর্ত্তে, কৃষকের নিকট কৃষিকার্য্য অধ্যয়ন, বেদপাঠ-বিনিময়ে কৃষকের অশ্লীল ভাষা শিক্ষা ও পৌরোহিত্যের পরিবর্ত্তে সার, মাটি দিয়া জমীর অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। এইরূপ উচ্চবর্ণের জাতি সকল, কৃষকের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া, শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির নামে কলঙ্ক রোপণ করিয়াছেন।

বিগত পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে জমীতে যেরূপ ফসলোৎপাদন হইত, অধুনা তাহার কিছুই নাই। সারা বৎসরটা একখানি জমীর জন্য খাটিয়া, ফসলের সময় ব্যয়ের অর্থ সংকুলান হয় না। এ হেন নিদারুণ অবস্থা কৃষককুলের বজ্র-সম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সকলেই তাহাদের কার্য্যে হস্ত দিয়া, অধিক ফস-লের বিনিময়ে, সামান্য ফসল প্রাপ্ত হওয়াতে, দুর্ভিক্ষ আসিয়া সংসারে নৃত্য করিতেছে। বিশেষতঃ বঙ্গদেশে পাটের চাষে, কৃষকেরা পূর্ব্বে বিস্তর টাকার মুখ দেখিয়াছে, এখন সকল সম্প্রদায়েই লাভবান পাটের চাষ করিতে গিয়া, একেবারে নিরন্ন হইয়াছে। নূতন কৃষি-সম্প্রদায় ব্যক্তিরা পাটের চাষে ক্ষতি দিয়া অনুশোচিত হইয়াছে, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্র কৃষিজীবিগণ না খাইতে পাইয়া মরিতে বসিয়াছে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এ দেশীয় তন্তুবায়গণ, দেশীয় বস্ত্র বয়ন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত; অধুনা নব্য সম্প্রদায় দেশীয় বস্ত্রের পরিবর্ত্তে, মিহি

বিলাতী বস্ত্র পরিধান করেন, কাজেই তাঁহাদিগকে তাঁত গুটাইয়া কৃষিকার্য্যে মনোযোগী হইতে হইয়াছে। এখন বেচারা তন্তুবায়দিগের দুই কূল গিয়াছে। তাঁত বিক্রয় করিয়া হালের বলদ খরিদ করিয়াছে, এদিকে কৃষিকার্য্যে ফসলের টানাটানি; কাজেই তাহাদের ঘরে দুর্ভিক্ষ, বহুপূর্ব্বে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে বৈদ্যেরা রোগের চিকিৎসা করিত। তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ হইতে চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শী বলিয়া, বংশপরম্পরায় সেই কার্য্য করিত। আজকাল বৈদ্যের নাম লোপ হইয়া, প্রত্যেক ঘরে ঘরে কবিরাজ, ডাক্তার বিরাজ করিতেছে। বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর করিয়া, সকলেই নামজাদা হইবার জন্য চেষ্টিত, কিন্তু সুভাগ্য কয় জনের হয়? আজকাল ডাক্তার, কবিরাজের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, চিকিৎসক ও ঔষধের প্রতি সাধারণ লোকের একটা ঘৃণা উপস্থিত হইয়া পড়িয়াছে। ঔষধ ব্যবহার করিলে, রোগ আরোগ্যের বিনিময়ে, বহুদিন আবার রোগের যন্ত্রণা পাইতে হয়; এ হেন আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসাশাস্ত্রে সকলেই হস্ত দেওয়ায় উন্নতির পরিবর্ত্তে, অবনতি হইয়াছে। আনাড়ী চিকিৎসকেরা এখন হাত মুখ কামড়াইতেছে, আর প্রাচীন চিকিৎসকেরা সেই সঙ্গে সঙ্গে দারুণ ক্লেশ পাইতেছে। ঔষধ-ভ্রমে হলাহল পান করিয়া, শরীর এবং চিকিৎসা-ব্যবসা চিরদিনের তরে লোপ পাইতে বসিয়াছে।

বঙ্গদেশে সূত্রধরদিগের একটী লাভজনক ব্যবসা। কিন্তু তাহাও সকলে করিতে শিখিয়া, সূত্রধরদিগের মহা অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে। আনাড়ী অন্যজীবী ব্যক্তিগণ সস্তায় কাষ্ঠের কার্য্য করিয়া, সূত্রধরদিগের ব্যবসা অতল জলধি-গর্ভে নিমজ্জিত করিয়াছে।

পূর্ব্বে বারুজীবিগণ, পান প্রস্তুত করিয়া স্বচ্ছলভাবে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিত; তাহাদের সেই কার্য্য আজ সর্ব্বশ্রেণীতে, অধিকন্তু মুসলমানে পর্য্যন্ত পানের আবাদ করিতে শিখিয়াছে, সুতরাং পান সস্তার পরিবর্ত্তে, দুর্ম্মূল্য হইয়াছে এবং পানজীবী বারুইগণকে দুঃখে কালযাপন করিতে হইতেছে।

মৎস্যজীবিগণ মৎস্য বিক্রয় করিয়া, সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিত। অধুনা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ পুষ্করিণী ডোবা খনন করিয়া মৎস্যের চাষ করিতেছেন। জেলে, নিকারীর ন্যায় তাঁহারাও মৎস্য বিক্রয় করিয়া বড়লোক হইবার চেষ্টায় আছেন; তজ্জন্য মৎস্যের মূল্য আজ এত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভবিষ্যতে

লোকে মৎস্যের মুখ দেখিতে পাইবে না। একদিকে যেমন প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব হইতেছে, অন্যদিকে তাহার বহুগ্রাহক হইয়া, দ্রব্যজাত বহুমূল্য ও দুষ্প্রাপ্য করিয়া তুলিতেছে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গব্য ঘৃত টাকায় একসের, পাঁচপোয়া বিক্রয় হইত, ইদানীং পল্লীগ্রামে গব্য ঘৃত টাকায় তিন ছটাক, একপোয়া বিক্রয় হইতেছে, তাহাও দুষ্প্রাপ্য। এত পরিবর্ত্তন হইবার হেতু কি? পূর্ব্বে গোয়ালারা দুগ্ধবতী গাভী প্রতিপালন করিয়া, ক্ষীর, সর, নবনী, ঘৃত সস্তাদরে বিক্রয় করিয়া বড় মানুষ হইত, এখন সর্ব্বশ্রেণীর লোকে গাভী পুষিয়া সংসারীর নিকট দুগ্ধ বিক্রয় করিতেছে। গোয়ালার ব্যবসা মাটি করিবার জন্য অনেকেই বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। পূর্ব্বের ন্যায় এখন আর দুগ্ধবতী ধেনু পাওয়া যায় না; যদিচ যায়, তাহাও সাধারণ লোকে ক্রয় করিয়া লাভের আশায় দুগ্ধ বিক্রয় করে; কাজেই গোয়ালারা অনন্যোপায় হইয়া, নিজের ব্যবসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, বাণিজ্য, কৃষি ইত্যাদি বিষয়ে মনোযোগী হইয়া মনুষ্যের ভোগের ব্যাঘাত করিয়াছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅক্রূরচন্দ্র দাস।

বিজয়ার বিদায়।

মহানবমীর বৈকালে প্রাণতমা কন্যা উমাকে কাছে বসাইয়া গিরিরাণী সাংসারিক উপদেশ দিতেছিলেন। উমা যেন বড় অবোধ বালিকা,—মায়ের উপদেশ—মায়ের অনুযোগ শুনিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন। বঙ্গের কবি গিরিরাণীর প্রাণের কথা গানে বলিয়াছেন—

"জামাই নাকি শ্মশানবাসী শুন্‌তে পাই।
আমি ভেবে সারা বল্ মা তারা, সত্যি নাকি শুধাই তাই॥
একে সে ক্ষেপা সন্ন্যাসী—
বুঝিয়ে কোথায় কর্‌বি ঘরবাসী;
(তা' না) হ'য়ে এলোকেশী উলঙ্গিনী বসিস্ বুকে সরম নাই॥
মরি ভেবে বুঝাব আর কবে,—
ক্ষেপাকে কে বুঝাবে তবে,

মার প্রাণে বল আর কত সবে—
ঘর করেছিস্ ভূতের বাসা,
মেতে বেড়াস্ মেখে ছাই।
ন'স্ ত এখন কচি মেয়ে, সে দিন গিয়েছে,
যা হোক দুটো গুঁড়োগাড়া কোলে হ'য়েছে।
আর কত কাল এলো হ'য়ে বেড়াবি নেচে,
তুই যদি না বুঝে চলিস্, বুঝবে কি ভাঙড় জামাই॥

এই সময় দাসী আসিয়া বলিল—জামাই এসেছেন। গিরিরাণী কাঁপিয়া উঠিলেন। এক বৎসর পরে বাছা এসেছিল,—নবমী নিশি না আসিতেই জামাই এলেন। পাগলের ঘর কি একদিনও চলে না!

জামাতা পাগল,—গায়ে শ্মশানের ছাই, মাথায় জটা, পরিধানে বাঘ-ছাল। ধুতুরা খাওয়া চোখ ঢুলু ঢুলু করিতেছে। হাতে শিঙ্গা-ডম্বুরু। মাথায় সাপ। ছি ছি,—এই পূজার সময় নিতান্ত দীনদরিদ্রও একখানা কাপড় কিনিয়া পরে!

ব্যথিত অন্তঃকরণে রাণী জামাইকে ভাল বাসে সজ্জিত করিবার চেষ্টা করিলেন।

সদানন্দ রাণীর সাধ পূর্ণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু আ'জ নয়—কা'ল যখন তোমার মেয়েকে লইয়া যাইব, তখন সাজিয়ো। তারা-হারা ভোলানাথ সাজিতে পারে না।

রাণী নবমী নিশি কাঁদিয়া কাটাইলেন। পর দিবস ত্র্যম্বক বা চরলগ্নে যাত্রা করিবেন বলিয়া দুর্গা বিদায় মাগিলেন। রাণী কাঁদিয়া আকুল—পর্য্যুসিতান্ন আর কচুর শাক ভোজন করিয়া দুর্গা সাজিলেন। রাণী চৈনিক পট্ট বস্ত্র, ভাল ভাল ফুলের মালা, স্বর্ণ টোপর দিয়া জামাই সাজাইলেন। ষাড়টাকে স্বর্ণ ঝালর মণ্ডিত বস্ত্রাদিতে সাজাইয়া দিতে অনুচরদিগকে অনুমতি করিলেন। রাণীর ইচ্ছা মতে সিংহাসনে শঙ্কর উপবেশন করিলেন। তাঁহার বামক্রোড়ে মহাশক্তি দুর্গা—দক্ষিণে সিদ্ধিদাতা গণপতি বসিলেন। সে রূপ দেখিয়া জগজ্জন ধন্য হইল।—

চতুষ্পাদ ধর্ম্মরূপী মহা বৃষভের উপর মহাযোগীশ্বর শঙ্কর—বামক্রোড়ে জগন্মূর্ত্তি মহামায়া, দক্ষিণে গণপতি।

———

প্রকাশকের নিবেদন।

৺পূজার বন্ধের মধ্যে অবসর প্রকাশ করিব বলিয়া সংকল্প করি ও সেই প্রকারই কাগজে লিখি। কিন্তু অনেক গ্রাহকমহোদয় অনুগ্রহ করিয়া লেখেন যে, ঐ সময় কাগজ পাঠাইলে গোলযোগ হইবে, হয় আমাদের বাড়ীর ঠিকানায় পাঠাইবেন, নয় বন্ধের পর পাঠাইবেন।

যাঁহারা লিখিলেন, তাঁহাদের নয় লিখিত নূতন ঠিকানায় পাঠাইতে পারিতাম, কিন্তু যাঁহারা লিখেন নাই, অথচ স্থানান্তরে গিয়াছেন, তাঁহাদের কাগজ গোলযোগ হইবে, তন্নিবারণের উপায় কি? অতএব বন্ধের পরই কাগজ পাঠান শ্রেয়ঃ বিবেচনা করা গেল।

তারপর বিড়ম্বনা! চিত্রকর K. V. Seyne & Brosএর আফিস বন্ধ,—চিত্র লইয়া মুণ্ড-মা'র উপস্থিত! বন্ধের পরও সহজে পাওয়া দুর্ঘট—ইহাতেও বিলম্ব ঘটিল।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্যমহাশয় ৺পূজার পর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়ায়, তাঁহার আরোগ্যের আশায় কয়েক দিন অপেক্ষা করা হইল, কেন না, তাঁহার লিখিত "শিক্ষার দোষ" উপন্যাসের কাপীর প্রয়োজন। এ যাবৎ তাহা পাওয়া গেল না—এক্ষণে আশ্বিন ও কার্ত্তিকের দুই মাসের অবসর একত্রে বাহির করিলাম। কিছু কম রহিল, অগ্রহায়ণ মাসের কাগজে তাহা সম্পূরণ করিয়া দিব এবং শিক্ষার দোষ উপন্যাস যথেষ্ট পরিমাণে প্রকাশ করিব। পণ্ডিত মহাশয়ের শরীর শ্রীভগবানের কৃপায় আরোগ্য হউক, ইহাই প্রার্থনা।

শকুন্তলা ও দুষ্মন্ত।

জ্যোতিস্তত্ত্ব।

মঙ্গল।

আকাশে যে অগ্নিবর্ণ সচল তারা দেখা যায়, তাহার নাম মঙ্গল গ্রহ।

আকার।—মঙ্গল গ্রহ আকারে গোল। সপ্তচন্দ্র একত্র করিলে মঙ্গলের সমান হয় এবং সপ্তমঙ্গল একত্র করিলে পৃথিবীর সমান হয়। আয়তনে মঙ্গল পৃথিবীর সিকি।

চেহারা।—চেহারায় পৃথিবীর সহিত মঙ্গলের যেমন মিল আছে, এমন অন্য কোন গ্রহের নাই। মঙ্গলকে একটী ক্ষুদ্র পৃথিবী বলিলেও চলে।

পৃথিবীর ন্যায় মঙ্গলের সুমেরু ও কুমেরু বরফের টুপী ধারণ করে।

পৃথিবীর ন্যায় মঙ্গলের আয়তন জলে ও স্থলে সমাকীর্ণ।

পৃথিবীর ন্যায় মঙ্গলের উত্তরভাগে—স্থল বেশী এবং দক্ষিণভাগে—সমুদ্র বেশী। তবে ভূপৃষ্ঠে ২ভাগ জল ও ১ভাগ স্থল;—মঙ্গলপৃষ্ঠে ১ভাগ জল ও ২ভাগ স্থল।

পৃথিবীস্থ পর্ব্বতের উচ্চতা যেমন বেশী, মঙ্গলের পর্ব্বতের উচ্চতা তেমন বেশী নহে। মঙ্গলের নদ নদী বা জলপ্রণালী গুলি তেড়া বেঁকা নহে। সেগুলি কতক উঃ দঃ কতক পূঃ পঃ প্রবাহিত গতিকে মঙ্গলের পৃষ্ঠ আয়তন ছককাটা দেখায়। (১) পৃথিবীর ন্যায় মঙ্গলে শীত, বসন্ত আদি ঋতু পরিবর্ত্তন ঘটে। মঙ্গলে অন্তরীক্ষ ও মেঘ, বৃষ্টি আদি আছে। পৃথিবীর ন্যায় মঙ্গলের উত্তরভাগ অপেক্ষা দক্ষিণভাগে শীত বেশী—কারণ তথায় জল বেশী।

পৃথিবীতে প্রাপ্ত সৌর আলোক ও উত্তাপের নিম্পী সুদূরবর্ত্তী মঙ্গলে পৌঁছে।

মঙ্গলের দিবা-রাত্রি পার্থিব দিবা-রাত্রির তুল্য স্থায়ী।

পৃথিবীর উপগ্রহ বা চন্দ্র একটী, ক্ষুদ্র মঙ্গলের চন্দ্র দুইটী।

গতি।—মঙ্গল প্রতি বিপলে ৬ মাইল চলে। এবং আপন মেরুদণ্ড আবর্ত্তন করিতে মঙ্গলের ২৪ ঘণ্টা কয়েক মিনিট লাগে। সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে মঙ্গলের ১ বৎসর ১০ মাস লাগে। এবং পৃথিবীর গতি বশতঃ এক

(১) কেহ বা মনে করেন, এগুলি কৃত্রিম খাল।

বিপরীত পদ হইতে পুনঃ বিপরীত পদে আসিতে মঙ্গলের দুই বৎসরের অধিক পঞ্চাশ দিন লাগে।

সূর্য্যসন্নিহিত মঙ্গল নিস্তেজ ও অদৃশ্য হয়, এবং পৃথিবীর সন্নিহিত মঙ্গল খুব সতেজ ও সুদৃশ্য হয়। ফলে মঙ্গল এক বৎসর অদৃশ্য থাকে এবং পর বৎসর দৃশ্য থাকে। পৃথিবীর সন্নিহিত হইবার পূর্ব্বে মঙ্গল মন্দগতি প্রাপ্ত হয়। ক্রমে মঙ্গলের স্থির গতি হয়, অর্থাৎ মঙ্গল স্থির থাকে। স্থিরগতি ত্যাগ করিয়া মঙ্গল বক্রগতি ধরে। ৬ সপ্তাহ বক্রগতি ভোগ করিয়া রাত্রি দুই প্রহরের সময় মঙ্গল মধ্যরেখায় উপনীত হয় অর্থাৎ মঙ্গল ও সূর্য্যের সম-সূত্রে পৃথিবী থাকে। বাক্যান্তরে মঙ্গল বিপরীত পদে (opposition) উপনীত হয় এবং মঙ্গল পূর্ণিমা মূর্ত্তি ধারণ করে। আরও ছয় সপ্তাহ মঙ্গল বক্রগতি ভোগ করিয়া পুনঃ স্থিরগতি প্রাপ্ত হয়। স্থিরগতির অবসানে মঙ্গল সহজগতি বা পূর্ব্বগতি গ্রহণ করে ও পৃথিবীর দূরে যাইতে থাকে এবং ইহার দ্যুতি কমিতে থাকে। ছয় মাস পরে মঙ্গল অদৃশ্য হয় এবং বৎসরাবধি অস্তমনে থাকিয়া মঙ্গলের হেলীক উদয় হয় অর্থাৎ শেষরাত্রে সূর্য্যের পূর্ব্বে মঙ্গলের উদয় হয়। তখন মঙ্গল পৃথিবীর নিকটে আসিতে থাকে এবং নিস্তেজ মঙ্গল ক্রমে দীপ্তি সঞ্চয় করিতে থাকে।

ক্রমে ক্রমে মঙ্গলের উদয়—প্রাতঃসন্ধ্যা হইতে সায়ংসন্ধ্যার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। যেদিন সায়ংসন্ধ্যাকালে মঙ্গলের উদয় হয়, সেইদিন মঙ্গল পূর্ণিমা মূর্ত্তি গ্রহণ করে এবং রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় মধ্যরেখায় আসিয়া প্রাতঃকালে পশ্চিম আকাশে অস্তগত হয়।

কলা ;—চন্দ্রের ন্যায় মঙ্গলের কতকটা ক্ষয়বৃদ্ধি বা তিথি আছে। সূর্য্য ও চন্দ্রের মধ্যে পৃথিবী পড়িলে যেমন চন্দ্র বিপরীত পদ (opposition) প্রাপ্ত হয় এবং পূর্ণিমা মূর্ত্তি গ্রহণ করে, চৌথে (at quadrature) থাকিলে মঙ্গল শুক্ল দ্বাদশীর চান্দ্রমূর্ত্তি ধারণ করে ; অর্থাৎ মঙ্গল দ্বাদশকলাময় হয়।

জ্যোতিঃ ।—বর্ষব্যাপী অস্তমনের পর উষাকালে পূর্ব্বদিকে সূর্য্যের পূর্ব্বে মঙ্গলের উদয় হইলে, মঙ্গল স্বল্পতেজ—সুতরাং কষ্টদৃশ্য হয়। ক্রমে ক্রমে মঙ্গল রাত্রি থাকিতে উদিত হয় এবং সতেজ হইতে থাকে তখন ইহার উদয় সায়ং সন্ধ্যার দিকে দিন দিন অগ্রসর হইতে থাকে। এবং ইহার অগ্নিবর্ণ ক্রমে প্রগাঢ় হইতে থাকে। সায়ংকালে মঙ্গলের উদয় হইলে মধ্য রাত্রে মঙ্গল মধ্যরেখায় উপস্থিত হয় এবং বিপরীত পদ প্রাপ্ত হয়।, তৎকালে

মঙ্গল ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতে থাকে। আবার প্রতি পঞ্চদশতম বর্ষে সপ্তম পূর্ণিমা প্রাপ্ত মঙ্গলের জ্যোতি পূর্ব্বগত ষট্‌পূর্ণিমা অপেক্ষা পঞ্চগুণ বাড়ে। তখন উজ্জ্বলতায় মঙ্গল বৃহস্পতির সমকক্ষ হয়। ইতিহাসে মঙ্গল বৃহস্পতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা—এই সমকক্ষতা মূলে রচিত হইয়াছে।

আবার মঙ্গলের এই সপ্তম পূর্ণিমা—বর্ষাকালে ঘটিলে সোণায় সোহাগা হয়। তখন মঙ্গল অপূর্ব্বশ্রী ধারণ করে।

১৭১৯ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাসে মঙ্গল-গ্রহ দর্শনে য়ুরোপের সাধারণ লোকের মহা সন্ত্রাস উপস্থিত হইয়াছিল।

১৯০৯ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাসে উদিত সপ্তম পূর্ণিমাপ্রাপ্ত মঙ্গল দর্শন জন্য আমরা সকলকে সতর্ক করিয়া দেই।

বর্ষাকালীয় অপূর্ব্ব দীপ্তি হইতে মঙ্গল "বর্ষা-অর্চ্চিঃ" উপাধি ধারণ করে।

পূর্ণিমাপ্রাপ্ত মঙ্গলের গাঢ় অগ্নিবর্ণ হইতে মঙ্গল "অঙ্গারক" ও "লোহিত-বর্ণ" খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

পূর্ণিমার পরে মঙ্গল যেমন বিদূরে যাইতে থাকে, ক্রমে ক্রমে উহার তেজের ক্ষীণতা জন্মে। ছয় মাস গতে মঙ্গল অস্তমনে যায় ও অদৃশ্য হয়। এজন্য মঙ্গল "বিরোচন" নাম উপহার পাইয়াছে।

প্রাচীন হিন্দু তারাদর্শকের কম গৌরবের কথা নহে যে, তিনি লিখিয়া গিয়াছেন :—

"বিবিধা চ রুচিঃ যাতা
যস্মাৎ এব বিদূরণা।
বিরোচনঃ ইতি প্রাহুঃ
তস্মাৎ ত্বাম্ দেব-দানবাঃ॥"

(পাদ্মে ১।২৪)

সকল গ্রহের দীপ্তির হ্রাস বৃদ্ধি আছে। গ্রহগণের মধ্যে মঙ্গল "কামরূপ" আখ্যা পাইবার শ্রেষ্ঠ পাত্র।

পূর্ব্ব-আষাঢ়া নক্ষত্রে স্থিতি কালে আবিষ্কৃত বলিয়া মঙ্গল "আষাঢ়াভব" নাম পাইয়াছে।

ইতিহ।—প্রাচীন ঋষিগণের পরম গৌরবের কথা যে, তাঁহারা স্থির করিয়াছিলেন—জগৎ-প্র-সবিতা সবিতা সূর্য্যদেব হইতে গ্রহগণ উৎপন্ন হইয়াছে। এবং মঙ্গল গ্রহ সর্ব্বাংশে পৃথিবীর সমান।

"ক্ষিতি প্রত্যধিদৈবতম্" (গ্রহযাগতত্ত্ব)

ইতিহাসে মঙ্গল গ্রহের জন্ম সম্বন্ধে নানা উপাখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। যথাঃ—

(ক) উপেন্দ্রবীর্য্যাৎ পৃথ্ব্যাং তু
মঙ্গলঃ সমজায়ত।
তেজসা সূর্য্য-সঙ্কাশঃ
নারায়ণ-সুতঃ মহান্।

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ১।৯)

(খ) পুরা হি ভ্রমতঃ বিষ্ণোঃ স্বেদবিন্দুঃ পপাত হ।
মহান্ ততঃ কুমারঃ অসৌ লোহিতাঙ্গঃ মহীতলাৎ।
জাতঃ স্নেহেন মেদিন্যাঃ বর্দ্ধিতঃ পৃথিবীপতে!

(স্কান্দে ১।১১)

(গ) সঃ ভুবাম্ ন্যপতৎ বিপ্র! স্বেদ-বিন্দুঃ শিবাননাৎ।
তস্মাৎ অঙ্গার-পুঞ্জাভঃ বালকঃ সমজায়ত ॥

(বামনে ৬৮)

(ঘ) ততঃ শরীরাৎ স্কন্দস্য পুরুষঃ পাবকপ্রভঃ।
ভক্তুম্ প্রজাঃ সঃ মর্ত্ত্যানাম্ নিষ্পপাত মহাগ্রহঃ ॥

ভূদেবীর গর্ভজাত বা ভূদেবীর পরিপালিত বলিয়া মঙ্গল "ধরাত্মজ" "ভূমি-নন্দন" "ভূমি-জ" "কু-জ" ও "ভৌম" খ্যাতি উপহার পাইয়াছেন এবং এই কামরূপ গ্রহে মনসিজ আত্মভূ কাম দেব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। তাই পড়ি ঃ—

কামদেবস্য বীজং তু মন্ত্রং ভৌমস্য কীর্ত্তিতম্।

(কালিকাপুরাণ)

ত্রিগুণময় কামদেব মানবের ত্রিবিধ শর্ম্ম (মঙ্গল) বিধান করেন। (১)

"যৎ তে কাম! ত্রিবরূথম্ শর্ম্ম"

(অথর্ব্ব ৯।২।১৬)

রজঃগুণে কামদেব (Gr Eros) জগতের স্রষ্টা।

"কামঃ তৎ অগ্রে সমবর্ত্তত"

(১০।১২৯।৪ ঋ)

সত্ত্বগুণে কামদেব জগতের পালক "কামঃ দাতা" এবং দেবতা ব্রাহ্মণের

(১) এই গ্রহের "মঙ্গল" নামের মূল তথ্য এই শর্ম্ম শব্দে থাকিলেও পারে।

রক্ষক (১) তমঃ গুণে কামদেব ফুলবাণ এবং মৃত্যুদেব যম (২) মৃত্যু-দেব বলিয়া ভৌম-কাম "মার" নামে অভিহিত।

"মদনঃ মন্মথঃ মারঃ" (অমরঃ) ত্রিগুণময় বা ত্রিমূর্ত্তি-ধর বলিয়া ভৌম-কাম "ত্রিত" নামে বেদে গীত ও স্তুত হইয়াছেন। বৃশ্চিক রাশি ভৌম গ্রহের গৃহ বা নাক্ষত্রিক প্রতিমা। সুতরাং বৃশ্চিক রাশি ত্রিত দেবের গৃহ ও নাক্ষত্রিক প্রতিমা রূপে বেদে গীত ও অর্চ্চিত হইয়াছে।

মহাভারতে ভৌম-কাম অগ্নির পুত্র কুমার স্কন্দ দেব নামে কীর্ত্তিত হইয়াছেন।

সকল দেশেই কাম চিরকুমার। ভারতে ভৌম-কাম চিরকুমার। ত্রিগুণ-ময় ভৌম-কাম রণদুর্ম্মদ অহিভুক্ বিচিত্র নীলকণ্ঠ-পৃষ্ঠে আসীন হইয়া "যম-অষ্টক" দিবসের পূর্ব্বে কার্ত্তিকী সংক্রান্তিতে কার্ত্তিকেয় নামে অর্চ্চিত হইয়া থাকেন।

প্রদীপ্ত ভৌম-কাম প্রদ্যুম্ন নামে শ্রীকৃষ্ণের সন্তান।

সামুদ্রিক মীন সদ্যঃ জাত কুমারকে ভক্ষণ করিল।

ভৌম-কাম "প্রদ্যুম্নঃ মীনকেতনঃ" হইলেন।

আবার মকর রাশিতে ভৌম-কামের তুঙ্গ। তাই পড়ি ঃ—

"মকরধ্বজঃ আত্মভূঃ"।

ভৌম-কাম "শিবাধিদৈবতং সূর্য্যং অগ্নি-প্রত্যধিদৈবম্" সূর্য্যদেবের সন্নিহিত হইলে অদৃশ্য হয়। ঐতিহাসিকের ভাষায় রুদ্রতেজে ভৌম-কাম দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হয়।

অস্তমনের অবসানে ভৌম-কামের হেলীক উদয় হয়। তাই পড়ি ঃ—
রতির বিলাপে শান্ত রুদ্রদেব কহিলেন ঃ—

তুষ্টঃ অহম্ কামদয়িতে!
কামোৎপত্তিঃ ভবিষ্যতি।
(পাদ্মে ১।৪০)

সপত্নহন্তা রণদেব রূপে ভৌম-কাম বীরভদ্র ও দাতাকর্ণ আখ্যা পাইয়াছেন এবং মৃত্যুদেব রূপে ভৌম-কাম নরক ও রাবণ আখ্যা পাইয়াছেন।

শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এল।

(১) "সপত্নহন" (অথর্ব্ব ৯।২।১।
(২) অঙ্গারকঃ যমঃ চৈব।

অন্তে।

রে বিষয়-বিমূঢ় মরণ-যাত্রী !
তোমার বৃথা গত কত দিবস রাত্রি।
কত বর্ষ মাস গত বিফল রঙ্গে,
পিতা, মাতা, পুত্র, রমণী সঙ্গে।
বিত্ত চরণ সেবি অতৃপ্ত চিত্তে
কত দণ্ড মুহূর্ত্ত পল যাপিলে মিথ্যে।
হে ভ্রান্ত! কৃতান্ত তব আগত দ্বারে,
প্রস্তুত হও মহাপ্রস্থান তরে।
পরিহর ধন জন যৌবন দম্ভ
বল অন্তে 'গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম'।
অদূরে মুমূর্ষু তব অজ্ঞাত দেশ,
আসন্ন এবে তব মুহূর্ত্ত শেষ।
মুহূর্ত্তে উড়িবে প্রাণ-বিহঙ্গ বন্য,
লুণ্ঠিবে ধরাতলে পিঞ্জর শূন্য।
এ অন্তে আর কেন ধন-জন-চিন্তা,
কে পিতা, কে মাতা পুত্র, কে তব কান্তা।
শেষ-সম্পদ তব মৃত্তিকা-কুম্ভ,
বল অন্তে—'গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম'।
দেখ তোমার কণ্ঠ ঘড় ঘড় কম্পিত কায়,
নাভিস্থলোত্থিত নিশ্বাস বায়।
স্থির নয়ন তব দৃষ্টি-বিহীন,
আজি তব ভবলীলা অবসান দিন।
পরজন্মে আপন মঙ্গল চাও,
'গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম' গাও।
অর্দ্ধ নিমগ্ন দেহ জাহ্নবী-অঙ্গে,
লহ এ পবিত্র মহামন্ত্র সম্বল সঙ্গে,
অনন্তে মিশিছে জীব! জীবন-বিম্ব,
বল অন্তে—'গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম'॥

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

অদৃষ্ট বা জীর্ণকন্থা।

(গল্প)

ফুল ফোটে, আর শুকায়। ভ্রমর-গুঞ্জনটাও সঙ্গে সঙ্গে আছে। বিন্দু বিন্দু মেঘাম্বুসঞ্চিত বারি-রাশি, একদিন নির্ঝরিণী-বুকে আপনাআপনিই শিহরিয়া উঠে। পর্ব্বতকন্দর পরিপ্লাবিনী অপ্রতিহত বেগবতীর সেই অনিরুদ্ধ তরঙ্গপ্রপাত কি কেহ কখনও প্রতিরোধ করিতে পারিয়াছেন? না, তাহাকে সেই তুষারমণ্ডিত উন্নত শৃঙ্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেখিয়াছেন? যাহা ঘটিবে, তাহা অবশ্যম্ভাবী। আর যাহা ঘটিবে না, তাহারও ব্যর্থপ্রয়াস অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু হায়, তবে মুগ্ধ গুঞ্জনবৎ আশা কেন? কেন, তাহা কে বলিবে,—অদৃষ্ট!

নিদাঘের দিবা তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। পুরন্দরপুরের একটা জীর্ণ দ্বিতলগৃহে মাতা সস্নেহে তনয়ার মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন, "মা, চিত্রে, চিতু, জিদ করা কি ভাল? চল আমরা ৺কাশীতেই যাই।"

"না, ৺বৈদ্যনাথ যাইব।"

মাতা আর বেশী কিছু বলিতে সাহসী হইলেন না। সংসারে শত নিষ্পেষণের মধ্যে জুড়াইবার স্থান তাঁর ঐ একমাত্র কন্যা। তিনি আর বাঙ্-নিষ্পত্তি না করিয়া গৃহের বারাণ্ডায়একটী শীতলপাটি বিছাইয়া শয়ন করিলেন। তনয়াও তাহার যত্নরক্ষিত শিল্পডালা বাহির করিয়া একপার্শ্বে কাঁথা সেলাই-এ মনোনিবেশ করিল।

হিন্দুর ঘরের মেয়ে সচরাচর বালিকা বয়সেই বিবাহিতা হয়। চিত্রার পিতা জীবিত থাকিলে তিনিও যে সে "গৌরীদানের" ফলভাগী হইতেন না, একথা একপ্রকার অস্বীকার্য্য। কিন্তু, সবই অদৃষ্ট। যে গৃহ একদিন, হিন্দুর নিত্যপর্ব্বে নিত্যোৎফুল্ল থাকিত, যেখানে অন্নদান, বস্ত্রদান এবং অর্থদান আসন্ধ্যা আবহমান থাকিত, সেইখানে আজ কি না একটী ভবঘুরেরও আবির্ভাব হয় না,—একটী অলস ভ্রমরের বীতরাগ গুঞ্জনও শ্রুত হয় না। ধন্য প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তন!

গৃহিনীর ৺কাশী যাইবার প্রধান কারণ চিত্রার বিবাহ। একে ত কুলীন কুমারী—জঙ্গলের মালতী ফুল। তাহাতে যাঁহারা গৃহিনীকে স্বজন বলিয়া

স্বীকার করিবেন, তাঁহারাই তাঁহার চিরশত্রু। এমন কি, তাঁহারা একটী অসহায়া বিধবার কলঙ্ক রটাইতেও কুণ্ঠিত হন নাই। তাই গৃহিণী মনে করিয়াছিলেন, বাস্তুভিটা ও গহনাদি যৎসামান্য এবং দগ্ধ বাটীর পিত্তল, কাংস্যপাত্রাদি যাহা কিছু বর্ত্তমান আছে, তাহা বিক্রয় করিয়া ৺কাশী যাইয়া কন্যার বিবাহ দিবেন। কুটিল, ভীষণ সমাজ-সংক্রামক পাড়াগাঁয়ে থাকিয়া ১৫।১৬ বৎসরের বালিকার বিবাহ দেওয়া, তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

এই পুরন্দর পুরে যিনি এখন জমীদার পদবাচ্য, সেই হরিকিঙ্কর চৌধুরী মহাশয় একদিন গৃহিণীর পরলোকগত স্বামীর অন্নে প্রতিপালিত ছিলেন। তখন তিনি তাঁহার পরমাত্মীয় প্রধান জ্ঞাতি, বন্ধু, মোসাএব এবং দেওয়ান; উভয়ের মধ্যে কত সখ্য, কত বন্ধুত্বের আদান-প্রদান। কর্ত্তার মৃত্যুর পর হইতে হরিকিঙ্কর চৌধুরী মহাশয় একটু নিজের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন,—স্বার্থে জ্ঞানান্ধ হইলেন। পরিশেষে রূপতৃষ্ণাও তাঁহাকে ব্যাকুল করিল। গৃহিণীর অতুলনীয় রূপরাশি বৈধব্যের সুরুচি মার্জ্জিত পবিত্র ছটায় মধ্যাহ্নের স্থলপদ্মের মত সগর্ব্বে ফুটিয়া উঠিল। হরিকিঙ্কর বাবুও একেবারে দিশে-হারা হইলেন। কামান্ধের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না,—প্রতিপালকের কথা মনে হয় না, আশ্রয় দাতার বক্ষে ছুরিকাঘাত করিতেও সে কুণ্ঠিত নহে। হরিকিঙ্কর বাবু তাহার অসংযত রিপু চরিতার্থ করিবার পথে উৎকট বাধা প্রাপ্ত হইয়া, অন্য পথে গৃহিণীকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া ছাড়িলেন। প্রচণ্ড ঝটিকাবর্ত্তে কণ্টকাকীর্ণ বেতস-লতিকা যেরূপ প্রপীড়িতা বিধ্বস্তা হইয়াও মূলোৎপাটিতা হয় না, গৃহিণীও সেইরূপ বিপদের উপর বিপদ আলিঙ্গন করিয়া আসিতে-ছিলেন। কিন্তু, রমণীজীবনের সার রত্ন যে সতীত্ব, তাহা তিনি নিজ বক্ষে সযত্নে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। স্বামীর ধ্যান, স্বামীর চিন্তা, স্বামীর কুল-রক্ষা, ইহাই তাঁহার ইষ্টমন্ত্র হইয়াছিল। হরিকিঙ্কর বাবুর সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র বিজ্ঞানচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে এম, এ, ক্লাসে অধ্যয়ন করিতেন। ইনি হরিকিঙ্কর বাবু কিংবা তাঁহার আর আর পুত্রগুলির মত বৈষয়িক কূটবুদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন না। তিনি সংযমী, বিনয়ী ও মিতভাষী ছিলেন। সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে ভাল বাসিতেন। গীতা, যোগবাশিষ্ঠ, উপনিষদ প্রভৃতি নীরস পুঁথিগুলি লইয়া সময় কর্ত্তন করিতেন। কিন্তু, সে গুলির উপর তাদৃশ যত্ন পরিলক্ষিত হইত না। বিজ্ঞানচন্দ্রের পড়া শেষ হইলে, পুঁথি-

গুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে বিরূপ ভঙ্গিমায় পরস্পর পরস্পরকে ব্যঙ্গ করিত। বিজ্ঞানচন্দ্র শৈশব হইতে চিত্রার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। যে সময়ে তাঁহার বয়স ১০।১১ বৎসর, তখন চিত্রার বয়ঃক্রম পাঁচ বৎসরের অনধিক হইবে। সেই শৈশব কালে, চিত্রার পিতার বেগবান্ অশ্বযানে যখন দ্বারপালেরা চিত্রা ও বিজ্ঞানচন্দ্রকে বৈকালিক ভ্রমণে বাহির করিত; তাহা এখনও পল্লিবাসী ভুলিতে পারে নাই। অনেক সাধারণ লোকে ইহাতে মনে করিত, দেওয়ানজির এই ছোট ছেলেটীর সঙ্গে বোধ হয় বাবু তাঁ'র মেয়ের বিবাহ দিবেন। কিন্তু, দেওয়ানজি ও বাবু উভয়ে জানিতেন যে. স্বগোত্রে বিবাহ হয় না।

বিজ্ঞানচন্দ্রের শরীর ব্যায়াম দ্বারা সেরূপ দৃঢ় ও সর্ব্বাবয়ব সুসম্পন্ন হইয়াছিল না। হরিকিঙ্কর বাবু তাই বিজ্ঞানচন্দ্রকে ৺বৈদ্যনাথ দেওঘরে একটী বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। কলেজের ছুটির সময় বিজ্ঞানচন্দ্র সেই খানে অবস্থান করিতেন। তাঁহার মাতা ত্রিপুরাদেবীও কনিষ্ঠ পুত্রটীর মমতানিবন্ধন দেওঘরে থাকিতেন।

হরিকিঙ্কর বাবু যে ছলনাক্রমে, চিত্রার পিতার সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়াছিলেন, বিজ্ঞানচন্দ্র তাহা বেশ বুঝিতেন। কিন্তু "পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম্ম" এই আর্য্যশাস্ত্রশাসিত সূত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াই বোধ হয় তিনি নির্ব্বাক্ থাকিতেন। চিত্রার মাতাকে তিনি গর্ভধারিণীর মত ভক্তি করিতেন এবং তাঁহার মত লোকের দ্বারা সে বিপন্ন পরিবারের যতদূর সাহায্য হইতে পারে, সে বিষয়েও তিনি কদাচ পশ্চাৎপদ হইতেন না।

চিত্রা, বিদ্যাসাগরের বোধোদয় ও আখ্যানমঞ্জরী পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল। এরূপ বিদ্যায় অবশ্যই এই বিংশ শতাব্দীর কোনও বঙ্গনবীনার পক্ষে কবিতা লেখার বাধা জন্মাইতে পারে না। চিত্রার সে বালাই ছিল না। শিল্পে ও চিত্রে তাহার বেশ একটু স্বাভাবিক নৈপুণ্য ছিল। বিজ্ঞানচন্দ্রও এ বিষয়ে তাহাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন। একখানা কীর্ত্তিবাসের রামায়ণ আর একখানা কাশিরাম দাসের মহাভারত বিজ্ঞানচন্দ্র চিত্রাকে কিনিয়া দিয়াছিলেন। সে যখন তাহা আপনমনে, ভাবে গদ্‌গদ চিত্তে, সুর করিয়া পড়িত, তাহা শুনিয়া অতি বড় পাষণ্ড-হৃদয়ও গলিয়া যাইত। অস্মদ্দেশীয় অভিমানিনীদের অভিমানটা অনেক সময়ে একটা না একটা কার্য্যে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। অনেক সময়ের ছেলে ঠেঙান ব্যাপারটাও এই অভিমানের

অন্তর্ভূত। চিত্রা নিতান্ত সরলা বালিকা হইলেও স্ত্রীজাতির স্বভাব অতিক্রম করা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক নহে। সে অভিমানভরে একপার্শ্বে বর্ষণোন্মুখ মেঘখানির মত মুখখানি ভার করিয়া, সুন্দর সুগঠন চম্পকাঙ্গুলির আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনে কন্থা খানি সূচিকা-বিদ্ধ করিতেছিল; আর অন্যপার্শ্বে মাতা, তালবৃন্ত সঞ্চালনে নিদ্রার আবেশে অতীতের স্মৃতি গুটাইয়া মানসপটে ভবিষ্যতের চিত্র আঁকিতেছিলেন। প্রতিবেশী-নির্য্যাতন, অকারণ চরিত্রাপবাদ, দুর্ব্বিষহ দারিদ্র্য প্রভৃতি কত কি অব্যক্ত বেদনা তাঁহার হৃদয়ে ভাসিয়া ভাসিয়া সরিয়া যাইতেছিল। অতীতের স্মৃতি অতীতে মুছিয়া, ভবিষ্যতের চিন্তা করিতে তাঁহার প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। মনে হইল, তিনি যেন একটী ভয়ঙ্কর ঝঞ্ঝাবাতের পূর্ব্বসূচনা দেখিতেছেন। মাতা-পুত্রী উভয়ই নীরব! দুই পার্শ্বে এই দুটী প্রাণী দেখিলে মনে হয়, যেন মানবের স্বপ্নরাজ্যের অনেক দূরে—আত্মার পুরী হইতে ইহারা পৃথিবী পৃষ্ঠে নামিয়া আসিয়াছে। হঠাৎ গৃহিণীর চমক ভাঙ্গিল। তিনি দেখিতে পাইলেন, চিত্রা কাঁদিতেছে। কাঁদিবার কারণ আর কিছুই ছিল না—সে অনবধানতা প্রযুক্ত বাম হস্তের তর্জ্জনীতে ছুঁচ ফুটাইয়া দিয়াছিল। গৃহিণী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। উঠিয়া চিত্রার হাতখানি ধরিয়া তাহাকে ঋজুভাবে দাঁড় করাইলেন। কন্যার উত্তপ্ত সিক্ত গণ্ডস্থল মাতার চিবুক স্পর্শ করিল। গৃহিণী মনে করিলেন, জগতে যদি কিছু সুখ থাকে, তবে ইহাই—এই অপত্য স্নেহই সংসারে সুখের বন্ধন।

গৃহিণী আবার কাশী যাইবার কথা তুলিলেন। পল্লিগ্রাম পরিত্যাগ করা তাঁহার নিতান্তই প্রয়োজন হইয়াছিল।

চিত্রা। কাশী যাইব না—বৈদ্যনাথ যাইব।

গৃহিণী। বৈদ্যনাথে সুবিধা হইবে না। বিজ্ঞান চন্দ্রের সাধ্য নাই যে, তাহার পিতার গতিরোধ করে।

চিত্রা। তবে কি আমার বাবার ভিটায় প্রদীপ জ্বলিবে না?

গৃহিণী। তোমার বাবার ভিটায় প্রদীপ জ্বলিলে তোমার কি? তুমি জান না, স্ত্রী জাতির সর্ব্বস্ব কি? গৃহিণীর এই কথায় চিত্রার গণ্ডস্থল রক্তিমাভ হইল। পরিম্লান সান্ধ্যনলিনীর মত সে মাতার বক্ষে ঘুমিয়া পড়িল। এদিকে সন্ধ্যারও বড় বেশী বিলম্ব ছিল না। গৃহিণী তাড়াতাড়ি উঠিয়া প্রাঙ্গণ বেদিকায় তুলসী-মূলে প্রদীপ জ্বালিয়া দিলেন। গোধূলির ধূম্রবর্ণ ছায়া তথায় আলো ও অন্ধকার সংমিশ্রণে এক অস্পষ্ট শোভা সৃষ্টি করিল।

চিত্রার জীবনে আজ এক নূতন ভাব। তাহার হৃদয়ের তারে তারে যেন ধ্বনিত হইতেছিল—"স্ত্রী জাতির সর্ব্বস্ব কি?" অদূরবর্ত্তী দেবালয়ের শঙ্খ ও কাঁশর-নিনাদ-সংমিশ্রিত এক অভূতপূর্ব্ব আশ্বাসের মধ্যে সে যেন শুনিতে পাইল—স্ত্রী জাতির সর্ব্বস্ব কি? যাঁহার পায়ে জীবন মরণ কৃতদাসীর মত ঢালিয়া দিতে হয়। যিনি হৃদয়ের দেবতা, প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, আত্মার পরিতৃপ্তি। স্ত্রী জাতির কে সে তিনি?

এই চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকার মর্ম্মে মর্ম্মে স্বর্ণাক্ষরে কে যেন আজ এক গুপ্ত মন্ত্র লিখিয়া দিল। সে মনে মনে বলিল "বিজ্ঞানচন্দ্র! তুমি আমাকে রক্ষা করিও।"

পরদিন প্রত্যূষে গৃহিণী ডাকে বিজ্ঞানচন্দ্রের পত্র পাইলেন। বিজ্ঞানচন্দ্র, তাঁহার এক বিপত্নীক জমীদার বন্ধুর সহিত চিত্রার বিবাহ স্থির করিয়া গৃহিণীকে অবিলম্বে বৈদ্যনাথ যাইতে লিখিয়াছেন। পাত্র সুশিক্ষিত এবং সচ্চরিত্র। কুলমর্য্যাদায় পাল্‌টি ঘর। বিজ্ঞানচন্দ্র চিত্রার অদৃষ্টের ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিয়া পত্রের উপসংহার করিয়াছেন। নিতান্ত প্রজাপতি-নির্ব্বন্ধ—তাই এরূপ অঘটন সংঘটন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। গৃহিণী পত্র পাইয়া যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। তিনি সেই মুহূর্ত্তে চিত্রার মতে মত দিয়া বৈদ্যনাথ যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া চিত্রার মুখকান্তি ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ হইল। গোলাপ-পেলব অধর-প্রান্তে শুষ্ক অপরাজিতার আভা-প্রকাশক একটু নীরস হাসি ফুটিয়া উঠিল। গৃহিণী চিত্রার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু মনে মনে নারায়ণকে স্মরণ করিয়া ভাবিলেন—সব অদৃষ্ট!

পুরন্দরপুর হইতে বেঙ্গলসেন্ট্রাল রেলওয়ের ঝিকরগাছি ষ্টেশন ১২ ক্রোশ দূরে। এই দুর্গম পথ তাঁহারা গোযানে অতিক্রম করিয়া রাত্রি ১২ টার সময়ে ট্রেণে উঠিলেন। যখন তাঁহারা শিয়ালদহে অবতরণ করিলেন, তখনও রাত্রি প্রভাত হয় নাই। বৈদ্যুতিকবর্ত্তিকা-প্রভাবে তথায় দিবারাত্রি সমান। তথাপি লোকের ভিড়ে ও গাড়োয়ানদের চীৎকারে তাঁহারা কিছু সময় স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সঙ্গে রামস্বরূপ নামক একটী প্রাচীন ভৃত্য ছিল। সে তাঁহাদিগকে ভিড়ের বাহিরে আনিয়া একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ীতে উঠাইল। গাড়ী যখন বড়বাজারের মধ্য দিয়া হাওড়ার ষ্টেশন অভিমুখে চলিতেছিল, তখন চারিদিক ফর্সা হইয়াছে।

চিত্রা এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে একটী কথাও বলে নাই। গরুর গাড়ীর ঘ্যানর ঘ্যানর আর রেলের গাড়ীর ট্যারাটং ট্যারাটং শব্দ,—এই অশ্রুতপূর্ব্ব সংগীত মাধুর্য্যের মধ্যে সে একেবারে ডুবিয়া গিয়াছিল। মাতার সহিত একটী কথাও বলে নাই।

গাড়োয়ান হাওড়ার প্লাটফর্মে জিনিষ পত্র নামাইয়া দিয়া ভাড়া লইল। রামস্বরূপ এইখানে টিকিট করিতে কিছু গোলে পড়িল। একটী বড় লোক দেওঘরে যাইতেছিলেন, অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক তিনি তাঁহাদিগকে টিকিট করিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন। গাড়ী বৈদ্যনাথ জংসনে আসিলেও সেই ভদ্রলোকটী তাঁহাদিগকে নামাইতে উঠাইতে ক্রটী করেন নাই। দেওঘর ষ্টেশনে যখন ট্রেণ থামিল, বাবুটীর কৌতুহলের বেগও তখন কিছু বর্দ্ধিত হইল। তিনি মেয়ে গাড়ীর দিকে একটু একটু অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলেন, চিত্রা ও তাহার মাতা অবতরণ করিয়াছেন। রামস্বরূপও নামিয়া জিনিষপত্র মিলাইতেছে।

বাবুটীর জন্য একটা জুড়ি অপেক্ষা করিতেছিল। একজন পাগড়িধারী বরকন্দাজও তাহার উপর বসিয়াছিল। সে নামিয়া আসিয়া তাহার মুনিবকে যথারীতি অভিবাদন করিল। বাবুটী প্রতি-নমস্কার করিলেন বটে, কিন্তু একটী কথাও তাহাকে না বলিয়া, ধীরে ধীরে রামস্বরূপের কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। উদ্দেশ্য, রামস্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহার সঙ্গিনী-দ্বয় কোথায় যাইবেন। যখন গৃহিণীর নিজমুখেই শুনিতে পাইলেন যে, তাঁহারা বিজ্ঞানচন্দ্রের বাসায় যাইবেন; তখন তাঁহার মনের মধ্যে একটু অজ্ঞাত আনন্দ সাড়া দিল। তিনি বিনীতভাবে বলিলেন,—"মা! বিজ্ঞানচন্দ্র আমার বন্ধু।" বরকন্দাজটী বাবুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছিল। তিনি ফিরিয়া বলিলেন—"ইঁহাদিগকে জুড়িতে করিয়া বিজ্ঞান-নিবাসে পৌঁছিয়া দিয়া, শীঘ্র ফিরিয়া আইস। আমি ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছি।"

বাবুটীর নাম রমণীরঞ্জন রায়। তিনি গবর্ণমেণ্টের রায় বাহাদুর খেতাব-শালী, পূর্ব্ববঙ্গের একজন ধনাঢ্য জমীদার। বায়ুপরিবর্ত্তন জন্য সম্প্রতি দেও-ঘরে বাস করিতেছিলেন। কৃষি ও শিল্প-প্রদর্শনীর একটী সভায় গবর্ণমেণ্ট পক্ষে আহুত হইয়া কলিকাতায় গিয়াছিলেন। ফিরিবার সময়ে রামস্বরূপের সহিত হাওড়া ষ্টেশনে প্রথম পরিচয়।

যখন আমি গল্প লিখিতে বসিয়াছি, তখন আমার সুযোগ্য পাঠক পাঠিকা

অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন, যে এই নবীন রায় বাহাদুর-পুঙ্গবই বিজ্ঞানচন্দ্রের বিপত্নীক বন্ধু এবং চিত্রার ভাবী বর।

রমণীরঞ্জন বাবু যদিও চিত্রা ও তাঁহার জননীর পরিচয় লইয়াছিলেন না; তথাপি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই সর্ব্বাঙ্গ-সুসম্পন্না কিশোরীই বোধ হয় তাঁহার গৃহ আলো করিবেন।

মাতা-পুত্রী এই অপ্রার্থিত—অনায়াস লভ্য জুড়িতে উঠিলেন;—বিজ্ঞানচন্দ্রের বন্ধু-শুনিয়া আপত্তি করিলেন না। গৃহিণীর মনে একটা ভরসাও হইয়াছিল।—বিজ্ঞানচন্দ্রের সেই বিপত্নীক জমীদার বন্ধু যদি বা ইনি হন্; নচেৎ এরূপ অযাচিত উদারতা, সর্ব্বত্র সুলভ নহে।

চিত্রার মনে এ সম্বন্ধে একটী রেখাপাত হইয়াছিল কি না সন্দেহ। সে মনে করিতেছিল,—কতক্ষণে বিজ্ঞানচন্দ্রের সাক্ষাৎ পাইবে!—আর তাহার অসার জীবনের অপূর্ণ আশা ভরসা, একটী অবিক্রীত বোঝার মত তাঁহার পদপ্রান্তে ঢালিয়া দিবে। পরে তিনি যাঁহার দোকানে ইচ্ছা, তাহা পদাঘাতে গড়াইয়া দিবেন। ছিন্নকোরক আর হৃদয়-বৃন্তে যোড়া লাগিবে না। সে আশৈশব বিজ্ঞানচন্দ্রের রমণীয় মূর্ত্তি ধ্যান করিতে শিখিয়াছিল; এমন কি, তাহার মার্জ্জার শিশুটী পর্য্যন্তও সে প্রেমের অংশভাগী হইয়াছিল। আজ, সেই অন্তরের অন্তরতম বিজ্ঞানচন্দ্র পর হইবে, ইহা সে সহ্য করিতে পারিবে না।

চিত্রার প্রিয়সঙ্গী সেই মার্জ্জার-শাবকটী বিজ্ঞানচন্দ্রের দর্শন পাইলে, হাই তুলিয়া—আনন্দে মুখব্যাদান করিয়া—সুমধুর মেউ মেউ রবে প্রণয় সম্ভাষণ করিত; চিত্রার প্রাণও সেই সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে নাচিয়া উঠিত। বিজ্ঞানচন্দ্র বেত্রাগ্রভাগ দ্বারা মার্জ্জার শিশুটীর অঙ্গ স্পর্শ করিলে, লাঙ্গুল ফুলাইয়া সে তাহার পশু-প্রেমের মর্য্যাদা রক্ষা করিত এবং পলায়ন করিত। চিত্রা মনে করিত,—তাহার অদৃষ্টে কি শেষে মার্জ্জার-শাবকের মত পলায়ন করিতে হইবে? সেরূপ পলায়ন মার্জ্জার শিশুর পক্ষে শোভনীয় হইলেও চিত্রার পক্ষে মৃত্যুর কারণ হইবে।

জুড়ি অনতিবিলম্বে "বিজ্ঞান-নিবাসের ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইল। চিত্রা ও তাঁহার মাতা গাড়ীর দরজা খুলিয়া অবতরণ করিলেন। বিজ্ঞানচন্দ্র ও তাঁহার জননী রায় বাহাদুরের জুড়ি চিনিতেন। তাঁহারা একটু বিস্মিত হইলেন। বিজ্ঞানচন্দ্র মুহূর্ত্তেই ব্যাপারটা একরূপ বুঝিয়া লইলেন। কারণ

তিনি জানিতেন, রমণীরঞ্জন কলিকাতায় মিটিং-এ গিয়াছেন। প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে বোধ হয়, এই শুভ আকস্মিক পরিচয়।

বিজ্ঞানচন্দ্রের মাতা ত্রিপুরাদেবী চিত্রা ও তাহার জননীকে সঙ্গে লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। বিজ্ঞানচন্দ্র ফুলবাগানে পায়চারি করিয়া ফিরিতে লাগিলেন।

কোচ্‌ম্যান, বরকন্দাজ কিছু বক্‌শিশের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিতেছিল, বিজ্ঞানচন্দ্র দুইজনকে দুইটী রজত মুদ্রা দিয়া বিদায় করিলেন। তাহারাও আগুম্ফ শ্মশ্রু-মধ্যে দন্তপংক্তি বিকশিত করিয়া সেলাম ঠুকিয়া জুড়ি হাঁকাইয়া দিল।

বিজ্ঞানচন্দ্রের মাতা সেরূপ পাকা গৃহিণী ছিলেন না। বিজ্ঞানচন্দ্রের মত তাঁহাকেও চাকর, বামুন ও চাকরাণীর উপর অধিক নির্ভর করিতে হইত।

ছেলে দিবা রাত্রি পুঁথি লইয়া ধ্যানমগ্ন থাকিত, তিনিও অবাক্‌ হইয়া সেখানে বসিয়া থাকিতেন। মধ্যে মধ্যে পাখা লইয়া বিজ্ঞানচন্দ্রকে বাতাস করিতেন, কখনও বা সযত্নে আঁচল দিয়া পুত্রের মুখখানি মুছাইয়া দিতেন। বিজ্ঞানচন্দ্র ভক্তি গদ্‌গদচিত্তে ভগবৎতত্ত্ব অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহার মাতা ত্রিপুরা দেবীও পুত্রের ভাবে ভাব মিশাইয়া একেবারে ডুবিয়া যাইতেন। তাঁহার সে ভক্তিটা বিশ্লেষণ করিতে গেলে, আধ্যাত্মিক কি আধিভৌতিক, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন।

আমাদের মনে হয়, সকল তত্ত্বের উপর মাতার হৃদয়ে সন্তান-বাৎসল্যই অধিক প্রবল। চিত্রা বিজ্ঞান-নিবাসের শোভা দেখিয়া মুগ্ধা হইয়াছিল। অনতি উচ্চ প্রাচীরের চারি পার্শ্বে খোলা মাঠে কে যেন সবুজ মখমল বিছাইয়া দিয়াছে। পাতায় পাতায় ডালে ডালে সন্নিবিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাল-বনের শ্রেণী চলিয়াছে, তন্মধ্যে নানাজাতীয় সুন্দর পক্ষীর কলরব। অদূরে ময়ূরকণ্ঠ ত্রিকূট মহাদম্ভে শির উত্তোলন করিয়া ভূতনাথ ভবানীপতির সাক্ষী-স্বরূপ দণ্ডায়মান। চিত্রা বিমুগ্ধ নেত্রে এই নৈসর্গিক শোভা দেখিয়া একেবারে আত্মহারা হইত। অবসর পাইলেই, সে বাহিরে আসিয়া বনের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিত। পক্ষীর সুমিষ্ট গানে কি এক স্বর্গীয় মদির-তায় তাহার কর্ণকুহর ভরিয়া যাইত। ভাবাবেশে যখন তাহার আঁখির পলক পড়িত, অচঞ্চল নয়ন তারা একবার ঘুরিয়া আসিত, বিশ্বের সৌন্দর্য্য যেন তাহাতে মুছিয়া যাইত।

বিজ্ঞানচন্দ্রের বৈষয়িক অমনোযোগে, বিজ্ঞান-নিবাসের অন্দরে বাহিরে সর্ব্বত্রই একটা বিশৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হইত। চিত্রা সেখানে যাইয়া তাহার সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হইল। ভিতরের জিনিষ পত্রগুলি তাকের উপরে সুন্দর ভাবে সাজাইয়া রাখিত। বিজ্ঞানচন্দ্রের অযত্ন-রক্ষিত পুঁথিগুলিরও কপাল ফিরিয়াছিল। চিত্রার সুকোমল করস্পর্শে সেগুলি সংস্কৃত এবং সজ্জিত হইয়া টেবিলের শোভা বর্দ্ধন করিত।

চিত্রা শিল্পের নিদর্শন একখানি নাতিদীর্ঘ সুন্দর কন্থা বিজ্ঞানচন্দ্রকে উপহার দিয়াছিল। বিজ্ঞানচন্দ্র তাহার শিল্পচাতুর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। "যে অশিক্ষিতা পল্লিবাসিনী কিশোরী বিনা শিক্ষায় শিল্পের এরূপ গূঢ় রহস্য ব্যক্ত করিতে পারেন, তিনি বোধহয় মানবী নহেন—শাপ-ভ্রষ্টা দেবী।" কন্থাখানির শিল্পনিপুণতা সমালোচনা করিতে বিজ্ঞানচন্দ্র মুক্তকণ্ঠে ইহাই ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

ভাববিমুগ্ধা বনবিহঙ্গিনী চিত্রারও হৃদয় তাঁহাতেই ডুবিয়া গিয়াছিল।

বিজ্ঞানচন্দ্রের চরিত্র দেবদুর্লভ। তাঁহার মন পদ্মপত্রের বারিবিন্দুর মত সংসারে মিশ্রিত হইত না। দ্বেষ, রাগ, জয়-পরাজয় সুখ-দুঃখ তিনি সমান মনে করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন! এজন্য যে সংযমের আবশ্যক, তাহাতেও তিনি আশৈশব অভ্যস্ত ছিলেন। নির্ম্মল শারদচন্দ্রমার মত তাহার স্বচ্ছ হৃদয় আপনাকে প্রকাশ করিত এবং পরকেও মাতাইত। তিনি ভালবাসিতে জানিতেন। চিত্রাকে সহোদরার মত স্নেহ করিতেন। চিত্রার প্রফুল্ল পদ্মকোরকতুল্য মুখখানি আঁধার দেখিলে, তাঁহার সেই আশৈশব অভ্যস্ত সংযমের মধ্যে একটা গোল বাধিয়া যাইত। হায়! এই বিশ্বসংসারে কে কবে মায়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে?

বিজ্ঞানচন্দ্র একদিন দেখিতে পাইলেন, চিত্রা লুকাইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর পড়িতেছে। তিনি ভালমন্দ কিছুই না বলিয়া পুস্তকখানি কাড়িয়া লইয়া, আলমারিতে বন্ধ করিয়া রাখিলেন। চিত্রা মর্ম্মাহত হইয়া বিজ্ঞানচন্দ্রের মুখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। কি যে অপরাধ করিয়াছে, সে তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। ধীরে ধীরে কম্পিত কণ্ঠে সে বলিল, "দাদা, শৈবলিনী কি সত্যি মানুষ,—না উপন্যাস?" বিজ্ঞানচন্দ্র প্রত্যুত্তরে বলিলেন "ও সব মিথ্যা উপন্যাস। তুমি রামায়ণ পড়িও—মহাভারত পড়িও।"

চিত্রা বুঝিল,—সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, দ্রৌপদী, গান্ধারী, সুভদ্রা ;—এঁরা সব সত্যি মানুষ,—শৈবলিনী একটা রাক্ষসী।

এই ঘটনার অল্প কয়দিন পরে একদিন বিজ্ঞান-নিবাসে মহাসমারোহে গোধূলি লগ্নে চিত্রা ও রমণীরঞ্জন রায়বাহাদুরের যথাশাস্ত্র উদ্বাহ ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইল।

পূর্ব্ববঙ্গের রায় বাহাদুরের বিবাহ—ইহাতে সাহেব সুবো যে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, ইহা বলা অনাবশ্যক। তাঁহাদের জন্য একটী পৃথক্ বাড়ী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সাহেবগণ সেখানে হিন্দুমতে পান-ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। বিজ্ঞানচন্দ্র যে বিবাহের ঘটক, সে স্থলে পশুমেধ যজ্ঞের পূর্ণাহুতি প্রদত্ত হওয়া অসম্ভব। কিন্তু, বিজ্ঞানচন্দ্র অনেক অনুরোধ করিয়াও সাহেবদিগকে কাঁটা চামচা পরিত্যাগ করাইতে পারেন নাই। শুনা যায়, সাহেবরা নাকি ধুতি চাদর পরিয়া বাই খেমটায় যোগদান করিয়াছিলেন। রমণীরঞ্জন বাবুর আত্মীয় স্বজন এবং পরিবারবর্গ এ বিবাহে দেওঘরে আসিয়াছিলেন। বিজ্ঞানচন্দ্র পুরন্দরপুরের সকলকেই এ বিবাহে নিমন্ত্রণের পত্র দিয়াছিলেন, কিন্তু হরিকিঙ্কর বাবু কাহাকেও আসিতে দেন নাই। তিনি পত্রোত্তরে জানাইয়াছিলেন, যে তিনি আর ইহজীবনে বিজ্ঞানচন্দ্র এবং তাঁহার গর্ভধারিণীর মুখাবলোকন করিবেন না। কারণ, তাঁহাদের কুকার্য্যে এই অপকর্ম্ম সংঘটিত হইয়াছে।

৺ বৈদ্যনাথের হার্দ্দপীঠে—যেস্থলে বিষ্ণুকর্ত্তৃক সতীদেহ কর্ত্তিত হইয়া মা সর্ব্বমঙ্গলার হৃদয় দেশ পতিত হইয়াছিল, তাহারই অনতিদূরে রমণীরঞ্জন রায় বাহাদুরের "বিলাস-কুটীর" ছিল। চিত্রা সেই বৃহৎ আনন্দ ভবন রাজরাজেশ্বরী রূপে আলো করিয়াছিল।

চিত্রার মাতা বিজ্ঞান-নিবাসেই ছিলেন।

চিত্রার এই বিবাহিত জীবনটা লইয়া সে বড়ই গোলে পড়িয়াছিল। রমণীরঞ্জন বাবু সর্ব্বদাই তাহার মনস্তুষ্টি-বিধানে যত্নবান্ থাকিতেন, কিন্তু কিসে তাহার মনস্তুষ্টি হইবে, তাহা তিনি খুঁজিয়া পাইতেন না। দম্পতী-জীবনের সুখের উপভোগ চিত্রার পক্ষে নূতন হইলেও, তাঁহার পক্ষে নূতন ছিল না। তিনি সমস্তই বুঝিতেন এবং অযাচিত ভাবে প্রার্থিত, অপ্রার্থিত সমস্তই চিত্রার জন্য প্রস্তুত রাখিতেন। কিন্তু, চিত্রা বনবিহঙ্গিনীর মত তাঁহার জাল ছিড়িয়া উড়িয়া পলাইবার জন্য সর্ব্বদা ছট্‌ফট্ করিত। সে মনে

করিত,—জীবনে সুখ কই? বিজ্ঞানচন্দ্রের মত অমন পরদুঃখ-কাতর দেবতাও যখন পর হইল—তখন এ জীবনে সুখ কোথায়? দয়ার পবিত্রনির্ঝরিণী জননী বিজ্ঞানচন্দ্রের কৃপা-ভিখারিণী; অথচ তাঁহার কন্যার নিকট থাকিতে অপমান বোধ করেন। হায়! ইহার নাম কি সংসার, না এ প্রেত-ভূমি?

চিত্রার সান্ত্বনার মধ্যে ছিল, রমণীরঞ্জন বাবুর প্রথম স্ত্রীর গর্ভজাত সাত বৎসরের একটী পুত্র। সেই স্বর্গের ছবি যখন "মা মা" বলিয়া তার কোলে উঠিত, চিত্রার উত্তপ্ত বক্ষে কে যেন বরফের চাপ্ বসাইয়া দিত। সে অনিন্দ্য-সুন্দর দেব-শিশুর কমনীয় কান্তি নিরীক্ষণে চিত্রা একেবারে স্নেহে গলিয়া যাইত। সময়ে সময়ে মনে করিত, "আহা, এর মা, নাই—জগদীশ্বরের কৃপায় আমি ইহার মায়ের পদ পাইয়াছি। প্রাণ ভরিয়া শিশুকে আদর করিব।"

অতৃপ্ত সুখাবেশে তাই সে মুহুর্মুহু শিশুর মুখ চুম্বন করিত। আবার পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিত—বড় লজ্জা! পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গিনীর মত চিত্রার দিনগুলি ক্রমশঃই অতি সঙ্ক্ষেপ হইয়া আসিতেছিল। চিত্রা রায়-বাহাদুরের—গৃহিণী; চাকর চাকরাণী প্রভৃতি তাহাকে "রাণী মা" বলিয়া সম্বোধন করিত। তাহার ক্ষুদ্র বক্ষঃ তাহাতে ক্ষণিকের নিমিত্ত স্ফীত হইত, আবার পরক্ষণেই নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ-শিখার মত দপ্ করিয়া নিবিয়া যাইত। সে ভাবিত, এত সুখ কি আমার কপালে সহিবে? আবার ভাবিত, এই যদি সুখ, তবে আমার অন্তরের অন্তরতম বিজ্ঞানচন্দ্র কেন এ সুখের অংশভাগী হইলেন না? তাহার বড় কান্না আসিত। নীরবে সেই আকর্ণবিশ্রান্ত চক্ষের জলে তাহার গণ্ডস্থল ভাসিয়া যাইত।

অসহনীয় চিন্তার পরিণাম রোগ। চিত্রারও শেষে তাহাই হইল। রমণীরঞ্জনবাবু ডাক্তারের পর কবিরাজ এবং কবিরাজের পর ডাক্তার এইরূপে চিকিৎসার পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কিন্তু রোগের উপশম কিছুতেই হইল না; বরং নিত্য নূতন উপসর্গ আসিয়া সে দেহ-পিঞ্জর জীর্ণ করিতে লাগিল। রমণীরঞ্জন বাবু চিত্রার জীবনে নিরাশ হইলেন; কিন্তু বৈদ্যনাথ পরিত্যাগ করা শ্রেয়ঃ মনে করিলেন না। ৺বাবার কৃপায় কত ক্ষীণ অস্থিতে প্রাণের সঞ্চার হয়—চিত্রাও দেবতার কৃপায় এবং স্থান-মাহাত্ম্যে প্রাণ পাইতে পারে,—এই তাঁর বিশ্বাস।

চিত্রার জননী কন্যার নিকট আনীত হইলেন। তাঁহার হৃদয়ে একটা

ভাবী অমঙ্গলের ছায়া পূর্ব্বেই পড়িয়াছিল। অতীতের দুঃখ-বিপত্তি-বিজড়িত হইয়া তাহা আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিল। তিনি মনে করিলেন, বিধিলিপি অখণ্ডনীয়—সব অদৃষ্ট।

বিজ্ঞানচন্দ্র চিত্রার অসুখে দু'বেলা "বিলাস-কুটীরে" যাতায়াত করিতেছিলেন, চিত্রা তাঁহাকে একদিনও একটী কথা বলে নাই। আজ কি জানি কি মনে করিয়া, সে ধীরে ধীরে বিছানার উপর ভর দিয়া উঠিয়া বসিল। আস্তে আস্তে বিজ্ঞানচন্দ্রের হাতখানি ধরিয়া নিজবক্ষে স্থাপন করিল। বিজ্ঞানচন্দ্র সে শিথিল বক্ষ স্পর্শ করিয়া চমকিয়া উঠিলেন। মুখের দিকে চাহিতে গিয়া চিত্রার কোটরাবিষ্ট চক্ষে জল গড়াইয়া আসিল। বিজ্ঞানচন্দ্রও মুখ ফিরাইয়া দুই এক বিন্দু অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। চিত্রা আর বেশী কিছু বলিতে পারিল না, কেবলমাত্র বলিল, "দাদা, মা রহিলেন—দেখিও" বলিতে বলিতে সে পুনরায় উপাধানে মস্তক বিন্যস্ত করিল। সেই সময়ে তাহার প্রথম ফিট্ হইল।

রাত্রিতে জ্বর আরও বেশী হইল। সঙ্গে সঙ্গে পিপাসা, প্রলাপ এবং ফিট্। বিজ্ঞানচন্দ্র ও রমণীরঞ্জন-বাবু রোগিণীর পার্শ্বে রাত্রি যাপন করিলেন। একবার ফিটের সময় রমণীরঞ্জনবাবু ভেউ ভেউ করিয়া বালকের মত কাঁদিয়া উঠিয়াছিলেন। চিত্রা জ্ঞান লাভ করিয়া বিস্ফারিতনেত্রে অতি ক্ষীণস্বরে বলিয়াছিল,—"আমরা এক বৃন্তে দুইটী ফুল ফুটিয়াছিলাম; কেন তুমি ছিঁড়িয়া পৃথক্ করিয়াছিলে?"

বিজ্ঞানচন্দ্র ও রমণীরঞ্জন বাবু বুঝিয়াছিলেন,—চিত্রা বিকারে বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখরের শৈবলিনীর উক্তি মুখস্থ বলিতেছে।

পরদিন প্রভাতে নাড়ী ক্রমশঃই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া চলিল। ২॥প্রহর বেলায় সকল আশা ফুরাইয়া গেল;—বাড়ীতে ক্রন্দনের রোল উঠিল। চিত্রার জননীর মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে পথের পথিকও চক্ষের জল ফেলিল। রমণীরঞ্জনের পুত্রটী "মা মা" বলিয়া ধূলায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। বিজ্ঞানচন্দ্র রমণীরঞ্জন-বাবুকে বুঝাইবেন কি, কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহারও আরক্তিম চক্ষু দুটী ফুলিয়া উঠিল। একটী বর্ষীয়সী চাকরাণী সুর করিয়া ছড়া গাহিয়া কাঁদিতে বসিল।

কর্ম্মনাশা-তীরে ৺বৈদ্যনাথের মহাশ্মশানক্ষেত্রে চিত্রার শবদেহ ভস্মীভূত হইল। শিবগঙ্গায় স্নান করিয়া সকলেই গৃহে ফিরিয়া আসিল। বিজ্ঞানচন্দ্র

ও রমণীরঞ্জন সে রাত্রে আর বাড়ী ফিরিলেন না। চিত্রার চিতা-পার্শ্বে সেই মহাতীর্থে চিতাভস্ম মাখিয়া সারারাত্রি অতিবাহিত করিলেন ;—ভূতনাথ ভবানীপতি তাঁহাদের শোক-বিদগ্ধ হৃদয়ে বল দিলেন। বিজ্ঞানচন্দ্র ও রমণীরঞ্জন উভয়ে বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাদের অপরিপক্ক কর্ম্মফলে চিত্রার অদৃষ্টলিপি ফলিল।—সে অনাঘ্রাত বনজ-কুসুম অকালে শুষ্ক হইল!

রায়বাহাদুর রমণীরঞ্জন রায়ের যত্নেও প্রচুর অর্থব্যয়ে সেই মহাশ্মশানে চিত্রার সমাধিক্ষেত্রে একটী বৃহৎ সমাধি-মন্দির নির্ম্মিত হইল। বিজ্ঞানচন্দ্র সেই মন্দিরের বিশাল গম্বুজের উপর চিত্রার প্রদত্ত সেই সুন্দর কন্থাখানি একটী সুদীর্ঘ রৌপ্যদণ্ডে নিশানের মত ঝুলাইয়া দিলেন। নিম্নে স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিলেন—

"লক্ষ টাকা পুরস্কার"

"যে রমণী রূপে-গুণে কন্থা-শিল্পিনার যোগ্যা—তিনি প্রার্থিনী হইবেন।" অনাবৃত বৃষ্টি ও রৌদ্রতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া, চিত্রার প্রিয়কন্থা অতি অল্পকাল মধ্যেই চিত্রার পুরী দর্শন করিল। বিজ্ঞানচন্দ্রের লক্ষ টাকা অপব্যয় হয় নাই। তিনি আজীবন চিরকুমার থাকিয়া "যোগবাশিষ্ঠ" অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

এক।

যে দিন ধরায় জন্ম নিয়েছি
ছিলনাক' কেউ সাথে।
মায়া-দেহ নিয়ে একা এসেছিনু
এখনো আমি আমাতে।
মায়ার সংসারে এক ছাড়া যদি
দুই বলি' কিছু থাকিত।
মরণের কালে অচেনা রাজ্যে
কেউ কি একাকী যাইত?

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ।

কামাখ্যা ও চন্দ্রনাথ ভ্রমণ

(১)

২৬এ মার্চ্চ বুধবার। বেলা ২টা ৪ মিনিটের সময় যে ট্রেণ শিয়ালদহ হইতে ছাড়ে, তাহাতে আরোহণ পূর্ব্বক আমরা গৌহাটী যাত্রা করিলাম। দামুকদিয়া ঘাট ষ্টেশনে যখন আমাদের গাড়ী পৌঁছিল, তখন ৭টা বাজিয়া ১৮ মিনিট হইয়াছে। আমরা তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিয়া ২।৩ জন কুলী ডাকিয়া, তাহাদিগের মস্তকে দ্রব্যাদি চাপাইয়া দিয়া, ষ্টীমার অভিমুখে যাত্রা করিলাম। এখন জল অনেক কমিয়া গিয়াছে, সুতরাং আমাদিগকে প্রায় ৭।৮ মিনিটের রাস্তা পদব্রজে গিয়া ষ্টীমারে উঠিতে হইল। ষ্টীমার দ্বারা পার হইতে প্রায় ৪০ মিনিট সময় লাগে। সময়ে সময়ে আরও বেশী, এমন কি ১ঘণ্টা পর্য্যন্তও সময় লাগে।

পরপারে উঠিয়াই সারাঘাট ষ্টেশন। এই ষ্টেশনে সারি সারি কয়েকখানি গাড়ী থাকে। রেলওয়ে কর্ম্মচারিগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া আপন গন্তব্যস্থানের ট্রেণ ঠিক করিয়া লইতে হয়। আমরা দার্জ্জিলিংগামী ডাকগাড়ীতে চাপিলাম। রাত্রি প্রায় ১১॥·টার সময় গাড়ী নাটোর ষ্টেশনে পৌঁছিল। ইহা একটী উল্লেখযোগ্য ষ্টেশন। প্রাতঃস্মরণীয়া দেবী রাণী ভবানী এক সময়ে এইস্থানে বিপুল বিক্রম ও মান-মর্য্যাদার সহিত জমীদারী শাসন করিয়াছিলেন। এখানকার তৈয়ারী সন্দেশ খুব উৎকৃষ্ট।

এখান হইতে গাড়ী ছাড়িয়া কতিপয় ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া সান্তাহার পৌঁছিল। ইহা একটী জংশন ষ্টেশন। এখান হইতে একটী লাইন বাহির হইয়া লালমণির হাট ষ্টেশনে মিলিত হইয়াছে। রাত্রি অনধিক ৩টার সময় গাড়ী পার্ব্বতীপুর জংশন ষ্টেশনে পৌঁছিল। আমাদিগকে এইখানে অবতরণ করিতে হইল। যেহেতু, এই গাড়ী বরাবর শিলিগুড়ি অভিমুখে যাইবে। পার্ব্বতীপুর জংশন ষ্টেশনটী বেশ জাঁকাল রকমের। রংপুর, কাউনিয়া, কাটিগার, দিনাজপুর, মনিহারীঘাট প্রভৃতি স্থানে যাইতে হইলে এইখানে গাড়ী বদল করিতে হয়। আমরা অবতরণপূর্ব্বক ওভারব্রীজ (overbridge) পার হইয়া পরপারে গৌহাটীর গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। অল্পক্ষণ পরে গাড়ী আসিলে তাহাতে আরোহণ করিয়া

নিজেদের বিছানাপত্র পাতিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিলাম। এইখানে নামিতে হইবে,—সেইভয়ে এতক্ষণ কাহারও নিদ্রা যাওয়ার সুবিধা হয় নাই। ভোর ৬টার সময় গাড়ী লালমণির হাট জংশন ষ্টেশনে পৌঁছিল।

এই স্থানটী বেশ স্বাস্থ্যকর বলিয়া শুনিলাম। ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলপথের মধ্যে এই ষ্টেশনটী সর্ব্বশেষ বৃহৎ জংশন ষ্টেশন। ষ্টেশনটীও খুব বড়। এই-স্থানে যাত্রীদিগকে ধুবড়ী লাইন, পার্ব্বতীপুর লাইন, কাউনিয়া ও সান্তাহার লুপ প্রভৃতি ষ্টেশন সকলে যাইবার জন্য গাড়ী বদল করিতে হয়। একগাড়ী হইতে নামিয়া অন্য লাইনের গাড়ীতে উঠিতে হইলে, অত্রত্য রেলকর্ম্মচারী-দিগকে বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া লইতে হয়। নতুবা এক গাড়ীতে উঠিতে গিয়া ভুলক্রমে অন্য লাইনের গাড়ীতে উঠিয়া পড়া অসম্ভব নহে। স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া এখানে ডিষ্ট্রীক্ট ট্রাফিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (District Traffic Superintendent) আফিস ও রেলওয়ে উর্দ্ধতন ও অধস্তন কর্ম্ম-চারীদিগের কোয়ার্টার আছে। ইহা একটী জিলা ষ্টেশন।

২৭এ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার। বেলা ৭টার কিছু পূর্ব্বে আমাদের গাড়ী ছাড়িল ও একঘণ্টার মধ্যেই গোলোকগঞ্জ জংশন ষ্টেশনে পৌঁছিল। এইস্থান হইতে গৌহাটী লাইন (Gollockganj—Gouhati Fxtecsion) আরম্ভ হইয়াছে। এই শাখা লাইনটী ঘুরিলে সকলেই বেশ বুঝিতে পারিবেন যে, ইহা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য রেলপথ। ৭।৮ ক্রোশের মধ্যে লোকালয়চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয় না ; আবার স্থানে স্থানে স্বচ্ছন্দবনজাত বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সকল এরূপ ঘন সন্নিবিষ্ট ভাবে দণ্ডায়মান যে, হঠাৎ দেখিলে মনে ভীতির সঞ্চার হয়। স্থানে স্থানে সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিতে পারে না। যাহা হউক, আমাদের বাষ্পীয়-যান এইরূপে কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ষ্টেশন পাস্ (Pass) করিয়া, সরভোগ ষ্টেশনে পৌঁছিল। এখানে একটী রিফ্রেশমেণ্ট রুম (Refresment Room) আছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ইউরোপীয় আরোহিগণ, সাধারণতঃ পথি-মধ্যস্থিত (Road side Station) ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া, তাঁহাদের ক্ষুৎ-পিপাসার নিবৃত্তি করিয়া থাকেন। সরভোগ হইতে গাড়ী ছাড়িয়া নলবাড়ী ও পরে রঙ্গিয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। এইস্থান হইতে রঙ্গিয়া টাংলা লাইন (Rangiya Tangla Extension) আরম্ভ হইয়াছে। বেলা ১টা ২৫ মিনিটের সময় গাড়ী আমিনগাঁঘাট ষ্টেশনে পৌঁছিল। আমরা এখানে অব-তরণ করিয়া ব্রহ্মপুত্র নদের উপর দণ্ডায়মান 'ফেরি' ষ্টীমারে উঠিলাম। ষ্টীমার

ছাড়িয়া কয়েক মিনিট পরেই পরপার পাণ্ডুঘাট ষ্টেশনে পৌঁছিল। এইস্থানে পুনরায় রেলে উঠিয়া কামাখ্যা ও গৌহাটী ষ্টেশনে যাইতে হয়। আমরা এখানে ষ্টীমার হইতে নামিতেই অনেক 'পাণ্ডা' আমাদিগকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল এবং "আপনাদের আদি পাণ্ডা কে, আমাদের বাটীতে আসুন, আমরা খুব যত্ন করিব" ইত্যাদি নানারূপ প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। পূর্ব্বদিবস ২টা হইতে আজ ১টা ২টা পর্য্যন্ত ট্রেণে ভ্রমণ করা এবং স্নানাহার ও নিদ্রার ব্যাঘাত হওয়াতে শরীর তত ভাল ছিল না, সুতরাং তাহাদিগের সহিত অধিক বাক্যব্যয় করিতে পারিলাম না। অল্প-স্বল্প দুই চারি কথায় তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলাম যে, "হোমেশ্বর জীবেশ্বর নামক দুই ভাই পাণ্ডা আমাদের আদি পাণ্ডা।" এই কথা বলাতে তাহারা সকলেই আমাদিগকে ছাড়িয়া দিল ও তন্মধ্য হইতে বৃদ্ধগোছের একজন আসিয়া আমাদিগকে বলিল, "আপনারা আমার সঙ্গে আসুন, আমি হোমেশ্বর জীবেশ্বরের লোক" ; সুতরাং আমরা সকলে তাহারই অনুসরণ করিতে বাধ্য হইলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে ঐ ব্যক্তি আমাদিগকে বলিল যে, "আপনাদের সহিত স্ত্রীলোক দেখিতেছি—আপনারা যদি পাণ্ডুঘাটে গাড়ীতে উঠিয়া কামাখ্যা ষ্টেশনে নামিয়া, পুনরায় পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করেন, তবে সেই দিক্‌কার রাস্তা অপেক্ষাকৃত খারাপ ; পাথর ধরিয়া ধরিয়া পার হইয়া তবে উঠিতে পারা যায় ; তদপেক্ষা নদীতীর হইতে যে রাস্তা মা'র মন্দিরাভিমুখে গিয়াছে, তাহা বেশ ভাল রাস্তা ;—এখন কোন দিক দিয়া যাইতে ইচ্ছা করেন, বলুন ?" আমরা পাণ্ডাঠাকুরের ইচ্ছামত নদীতীরের রাস্তা দিয়াই উঠিতে স্বীকৃত হইলাম। রাস্তা স্থিরীকৃত হইলে আমরা নিজ নিজ মোটমাটারি সমভিব্যাহারে, তীর হইতে কিছু দূরে একটা স্থান মনোনীত করিয়া লইয়া, তথায় জিনিষপত্র নামাইয়া শৌচাদি কার্য্য সমাপন পূর্ব্বক, ব্রহ্মপুত্র নদে স্নান করিলাম ও পাণ্ডাঠাকুরের নির্দ্দেশানুযায়ী 'পাণ্ডবেশ্বর শিব' দর্শন করিলাম। পাণ্ডাদের মুখে শুনিলাম,—মহাভারত-কথিত পঞ্চপাণ্ডবেরা অজ্ঞাতবাস হইতে দেশে ফিরিবার সময়ে, এই ঘাটে স্নান করিয়া শিবস্থাপনা করিয়া পূজা করিয়াছিলেন, সেই হইতে এই স্থানের নাম পাণ্ডুঘাট হইয়াছে। ইহার মূলে কতটুকু সত্য নিহিত আছে, জানি না। তৎপরে চারি আনাতে (যেহেতু সংখ্যায় আমরা চারিজন ছিলাম) এক ক্ষুদ্র নৌকা ভাড়া করিয়া যাত্রা করিলাম। আন্দাজ ১৫ মিনিটের পথ আসিয়া একস্থানে আমাদিগকে নামাইয়া দিল। পূর্ব্বকথিত বৃদ্ধ পাণ্ডাঠাকুর আমা-

দের সঙ্গেই ছিলেন। একজন মাঝিকেই মুটিয়ারূপে নিযুক্ত করিয়া মোটমাটারি তাহার মস্তকে চাপাইয়া, সকলে পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। শুনিলাম,—এই রাস্তাটী মহারাজা দ্বারবঙ্গাধিপতির ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। মহারাজার এই নিঃস্বার্থ পরোপকারে, তিনি কোটী কোটী যাত্রীর প্রাণের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছেন এবং যতদিন এই রাস্তার শেষ চিহ্নটুকু বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন তিনি প্রত্যহ এইরূপে যাত্রীদের আন্তরিক আশীর্ব্বাদ লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। পাহাড়ে উঠিতে খুব কষ্ট হয় নাই। বেলা আন্দাজ ৪ ঘটিকার সময়ে আমরা পূর্ব্বকথিত হোমেশ্বর জীবেশ্বরের বাটীতে উপস্থিত হইলাম। তথায় কিছুকাল বিশ্রামের পর স্ত্রীলোকেরা রন্ধনাদি আরম্ভ করিলেন। কামাখ্যা পর্ব্বতোপরি যে কয় ঘর বাসিন্দা আছে, তন্মধ্যে ইঁহারাই সমধিক সঙ্গতিপন্ন ও যাত্রীদিগের থাকিবার এরূপ উৎকৃষ্ট বাসা এখানে আর একটীও নাই। যাহা হউক, রন্ধনাদি সমাপ্ত হইলে, সকলে আহারাদি সমাপন করিয়া নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

(২)

২৮এ মার্চ্চ শুক্রবার। প্রাতঃকালে পাণ্ডাঠাকুরদের 'বাজখাঁই' আওয়াজে সকলের নিদ্রাভঙ্গ হইল। উঠিয়া দেখি—৭।০টা বাজিয়া গিয়াছে, সুতরাং বেশ বেলা হইয়াছে। সকলে তাড়াতাড়ি উঠিয়া হস্তমুখ প্রক্ষালনানন্তর নিত্যকর্ম্ম সমাধা করিয়া, জনৈক পাণ্ডাঠাকুরের সহিত স্নান করিতে গেলাম। যেখানে স্নান করিতে হয়, সকলে তাহাকে জ্ঞানগঙ্গা কহে। ইহা একটী অতিক্ষুদ্র জলাশয় মাত্র। ইহার জল আবার এত অপরিষ্কার যে, স্নান করিবার যে মুখ্য উদ্দেশ্য—গাত্র পরিষ্কার রাখা, তাহা তো হয়ই না, উপরন্তু কয়েকদিন ক্রমান্বয়ে স্নান করিলে কঠিন পীড়া হইতে পারে। অবশ্য, পল্লীবাসিমাত্রেরই যেমন ম্যালেরিয়া কতকটা সহিয়া গিয়াছে, এখানকার অধিবাসীদিগেরও সেইরূপ জলাভাব সহিয়া গিয়াছে। এখানকার অধিবাসীরা সাধরণতঃ অত্যন্ত অপরিষ্কার ভাবে থাকে; ইহার কারণ সম্ভবতঃ জলকষ্ট। কারণ, আমি এত দেশ ঘুরিয়াছি, কিন্তু এত জলকষ্ট কোথাও দেখি নাই। যদি কোনও মহাত্মা এখানকার অধিবাসীদের প্রধান কষ্ট (জলকষ্ট) নিবারণ করিয়া দেন, তবে তিনি অক্ষয়কীর্ত্তি লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। এই পুষ্করিণী ছাড়া আরও ২।১টী পুষ্করিণী এখানে আছে, তাহার জল আরও অব্যবহার্য্য। তাহাতে বাসনাদি ধৌত ইত্যাদি কার্য্য নির্ব্বাহ হয় মাত্র।

আর এটীতে কেবল মাত্র স্নানকার্য্য সমাধা হয়। এখানকার পুষ্করিণীর নীচে বালি ও পাথর। সাবধান হইয়া স্নান করিতে হয়, নতুবা পাথরে পা বাধিয়া হোঁচট্ লাগিতে পারে। জলের উচ্চতা ৪।৫ ফুটের অধিক নহে ; 'পাড়' প্রস্তর বাঁধান। পানীয়রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে, এরূপ কোনও জলাশয় বা জলপ্রপাত (Waterfalls) এখানে নাই। তবে মা'র মন্দির হইতে প্রায় ১৫ মিনিটের রাস্তা নিম্নে একস্থানে একটী 'ঝরণা' (Spring) আছে। সেটীর পরিসর ১বর্গহাতের কিছু বেশী। তাহার জল কেবলমাত্র পানীয়রূপে ব্যবহৃত হয়। তাহাতে বাসন মাজা, কাপড় কাচা বা স্নান ইত্যাদি সম্পন্ন করিতে দেওয়া হয় না ; কারণ, তাহাতে জল অপরিষ্কার ও অব্যবহার্য্য হইতে পারে। অনেকে হয় ত বলিবেন যে, পর্ব্বত-নিম্নে ব্রহ্মপুত্র নদ আছে, তবে এত জলকষ্ট কেন ? ইহার উত্তরে তাঁহাদিগকে বলিতে পারি যে, ১ মাইল ১॥০ মাইল রাস্তা পার্ব্বত্য পথে উঠা নামা করিয়া, জল লইয়া আসিয়া ব্যবহার করা কিরূপ শ্রমসাধ্য ব্যাপার, তাহা যিনি সেখানে কখনও না গিয়াছেন, তাঁহাকে বুঝান শক্ত।

কামাখ্যা পল্লীটী অনেকটা দার্জ্জিলিং সহরের মত। অবশ্য যাঁহারা সেখানে কখনও যান নাই, তাঁহদিগকে সরলভাবে বুঝাইয়া দিবার ক্ষমতা আমার নাই। দার্জ্জিলিংএ রাস্তা ঘাট যেরূপ উঁচু-নীচু,—পাথর বাঁধান, এখানেও অনেকটা সেইরূপ। তবে ততটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নহে। এখানে সামান্য একটী বঙ্গবিদ্যালয় আছে। যাহা হউক, স্নান করিবার কথায় কথায় অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি, সহৃদয় পাঠকবর্গ ক্ষমা করিবেন ;—এই সমস্ত অভাব অভিযোগের বিষয় সাধারণের গোচর করাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য—তাই অতদূর আসিতে হইয়াছে। আমরা 'জ্ঞানগঙ্গায়' স্নান সমাপন করিয়া, পাণ্ডাঠাকুরের আবৃত্তিকৃত মন্ত্র পাঠ করিয়া সংকল্প করিলাম ও তৎপরে তীরে উঠিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তনানন্তর মা'র মন্দিরাভিমুখে চলিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মা'র পূজা শেষ হয় নাই বলিয়া, দ্বার খোলা পাইলাম না। তখন বেলা প্রায় ৯টা হইবে। পাণ্ডাঠাকুর বলিলেন যে "এখন তো দর্শন হবে না, তবে ততক্ষণ চলুন, আপনাদিগকে দশ মহাবিদ্যার মন্দির সকল দর্শন করাইয়া আনি।" আমরা অগত্যা এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিতে বাধ্য হইলাম। কামাখ্যা মন্দির হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল উর্দ্ধে পাহাড়ের উপর, দশ মহাবিদ্যার চতুর্থ-মহামাতা, ভুবনেশ্বরী দেবীর মন্দির।

এই পর্ব্বত-চূড়াটী অন্যান্য কয়েকটী অপেক্ষা উচ্চতম ; সুতরাং এখান হইতে পূতপ্রবাহ ব্রহ্মপুত্র ও গৌহাটী সহরটী বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে পাণ্ডাঠাকুর মহাশয়ের আবৃত্তিকৃত মন্ত্র পাঠ, সংকল্প ইত্যাদি সমাপন করিলাম ও তথা হইতে পুনরায় অর্দ্ধমাইল নিম্নে অবতরণ করিয়া, দ্বিতীয়-মহাবিদ্যা তারাদেবীর মন্দিরে উপনীত হইলাম। এখানে দর্শন ও পূজাদি সমাপ্ত হইলে, পুনরায় কয়েকটী আঁকা-বাঁকা উচু-নীচু রাস্তা পার হইয়া সপ্তম-মহাবিদ্যা ধূমাবতীর মন্দিরে আসিলাম।

ইনি বিধবা,—এই জন্য সধবা স্ত্রীলোকদিগের ইঁহাকে স্পর্শ করিতে নাই। এখানে দর্শন ও পূজাদি শেষ হইলে পাণ্ডাঠাকুর বলিলেন "অন্যান্য যে কয়েকটী মহাবিদ্যার মন্দির আছে, তাহা অত্যন্ত দূরে দূরে অবস্থিত ; পথও অতি দুর্গম ; সবগুলি দেখা সম্ভবপর নহে ; তাহা হইলে এইখানেই ৫।৬ দিবস থাকিতে হয়—বেলাও অনেকটা হইয়া গিয়াছে। যে সকল যাত্রী এখানে আসেন, তাঁহারা মোটামুটীরূপে এই কয়েকটী দেখিয়াই চলিয়া যান।" তাহার কথানুসারে আমরাও সকলে তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক কামাখ্যা-মন্দিরে উপনীত হইলাম।

এইখানে আরও কয়েকটী কথা বলি। যে সমস্ত মন্দির মধ্যে মহাবিদ্যা-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা আছেন, তাহা গড়ান বা প্রস্তরনির্ম্মিত মূর্ত্তি নহে। এক একটী প্রস্তর খণ্ড। তা ছাড়া মন্দির মধ্যে এত বেশী অন্ধকার যে, দুই তিনটা বাতি লইয়াও অতিকষ্টে মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। প্রবেশ করিয়া বাতির আলোকসাহায্যে ১০।১৫টী করিয়া সিঁড়ী ভাঙ্গিয়া, নীচের দিকে নামিয়া গিয়া তবে দেবী-মূর্ত্তি দর্শন করিতে হয়। যাত্রীদিগকে বিশেষ সাবধান হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়, ইহা বলাই বাহুল্য মাত্র।

যাহা হউক, এইবার আমরা আসিয়াই মন্দির খোলা পাইলাম। ভিতরে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই মা'র, অষ্টধাতু-নির্ম্মিত "দ্বাদশভুজা" প্রতি-মূর্ত্তি দর্শন করিলাম। হস্তিদলনকারী-সিংহোপরি, দেবদেব মহাদেবের নাভিস্থল হইতে উত্থিত সহস্রদলোপরি, মা'র মূর্ত্তি স্থাপনা করা রহিয়াছে। তাহার পর আরও একটী ঘর পার হইয়া 'পীঠ' মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। এখানে দেখিলাম,—৮ বর্গহাত পরিমিত রৌপ্যমণ্ডিত স্থানের ভিতরে একহাত অন্তর, একবাহু প্রমাণ লম্বা ও দ্বাদশ অঙ্গুলি চওড়া একটী একটী যোনি স্থাপিত আছে ও সেই সমস্ত যোনিদেশের সম্মিলন কেন্দ্রস্থল হইতে গম্বুজাকারে উত্থিত

একখানি পাষাণ মূর্ত্তি। ইনিই মহাদেবী রূপে আখ্যাত হইয়া থাকেন। ইহা দর্শন করিলে সত্য সত্যই দেহ কণ্টকিত ও রোমাঞ্চিত হয়। এমন কি নাস্তিকের মনেও ভয় ও ভক্তির উদয় হয়।

হিন্দুমাত্রে সকলেই জানেন যে, অধুনা কলিকালে ৫১টী পীঠস্থানের মধ্যে এই মহাপীঠই হিন্দু বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের অত্যন্ত ভক্তির বস্তু। অবশ্য, তাই বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, আমি অন্যান্য পীঠস্থান সমূহের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমি এখানে আসিয়া যেরূপ যাহা শুনিয়াছি ও দেখিয়াছি, তাহাই অবিকল এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিলাম। নিজের মনগড়া কোনও কথা বা অন্য কোনও রূপে বাহ্যাড়ম্বর করি নাই॥

সতীমাতা তাঁহার পিতা দক্ষরাজের "শিবরহিত যজ্ঞে" উপস্থিত হইবার জন্য মহাযোগী শঙ্করের নিকট অনুমতি চাহিয়াছিলেন; কিন্তু অনুমতি না পাইয়া এরূপ ক্রোধান্বিতা হইয়াছিলেন যে, মহাদেব তখন যেদিকে মুখ ফিরান, সেই দিকেই মহাসতীর এক একটী স্বতন্ত্র অপরা মহাবিদ্যা মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। দিক্ দশটী, সেই জন্য দশ-মহাবিদ্যা মূর্ত্তির সৃষ্টি। শেষে সতীমাতা দক্ষালয়ে গমন পূর্ব্বক শিবনিন্দা শ্রবণে যোগাসনে উপবেশন করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। তখন শঙ্কর সেই মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া উন্মত্তবৎ ভ্রমণ করিতে থাকেন,—তদ্দর্শনে বিষ্ণু সুদর্শন চক্রদ্বারা সেই শবদেহ ৫১ অংশে বিভক্ত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পাতিত করিয়াছিলেন। যে যে স্থানে সতীদেহের অংশ পতিত হইয়াছে, সেই স্থানেই এক একটী মহাপীঠ স্থাপিত হইয়াছে। এই স্থানে যোনিদেশ পতিত হওয়ায় ইহাকে যোনিপীঠ কহে। এখানে অম্বুবাচীর সময়ে খুব ধূম হয়; তখন এ স্থানে ২০।২৫ সহস্র যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। মা অশুচি অবস্থায় থাকেন বলিয়া অম্বুবাচীর কয়েক দিবস দ্বার বন্ধ থাকে, তখন মা'র পূজাও হয় না। পরে অম্বুবাচীর নিবৃত্তি দিবসের পর দিবস মহাসমারোহের সহিত পূজা হইয়া থাকে এবং যাত্রীদিগেরও খুব বেশী ভিড় হয়। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের ধারণা আছে যে, এই সময়ে এই স্থানে দেবী দর্শন করিতে পারিলে আর পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

মা'র ভোগের জন্য যাত্রীদিগের নিকট হইতে যে পূজার পয়সা আদায় করা হয়, এস্থলে তাহার বিষয় একটু বলা আবশ্যক। যেহেতু আমাদের দেশের সহিত ইহার একটু তারতম্য আছে, এবং এই তারতম্যটুকু প্রত্যে-

কেরই জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য। যদি কেহ ১৬ আনার পূজা দেন, তবে তাঁহাকে আরও ৸৹ বার আনা অধিক দিতে হইবে; না দিলে পূজারি ঠাকুরেরা পূজার পয়সা গ্রহণ করেন না। এক পয়সার পূজা দিলে দুই পয়সা, এক আনার দিলে সাত পয়সা, চারি আনায় সাত আনা; অর্থাৎ যাঁহার পূজা দেওয়া যাইবে,—পুনরায় তাহার তিন চতুর্থাংশ দিতে হইবে। শুধু ইহা লইয়া ক্ষান্ত হইলে তো সৌভাগ্য মানিতাম। প্রত্যেক মন্দির হইতে বাহির হইবা-মাত্র, এক একটী ভগ্ন,—অর্দ্ধ-ভগ্ন প্রস্তর মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয়। কিসের মূর্ত্তি, তাহা চিনিবার কোনও উপায় নাই। মাত্র পূজারী ব্রাহ্মণ-প্রদত্ত অভিনব নামে ঘোষিত হইতেছেন। তাঁহাদের গাত্রে, এরূপভাবে এত বেশী তৈল ও সিন্দূর প্রদত্ত হইয়াছে যে, হঠাৎ দেখিলে ভয় হয়। ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরা যাত্রীদিগকে, ইনি অমুক ঠাকুর, এখানে অমুক ঠাকুরের এত পূজা দিতে হইবে, এইরূপ কতকগুলি সত্যমিথ্যা-জড়িত কাহিনী শ্রবণ করাইয়া, পয়সা আদায় করিয়া থাকেন। শুধু যে এখানেই এইরূপ, তাহা নহে; পূর্ব্বোক্ত দশমহাবিদ্যার মন্দির সকলেও এইরূপ। প্রত্যেক জায়গাতেই সংকল্প করিতে ১টী পয়সা চাই; তার দক্ষিণা দুটী পয়সা চাইই। তারপর যাত্রীদের ইচ্ছামত পূজার পয়সা, পূজারি ব্রাহ্মণের পয়সা ইত্যাদি দিতে হয়; তারপর আবার দ্বারবান বা গৃহপরিষ্কারকের পয়সা বা বক্‌শিশ ইত্যাদি। রাস্তার যেখানে সেখানে ঐরূপ এক একটী প্রস্তরনির্ম্মিত ভগ্ন বা অর্দ্ধভগ্নমূর্ত্তি তৈল সিন্দুরাক্ত কলেবরে দণ্ডায়মান থাকিয়া, অতীত যুগের ধর্ম্মবিশ্বাসের বিষয় প্রত্যেকের মনে জাগাইয়া দিতেছেন। এখানেও যাত্রী-ঠকাইয়া পয়সা আদায় করা হয়। অবশ্য সর্ব্বস্থানেই যে তাঁহাদের চেষ্টা সফল হয়, এরূপ নহে।

এই মূর্ত্তিসকল দর্শন করিলে বৌদ্ধদেবের সমসাময়িক মূর্ত্তি বলিয়া মনে হয়। তারপর সে যুগের অবসানে, ধর্ম্মের ভাণ মাত্র দেখাইয়া, দুর্দ্দান্ত কাপালিকগণ ঘোর নিষ্ঠুরাচরণে প্রবৃত্ত ছিল; ঠিক সেই সময়ে মহাদেবের অংশস্বরূপ জগৎপূজ্য শঙ্করাচার্য্য ঐ সমস্ত কাপালিকগণের অত্যাচার প্রতি-বিধানকল্পে কামরূপে আগমন করেন ও তাঁহার শিষ্যগণ, কাপালিকদিগকে যথোচিত শাস্তি দিয়া এবং এই সকল প্রস্তরমূর্ত্তি ভগ্ন করিয়া দিয়া চলিয়া যান। সেই সমস্ত ভগ্নাবশেষ এখনও বর্ত্তমান।

আরও এক কথা; আমাদের দেশে একটী প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায় যে, কামাখ্যাতে গেলে পুরুষ মানুষ 'ভেড়া' হইয়া যায়। এই তথ্যানুসন্ধানে

আমি অনেক চেষ্টা করিয়া যাহা জানিয়াছি, তাহা এই স্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম।

(৩)

কামাখ্যা পল্লীটী কামরূপ জিলার অন্তর্গত। লোকে সাধারণতঃ ইহাকে কামরূপকামাখ্যা বলিয়াই অভিহিত করিয়া থাকে। এখানকার অধিবাসীদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক, ইহারা বেশ সুন্দরী; কতকটা স্বাধীন-ভাবেই থাকে। যুবতীগণ পরপুরুষের সাক্ষাতে ঘোমটা খুলিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে কোনওরূপ লজ্জা বা দ্বিধা বোধ করিত না। (এইখানে 'করিত না' ভবিষ্যৎ কাল ব্যবহার করিলাম,—তাহার কারণ, এই 'ভেড়া' হওয়া ব্যাপার এই সময়ের বহুপূর্ব্বে ঘটিত। এখন প্রায়ই ঘটে না। এখন পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রবেশ করিয়া দেশকে অনেক পরিমাণে উন্নত করিয়াছে) আমাদের দেশের কামান্ধ যুবকগণ এখানে আসিয়া, ইহাদের এইরূপ স্বাধীনভাবে কথাবার্ত্তা দেখিয়া মোহিত হইয়া যাইত; আর দেশে ফিরিবার নাম করিত না।

আমরা মা'র মন্দির হইতে বাহির হইবামাত্র ৩০।৩৫টী ছোট বালকবালিকা ও যুবতীগণ আমাদিগকে ঘিরিয়া ধরিয়া "একটী পুইসা দে, একটী পুইসা দে" বলিয়া ব্যস্ত করিয়া তুলিল। আমরা সাধ্যমত ২।৪ জনকে কিছু কিছু দিয়া বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। বাসায় পৌঁছিয়া মেয়েরা কুমারীপূজা ও ব্রাহ্মণভোজন এবং এয়স্ত্রী-ভোজন ইত্যাদি ব্যাপারে লিপ্ত রহিলেন। আমার ক্ষুধা অত্যন্ত প্রবল ছিল, সুতরাং পাণ্ডাঠাকুরদের রন্ধনকৃত অন্নব্যঞ্জনাদি ভক্ষণ করিয়া লইলাম। এই সমস্ত কুমারীপূজা ইত্যাদি সম্বন্ধে এখানে একটী কথা বলিয়া রাখি। আমরা রাঁধিয়া দিলে তাহারা কেহই খাইবে না। পূর্ব্বাহ্নেই যে কয়জন কুমারী, ব্রাহ্মণ ও এয়স্ত্রী ভোজন করাইতে ইচ্ছা করেন, তাহার মূল্য সায় দক্ষিণা, পাণ্ডার হস্তে দিতে হয়। কুমারী প্রত্যেকটীর হিসাবে ॥০ আট আনা, এয়স্ত্রী প্রত্যেকের হিসাবে ৸০ আনা ও প্রত্যেক ব্রাহ্মণ হিসাবে ১৲ একটাকা লইয়া থাকেন। পাঠক! একবার ভাবিয়া দেখুন যে, ছোট একটী কুমারী, বা এয়স্ত্রী বা ব্রাহ্মণ কত পয়সার জিনিষ খাইতে পারেন। তাও যদি বুঝিতাম যে, ষোড়শোপচারে উত্তমরূপে খাওয়ান হইত, তাহা হইলে খরচ করিয়া মনকে প্রবোধ দিতে পারিতাম। কিন্তু খাদ্যের মধ্যে লুচি, একটামাত্র মোটামুটী রকমের তরকারী, ছোলার দাইল, দধি ও হালুয়া; ইহাই খাওয়াইবার উপকরণ। যাহা হউক, ইহাতে যে পাণ্ডা ঠাকুরদের বেশ লাভ হয়, তাহা

সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। অবশ্য ইহাও বলিয়া রাখি যে, সুযোগ বুঝিয়া পাণ্ডাঠাকুরদের কাকুতি মিনতি করিলে মোটের উপর সামান্য কিছু কমও হইতে পারে। এখানকার আহারীয় সামগ্রীর মধ্যে আতপতণ্ডুলই অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। দাইলের মধ্যে ছোলা ও অড়হর বেশী। মুগ বা অন্যান্য দাইল খুবই কম। তরকারীর মধ্যে আলুটাই সাধারণতঃ পাওয়া যায়। বেগুণ, পটোল বা অন্যান্য সাময়িক শাক সব্জী অতি অল্প পরিমাণে মধ্যে মধ্যে গৌহাটী সহর হইতে আসিয়া বিক্রীত হয়। মাছও ঐরূপ গৌহাটী হইতে মধ্যে মধ্যে আসে। মাংসটা প্রায়শঃই পাওয়া যায় এবং তাহা কলিকাতার বাজারের মাংস অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এখানকার সাধারণ স্বাস্থ্য বেশ ভাল। যাহা হউক, এইসমস্ত ব্যাপার সম্পন্ন হইলে স্ত্রীলোক-দিগের রন্ধন করিয়া আহারাদি কার্য্য সম্পন্ন করিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। তৎপরে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পাণ্ডাঠাকুরকে ডাকিয়া 'সুফল' 'সফল' বা সাফল্যলাভের দর্শনী স্বরূপ প্রত্যেকে ২৲ টাকা করিয়া দিলাম। সে দিনের মত কার্য্য সমাপ্ত হইল। পরে পাণ্ডাঠাকুরের সাহায্যে একজন মাঝিকে আনাইয়া, তৎপর দিবস প্রাতে উমানন্দ ভৈরব, অশ্বক্রান্তা, উর্ব্বশী প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন জন্য একখানি নৌকার বন্দোবস্ত করিয়া রাখিলাম। ভাড়া স্থির হইল ৩।৹ সাড়ে তিন টাকা। বর্ষাকালে নদবক্ষ স্ফীত ও বিস্তৃত হয় বলিয়া সে সময়ে এই নৌকা ভাড়া ৬।৭ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে। একে ত বর্ষাকালে একটু দূরে কোথাও যাইতেই কষ্ট পাইতে হয়, এতদূরে আসিতে খুবই কষ্ট পাইতে হয়। বিশেষতঃ বিদেশে মেয়েছেলে সঙ্গে লইয়া বর্ষাকালে তীর্থ ভ্রমণের যে কত কষ্ট, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্য কেহ সহজে বুঝিবেন না। সুতরাং যদি তীর্থ দর্শন করিতে হয় (বিশেষ পার্ব্বত্যপ্রদেশীয় তীর্থ) তবে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ লোকের পক্ষে এই সময়ে আসাই উচিত। ইহাতে অনেক বিষয়ের সুবিধা হয়। এরূপ অনাহূতরূপে উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া পাঠকবর্গ ক্ষমা করিবেন।

ক্রমশঃ—

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

———

মালদহ সাহিত্য-সম্মিলন।

সভাপতির অভিভাষণ। *

সমবেত সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যানুরাগী ভদ্রমণ্ডলী!

অদ্য আমরা মালদহ সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে সম্মিলিত, ভাষা-জননীর মন্দিরদ্বারে আজ আমরা পূজার অর্ঘ্য লইয়া উপস্থিত আজ আমাদিগের বড় আনন্দের দিন। এই আনন্দের দিনে আপনারা আমার ন্যায় নগণ্য সাহিত্যসেবীকে সেই আনন্দের, সেই পরামৃতের অংশভাগী করিয়া আপনাদের উদার হৃদয়ের ও মহানুভবতার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা ব্যক্ত করিবার ভাষা আমার নাই। আজ আপনারা নিজ গুণে যে পদে আমাকে বরণ করিয়াছেন. আমি জানি যে, আমি সে পদের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ; তবে আমার ইহা গ্রহণ করিবার পক্ষে এইটুকু কৈফিয়ৎ দিলে বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানী মালদহ বাসীদের। বৈষ্ণবকুলতিলক শ্রীল-রূপসনাতন-অধ্যুষিত বৈষ্ণবতীর্থ মালদহ জেলার সম্ভ্রান্ত সাহিত্যসেবী-দিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে পারি, এরূপ শক্তি মাদৃশ বৈষ্ণব দাসানুদাসের নাই। আজ আমরা ছোট বড় নির্ব্বিশেষে সকল সন্তান মাতৃ-মন্দিরে মার অলক্ত-রাগ-রঞ্জিত চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে এই মালদহ জেলায় সমবেত হইয়াছি। আসুন সকলে মিলিয়া সমস্বরে বলি :—

আজি গো তোমার চরণে জননি
আনিয়া অর্ঘ্য করি মা দান,
ভক্তি-অশ্রু-সলিল-সিক্ত শতেক ভক্ত
দীনের গান।

* * * * *

চাহি নাক' কিছু তুমি মা আমার
এই জানি, কিছু নাহি জানি আর,
তুমি গো জননী হৃদয় আমার
তুমি গো জননি আমার প্রাণ।

---

* মালদহ সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে পঠিত।

প্রাণময়ী, সর্ব্বার্থসাধিকা আশাতোষিণী ভাষা-জননীর চরণে প্রণতঃ হইয়া এক্ষণে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইব। এই যে আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি—মাতার পূজার দ্বারে অর্ঘ্য লইয়া উপস্থিত হইয়াছি, ইহার পরিকল্পনা আধুনিক যুগে ফরাসী রাজধানী পারী নগরাতে প্রথম সূচিত হয়। ফলে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে International Oriental Congress নাম দিয়া এক বিরাট সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হয়। ফ্রান্সের এই মহদ্দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত হইয়া লণ্ডন, সেণ্টপিটার্স বর্গ, ফ্লোরেন্স্, বারলিন, লিডেন প্রভৃতি প্রদেশ অদ্যাবধি এই সাহিত্য-সম্মিলন ব্যাপারটার রীতিমত সাময়িক অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছে। আট বৎসর পূর্ব্বে (১৩১২ বঙ্গাব্দে) আমাদের বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালী জাতির মধ্যে কএকজন বাণীর কৃতী সন্তানের চেষ্টায় এইরূপ একটা সাহিত্য-সম্মিলনের আয়োজন হইয়াছিল; আমাদের কপালের দোষে সে বৎসর সম্মিলনের সমস্ত আয়োজন পণ্ড হইয়া যায়। তারপর ১৩১৪ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাসে কাশিমবাজার রাজবাটীতে সাহিত্য-সম্মিলনের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। সেই বৎসরই উত্তরবঙ্গে, উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের সূচনা হয়। ফলে কাশিমবাজার, রাজসাহী, ভাগলপুর, ময়মনসিংহ, চুঁচুড়া, চট্টগ্রামে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের এবং রঙ্গপুর, বগুড়া, গৌরীপুর, মালদহ, কামরূপ ও দিনাজপুরে উত্তর বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের অনুষ্ঠান হয়। গতবর্ষে শ্রীহট্টেও একটী প্রাদেশিক সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মালদহবাসিগণ, আজ মালদহ সাহিত্য-সম্মিলনের অনুষ্ঠান করিয়া, সাহিত্যিক জ্ঞানবিস্তার ও বঙ্গভাষার অনুশীলন করিবার যে শুভ সূচনা করিয়া দিয়াছেন, মঙ্গলময়ের মঙ্গল আশীষে তাহা ফলপ্রসূ হউক এবং এই সম্মিলন যেন দেশের ও দশের উপকার করিয়া ধন্য হইতে পারে, দেশে সৎ-সাহিত্যের প্রচারকল্পে সহায় হইতে পারে আর জ্ঞান ও নীতিশিক্ষার দ্বারা চরিত্রবলে বলীয়ান্ করিয়া ভবিষ্যতের আশাস্থল সমাজের মেরুদণ্ডস্বরূপ যুবক সম্প্রদায়কে সমাজের কল্যাণকল্পে স্বদেশ-হিতব্রতে দীক্ষিত করিতে পারে। এক্ষণে এইরূপ সম্মিলনের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা, দেখা যাউক। জ্ঞান জাতি বা ব্যক্তির ভিতর সীমাবদ্ধ থাকিলে, বদ্ধ জলের ন্যায় কালে দুষ্ট হইয়া পড়ে। জ্ঞান বেগবান্ নদের ন্যায় সমাজের স্তরে স্তরে প্রবাহিত না হইলে, মানবের উপকারে আসিতে পারে না। জ্ঞান বিস্তার করিতে হইবে। এই প্রচার কার্য্য একের দ্বারা বা এক সমাজের দ্বারা সম্ভবপর হইতে পারে না—সম্মিলিত

চেষ্টায় এই কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে। তাই বঙ্গের বরেণ্য কবিবর রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—নির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যক্তিগত চেষ্টা অপেক্ষা সমবেত চেষ্টাই অধিক সাফল্য লাভ করে। সকলের সামর্থ্য সমান নয়, সকলেই যে-কাযে শক্তি নিয়োজিত করে, তাহা হইতে খুব বড় একটা ফললাভ করা যায়। এই নির্ম্মাণ কার্য্যই সাহিত্য-সম্মিলনের প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্র এবং এই উদ্দেশ্যই বঙ্গের সমুদয় সাহিত্য-সেবীকে, একস্থানে সম্মিলিত করিয়া, বাঙ্গালা সাহিত্যের শক্তি ও সামর্থ্য সম্বন্ধে আলোচনা করাই এইরূপ সম্মিলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। "চোরে চোরে মাসতুতো ভাই" প্রবাদ বাঙ্গালা দেশে বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে,—কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সমব্যবসায়ী সাহিত্যরথিদিগের ভিতর মনোবিবাদ ও মনান্তরের পরিণতি এইরূপ দাঁড়াইয়া ছিল যে, সমালোচনার নামে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ-বহ্নি উদ্গীরিত হইত। অনেক স্থলেই ইহার কারণ ছিল—সহানুভূতির অভাব,—সাহিত্য সেবীদের ভিতর প্রাণের স্পন্দনের অভাব—প্রীতির অভাব। এক্ষণে এই আট বৎসরের মেলা-মেশার দরুণ স্বকপোলকল্পিত অনৈক্য অনেকটা দূর হইয়াছে, ভাবের আদান-প্রদানের একটা সমতা হইয়াছে। এইরূপ অশেষ কল্যাণকর সম্মিলনের প্রয়োজনীতা সম্বন্ধে বোধ হয় বেশী করিয়া বলিতে হইবে না।

একথাও আবার স্বীকার করিতে হইবে যে, মনীষা সহযোগিতার ধার ধারে না। সে বলদৃপ্ত নদের ন্যায় পর্ব্বত ভেদ করিয়া—উপলখণ্ড বিচূর্ণ করিয়া আপনার গন্তব্য পথ নির্দ্ধারণ করিয়া লয়; কিন্তু সেও সাগর-সঙ্গম অভিলাষে ছুটিয়া থাকে। মহামনীষীদের অন্তরাত্মাও সেইরূপ জনসঙ্ঘের ভাবের মিলন-প্রয়াসী। মনীষীরা গগনচুম্বী কুতব-মিনারের ন্যায় স্বাতন্ত্র্যরক্ষা করিয়া দণ্ডায়মান থাকিলেও, তাঁহারা সম্মিলিত জনসঙ্ঘ-শক্তির ফল। দেশে ইট, কাঠ, পাথর সমস্তই ছিল, স্থপতিগণ চেষ্টা করিয়া সেগুলি সংগ্রহ করিয়া কুতব-মিনার গড়িয়াছে। তাহাদের পশ্চাতে অজ্ঞাতনামা হিন্দুনরপতিই হউন, আর কুতবুদ্দিন আইবকই হউন, একজনকে খাড়া হইতে হইয়াছে। সে আপনি দাঁড়াইতে পারে নাই।

এক্ষণে কোন্ পথে কার্য্য করিলে সম্মিলনের এই সকল মহদুদ্দেশ্য—সৎসাহিত্যের প্রচার, জ্ঞানের প্রচার, ভ্রাতৃভাবের বৃদ্ধি ও প্রীতি সংস্থাপন, সমাজ ও জাতীয়তা-রক্ষণ বজায় রাখিয়া চলিতে পারা যায়—দেখা যাউক :—

১। সমস্ত প্রাদেশিক সম্মিলন দেশীয় সম্মিলনীর সহিত সহযোগিতায় এক উদ্দেশ্য লইয়া কার্য্য করিলে আমরা অধিক কৃতকার্য্য হইব।

২। সমস্ত প্রদেশেই যাহাতে লিখিত ভাষার ঐক্য থাকে, তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। বিভিন্ন প্রদেশে লিখিত ভাষার কোন প্রকার প্রভেদ বাঞ্ছনীয় নয়।

৩। বাঙ্গালা ভাষার পূর্ব্বেতিহাস সঙ্কলন-বিষয়ে প্রত্যেক প্রাদেশিক সম্মিলনী উপকরণ সংগ্রহকল্পে সম্পূর্ণ সাহায্য করিবেন; যথাস্থানীয় প্রবাদ বাক্য, ব্রতকথাদি, কবি, পাঁচালী, গীত প্রভৃতি, কবি বা সাহিত্যিকদিগের জীবন-বৃত্তান্ত, রচনাদি, পুরাতন দেবালয়ের ইতিহাস, প্রস্তর বা ধাতু ফলকাদি-বিবরণ, প্রসিদ্ধ লোকদিগের জীবনবৃত্তান্ত, নানা প্রকার কিংবদন্তী প্রভৃতি সংগ্রহ।

৪। বিভিন্ন ভাষা হইতে অনুবাদ করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ-প্রচার। ইংরাজী ভাষা হইতে ত অনুবাদ নূতন কথা নয়; এক্ষণে ভারতবর্ষের বিভিন্ন-দেশীয় ভাষায় সদ্‌গ্রন্থ প্রচারিত হইতেছে, সেই সকল গ্রন্থ হইতে রত্নরাজি আহরণ করা কর্ত্তব্য। বাঙ্গালা ভাষার অনেক পুস্তক আজকাল হিন্দীভাষায় অনূদিত হইতেছে, কিন্তু আমরা হিন্দী ভাষায় প্রচারিত অনেক উল্লেখযোগ্য আবশ্যক পুস্তকের সংবাদ পর্য্যন্ত রাখি না। তমিড়ভাষার শত শত উৎকৃষ্ট গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ একান্ত প্রয়োজন। সম্প্রতি জৈনসম্প্রদায়ের বহু সদ্‌গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। তদ্ভিন্ন ওড়িয়া, গুজরাটী, মারাটী ভাষায় লিখিত উৎকৃষ্ট পুস্তকসকলের অনুবাদ আবশ্যক।

৫। বাঙ্গালা ভাষায় কেহ কোন নূতন পুস্তক প্রণয়ন করিলে, যদি তাহা দেশীয় সাহিত্যের মঙ্গলদায়ক হয়, তাহা হইলে ব্যয়ভার বহন করিয়া সম্মিলনের তাহা প্রচার করার ব্যবস্থা করা উচিত।

৬। দেশে যাহাতে সমদর্শী অভিজ্ঞ সমালোচকের লেখা প্রচারিত হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করা উচিত। সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে সমালোচনার একদেশ-দর্শিতা বা অনুরোধ-পরতন্ত্রতা-ব্যাপার দেশ হইতে বিদূরিত হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

৭। বাঙ্গালা-সাহিত্যের অনেক বিভাগে পারিভাষিক শব্দের বিশেষ অভাব আছে। দেশীয় সম্মিলনী বা বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সহিত এক-যোগে পরামর্শ করিয়া, যাহাতে সেই সকল পারিভাষিক শব্দ সঙ্কলন ও প্রচারের সহায়তার ব্যবস্থা হয়, তাহার চেষ্টা প্রার্থনীয়।

৮। স্থানীয় দুঃস্থ সাহিত্যসেবিগণকে উৎসাহ-প্রদান ও তাঁহাদের প্রণীত পুস্তকাবলীর প্রচারের চেষ্টা।

৯। বৎসরের মধ্যে একবার মাত্র এইরূপ সম্মিলনের সঙ্ঘটন ব্যতীত সাহিত্যিকগণকে লইয়া প্রতিমাসে সাহিত্যানুশীলনের ব্যবস্থা করিলে, সম্মিলনের মহদুদ্দেশ্য সাধনের দিকে কার্য্যতঃ অগ্রসর হওয়া সহজ হইয়া পড়িবে।

অতঃপর, সাহিত্যের সহিত সমাজের কি সম্বন্ধ, তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিব। মসিয়ে ফাগুয়ে (M. Faguet) বলেন ঃ—

"ফরাসী বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্ব্বে ফরাসী-সাহিত্য বিলাসের সাহিত্য ছিল। সে সাহিত্য সমাজ-মত-দ্যোতক ছিল না ; সে সাহিতের প্রভাব ফরাসী-সমাজের নিম্নতম স্তর পর্য্যন্ত প্রবেশ করে নাই। তাহার পর বিপ্লবের সূচক যে সাহিত্য-সৃষ্টি ফরাসীদেশে হইয়াছিল, তাহা খ্রীষ্টান সাহিত্য নহে। ভলটেয়ার, রূসো, ডিড়েরা প্রভৃতি মনীষী লেখকগণকে কোনক্রমে খ্রীষ্টান বলা যায় না। বরং তাহাদের লেখার প্রভাবে খ্রীষ্টানধর্ম্মের খণ্ডন হইয়াছিল, খ্রীষ্টান সমাজের উচ্ছেদ সাধন করা হইয়াছিল। তথাপি কিন্তু বলিতে হয়, যে ফরাসী সাহিত্য প্রায় পাঁচশত বৎসরের খ্রীষ্টান সভ্যতার ফলে, সহস্র বৎসর কালের খ্রীষ্টান ধর্ম্ম-মত সাধনের পরিণতি স্বরূপ, সে ফরাসী ভাষার মজ্জাগত খ্রীষ্টান ভাব ভলটেয়ার, রূসোর লেখাতেও একেবারে মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই। "একদিনে ভাষার সৃষ্টি হয় না—যুগ যুগান্তরের চেষ্টায় একটা ভাষা পূর্ণাঙ্গ হইয়া ফুটিয়া বাহির হয়।—যুগযুগান্তরের মতবাদ, ভাব, ধ্যান, ধারণা ভাষার স্তরে স্তরে বিন্যস্ত থাকে," সে সকল স্তর-বিন্যস্ত ভাবরাশিকে একটা বিপ্লবের ফুৎকারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। ফরাসী-বিপ্লব ধ্বংসের বিপ্লব হইলেও, ভলটেয়ার, রূসোর মতন অমানুষ-প্রতিভাশালী ধ্বংসাবতার অবতীর্ণ হইলেও ফরাসী-সাহিত্যকে উহার ধর্ম্মের বেদী হইতে তাঁহারা কেহ নামাইতে পারেন নাই।" * ফরাসী-সাহিত্য সমালোচনা করিয়া মসিয়ে ফাগুয়ে নিম্নলিখিত তিনটী সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন ঃ—

(১) "যাহা জাতির সাহিত্য, তাহা জাতির মেদমজ্জার সহিত জড়িত ;—তাহা জাতির সকল স্তরে সঞ্চারিত,—উচ্চতম হইতে নিম্নতম পর্য্যন্ত সকল লোকেই পরিব্যাপ্ত।

---

* সাহিত্য, আশ্বিন ১৩২০।

(২) যাহা জাতির সাহিত্য, তাহা জাতির অতীত পারম্পর্য্যের সহিত সম্বন্ধ—মালা-গ্রথিত পুষ্পশ্রেণীতুল্য।

(৩) যাহা জাতির সাহিত্য, তাহা জাতির সমাজধর্ম্ম-বর্জ্জিত হইতে পারে না; তাহা জাতির ভাষানিহিত ধর্ম্মকে উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না।" *

এই অবিসংবাদিত সত্যগুলি সকল সাহিত্য সম্বন্ধে প্রযুজ্য। সমাজের সকল স্তরে প্রবেশ লাভ করিতে না পারিলে, সাহিত্য কখনও স্থায়ী হইতে পারে না। বাঙ্গালার পুরাতন সাহিত্য স্থায়ী হইবার কারণ,—বাঙ্গালীমাত্রেই তাহার ভাবগ্রহণে ও রসবোধে সমর্থ। ভাবের অস্পষ্টতা কোথাও দেখা যায় না। প্রাণের ভাষায় লিখিত ভাবগুলি সমাজ-মুকুরের প্রতিচ্ছবি। তাই এখনও নিরক্ষর কৃষক দাশরথি, নিধুবাবু, রামপ্রসাদ, কাঙ্গাল হরিনাথের গান গাহিয়া আনন্দ অনুভব করে,—আপনাদের জ্বালা ভুলিয়া আত্মহারা হইয়া যায়। তাই বলিতেছিলাম, শুধু শিক্ষিতদিগের জন্য সাহিত্যের সৃষ্টি হইলে, সে সাহিত্য কখনও স্থায়ী হইবে না। ভাব ও ভাষার অপূর্ব্ব মিলনে নব-প্রয়াগের সৃষ্টি করিয়া, যাহাতে সকলে অবগাহন করিয়া মোক্ষলাভ করিতে পারে, সেইরূপ করা প্রত্যেক সাহিত্যিকেরই কর্ত্তব্য।

গভীর পরিতাপের সহিত বলিতে হইতেছে,—আজকাল কয়েকজন শক্তি-শালী লেখক য়ুরোপের আদর্শে গঠিত নূতন ভাব-পরম্পরার পসরা আনিয়া আমাদিগের সাহিত্যে উপঢৌকন দিতেছেন; কিন্তু সেগুলি ঠিক আমাদিগের জাতীয়তার সহিত সমঞ্জসীভূত হয় না;—আমাদিগের অতীতের ভাব-পরম্পরার সহিত সম্মিলিত হইতে পারে না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ধরুন,—যদি কোন শক্তিশালী লেখক চাকরের বা সহিসের প্রভুপত্নীর প্রতি প্রেমের বিষয় চিত্র-করের তুলিকার ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণে অঙ্কিত করেন, তাহা হইলে মনোবিজ্ঞানের দোহাই দিয়া, চাকর বা সহিসের প্রভুপত্নীর প্রতি প্রেম যে সম্ভবপর হইতে পারে না, তাহা বলিবার ক্ষমতা কাহারও নাই; কিন্তু—ভারতবর্ষে চাকর বা সহিস প্রভুপত্নীকে মাতৃভাবে ভিন্ন অন্যভাবে দেখিতে জানে না। সে আপনাকে পুত্র বলিয়া জানে। সে দাসত্ব করিতে আসিয়া নম্রতাকে এতটা নিজের স্বভাবগত করিয়া লইয়া উপস্থিত হয় যে, প্রভু-পরিবারের মহিলাগণের প্রতি তাহার মাতৃভাব ও ভগিনীভাব ব্যতীত অন্য কোন ভাব উপস্থিত হইলে, সে আপনাকে পাপী বলিয়া গণ্য করে। য়ুরোপীয় ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ও

* সাহিত্য, আশ্বিন ১৩২০।

স্বাধীনতা ভারতবাসীর স্বপ্নের অতীত। ভারতের চাকর বা সহিস আপনার দীনতায়-হীনতায় আপনি ম্রিয়মাণ, তাহার হৃদয়ে এ ভাবের সৃষ্টি নূতন। য়ুরোপে এরূপ সম্ভবপর হইতে পারে; তাহার কারণ, সেখানে সাম্যভাবই (equality) প্রধান। এরূপ গন্ধহীন বিলাতী কণ্টকবৃক্ষের আমদানি করিলে সৎসাহিত্যের পুষ্টি হইতে পারে না। তাই মনীষী ফাগুয়ের সহিত আবার বলি—"যাহা জাতির সাহিত্য, তাহা জাতির অতীত পারম্পর্য্যের সহিত সম্বদ্ধ হইবে; একথা ভুলিলে চলিবে না।

তিনি আরও বলিয়াছেন,—"ভাষা কেবল সাহিত্যের উপাদান নহে, উহার সর্ব্বাঙ্গ জাতির পদচিহ্নে অঙ্কিত। ভাষা সমাজের অভিব্যঞ্জনা; এই অভিব্যক্তি বিহঙ্গ-কলরবের ন্যায় ব্যোমপথে মিশাইয়া যায় না, সাহিত্যের মর্ম্মরগাত্রে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত থাকে। ভাষা সাহিত্যের সৃষ্টি করে, আবার সাহিত্যের আশ্রয়ে ভাষা আত্মরক্ষা করে। মানুষের ভাষা আছে, সে ভাষায় সাহিত্যের সৃষ্টি হয়, সে সাহিত্য সনাতন হইয়া থাকে। তাই মানুষ—মানুষ, নির্ভাঙ্গ পশু নহে। পশুর স্মৃতি নাই, স্মৃতির অক্ষয় মঞ্জুষা নাই; তাই পশুর উন্নতি নাই, স্থিতি নাই, বিকাশ নাই। মানুষের স্মৃতি আছে, স্মৃতির অক্ষয় মঞ্জুষা—সাহিত্য আছে; তাই মানুষ নর-দেবতা হইয়াছে, পরে আবার হইতেও পারিবে। সাহিত্যের সৃষ্টি ধর্ম্মের উপাদানে হইয়া থাকে। সে ধর্ম্ম প্রথম স্তরে বিভীষিকার উপাসনা, সৌন্দর্য্যের আরাধনা মাত্র। ইহার পর স্তরে স্তরে মানুষ যেমন উন্নত হয়, তদনুসারে মানুষের সাহিত্য ও আকারান্তরিত হয়। এই অসংখ্য স্তর-বিন্যস্ত সাহিত্য বিশ্ব মানবতার ইতিহাস—দেবত্বের উন্মেষ কাহিনী।" * বহুদিন পূর্ব্বে আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ প্রবীণ সাহিত্যধুরন্ধর শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় লিখিয়াছিলেন;—

হিন্দু এবং য়ুদী বহু নির্য্যাতনেও কেবল ধর্ম্মবলে এখনও জীবিত আছে। * * * য়ুদী কোন কালে বাস্তু দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে, তাহার উপর কত উৎপীড়ন, উপদ্রব মাথায় রহিয়াছে, এখনও রহিয়াছে, তবু মরে নাই; কেবল মরে নাই নহে, জগতের মধ্যে সুন্দর, সুশ্রী, উন্নত দেহ, দীর্ঘজীবী, বলিষ্ঠ, প্রফুল্ল, ধনশালী, কলানিপুণ জাতি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কেন? তাহারা স্বধর্ম্মপরায়ণ এবং সদাচারনিষ্ঠ বলিয়া। একথা যে খুব সত্য, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। ধর্ম্ম যেরূপ ব্যক্তিকে

* সাহিত্য, আশ্বিন ১৩২০।

জাতিকে ধারণ করিয়া থাকে, ভাষাকেও সেইরূপ ধারণ করিয়া থাকে। বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্যের প্রসার ও পুষ্টি ধর্ম্মের ভিতর দিয়া হইয়াছে। অর্ব্বাচীন সাহিত্যের কোন কোন স্থলে ইহার ব্যতিক্রম যে হয় নাই, তাহা বলিতে পারা যায় না; তবে সে সকল সাহিত্য আমাদের মর্ম্মস্পর্শী হয় নাই—ঐগুলি হৃদয়ে ক্ষণস্থায়ী ভাবের হিল্লোল তুলিতে পারিলেও স্থায়ী আনন্দ দিতে পারে না। সুকুমারমতি যুবক যুবতীদিগের নিকট মানবীয় প্রেমের কবিতা ভাল লাগিতে পারে, উত্তরকালে তাঁহারাই আবার প্রেমময় রাধা-কৃষ্ণের প্রেম ব্যতীত অন্যরূপ প্রেমের কবিতা পাঠ করিতে নাসিকা কুঞ্চিত করেন। তাই বলি, সনাতন ধর্ম্মরূপ মহীরুহকে বেষ্টন করিয়া যে সুকুমার কলালতা বর্দ্ধিত হইয়া উঠে, তাহাই কল্পান্তস্থায়ী হইয়া থাকে। আর যে কবির বীণার ঝঙ্কারে হৃদি রঞ্জনের মধুময় চিত্র নয়ন সম্মুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠে, তিনি আমাদের হৃদয় আসন চিরকালের জন্য অধিকার করিয়া থাকেন।

আজকাল একটা ধূয়া উঠিয়াছে, ধর্ম্মের সহিত সাহিত্যের কোন সংস্রব নাই। বাঙ্গালা সাহিত্যে ছোট গল্প-লেখকদিগের মধ্যে কয়েকজনের লেখা হইতে ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায় এবং তাঁহারা আকার ইঙ্গিতে কথাটা বুঝাইয়া দিতে চান—গল্পগুলিকে কলা হিসাবে দেখিতে হইবে। Art is for art—কলা, কলার জন্য; তাহাতে আবার ধর্ম্মের সংস্রব কি! গল্পগুলির উদ্দেশ্য জানিবার কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই; মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ থাকিলেই হইল। এই সকল লেখকের নিকট স্থান, কাল, পাত্র বিবেচনার বিষয়ীভূত নয়। ইঁহারা লোক-লোচনের সম্মুখে কিম্ভূত কিমাকার চিত্র দেখাইতে পারিলেই আপনাদিগকে ধন্য মনে করেন, কিন্তু ইহাদিগকে কি করিয়া বুঝাইব যে, সকল চিত্রই সকল লোকের গোচরীভূত করা যায় না। এখনও Art বা ইহার প্রতি শব্দই "কলা" সম্বন্ধে ঋষি-প্রতিম টলষ্টয় তাঁহার "What is Art" পুস্তকে আলোচনা করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই;—Art বা কলা মানবের কার্য্যকারী শক্তির (human activity) কলাস্বরূপ। উদ্দেশ্য ব্যতীত ইহার অন্য সার্থকতা নাই। মানবের উন্নতি বা অবনতির যতটুকু ইহা সহায়ক হইবে, ততটুকু ইহাকে ভাল বা মন্দ বলিব। কলাবিৎ আপ-নার ভাবপ্রেরণা অন্যে যদি সঞ্চারিত করিতে পারেন, তবেই তিনি কৃতার্থ-ম্মন্য হন। অঙ্গ-সঞ্চালন, রেখা, বর্ণ, শব্দ ও বাক্য সমন্বয়ে কলাবিৎ অন্যের হৃদয়ে ভাবের লহর তুলিতে পারেন। এইরূপে কলাবিৎ সমভাবের প্রেরণায়

বিশ্ব-সংসারকেআপনার করিয়া থাকেন। "Art is a means of union among men, joining them in the same feelings." তা হইলে কেবলমাত্র 'সঞ্চরণ' বা 'সংক্রমণ'—শক্তিই কি কলার লক্ষণ? অস্বাভাবিক উপায়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াও পারিপার্শ্বিক অবস্থার গুণে ইহা এরূপ হইয়া পড়িয়াছে যে, পল্লীবাসীর নিকট, প্রতিবাসীর নিকট, এমন কি আত্মীয়ের নিকট হইতে সহানুভূতি বলিয়া জিনিষটা আমরা আর পাই না। অবশ্য আমি সহরের কথাই বলিতেছি। এরূপ স্থলে টলষ্টয় বলিয়াছেন,—"The business of art lies just in this—to make that understood and felt which, in the form of an argument, might be comprehensible and inaccessible,"—এটি খাঁটি সত্য। তর্ক করিয়া যখন মানবকে বুঝাইতে পারা যায় না, তখন তুলিকার একটী রেখায়, একটী অঙ্কনে, একটী বর্ণসম্পাতে, কবিতার একটী ছত্রে তক্ষণশিল্পীর একটু খোদাই কার্য্যে ভাবের লহর ছুটাইতে পারা যায়; তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, কলাবিৎই তিনি—যিনি মানব হৃদয়ে সমভাবের লহর তুলিতে পারেন—যিনি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বিশ্বমানব প্রাণে সমানভাবে কার্য্য করিতে পারেন। যদিও কলা-সমালোচকগণ (Art-critics) প্রায় এক বাক্যেই বলিয়া থাকেন,—কলাবিদ্যার সার্ব্বজনীনতা (universality) একরূপ অসম্ভব, তথাপি আমরা টলষ্টয়ের সহিত একবাক্যে বলিব, কলার সার্ব্বজনীনতা অসম্ভব হয় হউক—যেখানে দেখিব—কলা সার্ব্বজনীন আদর্শের যত নিকটবর্ত্তী হইতেছে, ততই তাহা উচ্চাঙ্গের বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে—কলা বিশ্ব-মানবকে একসূত্রে গ্রথিত করিবার প্রয়াসী (Art unites men)। আর বিশ্ব-মানবকে ভাবের লহর দ্বারা গ্রথিত করিতে হইলে যে সকল ভাবরাশি মানবকে পশু হইতে পৃথক করিয়াছে, মানবকে দেবত্বে উন্নীত করিয়াছে, মানবের কল্যাণকল্পে সহায়তা করিয়া আসিয়াছে, সেই সকল ভাবের দ্বারাই এ কার্য্য সমাধা হইতে পারে। এই ভাব-পরম্পরাকে তিনি নৈতিক সংস্কার (Religious perception) আখ্যা দিয়াছেন।

বাস্তবিক যাহা দর্শনে, শ্রবণে, ধ্যান-ধারণায় হৃদয়ে ধর্ম্মভাবের উন্মেষ করিয়া দেয়, যাহা আমাদিগকে ক্ষুদ্রত্ব ভুলাইয়া দিয়া মহত্ত্বের দিকে টানিয়া লয়, যাহা চরিত্রকে উন্নত করিয়া দেয়, মানব-হৃদয়ে দেবভাবের স্ফুরণ করিয়া দেয়, তাহাই সুষ্ঠু কলা। তাহাই সুষ্ঠুকলা—যাহা ভ্রাতৃ-প্রেমের বন্ধনে জগৎকে

একসূত্রে গ্রথিত করিতে চায়—যাহা বুঝাইতে চায়—দেশ-কাল-পাত্রের গণ্ডী ছাড়াইলে, সংস্কারের গণ্ডী ছাড়াইলে, মানব এক বিশ্বপিতা প্রেমময়ের সন্তান। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয়, পবিত্র ধর্ম্মভাব কি করিয়া বুঝিব। "বিবেকের বাণী শুনিলেই এ প্রশ্নের সহজ সমাধান হইবে। টলষ্টয় বলিতেছেন নৈতিক সংস্কার (Religious perception) ইহা ঠিক করিয়া দিবে। তাঁহার মতে,—

"The religious percention is the consciousness that our well-being, both material and spiritual, individual and collective, temporal and eternal, lies in the growth of brotherhood among men—in their loving harmony with one another.

তাঁহার নৈতিক সংস্কার (Religious perception) বিশ্ব-মানবের ভিতর প্রীতির অচ্ছেদ্য বন্ধনে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। পরিশেষে তিনি প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, কলা (Art) বুদ্ধি হইতে ভাবের দ্বার দিয়া বিশ্ব-মানবকে একতার সূত্রে গ্রথিত করে, প্রচলিত পদ্ধতি ও অত্যাচার সমূহকে বিনাশ করিয়া জগতে ভগবানের রাজত্ব—প্রেমের রাজত্ব স্থাপন করে। "The destiny of art in our times is to transmit from the realm of reason to the realm of feeling the truth that well-being for men consists in being united together and to set up in place of the existing reign of force, that kingdom of God i. e. of love, which we all recognise to the highest aim of human life."—তাহা হইলে Art বা কলায় যে কোন উদ্দেশ্য নাই, এ কথা বলিলে চলিবে কেন। Art is for art এ কথার অর্থ আমরা বুঝিতে পারি না—টলষ্টয়ের সাহায্যে বুঝিতে পারি নাই ; বরং যাহা বুঝিয়াছি, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। আবার তাহা বলিঃ—উদ্দেশ্য ব্যতীত ইহার অন্য সার্থকতা কিছু নাই (Art does not exist for its own sake) "মানবের উন্নতি বা অবনতির যতটুকু উহা সহায়ক হইবে, ততটুকু ইহাকে ভাল বা মন্দ বলিব।" অধুনা বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পগুলির কোন কোনটীতে Art এর দোহাই দিয়া যে কদাচারের সৃষ্টি হইতেছে, অভিনব উৎকট ভাবের লহর ছুটিতেছে, বিলাতী প্রেমের পূতিগন্ধময় উদ্ভট চিত্র প্রকাশিত হইতেছে, ন্যক্কারজনক অনুবাদ বাহির হইতেছে ; তাহা আমাদিগের জননী, ভগিনী, গৃহিণী ও কন্যাদিগের হস্তে কোনমতেই দিতে পারা যায় না। কর্ত্তব্যানুরোধে গল্প লেখকদিগের মধ্যে অধুনা যিনি শিরোমণি, ব্যারিষ্টার-প্রবর শ্রদ্ধেয় প্রভাত বাবুর নিকট আমি একটু অনুযোগ করিব।

তিনিই আজকাল গল্প লেখকদিগের আদর্শ স্থল। তাঁহার লেখনী হইতে সমাজের বিকৃতি বা উৎকট চিত্র কখন দেখি নাই। তাই পূজার সংখ্যা "মানসী" পত্রিকায় যখন তাঁহার লেডি ডাক্তার গল্প পড়িলাম, তখন স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। প্রভাত বাবুর নাম দেখিয়া মর্ম্মাহত হইলাম। ফাঁদ পাতিয়া যুবক ডেপুটী সত্যেন্দ্র-মৃগ ধরিবার চিত্র—তাঁহার নিকট হইতে আমরা চাহি না;—চাহি না তাঁহার নিকট হইতে লেডি ডাক্তার ও তাহার পরিচারিকা কামিনীর কথোপকথন। আপনারা একটু শুনুন—

"শেষে সুবালা বলিল,—দেখ্ কামিনী পোর্টের সে বোতলটায় কিছু আছে ?"

"আছে। এখনও আধ বোতল আছে।"

"খানা সাজিয়ে, সে বোতলটা টেবিলের উপর রেখে দিস্। ওকে বলেছি, তোমার লিভার খারাপ হয়েছে। যা তা একটা কিছু ওষুধ বলে মিশিয়ে, খানিকটা পোর্ট খাইয়ে দেব। আজ যা হোক একটা হেস্তনেস্ত করে নিতে হবে।"

কামিনী বলিল,—"তা রেখে দেব। কিন্তু খুব সাবধান, বুঝলে ? শেষ কালে একেবারে হাতছাড়া না হয়ে যায়—সেই অখিল শীলের বেলায় যেমন হয়েছিল।"

"যা, যা, তোর আর উপদেশ দিতে হবে না।"—বলিয়া সুবালা বাহিরে আসিল।

এচিত্র কি হিন্দুরমণীর হস্তে দিতে পারা যায় ?

প্রভাতবাবুর, অক্ষয় লেখনী-মুখে কখন এরূপ কদর্য্যচিত্র ফুটিয়া উঠে নাই, তাই এইটী দেখিয়া কয়েকটা অপ্রিয় সত্য বলিতে হইল। শাস্ত্রের শাসন "মা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং" মান্য করিয়া এক্ষেত্রে চলিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত।

এইবার আমরা ভাষা সম্বন্ধে দুইএক কথা বলিব। পরমারাধ্যা চিরাদৃতা আমাদের শ্বেতশতদলবাসিনী বঙ্গভারতীর অঙ্গে নব্য সাহিত্যিক চিকিৎসক-দিগের ছুরিকাঘাত দেখিয়া, প্রত্যহই আমাদের চক্ষু দিয়া জল ধারা বহির্গত হইতেছে। জানি না কবে কোথায়, এ শব ব্যবচ্ছেদের ছেদ পড়িবে। মা আমার শবের মতন পড়িয়া আছেন—এই সকল চিকিৎসকের অস্ত্রোপচারে মা আমার ক্ষত-বিক্ষতা। অক্ষয়—বিদ্যাসাগর—ভূদেব—বঙ্কিম—কালীপ্রসন্ন

প্রমুখ সাহিত্য মহারথদিগের সাধনার ধন—বড় আদরের ধন—তাঁহাদের প্রাণাপেক্ষা গরীয়সী জননীর এ দুর্দ্দশা দেখিয়া বোধ হয় তাঁহারা স্বর্গ হইতেও অশ্রুপাত করিতেছেন। হায়! হায়! জানি না কবে কোন্ রাসায়নিক প্রবরের সিদ্ধমলমে মার আমার ক্ষত অঙ্গ যোড়া লাগিয়া আবার পূর্ব্বশ্রী ফিরিয়া আসিবে! এখনও ভারতগগনের চির-উজ্জ্বল রবি রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-গগন আলোকিত করিয়া রহিয়াছেন। এখনও আমরা বঙ্কিম-মণ্ডলের শেষ জ্যোতিষ্ক অক্ষয় চন্দ্রের দিকে চাহিয়া আছি—সাহিত্য-ধুরন্ধর পণ্ডিত-প্রবর হরপ্রসাদের দিকে চাহিয়া আছি—তাঁহারা কি ইহার প্রতীকারের চেষ্টা করিবেন না? আমাদের বিশ্বাস, তাঁহারা মনে করিলে এই অত্যাচারের শেষ যবনিকা পড়িবার বিলম্ব হইবে না। যাহা হউক, সুখের বিষয় সুকবি সুপণ্ডিত ব্যারিষ্টারপ্রবর প্রমথ চৌধুরী মহাশয় বীর বিক্রমে প্রবল যুক্তি দ্বারা ভাষা-জননীকে রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া বীরবল নামে এই সকল নব্য-সাহিত্য-রথকে আহবে আহ্বান করিয়াছেন। জানি না,—তিনি, শ্রদ্ধেয় ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বা তাঁহার ন্যায় অন্যান্য সাহিত্য-রথেরা এই কার্য্যে কতদূর সফলকাম হইবেন। নব্য লেখকেরা বলিয়া থাকেন, বাঙ্গলা ভাষায় যখন ব্যাকরণ নাই, আইন কাকুন নাই, তখন কাহার কথা শুনিয়া আমরা চলিব! বেশ কথা! বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায়, সংস্কৃত ভাষাই ইহার জননী। জননীর নিজস্ব হইতে যাহা পাওয়া যায়, তাহা জননীর স্ত্রীধনের আইনানুসারে চলিয়া থাকে। এক্ষেত্রে তাহা না হইবার কারণ কি? যখন আমরা সংস্কৃতের অনুসরণ করিব, তখন তাহার নিয়ম না মানিয়া চলিব কেন? সস্কৃত শব্দের সহিত দেশজ শব্দ মিলাইয়া 'গুরু-চণ্ডালী' দোষের সৃষ্টি করিব কেন? নব্য লেখকদিগের লেখনী পাঠ করিয়া মনে হয়, তাঁহারা যেন ইচ্ছা করিয়া নূতনত্বে আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিবার প্রলোভনে একটা নূতনের সৃষ্টি করিতে চান। অবশ্য প্রতিভা বা মনীষা ভাষার শব্দ-সম্পৎ-বৃদ্ধিমানসে নূতনের সৃষ্টি করিবেই করিবে।—ভাষাকে বলশালী করিবেই করিবে। কিন্তু তাই বলিয়া শোথের ন্যায় মাংসবৃদ্ধি বলের পরিচায়ক নহে। দুই চারিটা উদাহরণ দিয়া আমার বক্তব্যটা একটু বিশদ করিতে চাহি:—

"বসন্ত কুসুমফুলের গাঢ় রঙে তরুণীদের শাড়ী ওড়না "রঙাইয়া" দিত, সন্ধ্যামণির হৃদয় পিষিয়া চরণ "রঙাইত"। হেনার পাতার রস গালিয়া হাত

"রঙাইত"। আর মধুর হাসি, প্রিয় বচন, চটুল চাহনি দিয়া হৃদয় "রঙাইতে" চেষ্টা করিত—রূপসীদের হৃদয় তাহাতে "রঙিত" কি না, কে জানে। কিন্তু তরুণীদের আফিম ফুলের "মতো" রাঙা মাদক ঠোঁঠ দুখানি, ডালিম ফুলের "মতো" গাল দুটী, শিউলী "রঙা" বসন আর মেহেদি "রাঙা" চরণ নিজেদের সকল "লালিমা জড়ো" করিয়া বসন্তের তরুণ-কোমল হৃদয়খানি শোণিত রঙে "রঙাইয়া" তুলিতেছিল।" এই স্থলে ছয়বার রঞ্জধাতুর বিকৃতি ত দেখিলেন। ইহা ইচ্ছাকৃত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। আর লালিমা শব্দের ন্যায় 'হরিতিমা,' 'ম্লানিমা,' 'শ্যামিমা' প্রভৃতি অজ্ঞাতপূর্ব্ব উদ্ভট শব্দ অবাধে সাহিত্যে চলিতে সুরু করিতেছে। আর এই স্বয় ছত্রে দুইবার 'মত' ও একবার 'জড়'শব্দ ওকার সংযোগে লিখিত হইয়াছে। অবশ্য উচ্চারণ-গত বানান (Phonetic spelling) যখন উহার যুক্ত রাজ্যেও চলিতেছেনা, তখন যে এই সংরক্ষণশীল বাঙ্গালা দেশে চলিবে, সে ধারণা আমাদের নাই। আর যখন জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে, নগরে নগরে উচ্চারণ-বৈষম্য দৃষ্ট হয়, তখন এক স্থলের উচ্চারণ লিখিত ভাষায় চালাইলে চলিবে কেন ? সাহিত্যে এ ভেদ-নীতি সমর্থন করা যায় না। যদি বলেন—অভিমতার্থক মত ও তুল্যার্থক মত শব্দের প্রভেদ করিবার জন্য শেষের শব্দে "ও" কার সংযোগ করা হয়, তাহা হইলে কাল, ভাল, বল, মন ইত্যাদি কথায় 'ও' সংযোগ করিয়া লেখা হয় না কেন ? অবশ্য এই সকল ইচ্ছাকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি, তাহা আপনা-দিগের ন্যায় সাহিত্য-স্মার্ত্তের বিবেচ্য। আবার দেখুন :—

"একদিন যখন সন্ধ্যা বেলায় গাছে গাছে ফুলের দেয়ালি সাজিতেছিল, যখন দক্ষিণা বাতাস বিরহ-মূর্চ্ছিতের নিশ্বাসের "মতো" থাকিয়া থাকিয়া ফুলের বনে "শিহরণ" হানিতে ছিল; যখন ফুলের গন্ধে মাতাল হইয়া কোকিল পাপিয়া প্রলাপ বকিতেছিল, যখন হাজার দীপের শিখার মাঝে ফোয়ারার জল "তরল হীরার" মালার "মতো" গড়িয়া পড়িতেছিল ইত্যাদি—"

এখানে আপনারা "বনে শিহরণ হানিতেছিল" একথার রসগ্রহণ করিতে পারিলেন কি ! 'তরল হীরার মালা' যে কিরূপ পদার্থ, তাহা আমরা কল্পনায় আনিতে পারি না।

আবার শুনুন :—

ঘৃণাভরে ফুল গুলি সব পদাঘাতে ছড়াইয়া দিয়া "উদ্যত অশনির মতো" বলিল "কী" !—

ইংরাজীতে যাহাকে (transferred epithet) বলে 'উদ্যত অশনি' তাহারই দৃষ্টান্ত। আপনারা যদি এরূপ প্রয়োগ শিষ্ট বলিয়া মনে করেন, তবে চালাইতে পারেন ; কিন্তু আমার বিশ্বাস, আপনারা "সকল লোকের বিস্মিত "অবিশ্বাস" অগ্রাহ্য করিয়া" চালাইতে কিছুইতেই রাজি হইবেন না। উচ্চারণভেদে যদি 'কি' দীর্ঘত্ব লাভ করে, তবে অন্য শব্দে এরূপ হয় না কেন ?

আপনারা কি "অবিনয় ক্ষমা" কখন শুনিয়াছেন ? যদি না শুনিয়া থাকেন—তবে শুনুন !

* * * কুরূপ দেখিয়া অবহেলা করিয়াছি, ইহার লজ্জা আজ তাহার দয়ায় দারুণ হইয়া উঠিয়াছে ; তাহাকে এইরূপ লোলুপের "অবিনয় ক্ষমা" করিতে "বলিয়ো"।

প্রাণের যে কতটা যাতনায় নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই মক্ষিকাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছে, তাহা অন্তর্যামীই জানেন ; আর মাতৃভাষাসেবীদের ভাষার দিকে অবহিত হইবার জন্য যে এই পন্থা অবলম্বন করি নাই, তাহাও বলিতে পারি না।

ভাষা জননীর শরীর। এবার জননীর প্রাণের কথা—ভাবের কথা একটু বলি। যাহা সমাজের, যাহা দেশের, যাহা দশের নীতি ও স্বাস্থ্যের সহায়ক ও পরিপোষক, এইরূপ ভাবের চিত্র সকলের সমক্ষে আদর্শ রূপে ধারণ করাই আমাদের কর্ত্তব্য। বিশ্বমানবের ভাণ্ডার হইতে –প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতে সদ্ভাবসমূহ সমাহরণ করিয়া দেশের নিকট উন্মুক্ত করিয়া দিতে হইবে—ভাবের লহর ছুটাইতে হইবে –সমপ্রাণতার বন্যা বহাইতে হইবে—ভগীরথের ন্যায় ভ্রাতৃত্বের মন্দাকিনী ছুটাইতে হইবে। দেখিতে হইবে,—এমন ভাবের চিত্র, কাব্য বা কলায় ফুটাইয়া তুলিব না,—যাহা মাতা পিতা, ভ্রাতা ভগিনী, পুত্র কন্যা ও দয়িতার নিকট প্রকাশ করিতে পারা যায় না। আর একটী কথা মনে রাখিতে হইবে—বিদেশের ভাবের চারাগুলিকে আমাদের স্থান, কাল, পাত্র-উপযোগী করিয়া সমাজ ও ধর্ম্মের আলোক ও বাতাসের সাহায্যে বর্দ্ধিত করিতে হইবে। এইবার কবিতা সম্বন্ধে একটা বলিব।

আধুনিক কবিদিগের কতকগুলি কবিতা আমরা ঠিক বুঝিতে পারি না। বঙ্গের রবীন্দ্রনাথ বিদেশ হইতে Mystic কবিতার চারা আনিয়া সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাঙ্গালা দেশে যেদিন প্রথম রোপণ

করিলেন—যেদিন তিনি "সোণার তরী" প্রথম ভাসাইলেন; জানি না, সেদিন বাঙ্গালার সুদিন কি দুর্দ্দিন। তার পর যখন—

"দিনের শেষে ঘুমের দেশে
ঘোমটা পরা ঐ ছায়া
ভুলালরে ভুলাল মোর প্রাণ।
ওপারেতে সোণার কূলে আঁধার মূলে কোন মায়া
গেয়ে গেল কাজ ভাঙানো গান।"

গায়িলেন,—শেষ 'খেয়াও' পাড়ি দিলেন—সেই দিন হইতে তাঁহারই চরণে শরণ লইয়া বঙ্গের আধুনিক কবিকুল ছুটিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর কবিতা চেষ্টা করিয়া কল্পনার বিমানে চড়িয়া কতকটা বুঝিতে পারিলেও, ইঁহাদের কবিতা কল্পনার "এরিওপ্লেনে" চড়িয়াও বুঝিবার সামর্থ্যে কুলায় না। উর্ব্বর বাঙ্গালা দেশের মাটিরও আবহাওয়ার গুণে অল্প দিনের মধ্যে সহস্র সহস্র অস্পষ্ট দুর্ব্বোধ্য কবিতার সৃষ্টি হইল। এই শ্রেণীর কবিতায় ভাষার শিঞ্জিনী আছে, নূপুরের গুঞ্জন আছে, কিন্তু প্রাণ মাতিতে চায় না—ভাব কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিতে চায় না। ভাবের অভাবে, প্রাণের অভাবে, এগুলি যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার ন্যায় শব্দ করিতে পারে সত্য। এই সকল Mystic কবিতা দেহী আত্মার সহিত—চিরসুন্দর পরমাত্মার সংযোগ মূলক বলিয়া কোন কোন সমালোচকের মুখে শুনিয়া থাকি; কিন্তু আমরা এগুলিতে যোগের কিছুই দেখিতে পাইনা—দেখি বিয়োগ—ভাবের অভাব।

ইতঃপূর্ব্বে বহুবার সাহিত্য শব্দের প্রয়োগ করিয়াছি, এখন সাহিত্য শব্দে কি বুঝা যায়, তাহা দেখিবার চেষ্টা করিব।

সাহিত্য শব্দটী সংস্কৃত। সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্য শব্দটী যে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা হইতে বেশী কিছু বুঝিবার উপায় নাই। সংস্কৃতে প্রধানতঃ তিনটী অর্থে সাহিত্য শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। (১) যাহা কোন কিছুর সঙ্গে ব্যবহৃত হয়, তাহাই সাহিত্য। (২) মেলন। (৩) মনুষ্যকৃত শ্লোকময় গ্রন্থ বিশেষ। এই শেষোক্ত হিসাবে, ভট্টি, মাঘ, ভারবি প্রভৃতি গ্রন্থ সংস্কৃতে সাহিত্য নামে পরিচিত। কিন্তু বেদ, স্মৃতি, বেদাঙ্গ প্রভৃতি সাহিত্য নামের অন্তর্গত নয়। ইংরাজীতে "literature" বলিলে যেমন অনেক জিনিষ বুঝায়, বাঙ্গালায় সাহিত্য-শব্দেও আমরা জাতি বিশেষ-প্রসূত সমষ্টি-উদ্দিষ্ট লিপিবদ্ধ চিন্তারাশি বুঝিয়া থাকি। সমস্ত লিখিত গ্রন্থা-

দিকে আমরা সাহিত্য বলিয়া থাকি। গ্রন্থবিশেষে গ্রন্থকারের চিন্তা ও কল্পনা, উদ্যম ও আশার বিকাশ হইয়া থাকে। প্রত্যেক দেশের গ্রন্থসমষ্টিতে দেশের চিন্তা ও কল্পনা, উদ্যম ও আশার উন্মেষ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়াই গ্রন্থসমষ্টিই সাহিত্য। কিন্তু সাহিত্যের উদ্দেশ্য ধরিয়া অথবা জাতীয় গ্রন্থসমষ্টি আলোচনা করিলে অনেক গ্রন্থই এই পর্য্যায় হইতে খসিয়া পড়িবে। সাহিত্যের একটী সীমা বা গণ্ডী আছে। সেই সীমা বা গণ্ডীর অন্তর্ভুক্ত প্রদেশই সাহিত্যের রাজ্য। এই সাহিত্য-সাম্রাজ্যের সীমা নির্দ্দেশ করিতে হইলে আমাদিগকে প্রথমেই দেখিতে হইবে, জাতীয় চিন্তা ও কল্পনা, আশা ও উদ্যমের স্থান কতটুকু। গ্রন্থ-রাজ্যের যতটুকুতে জাতীয় চিন্তা ও কল্পনা, আশা ও উদ্যম বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে, ঠিক ততটুকুই সাহিত্য-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে সকল গ্রন্থই ত সাহিত্যের মধ্যে স্থান পাইতে পারে না। পদ্যও সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞানও সাহিত্য,---তবে কথা এই যে, এই সকলের মধ্যে সাহিত্যের উদ্দেশ্য বর্ত্তমান থাকা চাই ; নহিলে, 'গদ্যই বলুন, পদ্যই বলুন, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞানই বলুন,' কিছুই সাহিত্য নামে অভিহিত হইতে পারে না।

আর্ত্তের দীর্ঘশ্বাসে, প্রণয়ীর প্রেমোচ্ছ্বাসে, বীরের উদ্দীপনায়, ভক্তের ভক্তি সাধনায় কখন্ কোন্ মুহূর্ত্তে ভাষার উদ্ভব হইয়াছে, কে বলিবে? কে বলিবে—কেমন করিয়া দেশ, কাল ও অবস্থাভেদে, মনের ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য ভাষার উৎপত্তি? এইমাত্র জানি, একের মনের ভাব অন্যের নিকট ব্যক্ত করিবার জন্যই ভাষা। আমাদের এই উদ্দেশ্য যত সহজে—যত অল্পায়াসে সংসাধন করিতে পারা যায়, ততই আমাদের ভাষা সার্থকতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। যে জাতির কবি, গায়ক, লেখক, ভাবুকের কাব্য-গীত-রচনা-চিন্তাস্রোত যত বহিয়াছে, সে জাতির ভাষার কলেবরও তত পুষ্টিলাভ করিয়াছে। ভাষার প্রকৃতি, গতি, স্থিতি, বিকাশ ও বিরাম যদি বুঝিতে হয়, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে ভাষার উদ্ভব ও কলেবর-পুষ্টি বুঝিতে হইবে। আমরা বাঙ্গালী, বাঙ্গালা আমাদের ভাষা। যে ভাষায় আমরা প্রথম মা বলিতে শিখিয়াছি, যে ভাষায় আমরা আমাদের সুখ-দুঃখের কাহিনী ব্যক্ত করিতে শিখিয়াছি, যে ভাষায় আমাদের প্রাণের ভাবসমূহের দ্যোতনার প্রকৃষ্ট অভিব্যঞ্জনা, যে ভাষার পদলালিত্য অন্যান্য ভাষার আদর্শ স্থানীয় হইতে পারে, সেই বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি, গতি, স্থিতি, বিকাশ ও বিরাম বুঝিতে হইলে,

আমাদিগকে সর্ব্বাদৌ বঙ্গভাষার উৎপত্তি ও কলেবর পুষ্টি বুঝিতে হইবে। বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে আজ আমি এক্ষেত্রে কোন মতের উত্থাপন করিব না। বঙ্গভাষার উৎপত্তি লইয়া অনেকে অনেক উৎকট ও উদ্ভটমতের অবতারণা করিয়াছেন ও করিতেছেন। বঙ্গভাষার ভাষাতত্ত্ব ও ব্যাকরণ আলোচনার সময় এখনও আসে নাই। যতদিন না আমরা বাঙ্গালা ভাষার প্রচলিত শব্দাবলী সংগ্রহ করিয়া তাহাদের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিতে সমর্থ হইব, ততদিন বঙ্গভাষার উৎপত্তি নিরূপণ করিবার চেষ্টা বৃথা। বাঙ্গালা ভাষার প্রণালী-বিশুদ্ধ যে শব্দ-সংগ্রহ বা অভিধান সঙ্কলন করিতে হইবে, তাহাতে অধুনা প্রচলিত বা ইতঃপূর্ব্বে প্রচলিত সকল শব্দের অর্থ, ব্যুৎপত্তি এবং ইতিহাসের বিশিষ্ট বিবরণ থাকা চাই। তাহা হইলে আমরা ব্যাকরণের উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিব। কিন্তু, একার্য্যে অগ্রসর হইতে হইলে আমাদিগকে প্রথমেই বঙ্গীয় প্রাচীন সাহিত্যের সম্যক্ আলোচনা করিতে হইবে। প্রাচীন সাহিত্যের কোন্ বীজ কতদিনে ক্রম-বিকশিত হইয়া নবীন সাহিত্যের শাখা-কাণ্ডে পরিণত হইল, ঐতিহাসিকের চক্ষে ইতিহাসের আলোকে তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে। সমালোচক-ঐতিহাসিকের চক্ষে প্রাচীন কাব্যাদি না পড়িয়া—স্তাবক বা উপাসকের চক্ষে ঐ সকল গ্রন্থ পড়িলে চলিবে না। প্রাচীন সাহিত্যের ভাব, ভাষা, ছন্দোবন্ধ, শব্দবিন্যাস, রচনা পদ্ধতির সম্যক্ আলোচনা করা চাই। ব্যাকরণ ভাষার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিশ্লেষণ, অস্থি, মজ্জা, মেদ, মাংস, শিরা, স্নায়ু প্রভৃতির পরীক্ষা। এই পরীক্ষা সুসিদ্ধির নিমিত্ত প্রাচীন সাহিত্যের পরিজ্ঞান থাকা আবশ্যক। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রচিত যে কোন ভাষায় ব্যাকরণ অধ্যয়ন করুন, দেখিবেন পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় সেই ভাষার প্রাচীন সাহিত্যপাঠের লক্ষণ সুস্পষ্ট রহিয়াছে। ভাষার প্রাচীন কাব্য গীত রচনা, চিন্তার পরিজ্ঞান না থাকিলে, সে ভাষার ব্যাকরণ সঙ্কলন সর্ব্বদা অসম্ভব। যাহাকে ভাষা-বিজ্ঞান বলে, সে বিজ্ঞানের অস্তিত্ব প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত। সুতরাং প্রাচীন সাহিত্যালোচনা যে অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা আমাদিগকে বেশী করিয়া বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। এক্ষণে আমি সংক্ষেপে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা বলিয়া আমার বক্তব্যের উপসংহার করিব।

বৌদ্ধযুগে পালবংশীয় রাজাদিগের সময় হইতে বোধ হয় বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম প্রচার আরম্ভ হয়। ধর্ম্মঠাকুরের মাহাত্ম্য-প্রচারই সেই সকল

সাহিত্যের লক্ষ্যস্থল। গানের পালা সাজাইয়া সেই গান গাহিয়া সাধারণের মধ্যে সেই ধর্ম্মঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রচার করা হইত। যোগীপাল, মহীপাল, মাণিকচাঁদ, রমাইপণ্ডিত, ঘনরাম, ময়ূরভট্ট, রূপরাম, খেলারাম, মাণিকরাম, প্রভুরাম, সীতারাম, রামদাস আদক প্রভৃতি অনেকেই ধর্ম্মের গানের পালা-কর্ত্তা ছিলেন। তদ্ব্যতীত ডাকের কথা, খনার বচন,—সাহিত্যাকারে লোক-শিক্ষার বেশ দুইটী সোপান ছিল। ডাকের কথা ও খনার বচন ধর্ম্মঠাকুরের মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক গানের পালা নহে। উহা প্রচলিত ও সাধারণের সহজ বোধ-গম্য ভাষায় পদ্যে রচিত ছোট ছোট ছড়া। তাহাতে রাজনীতি, বাণিজ্য-নীতি, স্বাস্থ্যনীতি, ধর্ম্মনীতি, কৃষিনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি যাবতীয় জ্ঞাতব্য ও শিক্ষার্থ বিষয় ছোট ছোট কথায় শিক্ষা দেওয়া হইত।

অনেক সময় অমঙ্গল-নিদান হইতে মঙ্গলের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ধর্ম্ম-বিশ্বাসের মতভেদ হইতে ধর্ম্মের সঙ্কীর্ণতাজনক সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি এবং সেই সাম্প্রদায়িক মত প্রচার-করণোদ্দেশে সাহিত্যের আদিভূত পদাবলী, পৌরাণিক উপাখ্যান, পাঁচালী ও কথকতা ইত্যাদির উদ্ভব হইয়া থাকে। প্রবল বৌদ্ধমতের খরস্রোতকে মন্দীভূত করিবার নিমিত্ত সেন-বংশীয় রাজাদের শাসন কালে প্রচারিত ধর্ম্মঠাকুরের আবরণে আবৃত করিয়া নূতন শৈবমত প্রচারের চেষ্টা হইল এবং সেই উদ্দেশ্যে রামকৃষ্ণদাস কবিচন্দ্র শিবায়ন রচনা করিলেন। পরে তাঁহারই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া রামরায় ও শ্যামরায়, 'মৃগব্যাধ সংবাদ' রতি-দেব 'মৃগলুব্ধক' রঘুরাম রায়, 'শিবচতুর্দ্দশী,' ভগীরথ, শিবগুণ মাহাত্ম্য' হরি-হর সুত 'বৈদ্যনাথ মঙ্গল' রচনা করেন এই সকল গ্রন্থও ক্রমশঃ ধর্ম্মের গানের মত গীত ও শ্রুত হইয়া শৈব মতটা একপ্রকার বেশ প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল।

ধর্ম্মবিবাদ সকল দেশে সকল সময়েই আছে। য়ুরোপে এই ধর্ম্মবিবাদ উপ-লক্ষে কত রক্তপাত হইয়াছে। সুখের বিষয়, ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতের শোণিত-প্রবাহ না বাহিয়া সাহিত্যের প্রবাহ ছুটিয়াছে। শৈবমত প্রচারিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শাক্ত সম্প্রদায় মাথানাড়া দিয়া এক নূতন স্রোত প্রবাহিত করিলেন। বসন্তরোগ ও তাহার চিকিৎসা উপলক্ষ করিয়া শীতলা দেবীকে বসন্তের অধিষ্ঠাত্রীরূপে খাড়া করিয়া তাঁহার মাহাত্ম্য-বর্ণনা ও পূজা অর্চ্চনার জন্য শীতলামঙ্গল বা শীতলা-গানের সৃষ্টি হইল। ক্রমে শাক্ত-সম্প্রদায় বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়া বহু বিস্তৃত হইয়া পড়িল, এবং ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকার পালার আকারে ভিন্ন ভিন্ন শক্তির আবিষ্কার ও প্রচার করিতে লাগিলেন। কবিবল্লভ

দৈবকীনন্দন প্রভৃতি 'শীতলামঙ্গল' বা 'শীতলা-মাহাত্ম্য' প্রচার করিলেন। কিছুদিন পরেই হরিদত্ত, বিজয় গুপ্ত প্রভৃতি ৬০ জন পালাকর্ত্তা মনসা-দেবীকে সর্পভয়-নিবারিণীরূপে খাড়া করিয়া মনসা-মাহাত্ম্য বর্ণনাচ্ছলে, 'বিষহরির গান' বা 'পদ্মপুরাণ' নামে মনসামঙ্গল রচনা করেন। মনসামঙ্গলের মধ্যে নারায়ণদেব রচিত চাঁদসদাগর ও বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী বিশেষ-রূপে বিদিত। মনসামঙ্গলের পরই মঙ্গল চণ্ডীর গান বা চণ্ডীমঙ্গল নামে খ্যাত শুভ চণ্ডীর গান বা শুভসূচনীর (সুবচনীর) কথা প্রচলিত হইল। দ্বিজ জনার্দ্দন, কবিকঙ্কণ, বলরাম, কবিরঞ্জন, মুকুন্দরাম প্রভৃতি অনেকেই চণ্ডীমঙ্গলের রচয়িতা; চণ্ডীমঙ্গলের পরই কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর-কথা। নায়ক-নায়িকার উপাখ্যান ছলে, আদ্যাশক্তি মহাকালীর মাহাত্ম্য-বর্ণনাই কালিকামঙ্গলের প্রধান বিষয়। গোবিন্দদাস, কৃষ্ণরাম দাস, রামপ্রসাদ সেন, রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র, অন্ধকবি ভবানী প্রসাদ, নিধিরাম কবিরত্ন প্রভৃতি অনেকেই কালিকা-মঙ্গলের রচয়িতা। বহুশক্তিরূপিণী আদ্যাশক্তি মহা-মায়ার ধাত্রীরূপকে ষষ্ঠীদেবীরূপে কল্পনা পূর্ব্বক কৃষ্ণরাম, কবিচন্দ্র ও গুণরাজ ষষ্ঠীমঙ্গল রচনা করিয়া ষষ্ঠী-মাহাত্ম্য প্রচার ও ঘরে ঘরে ষষ্ঠী পূজার প্রচলন করেন। তাহার অব্যবহিত পরেই গুণরাজ খান, শিবানন্দ কর, রণজিৎ দাস প্রভৃতি অনেকেই কমলামঙ্গল বা লক্ষ্মীচরিত্র রচনা করিয়া কমলা-মাহাত্ম্য প্রচার করেন। সঙ্গে সঙ্গে অমনিই দয়ারাম দাস ও গণেশ মোহন, সারদা-মঙ্গল বা লক্ষ্মী-মাহাত্ম্য প্রচারে অগ্রসর হইলেন। কমলামঙ্গল-রচয়িতাদের মধ্যে দয়ারাম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

স্ব স্ববিদ্যা-বুদ্ধি প্রকাশের সুযোগ কোন সম্প্রদায়ই ছাড়িয়া দেন নাই। চণ্ডীমঙ্গল, কালিকামঙ্গল যখন প্রচারিত হইল, তখন গঙ্গামঙ্গলই বা বাকী থাকে কেন। মাধবাচার্য্য, দ্বিজ গৌরাঙ্গ, দ্বিজ কমলাকান্ত, দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মঙ্গলকর্ত্তৃগণ গঙ্গামঙ্গল রচনা করিয়া গঙ্গামাহাত্ম্য প্রচার করিলেন। গঙ্গামঙ্গলের মধ্যে দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-রচিত গঙ্গা-ভক্তি-তরঙ্গিণী সমধিক প্রসিদ্ধ। সাহিত্য-জগতে, বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ন্যায়, সৌর-সম্প্রদায়ও সাহিত্যের পুষ্টিসাধন পক্ষে কিছু কিছু সাহায্য করিয়াছেন। দ্বিজ কালিদাস ও দ্বিজ রামজীবন বিদ্যাভূষণ সূর্য্যের পাঁচালী লিখিয়া কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

ধর্ম্ম বিবাদের ন্যায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও সাহিত্যোৎকর্ষ সাধন পক্ষে

অনেক সহায়তা করিয়াছে। মুসলমান রাজত্বকালে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সংঘর্ষ না ঘটিয়া যাহাতে একটা প্রীতির ভাব সংস্থাপিত হয়, সেজন্য মুসলমান রাজপুরুষেরা হিন্দু সমাজের আচার-ব্যবহার ও হিন্দুশাস্ত্র এবং ধর্ম্ম অবগত হইবার জন্য যত্নবান্ হইয়াছিলেন। হিন্দুগণ তাঁহাদের সকল কার্য্যেই রামায়ণ, মহাভারত বা ভাগবতের দৃষ্টান্ত দিয়া চলিতেন; সুতরাং সর্ব্বাগ্রেই তাঁহাদের ঐ দিকেই লক্ষ্য পড়িল এবং উপযুক্ত লোক দিয়া, ঐ সকল গ্রন্থের অনুবাদ করাইয়া সাধারণের মধ্যে প্রচার করাইতে লাগিলেন। এই সময় হইতেই বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুবাদ শাখার আরম্ভ হইল। কৃত্তিবাস অদ্ভুতাচার্য্য, অনন্তদেব দ্বিজ রামপ্রসাদ, রঘুনন্দন গোস্বামী প্রভৃতি রামায়ণ অনুবাদ করেন। বিজয়পণ্ডিত, সঞ্জয় কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর, নন্দী, কাশীরাম দাস, নন্দরাম দাস, ষষ্ঠীবর প্রভৃতি অনেক মহাত্মাই মহাভারতের অনুবাদ বা ভারত বর্ণিত বিষয় অবলম্বনে বহু কাব্য রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতখানি, মহাভারতমধ্যে সর্ব্ব প্রাচীনত্বের গৌরব করিতে পারে। সুলতান, হোসেন শাহের সময় বিজয় পণ্ডিতের বিজয় পাণ্ডব কথা বা 'ভারত পাঁচালী' প্রণীত হয়।

রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ করিয়া ভাগবতের অনুবর্ত্তী হইয়া বহুসংখ্যক গ্রন্থ রচনা দ্বারা অনেকে বঙ্গ সাহিত্যে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে গুণ রাজখাঁন মালাধর বসু একজন। তাঁহার অনুবাদের নাম 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' বা 'শ্রীগোবিন্দ বিজয়'। গুণরাজ খাঁর পর রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ করেন। তাহার অনুবাদের নাম শ্রীকৃষ্ণ "প্রেম তরঙ্গিণী"। কবিচন্দ্রের "কৃষ্ণমঙ্গল" ভাগবত অনুবাদের সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থ। এতদ্ব্যতীত ভবানন্দ "হরিবংশ" এবং সঞ্জয় বিদ্যাবাগীশ ভগবদ্গীতা অনুবাদ করেন।

কেবল গীত রচনা দ্বারা সাহিত্যের পুষ্টিসাধন, রামপ্রসাদ সেন কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য দেওয়ান রঘুনাথ রায়, নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও তদ্বংশীয় শিবচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র, কুমার শরচ্চন্দ্র ও মহারাজ শ্রীশচন্দ্র, নাটোরাধিপতি মহারাজ রামকৃষ্ণ, দাশরথি রায়, রামদুলাল সরকার, কাশীমীরজা সৈয়দ জাফর খাঁ প্রভৃতি সাহিত্য জগতে অনেক খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন।

বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত, সৌর, বৈষ্ণব, সকলেই সাহিত্য সেবা করিয়াছেন, কিন্তু বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যিকেরা সাহিত্যের লালন-কার্য্য

করিয়াছেন। বৈষ্ণব মহাপ্রভুরা সেই সাহিত্যের হাতে খড়ি দিলেন। বৈষ্ণব যুগে বাঙ্গালা সাহিত্য লালনের অবস্থা অতিক্রম করিয়া তাড়নার অবস্থায় পদার্পণ করে। বাস্তবিক বাঙ্গালা সাহিত্যের বর্ত্তমান উন্নতির অবস্থা বৈষ্ণব-দিগেরই অনুগ্রহে। বৈষ্ণব কবিদিগের রসমাধুর্য্যময়ী লেখনী হইতে যে মধুর কোমলকান্ত অমৃতময়ী কবিতাধারা নিঃসৃত হইয়াছে, আজিও তাহা সহৃদয় ব্যক্তিগণের তৃপ্তি সাধন করিতেছে। জয়দেব যে পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, প্রভৃতি সেই পথেরই অনুসরণ করিয়া সাহিত্য কানন চির বাসন্ত আমোদে ভরপুর করিয়া রাখিয়াছেন।

এই যে সাহিত্যের কথা বলিয়া আসিলাম, ইহার সঙ্গে আমাদের অদ্যকার সঙ্কল্পিত মালদহ-সম্মিলনের কি সম্পর্ক তাহা একটু দেখাইতে চেষ্টা করিব। প্রথমতঃ সাহিত্যের ভিতর দিয়া আমরা কি শিখিতে চাই, তাহা দেখা আবশ্যক। আমরা যে দেশের মানুষ সেই দেশটা কেমন ও কি ছিল তাহা জানা চাই; তাহার পর সেই দেশের মানুষগুলি কেমন, পূর্ব্বে কিরূপ ছিল এবং পরেই বা কেমন হইতে পারে তাহা জানা আবশ্যক। বোধ হয়, এই দুইটা বিষয় ভাল করিয়া জানিতে পারিলে আর বড় বেশী কিছু জানিবার বাকী থাকে না। এই দুই বিষয় জানিতে গেলে, আমাদিগকে সাহিত্যের আশ্রয় লইতেই হইবে। আর অন্য পন্থা কিছু নাই।

দেশ বা দেশের লোক কেমন ছিল, তাহা যদি জানিতে হয়, তবে খুঁজিতে হইবে—তৎসম্বন্ধে পূর্ব্বে কোথায় কে কি লিখিয়া পড়িয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ইহা হইতেই আমাদের প্রাচীন সাহিত্য, প্রত্নতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের গবেষণার কথা আসিয়া পড়ে। ত্রিকাল দর্শন নামে একটা বিদ্যা এক সময়ে ভারতবাসীর অধিকৃত ছিল বলিয়া শোনা যায়; কিন্তু এখনকার যুগে ত্রিকালদর্শী কেহ আছেন কিনা আমার জানা নাই। থাকিলে তাঁহাকে স্তবে তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট ভূত ভবিষ্যৎ সমস্ত জানিয়া লইতাম। তাহা যখন হইবার সম্ভাবনা নাই, তখন আমাদের খুঁজিতেই হইবে। আমরা মালদহ সাহিত্য সম্মিলনে সম্মিলিত হইয়া সেই খুঁজিবার পথ নির্ণয় করিয়া লইব। মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতির উদ্যোগে এই সম্মিলন আহূত হইয়াছে। আদৌ পথ পাওয়া যাইবে কি না তাহার আশ্বাস দিবার জন্য সেই শিক্ষা সমিতি পূর্ব্ব হইতেই সেই পথনির্ণয় কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহারা অনুসন্ধান কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া মালদহের প্রাচীন সাহিত্য ও ইতিহাস সম্বন্ধে যে সকল

তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন তাহার কতকটা বিবরণ আপনারা অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয়ের পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিভাষণে শুনিয়াছেন এবং বিস্তৃত বিবরণ এখন অন্যান্যকৃতী পুরুষের মুখে শুনিতে পাইবেন; সুতরাং সে সকল বিষয় সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এখন বেশী কিছু নাই, তবে আমি যে কথা বলিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছি তাহা এই;—

মালদহ একটী পুরাতন স্থান। মুসলমান রাজত্বের প্রাক্কালে যে বহু বিস্তৃত বরেন্দ্র রাজ্য ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল, যাহার প্রভাবে বৌদ্ধ সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থান মগধকে ধ্বংসমুখে পতিত হইতে হইয়াছিল, সেই বরেন্দ্র রাজ্যের অতি প্রবলতম অংশ এই মালদহ প্রদেশ। তৎপরে মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপিত হইলে পাঠানদিগের বাঙ্গালা দেশের মধ্যে এবং মোগলাধিকারের বাঙ্গালা দেশের মধ্যেও মালদহ প্রদেশের প্রয়োজনীয়তা বড় কম ছিল না। আর যদি বৌদ্ধযুগ পূর্ব্বকালের পৌণ্ড্র বর্দ্ধনাদির খোঁজ করিতে হয় তাহা হইলেও মালদহকে একেবারে ভুলিলে চলিবে না।

গৌড় ও পাণ্ডুয়ায় পুণ্ড্র ও বরেন্দ্রের অতীত কাহিনী কথা—যাহা আমি স্বদেশী ও বিদেশীর নিকট শুনিয়া আসিতেছি—সেই সকল তোতা পাখীর কণ্ঠস্থ বুলি আর আপনাদের নিকট বলিয়া আপনাদের মূল্যবান্ সময় নষ্ট করিব না। আপনাদের নিকট সে সকল গৌরবময়ী স্মৃতির কথা আমরা শুনিতে আসিয়াছি। বিস্মৃতির অতল তল হইতে যে সকল রত্ন আপনারা আহরণ করিয়া রাখিয়াছেন তাহাই দেখিতে আসিয়াছি। দেখিতে আসিয়াছি গৌড় ও পাণ্ডুয়ার ভগ্নাবশেষ—গৌড়ের বার দুয়ারী মস্‌জিদ যাহার গম্বুজগুলি শত বৎসর পূর্ব্বে ক্রেটন সাহেব সুবর্ণ-পত্র দ্বারা মণ্ডিত দেখিয়াছিলেন। গৌড়ের সিংহদ্বার "দখল দরওয়াজা" ও গড়বন্দী প্রাসাদ, নবাব হোসেন শাহ ও নশরৎ শাহের সমাধিস্থান, ফিরোজা মিনার গৌড়স্তম্ভ, কদমরসুল মস্‌জিদ, তাঁতিপাড়া মস্‌জিদ, লুটন মস্‌জিদ, প্রাসাদের পূর্ব্ব ও পশ্চিম দ্বার "লুকাচুরি" ও কোতয়ালি দরওয়াজা; এককথায় দেখিতে আসিয়াছি—প্রাচীন পাঠানকীর্ত্তি মুসলমান গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী ও তাহার উত্তরাংশে অবস্থিত হিন্দু গৌড় বা প্রাচীন রাজধানী রমাবতীর ভগ্নাবশেষ। আর দেখিতে আসিয়াছি—বৈষ্ণবদিগের মহাতীর্থ রামকেলী, প্রেমের অবতার বাঙ্গালার ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পদধূলিতে যেস্থান পবিত্রীকৃত হইয়াছে সেইস্থান দেখিতে আসিয়াছি, যেস্থানে আমাদের প্রাণ গোরা বিশ্রাম করিয়াছিলেন, সেই কেলী কদম্বমূল দেখিতে আসিয়াছি।

দেখিতে আসিয়াছি শ্রীরূপ সনাতন-সেবিত সেই মদনমোহন ঠাকুর, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, শ্রীরূপ গোস্বামীখনিত রূপসাগর দীর্ঘিকা ; আর দেখিতে আসিয়াছি শ্রীপাঠ গয়েশপুর যে স্থানে আম্রকাননে শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র শ্রীমদ্বীরভদ্র গোস্বামী প্রভু, কেশব ছত্রির পুত্র দুর্ল্লভ ছত্রীর আতিথ্য গ্রহণ করেন। এই কেশব ছত্রীর নিকট ইতঃপূর্ব্বে গৌড়ে মহাপ্রভু আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আর পাণ্ডুয়ায় দেখিতে আসিয়াছি—আসানসাহী দরগা সেলামী দরগা ও বাইশ হাজারী দরগা, নুরকুতুব আলামের দরগা, সোনা মস্‌জিদ, একলখী মস্‌জিদ, জগতের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ আদিনা মস্‌জিদ।

ইতিহাস চর্চ্চার জন্য মালদহ জেলা প্রসিদ্ধ। মালদহ রিয়াজ উস্‌সলাতিন প্রণেতা ঐতিহাসিক গোলাম হোসেনের জন্মস্থান ও কর্ম্মস্থান। শত বৎসর পূর্ব্বে এই স্থান হইতেই তিনি বাঙ্গালীকে স্বাধীনভাবে ইতিহাস প্রণয়নে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন।

গোলামহোসেন শিষ্য-পরম্পরায় ইতিহাস আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্য আবদুলকরিম ও তৎ শিষ্য মৌলবীইলাহী বক্স ইতিহাসের চর্চ্চা, ইতিহাস আলোচনার একটা ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ছিলেন। আমি মানসনেত্রে দেখিতে পাইতেছি, মালদহ সহরে যেখানে দাতব্য-চিকিৎসালয় রহিয়াছে, সেই স্থান গোলামহোসেনের জন্মস্থান বলিয়া, আর সহরের উত্তরাংশে "মীরচক" নামক স্থান—যেখানে তিনি চির নিদ্রায় সমাহিত আছেন—সেই স্থান বাঙ্গালীর ভবিষ্যতে ঐতিহাসিকদিগের তীর্থ ক্ষেত্ররূপে পরিগণিত হইবে। তাহারপর পঞ্চদশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের শ্রদ্ধেয়বন্ধু পরলোকগত রাবেশচন্দ্র শেঠ মহাশয় বাঙ্গালার পুরাতন রাজধানী গৌড়, পাণ্ডুয়ার অতীত কাহিনী—বাঙ্গালার সুখ দুঃখের কথা—বাঙ্গালীর অতীত গৌরব বিবরণ সর্ব্বপ্রথম আমাদের নিকট বিবৃত করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার আজীবন পরিশ্রমলব্ধ, ঐতিহাসিক তথ্যগুলি মাসিক পত্রিকার অঙ্ক হইতে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতে দেখিলে আন্তরিক সুখী হইব। আমার বোধহয় তিনিই প্রতিথযশাঃ ঐতিহাসিক বরেণ্য শ্রদ্ধেয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়কে গৌড় ও পাণ্ডুয়ার ইতিহাস আলোচনায় প্রথম প্ররোচিত করেন। তাহারপর মৈত্রেয় মহাশয় অক্লান্ত পরিশ্রমে অনুসন্ধিৎসার বর্ত্তিকা লইয়া অন্ধকারময় ঐতিহাসিকগুহার অন্তর্নিহিত রত্নরাজি উদ্ধার করিয়া নূতন

তথ্যের আবিষ্কার করিয়া—আপনিও ধন্য হইয়াছেন, আমাদিগকেও ধন্য করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় কর্ম্মবীরের সাধনায় পাশ্চাত্য জগৎ মুগ্ধ—পরিশেষে তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি "বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির" গঠন। তাঁহারই চেষ্টায় কুমার শরৎকুমারের বদান্যতায় ও সভ্যগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে বাঙ্গলার ইতিহাসের কয়েক পৃষ্ঠা উজ্জ্বল হইয়াছে, নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়া সত্যের মহাত্ম্য প্রচারে সহায় হইয়াছে—"গৌড়-রাজমালা" ও "লেখমালা"র আবির্ভাব হইয়াছে। "বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি" জগতের নিকট সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, বিজ্ঞানানুমোদিত উপায়ে ইতিহাসের আলোচনা করিতে বাঙ্গালী জানে, উপকথা ও প্রবাদের ভিতর দিয়া ইতিহাসের সারমর্ম্মটুকু গ্রহণ করিতে পারে।

মালদহের কথা ভাবিতে গেলেই মনে প'ড়িয়া যায় জ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নাম। তিনি 'গৌড়ের ইতিহাস' দুই খণ্ডে প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন। তাঁহার পর আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু কর্ম্মযোগী ইতিহাসের এক নিষ্ঠসাধক হরিদাস পালিত মহাশয়, 'আদ্যের গম্ভীরা' লিখিয়া বাঙ্গালায় ধর্ম্ম ও সামাজিক ইতিহাসের একাংশ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন। ভবিষ্যতে যাঁহারা সমাজ ও ধর্ম্মের ইতিহাস লইয়া আলোচনা করিবেন তাঁহারা পালিত মহাশয়ের প্রদর্শিত মার্গে বিচরণ করিয়া সুফল লাভ করিবেন একথা মুক্ত কণ্ঠে বলিব।

মালদহ জেলার মধ্যে সাহিত্যালোচনা করিয়া যাঁহার যশের মন্দিরে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ মহাশয়ের নাম সর্ব্বাগ্রে মনে পড়িয়া যায়। ইহারা আমাদের সাহিত্যের সেবা করিয়া আমাদের ধন্যবাদের ভাজন হইয়াছেন।

পরিশেষে একজন নীরবসাধক—একজন কর্ম্মযোগীর অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনায় সিদ্ধিলাভের কথা বলিব।

মুর্ত্তিমান বিনয়—বিনয় কুমারের কথা আপনারা সকলেই জানেন। তিনি ইংরেজী সাহিত্য ও ইতিহাসে সুপণ্ডিত। তিনি মাতৃভাষার সাধনা করিয়া আজ বাঙ্গালীর নিকট বরেণ্য হইয়াছেন, তাঁহার পুস্তকাবলী সাহিত্য সমাজে আদৃত হইয়াছে; কিন্তু সে সকল কথা আজ আমি এখানে তুলিব না; তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি—"মালদহ জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ।" ১৩১২ সালে যখন প্রচলিত শিক্ষা প্রণালীর অসম্পূর্ণতা অনেকেই প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া কলিকাতায় "Bengal National Council of Educator."

সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তখন জেলায় জেলায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদেরও সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অনেক গুলিরই অকালে অস্তিত্ব লোপ হইয়াছে, কিন্তু সুখের বিষয় বিনয়কুমার সরকার, বিপিনবিহারী ঘোষ, কৃষ্ণচন্দ্র সরকার প্রমুখকর্ম্মিগণের চেষ্টায় ও সাধনায় মালদহ-শিক্ষা-পরিষৎ আজিও সগর্ব্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে ; কত দুঃস্থ বালককে শিক্ষাদান করিয়া সমাজে প্রকৃত মানবের সৃষ্টি করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই, ব্যাবহারিক জ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য এই জেলার কএকজন ছাত্রকে য়ুরোপ ও আমেরিকায় পাঠাইয়া শিক্ষিত করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছে। এই পরিষৎ মালদহবাসীর চিন্তা স্রোতকে বাঙ্গালা সাহিত্যের ভিতর দিয়া প্রবাহিত করাইয়া, যে কল্যানের সূচনা করিয়াছে তাহা আশাপ্রদ। আশাকরি কালে মালদহ জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ মহীরূহে পরিণত হইয়া ফলপুষ্প ভারে নত হইয়া বঙ্গীয় সাহিত্য কানন আমোদিত করিয়া রাখিবে।

আর আজ যে স্থানে এই সভা আহুত হইয়াছে, সেই কলিগ্রাম জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রাণ স্বরূপ সাহিত্যানুরাগী জমিদার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র সরকার মহাশয়কে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না তিনি একাধারে কমলা ও বীণাপাণির বরপুত্র ; এই কলি গ্রামের উন্নতি কল্পে তাঁহার মহতী চেষ্টা, তাঁহার প্রাণপণ পরিশ্রম যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া এই বিদ্যালয় রূপে আমাদের নয়ন সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

এইরূপে সর্ব্বকালে সকল দিক্ হইতেই যখন মালদহ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বঙ্গের ইতিহাসে সর্ব্ব প্রকারে বিশেষ প্রয়োজনীয় স্থান হইয়া রহিয়াছে, তখন ইহার উত্থান পতনের ইতিহাস এবং ভবিষ্যতের উন্নতির উপায় চিন্তা করা আমাদের কর্ত্তব্য।

মালদহবাসী মালদহের জন্য গবেষণায় প্রবৃত্ত হইবেন, ইহার জন্য উপরোধ, অনুরোধ, বা সঙ্কল্প আবশ্যক করে না। ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। কিন্তু মালদহের কি ছিল জানিলে যখন বাঙ্গালীর একাংশের ইতিহাস জানা যায়, তখন মালদহের গবেষণায় সমস্ত বাঙ্গালীর আগ্রহ হওয়া আবশ্যক। মালদহবাসী কাজ করিয়া সাফল্যের মুখ দেখিতে পাইয়াছেন। তাহার ফলাফল আজ আমাদের সম্মুখে ধরিতেছেন, আমারা তাঁহাদিগের সহিত সমান আগ্রহ দেখাইয়া যদি তাঁহাদের গবেষণার ফল গুলিকে আদর করিয়া লই, তবেই না মালদহের এই সাহিত্যে সম্মিলন সর্ব্বতোভাবে সফল হয়।

মালদহ যাহা করিয়াছেন, যাহা আমাদের দিতেছেন, তাহা আমাদের আদর্শ হউক, আমরা মালদহের আদর্শে অপরত্র এইরূপ সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাকারি।

জাতীয় শিক্ষা সমিতি কাহারও সাহায্য না লইয়া স্বক্ষেত্রে স্বাধীন চেষ্টায় স্বকার্য্য করিয়া যাইতেছেন। এই সাবলম্বন অতিমাত্র প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু যেমন ব্যক্তি সমষ্টি লইয়া সমাজের গঠন হয় তেমনই এই মালদহের ন্যায় কর্ম্মিদল সকল জেলায় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গড়িয়া উঠুক এবং ক্রমশঃ সে সকলের সমবায়ে বিপুল বঙ্গ সমাজের গঠন সম্পূর্ণ হউক। কোথায় কি সূত্রে কেমন করিয়া তাহা হইবে, তাহার জন্য আমাদিগকে ভাবিতে হইবে না। সমস্ত বঙ্গের সাহিত্য চেষ্টা যাহাতে একাঙ্গীভূত হয় আজ বিশবৎসর হইল তাহার স্থান ভগবৎ কৃপায় গঠিত হইয়াছে। যেমন মালদহের জাতীয় শিক্ষা সমিতি আশা করেন—মালদহের প্রত্যেক ব্যক্তি মালদহের সাহিত্য; ইতিহাস ও সমাজ তত্ত্বের গবেষণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া মালদহের কাজ সুসম্পন্ন করুক; তেমনই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ আশা করেন, কেবল মালদহ কেন বঙ্গের সমস্ত জেলায় মালদহ সাহিত্যালোচনা-সমিতির ন্যায় সমিতি হইয়া সমগ্র বঙ্গের কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য দেশের সমস্ত বিচ্ছিন্ন স্বাধীন শক্তিকে একত্র করিয়া একবঙ্গের নামে সংহত শক্তি প্রয়োগের ব্যবস্থা করুক। মালদহ শিক্ষা সমিতির কার্য্য মালদহে নিবদ্ধ থাকুক, কিন্তু সে কেবল স্বাধীনতার দোহাই দিয়া কেবল স্বাতন্ত্র্যের মহিমা দেখাইবার জন্য সমস্ত বঙ্গের সংহত চেষ্টায় যোগ দিবে না, অথবা তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিবে, ইহা যেন হইতেই পারেনা। এরূপ বিসদৃশ কল্পনাও বোধহয় মালদহ শিক্ষা সমিতির লক্ষ্মীভূত নয়। মালদহ যেমন সমস্ত মালদহ জেলাকে একত্র করিয়া এক ক্রিয়া ও এক উদ্দেশ্যে বদ্ধ করিতে প্রয়াসী—বঙ্গীয় সাহিত্য পারিষৎ ও তেমনই সমস্ত জেলাকে পরিষদের নামে একত্র করিয়া একক্রিয়া ও এক উদ্দেশ্যে বদ্ধ করিতে প্রয়াসী। অনেকে বলিবেন এসকল অবান্তর কথার অবতারণা কেন? একটু প্রয়োজন হইয়াছে বলিয়াই এই সকল কথা বলিতে বাধ্য হইলাম। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন হয়—সমস্ত বঙ্গকে লইয়া। উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন হয়—সমস্ত উত্তরবঙ্গকে লইয়া। আবার সেই উত্তর বঙ্গের মধ্যে একপ্রান্তে মালদহ সাহিত্য সম্মিলনের অনুষ্ঠান। ইহা যেমন কর্ম্মপ্রবণতার লক্ষণ, তেমনই স্বাধীনতার নামে বিচ্ছিন্নতা বর্দ্ধনের লক্ষণ।

অনেকেই প্রশ্ন পূর্ণ দৃষ্টিতে এই সকল ব্যাপার লক্ষ্য করেন। সুরসিক অমৃতলাল বসু একদিন বলিয়াছিলেন—এক কলিকাতার মধ্যেই অতঃপর ‘ঠন্‌ঠনিদা সম্মিলন’, ‘বড়বাজার সম্মিলন’ ‘চৌরঙ্গী সম্মিলন’ ঘটিবে। মনুষ্য চরিত্রের অভিনয় কলাকুশল সুরসিক নটরাজ দূর ভবিষ্যতে দৃষ্টি রাখিয়া যে ইঙ্গিত করিয়াছেন, এই সম্মিলনের সভাপতির পদে বৃত হইয়া সেদিক্‌ হইতে আমি দৃষ্টি একবারে সঙ্কুচিত করিতে পারিলাম না বলিয়া এসকল কথার অবতারণা করিয়াছি। এই ক্ষুদ্র-বৃহৎ স্থানব্যাপী সম্মিলন গুলির সহিত যে কোথাও দ্বন্দ নাই, তাহা বলিয়া দেওয়া বোধ হয় আমাদের পক্ষে অসঙ্গত হইল না। মালদহ বাসীদের আজ বড় আনন্দের দিন—জননী বঙ্গভাষার মন্দির প্রতিষ্ঠার পুন্যাহ, সাধকের প্রেমাঞ্জলি দিবার দিন। আজ শত ভক্ত অর্ঘ্য লইয়া মাতৃমন্দির দ্বারে দণ্ডায়মান। আসুন আমরা সকলে মাতার বন্দনা করিয়া নববলে বলীয়ান্ হইয়া মাতৃভাষার সেবাকল্পে জীবন উৎসর্গ করি। আজ আমরা আমাদের স্বার্থপরতা ভুলিতে আসিয়াছি। ভুলিতে আসিয়াছি—আমাদের ক্ষুদ্রতা,—আমাদের নীচতা।

আসুন আমরা অচ্ছেদ্য অটুট দিব্য প্রেমের বন্ধনে ভ্রাতৃ ভাবে সকলের সহিত আবদ্ধ হইয়া মাতৃভাষার সেবা করি, কারণ কথাই ত আছে “দশে মিলে করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ”।

আর কবির সহিত বলি—মায়ের চরণে ফুলমালা দেরে জড়ায়ে,
মায়ের ভাষায় আপনার দেরে ছড়ায়ে
দিশে দিশে, দেশে বিদেশে,
আজি স্পন্দিত নিমেষে।

আর মালদহবাসী কর্ম্মীদের সাধনায় আমার বোধ হয় এই সুন্দর মাতৃমন্দির-দ্বারে প্রতি বৎসর বাঙ্গালা দেশের সাহিত্যিকগণ সমবেত হইয়া আপনাদের উৎসাহ-বর্দ্ধন করিবেন—আপনাদের হৃদয়ে নববলের সঞ্চার করিয়া দিবেন। আসুন এক্ষণে আমরা কর্ম্ম ফলের দিকে না চাহিয়া—কর্ম্ম ফল শ্রীভগবানে অর্পণ করিয়া—কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হই।

শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ।

শিক্ষার দোষ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নূতন চাকুরী—গৃহশিক্ষক।

ননিলাল কলিকাতায় পঁহুছিয়া আফিষের কার্য্যে নিযুক্ত হইল, কিন্তু মাসিক পঞ্চদশ মুদ্রা বেতনের চাকুরীতে যখন তাহার একটী পয়সাও বাঁচাইয়া বাড়ী পাঠাইবার উপায় নাই, তখন তাহাকে অপর কোন একটি কাজের যোগাড় করিয়া লইতেই হইবে। সে প্রতিদিন প্রাণপণে তাহার চেষ্টায় ফিরিত।

দশ পনরদিন পরে সে যখন প্রতিদিনের মত অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা করিয়া অবশেষে নিরাশ হইয়া বাসায় ফিরিতেছিল, তখন প্রায় সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছিল।

হেদোরপুকুরে তখন অনেক লোক সান্ধ্যবায়ু সেবন করিতে আসিয়াছিলেন। অনেক বালকবালিকা লইয়া তাহাদের পিতা বা ঝি-চাকর আসিয়া পুকুরের চারিধারে পাদচারণা করিয়া ফিরিতেছিলেন এবং প্রায়াগতা সন্ধ্যা দর্শনে কাক ও চড়াই পাখীর দল হেদোর বৃক্ষগুলিতে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছিল।

ননিলাল ক্লান্তদেহে ক্ষুণ্ন মনে দ্বার গলাইয়া হেদোর চত্বরে প্রবেশ করিল। এবং চিন্তাক্লিষ্ট চিত্তে ধীরে ধীরে পায়চারি করিয়া ফিরিতে লাগিল।

ননির আগে পাছে অনেক লোক হাঁটিতেছিল। একটি ভদ্রলোক একটি অষ্টমবর্ষীয় বালক সঙ্গে লইয়া ঠিক ননির আগে আগে চলিতেছিলেন।

সেই ভদ্রলোক ও বালক সম্বন্ধে পিতাপুত্র। ভদ্রলোকটির বয়স হইয়াছে। আকৃতি ও পরিচ্ছদ ভদ্রজনোচিত। পুত্রের সহিত নানারূপ কথোপকথন করিতে করিতে গমন করিতেছিলেন। ননি সে সকল কথা কানে তুলে নাই—চলিয়া যাইতে হয়, যাইতেছিল। হঠাৎ একটি কথা তাহার কানে গেল, সে উৎকর্ণ হইয়া কথার শেষ পর্য্যন্ত শ্রবণ করিল।

পিতা পুত্রকে বলিলেন,—"তোর মাষ্টার কি জবাব দিয়ে গেছে, না আবার আস্‌বে?"

পুত্র। না বাবা, বোধ হয় তিনি আর আস্‌বেন না। তিনি ব'লে গেছেন, যে আফিষে তিনি কাজ করেন, সে আফিস নাকি উঠে শালিখায় গেছে—কাজেই তাঁকে শালিখায় বাসা করতে হবে। কাজেই এত দূর এসে তিনি আর পড়াতে পাববেন না।

পিতা। কৈ, তাত একয় দিন বলিস্ নি। আমি কি বাপু আফিষের খাটুনী খেটে এসে, রোজ তোকে পরাতে পারি। আমাকে সাড়ে আটটায় খেয়ে দৌড়ুতে হয়। তাতে কি আর তোকে পড়ান যায়। আসি সেই সন্ধ্যায়। আজ রবিবার ছিল, একজন শিক্ষকের সন্ধান করা যেত। সাত দিনের মধ্যে আর হবে না। তোর পড়ার ক্ষতি হবে!

তখন তাহারা উত্তর দিকের চত্বরে পৌঁছিয়াছে, ননি ধাঁ করিয়া ঘুরিয়া ভদ্রলোকটির সম্মুখে গেল, এবং বিনীতভাবে নম্রস্বরে বলিল,—"আপনার পুত্রের জন্য কি মাষ্টার রাখিবেন?"

চকিতে একবার ননির আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া ভদ্রলোকটি বলিলেন,—"হাঁ রাখিব।"

ননি। আমি ঐ কার্য্য করিতে পারি।

ভদ্র। তুমি কোথায় থাক?

ননি। সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে—মেসে থাকি।

ভদ্র। অধিকদূর নয়। কোথায় কাজ কর?

ননি। কোম্পানীতে—কেরাণীগিরি।

ভদ্র। তুমি কতদূর পর্য্যন্ত পড়িয়াছ।

ননি। এণ্ট্রেন্স পাশ করিয়া এফ, এ পড়িতেছিলাম। কিন্তু পরীক্ষা দিতে পারি নাই।

ভদ্র। কি জাতি?

ননি। ব্রাহ্মণ।

ভদ্র। তা বেশ। তোমার নাম?

ননি। আজ্ঞে ননিগোপাল চক্রবর্ত্তী।

ভদ্র। তা' বেশ,—কিন্তু সকাল-বিকাল দুইবেলাই পড়াইতে হইবে।

ননি। তাই পড়াইব। সকালে সাড়ে আটটা পর্য্যন্ত, আর বিকাল ছয়টা হইতে যতক্ষণ আবশ্যক।

ভদ্র। বৈকালের সময়টা একটু অসুবিধাকর হইতেছে।

ননি। কেন ?

ভদ্র। ছেলেমানুষ ছাত্র—পাঁচটা হ'তে আরম্ভ কর্‌লেই ভাল হয়।

ননি। আজ্ঞে আমার আফিষের ছুটি পাঁচটায়। তারপর বাসায় গিয়ে কাপড় চোপড় ছেড়ে একটু জল-টল খেয়ে আস্‌তে হবে।

ভদ্র। আচ্ছা, তাই। বেতন কত নেবে ?

ননি। আপনি বিবেচক—আমি দরিদ্র ; উদরের জ্বালায় কাজ করিব—বিবেচনামত আপনি দিবেন।

ভদ্র। না না, একটা সাব্যস্ত থাকা চাই।

ননি। আপনিই বলুন।

ভদ্র। যে মাষ্টার ছিল, তাকে আমি ছ টাকা ক'রে দিতুম।

ননি। দু'বেলা আস্‌তে হবে—

ভদ্র। বেশ তুমি মনোযোগ সহকারে ওকে শিক্ষা দাও তোমাকে আট টাকা করিয়া দিব।

ননি। যে আজ্ঞে তাই। কবে হ'তে যাব ?

ভদ্র। কাল সকাল থেকে। আমার নাম উপেন্দ্রনাথ সেন, ৭৭ নং রামকৃষ্ণ দাঁর লেন, আমার বাড়ী।

ননি তাড়াতাড়ি পকেট হইতে পকেট বই বাহির করিয়া নামও ঠিকানা লিখিয়া লইয়া নমস্কার করত হৃষ্টান্তঃকরণে চলিয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

শুক্রবার অতীত হইয়া গিয়াছে, ননিলাল ঘোষপ্রভুর নিকটে প্রাপ্য বেতন প্রাপ্তির আশায় তাহার দোকানে গিয়া উপস্থিত হইল।

ঘোষমহাশয় তখন একজন খরিদারের সহিত বচসায় প্রবৃত্ত ছিলেন। তিনি ওজন কম দিয়াছিলেন,—খরিদার ভদ্রলোক সেই কথা বলায় ঘোষ-মহাশয় চটিয়া তাহাকে দু' কথা শুনাইয়া দিতেছিলেন।

ভদ্রলোকটিও নিতান্ত অপাত্র নহেন, তিনিও বাঁকিয়া দাঁড়াইলেন। উভয়ে বাক্‌যুদ্ধ চলিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সেখানে অনেক লোক যুটিয়া

গেল। অনেকেই ভদ্রলোকটির পক্ষ সমর্থন করিল। কেহ কেহ মধ্যস্থ হইয়া বিবাদ মিটাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দুই পক্ষের কথা খুব সংক্ষেপে শুনিবার চেষ্টা করিলেন।

ব্যাপার জিজ্ঞাসিত হইয়া ভদ্রলোকটি বলিলেন,—"মহাশয়, আমি রাব্ড়ীর দর জিজ্ঞাসা করায়, উনি বারো আনা সের বলিলেন। আমি বারো পয়সা দিয়া এক পোয়া খরিদ করিলাম, এবং পাশের দোকানে ওজন করাইলাম,—খাঁটি তিন ছটাক হইল।"

ঘোষমহাশয় বলিলেন,—"তিন ছটাক হবেনাত কি হবে? দুধ কত মাগ্‌গি—এক টাকা সেরের কমে কখনও রাব্ড়ি বেচা যায় না—কোন শালা পারবে না।

ভদ্র। তুমি কেন সেই দর বলিলে না!

ঘোষ। তা' হ'লে কি খদ্দের শালারা দাঁড়ায়!

ভদ্র। এরূপ করিলে তোমার রাজদণ্ড হ'তে পারে।

ঘোষ। ওরে আমার রাজদণ্ড—চিরদিনই এই রকম করি। সবাই করে। যে না করে, তার আর পেটের ভাত যোটাতে হয় না।

ভদ্র। একাজ ভাল নয়।

ঘোষ। আমাকে আর উপদেশ দিতে হবে না। তোমরা গোল ভাঙ। সন্ধ্যার সময় দু একটা খদ্দের আসবে।

প্রবঞ্চিত ভদ্রলোকটি ছাড়িতে চাহেন না। তিনি পুলিসে যাইবেন স্থির করিলেন। কেহ কেহ সে বিষয়ে উৎসাহ দিল, কেহ কেহ সাহায্য পর্য্যন্ত করিতে চাহিল, প্রবঞ্চিত ভদ্রলোক থানায় যাইতেছিলেন, দুই একজন মধ্যস্থ থাকিয়া তাঁহাকে ফিরাইলেন এবং বুঝাইয়া বলিলেন—পুলিসে গেলেই কিছু নিষ্কৃতি নাই। পাঁচ দিন থানা আর ঘর করিতে হইবে। তারপরে মাজিষ্ট্রেট কোর্টেও কোন্ দশদিন না ঘুরিতে হইবে। সামান্য একছটাক রাবড়ীর জন্যে এত হাঙ্গামা ভাল নয়। ইহাতে আপনার দু' দশটাকা ব্যয়ও হইয়া যাইতে পারে।

ভদ্রলোকটি তথাপি নিরস্ত হইতেছিলেন না। তিনি বলিলেন,—হয় হউক ঝঞ্ঝট, হয় হউক ব্যয়, তথাপি জুয়াচোরের শাসন হইবে।

কিন্তু সে কথা সমীচীন বলিয়া তাঁহারা সমর্থন করিলেন না। তখন আরও নানাবিধ বাক্‌বিতণ্ডার পরে ভদ্রলোকটি চলিয়া গেলেন। সেখানকার জনতা ভাঙ্গিয়া গেল।

ঘোষ মহাশয় রণজয়ী বীরের ন্যায় যখন নিজের কম ওজন দিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত এই কারবার করিয়া আসিতেছেন, এবং তাহাতে কেহ কিছুই বলিয়া করিতে পারে নাই বলিয়া গর্ব্ব করিতেছিলেন, তখন ননিলাল ধীরে ধীরে তাঁহার নিকটস্থ হইয়া বলিলেন—"আমি আসিয়াছি।"

একবার তীব্র কটাক্ষে ননিলালের মুখেরদিকে চাহিয়া ঘোষমহাশয় যেমন আপন কথা ব্যক্ত করিতেছিলেন, তেমনই করিতে লাগিলেন। ননিলালের কথার কোন উত্তরই করিলেন না।

তস্করের ন্যায় দোকানের সম্মুখে ফুটপাতের উপরে আরও কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিয়া পুনরপি ননিলাল বলিল,—"আমার প্রাপ্য টাকার জন্যে আসিয়াছি।"

ঘোষমহাশয় উচ্চৈস্বরে বলিলেন,—"তা শুনেছি।"

ননি। দিন, অনেক দুর যাব।

ঘোষ। তুমি অনেক দুর যাবে, তা আমার কি!

ননি। না, তোমার আর তাতে কি,—তবে আমার পাওনা মিটাইয়া দিলেই আমি চলিয়া যাই।

ঘোষ। কিসের পাওনা?

ননি। ওমা,—কিসের পাওনা, তাই বলিতে হইবে? কেন আপনি কি ভুলিয়া গিয়াছেন নাকি?

ঘোষ। তুমি বলই না।

ননি। কেন, তোমার ছেলে পড়ানর মাইনে।

ঘোষ। ইস্—দই-দুধ খেয়ে কত বেটা দাম দিলে না, তা' আবার একটু পড়িয়ে বাকি আদায় করতে এসেছেন—খুব মানুষ বাবা, তুমি।

ননি। আমি গরিব মানুষ—

ঘোষ। রাখ, তোমার গরিব মানুষ—আমি টাকা দিতে পারিব না। আর দেবই বা কেন,—তুমি আমার ছেলে দুটোকে বোকা বানিয়ে রেখে গেছ—তোমাকে যে অমনি ছেড়ে দিয়াছি, সেই ভাল।

ননি। কেন, মারতে নাকি?

ঘোষ। দোষ কি!

ননি। মুখে লাগাম দিয়ে কথা কহিয়ো। টাকা দেবে তবে ছাড়িব।

ঘোষ। ইস্—টাকা গাছের ফল কি না।

ননি। দেবে না?

ঘোষ। কখন না।

ননি। আল্‌বৎ দিবে।

ঘোষ। টাকা আমার—তুমি আল্‌বৎ বলিলে কি হবে।

ননি। আমি আদায় করিব—তবে ছাড়িব?

ঘোষ। এখন দন্তকিচমিচ ছাড়। নইলে পুলিশ ডাকিব।

ননি। টাকা না পেলে আমি কিছুতে যাব না।

ঘাটীর পাহারাওয়ালা সাহেব একটু করিয়া অহিফেন সেবন করেন, এবং ঠিক সন্ধ্যার সময় ঘোষের দোকানে আসিয়া এক কটরা জল মিশ্রিত কবোষ্ণ দুগ্ধ পান করিয়া থাকেন। ঘোষ কখনও তাহার মূল্যের দাবি করেন না। তাঁহার ধারণা, ইহাতেই পুলিস তাঁহার হস্তগত এবং তিনি যে কমবেচাকেনা করেন, তজ্জন্য তাঁহার প্রতি রাজদণ্ডের কোন সম্ভাবনা নাই।

অধিকন্তু ঘোষমহাশয় আশা করেন, ঘাটীর কনষ্টবল বাহাদুরকে নিয়মিত জলমিশ্র কবোষ্ণ দুগ্ধ এক কটরা করিয়া পান করানয়, সম্মুখসমরে কেহ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দণ্ডায়মান হইতে কখনই সাহসী হইতে পারে না। কারণ, প্রতিদ্বন্দ্বীকে তখনই পুলিস ডাকাইয়া ধরাইয়া দিতে পারিবেন, এবং দুগ্ধপান কৃতজ্ঞ পুলিস কনষ্টবল তখনই তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া হরিণ-বাড়ী পুরিয়া রাখিয়া দিবে।

ননির সঙ্গে যখন ঘোষমহায়ের বাক্‌যুদ্ধ প্রবলতর হইয়া গিয়াছে, তখন একমাত্রা অহিফেন সেবন করিয়া পাহারাওয়ালা প্রভু তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পাহারা পরিবর্ত্তনের সময় উপস্থিত হইয়াছে, দুগ্ধটুকু পান করিয়াই থানায় চলিয়া যাইবেন।

মন্থর গতিতে গর্ব্বিত পদক্ষেপে কোমরবন্দে হস্তক্ষেপ করিতে করিতে যখন পাহারাওয়ালা সাহেব ঘোষের দোকানের সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, তখন ঘোষমহাশয় অত্যন্ত আশান্বিত হইলেন, এবং ননির উপযুক্ত শাস্তিকাল উপস্থিত স্থির জানিয়া তাঁহার শিক্ষামতে হিন্দিভাষার আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়া বলিলেন,—"এ কনষ্টবল সাহেব, এই বদমায়েস্ হামারা বহুৎ দিগদারি করিতেছে। তোম্‌বি ইহাকে গারদে নিয়ে যাওত।"

পাহারাওয়ালা ননিলালের আপাদমস্তকের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"মৎ চিল্লাও বাবু। কাঁহে দিগ্‌দারি কর্‌তা হায়?"

ননি। ওর ছেলে পড়াইয়াছি—মাইনে দেন না। চাহিতে আসিয়াছি,—তাতে আবার রোক

পাহারা। যব্ দেগা,—তব্ আইও।

ননি। কেন, তোমার হুকুম নাকি? তুমি দেখ,—কে রাস্তায় প্রস্রাব করিয়াছে। আমার উপর কথা কহিবার কোন অধিকার নাই।

পাহারা। আপ্ রাস্তামে বহুৎ ভিঁড় করতা হ্যায়।

ননি। একা মানুষ ভিঁড় কিহে বাপু? এত বিদ্যা না হ'লে আর দেশ ছেড়ে এখানে এসে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে মর।

পাহারা। হাম্ সম্‌জাতাহ্যায়, আপ্ সাদেশী বাবু থা,—পুলিশ সাহেবকা পাশ এবাৎ বোল্‌তা হ্যায়।

ননি। জরুর। আবি হামরা পাওনা লেকে তব্ ছোড়েগা।

তখন পাহারাওয়ালা সাহেব আপাততঃ ননির উপর কোন প্রকার নির্য্যাতন করা অসম্ভব বিবেচনা করিলেন। কারণ ইংরেজ আইনে সে ক্ষমতা তাঁহাদের নাই। কাজেই তিনি নিরাশ হইয়া ঘোষমহাশয়কে বলিলেন,—"দুধ দেও জি, হামরা ছুটি হুয়া।"

ঘোষমহাশয়ের বহুদিনের আশা শূন্যে বিলীন হইল। তিনি বুঝিলেন,—আংরেজী পড়া লোকগুলার নিকটে পুলিশও পরাস্ত। তবে নিত্য নিত্য কি জন্য এবেটাকে দুগ্ধ দেওয়া!

তখন স্পষ্টতঃ তিনি তাঁহার নিজস্ব হিন্দি ভাষায় বলিলেন,—"পাঁড়েজি, তোমারা পাশ, দুধের অনেক দাম পাওনা হোগা। আবি হামাকে শোধ ক'রে দাও।"

পাহারাওয়ালা চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহাকে একটু একটু দুগ্ধ দিয়া তাহার মূল্য প্রার্থনা করা অত্যন্ত অন্যায়। কাজেই তাঁহার রাগ হইল। বলিলেন—"কিয়া?"

ঘোষ। বুঝিতে পারলে না? হাম্‌তো তোমাকে রোজ রোজ দুধ দেই। উস্‌কা দাম নাহি কি? তোমারা পাশ সাত রূপেয়া এগার আনা হামারা পাওনা হোগা।

পাহারা। এত্‌না রোজ কাঁহে নেই বোল্‌তা হ্যায়?

ঘোষ। হাম জান্‌তা হ্যায় তোম্ ভদ্দর আদ্‌মি, যব চাহেগা—তব্ দাম পাব।

পাহারাওয়ালা অনন্যোপায় হইয়া সেকথা চাপা দিবার চেষ্টা করিলেন। বলিলেন—এ বাবুকা কাঁহে তলব নেই দেতা হ্যায় ? ভদ্দর আদ্‌মি—আবি দেও।”

ঘোষ। তোমার নিকট দামবি পাতা হয়, তব্ দেতা হ্যায়।

ননি। আমার সঙ্গে তোমার সেইরূপ কণ্ডিসন ছিল নাকি ? দেবে কিনা বল ?

ঘোষ। দিব না ?

ননি। কেন ?

ঘোষ। তুমি নালিশ ক'রে নিও।

তখন পাশের দোকানদারগণ বা পথিকগণ পাহারাওয়ালা সাহেব দুধ খাইয়া দাম দেয় না একথা যাহাতে শুনিতে না পায়, তজ্জন্য পাহারাওয়ালা “ইয়া বড়া খারাপ বাৎ হ্যায়। ভদর আদ্‌মী ছেলিয়া পড়াতা হ্যায়—উস্‌কা তলব নেই মিল্‌তা হ্যায়—কিস্‌মাফিক বাত হুয়া রে” বলিতে বলিতে তিনি চলিয়া গেলেন।

ননিও বেতন প্রাপ্তির আশায় সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া সে স্থান পরিত্যাগ করত চলিয়া গেলেন।

ননি চলিয়া গেলে, ঘোষমহাশয় ননির চরিত্র বংশ শিক্ষা ও শরীরের উপরে নানাবিধ দোষারোপ দ্রব্যবিশেষ কাল্পনিক নিক্ষেপ ও কাল্পনিক সম্বন্ধের সৃষ্টি করিতে আত্ম কর্ত্তব্যে মনোনিবেশ করিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

ম্যাডোনা।

SEYNE

জননী।

সকল যাতনা তুমি তুচ্ছ জ্ঞান করি,
দশমাস দশদিন ধরিছ জঠরে—
সন্তানে, তোমার গুণ বর্ণিতে না পারি,
কি কার্য্য অসাধ্য তব সন্তানের তরে।
নরক যাতনা তুল্য প্রসব বেদন,
অম্লান বদনে সহ্য কর গো জননি!
হেরিয়া সন্তান-মুখ প্রফুল্ল বদন,
সমুদয় জ্বালা ভুলি যাও গো তখনি।
হে দেবি! এ হেন সহ্য ত্রিভুবনে কার,
জনয়িত্রীরূপে তুমি সৃষ্টির আধার।
শিশুর পুরীষ-মূত্র মুছি স্নান করে,
সযতনে কর তারে লালন পালন,
ঘৃণার উদ্রেক তব নাহিক অন্তরে,
করনা নয়ন ছাড়া সন্তানে কখন।
সন্তান, শয়তান যদি হয় গো তোমার,
তবু তব স্নেহ মায়া দূরে না হ যায়,
সেইরূপ শুভবাঞ্ছা থাকে অনিবার,
আকুল পরাণে রও তাহার মায়ায়।
হে জননি! তব ঋণ শোধে শক্তি কার,
পরম মঙ্গলা তুমি পূজ্যা সবাকার।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস

সম্রাট্ আকবরের শিল্প-প্রীতি

পাশ্চাত্যবাসী আপনাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য যাহাই বলুন না কেন, ভারতবর্ষ, প্রাচ্যবাসীর নিকট চিরদিনই সুন্দর সুন্দর উন্নতপ্রণালীর কারুকার্য্য ও শিল্পপ্রণালীর জন্য সমাদৃত হইবে। হিন্দুরাজত্বকালাপেক্ষা যে মোগলরাজত্বকালে ভারতীয় শিল্পের পূর্ণ বিকাশ সাধিত হইয়াছিল, একথার সাক্ষ্য ইতিহাস। ফতেপুর, সিক্রী, আগ্রা ও অন্যান্য স্থানের মস্জিদ, সমাধি মন্দির ও প্রাসাদাবলী আজও মোগলশাসনাধীন ভারতের শিল্পকলার ঔৎ-কর্ষ্যের প্রমাণ দিতেছে।

সম্রাট্ সাজাহান বহুসংখ্যক অট্টালিকা নির্ম্মাণের জন্য ভারতীয় ইতিহাসে চির-প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। সম্রাট্ বাবর তাঁহার স্বকীয় আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন যে, "তিনি প্রতিদিন ১৪৯১ জন প্রস্তরখোদক নিযুক্ত রাখিতেন। এই সমস্ত প্রস্তর খোদকেরা তাঁহার আগ্রাস্থিত ৬৮০টী প্রাসাদের সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিত। সম্রাট্ হুমায়ুনও, আগ্রা ও দিল্লীতে বহুসংখ্যক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ফেরিষ্টা (Ferishta) বলেন, যমুনা নদীর তীরে সপ্ততল ও গম্বুজবিশিষ্ট একটি প্রাসাদ ছিল। গভীর পরিতাপের বিষয় আজ পর্য্যন্ত কোনও ঐতিহাসিক বা প্রত্নতত্ত্ববিদ্ এই অত্যাশ্চর্য্য প্রাসাদটী নির্ণয়ে সমর্থ হন নাই।

সম্রাট্ আকবরের ফতেপুর সিক্রীস্থিত প্রাসাদ মিঃ ই, ডব্লিউ, স্মিথ্ (E. W. Smith) কর্তৃক মুক্তকণ্ঠে প্রশংসিত হইয়াছে। ফতেপুরের প্রাসা-দের মূল ভিত্তি প্রভৃতি সুন্দর না হইলেও দরবার গৃহাদি অতি সুন্দররূপে সুরঞ্জিত। এই প্রাসাদে দেওয়ান-ই খাস নামে স্বতন্ত্র একটি বিভাগ ছিল, এইস্থানে ধার্ম্মিক লোক সকল সম্রাট্-সমক্ষে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বাদানুবাদ করিতেন। এই সুবিস্তৃত প্রকোষ্ঠের মধ্যভাগে সম্রাট্ আকবরের মণি-মুক্তা-কাঞ্চনখচিত সিংহাসন স্থাপিত থাকিত। আকবরের সভার ঐতিহাসিক বদৌনী বলেন, "এই প্রকোষ্ঠের পূর্ব্বভাগে সম্ভ্রান্ত লোকসকল, পশ্চিমভাগে সৈয়দগণ, দক্ষিণ-ভাগে উলামাগণ এবং উত্তরভাগে সেখগণ উপবেশন করিতেন।" কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, আকবর এই কক্ষে বসিয়া চারিজন মন্ত্রীর পরামর্শানুসারে

রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। দুঃখের বিষয়, এই চারিজন মন্ত্রীর নাম আজ পর্য্যন্ত কোন ঐতিহাসিক উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হন নাই।

ফতেপুর সিক্রীর প্রধান প্রাসাদের উত্তরাংশে সম্রাট্ আকবরের পঁচিশি কোর্ট স্থাপিত ছিল। কথিত আছে, এইখানে সম্রাট্ ক্রীতদাস-কন্যাদের লইয়া "চৌহান" ক্রীড়া করিতেন। এই চৌহান প্রাসাদের নিকটে দ্বাদশ বিভাগে বিভক্ত হাঁসপাতাল ছিল। তন্মধ্যে তিন, চারিটি এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই হাঁসপাতালের নিকট একজন জ্যোতিষী যোগীর আসন ছিল। কথিত আছে, আকবর ইঁহার নিকট রাত্রিকালে চক্ষুবিজ্ঞান ও শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করিতেন। এই যোগীবরের মন্দিরটি জৈন-প্রণালীর। এই ঘটনায় কেহ কেহ মনে করেন, যোগীবর জৈন ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন।

সম্রাট্ আকবরের মহিষী মৈরামের মোকাম তাঁহার শিল্প-প্রীতির প্রকৃষ্ট পরিচয়। মৈরামের কুঠীকে পূর্ব্বে "সোণার মোকাম" বলিত। কেহ কেহ মনে করেন, মৈরাম আকবরের ক্রীশ্চিয়ান-মহিষী ছিলেন। তিনি যাহাই থাকুন, তাঁহার আলোচনা বক্ষ্যমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে; ইতিহাসজ্ঞ সে বিষয়ের মীমাংসা করিবেন। মৈরামের কুঠীর প্রাচীরগুলি তপ্ত-কাঞ্চন-সন্নিভ বর্ণের।

সম্রাটের অন্তঃপুরে "বুবলের কন্যার মহল" নামে একটি মহল ছিল। কিন্তু আকবরের মহিষীগণের মধ্যে বুবলের কন্যা বলিয়া কেহ ছিলেন, তাহা ইতিহাসের কোথাও দেখা যায় না। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, বুবল নামে জনৈক ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা সম্রাটের প্রীতিউৎপাদনকরতঃ তদ্‌সমীপে অবস্থান করিত। এই বুবলেরই অনুপ্রেরণায় সম্রাট্ আকবর ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ললাটে তিলকবিন্দু ও গলদেশে যজ্ঞসূত্র ধারণ করেন। সম্ভবতঃ এই প্রাসাদে বুবল স্বয়ং তাঁহার কন্যার সহিত বাস করিতেন এবং কালক্রমে তাঁহার কন্যার নামানুসারে ইহার নাম হইয়াছে "বুবলের কন্যার মহল।" এই মহলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধরণের গঠন ছিল। জাপানী ও চৈনিক স্থাপিত শিল্পের সহিত এই মহলস্থ অট্টালিকাসমূহের আকারগত সৌসাদৃশ্য দেখিয়া সহজেই অনুমান করা যায় যে, আকবর বিদেশীয় শিল্পের অনুকরণ করিতে ও সে শিল্পকে নিজের দেশ কাল পাত্রোপযোগী ছাঁচে ঢালিয়া ব্যবহারে আনিতে পারিতেন।

আকবরের কারুকার্য্য-মণ্ডিত প্রাসাদের মধ্যে তুর্কদেশীয় সুলতানার প্রাসাদই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কোন কোন ঐতিহাসিক ইহাকে যোধ বাইয়ের প্রাসাদ বলিয়া উল্লেখ করিয়া ভয়ানক ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ইহা

আকবরের খুল্লতাত হিঁদাল-কন্যা, তাঁহার প্রথমা পত্নী রুক্য বেগমের প্রাসাদ। এই প্রাসাদের গঠন-প্রণালী হিন্দু রুচির দ্যোতক বলিয়া সাধারণতঃ লোকে ইহাকে যোধপুরের উদয় সিংহের দুহিতা, জাহাঙ্গীরের পত্নী যোধবাইয়ের প্রাসাদ বলিয়া ভুল করেন। এই প্রাসাদের বহির্দ্দিকে কোন গবাক্ষ নাই। ইহার গঠন প্রণালীর সহিত শুধু হিন্দুভাব নহে, পারস্য ও ইউরোপীয় ভাব ও অনেকটা বিমিশ্রিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক ফার্গুসন এই প্রাসাদ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—The Pavilion is indeed a Superb jewel casket in which hardly a square inch of masonry is left uncarved. It is impossible to conceive any thing so picturesque in outline, or any building carved and ornamented to such an extent withont the smallest approach to being overdone or in bad taste.

বৌদ্ধ বিহারের অনুকরণে নির্ম্মিত পাঁচমহলও, আকবরের অসাধারণ শিল্প-প্রীতির অন্যতম সমুজ্জ্বল উদাহরণ। এই পঞ্চতল বিশিষ্ট প্রাসাদে বসিয়া সম্রাট্‌ প্রভাতে মৃদু-মন্দ-মলয়ানিল উপভোগ ও বালভানুর কিরণমালা দর্শন করিতেন।

ফতেপুর সিক্রীর সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের বস্তু মস্‌জিদ।

আগ্রার প্রাসাদ, আকবর ও তদীয় উত্তরাধিকারীবর্গের রুচির বিভিন্নতার পরিচায়ক। আকবরের প্রাসাদ লোহিত প্রস্তরখণ্ড দ্বারা বিনির্ম্মিত, পক্ষান্তরে সাজাহানের প্রাসাদাবলী শ্বেত মর্ম্মরাচ্ছাদিত।

আকবর সেকেন্দ্রায় নিজের জন্য সমাধিমন্দির নিজেই নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই সমাধি মন্দিরের চতুর্দ্দিকে শোভন বৃক্ষ সকল অবস্থিত। এই মন্দিরে খোদিত বাক্যগুলি বড়ই আবশ্যকীয়। মন্দির নির্ম্মাণ সমাপ্ত হইলে জাহাঙ্গীর কয়েকটি কথা মন্দির গাত্রে খোদিত করেন। সেই খোদিত লিপি পাঠে জানা যায় যে আকবর জীবনের চরম অবস্থায় ইস্‌লাম্‌ ধর্ম্মে পুনরাস্থা স্থাপন করেন নাই; যদি করিতেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহার উল্লেখ থাকিত। Father Botelho ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে গোয়া হইতে এই মর্ম্মে সংবাদ প্রেরণ করেন যে,—"At the last (Akabar) died as he was born, a mahamedan." কিন্তু এ সংবাদ আদৌ সত্য নহে। কারণ আকবর যদি বার্দ্ধক্য অবস্থায় ইস্‌লাম্‌ ধর্ম্মে পুনর্বিশ্বাসী হইতেন, তবে জাহাঙ্গীরের

খোদিত লিপিতে নিশ্চয়ই তাহার কোন না কোন প্রকারের উল্লেখ থাকিত। জাহাঙ্গীর তাঁহার আত্ম জীবনীতে লিখিয়াছেন যে, পিতা আকবরের ধর্ম্মান্তরে মতি চালিত করার অপরাধে তিনি আবুল ফজলকে হত্যা করেন।

অসংখ্য প্রাসাদ, মন্দির, অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ করিতে সম্রাট্ আকবরকে অবশ্য প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতে হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু আধুনিক সময়ে প্রস্তরাদির মূল্য দর্শনে আমরা যতটা মনে করি আকবরকে ততটা ব্যয় ভার বহন করিতে হয় নাই। আকবর ভরতপুর হইতে লোহিত প্রস্তর, জয়পুর ও আজমীর হইতে মার্ব্বেল ও জশল্মীর হইতে চুণ আনিতেন। আগ্রার আঙ্গুরী বাগানের জন্য কাশ্মীর হইতে মাটী আনীত হইত। রাজমিস্ত্রী প্রভৃতির মজু-রীও আকবরের সময়ে অতি অল্প ছিল। আবুল ফজল বলেন, একজন প্রস্তর খোদাইকারী মিস্ত্রী ৫ কিংবা ৬ দাম (৪০ দামে একটাকা) পাইলে বিশেষ সুখী হইত। করাতীর ২ দাম, সূত্রধারের ২ হইতে ৭ দাম মজুরী ছিল।

জিনিষপত্র যথেষ্ট, তাহাতে আবার মজুরের মজুরী যৎপরোনাস্তি সস্তা, তদুপরি অট্টালিকা নির্ম্মাণকর্ত্তার অর্থ প্রভূত; কাজেই আকবর আপন রুচি ও বাসনানুযায়ী সুন্দর ও উন্নত শিল্প-কার্য্য সমন্বিত প্রাসাদাদি নির্ম্মাণে সমর্থ হইয়াছিলেন। আকবরের প্রাসাদাদির এতাদৃশ মনোরম শোভা ছিল যে, তিনি পারস্য ভাষায় একটি প্রাসাদে এই বাণী খোদিত করিয়াছিলেন,—"স্বর্গের ভৃত্য রিজান আমার প্রাসাদের মেজেতে দর্পণ বোধে তাহার মুখ দর্শন করিবে। আমার প্রাসাদের সিঁড়ির ধুলিকণা হৌরীর (হরি) চক্ষুর সুর্ম্মারূপে ব্যবহৃত হইবে।"

পাঠক আকবরের এই লিপি পাঠ করিয়া তাঁহার শিল্পোৎকর্ষের সম্যক্ পরিচয় পাইতেছেন। আকবর, হিন্দু, জৈন, ক্রিশ্চিয়ান, জাপানী, চৈণিক প্রভৃতি সমস্ত সম্প্রদায়ের শিল্প প্রণালীর অনুকরণ করিতেন। ইহা তাঁহার গুণগ্রাহীতার পরিচয় সন্দেহ নাই।

আকবর হিন্দু-প্রবাদে অত্যন্ত আস্থাবান ছিলেন। আমাদের মধ্যে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে যে. জগদীশ্বর কোন অট্টালিকার সম্পূর্ণ নির্ম্মাণ দেখিতে পারেন না। আকবর এই প্রাবাদানুসারে শিল্পীদিগকে তুর্কদেশীয়া সুল-তানার বাটী একটু অসম্পূর্ণ রাখিতে আদেশ করেন।

যেদিক দিয়াই বিচার করি, দেখিতে পাই আকবর উন্নত ও আদর্শ শিল্পের অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

দ্বিপত্নীক।

(গল্প)

নিরঞ্জন যখন প্রিয়তমা পত্নীর শেষ চিহ্ন শ্মশানে ভস্মীভূত করিয়া গৃহে ফিরিল তখন তাহার সারা সংসারটা শূন্য বোধ হইতে লাগিল। থাকিবার মধ্যে তাহার নিকট রহিল কেবল পরলোকগতা প্রিয়তমার স্মৃতিটুকু। সে স্মৃতি আকাশে বাতাসে নিকুঞ্জে গৃহবাসে সর্ব্বস্থানেই যেন ছড়ান ছিল। যে কক্ষে পত্নীর শেষ নিশ্বাসটুকু অনন্তে মিশাইয়া গিয়াছিল। উদাসমনে নিরঞ্জন সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। শূন্য গৃহটা তখন খা খা করিতেছিল। গোধুলির অস্পষ্ট আলোকে সে কি এক ম্লান গাম্ভীর্য্য ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছিল। ক্ষুব্ধ হৃদয়ে শোকমুগ্ধ নিরঞ্জন সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া আঙ্গিনায় গিয়া বসিল। পাঁচ বৎসরের ক্ষুদ্র শিশু ছুটিয়া আসিয়া তাহার ক্রোড় অধিকার করিয়া বসিয়া সাদরে পিতার গাত্রে হস্ত বুলাইতে বুলাইতে বলিল,—"বাবা, মা কোথা গেল ?"

তখন শরতের সুনীল সান্ধ্যাকাশের ক্রোড়ে দুই চারিটি নক্ষত্র উকি মারিতেছিল। গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া নিরঞ্জন একটি তারার দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিল,—"ওই ওখানে গেছে !"

"আমরাও যাব। আচ্ছা বাবা আমরা কবে যাব মার কাছে ?"

"যখন তোমার মা ডেকে পাঠাবেন !"

গম্ভীরভাবে শিশু সত্যচরণ কতক্ষণ কি ভাবিল, তাহার পর আবার জিজ্ঞাসা করিল,—"সে কবে বাবা ?"

নিরঞ্জন এইবার একটু বিব্রত হইয়া পড়িল ; কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল,—"তা' জানি না। তুই এখন ঠাকুরমার কাছে যা—আমি একবার বেরুবো।"

ক্ষুণ্নমনে সত্যচরণ উঠিয়া গেল। সান্ধ্য অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া নিরঞ্জন কত কথা ভাবিতে লাগিল। সেই বহুদিনের একটি ঘটনা তাহার মনে পড়িল। মনে পড়িল, এমনি অশান্তচিত্তে সে একদিন সান্ধ্য অন্ধকারে একাকী ছাদে বসিয়াছিল। মাতা মন্দাকিনী তখন তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন।

ক্ষণেক সাংসারিক কর্ম্মে অবসর পাইয়া পত্নী প্রভাবতী তাহার নিকট আসিয়া বসিল। ধীরে ধীরে তাহার একখানি কর্ম্মক্লান্ত কঠোর হস্ত আপন কোমল মুষ্টির মধ্যে ধরিয়া বলিল,—"কি ভাব্‌চ আমায় ব'লবে না?" কি কোমলতা কি সহানুভূতির ভাব তাহার প্রতিবাক্য ফুটিয়া উঠিতেছিল। তাহার কষ্টের লাঘব করিবার, তাহার দুঃখের অংশ গ্রহণ করিবার, কিসে আকুল আগ্রহ তাহার সারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়া ফুটিয়া উঠিতেছিল! হায়! আজ যে তাহার চিত্তে প্রলয়ের ঝড় উঠিয়াছে, এখন তুমি কোথায় প্রভা? একবার এস, একবার তেমনিভাবে তাহাকে সান্ত্বনা দাও। নিরঞ্জনের দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল। অস্পষ্টস্বরে আকুলকণ্ঠে সে আকাশের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল,—"একবার এস প্রভা! যার প্রাণে এতটুকু দুঃখ আসিলে তুমি আকুল হ'তে, আজ যে সে দুঃখের সমুদ্রে প'ড়েছে! একবার এসে তাকে সান্ত্বনা দাও, তার সকল কষ্টের অবসান কর! কেন তুমি এত নিষ্ঠুর হ'লে প্রভা, আমার সঙ্গে দেখা হবে না, আমি একা থাকলে কষ্ট পাব ব'লে তুমি যে কখনও বাপের বাড়ী যেতে চাইতে না, সেই তুমি আজ আমায় একা ফেলে জন্মের মত কেন চ'লে গেলে প্রভা? এস—একবার—ক্ষণিকের জন্যও এস।"

এইরূপ আরও কত কথা ভাবিতে লাগিল। সে চিন্তার কোন সীমা ছিল না। একদিন সে মনে করিয়াছিল, প্রভাকে সে বুঝি বড় ভালবাসে, এখন বুঝিল তাহার প্রাণের সবটাই প্রভাময় সেখানে আর কাহারও স্থান ছিল না; প্রভাই তাহার সুখ দুঃখ সব! সে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না এই প্রভা ভিন্ন সংসারে সে কিরূপে জীবন ধারণ করিবে!

ওদিকে যে রাত্রি নয়টা বাজিয়া গিয়াছিল সে বিষয়ে নিরঞ্জন কিছুই জানিত না আপনার চিন্তাতেই সে আত্মহারা। জননী মন্দাকিনী কি একটা কাজের জন্য প্রদীপ হস্তে বাহিরে আসিয়াছিলেন;—পুত্রকে তদবস্থায় আঙ্গিনায় উপবিষ্ট দেখিয়া স্নেহ-করুণ-কণ্ঠে ডাকিলেন,—"নিরু! ওখানে কি কচ্চিস্ বাবা? রাত্তির যে অনেক হ'য়ে গেছে। কিছু খেয়ে নিয়ে শুগে যা।"

"ক্ষিদে নেই মা, আজ আর কিছু খাব না।"

স্নেহময়ী জননী বুঝিলেন, পুত্রের প্রাণে বধুর শোকটা বড় বেশী লাগিয়াছে। আহা তা আর লাগিবে না, তিনি যে তাহার জন্য কন্যাহারা জননীর মত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন! নিরঞ্জনের প্রাণে আঘাত লাগিবার কথাই ত'। ধীরে ধীরে তিনি নিরঞ্জনের নিকটে গেলেন; সস্নেহে মস্তকে হস্ত দিয়া

বলিলেন,—তা বাবা বৌমার জন্যে আমার প্রাণ কাঁদচে না? কিন্তু কেঁদে কি ক'রবি বল; যে গেছে, সে ত' আর শত সাধনাতেও ফিরবে না! কিন্তু যাই বল, অমন সোণার বউ আর আমি পাব না। আহা মা যেন আমার লক্ষ্মী প্রতিমা ছিল!" তাঁহার শীর্ণ গণ্ড বহিয়া দুই বিন্দু অশ্রু পড়িল। পুত্রকে সান্ত্বনা দিতে আসিয়া নিজেই ব্যাকুলা হইয়া পড়িলেন।

* * * *

শয্যায় শয়ন করিয়া নিরঞ্জনের কিছুতেই নিদ্রাকর্ষণ হইল না; চিন্তা আসিয়া তাহার সমস্ত হৃদয়কে উৎক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল। সে ভাবিতে লাগিল, এমনি এক নিশায় প্রভা তাহার নিদ্রাকর্ষণ করাইবার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছিল। সেদিন অত্যন্ত গ্রীষ্ম; জগৎ নিস্তব্ধ; নিরঞ্জন শয্যায় পড়িয়া এপাশ ওপাশ করিতেছিল; এরূপ সময়ে আহারাদি সারিয়া প্রভা গৃহে প্রবেশ করিল। স্বামীকে গ্রীষ্মাতিশয্যে ব্যাকুল দেখিয়া একখানি পাখা লইয়া ধীরে ধীরে তাহাকে বাতাস করিতে লাগিল; অন্যহস্তে তাহার গাত্র মার্জ্জনা করিতে লাগিল। সারাদিনের শ্রমে তাহার চক্ষু দুইটী তরল নিদ্রাবেশে মুদ্রিত হইয়া আসিতেছিল; কতক্ষণ পরে আপনিই নিদ্রিত হইয়া পড়িল। নিরঞ্জন একটি সপ্রেম চুম্বনে তাহার সদ্যাগত তন্দ্রা ছুটাইয়া দিল। লজ্জিতা হইয়া প্রভা দ্বিগুণ উৎসাহে বাতাস করিতে লাগিল।

নিরঞ্জন বলিল,—"থাক্ আর বাতাস ক'ত্তে হবে না।"

প্রভা মনে করিল, সে বাতাস করিতে করিতে তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়ায় নিরঞ্জন বুঝি রাগ করিয়াছে সেইজন্যই তাহাকে বাতাস করিতে নিষেধ করিতেছে। কাজেই সে পাখা ছাড়িল না। নিরঞ্জন তাহার হাত হইতে পাখা কাড়িয়া লইয়া দূরে ফেলিয়া দিয়া, প্রভাকে বক্ষে টানিয়া লইল এবং চুম্বনের উপর চুম্বন দিয়া তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। কতক্ষণ পরে সে চুম্বনবৃষ্টি বন্ধ হইলে, স্বামীর বক্ষে মুখ লুকাইয়া প্রভা বলিল,—"যাও, তুমি ভারি দুষ্টু! কেন আমার হাত থেকে পাখা কেড়ে নিলে?"

অপরাধির সুরে নিরঞ্জন বলিল,—"কসুর হ'য়েচে মাপ কর!"

কৃত্রিম কোপ প্রদর্শন করিয়া প্রভা বলিল,—অমন কর ত' আমি চ'লে যাব!"

নিরঞ্জন তাহাকে বুকের মধ্যে আর একটু টানিয়া লইয়া বলিল,—"যাওনা দেখি!"

সে দিনগুলা কি সুখেই তাহার কাটিয়াছিল। হায়! তেমন ভাবে আর কে তাহাকে সান্ত্বনা দিবে? ভাবিতে ভাবিতে তাহার দুই গণ্ড বহিয়া অজস্র ধারে অশ্রু পড়িয়া উপাধান সিক্ত করিয়া তুলিল। বাহিরে প্রভাতের শীতল সমীর বহিয়া যাইতেছিল; উন্মুক্ত গবাক্ষপথে একবার সে ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রভার ন্যায় কোমল-কর-সঞ্চালনে শ্রান্ত নিরঞ্জনকে নিদ্রায় অভিভূত করিয়া ফেলিল। বেচারা এতক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিল।

* * * *

জগতের চিরন্তন প্রথানুযায়ী দিনের পর দিন কাটিয়া গেল। একটী একটী করিয়া নিরঞ্জনের পত্নী বিয়োগের পর দুই বৎসর কাটিয়া গেল। কালের কঠোর নিয়মে সে প্রিয়তমার শোক অনেকটা বিস্মৃত হইল কিন্তু তাহার স্মৃতি কিছুতেই মন হইতে বিসর্জ্জন দিতে পারিল না। স্মৃতিই যে তাহার শেষ সম্বল। হায়! নিষ্ঠুরকাল! সে তাহার সেই স্মৃতিটুকুও বিস্মৃতির অতল জলে ডুবাইয়া দিতে চায়! অমানিশার পর পূর্ণিমা যেমন মধুর লাগিয়া থাকে, সংসারের কোলাহলময় কর্ম্মজীবনের অবসর কালে প্রভার স্মৃতিটুকুও নিরঞ্জনের নিকট তেমনি মধুর, তেমনি নির্ম্মল মনে হইত!

সংসারের চতুর্দ্দিকে তাহার বিরুদ্ধে একটা নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। কুটিল কালের সহিত তাহার আত্মীয়গণ একযোগে নিরঞ্জনের হৃদয় হইতে প্রভার শেষ স্মৃতিটুকু কাড়িয়া লইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলেন।

সেদিন শনিবার। নিরঞ্জন বেলা তিনটার সময় কলিকাতা হইতে বাটী ফিরিয়াছিল। বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া নিরালে বসিয়া একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছিল; এরূপ সময়ে পাড়ার 'চাটুয্যে' মহাশয় সে স্থানে পদার্পণ করিলেন।

দুই চারিটী ঘরোয়া কথাবার্ত্তার পর তিনি একেবারে কাজের কথা পাড়িয়া ফেলিলেন। হুঁকায় একটী বড় রকম টান দিয়া বলিলেন,—"তা বাবাজি! বৌমাত' অনেকদিনই আমাদের মায়া কাটিয়ে চ'লে গেছেন, আর কতকাল তুমি তাঁর জন্যে ব'সে ব'সে কাঁদবে? এইবার একটা বিয়ে-টিয়ে ক'রে ফেল।"

নতমস্তকে নিরঞ্জন বলিল—"আজ্ঞে, সে ইচ্ছে আর বড় নেই।"

এরূপ বিবাহের প্রস্তাব আজ তাহার নিকট নূতন নহে। পত্নীর মৃত্যুর ছয় মাস যাইতে না যাইতেই বন্ধুগণ আবার তাহার বিবাহ দিতে ব্যস্ত হইয়া

উঠিয়াছিল। নিরঞ্জন প্রথমে অশ্রুজলে এবং পরে নিরুপায় হইয়া ক্রোধ প্রকাশ করিয়া এতাবৎকাল আত্মরক্ষা করিয়া আসিয়াছে। সুখের বিষয়, জননী এ পর্য্যন্ত একদিনও তাহাকে এ অনুরোধ করেন নাই। কেহ এ বিষয় তাঁহার কাছে কোন কথা উল্লেখ করিলেই, তিনি নয়নে অঞ্চল দিয়া বলিত,—"না মা, এখন ও নাম কোরনা; আমার যে বউ গেছে, তেমনটী আর পাব না। আহা! মা যেন আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী পিত্তিমে ছিল!" গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুজনেরাও এতদিন একথা বলেন নাই। আজ অকস্মাৎ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আসিয়া নিরঞ্জনকে এই অনুরোধ করিলেন। সে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর মনে মনে বিরক্ত হইলেও প্রকাশ্যে বিশেষ কিছু বলিতে পারিল না। নিরঞ্জনের একটা মহা অন্ধ সংস্কার ছিল, সে কখনও মুখ তুলিয়া 'ওল্ড ফুল'দিগের মুখের উপর কিছু বলিতে পারিত না,—আজও পারিল না। 'চাটয্যে' মহাশয় বুঝিলেন নিরঞ্জন বিবাহ করিতে সম্মত আছে। তবে সে যে আপত্তি করিল, দ্বিতীয়পক্ষের দার পরিগ্রহ করিবার সময় ওরূপ একটা ক্ষীণ আপত্তি সকলেই করিয়া থাকে। কাজেই তিনি একটু উৎসাহিত হইয়া বলিলেন,—"সেকি কথা বাবাজি! কেউ কি আর বিপত্নীক হয় না? আবার দ্বিতীয় বার দার-পরিগ্রহ করে না? এমন কি কথা আছে যে, যে ম'রে গেল, তার স্মৃতি বুকে ধ'রে চিরদিন হা হুতাশ ক'রে কাটাতে হবে? সংসারে মানুষ কতক্ষণের জন্যে? এই আছে এই নেই; তবে হেসে খেলে দিনগুলো না কাটিয়ে কেবল কেঁদে মরি কেন? আমি উচিত কথাই ব'লচি—তুমি বুঝে দেখ! আজকালের ছেলেরা নভেল প'ড়ে—ইংরাজী দু'কলম শিখে একেবারে মস্ত 'লভার' হ'য়ে ওঠে। স্ত্রীবিয়োগ হ'লে কেউ কেউ আবার মৃতা পত্নীর স্মৃতি নিয়ে 'উদ্ভ্রান্ত প্রেম' 'অশ্রুবিন্দু' 'শোক-সিন্ধু' প্রভৃতি কত নামে গদ্য পদ্য রচনা ক'রে ফেলে। আমাদের সময় ও সব কোন ন্যাটাই ছিল না। যাক্ ও সব কথা—এখন তুমি কি বল?

পূর্ব্বের ন্যায় নতমস্তকেই নিরঞ্জন বলিল,—"আজ্ঞে, আমার ত' মোটেই ইচ্ছে নেই; তবে মাকে একবার ব'লব'খন।"

"হ্যাঁ ব'ল আমারই বেয়াইয়ের ভাগিনেয়ী। বেগের গাঙ্গুলী তাঁরা। আমি মেয়েটীকে স্বচক্ষে দেখিচি; অপরূপ সুন্দরী। তবে বয়স কিছু বেশী হ'য়েচে,—এমন বেশীই বা কি তের চোদ্দ। আসল কথা কি জান—মেয়ের বাপ মা কেউ নেই, টাকা খরচ ক'ত্তে পারে, এমন কোন আত্মীয়ও নেই

কাজেই তার বে হ'চ্চে না। আজ কাল ত' আর শুধু রূপ দেখে বে হয় না, অন্ততঃ হাজার টাকা দক্ষিণা চাই-ই। তা বাবাজি তা হ'লে মনে ক'রে মাঠাকরুণকে কথাটা বল, আমি দু একদিনের মধ্যে যেন মতামত জান্‌তে পারি। আর তাও বোধ হয় দরকার হবে না, আমি তাঁদের লিখিছি দু' একদিনের মধ্যেই ঘটকী এসে পড়বে। আঃ তা হ'লে আমিও বাঁচি; এ বুড়ো বয়সে কি এ সব পোষায় গা।"

'চাটুয্যে মশাই' আরও এক কলিকা তামাক পুড়াইয়া গাত্রোত্থান করিলেন। বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া নিরঞ্জন কর্ত্তব্য চিন্তা করিল, কিন্তু বিশেষ কিছু স্থির করিতে পারিল না।

রাত্রে নিরঞ্জন যখন আহারে বসিল তখন জননী মন্দাকিনীও দুই একটি ভূমিকা পাড়িয়া অবশেষে বলিলেন,—"বাবা নিরু! আর কতদিন ঘর খালি থাকবে? দেখ দেখি বাড়িটেয় একটুও লক্ষ্মী শ্রী নেই। অনেক দিন হ'য়েও গেল, আর কেন, এইবারে একটা দেখে শুনে বিয়ে করে ফেল।

নিরঞ্জন নত মস্তকে গম্ভীর মুখে আহার করিতে লাগিল। জননীর কথায় কোন উত্তর দিল না। জননীও পুত্রের এই মৌনভাবকে সম্মতি লক্ষণ জ্ঞান করিয়া মনে মনে যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইলেন।

নীরবে আহার শেষ করিয়া নিরঞ্জন শয্যায় গা ঢালিয়া দিল। বহুক্ষণ চেষ্টা করিয়াও নিদ্রাকর্ষণ হইল না। তাহার মনের মধ্যে তুমুল ঝটিকা উঠিয়াছিল। সারা রাত্রির যুদ্ধের পর অবশেষে সেই জয়ী হইল—স্থির করিল কিছুতেই দ্বিতীয়বার সে দারপরিগ্রহ করিবে না।

সেদিন মধ্যাহ্নভোজনের সময় জননীকে তাহার অভিমত জানাইল। জননী বলিলেন,—সে কি নিরু! কাল তুই কিছু বল্লি না, আমি মনে কল্লুম বে ক'ত্তে তোর অমত নেই, কাজেই চাটুয্যে মশাইকে কথা দিলুম; তাঁর বেয়াইয়ের ভাগ্নীর সঙ্গেই বে হবে। কথা দিয়ে এখন আবার না বলতে যাব কি ক'রে?"

মাতার কথা শুনিয়া রাগে তাহার সর্ব্ব শরীর জ্বলিয়া উঠিল। রুক্ষস্বরে বলিল,—"কে তোমায় তাড়াতাড়ি কথা দিতে বল্লে? আমি কি একটা কথাও বলেছিলুম!"

অভিমানের অশ্রু স্রোতে মন্দাকিনীর দুই নয়ন পূর্ণ হইয়া উঠিল;—তিনি রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন,—"নিরু! তুই যে আজ এমন ক'রে আমায় অপমান

ক'র্বি তা স্বপ্নেও কখন ভাবিনি। আজ যদি তিনি বেঁচে থাকতেন......"
তিনি আর বলিতে পারিলেন না। বহুদিনের পূরাতন স্বামী শোক আজ তিনি আবার নূতন করিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

নিরঞ্জন ইতিপূর্ব্বে আর কখনও জননীর সহিত এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করে নাই। ক্রোধের প্রথম বেগটা কাটিয়া গেলে সে বুঝিতে পারিল আজ সে এক গুরুতর অপরাধ করিয়াছে। আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা চকিতের মত তাহার মনে পড়িয়া গেল সে দেখিল দোষ তাহারই। তখন সে দ্বিতীয়-বার দ্বার পরিগ্রহ করিয়া এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে মনস্থ করিল। প্রকাশ্যে বলিল,—"মা আমায় ক্ষমা কর! তোমারই সত্যরক্ষা হক, আমি বে ক'রব।"

মুহূর্ত্তে জননীর শোক নিভিয়া গেল। সস্নেহে পুত্রের মস্তকে হস্ত প্রদান করিয়া আনন্দ বিহ্বলস্বরে বলিলেন,—"বেঁচে থাক বাবা। ভগবান তোমাদের সুখী করুন্।"

মাতৃপ্রীতির অছিলায় নিরঞ্জন আজ আত্মসুখ বলি দিল! বিবাহ স্থির হইয়া গেল।

* * * * * *

বিবাহের পর প্রথম শ্বশুর বাটিতে পদার্পণ করিয়াই অরুণার কি জানি কেন সত্যর উপর একটা মায়া পড়িয়া গেল। সত্য দুই বৎসর মাকে দেখে নাই, জননীর মৃত্যুর সময় সে নিতান্ত শিশু ছিল, কাজেই প্রভার স্নেহ কোমল মুখচ্ছবি তাহার স্মৃতিপট হইতে মুছিয়া গিয়াছিল; সেই জন্যই এক হস্ত পরিমিত ঘোমটায় বদনাবৃত করিয়া পঞ্চদশী অরুণা যখন গৃহে প্রবেশ করিল তখন মাতৃস্নেহ বঞ্চিত বালক সত্য তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া ডাকিল,—"মা!"

অরুণাও আজন্ম মাতৃহারা, কাজেই সে বালকের মনঃপীড়া সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিল। যুবতী অরুণার বক্ষ মাতৃস্নেহে ভরিয়া উঠিল। সস্নেহে সে বালক সত্যকে ক্রোড়ে করিয়া মুখচুম্বন করিল। দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিবার প্রধান ভয় নিরঞ্জনের অনেকটা কাটিয়া গেল।

কিন্তু নিরঞ্জন চেষ্টা করিয়াও অরুণাকে ভালবাসিতে পারিল না। কি যেন একটা কি তাহাদিগের মধ্যে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল। এজন্য তাহার মনে যথেষ্ট অনুশোচনা হইত। সে ভাবিত—"এ নিরপরাধা রমণীর এ শাস্তি

কেন? পৃথিবীতে এসে অবধি একদিনের জন্যও বাপ মার স্নেহ পায়নি, তার পর রমণী জীবনের যা শ্রেষ্ঠ সুখ স্বামীর ভালবাসা তাতেও এ বঞ্চিতা! কখনও যে আমি ওকে ভাল বাসতে পারবো এমনও ত মনে হয় না।

অরুণা স্বামীকে সুখী করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিত; তাহার ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটুকু সম্ভবে তাহা করিতে কোনদিন সে কুণ্ঠিত হয় নাই। নিরঞ্জন তাহার সহিত বড় একটা কথা কহিত না, কিন্তু অরুণা সে জন্য কিছুমাত্র শোক প্রকাশ করিত না, সর্ব্বদাই হাসি মুখে মনের কষ্ট মনের মধ্যেই বদ্ধ করিয়া স্বামীকে সুখী করিতে চেষ্টা করিত। তাহার অবসর কালের অধিকাংশ সময়ই সত্যর তত্ত্বাবধান করিতে কাটিয়া যাইত। সত্যই তাহার ব্যর্থ জীবনের একমাত্র শান্তি স্থল!

একদিন নিরঞ্জন নিদ্রিতাবস্থায় একটী স্বপ্ন দেখিল। সে দেখিল যেন একটী নিকুঞ্জ মধ্যে বসিয়া সে কাহার প্রতীক্ষা করিতেছে। বাহিরে গ্রীষ্মের মেঘহীন গগনে পূর্ণচন্দ্র হাসিতেছেন। কুঞ্জের আশে পাশে কত রকম ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। তাহাদের আকুল মদিরবাস বায়ু পথে ভাসিয়া আসিয়া তাহাকে ভাবাবেশে আকুল করিয়া তুলিল। অদূরে বৃক্ষশাখায় চক্রবাক বধু বসিয়া আলাপ করিতেছিল। সেও যেন কাহার সহিত তেমনি ভাবে আলাপ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িল। অকস্মাৎ বাহিরে যেন কাহার অলঙ্কারের মৃদু গুঞ্জনধ্বনি শুনা গেল। চক্ষু তুলিয়া নিরঞ্জন দেখিল দুইজন ষোড়শী তাহারইদিকে আসিতেছে। সোৎকণ্ঠায় সে তাহাদেরদিকে চাহিয়া রহিল; আর একটু নিকটে আসিলে সে চিনিতে পারিল,—তাহারা তাহারই দুই পত্নী—প্রভা ও অরুণা! দুই জনে যেন সহোদরার ন্যায় একই প্রীতিডোরে বদ্ধ! নিরঞ্জনকে দেখিয়া প্রভা মৃদু হাস্য করিল। আকুলকণ্ঠে নিরঞ্জন বলিল,—"প্রভা! প্রভা! তুমি কি নিষ্ঠুর! এতদিন তোমার উদ্দেশে আমি বুকপোরা ভালবাসা নিয়ে ব'সেছিলুম আর তুমি নিশ্চিন্ত মনে সেখানে বাস কচ্ছিলে?"

অধর কোণে আবার একটু হাসির কজ্জল টানিয়া দিয়া প্রভা বলিল,—"আমি না হয় নিষ্ঠুর, কিন্তু তুমি কি? এই যে বালিকা তাহার একনিষ্ঠ ভালবাসার পুষ্পাঞ্জলি নিঃস্বার্থভাবে তোমার পায়ে ঢেলে দিচ্ছে, তুমি কি তারদিকে একদিনও চেয়ে দেখেছিলে? তুমিও কি নিষ্ঠুর নও! ছিঃ! একে জান না? এ আমারই আত্মা, আমারই অংশ, আমারই ভগ্নি! শুধু

আকৃতির বদল। বল তুমি একে ভালবাসবে, যত্ন করবে, আর কখনও কষ্ট দেবে না।"

যন্ত্র চালিতের মত নিরঞ্জন বলিল.—"না।" তাহার পর নিরঞ্জন আরও কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল কিন্তু প্রভা তাহাতে বাধা দিয়া দিয়া অকস্মাৎ শূন্যে মিলাইয়া গেল,—রহিল শুধু অরুণা! অগত্যা নিরঞ্জন ডাকিল,—"অরুনা!"

সঙ্গে সঙ্গে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চাহিয়া দেখিল পদতলে বিনিদ্র নেত্রে অরুণা বসিয়া বাতাস করিতেছে বাহিরে তেমনি বাতাস ফুলের গন্ধ বহিয়া আনিতেছে, গবাক্ষ পথে চন্দ্রের স্নিগ্ধ আলোক গৃহে প্রবেশ করিতেছে।

অরুণা একবার তাহারদিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"আমায় এখন ডাকলে?"

নিরঞ্জন বুঝিতে পারিল, স্বপ্নাবেশে সে অরুণাকে ডাকিয়াছে। প্রকাশ্যে বলিল,—"হ্যাঁ, আমার কাছে এস!"

অরুণার সারা দেহখানি যেন অবশ হইয়া গেল। ইতিপূর্ব্বে আর কখনও নিরঞ্জন তাহাকে এরূপ করুণকণ্ঠে ডাকে নাই। ধীরে ধীরে সে তাহার পার্শ্বে গিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কি বলচ?"

নিরঞ্জন তাহাকে আপন বাহুপাশে বেষ্টন করিয়া বলিল,—"আমি বড় নিষ্ঠুর, নয় অরু!"

"কই না, আমি ত কোনদিন তা মনে করিনি!"

"জানতুম না তুমি এমন অমূল্য রত্ন অরু! আমি কিন্তু তোমার সম্পূর্ণ অযোগ্য।"

তাহার পর নিরঞ্জন তাহাকে তাহার স্বপ্নের কথা বলিল। অরুণা সমস্ত শুনিয়া যুক্তকরে প্রভার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া বলিল,—"তোমার আশীর্ব্বাদ দিদি, আমি মাথায় পেতে নিলুম। আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার মত হ'তে পারি।"

নিরঞ্জন সেইদিন প্রথম তাহার গণ্ডে প্রণয় চুম্বন অঙ্কিত করিয়া দিল। এতদিনে নিরঞ্জনের জননীর আশীর্ব্বাদ সমাধা হইল।

শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

জ্যোতিস্তত্ত্ব।

রাবণ রাজা।

(বনপর্ব্ব হইতে টোপতোলা।)

মহর্ষি পুলস্ত্য পিতামহের মানস পুত্র। পুলস্ত্যের ঔরসে গবীর (১) গর্ভে কুবের জন্মগ্রহণ করেন। মৃত মহর্ষির আত্মা অর্দ্ধ বিশ্রবা নামে দ্বিজ-বংশে উদ্ভব হইলেন।

পিতামহের বরে কুবের অমর ধনেশ ধনদ যক্ষগণের অধিপতি হইলেন এবং রাক্ষসগণ সমন্বিত লঙ্কাপুরী তাঁহার রাজধানী হইল।

মহর্ষি বিশ্রবার পরিচর্য্যার নিমিত্ত কুবের পুষ্পোৎকটা রাকা ও মালিনী নামে তিন নিশাচরী নিযুক্ত করেন। মহর্ষির বরে পুষ্পোৎকটার গর্ভে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ, মালিনীর গর্ভে বিভীষণ এবং রাকার গর্ভে পুত্র খর ও কন্যা স্বর্পণখা জন্মগ্রহণ করে। (২) ইহারা গন্ধমাদন পর্ব্বতে (৩) বাস করিত।

বনপর্ব্বে রাবণের বিবাহের কোন উল্লেখ নাই। (৪) তবে রাবণি ইন্দ্রজিতের উল্লেখ আছে।

শুক ও সারণ রাবণের দুই চর ছিল। (৫)

পঞ্চবটীবনে স্বর্পণখার নাশা ছিন্ন হয়। (৬)

ব্রহ্মার বরে রাবণ কামরূপী হয়, মায়াবী মৃগের কুহকে পড়িয়া শ্রীরাম বনে তাহার অনুসরণ করিলেন এবং মায়াবী মৃগের কুহকস্বরে সীতার ভ্রম জন্মিল

---

(১) রামায়ণমতে ভরদ্বাজ দুহিতা দেব বর্ণিনীর গর্ভে কুবেরের জন্ম হয়। পুরাণমতে ইলবিলার গর্ভে কুবেরের জন্ম হয়।

(২) রামায়ণমতে কৈকসীর গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ, স্বর্পণখা ও বিভীষণের জন্ম হয়। পুরাণমতে নিকষার গর্ভে উহাদিগের জন্ম হয়।

(৩) রামায়ণমতে শ্লেষ্মাতক বনে ইহারা বাস করিত।

(৪) রামায়ণমতে ময়দানব দুহিতা মন্দোদরীকে রাবণ পত্নীত্বে গ্রহণ করেন। ময়-দানব নির্ম্মিত মায়া রাবণের প্রধানা মহিষী ছিলেন।

(৫) রামায়ণমতে শার্দ্দূল রাবণের শ্রেষ্ঠ অমাত্য ছিল।

(৬) রামায়ণমতে নাশা ও কর্ণ ছিন্ন হয়।

সীতার আদেশে লক্ষ্মণ পঞ্চবটীবনে সীতাকে অসহায় রাখিয়া শ্রীরামের অনু-সরণ করিলেন।

যতিবেশে রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল এবং আকাশ পথে গমন করিয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিল। এবং অশোকবনে ত্রিজটা রাক্ষসীর জিম্বায় সীতাকে রাখিয়া দিল। (৭)

শ্রীরাম ভল্ল,করাজ জাম্বুবানের সহিত এবং বানররাজ সুগ্রীবের সহিত বানরসেনা সহ সমুদ্রকুলে উপনীত হইলেন।

অমাত্য চতুষ্টয় সহ বিভীষণ শ্রীরামের শরণ লইলেন। বিভীষণ লক্ষ্মণের মন্ত্রীপদ গ্রহণ করিলেন। নল সেতু নির্ম্মিত করিলে শ্রীরাম সসৈন্যে লঙ্কা অবরোধ করিলেন এবং বালিসুত তারেয়কে দৌত্যকার্য্যে রাবণের সমীপে পাঠাইলেন।

বহু সংগ্রামের পর রাবণ রণক্ষেত্রে উপনীত হইলে মাতলি দেবরাজের রথ লইয়া আসিলে শ্রীরাম রথে আরোহণ করিয়া রথী রাবণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন শ্রীরাম ব্রহ্মাস্ত্রের সহিত যোগ করিয়া এক বাণ বর্ষণ করিলে রথ অশ্ব সারথিসহ রাবণ ভস্মসাৎ হইল। (৮)

এই উপন্যাসে পুরাণকারীগণ মহীরাবণ ও অহিরাবণ যোগ করিয়াছেন এবং রামায়ণে যে অশ্বমেধ যজ্ঞ সংযোজিত হইয়াছে পুরাণকারগণ সেই যজ্ঞ উপলক্ষে লব কুশের যুদ্ধ যোগ দিয়াছেন।

জ্যোতিষিকতত্ত্ব ও ইতিহ।

রামায়ণের (৬।১১৯।৩২) "ইতিহাসং পুরাতনং" হৃদয়ঙ্গম করিতে বাসনা থাকিলে কয়েকটী জ্যোতিষিক তত্ত্ব ও ইতিহ মনে রাখিতে হইবে। নতুবা রামায়ণ পাঠে অধিকার জন্মিবে না। পণ্ডশ্রম হইবে মাত্র।

সূর্য্যসুত ভৌম অঙ্গারক গ্রহরূপে কামরূপ তারা (Variable Star) ভৌম কোন বর্ষে দৃশ্যপর বর্ষে অদৃশ্য থাকে। ভৌম কখন অগ্নিবর্ণ অতি উজ্জ্বল (প্রদ্যুম্ন) কখন উজ্জ্বল কখন বা অনুজ্জ্বল হয়। তাই এই গ্রহে বেদোক্ত কামদেব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ঐ গুণঃ "কামদেবস্য বীজং তু মন্ত্রং ভৌমস্য কীর্ত্তিতম্। (কালিকাপুরাণ।)

(৭) রামায়ণমতে রাবণ পুষ্পক রথে সীতাকে লইয়া যান।

(৮) রামায়ণমতে ব্রহ্ম-দত্ত মহৎ বাণ যাহা অগস্ত্য শ্রীরামকে দিয়াছিলেন সেই বাণে রাবণ নিহত হয়। পুরাণমতে স্ফটিকস্তম্ভে স্থিত মৃত্যুবাণ দ্বারা রাবণ বিনষ্ট হয়।

অবসর—

স্বর্গীয় পণ্ডিত ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ভৌম অধিষ্ঠিত কামদেব ত্রি-মূর্ত্তিতে জীবের ত্রিবিধ শর্ম্ম (মঙ্গল) বিধান করেন। (১)

"যৎ তে কাম! শর্ম্ম ত্রিবরূথং" (অথর্ব্ব ৯।২।১৬)

যথাঃ "কামঃ দাতা" বেদবাক্যে দান দেব মূর্ত্তি, "সপত্নহনং বৃষভং" (২) বেদবাক্যে সমর দেব মূর্ত্তি, এবং "অন্ধা তমাংসি অব পাদয়" বেদবাক্যে (৩) যম দেব মূর্ত্তি বিকশিত আছে। (৪) এই ত্রিমূর্ত্তি হইতে ভৌম-কাম বেদে ত্রিত নামে এবং অবেস্তায় থ্রিত নামে গীত ও অর্চ্চিত হইয়াছেন।

রাশি চক্রের বৃশ্চিক রাশি সোম ধারায় প্লাবিত এবং ভৌম-কাম দেবের গ্রহ এবং নাক্ষত্রিক প্রতিমা। (৫)

ত্রিসহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে সুমেরুবাসী তারাদর্শক ঋষি দেখিতেন যে ঃ— দেবদিবার অবসানে সায়ং সন্ধ্যাকালে সূর্য্যদেব শারদীয় ক্রান্তিপাতের গুহায় বৃশ্চিকের কবলে পতিত হইতেন। দশসহস্র দস্যু (রাক্ষস) সূর্য্যকে আক্রমণ করিত। প্রভাহীন কৃষ্ণ তারা অংশুমতী নদীতে ("সোম ধারা নভঃ সরিৎ") ডুবিত। (৬) ঋঃ ৮।৮৫।১৩—১৫। ঐতিহাসিকের ভাষায় সূর্য্যের প্রভাদেবী এই গুহায় বিলীন হইতেন অথবা রাক্ষসগণ প্রভাদেবীকে এই বিলে নিরুদ্ধ রাখিত। "কা অসি ত্বং কস্য বা বিলং" (রাম ৪।৫০)

তারা বৃশ্চিকের পুচ্ছে নির্ঋতি (৭)

---

(১) তাই ভৌমের "মঙ্গল" নাম।

(২) তু। "স্কন্দাধিদৈবতং ভৌমং"। (জ্যোতিষ)

(৩) অঙ্গারকঃ যমঃ চৈব (পদ্মপুরাণ)

(৪) তাই ভৌম "রাক্ষস গ্রহ" উপাধি ধারণ করে। যথাঃ—

"গৃহীত্বা তু পতাকা বৈ যাতি অগ্রে রাক্ষসঃ গ্রহঃ।" (বণপর্ব্ব)

(৫) বেদমন্ত্রের আধিদৈবিক অর্থ গ্রহণ না করায় সমস্ত ভাষ্যকারগণ খেই হারাইয়া বসিয়াছেন। ঐ শুন ঃ—

"A mysterious ancient diety. By Sayana he is identified sometimes with Vayu sometimes with Indra and sometimes with Agni". (Griffith)

(৬) তু। সন্ধ্যাকালে তু সংপ্রাপ্তে রৌদ্রে পরম দারুণে। সন্দেহাঃ রাক্ষসাঃ সর্ব্বে সূর্য্যাম্ ইচ্ছন্তি খাদিতুম্ ॥ (বিষ্ণু পুরাণ)

(৭) শব্দকল্পদ্রুম মতে নির্ঋতি অর্থে যম এবং রাক্ষসেশ্বর। পুরাণে যম "নরক অসুর" নাম ধারণ করেন রামায়ণে রাক্ষসেশ্বর "রাবণ নাম ধারণ" করেন। নরক ও রাবণ উভয়েই রাক্ষস-সৈন্যের অধিপতি।

দৈবত শঙ্খাকৃতি মূলা নক্ষত্র, হৃদয়ে ইন্দ্র দৈবত জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র, তুণ্ডে মিত্র দৈবত চতুস্তারাময় অনুরাধা নক্ষত্র এবং তারা বৃশ্চিকের সূর্পাকৃতি নখর পুটে ইন্দ্র অগ্নি দৈবত রাধা বা বিশাখা নক্ষত্র বিরাজমান আছে।

রামায়ণের রচনা কালে এই বিশাখা নক্ষত্রের পার্শ্বে শারদীয় ক্রান্তিপাত অর্থাৎ জলবিসুপ সংক্রান্তি বিন্দু (Autumnal Equinox) ছিল। তাই এই স্থান আকাশের দেবভাগ ও অসুর ভাগের সংযোগ স্থল বলিয়া ইতিহাসে জলস্থান নাম পাইয়াছে। (৮)

বৃশ্চিক সুব্যক্ত নাসা কর্ণ বিহীন জন্তু। নিঋতির তারা শঙ্খের মুখস্থিত তারা যুগল নিঋতি যমের "শ্যাম-শবল" নামক কুকুর যুগল।

"যৌতে স্বানৌ শ্যাম শবলৌ বৈবস্বত কুলোৎভবৌ॥"

(সায়ণ ধৃত বচন)

কুসংস্কারের পোষ্যপুত্র সম্প্রদায়ের মতে মূলা নক্ষত্রে জাত পুত্র বংশের মূলোৎপাটন করে। তাই মূলা "মূলবর্হনী" নাম ধারণ করে।

তারা বৃশ্চিকের নখরপুট মধ্যে পঞ্চপত্রময় তারা বট বিদ্যমান আছে। এই পঞ্চপত্র ময় তারাবট মহাভারতের ভদ্র বট (বট শ্রেষ্ঠ)।

সুমেরুবাসী তারাদর্শক ঋষি প্রাচীনকালে দেখিতেন যে:—দেবরাত্রির আগমনে সন্ধ্যাকালে নিদ্রিত সূর্য্য-নারায়ণ আকাশ সমুদ্রে এই বট পত্র আশ্রয় করিয়া ভাসমান থাকেন। এই বটবৃক্ষে আরোহণ করিয়া বেদোক্ত "সবিতা সত্য ধর্ম্মা" "ঋতবান্" (সত্যবান্) প্রতি সন্ধ্যাকালে দেহ ত্যাগ করেন। এই আধিদৈবিক তারা বটের মূলে বসিয়া প্রভাহীন কৃষ্ণ সূর্য্য "বটকৃষ্ণ" উপাধি ধারণ করেন। যাত্রীগণ পুরীধামে বটকৃষ্ণ দেবের আধিভৌতিক প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করেন। বটকৃষ্ণ রাধা নক্ষত্রের পদতলে পতিত। এই তারা বট বা আধিদৈবিক "অক্ষয় বট" বহু তীর্থের আধিভৌতিক অক্ষয় বটের মূল আদর্শ।

তারা বৃশ্চিকের তলে শার্দ্দূল মণ্ডল (Lupus) অধিষ্ঠিত আছে। শার্দ্দূল মণ্ডলে ব্যাঘ্র নক্ষত্র বিদ্যমান আছে। প্রবাদে শুনি ব্যাঘ্রী একজটা দ্বিজটা বা ত্রিজটা হয়।

মৃগ মুণ্ডধারী (৯) সমুদ্রবাসী তারা মকর মায়া জালে ব্রহ্মাকে মোহিত

(৮) সূর্পণখার নাসা ছেদন হইতে জনস্থান "নাশিক" খ্যাতি পাইয়াছে।

(৯) "মৃগাস্যঃ মকরঃ ব্রহ্মণ্"

করিয়া চতুর্ব্বেদ হরণ করে। নারায়ণ মৎস্যরূপ ধারণে মকর বধ করিয়া বেদ উদ্ধার করেন। (১০)

ময়দানব নির্ম্মিত মায়া (স্ত্রীগ্রহ শুক্র) কাম-ভৌম গ্রহের পত্নী।

উপপত্তি।

কামদেবের ত্রিমূর্ত্তির দানবীর মূর্ত্তি ও অন্ধতা একাক্ষী ও পিঙ্গলী কুবের-দেবে, কাম দেবের ত্রিমূর্ত্তির সমরবীর মূর্ত্তি রাবণে প্রদত্ত হইয়াছে।

কামদেবের মৃত্যুকবল ও সোমপান রাবণ ও কুম্ভকর্ণের নরমাংস ভোজনে ও সুরাসেবনে প্রকাশিত এবং কামদেবের বিলাসিতা নরনারী রাবণ—সূর্পনখাতে প্রস্ফুটিত, কাম-যমের সহচর নিদ্রা কুম্ভকর্ণে ন্যস্ত হইয়াছে। কামদেবের কামগতি রাবণে বিকশিত আছে। (১১) কামদেবের সৌন্দর্য্য সেনাপতিত্ব এবং অমরত্ব ও ধর্ম্ম রাজতা বিভীষণে অর্পিত হইয়াছে।

ধনকুবের তারা জগতে কামরূপ কৃকলাস মণ্ডলে (Delphinus) (১২) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কামরূপ কৃকলাসের তুণ্ড নিয়ত কাঞ্চন বর্ণ থাকিলেও তাহার পৃষ্ঠ দেশের বর্ণ মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হয়। কিন্তু তাহার তলদেশ সতত শ্বেতবর্ণ থাকে। এই বর্ণ পরিবর্ত্তনে কৃকলাসের দেহ কুদৃশ্য হইয়াছে এবং একাক্ষী পিঙ্গলী ধনদ—"কু—বের" (কুৎসিত—দেহ) খ্যাতি পাইয়াছেন।

কামত্রিত দেব গ্রহ জগতে কাম দৈবত ভৌম গ্রহে এবং তারা জগতে বৃশ্চিক রাশিতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। জ্যোতির্ব্বিদ কবি মহর্ষি বৃশ্চিকপুচ্ছে নির্ঋতি দৈবত মূলা নক্ষত্রে কাম-রাবণকে বসাইলেন। এবং বৃশ্চিক হৃদয়ে মঘবান্ ইন্দ্র দৈবত জ্যেষ্ঠানক্ষত্রে (লঙ্কাপুরীতে) ধনদ দেবকে বসাইলেন। মিত্র দৈবত মাল্য আকৃতি প্রাচীন অনুরাধা নক্ষত্রের (১৩) তলস্থিত আধুনিক চতুস্তারকময় অনুরাধা নক্ষত্রে মালিনী সুত মিত্র বিভীষণকে বসাইলেন। এবং রাবণ বিনাশের পর শূন্য লঙ্কাপুরীর রাজা বিভীষণ

(১০) তু। Pan (Capricorn) was believed to wonder in mountains and Valleys, joining inchase and dance of the nymphs. He invented the shepherd's flute, Syrinx.

(১১) তু। Cupid has wings

(১২) The Dolphin fish কৃকলাসের ন্যায় এই মৎস্যের বর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটে।

(১৩) Corona

হইলেন। এবং সূর্পাকৃতি বৃশ্চিক নখর পুটে (বিশাখা নক্ষত্রে) ছিন্ন নাসা ছিন্নকর্ণা সূর্পনখাকে বসাইলেন। রাকা দুহিতা সূর্পনখা রাকাপূর্ণিমার প্রিয়তম নক্ষত্রে স্থাপিত হইলেন (১৪) বি শাখা বাসিনী সূর্প-নখার নাসাকর্ণ ছিন্ন না হইলে মিল হয় না। প্রাচীনকালে যখন মূলা নক্ষত্রে ক্রান্তিপাত ছিল। তখন যম দৈবত মূলা নক্ষত্র অসুর ভাগের মাথায় ছিল। সূর্য্যাদি গ্রহগণ মূলা নক্ষত্রে উপনীত হইলেই প্রভাহীন হইয়া অস্তগমন করিত।

এই দৃশ্য হইতে সুমেরুবাসী ঋষিগণ সিদ্ধান্ত করিলেন যে নির্ঋতি যমের অঙ্কগত হইলে সূর্য্যদেব যমের মুখে (১৫) পড়েন এবং দশসহস্র যমদূত রাক্ষসে সূর্য্যকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয়। (১৬) নির্ঋতি যম এইরূপে "রাক্ষসেশ্বর উপাধি গ্রহণ করিলেন। সূর্য্যপ্রভা সূর্য্যা দেবীকে মূলাপতি "রাক্ষসেশ্বর" হরণ করেন এই জ্যোতিষিক ইতিহের উপর রামায়ণের উপাখ্যান গঠিত হইল। কাল ক্রমে শারদীয় ক্রান্তিপাত বিশাখা নক্ষত্রে বৃশ্চিকের নখরপুট মধ্যে পড়িল। তাই সেই নখরপুটস্থিত পঞ্চপত্রময় তারা বটতলে অসহায়া সূর্য্যা—সীতা অপহৃত হইলেন। মৃগ মায়া বলে চতুর্ব্বেদ হরণ করে এবার "ত্রয়ীময় স্বয়ং ভগবান্ "সূর্য্যদেবের পত্নী—সীতা—সূর্য্যকে হরণের সহায় হইল। তলাইয়া দেখ—কথা একই।

ভৌম রাবণের পত্নী মায়া রামায়ণে "মন্দোদরী" নাম ধারণ করেন।

মায়া ভৌম-রাবণের অন্যমূর্ত্তি ভৌম—নরক অসুরের পত্নী। (১৭) এবং মায়া দেবী শ্রীকৃষ্ণ পুত্র কাম-প্রদ্যুম্নের পত্নী।

শার্দ্দূল রাবণের প্রধান চর। মূলার অদূরে শার্দ্দূল মণ্ডল অবস্থিত আছে। নির্ঋতি-যমের দূতদ্বয় শ্যাম শবল নাম ধারণ করে। নির্ঋতি—রাক্ষসেশ্বর রাবণের চরদ্বয় শুক সারণ নাম ধারণ করে। শার্দ্দূল ও কুকুর নির্ঋতির উপযুক্ত দূত বটে।

---

(১৪) বিশখয়োঃ মধ্যগতঃ সম্পূর্ণঃ ইব চন্দ্রমাঃ

(১৫) ১০।৯৫ ঋক্‌সূক্তে উর্ব্বসী পুরূরবার ইতিহ পাঠ কর। পুরূরবা। আমি নির্ঋতির ক্রোড়ে যাই উর্ব্বশী। না, না, নির্ঋতির ক্রোড়ে যাইবে কেন?

(১৬) ৮।৮৫।১৩—১৫ ঋক্ তু। সন্ধ্যাকালে তু সংপ্রাপ্তে রৌদ্রে পরম দারুণে সন্দেহাঃ রাক্ষসাঃ সর্ব্বে সূর্য্যং ইচ্ছন্তি খাদিতুম।

(১৭) ততঃ বিদর্ভ রাজস্য পুত্রীং মায়া আহ্বায়াং হরিঃ পুত্রার্থে বরয়ামাস নরকস্য সমাং গুণৈঃ॥ (কালীপুরাণ ৩৯)

মৃগাস্থ মকরের কুহকে পড়িয়া শ্রীরাম তাহার অনুসরণে গহন বনে প্রবেশ করিলেন। মকরের কুহক বাণী শ্রবণে লক্ষ্মণ সীতাকে একাকিনী পঞ্চবটীতে রাখিয়া চলিয়া গেলেন।

চতুর্ব্বেদ হরণ করিলে মৎস্য অবতার মকর বধ করেন; ত্রয়ীময় ভগবান্ সবিতা দেবের ভার্য্যা—সতী সাবিত্রী সীতা সাবিত্রী সীতা দেবীর হরণে আসিয়া মকর মৃগ ধ্বংস হইল। দেবরাজ ইন্দ্র এই মৃগ বধ করিয়া ছিলেন। "যৎ ইদম্ মৃগায় হন্তবে" (৫।৩৪।২ ঋক্)

কামরূপী রাবণ-যম পঞ্চপত্রময় তারা বট মূলে শারদীয় ক্রান্তিপাতের গুহায় সীতা সূর্য্যকে হরণ করিল। সুমেরুশিখরে দেব রাত্রি উপস্থিত হইল রাম সূর্য্য ছয়মাস কালে সীতা উদ্ধার করিয়া আবার উদিত হইবেন।

রাবণ শোক রহিত বনে ত্রিজটা নামক ব্যাঘ্রী নক্ষত্রের সন্নিধানে সীতাকে রাখিয়া দিলেন। আকাশ গঙ্গার পূর্ব্ব শাখা সীতা ব্যাঘ্রী নক্ষত্রের সন্নিধানে অবস্থিত আছে।

বৃহৎভল্লুক মণ্ডল (the Great Bear) বাসী সপ্তর্ষিগণ জাম্ববান্ নামে রামসূর্য্যের রক্ষাবিধানে নিযুক্ত হইলেন। বজ্রধর গণপতি বৃহস্পতি সুগ্রীব নামে মরুৎসৈন্যের সেনাপতি হইলেন। বৃহস্পতি সুত তারেয় বুধগ্রহ (Hernus) তারেয় অঙ্গদ নামে শ্রীরামদেবের দৌত্যকার্য্যে ব্রতী হইলেন। (১৮) মরুৎগণের পিতা রুদ্রদেবের প্রিয়পুত্র হনুমন্ত বানররূপী মরুৎগণ সহ রাম-সূর্য্যের সেনা হইলেন। মাতা পৃশ্নী দেবীর উদ্ধারার্থে হনুমন্তপ্রমুখ মরুৎগণ লঙ্কাপুরীতে যাত্রা করিলেন।

সসৈন্যে রামলক্ষ্মণ আকাশ-সেতুপথে যমালয় মূলা নক্ষত্রের উত্তরদেশে উপনীত হইলে যম-রাবণ যুদ্ধার্থে আকাশ লঙ্কাপুরীর উত্তরদ্বারে শ্যাম-শবল ওরফে শুক সারণ তারাদ্বয়ের মধ্যে দণ্ডায়মান হইল। মহারাক্ষস মহাকাল বিরূপাক্ষের বরপুত্র মরুৎগণ রাক্ষসবেশে রাম-সূর্য্যকে আক্রমণ করিল। বৃহস্পতি ইন্দ্র সুগ্রীব নামে রামসূর্য্যের রক্ষাবিধানে ব্রতী হইলেন। সুগ্রীব ইন্দ্র রাক্ষস সেনা ধ্বংস করিলেন।

"বিশঃ অদেবী……ইন্দ্রঃ সমাহে" (৮।৮৫।১৩-১৫ ঋ)

রামসূর্য্য সীতা-প্রভা লাভ করিয়া সতেজ হইলেন। শ্রীরাম ও রাবণের শেষ

(১৮) Hernus was the Messenger of the Gods. (Beeton)

যুদ্ধদিনে রামসূর্য্য মাতলি চালিত রথে এবং রাবণ স্বীয় রথে আসীন হইলেন। ঘোরতর যুদ্ধকালে শ্রীরামের বাণে মূলাপতি কাম রাবণ রথ অশ্ব সারথি সহ ভস্মীভূত হইল। কাম-রাবণ ফের অনঙ্গ হইলেন।

সীতা সূর্য্যা পূষন্ মণ্ডলে প্রবাহিত আছেন। পূষন্ (১৯) অগ্নির নাক্ষত্রিক প্রতিমা পূষন্-অগ্নির ক্রোড়ে সীতা বসিয়া আছেন। সীতার এই চিত্র অগ্নি পরীক্ষাতে ব্যক্ত হইয়াছে।

বেদ মন্ত্রের উপর রাম অয়ন (২০) গঠিত হইয়াছে। বৃহৎ ধর্ম্ম পুরাণ-কার ঠিক বলিয়াছেন, হে বাল্মিকি! "সঃ ত্বম্ বেদার্থবক্তা স্যাঃ কাব্যরূপেণ সর্ব্বশঃ।"

কাম-রাবণ নারী হরণে শশব্যস্ত।

কাম যম নরভক্ষণে তৎপর।

কাম-দেব অজেয় ধনুর্দ্ধারী।

ত্রিবদেব সোমসুরার আধার কিন্তু কাম রাবণে দানশক্তির সম্পূর্ণ অভাব।

ত্রিতকামদেব ইতিহাসে নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। নরক অসুর বীরভদ্র, দাতাকর্ণ প্রদ্যুম্ন ও রাবণ। পঞ্চজনেই অজেয় ধনুর্দ্ধর।

বীরভদ্রে আমরা ত্রিতকামের রণবীরত্ব দেখিতে পাই। মরুৎগণ ভূতবেশে বীরভদ্রের সেনা। দাতাকর্ণে ত্রিতকামের রণবীরত্ব ও দানবীরত্ব—মূর্ত্তিদ্বয় মাত্র দেখি অঙ্গসেনা অঙ্গরাজ কামের সহচর। অঙ্গরাজ জিতেন্দ্রিয়।

শম্বর-অরি মায়াপতি প্রদ্যুম্ন—শৈশবে শম্বর বধ করিয়া মায়ার উদ্ধার সাধন করিলেন।

নরক-রাবণে ত্রিতকামের যমত্ব রণবীরত্ব ও কামুকত্ব সুন্দর প্রস্ফুটিত হইয়াছে। কিন্তু নরক-রাবণে দানশীলতার নাম মাত্র নাই।

শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায়।

---

(১৯) Auriga

(২০) তু সূর্য্যের অয়ন।

আবেশ।

১

আমার হৃদয়-কুঞ্জে প্রথম ডাক্‌লো যখন পাখী
প্রাণ মাতান গলায় তাহার কোন্ মদিরা মাখি,
তার সে মধুর গুঞ্জরণে
আঁধার হৃদয় কুঞ্জবনে
চাঁদের বিমল জ্যোছনা দিয়ে ফেললো যেন ঢাকি
যেদিন ডাক্‌লো প্রথম পাখী।

২

ছুট্‌লো সেথায় হাজার ফুলের গন্ধ বায়ুর ভরে
মনের মাঝে হাজার স্বপন সাজলো থরে থরে,
মন ভুলান করুণ সুরে
কে যেন গান গাইতো দূরে
সে সুর যেন আকুল প্রাণে কাঁদতো গলা ধরে
সে দিন গন্ধ বায়ুর ভরে।

৩

সকল কথায় বাজতো যেন করুণ আবাহন
সেই মদিরা সেই স্বপনে বিভোর ছিল মন,
তাই দেখেছি আকাশ পানে
কারুর কথা যায়নি কানে
সকল কাজেই ভুল ক'রেছি কেবল জ্বালাতন
সে দিন বিভোর ছিল মন॥

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

শিক্ষার-দোষ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মেসের মেম্বর।

যথাসময়ে ননি বাসায় ফিরিয়া আসিল। সন্ধ্যার পরে যখন মেসের মেম্বরগণ সারাদিনের অফিষের অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের ক্লান্ত দেহ লইয়া মুড়ীর বংশ ধ্বংস কামনায় মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন, আর বিলাত, আমেরিকা, জাপান, চীন প্রভৃতি দেশের রাজনৈতিক সমাজনৈতিক ও শিল্প-বাণিজ্যের সমালোচনা লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছিলেন, সেই সময় ম্লানমুখে ননি তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইল।

কেদারবাবু অন্যতম মেম্বর। তিনি মুড়ী ভক্ষণ সমাপ্ত করিয়া কল্কিতে ফুৎকার দিতেছিলেন, আর সমবেত বান্ধবমণ্ডলীর সমালোচনার উপরে ফুটনোট কাটিতেছিলেন।

ননির ম্লানমুখের উপরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—"কি হে, মুখ অত ভারি কেন? একেবারে যেন ধনহারাপাখী।"

ননি তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িল। বলিল—"ভাই, সেই যে গোয়ালা বেটার ছেলেকে পড়াইয়াছিলাম, তাহার নিকট কয়টা টাকা পাওনা ছিল,—সে আর তাহা দিল না।"

কেদার। তুমি চাহিয়া দেখিয়াছ?

ননি। হাঁ,—টাকা দেওয়া দূরের কথা; আরও নানা প্রকার গালাগালি দিল।

কেদার। তুমি?

ননি। তাদের পাড়া—আমি একা আর কি করিব!

অর্দ্ধচর্ব্বিত এক গা'ল মুড়ী ধাঁ করিয়া গিলিয়া ফেলিয়া শ্যামবাবু বলিলেন,—"তাদের পাড়া ব'লে তোমায় গালি দিবে! এত বড় স্পর্দ্ধা—মেসের মেম্বরদের গালি দিয়ে অব্যাহতি পায়, কলিকাতা সহরে এমন লোক দেখি না।"

মতিবাবু জলের ঢোক গলাধঃকরণ করিয়া অমিত্রাক্ষর ছন্দে বলিলেন—"সাজ সাজ সাজ সৈন্যগণ, দেখিব কেমন বীর বেহুলাসুন্দরী।"

দীনেশবাবু মুড়ীর বাটী সম্মুখভাগে কিঞ্চিৎ প্রচালিত করিয়া, আভিনায়িক সুরে বলিলেন—"ধর ইঁট মহা অস্ত্র অঞ্জনানন্দন; সংহারিব আজি রণে সুমিত্রাবল্লভে।"

কেদারবাবু কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"তোমরা বড় বেল্লিক।"

মতি। কেন সখা বিভীষণ! হেন বাক্য
করিলে প্রয়োগ, দানিলে বেদনা—
দুর্ব্বাসারে, বল অকারণে?
দানবনন্দিনী আমি রক্ষকুলবধূ,
আমি কি ডরাই সখি, দুর্য্যোধন বীরে?

কেদারবাবু বিরক্তিভাবে বলিলেন,—"ও বেচারা গালি খাইয়া আসিয়া তোমাদের নিকটে দুঃখ জানাইল,—আর তোমরা রঙ্গ-রস করিয়া সময় কাটাইতেছ?"

মতি। তবে তুমি কি করিতে বল?

কেদার। কেন আমরা কি মেসের মেম্বর নই?

মতি। অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন প্রবল প্রতাপশালী নরকুলধুরন্ধর মেসের মেম্বর আমরা; আমরা অবশ্যই মানবের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট বিদূরিত করিতে সমর্থ। এক্ষণে কি করিতে হইবে সখি?

কেদার। ঠাট্টা নয় ভাই। মেস করিয়া আমরা দশজনে একত্র বাস করি কেন? পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিব,—পরস্পর পরস্পরের অপমান-অভিযোগের প্রতিকার করিব। তা' না হ'য়ে ওর কথায় বাজে বকিয়া সারিয়া দিতেছ। আ'জ ওর ঐ রকম হ'য়েছে, কা'ল যে, তোমার-আমার হইতে পারিবে না,—কে বলিতে পারে। তখনও উহারা এইরূপ করিবে।

দীনেশ। এখন তবে কি করিতে বল?

কেদার। চল, আমরা সকলে মিলিয়া সেই বেটার কাছে যাই। সকলে তাড়া দিয়া ধরিলে নিশ্চয়ই সে টাকা দিতে বাধ্য হইবে।

দীনেশ। যদি না দেয়?

কেদার। দেবে না—সে নবাব কি না।

দীনেশ। ধর, দিল না।

কেদার। চেষ্টা করিয়া যদি নাই দেয়,—তখন আর কি করা যাইবে। বেটাকে বেশ দু'কথা শুনিয়ে দিয়ে আসা যাবে।

তখন সকলেরই সেই মত হইল। ননির অংশমত মুড়ীগুলি একটা বাটীতে ছিল। কেদারবাবু বলিলেন,—"তুই ভাই, ওগুলো খেয়ে নে।"

ননির তখন উদরমধ্যে প্রবল ক্ষুধা—তিনি বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া বাটীটা টানিয়া লইয়া মুড়ীগুলি উদরস্থ করিলেন। তারপরে কয়বন্ধুতে গোপমহাশয়ের দোকানাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

তখন রাত্রি নয়টা বাজিয়াছে। গোপমহাশয় তাঁহার কর্ম্মচারীর উপরে দোকানের ভার অর্পণ করিয়া, তহবিল গুছাইয়া লইয়া বাড়ী যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। বান্ধবকুল-পরিবেষ্টিত ননি সেই সময় গিয়া বলিলেন,—"আমার পাওনা মিটাইয়া দাও।"

গোপমহাশয় চাহিয়া দেখিলেন, অনেকগুলি বাবু একত্রে যুটিয়া আসিয়াছে। বুঝিলেন, না দিলে, এখনই একটা বিষম কাণ্ড উপস্থিত করিবে। পুলিস পর্য্যন্ত যখন বাবুদের খাতির করিয়া চলে, তখন এ পাপ মিটানই ভাল। সময়োচিত স্বরে গোপমহাশয় ননিকে বলিলেন,—"তুমি বাপু বড় নির্ব্বোধ—"

কথা সমাপ্ত না হইতেই শ্যামবাবু বলিলেন,—"সাবধানে কথা বলিয়ো।

গোপপ্রভু বুঝিলেন, ব্যাপার কিছু গুরুতর। বলিলেন,—"আজ্ঞে, আমরা কি আর ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা-বার্ত্তা কহি না। ওঁর পাওনা নিয়ে গেলেই হয়। তবে সময়াসময় আছেত।"

দীনেশ। পাওনা নেবে, তার আবার সময়-অসময় কি হে? টাকা দেবেত দাও।

গোপ। আপনার কত পাওনা মাষ্টার মোশাই?

ননি হিসাব করিয়া বলিল। গোপপ্রভু কড়ায়-গণ্ডায় তখনই তাহা মিটাইয়া দিলেন।

রণবিজয়ী বীরবৃন্দের ন্যায় মেসের মেম্বরগণ হর্ষোৎফুল্ল আননে টাকা লইয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

পথে যাইতে যাইতে কেদার বাবু বলিলেন—"দেখ্‌লে ভ্রাতৃগণ; টাকা আদায় হ'ল না? এ জগৎটা কি জান? সবাই শক্তের ভক্ত।" মেসের মেম্বরের নামে না ডরায় এমন লোক নাই।"

দীনেশ। মহাশয়গণ যে মেসের প্রবল প্রতাপান্বিত অসীম ক্ষমতাশালী মেম্বর, তাহা কি গোয়ালা বেচারী জানিতে পারিয়াছিল?

শ্যাম। অবশ্যই জানিয়াছে, নতুবা কি এমন ভাল মানুষের মত টাকা দিত!

দীনেশ। কি প্রকারে চিনিল ?

শ্যাম। মানুষ দেখ্‌লেই চেনা যায়।

দীনেশ। ধড়াচূড়া অঙ্গে নাই তবু চেনা যায় শ্যামে,
মেসের মেম্বর চেনে দাঁড়াবার সুগঠমে ?

কেমন ?

শ্যাম। তা' হবে।

দীনেশ। যাক্, বেচারার যে টাকা কয়টি আদায় হ'ল, এই যথেষ্ট।

মতি। তবে ওথেকে কিছু মেসের মেম্বরদের ভোগে লাগান উচিত।

কেদার। তা নিশ্চয়।

ননি। নাও—আমার ত সবই গিয়াছিল। কত দেব ?

মতি। আট আনা দাও। দু' আনার সিদ্ধি, আর ছ' আনার মিষ্টি।

দীনেশ। বস্—উত্তম ব্যবস্থা। চল একটু সিদ্ধি খেয়ে প্রাণটা ঠাণ্ডা করা যাকগে।

তখন সকলে সিদ্ধির দোকানের উদ্দেশে গমন করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

চা'র ব্যবস্থা।

পর দিবস প্রভাতে উঠিয়া ননিলাল দেখিলেন, তাঁহার শরীর বড় অসুস্থ হইয়াছে। মাথা ঘুরিয়া পড়িতেছে,—উদর স্তম্ভিত হইয়া রহিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গ যেন ভারি—যেন নিজের নয়। নূতন যে গৃহশিক্ষকতার কার্য্য হইয়াছে, সেখানে যাইতে হইবে, কিন্তু শরীরের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে যাওয়া সম্ভবপর নহে।

মতি বাবু উঠিয়া চৌবাচ্চার নিকটে বসিয়া মুখ ধুইতেছিলেন। ননির মন্থর গমন ও দৈহিক ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া বলিলেন,—"কি হে, 'অবশ-অঙ্গ শিথিল কবরী' কেন ?"

ননি। শরীরটা বড় অসুখ ক'রেছে।

মতি। কি প্রকার অসুখ ?

ননি। মাথা টলিয়া পড়িতেছে—সর্ব্বাঙ্গ যেন ভার।

মতি। সিদ্ধির ক্রিয়া। তুমি আর কথনও কি উহা খাও নাই?

ননি। কা'লই তো বলিয়াছিলাম, আমি কথনও সিদ্ধি খাই নাই—অতএব খাইব না। কিন্তু তোমরা ছাড়িলে না।

মতি। আমরাই কি আর অন্নপ্রাশনের সময় হইতে সিদ্ধি খাইতে শিখিয়াছি! এই মেসে থাকিতে থাকিতেই দশ বন্ধুর সঙ্গে খাচ্চি।

ননি। যা খেলে শরীর খারাপ হয়, তা না খাওয়াই কি ভাল নয়?

মতি। তুমি নূতন খেয়েছ কিনা, তাই অসুখবোধ ক'চ্চ—কিন্তু আমাদের ত আর অসুখ করে না। বরং কর্ম্ম-ক্লান্ত দেহ সুস্থই হয়। বিদেশে পড়ে থাক্‌তে হয়,—সারা দিন রাত্রি খেটে মর্‌তে হয়, মধ্যে মধ্যে একটু আধটু নেশা-ভাঙ না করলে কি চলে ভায়া? আ'জ দেখ্‌বে যা ভাত খেয়ে থাক, তার দেড়া টান্‌বে। এখন অবসাদক অবস্থা ব'লে শরীর অমন হ'য়েছে। এক পিয়ালা চা খাও—শরীর ক্রমশই ঝরঝরে হ'য়ে যাবে এখন।

ননি। আমিত চা খাই না।

মতি। খাওনা—এখন হ'তে ধর।

ননি। না ভাই—গরম চার দোকানে তোমাদের মত রোজ চারিটা ক'রে পয়সা দেওয়া আমার কাজ নয়। আমার আয় কত সামান্য জানত?

মতি। কিন্তু শরীর বজায় রেখে তারপর ত আর সব।

ননি। আর ভাই, গরিবের আবার শরীর। বিশেষতঃ সিদ্ধি, চা, এ সকলে যে শরীরের কোন উপকার হয়, এমন বিশ্বাস আমি করি না।

মতি। তুমি নেহাৎ চা'ল-কলা খেগো বামুন কিনা,—তাই অমন কর। যাক্‌—ক্রমে ক্রমে সব হবে। এখন আ'জ চারিটা পয়সা ব্যয় ক'রে এক পেয়ালা চা খেয়ে কাজে যাও। খোঙারিটা বেশি ধ'রেছে। চার মত খোঁয়ারি নষ্ট করতে তুনিয়ায় আর কোন চিজ্‌ নেই।

ননির তখন প্রাতঃকৃত্য সমাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। নূতন কাজ বলিয়া তত অসুস্থ শরীর লইয়াই সে ছাত্রাবাসের উদ্দেশে গমন করিল।

পথে যাইতে যাইতে পথিপার্শ্বস্থ গরম চার দোকানের দিকে লোলুপদৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে চলিয়া গেল। এক একবার মনে হইতেছিল, এক পিয়ালা চা খাইয়া শরীরটা সুস্থ করিয়া লই। পরক্ষণেই মনে হইতে লাগিল,—আমার আয় অতি সামান্য। এ সকল অভ্যাস করিলে পয়সা কোথায় পাইব? বাড়ীতে মা ও স্ত্রীর একান্ত অভাব—দৈনিক চারিটি করিয়া পয়সা যদি

তাহারা পায়, তাহাদের কষ্ট কতকটা নষ্ট হইতে পারে। আবার মনে হইতে লাগিল,—আ'জ বৈ ত নয়। শরীরটা বড় খারাপ হইয়াছে—চারিটা পয়সার পরিবর্ত্তে যদি শরীর ভাল হয়, মন্দ কি? কিন্তু পরক্ষণেই সে হৃদয় দৃঢ় করিল। সে গরিবের ছেলে,—সে চা খাইয়া পয়সা নষ্ট করিবে কেন?

তখন দ্রুতপদে ছাত্রাবাসে চলিয়া গেল, যদিও পূর্ব্বে কোন দিন সে সেখানে যায় নাই, কিন্তু তাহাকে সেই ভদ্রলোকটি যেরূপ ভাবে ঠিকানা বলিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে খুঁজিয়া লইতে তাহার কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না।

বাড়ীর সম্মুখে গিয়া সে দেখিল, বাড়ীটী অতি সুন্দর এবং বৃহৎ। সম্মুখ-ভাগে বিলাতী লতা শ্রেণীবদ্ধরূপে দরোজার গায়ে বিজড়িত। অরকোরিয়া বিগ্নোনিয়া সাইপ্রেস প্রভৃতি বিলাতী তৃণ ও গাছ গুচ্ছে গুচ্ছে রোপিত। তাহার মধ্য দিয়া রাস্তা। বামভাগে গেটের স্তম্ভগাত্রে ক্ষুদ্র শ্বেত প্রস্তরের উপরে 'শান্তি নিকেতন' বলিয়া লেখা। ননি সভয়ে সসম্ভ্রমে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

দরোজার পরেই চত্বর—চত্বরে একখানি লৌহ বেঞ্চি পাতিত। তন্নিকট-বর্ত্তী হইয়া ননিলাল চারিদিকে চাহিল। দেখিল, বাড়ীটী চক্—দ্বিতলের চারিদিকেই বারেণ্ডা—বারেণ্ডায় সবুজ রঙের লৌহ রেলিং।

নিম্নের একটা গৃহ হইতে গাত্রে মেরজাই অাঁটা এক ভৃত্য বাহির হইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি কাহাকে খুঁজিতেছেন, মোশাই?"

থতমত খাইয়া ননি বলিল,—"বাবুকে।"

ভৃত্য। বাবু এখনও ওঠেন নি। আটটার সময় আসিলে সাক্ষাৎ হইতে পারে।

ননি। আমি তাঁহার ছেলে পড়াইতে আসিয়াছি।

ভৃত্য। দাঁড়ান। আমি জেনে আসি।

ভৃত্য তখনই ত্বরিতপদে উপরে চলিয়া গেল—ননি সেই স্থানে দাঁড়াইয়া বাড়ীটীর শোভা-সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিল, এবং এরূপ বড় লোকের আশ্রয়ে থাকিতে পারিলে ভবিষ্যতে যে খুব ভাল হইতে পারে—মনে মনে তাহার আশা করিতে লাগিল।

কয়েক মিনিট মধ্যেই ভৃত্য দ্বিতলের বারেন্দায় দাঁড়াইয়া বলিল,—"মোশায়, আপনার নাম কি?"

ঊর্দ্ধমুখ হইয়া ননি বলিল—"ননিলাল চক্রবর্ত্তী।"

ভৃত্য। আপনিই কি কা'ল বাগানে বাবুর নিকট কাজ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন ?

ননি। হাঁ।

"আসুন—তবে উপরে উঠে আসুন।" এই কথা বলিয়াই ভৃত্য সরিয়া গেল। এখন ননি যায় কোথায় ? কোন্ দিকে বা সিঁড়ি, কোন্ দিক দিয়া বা সে উপরে যায়! তারপরে উপরে গিয়া কোন্ গৃহে সে প্রবেশ করিবে! অন্দর কোন্ দিকে, সদর কোন্ দিকে—সেত কখনও দেখে নাই! ননি যাইতে পারিল না, সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া এক একবার নিম্নদিকে এবং এক এক বার ভৃত্যের পুনরাগমন দর্শন কামনায় ঊর্দ্ধদিকে চাহিতে লাগিল।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা অতীত হইলে,ভৃত্য পুনরপি বাহিরে আসিল এবং কিঞ্চিৎ বিস্মিত. কিঞ্চিৎ অবজ্ঞা ভাবে বলিল,—"কৈ, আপনি উপরে এলেন না!"

ননি বলিল,—"আমি কোন দিন উপরে যাই নাই। কোন্ দিকে সিঁড়ি তাও জানি না।"

ভৃত্য। এই যে—আসুন না।

ননি। এই যে, আমি বুঝিতে পারিলাম না।

ভৃত্য। উত্তর দিকে আসুন—ডা'ন হাতে সিঁড়ি পাবেন। উপরে আসুন।

"তুমি ঐখানে দাঁড়াও"—এই কথা বলিয়া ননি ভৃত্যের নির্দ্দেশ মতে উত্তরদিকে চলিয়া গেল এবং দক্ষিণভাগে সিঁড়ি পাইয়া উপরে উঠিল।

উত্তর-দক্ষিণ লম্বা-লম্বি বারেন্দা—ভৃত্য বারেন্দার মধ্যভাগে, রেলিংএর নিকট দাঁড়াইয়া ছিল। ননি দ্রুতগমনে তাহার নিকট যাইতেছিল।

দক্ষিণ পার্শ্বে গৃহদ্বারগুলি প্রায়ই প্রলম্বিত সুন্দর পর্দ্দায় আবৃত। একটা কক্ষদ্বারের পর্দ্দা দক্ষিণদিকে ঈষচ্চাপিত—ঈষদুন্মুক্ত। দ্রুত গমনশীল ননি-লালের দৃষ্টি সেই কক্ষাভ্যন্তরে পতিত হইল,—সে শিহরিয়া উঠিল।

ননি দেখিল, দ্বাবিংশবর্ষীয়া এক সুন্দরী যুবতী চেয়ারে বসিয়া একখানি ছোট মার্ব্বেল টেবিলের উপর উপুড় হইয়া একখানি কেতাব অধ্যয়ন করিতে-ছেন। ক্ষণমাত্রের দৃষ্টি—ভাল করিয়া দেখিতে পাইল না। তথাপি ননি বুঝিতে পারিল,—যুবতী পরমা সুন্দরী ও তাহার গায়ে জামা, পায়ে মোজা, টেবিলের তলে চটি জুতা এবং মস্তকের কেশ বেণী বানান।

ননি সেদিকে আর নয়ন নিক্ষেপ করিল না,—সে একেবারে ভৃত্যের সমীপবর্ত্তী হইয়া হাঁপ ছাড়িল।

ভৃত্য বলিল,—"আসুন।"

সে অগ্রগামী হইল, ননি তাহার পশ্চাৎ গমন করিল। যে গৃহে যুবতী অবস্থান করিতেছিল, তাহার পরে তিনটী কক্ষ অতিক্রম করিয়া চতুর্থ কক্ষে প্রবেশ করতঃ ভৃত্য বলিল—"বসুন, আমি দাদাবাবুকে ডেকে আনি।"

ভৃত্য চলিয়া গেল।

গৃহের মধ্যস্থলে একখানি বড় গোল টেবিল;—টেবিলের চতুষ্পার্শ্বে ত্রিপদ, চতুষ্পদ ও ষট্‌পদ অনেকগুলি চেয়ার। ননি তাহার একখানি চেয়ারে উপ-বেশন করিল।

গৃহখানি সুন্দররূপে সুসজ্জিত। দেয়ালে বিদেশী ছবির সারি। মধ্য-স্থলে একটি মূল্যবান ঘড়ী,—উপরে ইলেক্‌ট্রিক্ পাখা,—নিস্তব্ধে অবস্থান করিতেছিল।

অবস্থা দর্শনে ননি বুঝিল,—নিশ্চয়ই ইহাঁরা সম্ভ্রান্ত ও ধনশালী গৃহস্থ। এবাড়ীতে চাকুরী হওয়ায় সে তখন নিজেকে সৌভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করিতে লাগিল।

কিন্তু এক সন্দেহ তাহার মনের মধ্যে এই উদিত হইল যে, খুব সম্ভব ইহাঁরা ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী হইবেন। ইহা মনে হইবার অপর কোন কারণ না থাকিলেও ঐ সুন্দরী যুবতীর অবস্থাই তাহাকে এধারণাতে আনয়ন করিতে পারিয়াছিল।

এই সময় ভৃত্য আসিয়া বলিল,—"দাদাবাবু চা খাইতেছেন। এখনই আসিবেন। আপনি কি চা খাবেন?"

ননি বিনীত-নম্রস্বরে বলিল,—"না না, আমি চা—

সহসা তাহার মনে হইল,—সিদ্ধির ক্লান্ত দেহ চা পানে সুস্থ হয়। তখন—আমি চা—বলিয়া অপর কথার অবতারণা করিল। বলিল,—আমি আর এখন চা খাইব না। বাড়ী গিয়াই খাইব।"

ভৃত্য। তা কেন খেতে যাবেন। রোজ সকাল-সন্ধ্যায় এই খানে চা খাবেন। পাড়ার লোকে এখানে এসে চা খেয়ে যায়—আর একটু পরে, বাবু উঠে নীচেয় গেলে দেখবেন, চা খাবার জন্যে কত লোক এসে উপস্থিত হয়। আপনি মাষ্টার মশাই—আপনি দু'বেলা দু'পেয়ালা চা' খাবেন, সে আর

এমন কি! আপনার আগে যে মাষ্টার মুশাই ছিলেন,—তিনি এখানেই চা খেতেন। তিনি বড় ভাল লোক ছিলেন।

ননি। বাবুরা কিছু মনে না করেন।

ভৃত্য। বলেন কি! এঁরা বড় ভাললোক,—মাবাবু জিজ্ঞেস করে পাঠালেন, আপনি চা খাবেন কি না।

ননি। তবে আন।

ভৃত্য চলিয়া গেল। এই সময় ননির ছাত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। ছাত্রকে ননি বাগানে দেখিয়াছিল, সুতরাং আসিবামাত্রই চিনিতে পারিল। বলিল,—"এস, তোমার বৈ আন।"

ছাত্র পার্শ্বের আলমায়রা হইতে বৈগুলি টানিয়া টেবিলের উপরে ফেলিল। এই সময় চা লইয়া ভৃত্যও উপস্থিত হইল।

এই সবে ননির চা'র পাত্র গ্রহণ। কি প্রকারে চামচ-পেয়ালার ব্যবহার করিতে হয়, তাহাও সে ভালরূপ জানিত না। তবে গরম চার দোকানে কোন কোন দিন মেসের বন্ধুদিগের সঙ্গে গিয়াছে, এবং তাহারা যখন পান করিয়াছে, তখন দেখিয়াছে। সে ক্রমে ক্রমে চা'টুকু পান করিয়া ফেলিল।

বেলা সাড়ে নয়টা পর্য্যন্ত ছাত্রকে অধ্যয়ন করাইয়া ননি বিদায় লইল।

যখন সে চলিয়া যায়, তখন নীচের বৈঠকখানার কাছ দিয়া যাইতেছিল,—দেখিল, বাস্তবিক বাবুর ফরাসে দশ বার জন ভদ্রলোক বসিয়া চা' পান ও গল্প-গুজব করিতেছেন। বাবু মধ্যস্থলে বসিয়া তাহাদের সহিত কথোপকথন করিতেছেন।

ননি বাবুর সঙ্গে দেখা করিয়া যাওয়া প্রয়োজন জ্ঞান করায় সে কক্ষে প্রবেশ করিল।

বাবু ননির দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"আসিয়াছিলেন? বেশ। খোকাকে পড়াইয়াছেন?"

বিনীতভাবে ননি বলিল,—"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি সময় মতেই আসিয়াছিলাম।"

বাবু। যত্নসহকারে খোকাকে পড়াইবেন, আমি আপনার বিষয়ে মনে রাখিয়া কাজ করিব।

পার্শ্বস্থিত চা-পান-নিরত একজন ভদ্রলোক বলিলেন,—"আপনি যদি ওঁর

অবসর—

৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিষয় মনে রাখেন, উনি প্রতিপালিত হইয়া যাইবেন। আপনার কৃপা-কটাক্ষপাতে কত পথের কাঙাল বড়লোক হ'য়ে গেল।"

চন্দ্রবাবু চা'র পেয়ালা ফরাসের ওপরে নামাইয়া বলিলেন,—"তা আর একবার ক'রে বোল্‌চেন মুখুয্যেমশাই! এই ত সেদিন আমাদের পাড়ার হারাধনকে মস্ত একটা চাকুরী ক'রে দিলেন।"

মতিবাবু ধূমপান করিতে করিতে বলিলেন,—"আপনি রাজা মানুষ, আপনার কথায় কত কাঙাল বড় লোক হ'য়ে গেল।"

তখন নিত্য নিত্য যথাবিহিত চা প্রাপ্তির অন্তরায় নিরাকরণ মানসে সমবেত ভদ্রলোকগণ বাবুর সুখ্যাতি-স্রোত প্রবাহিত করিতে লাগিলেন। বাবুর শিক্ষা, দীক্ষা, বংশ, ধন-সম্পত্তি ও পদগৌরব সে সুখ্যাতির জালে সকলই জড়াইয়া বসিল। ননি তাহাতে কোন কথাই কহিল না। একটু দাঁড়াইয়া কতক কতক শ্রবণ করণান্তর বাবুকে নমস্কার করিয়া বাহির হইল।

দশম পরিচ্ছেদ।

পরিচয়।

ননিলাল যখন নবপ্রভুর বাটী পরিত্যাগ করিয়া রাস্তায় বাহির হইল, তখন আর একজন ভদ্রলোক চা-পান সমাপ্ত করিয়া বাহির হইলেন। তিনি বয়সে প্রবীণ,—গায়ে একটা ঢাকাই মেরজাই, পায়ে ঠনটনিয়ার চটিজুতা—হাতে বাঁশের মোটা লাঠী।

ভদ্রলোকটিকে বাহির হইতে দেখিয়া ননি একটু দাঁড়াইল এবং তিনি অগ্রসর হইলে, ননি তাঁহার পশ্চাদনুগমন করিতে লাগিল।

একটু অগ্রসর হইয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিয়া ভদ্রলোকটি বলিলেন, "মাষ্টারমাশয়? আপনি কি এই দিকে যাবেন?"

তাহারা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ধরিয়াছিলেন।

ননি। আজ্ঞা হাঁ।

ভদ্র। আপনি কোথায় থাকেন?

ননি। চাঁপাতলার ঐদিকে—একটা মেসে।

ভদ্র। ঐ বাড়ীতে আপনি বোধ হয়, নূতন নিযুক্ত হইয়াছেন?

ননি। আজ্ঞা হাঁ,—সবে আ'জ।

ভদ্র। তা' বেশ হ'য়েছে। উনি খুব ভদ্রলোক।

ননি। আপনার বাড়ী কি ঐ বাড়ীর নিকটে?

ভদ্র। হাঁ,—আপাততঃ আমি মাধববাবুর বাজারে যাইব। আপনার বেতন কত ঠিক হ'য়েছে?

ননি। উনি ভদ্রলোক, যা' বলিলেন, তাতেই স্বীকৃত হ'য়েছি।

ভদ্র। তা' বেশ ক'রেছ,—লোকটি দয়ালু ও পরোপকারী।

ননি। উনি কি কাজ করেন?

ভদ্র। আগে সবজজ্ ছিলেন,—এখন একটা সওদাগরি আফিষের মুস্থুদ্দীর কাজ করেন।

ননি। ভবিষ্যতে ওঁর দ্বারায় তবে একটা ভাল চাকুরী-বাক্‌রীও যুট্‌তে পারে?

ভদ্র। খুব—খুব। কত পথের লোককে উনি চাকুরী ক'রে দিয়েছেন!

ননি। বাবুটি কি ব্রাহ্মণ?

ভদ্র। না,—কায়স্থ।

ননি। হিন্দু ত?

ভদ্র। কি রকম! কায়স্থ হিন্দু নয়ত কি মুসলমান?

ননি। না না,—আমি তা' বলিনি।

ভদ্র। তবে?

ননি। আ'জ কা'ল যে, যাঁরা ধনে মানে বা শিক্ষায় একটু উচ্চ হন, তাঁরাই——

ভদ্রলোকটি হাসিয়া ননির কথার উপসংহার করিলেন। বলিলেন,—"তাঁরাই ব্রাহ্ম বা খ্রীষ্টান হন। কেমন?"

ননি সঙ্কুচিত ভাবে বলিল,—"না না, আমি ঠিক তা' বলিনি।"

ভদ্র। কথাটা যে একেবারেই ভুল ব'লেছ, তাও না। তবে শ্রীভগবানের কৃপায় বর্ত্তমানে স্রোত একটু ফিরেছে। কয়েকজন পণ্ডিতের অক্লান্ত পরিশ্রমে এখন দেশের লোক বুঝিতে পারিয়াছেন, হিন্দুধর্ম্মের চেয়ে উন্নত ধর্ম্ম জগতে আর নাই। অবস্থা ও অধিকারীভেদে ইহার উপাসনা ও অনুষ্ঠান ভেদ। যাক্, তুমি যে প্রশ্ন করছিলে—তোমার মনিব হিন্দু কি না?

ননি সে সকল কথার কোন উত্তর করিল না। ভদ্রলোকটি যাইতে

যাইতে একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া ননির দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"তুমি যা' মনে ক'রেছ—উনি তাই। উনি ব্রাহ্ম।"

ননি সে সকল কথারও কোন উত্তর করিল না, কিন্তু মনে মনে যেন কি চিন্তা করিল।

এই সময় তাহারা মাধববাবুর বাজারের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল, ভদ্রলোকটি বলিলেন,—"তবে যান, মধ্যে মধ্যে ঐ বাড়ীতে দেখা হবে।"

ননি নমস্কার করিয়া বিদায় হইল।

রাস্তায় গমন করিতে করিতে ননি ভাবিতে লাগিল, ব্রাহ্মবাবুরা খুব উদার এবং পরোপকারী হয়, শুনিয়াছি। সর্ব্বত্রই তাঁহাদের ভ্রাতৃ-ভাব। সর্ব্বজীবে সমান দয়া। তাঁহাদের অন্দর-বাহির প্রভেদ নাই। স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ, ধনী-নির্ধন ও সুশ্রী-কুশ্রীতে পার্থক্য নাই।

তারপরে মনে হইল, সেই সুন্দরী যুবতীর কথা। তারপরে মনে হইল, বঙ্গবাসীর মডেল ভগিনীর কথা। তারপরে মনে হইল,—সেই কি একটা কথা! সবাই কি এক রকমের লোক হয়! আচ্ছা যে যেমন হয় হোক —আমি গরিব মানুষ, অত উঁচু চিন্তা আমার কেন? আমি আমার কর্ত্তব্য পালন করিয়া চলিয়া আসিব। আর বাবুটির যেরূপ পরিচয় পাইলাম, তাহাতে ভবিষ্যতে একটা চাকুরীর যোগাড় হইলেও হইতে পারে। ভগবান দীনের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহেন, ইহাই প্রার্থনা।

ননি এইপ্রকার বিবিধ চিন্তা করিতে করিতে মেসে গিয়া উপস্থিত হইল। মেসের মেম্বরগণ তখন কেহ প্রাইভেট পড়াইয়া, কেহ দোকানের জমাখরচ লিখিয়া, কেহ আড্ডা মারিয়া, কেহ কেহ চা খাইয়া, প্রাতর্ভ্রমণ করিয়া আসিয়া বাসায় সমবেত হইয়াছিল এবং আফিষে যাইবার জন্য স্নানাহারের উদ্যোগ করিতেছিল। সকলেই ননির নূতন কাজের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিল— ননি ভাল বলিয়া ব্যাখ্যা করিল। কিন্তু তাহার মনিব যে ব্রাহ্ম; তাহা কাহারও নিকটে ব্যক্ত করিল না।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

মেঘ।

আবরিয়া শ্যাম অঙ্গে রঙ্গিণ প্রাবার
কোথায় যেতেছ চলি অথির চরণে ?
স্বচ্ছন্দ দেহের কান্তি প্রদর্শি তোমার
টানি লও মন প্রাণ ঘোর আকর্ষণে !
কে গো তুমি পরদেশী, সুন্দর পথিক ?
কোথায় গমন তব, সুমোহন বেশ ?
করিতেছ পথ ভুলি এদিক ওদিক,
যাবে পরপারে বুঝি ত্রিদিব প্রদেশ ?
শোভিতেছে গলদেশে সূর্য্যকান্ত হার ;
প্রদীপ্ত হ'তেছে তার সোণালি আভায়
সুকোমল ঢল ঢল মু'খানি তোমার
বিবশ বিভল মন—অবশিত কায়।
শ্যামল দোদুল্যমান বিটপীর শিরে
পড়িয়া কর্ব্বুর-কর করে ঝলমল
প্রতিভাত হ'য়ে যথা পদ্মাকর নীরে
লহরে লহরে ভাসে তারকা-মণ্ডল।
চন্দ্রকী সুকণ্ঠ ওই শোভা অনুপম
ধরিয়াছে উচ্চতর শিলোচ্চয় চূড়া ;
শোভিছে নবীন তৃণ ; বল্লী মনোরম
রয়েছে বেড়িয়া কোথা মন-প্রাণ হরা।
প্রফুল্লিতা কুরঙ্গিণী শাবকে মিলিয়া
লম্ফ ঝম্ফ করি খেলে অচল উপর—
হরিৎ লতিকাদলে চরণে দলিয়া ;
উপল শয়নে কেহ শ্রমেতে কাতর।
হরিদ্র বালুকাময় পারিণের তীর
করেছে ভূষিত হেম মনোজ্ঞ বরণে ;
শ্যামলা বসুধা সিক্ত শারদ-শিশিরে
উদ্ভাসিত করে যথা বালার্ক-কিরণে।

প্রবীণ চণ্ডাংশু ওই যাইতেছে ফিরি
উজ্জ্বল আলোক রাশি লইয়া আবাসে ;
এখনি ফেলিবে ধরা অন্ধকারে ঘিরি,
শূন্য ছাড়ি পাখী তাই নামিছে তরাসে।
যাও ওই পথ ধরি ওগো ও বিদেশি !
খুঁজিতেছ যাহা তুমি পাবে ওই পথে ;
ক্লান্ত যদি ব'স গিয়ে উপাধান ঠেসি'—
দড়বড়ি চড়ি ওই প্রভঞ্জন-রথে।
সম্মুখে সুদীর্ঘ পথ.—দূরে মন্দাকিনী
ছল ছল কল কল যেতেছে বহিয়া
নীলমণি-জিনি-দীপ্ত-কিরীট-শোভিনী ;
যাও চলি নদী পার্শ্ব সুপথ ধরিয়া।
আর কি শকতি তব নাহি চলিবারে ?
পথ হারা হ'য়ে তাই করিতে বিশ্রাম
বসিলে নিশ্চল হ'য়ে ? তাই চিন্তা ভারে
বদন-কমল কি গো হ'ল ম্রিয়মাণ ?
দর্শ-মসী দেখা দেয় কমল আননে ;
দহিছে কি চিত্ত তব ভাবনা বিকল ?
তাই কি চাহিয়া দেখ দিক্‌বালাগণে ?
তাই ঝরে ফোঁটা ফোঁটা আখিপ্রান্তে জল ?
কি করি শকতি নাহি পৌঁছিবারে তথা,
নচেৎ তোমায় পান্থ দেখাতাম পথ,
দিতাম লইয়া সেইস্থানে,—যাবে যথা
হ'লেও দুর্গম—তারে খুঁজি সাধ্যমত।
চুপ কর ক্ষণতরে বরিষ না ধারা,
বসে থাক মুহূর্ত্তেক, না হ'য়ো চঞ্চল,
এখনি উদিত হবে প্রদোষের তারা—
দেখাইবে পথ তায় শুধায়ো সকল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষাল :

জাতীয় কার্য্যের অবনতি

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

শাস্ত্রে আছে, "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" কথাটা বাস্তবিক। বাণিজ্য করিয়া অনেকেই বড়লোক হইয়াছে। এখন সেই দেখা-দেখি সাধারণ সকলেই স্ব স্ব কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, বাণিজ্যে মন দিয়াছে। আজকাল যে ব্যক্তি ধনী,— সেও বাণিজ্য করে, যে দরিদ্র, সেও ধার কর্জ্জ করিয়া বাণিজ্য করিতেছে। অপরিণামদর্শী দরিদ্র বাণিজ্য-ব্যবসায়ী, যে মূল্যে দ্রব্য খরিদ করে, তদপেক্ষা কম মূল্যে বিক্রয় করিয়া, ব্যবসা উত্তমরূপ চলিতেছে, ইহা প্রতিযোগী বাণিজ্য-ব্যবসায়ীকে দেখাইয়া, ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া, বাণিজ্য নামে কলঙ্ক দিতেছে। সকলেই এক কার্য্যে হস্ত দেওয়ায় দেশের এতদূর অধঃপতন হইয়াছে।

বঙ্গদেশে যেমন প্রচুর পরিমাণে পাট জন্মে, সেইরূপ খরিদদারও প্রচুর হইয়াছে। ইস্তক গাঁইট খরিদদার, বেলোয়ার, আড়তদারের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। পল্লীগ্রামে ৭।৮ বৎসরের বালক বালিকা হইতে, অশীতিপর বৃদ্ধ পর্য্যন্ত পাটের ব্যবসা করিতেছে। ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রালাপ ত্যাগ করিয়া, পাটের ব্যবসায়ে রাতারাতি বড়লোক হইবার চেষ্টায় আছেন। পল্লীগ্রামে, পাট যেমন কৃষকের বন্ধু ছিল, আজ সর্ব্বলোকে সেই পাটের চাষ এবং ব্যবসা করিয়া, সকলেই নিরন্ন হইয়াছে। স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি, সহধর্ম্মিণীর গায়ের অলঙ্কার, দুগ্ধবতী গাভী, বাস্তভিটা ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া দিলেও, পাটের ঋণ পরিশোধ হইবে না। এত সর্ব্বনাশ হইবার প্রধান হেতু, জাতীয় কার্য্যের অনৈক্য।

পূর্ব্বে এদেশে বিস্তর দেশীয় চিনির কারখানা ছিল, ইদানীং পাটের চাষে খর্জ্জুর বৃক্ষ সমূলে উৎপাটন করিয়া, সেই জমীতে পাট করিতেছে, দ্রব্যের অভাব হইয়াছে; কিন্তু পাটের চাষ না হইতে, এদেশে দু'দশ গ্রাম অন্তর দেশীয় চিনির কারখানা ছিল, তারপর লাভজনক ব্যবসায় সকলেই হস্তক্ষেপ করিল। ক্রমে ক্রমে চিনিতে লোকসান দিয়া সকলেই কারখানা ত্যাগ করিল; কাজেই আজকাল বঙ্গদেশ হইতে দেশীয় চিনির কারখানা একেবারে লোপ হইয়াছে। দ্রব্যেরও অভাব, তাহাতেই লোকসান।

কয়েকদিন পূর্ব্বে আমাদের বস্ত্র ক্রয় করিতে হইলে, তিন চারি মাইল ব্যবধান হইতে, ক্রয় করিয়া আনিতে হইত। অধুনা আমাদের গ্রামের

আশে-পাশে সর্ব্বশ্রেণীতে বস্ত্রব্যবসায়ী হইয়াছে। বোধ হয়, এখন হুকুম করিলে বাটী বসিয়াই বস্ত্র পাইতে পারি। ব্যবসায়ীরা ভিক্ষুকের ন্যায় প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে, বস্ত্র ক্রয়ের জন্য অনুরোধ করিতে কুণ্ঠিত হয় না।

পূর্ব্বে আবশ্যকীয় দ্রব্যের দোকান খুব কম ছিল। কদাচিৎ দুই একজনে তৈল, লবণ, ডাইল ইত্যাদি বহুলাভে বিক্রয় করিত, আজকাল প্রায় প্রত্যেক ঘরে ঘরে তৈল লবণের দোকান হইয়াছে। কেহ বা পাঁচ-টাকার দোকানদার, কেহ বা সাড়ে নয়টাকার, আবার কেহ বা বিনা পুঁজিতে দোকানদারী করিতেছে। এ হেন অসার আবর্জ্জনাপূর্ণ ব্যবসায়ী যুটিয়া, বাণিজ্যের নামে কলঙ্ক অর্পিত করিয়াছে। যেদিন এই সব ক্ষুদ্র অসার ব্যবসায়ী, ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব জাতীয় কার্য্যে মনোযোগী হইবে, সেই দিন, "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ", অক্ষরে অক্ষরে মিলিত হইবে।

পল্লীগ্রামের অবস্থা যিনি একবার চিন্তা করিবেন, তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন, জাতীয় কার্য্যের অনৈক্য হেতু সংসারে এত অভাব অনটন হই-তেছে। সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে জাতীয় কার্য্য বিভাগ আছে। অতিলোভী বাঙ্গালী, পিতৃ-পিতামহের ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া, লুব্ধ আশায় অন্যের ব্যবসা হস্ত-গত করিতে গিয়া, নিজের এবং অন্যের উভয়েরই সর্ব্বনাশ সাধিত করিতেছে।

এক একটী কার্য্য একজনের করায়ত্ত থাকিলে, তাহাতে নিশ্চয়ই উন্নতি লাভ হয়। আর যে কার্য্যে সকলে হাত দেয়, তাহার বংশ নির্ম্মূল হয়। বঙ্গ-দেশে কেবল কয়েকটী কার্য্য এখনও একজাতির মধ্যে অবস্থান করিতেছে। ধোপা, নাপিত, দাই ইত্যাদি; ইহারা জাতীয় ব্যবসা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। স্বর্ণকার, তৈলকার প্রভৃতি যাহারা নবশায়কের মধ্যে আছে, তাহাদের ব্যবসা সকলেই লইয়াছে, এইজন্য তাহাদের অবস্থা আজ এত শোচনীয়!

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণ। শাস্ত্রালাপ, বিদ্যাধ্যয়ন, যাগ, যজ্ঞ, হোম ইত্যাদি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্যগুলি ব্রাহ্মণের উপর অর্পিত এবং তাঁহাদের কর্ত্তব্য কার্য্য; যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা ও যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের জাতীয় ধর্ম্ম; বৈশ্যেরা বাণিজ্য করিবে, আর শূদ্র এই ত্রিবিধ জাতির দাসরূপে, স্ব স্ব কার্য্য অবলম্বন করিয়া, সকল শ্রেণীর জীবন রক্ষা করিবে, ইহাই পৌরাণিক কথা। ইদানীং বঙ্গদেশের পল্লীগ্রামে, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র দেখিতে পাওয়া যায়, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সংখ্যা নিতান্ত বিরল। আবার শূদ্রের মধ্যে

বহুবিধ জাতি-বিভাগ করা রহিয়াছে। যথা, কায়স্থ, কৈবর্ত্ত, গোয়ালা, কুম্ভকার, কর্ম্মকার, স্বর্ণকার, সূত্রধর, প্রামাণিক, কাপালিক, সদ্গোপ, সচ্চাষী, বারুই, যোগী, তিলি, বৈষ্ণব, তৈলকার, চণ্ডাল, হাড়ি, মুচি ইত্যাদি বহু শ্রেণীতে বঙ্গদেশ পূর্ণ। সকলেরই স্ব স্ব জাতীয় ব্যবসা রহিয়াছে। ইহা-দের পূর্ব্বপুরুষগণ নিজ নিজ জাতীয় কার্য্য করিয়া, প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছেন। অধুনা সকলেই পিতা-প্রপিতামহের ব্যবসা ঘৃণা বোধে ত্যাগ করিয়া, সুসভ্য ও লাভবান হইবার আশায়, পরস্পর অন্যের ব্যবসা অবলম্বন করিয়া, সংসারে ঘোর অশান্তি এবং দুর্ভিক্ষের হাহাকার রব বিস্তৃত করি-য়াছে। যে দিন স্ব স্ব জাতীয় কার্য্যের প্রতি সকলের মন আকৃষ্ট হইবে, সেইদিন শস্য-শ্যামলা বঙ্গভূমি যথার্থই সুখে স্বচ্ছন্দে অবস্থিতি করিবে।

দেশের যতদূর অধঃপতন হইবার সম্ভাবনা, তাহা হইয়াছে। এক্ষণে ইহার প্রতীকারের উপায় কি? সকলেই যখন বিজ্ঞ, তখন বসুমতীর নামে কলঙ্ক করা বিজ্ঞের অনুচিত। পিতা-প্রপিতামহের নাম না ডুবাইয়া, সকলেই জাতীয় ব্যবসার উন্নতিকল্পে সচেষ্ট হউন।

যে বঙ্গদেশে পূর্ব্বে লোকে তাস, পাশা খেলিয়া, হাস্যমুখে দিন অতি-বাহিত করিয়াছে, দুঃখের বিষয়, সেই বঙ্গদেশ একেবারে দুর্ভিক্ষের ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, পল্লীবাসীর জীবন হনন করিবার জন্য লোল জিহ্বা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। ধরা পাপে পূর্ণ হইয়াছে। বসুমতী, পল্লীবাসীর হৃদয়ে দারুণ আঘাত দিয়া, জ্ঞানের উদয় করিয়া লইতেছে। সকলকে জাতীয় কর্ম্ম করিবার জন্যে অনাহারী রাখিতেছে, ইহাতেও যদি ব্রাহ্মণ ও শূদ্র সম্প্রদায়ের চৈতন্য সম্পাদন না হয়, তবে যে দিন সকলে না খাইতে পাইয়া মরিয়া যাইবে, সেই দিন জ্ঞানের উদয় হইবে।

হে বঙ্গবাসী ব্রাহ্মণ ও শূদ্র সম্প্রদায়সকল, আপনারা স্ব স্ব জাতীয় ব্যবসার কার্য্যে আর কলঙ্ক রোপণ করিবেন না। নিজ নিজ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হউন, তাহা হইলে সংসার আবার সুখের হইবে। রাতারাতি বড়মানুষ হইবার আশা পরিত্যাগ করিয়া, ক্রমে ক্রমে সুখী হউন। পিতা, পিতামহের নামে কলঙ্ক না দিয়া, সুযশ রাখিতে চেষ্টা করুন। নিজ জাতীয় ব্যবসায়ে মনোযোগী হইয়া, ঈশ্বরের চক্ষে এবং পূর্ব্বপুরুষগণের চক্ষে ভাল-মানুষ হউন; তাহা হইলে সংসারে সুখ শান্তি বিরাজ করিবে।

শ্রীঅক্রূরচন্দ্র দাস।

পৌষ-পার্ব্বণ।

(সেকালের কথা।)

সেকালের কথা বটে, কিন্তু একেবারে মান্ধাতার আমলের নয়,—চল্লিশ বৎসরের আগেকার কথা। ইতিহাসের হিসাবে চল্লিশ বৎসর অবশ্য খুব অল্প দিন—চল্লিশ বৎসরের কথা, সেকালের কথা হইবে কেন? ঐতিহাসিক কালের গণনায় না হইতে পারে, কিন্তু পরিবর্ত্তনের হিসাবে তখনকার সময়কে সেকালের কথা বলা যাইতে পারে! এই চল্লিশ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালার যে কি পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, তাহাই দেখাইবার জন্যে সেকালের পৌষ-পার্ব্বণের কথা শুনাইতে বসিয়াছি।

তখন বাঙ্গালার সহর কলিকাতার রাস্তার দুইধারে নর্দ্দামায় ময়লা জল পূতিগন্ধ আবর্জ্জনা বক্ষে করিয়া মশককুল-গুঞ্জন-স্বর-মুখরিত হইয়া গড়াইয়া গড়াইয়া চলিয়া যাইত। তখন সহরের লোক কথায় কথায় কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হইত। মার্ত্তণ্ড-তাপে রাস্তার ধূলি, অশ্ববিষ্ঠা গোময়াদি সংমিশ্রণে পথিকের চোখে-মুখে প্রবেশ করিত। সন্ধ্যার পরে দূরে দূরে—অতি দূরে ক্বচিৎ স্তম্ভশীর্ষে আলোক ক্ষীণ কিরণ বিকীর্ণ করিত। গুণ্ডার দল সগর্ব্বে অলি-গলিতে পথিকের সর্ব্বনাশ-আশায় ঘুরিয়া বেড়াইত। রাত্রি দূরের কথা—দিবসে মশক-দংশনে মানুষের গাত্রে ঔপদংশিক স্ফোটকবৎ চাকা চাকা দাগ হইত। পল্লীর মানুষ কলিকাতায় আসিতে হইলে, সুযাত্রিক তিথিতে যাত্রা করিত, এবং পুনরাগমন কামনায় দেবপীঠে মানসা করিয়া আসিত!

তখন বঙ্গপল্লীর অবস্থাও বিভিন্ন প্রকারের ছিল। স্বাস্থ্য ও আনন্দ সেখানে পূর্ণরূপে বিরাজ করিত। 'সুজলা সুফলা বঙ্গ' তখন দীর্ঘায়ুঃ সুস্থ সন্তান-সন্ততি লইয়া জ্যোৎস্নাপুলকিতা যামিনীর ন্যায় আনন্দে দিন কাটাইত।

এখনও তেমনই ভাবে বঙ্গপল্লীর তরুশিরে বহু বিহগ-বিহগী কল-কণ্ঠে গান গায়, এখনও নীল আকাশ-তলে বসিয়া শুক্লপক্ষের শশধর জ্যোৎস্না বিলায়, এখনও কৃষ্ণপক্ষের নিশীথিনী সর্ব্বাঙ্গে মসি মাখিয়া মলিন সাজে সজ্জিতা হয়। এখনও কৃষক বলদ লইয়া প্রান্তরে আবাদ করে, এখনও রাখালেরা গাভী লইয়া

গোচারণের মাঠে গোষ্ঠ-বিহার করিয়া থাকে, এখনও নদী-বিল-খাল-জোলে জেলেরা জাল দিয়া মৎস্য শীকার করে, এখনও কৃষকবধূকুল কলসী কক্ষে নদী হইতে দল বাঁধিয়া জল আনে। এখনও সন্ধ্যায় সাজের প্রদীপ জ্বালিয়া পল্লীকুমারী ঠাকুরঘরে, গোলাঘরে, তুলসী-মন্দিরে সন্ধ্যা দেখাইয়া ফিরে— এখনও সাঁজের শঙ্খ রাঙা ওষ্ঠের ফুৎকারে আপন জন্ম সার্থক করিয়া গভীর নাদে দিবাবসান ঘোষণা করে।

কিন্তু যাহারা সেকাল দেখিয়াছে, তাহারা একাল দেখিয়া মনে করে— কি ছিল, কি হইয়াছে! 'গজভুক্ত কপিত্থবৎ' বহিরাবরণে কতকটা ঠিক থাকিলেও ভিতরকার শস্য কোথায় উপিয়া গেল! সে স্বাস্থ্য, সে আনন্দ, সে স্বচ্ছলতা নাই কেন?

সহর আজি স্বর্গ;—পল্লী আজি পথের কাঙাল। রোগ শোক দ্বন্দ্ব হিংসা দ্বেষে পরিপূর্ণ!

প্রভাত-সন্ধ্যায় পাখী ডাকে,—সে ডাকে যেন মধুরতা নাই। এখন কোকিল পাপিয়া শ্যামার ডাক কম—সে পাখীরা যেন কোথায় চলিয়া গিয়াছে। এখন পেচক, ধনহারা, যমকুলী ইহারাই যেন পল্লী-সাথী। আগে বঙ্গপল্লীর বনে বনে প্রতি ঋতুতে কুসুম ফুটিয়া স্বর্গ-গন্ধ আনয়ন করিত,—এখনও ফুল ফোটে, কিন্তু তত বা তেমন নাই। অধিকন্তু মনে আর তেমন আনন্দ আনয়ন করিতে পারে না। শরতে আগে শেফালী ফুটিয়া মহামায়ার আগমন-বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া পল্লীর মানব-মানসে সীমাহারা সুখধারা জাগাইয়া দিত,— আর এখন শেফালী ফুটিয়া ম্যালেরিয়ার আগমন-সংবাদ ঘোষণা করে। নরনারীর প্রাণ শিহরিয়া উঠে—ভাবে শীতের কয়মাস ত' সপরিবারে শয্যা-শায়ী থাকিবই, কিন্তু কে কাহাকে ফেলিয়া যে জন্মের মত চলিয়া যাইবে, তাহার ঠিক কি! বসন্ত-বিকশিত কুসুম-গন্ধে মনে হয়, ম্যালেরিয়া-অন্তে যে কলেরার আবির্ভাব, এই তাহার সময় উপস্থিত,—হায়! কে জানে, কবে কে মহাযাত্রার যাত্রী হইয়া সংসারে হাহাকার রোল তুলিবে!

নদীতে জল আছে—কিন্তু বারমাসের জন্যে নয়। বর্ষায় যখন জল ও কাদায় ঘরের বাহিরে যাওয়া যায় না, তখন নদী-খাল-বিলে জলপূর্ণ। যখন শুকাইবে, তখন সর্ব্বত্র। তখন জলাভাবের পূর্ণ হাহারব! কৃষক এখন হাড়ভাঙা খাটুনি খাটে, কিন্তু বৎসর বৎসর অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টির বৈফল্য লইয়া বড় ম্লানমুখে দিন কাটায়। রাখালেরা গাভী লইয়া মাঠে যায়, কিন্তু স্বাস্থ্য-

হারা—ম্যালেরিয়া জ্বরে হয়ত গাছতলায় পড়িয়া সূর্য্যোত্তাপে জ্বরের কম্প নিবারণ করে। তারপরে গোচারণভূমির তেমন স্বচ্ছন্দ ও মুক্ত প্রান্তর কোথাও নাই। জমিদারমহাশয়েরা গোচারণ ভূমি আবাদ করাইয়া আয় বৃদ্ধি করিয়া লইয়াছেন। তাই বলিতেছিলাম, আছে সব, কিন্তু যেন প্রাণ-হীন। তাই বলিতেছিলাম, একালের নয়, সেকালের কথা।

যাহা নাই, যাহা অতীত হইয়াছে, যাহাকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—সেই কালকেই ত সেকাল বলে? তা' যদি হয়, তবে আমার ঐ কথায় কোন দোষ হয় নাই। অতএব সেকালের পৌষপার্ব্বণের কথা বর্ণনা করিব।

চল্লিশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে—এই চল্লিশ বৎসরের সহিত আমারও জীবনের কত পরিবর্ত্তন, কত ভাব-বিপর্য্যয়, দৈহিক কত উত্থান-পতন হইয়াছে,—তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কত দেখিলাম, কত শুনিলাম, কত বুঝিলাম—কত ভুল করিলাম—কত সুধাভ্রমে গরল পান করিয়াছি, কত কাঞ্চনভ্রমে কাচের সেবা করিয়াছি। এই চল্লিশ বৎসরে কত বন্ধু হারাইয়াছি,—কত নূতন বান্ধব প্রাপ্ত হইয়াছি,—আবার কত প্রাণের বন্ধুকে প্রবল শত্রু হইতে দেখিয়াছি। তা' যাক্। এই পৌষ পার্ব্বণেরই কত রূপান্তর পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

পল্লীতে জন্মিয়াছিলাম, পল্লীর কথাই ভাল করিয়া বলিতে পারিব। কিন্তু অন্যূন পঁচিশ বৎসর সহরে বাস করিতেছি। ইহার মধ্যে স্মরণ হয়, দুইবার কি তিনবার পল্লীর পৌষপার্ব্বণ দর্শন ভাগ্যে ঘটিয়াছে। কিন্তু সেও প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে। এবার পল্লীতে আসিয়াছি।

পৌষপার্ব্বণ আছে—কিন্তু সে চিত্র নাই। প্রতিমা আছে—দর্পণ জলে পড়িয়াছে।

আমাদের বাড়ীর কথাই বলি। তখন আমরা দশ এগার বৎসরের বালক,—আমাদের গ্রামের অনতিদূরে বজুদ্দীয়া গ্রাম। গ্রামখানি অতি ক্ষুদ্র—শুধু কৃষকপল্লী। পৌষপার্ব্বণের দিন প্রভাতী তারা অস্তমিত না হইতে হইতে আমরা উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া র‍্যাপার স্কন্ধে লইয়া নগ্নপদে বাড়ীর ভৃত্য দীনুদা'র স্কন্ধে দুইটা পিতলের কলসী চাপাইয়া দিয়া তাহাকে লইয়া বজুদ্দীয়া অভিমুখে ছুটিয়াছি। গঙ্গাস্নানোপলক্ষে যাত্রীর মত—কত স্ত্রী-পুরুষ যে ঘটী, ভাঁর ও কলসী হস্তে করিয়া বজুদ্দীয়া অভিমুখে ছুটিতেছে, তাহা গণিয়া স্থির করিতে পারা যায় না। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য!

নিশির শিশিরে কাপড় ভিজিয়াছে—পথের উভয়পার্শ্বের ক্ষেত্রজাত সরিষা, মসিনা, মটর প্রভৃতির পুষ্প শিশিরের সহিত পদদ্বয়ে ও পরিধেয় বস্ত্রে জড়াইয়া গিয়াছে,—জুতার পরিবর্ত্তে 'আমুনেজোলের' পঙ্ক পদদ্বয়ে আবৃত—প্রভাত-কুয়াসা মস্তকের চুলে পড়িয়া মুক্তাহারের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। 'উত্তুরে হাওয়া'—কন্‌কনে শীত! কিন্তু কে তাহা গ্রাহ্য করে? সকলে সারি বাঁধিয়া চলিয়াছি।

বজুদ্দীয়ায় কি, তোমরা তাহা বুঝিতে পার নাই। সেখানে খেজুরের রস পাওয়া যায়। কৃষকেরা খেজুর গাছ হইতে রস বাহির করে,—গুড় জ্বালাইয়া বিক্রয় করে। কিন্তু পৌষপার্ব্বণের দিন—কেবল বিতরণ! মূল্য নাই—প্রতিদান নাই—চেনা-শুনা জানা নাই—প্রার্থী মাত্রকেই কেহ ফিরাইত না। সাধারণ লোকে দশবার 'বাইন' ঘুরিলেই এক এক কলস রস সংগ্রহ করিতে পারিত—আর সেই সকল কৃষক, যাহার প্রজা বা খাতক—তাহাদের কথাই নাই; প্রয়োজনীয় রস দান করিবেই করিবে। যাহাদের সেরূপ প্রজা বা খাতক নাই—কোন সম্বন্ধ নাই—তাহাদিগকেই 'দশদুয়ারে' ঘুরিয়া সংগ্রহ করিতে হইত। আমাদের বাড়ী অনেক রস কৃষকেরা পাঠাইয়া দিত, তথাপি সে 'আনার আনন্দ' উপভোগ জন্য না যাইয়া থাকিতে পারিতাম না। কেহই পারিত না। আমার মত অনেক বাতিকগ্রস্থ লোক—যাহারা বাড়ী বসিয়াই রস পাইত, তাহারাও 'বছরকার দিনের' আনন্দ প্রাপ্তি জন্য ছুটাছুটি করিত। তোমরা বলিতে পার—সেই শীতে—সেই খালি পায়ে—সেই শিশির-জঞ্জাল মাখিয়া আবার আনন্দ! আমার পুত্র-পৌত্রগণও এখন তাই বলে,—আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সেকালের আনন্দ—এখন তোমরা বুঝিবে না।

বজুদ্দীয়ায় আমাদের এক জফরচাচা ছিল। জফর চাচার অবস্থা ভাল, আমাদের প্রজা ও খাতক। জফরচাচা মুসলমান—আমরা ব্রাহ্মণ; কিন্তু সে কথা মনেও আসিত না। আমরা উপস্থিত হইলে জফরচাচা যে কি দিয়া সন্তুষ্ট করিবে, খুজিয়া পাইত না। 'জিরেন কাটের' রস খাওয়াইত—আগের দিন পাটালী প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া তখনই বাহির করিয়া দিত। রস যত প্রয়োজন তত দিত,—আমরা বাণিজ্যাগত বণিকের ন্যায় প্রফুল্ল মনে গৃহে গমন করিতাম। দুঃখের বিষয়, সে রসের তত আদর বাড়ীতে হইত না—তখন বিভিন্ন পল্লীর প্রজার বাড়ী হইতে ভারে ভারে রসের ভাঁড় আসিয়া আমাদের প্রাঙ্গণ পূর্ণ হইয়া যাইত।

মা, জ্যাঠাইমা, খুড়ীমা, বৌদিদি, ওবাড়ীর কাকীমা, পিসিমা, ঢেকিশালা হইতে তখন বাহির হইয়াছেন,—প্রভাতেই স্নান করিয়াছেন—শীত কাহাকে বলে, তা যেন জানেন না ; শুদ্ধবস্ত্রা, প্রভাত-স্নাতা, কেশরাশি পৃষ্ঠে বিলম্বিত—মুখে চোখে উভয় হস্তে চাউলের সূক্ষ্ম চূর্ণ লাগিয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। এদিকে ঝি কুটনা কুটিতেছে, বাটনা বাটিতেছে—জল তুলিতেছে ; চাকরেরা কলাপাত, তরকারি, গুড়, সন্দেশ, বীরখণ্ডী, তিলেপাটালী—ভারে ভারে আনিয়া বাড়ী পূর্ণ করিতেছে। বাড়ীতে যেন মহাযজ্ঞের আয়োজন। সেই প্রত্যুষেই উনোন জ্বলিয়াছে—বিবিধ আকারের—বিবিধ প্রকারের, বিবিধ রসের পিষ্টক-পায়স প্রস্তুত হইতেছে। পল্লীর বাড়ী বাড়ী—ঘরে ঘরে এ আনন্দ—এ উৎসব। সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ী হইতে ভিখারীর কুটীর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই এক উৎসাহ—এক উৎসব। যাহার যেমন সাধ্য—যাহার যেমন অবস্থা, তাহার তেমনই আয়োজন ;—কিন্তু কোথাও বাদ নাই। পল্লীর পাখীরাও বুঝি সে আহার্য্যে বঞ্চিত হইবে না জানিয়া প্রভাত হইতে আনন্দ-গীতি গাহিয়া ফিরিত। সারমেয়কুল আকুল লালসায় দল পাকাইয়া—ঝগড়া করিয়া পুরাঙ্গণে ঘুরিয়া ফিরিত।

সে দিন আবার বাড়ী বাড়ী বাস্তুপুরুষের পূজা-উৎসব। যেখানে বাস করিতে হয়,—তাহার অধিষ্ঠাতৃ-দেবতাকে পূজা না করিলে সম্বৎসরের শুভফল কোথায় মিলিবে ? বাড়ী বাড়ী পুরোহিত ঠাকুর পূজা করিয়া ফিরিতেছেন। নগ্ন ছেলেরা বাড়ী বাড়ী হইতে পূজার প্রসাদ সংগ্রহ করিতেছে ;—ঢোল-সানাইয়ের বাদ্যোদ্যমে শান্তপ্রকৃতি পল্লী মুখরিতা। হিন্দু-মুসলমান—আত্মীয়-স্বজন কেমন প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া, বাড়ী বাড়ী সমবেত হইয়া হাসিমুখে পায়স-পিষ্টক ভোজন করিত। ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত, জমিদার প্রজা, উত্তমর্ণ অধমর্ণ, বিদ্বান্ এবং নিরক্ষর কৃষক একত্রে মিলিয়া আনন্দ-ভোজন করিত। মেয়েরা অন্নপূর্ণা রূপে রাশি রাশি অন্ন-ব্যঞ্জন, পায়স-পিষ্টক প্রভৃতি রসনা-তৃপ্তিকর ভোজ্য প্রস্তুত করিয়া নিজ হস্তে ভোজন করাইয়া অপার আনন্দ লাভ করিত। এবাড়ী হইতে ও বাড়ী—ওবাড়ী হইতে সে বাড়ী—বৃদ্ধ বৃদ্ধার জন্য নবাগতের জন্যে ভোজন দ্রব্য ভারে ভারে প্রেরিত ও নীত হইত। এ পার্ব্বণের উদ্দেশ্য—পৌষমাসে নূতন ধান্য সংগ্রহ হইয়া গৃহস্থের মরাই পূর্ণ হইয়াছে। কড়াই, মুগ, সরিষা, তিল, অরহর নূতন হইয়াছে। খর্জ্জুর গুড় প্রস্তুত হইয়াছে—শীতের মরসুমি আনাজ

হইয়াছে—এ সময় একবার পল্লীর সকলকে লইয়া প্রীতিভোজন না করিলে আনন্দবর্দ্ধন হইবে কেন? আত্মীয়তা-ঘনিষ্ঠতা বজায় থাকিবে কেন? পরস্পর পরস্পরের আনুগত্য রহিবে কেন? ব্রাহ্মণ-শূদ্র—হিন্দু-মুসলমান ভ্রাতৃ-ভাবে আবদ্ধ থাকিবে কেন?

কিন্তু 'তে হি নো দিবসা গতাঃ'—আমাদের সেদিন গত হইয়াছে। এবার পৌষপার্ব্বণে দেখিলাম. সে রামও নাই,—সে অযোধ্যাও নাই। ক্বচিৎ কোথাও কোন্ বাড়ীতে একটু-আধটু উদ্যোগ দেখা গেল। সমস্ত পল্লী ঘুরিয়া জানিতে পারিলাম,—তত খাবার উদ্যোগ কাহার জন্যে? ম্যালেরিয়ায় ছেলে পুলে জীর্ণ শীর্ণ—সাগু বার্লি দু'বেলা খেলেই পেট ফোলে! মেয়েদের অত শীতে শয্যাত্যাগ করিলে ঠাণ্ডা লাগে। কেহ কেহ শ্লোক আওড়াইলেন,—"গৃহস্থকে ভূতে পায়, চা'ল কুটে পীঠে খায়।"

জফর চাচা নাই—তাহার মৃত্যু হইয়াছে। সংবাদ শুনিয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইলাম। জফর চাচার ছেলেই এখন মুরুব্বি—তাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে পাঠাইলাম. ভাবিলাম—পিটে না হয় দু'খানা গরম লুচি আর গোটাকয়েক সন্দেশ খাইয়া যাইবে। জফর চাচার ছেলে করিমউল্যা গ্রাম্য পাঠশালায় হিতোপদেশ পর্য্যন্ত পড়িয়াছে,—গায়ে জামা দেয়, পায়ে জুতা পরে। সে আমার লোকের নিকটে বলিয়া দিল, হিন্দুর বাড়ী মুসলমানের খাইতে নাই,—অতএব আমি অন্য সময় গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব। তোমার বাপ-পিতামহ কেন খাইতেন? এ প্রশ্নের উত্তরে সে বলিল—তাঁরা একেবারে চাষা ছিলেন; জানিতেন না, হিন্দু ও মুসলমানে কত প্রভেদ!

শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলাম,—ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না, এই কয় বৎসরের মধ্যে কোথা হইতে নারদের ঢেঁকি আসিয়া হিন্দু-মুসলমানে এ বিবাদ-পার্থক্য বাধাইয়া দিয়াছে! জফর চাচা যে আমাদের বড় আপনার ছিল!

পল্লী এখন বড় অবনত;—পল্লীতে তেমন পৌষপার্ব্বণে হয় না দেখিয়া, দুঃখ পাইয়া আসিয়াছি।

প্রাপ্ত গ্রন্থাদি।

উত্তর-ভারত ভ্রমণ ও সমুদ্র দর্শন—শ্রীশ্যামাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত ও প্রকাশিত। পুস্তকখানির কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই মনোজ্ঞ। লেখায় বেশ সরলতা ও ভাবপ্রবণতা আছে। তবে 'বৃক্ষ-শাখে পাখীগণ পাখা ঝাড়িল' 'দৈববশাৎ' প্রভৃতি অনেক স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। আর 'আম্র ফলের রাজা। সেই শ্রেষ্ঠ ফল ঈশ্বর আমাদিগকে প্রচুর পরিমাণে দিয়াছেন, ইহা চিন্তা করিলে ভগবানের অপার করুণার কথাই মনে হয়।'—এইটুকু পড়িয়া ডারুইনের থিয়োরিও অনেকের মনে হইবে। আম্রফলের অত্যধিক লোভে এবং এই ফল দানে ভগবানের এত মহিমা স্মরণ হওয়ায়, আমরাই যে মর্কটবংশধর তাহা কে না বুঝিবে? আচ্ছা, যে দেশে আম্র নাই, সে দেশের লোকের প্রতি কি ভগবানের অকরুণা বুঝিতে হইবে? অন্যত্র 'হক্' এতক্ষণ ভয়ে মুহ্যমান হইয়া নোঙ্গর করিয়া যমুনাসৈকত-সমীপে লুক্কায়িত ছিল; সে সময় বুঝিয়া বাষ্প উদ্গীরণ করিতে করিতে সগর্ব্বে গন্তব্যপথে চলিয়া গেল।' ইহা কি কাব্যের হিসাবে লেখা? তা' হয় হউক,—কিন্তু সৈকত-সমীপে লুকায় কিসের মধ্যে? সৈকত মানে ত বালুকাময় তট? তবে কি হক্‌নামা জাহাজ বালির মধ্যে লুকাইয়াছিল? আর নোঙ্গর কি সেই নিজে করিয়াছিল? অন্যত্র—'আদিশূরের বংশধর রাজা বল্লালসেন' এরূপ লেখাও আছে। এতকাল পরে কি রাজা বল্লালসেন আদিশূরের বংশধর হইলেন?

আ'জ কা'লকার কবিতা, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী যা' কিছু পড়িতে পাওয়া যায়, এইরূপ কাব্য-বিভীষিকা, আর অজ্ঞতার সীমাহারা-ভাব দেখিয়া ম্রিয়মাণ হইতে হয়। সমালোচ্য গ্রন্থখানির সর্ব্বাঙ্গে এইরূপ দূষ্য পদার্থ বিজড়িত। গ্রন্থকারের প্রাণ আছে, দর্শনীয় বিষয়গুলি বেশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতে পারেন,—লিখিবারও শক্তি আছে বলিয়া বোধ হয়, যদি একটু মনোযোগ সহকারে এই দোষগুলি পরিবর্জ্জন করিয়া গ্রন্থ ছাপিতেন, তবে বড় আদরের হইত। পড়িতে পড়িতে বেশ একটু তন্ময়তা আসে, তবে মধ্যে মধ্যে ঐ আপদগুলা দেখা দিয়া, সে সুখ-স্বপ্ন নষ্ট করিয়া দেয়। মোটের উপর এগুলি বাদ দিয়া পড়িলে, লেখা বেশ—সরস ও হৃদয়গ্রাহী।

পূজার গল্প—শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী প্রণীত। কলিকাতা ৪০।১, এ, নং মহেন্দ্রনাথ গোস্বামীর লেন, সিমুলিয়া, ভক্তের জয় কার্য্যালয় হইতে প্রণেতা কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য।০ চারি আনা মাত্র। সদানন্দের সন্ধি-পূজা, মনে মনে মায়ের পূজা, মুখুয্যে মশাই, তারাসুন্দরী,—এই চারিটী গল্প লইয়া পূজার গল্পের বই। অতুলকৃষ্ণের অতুল ভাষা-সম্পদ্ আ'জ বঙ্গ যুড়িয়া বিজ্ঞাত। সেই ভক্তির ভাষায় ভক্তের ভাবে ভক্তিময় এই চারিটী আখ্যান বিরচিত। পড়িতে পড়িতে ভাব-নদীতে তুফান উঠে,—চোখের জল আপ্‌নি ঝরিয়া বুক ভাসাইয়া দেয়। এ গল্পের রসাস্বাদে বাঙ্গালী মাত্রেরই কৃতার্থ হওয়া কর্ত্তব্য।

ঘোষের ডায়েরী—কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। সুন্দর কাগজে, নূতন অক্ষরে, ঝক্‌ঝকে কালীতে তক্‌তকে করিয়া ছাপান। প্রচ্ছদপট অতি সুন্দর। অনেক জানিবার জিনিষও এর সঙ্গে আছে। যাঁরা ডায়েরী ব্যবহার করেন, তাঁরা ঘোষের ডায়েরী ব্যবহারে নিশ্চয়ই পরিতুষ্ট হইবেন। কেননা, বাজারে অনেক রকম থাকিলেও—এ রকমটি নাই বলিয়া মনে হয়। দাম চারি আনা হইতে এক টাকা পর্য্যন্ত আছে।

সরস্বতী।

শ্রীপঞ্চমী।

চারু সিতাধরে কিবা স্মিত হাসি,
সিত-পদ্মাসীনা পদে ফুল্লরাশি ;
নমি পদযুগে বাণী বীণাপাণি.—
রাজ হৃদি-শতদল-দলে রাণী।

আ'জ শ্রীপঞ্চমী। বঙ্গের প্রীতি-সমুজ্জ্বল গৃহদ্বারে নবীন অতিথি বসন্তলক্ষ্মীর সমাগম। তাই.—

বঙ্গরঙ্গ-নিকেতনে তুমি আসিয়াছ রাণী
ফলফুলে ধনধান্যে হাসিছে ধরণীখানি
পুলকে শিহরি উঠে প্রাণ।

তবে এস মা শ্বেতাব্জ-বাসিনী ভারতি! দেখ, তোমার আগমনে কুসুম-কুন্তলা পল্লীরাণী আ'জ পুলক-বিবশা—আনন্দ-বিভোরা। দেখ মা! হরিত সরিষাক্ষেত্রে, বিকশিত-ইন্দিবর-নিকরে, সুনির্ম্মলনীলাকাশে কি এক অনির্ব্বচনীয় সুষমা। জলে, স্থলে, ব্যোমে কি এক আনন্দ-রাগিণী। তোমার চরণ-স্পর্শে বনরাজি-নীলা বঙ্গভূমি আ'জ হর্ষমগ্না—সজীবতাময়ী।

সুনীল-বিমান-প্রান্তে তোমারি মধুর হাসি,
সবুজ প্রান্তরে কত উছলিত প্রীতিরাশি।
বসন্ত-প্রসূন-পুঞ্জে গুঞ্জে মত্ত অলিদল,
মন্দ মন্দ গন্ধবহ বহে পুষ্প-পরিমল!
শ্বেত বলাকার পাঁতি নীলনীলিমার গায়,
তটিনীর নীলজলে রবিকর মূরছায়।

জননি! প্রকৃতি-দেবী তোমার আগমনে তরুবৃন্দকে পাটল নবকিসলয়ে সাজাইয়া দিয়াছে! জয়ন্তী, যূথিকা, বেলা, হেনা প্রভৃতি কুসুম-নিকর প্রস্ফুটিত হইয়া তোমার চরণ-স্পর্শে কৃতার্থ হইবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইতেছে। মুকুলিত চূতশাখী হইতে পিকবর পঞ্চমে ঝঙ্কার তুলিয়া তোমায় অভিনন্দিত করিতেছে। আর মৃদুমন্দ গন্ধবহ আম্রমুকুলের গন্ধ তোমার চরণ-তলে অঞ্জলি দিয়া ধন্য হইতেছে।

দেবি! পুষ্পভারাবনত কাঞ্চন-বৃক্ষে সমবেত কমকণ্ঠ বিহঙ্গমণ্ডলী কেমন সুমধুর কলরব করিতেছে। অনলস গ্রাম্যবালদল অনাবৃত শ্যামল শষ্পাসনে কেমন ছুটাছুটি করিতেছে। আর ছোট ছোট মেয়েগুলি সবুজ, ফিরোজা, বাসন্তী রঙের রঙিন শাড়ী পরিয়া বনদেবীর ন্যায় অঞ্চল ভরিয়া কত পুষ্প চয়ন করিতেছে।

হিম-প্রপীড়িত-নরনারীগণ তোমার আগমনে আ'জ কেমন সজীব! কেমন উল্লসিত!

প্রফুল্লচিত্ত কৃষককুল কেমন হর্ষোৎফুল্ল ! লাজশীলা পল্লি-বধূগণ কেমন হাস্যময়ী ! মাঠে, ঘাটে, বাটে কি এক নবীন মধুরিমা ! পৃথিবী কত সুন্দর—কেমন কবিত্বময়।

তুমি আসিয়াছ তাই এত শোভাময় ক্ষিতি,
ফুলের এমন হাসি পাখীর এমন গীতি।
দিগ্‌বধূ ফুলসাজে সাজিয়াছে ফুলরাণী,
হরিত প্রান্তরে তার বিছায়ে আঁচলখানি।
শ্যাম বিটপীর আড়ে আকাশ পড়েছে নুমে,
গাঢ়-নীল-নীলিমায় হেমবসুন্ধরা চুমে।
আকাশে বাতাসে, এক উঠিছে মধুরতান,
কত স্নিগ্ধ, কত শান্ত, কি করুণ কি মহান্।

মাতঃ ! তোমার চরণস্থিত অলক্তরেখাবৎ অপরাহ্ন-রবির রক্তরাগময় ম্লানরশ্মি তটিনীর স্বচ্ছ নীলাভ জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া, কি এক অভূতপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের বিস্তার করিয়াছে। প্রান্তরস্থ বেগুনী রঙের কলাইসুটির ফুলগুলি রৌদ্রের সোণালি আভায় ঝিকমিক্ করিতেছে। আর গোধূলি-ধূলি-ধূসর শ্যামতরুশ্রেণী মন্তমলয়-মারুতান্দোলনে তোমার চরণোদ্দেশে বারবার প্রণিপাত করিতেছে।

"There's a dance of leaves in that
aspen bower,
There's a titter of winds in that
beechen tree,
There's a smile on the fruit,
and a smile on the flower,
And a laugh from the brook
that runs to the Sea."

আবার ঐ দেখ ! সুদূর দিকচক্রবালে—বাসন্তী শুক্লা পঞ্চমীর রজতচন্দ্রিকা ধীরে ধীরে সমুদিত হইয়া নিশিসীমন্তিনীর ভালে কি অপূর্ব্ব শোভার সৃষ্টি করিতেছে। আর,—

জননী উঠিছে তোমারি নামে গান
নিখাদে তুলিয়া কিবা তান।
বঙ্গাঙ্গ-নিকেতনে তুমি আসিয়াছ রাণী
ফলে ফুলে ধনে ধান্যে হাসিছে ধরণীখানি—
পুলকে শিহরি উঠে প্রাণ।
সাজায়ে মঙ্গলসাজি প্রীতিপুষ্প পরিমলে
সযতনে সন্ধ্যাসতী অরপিছে পদমূলে
যত পাপ-তাপ আজি ম্লান।

শ্রীমন্মথনাথ বিশ্বাস।

কন্যাদায়।

বর্ত্তমান বাঙলায় যতগুলি দায় বিদ্যমান, কন্যাদায় বোধ হয় তাহাদের মধ্যে প্রথমতম ও প্রধানতম দায়। এবং ইহার আলোচনা করা প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য।

মহাজনের দায়, সুদের দায়, রোগের দায়, পেটের দায়, অনেক দায়ই বাঙলায় আছে, এবং সেগুলা দেশ-বিশেষে স্থান-বিশেষেই হয়ত সীমাবদ্ধ। এমনও অনেক স্থান আছে, যেখানে অনেক মহাজন খাতকের উপর কিঞ্চিৎ করুণাও করেন। গরিব প্রজাকে বাঁচাইয়া তাঁহার প্রাপ্য আদায় করিয়া লয়েন, অনেক স্থানে ম্যালেরিয়াও হয়ত নাই। পেটের দায়ও হয় ত ততটা নাই।

কিন্তু এ কন্যাদায় যে সারাবঙ্গ জুড়িয়া। প্রকৃতির নিয়মে, বাঙলার জল-বাতাসের অতি উষ্ণতায় জন্মদানেরও অভাব নাই, কন্যারও অভাব নাই। ব্রাহ্মণ-কায়স্থাদি-ঘরে যাহার অতি সামান্য মাত্রও সংস্থান আছে, সেও বিবাহ করিয়া এক শিশুপল্টনের অধিকারী; বোধ হয় যতগুলি পুত্র ততগুলিই কন্যা। ঘরে আহার্য্যের সম্পূর্ণ অভাব, তবু পুত্র কন্যার অসদ্ভাব নাই। যে গুলি জন্মিয়াছে, তাহাদেরই ভরণ-পোষণ দায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তবু বৎসর বৎসর সন্তান জন্ম-গ্রহণ করিতেছে। তাহার উপর উপর্য্যুপরি কেবল যদি কন্যা সন্তানই দেখা দেয়, তবে ত আর কথাই নাই। পিতার মনে হয় যেন তিনি কোন দুর্গ্রহের কোপ-দৃষ্টিতেই পড়িয়াছেন। গ্রহশান্তি করিবার জন্য কত স্থলে কত গ্রহাচার্য্যেরও আমন্ত্রণ পড়িয়া যায়। হায়! এ বঙ্গ-সংসারে পুত্রই মাত্র সন্তান। কন্যাসন্তান সন্তানই নয়। সে চক্ষের বালি ভবিষ্যতের মৃত্যুজাল! কারণ তাহার বিবাহে যে গলায় দড়ি পড়িবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে; এমন যে স্নেহের প্রতিমা মা তাঁরও বক্ষ কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া শুকাইয়া যায়; যাই হোক, দেশে শিক্ষার নিতান্ত অভাব থাকিলে হয় ত ধরিয়া লইতে পারিতাম, এরূপ ব্যাপার হওয়া স্বাভাবিক, কারণ শিক্ষার অভাবই দেশে সর্ব্ব প্রকার দুর্গতির সঞ্চার করে। কিন্তু এই যে ব্যাপার, এই যে কন্যা-সম্প্রদান যজ্ঞ, ইহাতে দেখা যায় অশিক্ষিত অপেক্ষা শিক্ষিত সম্প্রদায়েই তাহার দানবী-লীলা শতধারে প্রবাহিত করিয়া যাইতেছে, প্রতিদিন ঘরে ঘরে কত গৃহস্থের সর্ব্বনাশ হইয়া যাইতেছে, কে তাহার সংখ্যা নির্ণয় করিবে?

ইহার জন্য আলোচনাও হইয়াছে—ঢের, সভা-সমিতিও হইয়াছে বিস্তর। বলিদানের মত নাটকও প্রণীত হইয়া অভিনীত হইতেছে,—কিন্তু ফলে কি হইতেছে?

দুই একটা খবরের কাগজের সংবাদ-স্তম্ভে দেখা যায়, অমুক পিতা অমুক কন্যার সহিত বিনাপণে পুত্রের বিবাহ দিলেন, বস্ ঐ পর্য্যন্ত! সমুদ্রে শিশির-বিন্দুবৎ দুই একটি আশার বাণীতে দেশ কি নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে? ভীষ্মের মত যেখানে পিপাসা, সামান্য ভৃঙ্গারের বারিতে সেখানে কি করিবে? চাই যে সমস্ত দেশবাসীর একসূত্রে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হওয়া। সকলে একত্র ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত হওয়া.—আমরা অনেক সময় সমাজের সামান্য রকমও খুঁটী-নাটীতে শাস্ত্রকরদের দোষ দিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া থাকি, শাস্ত্রকরগণ বিধি-নিষেধের পাকে আমাদের মর্ম্মে মর্ম্মে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিয়াছেন। আমাদের পাশ কাটাইবার কোন উপায় নাই। কিন্তু নূতন এই যে ২০।২৫ বৎসরের পাশ যা আমাদেরই স্বকৃত—এই যে পুত্র-বিবাহে পণগ্রহণ-প্রথা, ইহাত ইচ্ছা করিলে আমরাই ইহার নিরাকরণ করিতে পারি, কিন্তু সে প্রবৃত্তি কোথায়? এমন সস্তায় এত বড় একটা লাভের ব্যাপার, মানুষ সে কি সহজে ত্যাগ করিতে পারে? ইহাতে কোন হিসাব নিকাশের প্রয়োজন নাই, কোন মূলধনের আবশ্যকতা নাই; শুধু একটি কথা “টাকা দাও নহিলে পুত্র দিব না” আর বাঙলার রীতি এই যে টাকা থাক না থাক, ভিক্ষা করিয়াও কন্যার বিবাহ দিতে হইবে। কন্যা অবিবাহিত রাখা চলিবে না। কাজেই বাধ্য হইয়া কন্যার পিতাকে সর্ব্বস্ব একধারে ও কন্যাকে একধারে করিতে হয়।

এই রকম প্রতিদিন যদি আমরা ধ্বংসের পথই বাড়াইয়া চলিতে থাকি, তবে বাঙলার মধ্যবিত্ত সংসারগুলির পরমায়ু আর কয় দিন?

আমরা সাধারণ চক্ষে হয় ত ধরিতে পারিব না, ইহাতে কার কতটা অনিষ্ট হইতেছে। অঙ্কের খাতায় হয় ত জমাখরচ সমানই দেখিতে পাওয়া যাইবে, যেমন কন্যার বিবাহে খরচ হইতেছে, তেমনি পুত্রের বিবাহেতে আবার পাওনা হইতেছে, তবে অমিলটা কোথায়? বাহিরের জগত যেন তাই বুঝিল—কিন্তু—যে পিতার কন্যা বই—পুত্র-সন্তান নাই, সেখানকার দুর্দ্দশা কে ঘুচাইবে?

সমাজ-সংসার নীরব। পরের ভাবনা ভাবিবার কাহারও প্রবৃত্তি নাই। পরের দিকে চাহিবারও কাহারও অবসর নাই।

একটা গল্প মনে পড়িতেছে, কোন দেশে এক সময়ে এক রাক্ষসী দেবীর আবির্ভাব হইয়াছিল ; দেবীর প্রত্যহই নররক্ত নরমাংস ব্যতীত তৃপ্তি হইত না। দেখিয়া শুনিয়া পুরোহিত ব্যবস্থা করিলেন, রোজ কেন পাঁচ দশটি মানুষের প্রাণহানি হয়? তার অপেক্ষা দেশের লোক পালা করিয়া প্রত্যেক বাড়ী হইতে প্রত্যেক দিন এক একটা নরবলি পাঠাইয়া দিক, দেশের লোকও তাহাতে সম্মতি দান করিল। ফলে প্রতিদিন এক এক গৃহস্থ হইতে কান্নার রোদন-ধ্বনি উঠিতে লাগিল। অথচ সেখানকার মানুষ সকল এতদূর ভীরু ও আত্মমগ্ন যে, কোন মতে সকলে এক হইয়া সেই রাক্ষসীর বিরুদ্ধে উঠিতে পারিল না। পার্শ্বের বাড়ীতে আসন্নবলীর ক্রন্দন ধ্বনি উঠিয়াছে, সে ধ্বনিতে পৃথিবী শুদ্ধ কম্পিত হইয়া যাইতেছে, তবু পার্শ্বের গৃহস্থ ভাবিতেছে যাই হোক আমার ত আজ পালা নয়। যে দিন পালা আসিবে, সেই দিন বোঝা যাইবে। আমাদের সমাজেরও আ'জ সেই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। সকলকেই এক দিন না একদিন পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে কন্যাদায়রূপ-যজ্ঞে বলি হইয়া দাঁড়াতেই হইবে। তবু কাহারও চেষ্টা আছে কি?

পণপ্রথা উঠাও, প্রস্তাব করিলেই চারিদিক হইতে এই একটা উত্তর শুনিতে পাওয়া যায়—আগে সকলে উঠাক্, তারপর উঠাইব। সকলের মধ্যে তাহারাও যে এক একজন এ হুঁস যে দেশের নাই সে দেশের আবার শ্রেয়ো কোথায়?—

আবার এই ব্যাপারটী কেমন সংক্রামক ; প্রথম সমাজের উচ্চশ্রেণীতেই ইহার প্রসার ছিল। ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি সম্প্রদায়ে ইহার বিভৎস কাণ্ড চলিত, দেখা দেখি সমাজের নিম্নতম শ্রেণীতে পর্য্যন্ত এ বিষ সঞ্চারিত হইয়াছে। আগে আমরাই দেখিয়াছি, নমঃশূদ্র, কৈবর্ত্ত গোপ প্রভৃতি শ্রেণীতে আদৌ বিবাহে টাকার দেনা-পাওনার কোন ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু কালের কি গতি! দু'চার বৎসরের মধ্যে সেই সমাজে ২০০।৫০০ হইতে ১০০০ পর্য্যন্তেরও অধিক ব্যবহার চলিয়া গিয়াছে, এখন তাহারাও টাকার ওজনে স্নেহ-প্রেমের নিরীখ করে!

অধম ডোম হাড়ী পর্য্যন্ত যাহাদের আজ খাইতে—কাল নাই, তাহারাও দর বাড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। শুনিয়াছি, তাহাদেরও এখন আর এক জালা পাচুই মদে বিবাহ হয় না। ভিটে-ভাটা বেচিয়া তাহাদেরও কিছু সংগ্রহ করিতে হয়।"

সমস্ত বঙ্গ-সংসারটা যেন একটা কেনা-বেচার কসাইখানায় দাঁড়াইয়া গিয়াছে! সেখানে মানুষের মুখের দিকে মানুষ চাহে না, টাকার ওজনে মনুষ্যত্বের দর কষা চলিতেছে।

এখন এ বিষয়ে বাঙলার শিক্ষিত যুবকবৃন্দই মাত্র ভরসা-স্থল। উঁহারাই যদি স্বেচ্ছায় দয়া-ধর্ম্ম-প্রণোদিত হইয়া বাঙলার অভাগা কন্যাদায়-গ্রস্ত-পিতৃকুলকে রক্ষা করেন, তবেই একটা গতি হয়, নহিলে অন্যগতিত আর দেখি না! তাহাতে তাঁহাদের পিতা মাতার মুখের দিকে চাহিলে চলিবে না। তাঁহারা ত বলিবেনই কন্যার পিতা যখন, তখন তাঁহার কাছ হইতে টাকা আদায় করিবই, কিন্তু পুত্র যদি জোড়হাত করিয়া বলে, পীড়ন করিয়া ভাবী শ্বশুরের কাছ হইতে এক পয়সা লইব না। তখন হয়ত তখনকার মত পিতা-পুত্রের মধ্যে সামান্য রকম একটু মন কষাকষি চলিতে পারে, কিন্তু পরিণামে ইহার পরম মঙ্গল আশীর্ব্বাদে পিতা-মাতা সকলকেই শান্তভাব অবলম্বন করিতেই হইবে।

একজন দায়গ্রস্ত বক্ষের পঞ্জর ভাঙিয়া যে অর্থ প্রদান করিবে, আর এক জন সাগ্রহে তাহাই হাত পাতিয়া লইয়া সুখের হাট পাতাইবার আয়োজন করিবে।

অমঙ্গল দিয়া মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা? দীর্ঘশ্বাসের উপর স্বর্গ-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন, ইহাও কি কখন সম্ভবপর হইতে পারে?

মানুষ হইয়া মনুষ্যত্ব না থাকিলে চলিবে কেন? মানুষ হইয়া মানুষকে অনর্থক বিপজ্জালে জড়ীভূত করা, ইহা কি কোন দেশের কোন সমাজের ন্যায়ানুমোদিত মত? বোধ হয় নিতান্ত অসভ্য সমাজও এ রাক্ষসী-নীতি দূষণীয় বলিয়া মনে করে।

আর সভ্য বঙ্গীয়সমাজ! ছিঃ বাঙালী—হিন্দুর এ কলঙ্ক রাখিবার স্থান নাই।

শ্রীশ্রীপতিমোহন ঘোষ।

লবণের উপকারিতা

লবণ প্রায় সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। ইহা কেবলই যে ভূমি ও জলের সহিত বিবিধ প্রকারে মিশ্রিত হইয়া থাকে তাহা নহে ; জন্তুদিগের দেহাভ্যন্তরেও থাকে। একটি কথা প্রচলিত আছে যে, যে মনুষ্যের ওজন পঁয়ত্রিশ সের হইতে একমণ হইবে, তাহার শরীরাভ্যন্তরে অন্ততঃ আধ আধসের লবণ থাকিবে। বিশেষতঃ যে সকল জন্তুর মাংস খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়, সেই সকল জন্তুর দেহের ভিতর লবণ যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান আছে। বাস্তবিক পক্ষে পৃথিবী এক বৃহৎ লবণাগার।

এখন দেখা যাউক, কোন্ কোন্ মূল পদার্থ হইতে অধিক পরিমাণে লবণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। লবণের মূল উৎপত্তিস্থান দুইটি যথা—স্থল ও জল।

(১) স্থলে—লবণ-পাহাড়, লবণ-আকর, লবণ-ক্ষেত্র এবং আগ্নেয়পর্ব্বত হইতে লবণের উৎপত্তি।

(২) জলে—লবণ-হ্রদ, লবণ-উৎস ও সমুদ্র প্রভৃতি লবণের মূল উৎপত্তিস্থান।

লবণ-পাহাড়—ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমে পাঞ্জাবের দিকে লবণপাহাড় দৃষ্ট হয়। এই সকল লবণপাহাড় হইতে প্রতি বৎসর প্রায় ৫০০০০ হাজার টন লবণ উত্থিত হয়।

লবণ-আকর—লবণাকর ভারতবর্ষে দেখিতে পাওয়া যায় না। পোলাণ্ডে একটি বৃহৎ লবণাকর আছে। সেটী প্রায় এক মাইল লম্বা এবং লবণ কাটিয়া এস্থানে সহর, রাস্তা ও গৃহ তৈয়ারী করা হইয়াছে। যখন এই আকরটী আলোকমালায় সুশোভিত হয়, তখন লবণের শ্বেত-প্রাচীর-গাত্রে আলোকরশ্মি পতিত হওয়ায় অপরূপ শোভার আবির্ভাব হয়।

লবণক্ষেত্র—পাঞ্জাবে কতিপয় লবণক্ষেত্র আছে, উত্তর পশ্চিম প্রদেশে তদপেক্ষা বেশী এবং উত্তর বিহার প্রদেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে লবণক্ষেত্র দৃষ্ট হয়। সেই সকল লবণক্ষেত্রগুলিকে "উষার" নামে অভিহিত করা হইয়াছে। প্রবলবেগে এক পশলা বৃষ্টি হইবার পর, কোন কোন ক্ষেত্রে এক প্রকার শ্বেত চূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়, যে জমিতে এই চূর্ণগুলি দৃষ্ট হয়, সেই গুলি চাঁচিয়া একত্র করিয়া একটি পাত্রে রক্ষিত করিবার পর,

তাহার মধ্য হইতে জল বহিষ্কৃত করিয়া লওয়া হয়। জলশোধকের মধ্য হইতে যে জল ফোঁটা ফোঁটা পড়ে, তাহা কোন পাত্রে সিদ্ধ করিয়া সেই জলের সহিত সোরা নামক এক প্রকার লবণজাতীয় দ্রব্য মিশ্রিত করিলে লবণ উৎপন্ন হয়। পশ্চিমদেশে লুনিয়া বা "নুলিয়া" নামক এক প্রকার জাতি আছে; তাহারা এই প্রকার ভূমি হইতে লবণ ও সোরা প্রস্তুত করে।

আগ্নেয়গিরি—আগ্নেয়গিরির শিখর হইতে গলিত প্রস্তর এবং আরও নানা প্রকার দ্রব্য বহির্গত হয়। অগ্ন্যুৎগমনের পর পর্ব্বতের পার্শ্বে যে সকল গর্ত্ত ও ফাটল থাকে, বিশেষতঃ যেগুলি মুখের সন্নিকটে অবস্থিত, তাহা গাঢ় লবণস্তরে আবৃত হয়। লুনিয়ারা জমির উপরিভাগে যেরূপে ক্ষুদ্র পাত্রে লবণ প্রস্তুত করে, হয়ত সেইরূপে পৃথিবীর নিম্নভাগে এক প্রকার বৃহৎপাত্রে প্রকৃতি হইতে এইরূপ লবণ প্রস্তুত হয়। ভারতবর্ষে আগ্নেয় পর্ব্বত নাই।

এখন জলে যে লবণহ্রদ, লবণ-উৎস, সাগর ও সমুদ্র প্রভৃতি যে সকল লবণের উৎপত্তি স্থান আছে, তাহাই পরীক্ষা করা যাউক। বাষ্পে পরিণতি-রূপ পদ্ধতি দ্বারা উপরোক্ত উৎপত্তি-স্থান হইতে লবণ উৎপন্ন করা হয়। কিন্তু এই পদ্ধতি কি? একটি পাত্রে কিঞ্চিৎ জল রাখিয়া তাহা সূর্য্য-রশ্মিতে স্থাপন করিলে, কিয়ৎক্ষণ পরে, জল শুষ্ক হইয়া যায় এবং আর জল দেখিতে পাওয়া যায় না, ইহাকেই "বাষ্পে পরিণতি" কহে। জল, সূর্য্যের উত্তাপে বাষ্প ও জলকণায় পরিবর্ত্তিত হয়; সে কণাগুলি এত সূক্ষ্ম যে তাহা দেখিতে বা অনুভব করিতে পারা যায় না; বাস্তবিক পক্ষে জল বায়ুতে মিশিয়া যায়। কিন্তু, মনে করুন, লবণের মত, কোন কঠিন পদার্থ অথবা কর্দ্দমের সহিত জল মিশ্রিত করা হইল। তাহা হইলে কি হয়? জল অদৃশ্য হইয়া যায় এবং কর্দ্দমাংশ পাত্রের তলদেশে পতিত হইয়া থাকে। এই পদ্ধতি অনুসারেই জল হইতে লবণের উৎপত্তি। যে জলে লবণ থাকে তাহা কোন পাত্রে স্থাপন করিয়া যে পর্য্যন্ত জল না শুষ্ক হয়, সে পর্য্যন্ত সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে উত্তপ্ত করিলে লবণাংশ ব্যতীত আর কিছুই থাকে না।

লবণহ্রদ—এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যভাগে "কাস্পিয়ান সাগর" নামক একটি প্রকাণ্ড লবণ-সাগর আছে। এটিকে সাগরাপেক্ষা হ্রদ বলাই শ্রেয়; কারণ ইহা চতুর্দ্দিকে স্থলদ্বারা বেষ্টিত। ইহার বৃহৎ আকার ও ইহার জল নির্ম্মল নহে এবং লবণাক্ত হেতু ইহাকে সাগর বলা হয়। রাজপুতানায় চারিবর্গ ক্রোশ বিস্তৃত "সম্বরহ্রদ" নামক একটি বৃহৎ লবণ-হ্রদ আছে।

ইহা মানচিত্রে আরাবল্লী পর্ব্বতের পাদদেশে এবং আজমীরের কিঞ্চিৎ উত্তরে চিহ্নিত আছে।

লবণ-উৎস—আমাদের দেশে লবণ-উৎস দৃষ্ট হয় না; কিন্তু ইংলণ্ডে প্রচুর পরিমাণে আছে। কিন্তু বঙ্গদেশে যে সকল স্থান সমুদ্রের অনতিদূরে অবস্থিত, সেই সকল স্থানের কূপের জল কিঞ্চিৎ লবণাক্ত। ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, কূপের তলদেশে যে উৎস আছে, তাহা ভূমির নীচে লবণাক্ত স্তরের সহিত মিশ্রিত। এই সকল কূপে যে পরিমাণে লবণ আছে তাহা কেবল জলের কিঞ্চিৎ অপ্রীতিকর আস্বাদ সম্পাদন করিতেই সক্ষম কিন্তু ইহা হইতে লবণ বাহির করিবার যোগ্যানুরূপ নহে।

সমুদ্র—সমুদ্র লবণের একটি বৃহৎ ভাণ্ডার-গৃহ; কারণ পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশই সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং সমুদ্রের জল প্রচুর পরিমাণে লবণাক্ত। ভারতবর্ষের উপকূলে প্রায় সর্ব্বত্রই বাষ্পে পরিণতি দ্বারা লবণ প্রস্তুত হয়। কিন্তু গুজরাট ও করোমণ্ডেল উপকূলেই ইহার প্রধান কেন্দ্র-স্থল।

উৎপত্তি-স্থান নির্দ্দেশ করা সমাধা হইল। এক্ষণে লবণের উপকারিতা ও ব্যবহার সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিতে চাই।

লবণ চারি প্রকারে ব্যবহৃত হয়। যথা—আমাদের খাদ্যরূপে, পশু-দিগের খাদ্যরূপে, মাংস পচন হইতে রক্ষা করিতে এবং জমিতে সার দিতে লবণ ব্যবহৃত হয়।

মানবের শরীর লবণ ব্যতীত সুস্থ ও বলিষ্ঠ হইতে পারে না। যদি মনুষ্য লবণ না খায়, তবে দেহের মাংস নষ্ট হইয়া যায়, মস্তকের কেশরাশি খসিয়া পড়ে, চক্ষুর দৃষ্টি ক্ষীণ হয়, হাড় নরম হইয়া যায় এবং সমস্ত অঙ্গ শিথিল হইয়া পড়ে।

আমাদের দেশের কৃষকগণ সাধারণতঃ দরিদ্র। তাহাদের অদৃষ্টে জন্তুর মাংস ভক্ষণ ঘটিয়া উঠে না, তন্নিমিত্ত তাহাদিগের লবণ ভক্ষণ করা প্রাণধারণের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যকীয় এবং ভগবান্ বোধ হয়, সেই জন্যই ভারতবর্ষ লবণাধিক্য দেশরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, গো মহিষাদি জন্তুর মাংস কিঞ্চিৎ লবণ-যুক্ত, কিন্তু তাহাদিগের দেহ সতেজ করিবার নিমিত্ত লবণের প্রয়োজন। বন্য পশু, গৃহপালিত পশু বস্তুতঃ প্রত্যেক শস্যজীবী জন্তু, কেবল লবণ-প্রিয় নহে, কিন্তু ইহা ব্যতীত তাহাদের শরীর সতেজে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে না। বিশেষতঃ মেষদিগের

খাদ্যের সহিত লবণের প্রয়োজন। ইংলণ্ডে যে সকল স্থানে লবণ-উৎস আছে, তৎসমুদায় স্থানের মেষগুলি অনেক দূর হইতে আসিয়া লবণ উৎসের জল পান করে।

মাংসে লবণ না মাখাইয়া রাখিলে শীঘ্রই পচিয়া যায়, কিন্তু মাংসে ইহা মাখাইয়া রাখিলে কয়েক দিন পর্য্যন্ত বেশ তাজা থাকে। ক্ষেত্রে সার দিবার পক্ষে লবণ একটি উত্তম জিনিস। আমাদের দেশের কৃষকেরা ক্ষেত্রে সার দিবার নিমিত্ত লবণ ব্যবহার করিয়া থাকে। নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষেও লবণের সার দেওয়া হয়। আমাদের দেশে লবণ অতি সুলভ কিন্তু আফ্রিকার মধ্যভাগে ইহার মূল্য অত্যন্ত অধিক।

বিশুদ্ধ লবণ শ্বেতবর্ণ, জারক ও অতি সহজে ভাঙ্গিয়া যায়; ইহা অধিক উত্তাপে দ্রবীভূত হয়, ইহার স্বভাবসিদ্ধ আস্বাদ আছে, লবণ ব্যতিরেকে মানবের একদিনও চলে না। যাহারা বিশ্বাসী, তাহাদিগকে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে নিমক্‌হালাল্‌ ও অবিশ্বাসীকে "নিমকহারাম" কহে।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী।

মৃত্যু ও ব্যথিত।

ধনে, মানে, ব্যথিত যে জন—
সৌভাগ্যের সুখময়-দ্বারে,
হে মরণ, অন্তিমের শেষ—
তুমিই সান্ত্বনা দাও তারে?
ধনীর যথেচ্ছাচার সহি,
ধন-গর্ব্বে হয়ে জ্বালাতন,—
পর-পদ সতত সেবিয়া,—
যবে তোমা করয়ে স্মরণ।
—"এই দিন না রহিবে কভু:
সবই শেষে করিব সমান।"—
ব্যথিতেরে কহি এই কথা—
অসময়ে কর শান্তি দান।

শ্রীজগৎপ্রসন্ন র

একখানি পল্লীর ইতিবৃত্ত।

কালচক্রের প্রতিপলক আবর্ত্তনে এই বিশাল বিশ্বের কোন অংশে কতটুকু পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে, তাহার নির্ণয় করা অসাধ্য। আজ যেখানে উচ্চচূড় পর্ব্বত-শিখর অভ্ররাশি ভেদ করিয়া গগন স্পর্শ করিতেছে, সেই স্থানে একদিন বিশাল জলধির উত্তাল-তরঙ্গমালা প্রবাহিত হইত কিনা কে তাহার উত্তর প্রদানে সক্ষম হইবে? এ বিষয়ে ঐতিহাসিক নিরূপণ অতিক্ষুদ্র, অতি স্থূল অনন্তের এক কণিকামাত্রও নহে। অনন্ত সৃষ্টির প্রতিপলক আবর্ত্তন নিবর্ত্তন লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে, এরূপ ঐতিহাসিক ইতিহাস-জগতে কেহ নাই, একথা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে। সেই জন্যই এই জগতের অতিস্থূলতম লক্ষ্যস্থল নগরগুলির ঐতিহাসিক বিবরণ ইতিহাসকারগণ যথা-সাধ্য নির্ণয় করিয়াছেন। তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর গ্রামসমূহের তথ্য ও কথঞ্চিন্মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে বা হইতেছে; কিন্তু সূক্ষ্মতম বিজন প্রান্তর বা নিবিড় অরণ্যানীর অভ্যন্তরে যেখানে যে ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত আছে, অদ্যাপি তাহার বিশেষ অনুসন্ধান হয় নাই। তবে আশা করা যায় যে, কালক্রমে ঐতিহাসিকগণের অসীম অধ্যবসায়ে এবং অসংখ্য অনুসন্ধানে জগতের অধি-কাংশ নিহিত তথ্যই প্রকাশিত হইবে।

বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আমি যে স্থানের কথা উল্লেখ করিতেছি, ইহা রাজসাহী জেলায় নওগাঁ মহকুমার অন্তর্গত একখানি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম। আত্রাই রেলষ্টেশন হইতে পাঁচ মাইল পূর্ব্বদিকে আত্রেয়ী নদী হইতে চারি মাইল পূর্ব্বোত্তর কোণে অবস্থিত।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই স্থানে সুদূরব্যাপী নিবিড় অরণ্যানী ছিল। বিস্তৃত ধান্যক্ষেত্র-পরিবৃত এই অরণ্যের মধ্যে কোন দিন কোনও রূপে জনসমাগম হইত না। কৃষকগণ দিবাভাগে এই অরণ্যপ্রান্তস্থ ক্ষেত্রের কর্ষণাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া চলিয়া যাইত। এই সার্দ্ধ ক্রোশ বিস্তৃত অরণ্য কেবল শ্বাপদকুলের আবাসভূমি বলিয়াই সাধারণের বিশ্বাস ছিল। এই জন্যই সম্ভবতঃ ইহার আভ্যন্তরিক অনুসন্ধিৎসা কাহারও অন্তঃকরণে জাগরিত হয় নাই।

এই সময়ে ভবানন্দ লাহিড়ী নামক একব্যক্তি নোকোইড় গ্রাম হইতে এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। উক্তগ্রাম পূর্ব্বাঞ্চলে অবস্থিত। কোন্ জেলার অন্তর্গত তাহা জানা যায় নাই। ভবানন্দ লাহিড়ী গৃহ-কলহে সংসারের প্রতি

বীতশ্রদ্ধ হইয়া, ঈশ্বর-আরাধনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন এবং উপাসনার উপযোগী নির্জ্জন স্থানের অনুসন্ধানে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কথিত আছে, 'ধর্ম্ম যাহার অবলম্বন—ঈশ্বর তাহার সহায়' একথার সার্থকতা আমরা অনেক সময় সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারি না; কারণ ঈশ্বরের প্রতি একান্ত নির্ভর করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই, কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীয় জনসমাজের ঈশ্বরের প্রতি যেরূপ প্রগাঢ় ভক্তি ছিল জানা যায়, তাহাতে তাহাদের পক্ষে ইহার যাথার্থ্য অনুভব করা সম্পূর্ণ সম্ভব ছিল। এই জন্যই ধর্ম্মপ্রাণ সাধক ভবানন্দ লাহিড়ী নির্ভীক চিত্তে এই শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি এই অরণ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া নয়টী দেউল (প্রাচীর) পরিবেষ্টিত অর্দ্ধবিধ্বস্ত অবস্থায় একটী শিবমন্দির দেখিতে পাইলেন। অশ্বত্থবৃক্ষ-সমাচ্ছন্ন সেই জীর্ণ মন্দির-মধ্যে তিনটি শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। নির্জ্জন অরণ্যের অভ্যন্তরে এই প্রাচীন ধর্ম্মানুষ্ঠান দেখিয়া ভক্তের প্রাণে ভক্তির বীণা বাজিয়া উঠিল। তিনি আনন্দাশ্রু-পরিপ্লুত নেত্রে নিস্তব্ধ অরণ্য প্রকম্পিত করিয়া, দেবাদিদেব মহেশ্বরের স্তোত্রাবলী পাঠ করিতে লাগিলেন। সংসারের অসহ্য যাতনায় ভোগলিপ্সা তাঁহার অন্তর হইতে দূরীভূত হইয়াছিল, এই অরণ্যস্থ ফলমূল তিনি জীবন-ধারণের যথেষ্ট উপকরণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই জীর্ণ মন্দিরাধিষ্ঠিত শিবলিঙ্গত্রয় কোন্ সময় কাহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা জানিবার কোনও উপায় নাই। এই মহাপুরুষের বর্ত্তমান বংশধরগণের অযত্নে সে সমুদয় তত্ত্ব অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে।

এই অবস্থায় কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইলে রাজসাহী জেলাস্থ চৌগ্রামের বর্ত্তমান রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ অনুচরগণ সমভিব্যাহারে বৈদ্যনাথ যাইবার পথে এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। তখন বঙ্গদেশে এরূপ রেলপথের বিস্তার হয় নাই; সুতরাং তিনি হস্তী অথবা শিবিকা-যোগে যাইতেছিলেন, এইরূপ অনুমান করা যায়। চৌগ্রামাধিপতি এই অরণ্যপ্রান্তে অনুচরগণ পরিবৃত হইয়া বিশ্রাম করিতে করিতে অরণ্যের অভ্যন্তর হইতে প্রশান্ত কণ্ঠে শিবস্তোত্র পাঠ শুনিতে পাইলেন। ভক্তের ভক্তি গদ্‌গদ কণ্ঠস্বর অরণ্যস্থল অতিক্রম করিয়া প্রান্তরে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। ঈশ্বর-পরায়ণ চৌগ্রামাধিপতির মর্ম্মে মর্ম্মে সেই স্বর প্রবেশ করিয়া অপূর্ব্ব ভক্তি-রসের

সঞ্চার করিয়া দিল। তিনি তন্ময় চিত্তে সেই স্তোত্রাবলী শ্রবণ করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ বিজন অরণ্যের নিস্তব্ধতা আবার ফিরিয়া আসিল। শিবস্তোত্রের অন্ত্য প্রতিধ্বনি আকাশ-মার্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া থামিয়া গেল। তখন তিনি অনুচরদিগকে সেই স্থানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া স্বয়ং অরণ্য-মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, সাধক স্বীয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়া মন্দিরপ্রান্তে দণ্ডায়মান আছেন। তিনি ভক্তিভরে মহেশ্বরকে এবং সেই মহাপুরুষকে প্রণাম করিলেন। অতঃপর মহাপুরুষের নাম ধাম প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার নিকটে জানিলেন যে, মন্দিরস্থ মহেশ্বরের পূজা ভোগ প্রভৃতি অনুষ্ঠেয় নিয়মগুলি সম্যক্‌রূপে প্রতিপালিত হয় না। ইহা শুনিয়া তাঁহার সেই সমস্ত অভাব দূর করিবার প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল হইল। তিনি চৌগ্রামে লোক পাঠাইয়া তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারীকে আদেশ করিলেন যে, অল্পদিনের মধ্যে এই অরণ্য সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া এইস্থানে জলাশয় খনন, জনপদ স্থাপন প্রভৃতি সম্পন্ন করিতে হইবে। এই বলিয়া তিনি বৈদ্যনাথ-যাত্রা করেন এবং সেখান হইতে প্রত্যাগমন করিয়া সেই জীর্ণ মন্দিরের সংস্কার করাইয়া তাহাতে শিবমূর্ত্তিত্রয় এবং কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই নিবিড় অরণ্য সে সময় স্বচ্ছতোয়া সরোবর, সুবিস্তৃত দীর্ঘিকা এবং শান্তিময় জনাবাসে পরিণত হইল। এই স্থানে নয়টি দেউল বেষ্টিত মন্দির ছিল, এই জন্য এই গ্রামের নামকরণ হইল নয়দেউলী। সেই শিবমূর্ত্তি প্রভৃতির পরিচর্য্যার নিমিত্ত ভবানন্দ লাহিড়ীকে এই নবপ্রতিষ্ঠিত গ্রাম এবং বার্ষিক এক সহস্র মুদ্রা আয়ের সম্পত্তি প্রদান করেন। ভবানন্দ লাহিড়ী এই সময় মিশ্র উপাধি গ্রহণ করিয়া, দেশ হইতে আত্মীয়গণকে এই স্থানে লইয়া আসেন। সম্ভবতঃ অদৃষ্টের এই শুভ অবসরে তাঁহার বাধাপ্রাপ্ত সংসার-স্পৃহা পুনরায় প্রত্যাগত হইয়াছিল। তিনি স্বীয় জমিদারীর তত্ত্বাবধান এবং প্রতিষ্ঠিত মহেশ্বরাদির পূজা প্রভৃতি কার্য্য স্বয়ং সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইলে তাহার তিনটি পুত্রসন্তান হয়। প্রথম শ্রীচরণ, দ্বিতীয় শিবচরণ এবং তৃতীয় লক্ষ্মীনারায়ণ নামে পরিচিত ছিল। অবশেষে উপযুক্ত পুত্রগণকে নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া ভবানন্দ লাহিড়ী ইহলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার উপযুক্ত পুত্রত্রয় পিতৃ-নির্দ্দেশক্রমে কেহ মহেশ্বরের অর্চ্চনা, কেহ জমিদারীর তত্ত্বাবধান এবং কেহ বা সাংসারিক কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়া, স্বীয় জমিদারীর উৎকর্ষ সাধন করেন। ইঁহারা

ব্রহ্মোত্তর প্রদান করিয়া নানা স্থান হইতে সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণদিগকে আনাইয়া এই স্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ক্রমশঃ এই নব প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র গ্রামখানি বহু সংখ্যক ভদ্রমণ্ডলীর আবাস-ভূমিতে পরিণত হইল। এই স্থানে নৈয়ায়িক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গদাধর ন্যায়রত্ন মহাশয় আসিয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত চতুষ্পাঠীতে দেশ-বিদেশ হইতে ব্রাহ্মণ এবং মহারাষ্ট্রীয়গণ আসিয়া বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে থাকে। পল্লীগ্রামের নিভৃত শান্তি সানুভূতি হিতৈষণা প্রভৃতিতে এই গ্রামখানি পূর্ণমাত্রায় ভূষিত ছিল। ভবানন্দ লাহিড়ীর পুত্রগণ এই নব অভ্যুত্থানে নবাব সরকারে পরিচিত হন। নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ তাঁহাদিগকে নিয়োগী উপাধি প্রদান করেন। তাহারা ভাগ্যলক্ষ্মীর পূর্ণ অনুগ্রহে এই ক্ষুদ্র পল্লীতে নিশ্চিন্তভাবে শান্তিসুখ অনুভব করিতে থাকেন।

কালচক্রের অখণ্ডনীয় নিয়ম কে লঙ্ঘন করিবে! এক্ষণে সেই শান্তিপূর্ণ নয়দেউলী গ্রামের পূর্ব্ব শ্রী অন্তর্হিত হইয়াছে। ভবানন্দ লাহিড়ী মহাশয়ের পরবর্ত্তী বংশধরগণ জ্ঞাতিবিচ্ছেদ প্রভৃতিতে পূর্ব্ব সম্পত্তির অল্পমাত্র অবশিষ্ট অংশের স্বত্বাধিকারী হইয়া কোনওরূপে কালাতিপাত করিতেছেন। গদাধর ন্যায়রত্নের বংশধরগণ এখনও এই স্থানেই আছেন। অন্যান্য ভদ্রমণ্ডলী এখান হইতে স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছেন। এখানকার পূর্ব্বশ্রীর মধ্যে সেই শিব ও কালিকা-মন্দিরের ভগ্নাবশেষে উক্ত মূর্ত্তি চতুষ্টয় প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে এখানে মহাসমারোহে সেই কালীমূর্ত্তির পূজা ও বাণোৎসব হইয়া থাকে। বহু দূর হইতে নরনারীগণ বিবিধ পীড়ামুক্তির আশায় এই স্থানে আসিয়া, কালীমূর্ত্তির নিকটে 'মানসিক' করিয়া থাকে। যাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ হয়, তাহারা মহিষ, ছাগ প্রভৃতি বলিদান পূর্ব্বক ভক্তিপূর্ণচিত্তে মহামায়ার অর্চ্চনা করিয়া যায়। পল্লীবাসী অশিক্ষিতা নরনারীর সরল ভক্তিতে মহামায়া যেন তাহাদের রক্ষয়িত্রীরূপে এই স্থানে বিদ্যমান আছেন। *

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

* ভবানন্দ লাহিড়ী মহাশয় তাঁহার জীবনের প্রধান ঘটনাগুলি স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন। তাহাতে এই পল্লী প্রতিষ্ঠাতা চৌগ্রামের তৎকালীক অধিপতির নাম প্রভৃতি বিশেষ আবশ্যকীয় বিষয়গুলি সন্নিবদ্ধ ছিল; কিন্তু তাঁহার বংশধরগণের জ্ঞাতিবিচ্ছেদের সময় সেই স্মারকলিপিখানি নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছে। যাঁহারা সেই লিপি পাঠ করিয়াছিলেন তাঁহাদের নিকট যতটুকু জানিতে পারিয়াছি তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট করিলাম।

লেখক।

খুকী।

(১)

চলিতে টলিয়া পড়ে, পড়িয়াই ওঠে ;
হাসিয়া কম্পিত-পদে পুনরায় ছোটে।
অপটু চলিতে নিজে,
তথাপি এ সাধ কি যে,
বুঝি না ও কচি বুক পূর্ণ কি আশায় ;
কোলে তুলে রাখে সদা খেলার খোকায়।

(২)

জননীর স্নেহ-উৎস হৃদয় হইতে,
যত স্নেহ পাইয়াছে খুকী এ মহীতে ;
উল্লাসে উৎফুল্ল প্রাণ,
তত স্নেহ করে দান.
খেলার খোকার প্রতি, ভাব-ভোলা মন,
মাটির খোকাটি তা'র প্রিয়তম ধন।

(৩)

কখন আদর ক'রে চুমো খায় মুখে.
কখন সোহাগ-ভরে চেপে ধরে বুকে।
কখন শাসিতে তা'রে,
কচি হাতে চড় মারে,
তখনি আদরে তা'র নয়ন মুছায় ;
স্তন দানে শান্ত করে খেলার খোকায়।

(৪)

ওদিকে খুকীর ঐ খেলাঘর পাতা,
আছে তথা হাঁড়ী, বেড়ী, বঁটি, শিল, যাঁতা।
রাঁধিয়া ধূলার ভাত,
খেতে দেয় পেতে পাত ;
লতা পাতা কুটে করে অপূর্ব্ব ব্যঞ্জন ;
আদরে সবায় ডাকে করিতে ভোজন।

(৫)

খাইতে না চাই যদি, হাসি মুখ তা'র ;
কি যেন চিন্তার ভারে হ'য়ে আসে ভার :
কাছে এসে বলে "সে কি,
দু'টি ভাত খাবে না কি ?"
জিজ্ঞাসে মধুর স্বরে, বুকে দিয়া হাত ;
"অসুখ হ'য়েছে, তাই খা'বে না'ক ভাত ?"

(৬)

অসুখের কথা শুনে, তাড়াতাড়ি ক'রে,
ঔষধ আনিতে যায় তা'র খেলাঘরে।
তখনি আসিয়া ফিরে,
কচি হাত ধীরে ধীরে,
যতনেতে বুকে, মুখে, ললাটে বুলায় ;
এক কথা শতবার শুনিবারে চায়।

(৭)

খুকী মা'র মনে কি এ পূর্ব্ব সংস্কার ?
কিম্বা ভাবী জীবনের শুভ সমাচার !
খুকীমা এসেছে ভবে,
সংসার পাতিবে কবে,
আজি তা'র হাতে খড়ি, দৃশ্য মনোরম ;
ভাবিয়া অবাক হই বিধির নিয়ম !

(৮)

অভ্যস্ত হইয়া থাক ; প্রবেশি সংসারে,
নিপীড়িতা হইও না কর্ত্তব্যের ভারে।
সতী-ধর্ম্মে রাখি' মন,
আপনাকে বিসর্জ্জন
করিও পরার্থে, স্বার্থ করিয়া প্রসার ;
মাতৃত্ব-গৌরব-গর্ব্ব দেখুক সংসার !

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বন্ধুর উপহার।

(গল্প)

(১)

আমাদের গ্রামের ধারের নদীটিকে খড়্‌গেশ্বরী বলে। নদীটি অনতি-সঙ্কীর্ণ—কাঁপিয়া কাঁপিয়া বহিয়া যাইতেছে। দুই পার্শ্বে শ্যামল উপকূল দূর্বামণ্ডিত। গ্রীষ্মের অপরাহ্নে মধুর সমীরণ বহিতেছে। অপরাহ্নের স্নিগ্ধ বায়ুতে তরঙ্গিণীর সেই শ্যাম উপকূলে আমি একাকী বিচরণ করিতেছিলাম।

খড়্‌গেশ্বরীর স্রোতের সহিত একখানি পান্‌সী বাহিয়া আসিতেছে কে ? যেন উহাদের একজনকে আমি চিনি। যেন উহাকে কোথায় দেখিয়াছি—যেন আলাপ করিয়াছি—যেন কখনও উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্যও জন্মিয়াছিল। এমন পরিচিত আকৃতি তথাপি কি যেন একটা প্রচ্ছন্নতা আসিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। যুবকের সহিত কথা কহি,—তাঁহার পরিচয় লই—এইরূপ চিন্তা করিতেছি, কিন্তু যেন একটা বাধা অনুভব করিলাম। পান্‌সী নিকটে আসিল, ধীর গতিতে ঘাটে লাগিল। যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন "হ্যাঁ মশায় ! লক্ষ্মীবাবুর ছেলে কি আ'জ কাল এই গ্রামেই আছেন ?" আমি চমকিত হইয়া উত্তর দিলাম "আজ্ঞা হাঁ। আপনি কোথা হ'তে আস্‌ছেন ?" বলিতে বলিতে নদীর কিনারায় অগ্রসর হইলাম। আমি নিকটে পৌঁছিলে যুবক বলিয়া উঠিলেন "আরে ! আমি একেবারে অন্ধ, এত কাছের মানুষ চিন্‌তে পারি না।" আমার সন্দেহ দূরীভূত হইল। যুবক তীরে অবতরণ করিলেন। আমি বলিলাম "বাঃ আমিও ত তোমাকে ঠিক চিন্‌তে পারি নাই।" বলিতে বলিতে দুই বন্ধু পরস্পর জড়াইয়া ধরিলাম। আজ বহুবর্ষ পরে বন্ধুর প্রণয়দীপ্ত মুখখানি দর্শনে কি একটা বিপুল আনন্দ-স্রোত আমার অন্তর ছাপাইয়া উঠিল। আমি ক্ষণিক আত্মহারা হইলাম। তাহার পর শৈশবের সেই সব পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া দুই বন্ধু পুনরায় সেই অতীত সুখে নিহিত হইলাম।

সেই ত আমার বন্ধু—সেই ত আমি। এতদিন কোথায় কে আমাদিগকে পৃথক করিয়াছিল ? সেই একই স্থানে আমরা আজন্ম বর্দ্ধিত হইতেছিলাম। বাল্যে এমন একদিন ছিল, যখন সর্ব্বদা বিচ্ছেদ—আবার সর্ব্বদা মিলন ! যেন সেই কলহে, সেই বিচ্ছেদ-মিলনে কি একটা সুষমা পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে।

কৈশোরের নবীন জীবনে আর কলহ নাই, বিচ্ছেদ নাই। শুধু এ—ও—তার পরামর্শ, শুধু একতা, শুধু অবিচ্ছেদ—শুধু মিলন! তাহার পর বন্ধুর পিতার স্থান পরিবর্ত্তন। আমার প্রাণে তখন একটা ঘনান্ধকার আসিয়া অধিকার করিয়াছিল। বন্ধু চলিয়া গেল, আমি কেমন করিয়া থাকিব? আমার পিতাও যদি উহাদের সহিত যাইতেন,—তবে বড় ভাল হইত। কিন্তু তাহা হইল না; আমি একাকী রহিলাম। বন্ধুর স্মৃতি আমার প্রাণে জাগিয়া রহিল। সেই প্রণয়, সেই স্মৃতি আজিও আমাকে চমকিত করিত। আমরা সেই সহরেই অধিক সময় ছিলাম, তার পরে পিতার মৃত্যুর পর গ্রামে আসিয়াছি। সেই স্মৃতি—সেই সহর, সেই বাল্যের কথা, সেই কৈশোরের কথা, আজি দুই বন্ধুর প্রাণে জাগিতে লাগিল। আমার পিতাকে তাঁহার স্মরণ হয় কিনা, তাঁহার মাতা আমাদের কথা বলিতেন কিনা,—এই সব কথা বলিতে বলিতে আমরা গ্রামাভিমুখে আসিতে লাগিলাম।

সূর্য্য রাঙ্গা মেঘের ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িতেছে। আমি মুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া আছি। পথ হাঁটিতেছি সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নাই। বন্ধু কি বলিলেন আমি শুনিতে পাইলাম না। আমি পুনরায় শুনিবার জন্য বলিলাম "উঁ"। বন্ধু বলিলেন "তা হ'লে কালই ঠিক যাচ্চ ত?" আমি বলিলাম "চল, দেখি গে।" বন্ধু বলিলেন "আবার দেখি গে কেন?" আমি উত্তর দিলাম "মাকে ব'লে দেখা যাক্।" বন্ধু বলিলেন,—"সে ঠিক হবে এখন।" বলিতে বলিতে আমরা গ্রামে প্রবেশ করিলাম। গ্রামে কত লোক বাস করে, তাহারা কেমন লোক, গ্রামে বিদ্যাশিক্ষার চর্চ্চা নাই বলিলেও হয়, আমি ও বাড়ীতে থাকিয়া কেমন হইয়া গিয়াছি—এই সকল পরিচয় দিতে দিতে বাড়ী আসিয়া পোঁছিলাম। নানা কথাবার্ত্তায় কিয়ৎক্ষণ কাটিল। মা আমার বন্ধুকে দেখিয়া অতিশয় আনন্দিতা হইলেন। রাত্রিতে দুই বন্ধু কত কি অন্তরের কথা কহিলাম। প্রাতে বন্ধু আমাকে লইয়া যাইবার জন্য মাতার নিকট অনুমতি লইয়া প্রত্যাগমনের জন্য ব্যস্ত হইলেন। মা বলিলেন "আজ থাক না বাবা! কাল রাত্রে এলে, আবার এখনই যাবার তাড়াতাড়ি! না থাক, কাল সকালে যেয়ো।" বন্ধু আবার শীঘ্র আসিবার অঙ্গীকার করিয়া, অনেক করিয়া মাতার সম্মতি লইলেন। আমরা যাত্রা করিলাম।

খড়্গেশ্বরীর প্রতিকূল বীচিমালা ভেদ করিয়া আবার পান্সী চলিতে লাগিল। কলনাদিনী স্রোতস্বতী মৃদু পবনহিল্লোলে ঠমকে ঠমকে নৃত্য

করিতেছে। নাচিতে নাচিতে বহিয়া আসিতেছে। তরুণ সূর্য্যের ফুল্ল কিরণ তটিনীবক্ষে বিচ্ছুরিত হওয়ায়—তরঙ্গিণী-বারি হেম-রেণু-মণ্ডিত বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল। বিহঙ্গমকুল-কূজিত রুচির পুলিন দেখিতে দেখিতে বন্ধুর গ্রামের ঘাটে পৌঁছিলাম। বন্ধুর বাড়ী পৌঁছিলে, আমাকে পাইয়া তাঁহার পিতামাতা যেন একটি হারানিধি ফিরিয়া পাইলেন। বন্ধুর পিতা বলিলেন, "আমরা এক-আধবার এখানে আস্‌তাম। তোমরা সহরে থাক্‌তে। কাজেই তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাতের বড় সুবিধা হ'ত না। পত্র ভিন্ন তত্ত্ব লওয়া হইত না। এবার এসে দুঃসংবাদ পেয়ে আমি মর্ম্মাহত হয়েছি। আমার বন্ধুকে হারিয়ে আমি বড় দুঃখ পেলাম। এতদিনের মধ্যে একটিবার তাঁকে দেখ্‌লাম না—বড় দুর্ভাগ্য আমার।" দেখিলাম, দুইটি অশ্রুধারা তাঁহার নয়নের পার্শ্ব বহিয়া পড়িল। আমার রুদ্ধ হৃদয়ের দ্বারে কি যেন একটা বদ্ধ আবেগ সজোরে আঘাত করিতে লাগিল। এত নিকটে আমার এমন আপনার লোক রহিয়াছে—আর আমি নিঃসহায় বিমর্ষভাবে কতদিন কাটাইয়াছি।

তাহার পর আদর-যত্নে আমি সিক্ত হইলাম। বাড়ীর বালক-বালিকাও যেন আমাকে পাইয়া সুখী। আমাতে যেন কি একটা অননুমেয় ভোগ্যবস্তু লুক্কায়িত আছে। আমিও তাহাদিগকে লইয়া অতীব আনন্দানুভব করিতাম। সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিল, বন্ধুর ছোট বোন্ শুক্লাকে! সে যেন একটি পরী! আর যেন কতকালের পরিচিত। যখন সে প্রথম আমাকে দেখিবার জন্য বন্ধুর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার অর্দ্ধ বিকশিত পদ্মের ন্যায় মুখখানি দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম। ভাবিলাম—এ কুসুম-মন্দার! কি চক্ষে তাহাকে দেখিলাম, দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। সে দৃষ্টি অব্যক্তসুধা, সে বাক্য-লহরী অমৃত নিঃস্বন!

আমি বাড়ী আসিয়া মাকে বলিলাম, "মা, শুক্লা বেশ মেয়ে। আমার ওকে বড় ভাল লেগেছিল। আহা! অমনি যদি আমার একটি বোন্ থাকিত!" মা হাসিয়া বলিলেন, "শুক্লাও তোমার বোন্।" তাইত,—বন্ধুর ভগিনী আমারও ত ভগিনী!

(২)

হঠাৎ একদিন বন্ধু আসিয়া বলিলেন, "আমরা ত হরিদ্বার যাচ্ছি—তুমিও চল।" আমি জননীকে একাকিনী রাখিয়া যাই কেমন করিয়া? তাহা বন্ধুকে জানাইলাম। বন্ধু ছাড়িবেন না। তাঁহার মাতার নামে আমার

মাতার নিকট অনুনয় করিয়া "আপনি লিখ্‌লেই ওকে ছেড়ে দিব," বলিয়া তাঁহার অনুমতি লইলেন। মা বলিলেন, "বাবা! আমার আপত্তি কি? অত ক'রে কেন বল্‌তে হবে? আমার কাছে না থেকে তোমার মায়ের কাছে থাক্‌বে, তাতে আর কি? তা বেশত।"

পুণ্যভূমি হরিদ্বার যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বন্ধুর বাড়ী গেলাম। বন্ধুর মাতা বলিলেন, "এখন ত বাবা, ব'সেই থাক্‌তে—চল একবার বেড়িয়ে আস্‌বে। দু'দিন আমার কাছেই বা থাক্‌লে! আমিও ত তোমার মা!" আমি স্মিতমুখে উত্তর দিলাম, "তাত বটেই মা! তাইত আমি এসেছি।"

বাড়ীর বালকবালিকাদিগের অপার আনন্দ। বন্ধুর শিশু ভ্রাতা "নন্নু" "নটুনডাডাও ডাবে।" বলিতে বলিতে তাহার শুকু দিদির নিকট দৌড়িয়া গেল। কে শিখাইয়াছিল আমি 'নতুনদাদা।" দুই দিন পরে সকলে যাত্রা করিলাম।

পূতভূমি হরিদ্বার দেখিয়া প্রাণ বিভোর হইল। শিলা-পুঞ্জ-প্রবাহিনী ভাগিরথী ত্রিধারা হইয়া পতিত হইতেছে। গিরি-নির্ঝরিণী-স্নাত তরুরাজি সানুদেশ অলঙ্কৃত করিয়াছে। উচ্চ গিরিনিচয় সঞ্চারিত জীমূতগণের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বিশাল শৈল যেন এ বিশ্ববিধানের রহস্য চিন্তায় নির্ব্বাক নিস্পন্দভাবে ব্যাপৃত আছে। কয়েকদিন ধরিয়া হরিদ্বারের মনো-মোহিনী শোভা দেখিলাম।

আমি বড় আদরের মাঝে আছি। আমার কোন সঙ্কোচ বন্ধুর ভাল লাগে না। ক্রমে আমি বন্ধুর গৃহ বলিয়া ভুলিয়া গেলাম। যেন স্বগৃহে, নিজ পিতামাতা, ভ্রাতা-ভগিনী লইয়া বড় সুখে আছি। সেই কমনীয়তায় মুগ্ধ হইলাম। সংসারের উপর আমার যেন একটা কর্ত্তৃত্ব রহিয়াছে। পরও এমন আপনার হয়?

বালকবালিকাগণ পরস্পর আমার নিকট নানা অভিযোগ আনয়ন করে। আমি মধ্যস্থ হইয়া তাহাদের বিবাদ মিটাইয়া দি। কে কেমন পড়িতে পারে, কাহার হস্তলিপি উৎকৃষ্ট, কেন সকলেই সমান নয় ইত্যাদি তাহাদের বিবাদ। শুক্লা কখনও কখনও কোন পুস্তকের কোন অংশ বুঝাইয়া লয়। তাহার দাদার নিকট গেলে আমার নিকট পাঠাইয়া দেন। শুক্লা আমার কাছে আসে, আমি ক্ষণকাল বেশ করিয়া দেখি,—আমার মনে হয়, "শুক্লা বেশ!" আবার ভাবি, "সে বেশ, তাহাতে আমার কি? বনের পাখীটিও ত বেশ

উদ্যানের পুষ্পটিও ত সুন্দর! কুসুম-চুম্বিত প্রজাপতিটিও মনোহর! পৃথিবীর অসংখ্য বস্তুই ত মনোমুগ্ধকর! তাহাতে তোমার আমার কি আসে যায়? যদি চিত্রকর হইতাম, যদি কবি হইতাম—বনের পক্ষী, উদ্যানের পুষ্প, বিচিত্র প্রজাপতি লইয়া কত কি খেলা খেলিতাম! আমি চিত্রকর নই, কবি নই। শুক্লার সৌন্দর্য্য, শুক্লার মনোমোহিনী রূপ-মাধুরী লইয়া আমি কি করিব? শুক্লা আমার কেহ নয়, আমার বন্ধুর ভগিনী,—তাই স্নেহের পাত্রী। বন্ধুর আরও ভ্রাতা ভগিনী আছে, অনেকেই ত স্নেহের যোগ্য; কিন্তু সকলকে দেখিবার জন্য ত প্রাণ কাঁদে না!" শুক্লাকে নয়নের আড়াল করিতে আমার হৃদয় যেন ফাটিয়া যায়। আবার একটিবার চক্ষের সম্মুখে পাইলে উন্মাদপ্রায় চাহিয়া থাকি। দেখিতে দেখিতে বিভোর হইয়া যাই। মনে হয় "মুছে যাক্ চোখে এ নিখিল সব।" এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লুপ্ত হউক। আমি শুধু শুক্লাকে দেখি! একি! কেন এমন হয়? যাহাকে ভগিনী বলিয়া ভালবাসিয়াছি, তাহার প্রতি একি আবেগ? না, না, ইহা ত বড় অলীক! এ ভাব ত্যাগ করিতে হইবে! হৃদয়ের রশ্মি সংযত করিতে হইবে!

বন্ধু একদিন বলিলেন, "এইবার একটা সাথী কর না।" আমি হাসিয়া কবিতার্দ্ধ আবৃত্তি করিলাম,—"তুমি, 'মম মানস-সাথী'।"

বন্ধু। না, রঙ্গ রাখ। সত্যি যা বল্‌ছি, শোননা।

আমি। ক'নে কোথায়?

বন্ধু। ক'নের অভাব কি? বল না তুমি রাজি কি না?

আমি। এত ব্যস্ত কেন? নিজে উপবাসী থেকে, আমার উপর এতটা অনুগ্রহ কেন?

বন্ধু হাসিয়া উত্তর দিলেন, "বিধি রুষ্ট আর করি কি? আমি—দায়ে পড়ে রায়মশায় হয়েছি। আমার কথা ছাড়। এখন তুমি রাজি কি না তাই বল।"

আমি। কোথায় বল শুনি, তারপর ব'লব।

বন্ধু। সে এখন ব'লব না। এখন বল রাজি কি না?

আমি। অ্যাঁ! আমি—রাজি—কি—না?

বন্ধু। হাঁ গো মশায় তাই।

আমি। তুমি কি বল?

বন্ধু। আমি বলি, হাঁ।

আমি। তবে তাই।

বন্ধু। কিন্তু বড় কুৎসিত।

আমি। যদি তোমার ভাল লাগে, তবে কুৎসিতই ভাল।

বন্ধু। ঠিক ?

আমি। হাঁ।

বন্ধু হাসিয়া কহিলেন "আচ্ছা আমাকে কি দিবে বল ?"

আমি। ঘটকালি বুঝি ? তা না হয় পাবে। কিন্তু এত কষ্ট করব আমি—আমাকে কি দিবে বল ?

বন্ধু। আচ্ছা তোমাকে একটা ভাল উপহার দিব। কিন্তু নেওয়া চাই।

আমি। "নিশ্চয়। তুমি দিবে, আর আমি একটু কষ্ট ক'রে নিতে পারব না ? তোমার উপহার আমি সাদরে গ্রহণ করব।"

বন্ধু। কর্‌বে ত ?

আমি। কর্‌ব গো কর্‌ব, তুমি দিয়েই দেখো না।

বন্ধু। তা হ'লে শপথ করেছ যেন মনে থাকে।

আমি। "বেশ !"

বন্ধুর নিকট বিবাহে সম্মত হইলাম। কিন্তু কোথাকার কাহার কথা হইল জানিতে পারিলাম না। কে তিনি ? শুক্লা নয় ত ? না, না তাহা নয়। কিন্তু যদি শুক্লাই হয়, তবে এ কেমন হইবে ? যাহাকে ভগিনী বলিয়া জানি, তাহাকে পত্নীরূপে লইব কেমন করিয়া ? না, তাহা হইতেই পারে না। সে বিবাহে আমি সম্মত হইব না। আবার যখন বন্ধুর পিতা বলিবেন, তখন কেমন করিয়া "না" বলিব ? যিনি আমার পিতার প্রিয়সুহৃদ, যাঁহাকে পিতার ন্যায় জ্ঞানে ভক্তি করি, তাঁহার কথার অন্যথা করিব কি করিয়া ? বিবিধ চিন্তায় উদ্বিগ্ন হইতেছি, কিন্তু আমার ধারণা মিথ্যাও হইতে পারে ! আমি ভ্রমই করিয়াছি ! নিশ্চয় অন্য কাহারও কথা হইয়াছে। কিন্তু সেই বা কে ?

আমরা হরিদ্বার হইতে প্রত্যাগমন করিলাম। বন্ধুর বাড়ী হইতে আমি নিজের বাড়ী আসিলাম। বন্ধনমুক্ত বৎস গাভীর নিকট আসিলে গাভী যেমন পুলকিত চিত্তে বৎসের প্রতি বাৎসল্য-হেতু তাহার গাত্র লেহন করিতে ব্যস্ত হয়, তেমনি অনেক দিনের পর আমাকে পাইয়া স্নেহপ্রবণা মা আমার সহর্ষ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। স্বপাক আহার্য্য সাজাইয়া কাছে বসিয়া মনের সাধে খাওয়াইতে খাওয়াইতে বলিলেন "ক'দিন আগে' শুকুর বিয়ের

জন্য তার মা আমাকে লিখেছিলেন। লিখেছেন তোর বোধ হয় পছন্দ হবে।" আমি একেবারে আকাশ হইতে পড়িলাম। যুগপৎ বিস্ময়ে ও লজ্জায় আমি নির্ব্বাক হইলাম। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলাম "না, মা! সে কেমন হবে! ওদের সঙ্গে আর এক রকম, সব ভাই বোনের মত।" মা বলিলেন "অত ধরলে কি চলে? ভালবাসা হয় বই কি। তা ব'লে ত সম্বন্ধে বাধে না। শুকুর সঙ্গে তোর বিয়ে হ'লে বড় সুখের হবে।" আমি বলিলাম "না, মা! সে কেমন কেমন দেখায়!" মা একান্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া কহিলেন "ভালই দেখাবে। ওঁদের সঙ্গে একটা কুটুম্বিতা হ'লে ভালই হবে। অমত কিসের? কেন মেয়েটি ও ত বেশ! তুই ত কত প্রশংসা করিস্। মেয়েটিও বড়, সঙ্গে সঙ্গেই আমি বউ নিয়ে ঘর করতে পাব। অমত করিস্‌নে বাবা!" আমি লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিলাম। তথাপি দৃঢ় স্বরে কহিলাম "না, তা হইতেই পারে না," বলিয়া উঠিয়া গেলাম। মাতা ও নীরব হইলেন।

কয়েকদিন কাটিয়া গেল। মা আর বিবাহের কথা তুলিলেন না। এখন মনে হয় "তাইত, তাহাতে দোষ কি? সম্বন্ধে বাধে না। কেন আমি সম্মত হইলাম না? শুক্লাকে পাইলে আমিও সুখী হইতাম। তেমন রত্ন হস্তে পাইয়া ত্যাগ করিলাম! ছি, ছি, কি অন্যায় করিয়াছি? যাই মাকে গিয়া বলি, আমার অমত নাই। আপনা হইতেই বা কি করিয়া বলিব? আর একবার যদি মাতা বিবাহের কথা তুলেন ত ভাল হয়।" এমন সময় আবার বন্ধু আসিলেন। বলিলেন "একি হে? শপথ ক'রে আবার পেছিয়ে পড় যে?"

আমি। কেন কিসে পেছিয়ে পড়ছি?

বন্ধু। কেন? এক দিন না বলেছিলে, আমি যে উপহার দিব, তুমি তাই সাদরে গ্রহণ করবে। সে কথা বুঝি ভুলে গেছ?

আমি। দোহাই তোমার। তোমার সঙ্গে ত পারব না। যা হয় তুমি কর।

বন্ধু। তবে কেন এ কষ্ট দিলে? তুমি যদি আমার ভগিনীকে গ্রহণ কর তবে সে মিলন কি সুখের হবে! বল, শুক্লাকে গ্রহণ করবে?

আমি। এই তোমার উপহার? বেশ তাই হোক, কোন বাধা নাই।

বন্ধু পুলকিত হইয়া মাতাকে জানাইলেন।

৩

শুক্লা আমার হইবে, আমি আশায় উৎফুল্ল। সেই শুক্লা সেই স্নিগ্ধ শুক্লা! শুক্লা আমার আনন্দ-নিলয়। আমি নবীন সংসারী হইব। প্রকৃতি-স্বরূপিণী রমণীর প্রণয় আমার সম্মুখের অসীম অনন্ত উশৃঙ্খলতার পথ রুদ্ধ করিয়া দিল। নারীর প্রেমের আশায় আমি মুগ্ধ হইলাম। নবীন প্রেমের উজ্জ্বল আলোকে দেখিলাম, যেন পৃথিবী শান্তিময়ী,—এখানে শোক নাই, দুঃখ নাই, বিড়ম্বনার লেশ মাত্র নাই। হয় ত ইহাই সুখ—শান্তি—সৌন্দর্য্যের লীলা-নিকেতন!

একি! আবার কেন মন ভীত হও? শুক্লাত আমারই, তবে কেন তার চিন্তার মধ্য হইতে একটা নিরাশা মাথা তুলিয়া চাহিতেছে। তবে কি এ মিলনে ইষ্ট নাই? যদি শুক্লা আমাকে না চায়, তবে কেন তাহাকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিব? সে প্রভাতের প্রজাপতির মত প্রফুল্ল। কেন তার সে প্রফুল্লতা অন্ধকারে ঢাকিয়া দিব? না, তাহাতে কায নাই। শুক্লার সহিত পরিণয়ে কায নাই। হয়ত শুক্লার সকল সুখ এই অনিচ্ছাবদ্ধ পরিণয়ের সঙ্গে শেষ হইবে! তাহাতে আমিও সুখী হইব না। যে শুক্লাকে আমি আমার হৃদয়ের হৃদয় দিয়া অভ্যর্থনা করিতে চাই, যাহাকে আমার জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষিত বস্তু বলিয়া জানি, যাহার মাধুর্য্য আমার অমৃতময় বলিয়া মনে হয়, এ তৃষিত প্রাণে যাহার আশাপথ চাহিয়া আছি, যাহাকে এত ভালবাসি, তাহার সুখের পথে কেন কণ্টক হইব? না, না, শুক্লাকে না পাইলে আমার এ তৃষা নিবৃত্ত হইবে কিরূপে? শুক্লাকে না পাইলে এ জীবন বিড়ম্বনা। শুক্লা আমারই। এস শুক্লা! তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া সকল জ্বালা জুড়াই!

* * * *

"তাইত মা! এমন দিনে আবার একি হ'ল?" একজন প্রতিবেশিনী আমার মাতার নিকট বলিতেছেন "তাইত মা! এমন দিনে অবার একি হ'ল?" মা বলিলেন "আর ত সাত দিন আছে। আজ ও জ্বর ছাড়েনি এই ক'দিনে কেমন ক'রে সারবে মা? এ দিনে বুঝি বিয়ে হয় না!" আমি ভাবিলাম 'তবে কি শুক্লাই পীড়িত হইয়াছে। ঠিক তাহাই, আমাদের বিবাহেরও ত আর সাত দিন আছে। আমি একটু সরল ভাব দেখাইয়া গৃহের বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "হাঁ মা! কার জ্বর ছাড়েনি?" মাতা

কহিলেন "তুই শুনিস্‌নি বুঝি ! শুক্লার জ্বর হয়েছে খবর পেলাম।" আমি নীরব হইলাম। মাতা পুনরায় কহিলেন "কাল কাকেও পাঠাব।" পর দিন একজন আত্মীয় শুক্লার সংবাদ জানিবার জন্য প্রেরিত হইলেন। মাতা বলিলেন "আহা ! বিয়ে না হয় দুদিন পরেই হবে; এখন বাছার আমার ভাল খবর পেলে বাঁচি।"

বিবাহে নিমন্ত্রিত কুটুম্ব-কুটুম্বিনীগণ আগমন করিতেছেন। মাসী মা আসিলেন। তিনি শুক্লার অসুস্থতা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিতা হইলেন। সংসারে তিনি একা গৃহিণী। আর কেহ তেমন দেখিবার নাই। এবার ফিরিয়া গিয়া পুনরায় আসিতে হইলে তাঁহার অতিশয় অসুবিধা হইবে। এই বারেই অনেক করিয়া আসিয়াছেন। একটা সংবাদ দেওয়া উচিত ছিল। মা কি আর জানেন যে এমন হইবে ! তবে, শুক্লা আরোগ্যলাভ করিলে তাহার পর শীঘ্রই বিবাহ হইবে; মাসীমাতাকে আর ফিরিতে হইবে না। কিন্তু এতদিন তাঁহার সংসার দেখিবে কে ?

শুক্লাকে দেখিয়া লোক প্রত্যাগমন করিয়াছে। শুক্লা অপেক্ষাকৃত ভাল আছে। তবে অনেক দিন কষ্ট পাইবে। এ দিনে বিবাহ হইতেই পারে না। না হয় কয়েক দিন পরেই হইবে, তাহাই হউক। শুক্লা ! তুমি শীঘ্র নিরাময় হও। এস শুক্লা ! আমার হৃদয়ে। এখানে তোমাকে সকল বিপদ হইতে, সংসারের সব দৈন্য, সব ক্লেশ হইতে লুকাইয়া রাখি। এস, এস শুক্লা ! আমার হৃদয়ে এস !

প্রতিদিন লোক গিয়া সংবাদ আনিতে লাগিল। আবার অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইতেছে। কয়েক দিন সংজ্ঞা লুপ্ত হইয়াছে। কেন এমন হইল ? একদিন সংবাদ আসিল, শুক্লা ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে—শুক্লার বিবাহ হইবে না !

বন্ধু আমার আজিও তেমনি। কিন্তু কোথায় আমার——

বন্ধুর উপহার ?

শ্রীরেণুপদ গঙ্গোপাধ্যায়।

———

কামাখ্যা ও চন্দ্রনাথ ভ্রমণ।

(৪)

২৯এ মার্চ্চ শনিবার। অদ্য প্রাতে বিছানা ত্যাগ করিয়া শৌচাদি সম্পন্ন করিয়া হস্তমুখ প্রক্ষালনান্তর নিজ নিজ বিছানাপত্র ও মোট-মাটারি গুছাইয়া লইয়া নদের দিকে চলিলাম। একজন পাণ্ডাঠাকুর আমাদের সঙ্গে চলিলেন। পাহাড়ের নীম্নে আসিয়া ব্রহ্মপুত্রে স্নান সম্পন্ন করিলাম। তৎপরে নৌকারোহণে যাত্রা করিলাম।

এইরূপে কিয়ৎক্ষণ নৌকারোহণে গমন করার পর, যেখানে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বসহ রাজ্যভ্রমণ মানসে বহির্গত হইয়া, ক্লান্ত কলেবরে বিশ্রাম করিয়াছিলেন তথায় উপনীত হইলাম। ইহা নদীর অপর পারে অবস্থিত। এই স্থানকে "অশ্বক্লান্তা" কহে। এখানে মন্দিরমধ্যে প্রস্তর-নির্ম্মিত নরনারায়ণ-মূর্ত্তি স্থাপনা করা আছে। দর্শন সমাপ্ত হইলে পুনরায় নৌকারোহণে উমানন্দ-ভৈরব দর্শনে যাত্রা করিলাম। নদের মধ্যস্থিত একটি উচ্চ পর্ব্বতোপরি মন্দিরমধ্যে উমানন্দদেবের মন্দির বর্ত্তমান। কলিকাতায় কালিঘাটে যেমন, দেবদেব উমাপতি নকুলেশ্বর ভৈরব নামে আখ্যাত আছেন, এখানে সেইরূপ উমানন্দ ভৈরব নামে বিরাজ করিতেছেন। সতী-অংশ যেখানে যেখানে পড়িয়া মহাকালীরূপে ভিন্ন ভিন্ন নামে আখ্যাত আছেন, শঙ্করও সেই সেই স্থানে ভৈরবমূর্ত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন নামে ঘোষিত হইয়াছেন। শুনিতে পাই, শুধু দেবী দর্শন করিলে কোনও ফল হয় না। সেই সঙ্গে সেই স্থানের কালভৈরব-মূর্ত্তি দর্শন করিতে হয়। যাহা হউক, এখানকার পূজাদি সমাপ্ত হইলে পুনরায় নৌকারোহণে যাত্রা করিয়া, যেখানে, উর্ব্বশী সুন্দরীর নৃত্য দেখিয়া দেবাদিদেব প্রসন্ন হইয়াছিলেন, তথায় উপনীত হইলাম ও কিয়ৎক্ষণ পরে পুনরায় যাত্রা করিয়া গৌহাটী পানবাজারের ঘাটে উপনীত হইয়া সকলে অবতরণ করিলাম। আমাদের সঙ্গে যে পাণ্ডাঠাকুর আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে আট আনা জলপানি স্বরূপ দিয়া বিদায় করিলাম ও নিজ নিজ জিনিষ পত্র সহ, আমাদের একজন দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইলাম।

এখানে উপস্থিত হইবামাত্র ইঁহারা পরম সমাদরে আমাদিগকে যথোচিত সমাদর পূর্ব্বক বসাইলেন। তৎপরে সকলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া স্নান ও আহারাদি সমাপ্ত করিয়া শয়ন করিলাম। বৈকালে উঠিয়া সহর দর্শনে বাহির হইলাম।

গৌহাটী সহরটি কামরূপ জিলার হেড্কোয়াটার। এখানে জজকোর্ট, ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্ট প্রভৃতি বিচারালয় ও গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকরী আফিস সমূহ বিদ্যমান। কতকগুলি আফিস উচ্চতম রাজপুরুষ ও রাজকর্ম্মচারিদিগের সৌকর্য্যার্থে শিলং-এ স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। সহরের সকল বাড়ীতেই কলিকাতার ন্যায় জলের কল আছে। এখানকার স্বাস্থ্য বেশ ভাল। রাস্তা ঘাটও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সহরের একদিকে ব্রহ্মপুত্র নদ আর তিন দিক ক্ষুদ্র বৃহৎ পর্ব্বতমালায় বেষ্টিত। দেখিলেই মনে হয় যেন শত্রু-হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য পাহাড়গুলি সহরটীকে 'আঁকৃড়িয়া' ধরিয়া আছে। সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরিয়া আহারাদি সমাপ্ত করিয়া নিদ্রা গেলাম।

৩০এ মার্চ্চ রবিবার। প্রাতে উঠিয়া একখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া "বশিষ্ঠ-আশ্রম" অভিমুখে যাত্রা করিলাম। এখান হইতে যাতায়াতে কিঞ্চিদধিক ১৫ মাইল হইবে। ভাড়া স্থির হইল ৫৲ টাকা। সময় বিশেষে অর্থাৎ বর্ষাকালে ৭।৮৲ টাকাও লাগে। এখানে বেলা ৯॥০ সাড়ে নয়টার মধ্যেই পৌঁছিলাম। স্থানটী বড়ই মনোরম। এখানে আসিয়া যাত্রীদিগকে রন্ধন করিয়া খাইতে হয়। খুব বড় একটি ঝরণা আছে। তথাকার জল খুব সবেগে নীম্নে পতিত হইতেছে। তার মধ্যে মধ্যে, বৃহৎ বৃহৎ এক একটী প্রস্তরখণ্ড পতিত আছে। তন্মধ্যে একখানির উপর ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেব বসিয়া সন্ধ্যা-বন্দনা করিতেন,—পাণ্ডাদের মুখে এইরূপ শুনিলাম। বশিষ্ঠদেব কোন সময়ে এখানে বাস করিতেন তাহা বলিতে পারি না। যাহা হউক, এই স্থানে স্নান করিয়া তন্নিকটস্থিত একটী মন্দির মধ্যে বশিষ্ঠদেবের পাষাণ-ময় মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন, সেই মূর্ত্তি দর্শনান্তর বন হইতে শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড সকল সংগ্রহ করিয়া ইটের উনান করিয়া, গৌহাটী সহর হইতে আনীত একটি হাঁড়ীতে, কয়জনের উপযুক্ত চাউল ও দাইল চাপাইয়া দেওয়া হইল। কোনও রকমে কষ্টে স্বষ্টে, রন্ধন সমাপ্ত হইলে, আহারাদি শেষ করিয়া, অশ্ব যানারোহণে ষ্টেশনাভিমুখে রওনা হইলাম। বৃহস্পতি ও রবিবারে এখানে অনেক যাত্রী'সমাগম হয়। আজ রবিবার; স্নুতরাং ১৫।১৬টী দল যাত্রী সমাগম

হইয়াছিল। গৌহাটী ষ্টেশনে পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। এখানে মধ্যম বা তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগের কোনও বিশ্রাম কক্ষ নাই। আমরা মধ্যম শ্রেণীর আরোহী ছিলাম। রাত্রি ১০ দশ ঘটিকার সময় লামডিং-এর গাড়ী ছাড়িবে। এখন মোটে ৬টা। এই ৪ ঘণ্টা ষ্টেশনের খোলা জায়গায় বসিয়া থাকা কষ্টকর ব্যাপার,—সেইজন্য এখানকার ষ্টেশনমাষ্টার (পাঞ্জাব দেশবাসী) মহাশয়কে বলিয়া ১ম ও ২য় শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের বিশ্রাম কক্ষটীতে স্থান করিয়া দিলাম। ক্ষণকাল পরে গোহাটীর শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বাবুর মধ্যম পুত্র, তাঁহার মাতাঠাকুরাণী ও এক ভগ্নী সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইয়া টিকিট কাটাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। পূর্ব্ব হইতে এইরূপ বন্দোবস্ত ছিল যে, ইঁহারাও আমাদের সহিত ৺চন্দ্রনাথ দর্শন করিতে যাইবেন। যাহা হউক, উপযুক্ত সময়ে গাড়ীতে আরোহণ করিলাম। ট্রেণে উঠিবার সময়ে ষ্টেশন মাষ্টারটী আমাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহাকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিয়াছিলাম।

(৫)

৩১এ মার্চ্চ সোমবার। ভোর সাড়ে চার ঘটিকার সময় গাড়ী লামডিং জংশন ষ্টেশনে পৌঁছিল। গৌহাটী হইতে এইখান পর্য্যন্ত একটী শাখা লাইন (Branch Line) টিন সুকিয়া হইতে চট্টগ্রামগামী ডাউন আসাম মেলে আমাদিগকে চাপিতে হইল। কয়েক ঘণ্টা পরে গাড়ী হাফ্‌লং নামক ষ্টেশনে পৌঁছিল। এইটীতে অনেকক্ষণ গাড়ী থামে। একটি Re resh-ment Room এখানে আছে। অনেকক্ষণ গাড়ী থামে বলিয়া আমরা সকলেই এখানে নামিয়া ষ্টেশনস্থিত কলে হাত মুখ ধুইয়া কিছু কিছু জল-যোগ করিয়া লইলাম। এখানে গরম মহিষ-দুগ্ধ ⁄১০ পয়সা সের। দধি, ক্ষীর ও খুব সস্তা দরে বিক্রয় হয়। পেঁপে খুব বড় একটীর দাম ⁄১০ পয়সা মাত্র। সুতরাং এই কয়েকটী দ্রব্যের দ্বারাই ক্ষুন্নিবারণ করিলাম। যথা-সময়ে বংশীধ্বনি করিয়া গাড়ী ছাড়িল ও বেলা ৩টা ২৫ মিনিটের সময়ে গাড়ী বদরপুর জংশন ষ্টেশনে পৌঁছিল। এইটি, এই রেলপথের মধ্যে সর্ব্বা-পেক্ষা বৃহৎ Haulting Station.

আমরা পুনরায় এখানে অবতরণ করিয়া হাত মুখ ধুইয়া, ষ্টেশন হইতে পূর্ব্বমত দুধ, কলা ও পেঁপে কিনিয়া ভক্ষণ করিলাম। এই রেলপথের প্রায় প্রত্যেক ষ্টেশনে দুধ, পেঁপে প্রভৃতি বেশ সস্তা দরে বিক্রয় হয়। এখান

হইতে গাড়ী ছাড়িয়া ১৫।১৬টী ষ্টেশন পার হইয়া রাত্রি ৪ ঘটিকার সময় লাকসাম জংশন ষ্টেশনে পৌঁছিল। যে গাড়ীখানিতে আমরা আসিলাম তাহা চাঁদপুর অভিমুখে যাইবে। সুতরাং আমাদিগকে এইখানে অবতরণ করিয়া ওভার ব্রীজ পার হইয়া চট্টগ্রামের গাড়ীতে উঠিতে হইল। এই ষ্টেশন হইতে একটী লাইন চাঁদপুর অভিমুখে গিয়াছে। একটি চট্টগ্রাম অভিমুখে, অন্যটি একমাচল অভিমুখে গিয়াছে এবং অপরটি প্রধান লাইন,—বদরপুর হইতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে।

বেলা ৬টার সময় এখান হইতে গাড়ী ছাড়িল ও ৯॥০ টার কিছু পূর্ব্বে সীতাকুণ্ড ষ্টেশনে পৌঁছিল। এখানে নামিতে গিয়া অত্যন্ত ভিজিয়া গেলাম, কারণ তখন অত্যন্ত বৃষ্টি হইতেছিল। আমরা নামিতেই পঙ্গপালের ন্যায় পাণ্ডারা আসিয়া আমাদিগকে ঘিরিয়া ধরিল। আমরা অতি কষ্টে এই 'পাণ্ডাব্যূহ' ভেদ করিয়া 'ওয়েটিং রুমে' আশ্রয় লইলাম। কিছুক্ষণ পরে বৃষ্টি থামিলে একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া আমাদের আদিপাণ্ডার (কৃষ্ণকুমার পাণ্ডা) বাসা চিনিয়া লইলাম। ষ্টেশন হইতে বাসা খুব নিকটেই ছিল, সুতরাং কষ্ট পাইতে হয় নাই।

এখানে পৌঁছিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। পরে উঠিয়া হস্ত মুখ প্রক্ষালনান্তর নিত্যকর্ম্ম সমাধা করিয়া রন্ধনাদি কার্য্যের সহায়তা করিতে লাগিলাম। অত্যধিক বৃষ্টি হওয়ায় পাণ্ডাঠাকুর পাহাড়ে উঠিতে নিষেধ করিলেন। বৈকালে ৫॥০ ঘটিকার সময় সহর পরিদর্শনে বাহির হইলাম। যদিও অল্প পরিমিত স্থানের উপর সহরটী স্থাপিত, তথাপি বেশ পরিপাটী। স্বর্গীয় প্রেমনাথ রায় নামক কোনও এক উদারচেতা জমিদার মহাশয়ের 'উপযুক্ত' পুত্রগণ কর্ত্তৃক একটি জলের কল স্থাপিত হইয়াছে। চন্দ্রনাথ পর্ব্বতের এক বৃহৎ ঝরণা হইতে (লোকে এই ঝরণাকেই মন্দাকিনি কহিয়া থাকে) পাইপ সংযোগে জল আনিয়া এক বৃহৎ ট্যাঙ্কে (Tank) রক্ষিত হয় ও সেখান হইতে সহরের মধ্যে জল সরবরাহ করা হইয়া থাকে।

২রা এপ্রিল বুধবার। প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিয়া শৌচাদি কার্য্য সমাপনান্তে, পাণ্ডাঠাকুরের গোমস্তা, ক্ষুদিরাম পাণ্ডাকে সঙ্গে লইয়া, দেবাদি-দেবের মন্দিরাভিমুখে রওয়ানা হইলাম। এক মাইল রাস্তা আসার পর একটি পুষ্করিণীতে (লোকে ইহাকে ব্যাসকুণ্ড কহে) স্নান ও সংকল্পাদি করিলাম ও তৎপরে তন্নিকটস্থিত একটি মন্দির মধ্যে সকলে প্রবেশ করিয়া

মহামুনি ব্যাসদেবের পাষাণমূর্ত্তি দর্শন করিলাম। এই পুষ্করিণীতে স্নান না করিয়া কিম্বা ব্যাসদেবের পূজা না দিয়া কেহ অগ্রসর হইতে পারেন না—এইরূপ নিয়ম আছে। তৎপরে আমরা আরও কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া "জ্যোতির্ম্ময়" নামক একটী স্থানে উপনীত হইলাম। এতক্ষণ সমতল ভূমিতে আসিতেছিলাম, এইবার পার্ব্বত্যপথে উপরের দিকে উঠিতে হইতেছে। এইখানে মাটীর উপর একস্থানে মধ্যে মধ্যে আপনা হইতে 'আগুন' বা 'জ্যোতিঃ' দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেই জন্য স্থানটীকে লোকে 'জ্যোতির্ম্ময়' কহে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা কোনও আলোক দেখি নাই। পরে শুনিয়াছি যে, ঐ স্থানের নিম্নে কেরোসিন তৈলের 'খনি' আছে। অত্যন্ত গ্যাস জমিলে স্থানটী গরম হইয়া ঐরূপ আলোক দৃষ্ট হইয়া থাকে। যাহা হউক, উহা দর্শন করিয়া পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করিলাম।

ভারতবর্ষে যে সমস্ত তীর্থ আছে ও তন্মধ্যে যে কয়টী পর্ব্বতের উপর স্থাপিত আছে, তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দূরারোহ ও কষ্টকর পথ—বদরিকাশ্রম; দ্বিতীয় সাবিত্রী দেবী; এবং তৃতীয় দুর্গম পথ এই চন্দ্রনাথ পর্ব্বত। বিশেষতঃ বর্ষাকালে আসিতে হইলে ত কষ্টের সীমা থাকে না। পর্ব্বতোপরি অধিষ্ঠিত দেব বা দেবী দর্শনে আসিলে এইরূপ সময়ে বা আরও কয়েকদিন পূর্ব্বে আসিতে হয়। নতুবা অত্যন্ত কষ্ট হয়। স্থানে স্থানে ঠিক সোজাভাবে উর্দ্ধমুখে উঠিতে হয়; হাতে করিয়া কোনও জিনিষ (পূজার উপকরণাদি) বহন করিবার উপায় নাই। সমস্ত জিনিষ গামছায় বাঁধিয়া কোমরে জড়াইয়া লইতে হয়। এক একস্থানে পথ অত্যন্ত পিচ্ছিল। ঐ সকল স্থানে বড় বড় একপ্রকার বনজ বৃক্ষ আছে, তাহার কাণ্ড বা শিকড় ধরিয়া উঠিতে হয়। কিয়ৎক্ষণ পরে 'শম্ভুনাথ' নামক শিব-মন্দিরে উপনীত হইলাম। এখানে পূজাদি সমাপ্ত হইলে, তৎসন্নিকটস্থিত এক জায়গায় 'পাদগয়া' বর্ত্তমান আছে। এখানে পূর্ব্বপুরুষগণের শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি করিতে হয়। এ সমস্ত যথারীতি অনুষ্ঠিত হইলে আবার উপরে উঠিতে লাগিলাম। প্রায় ২ মাইল রাস্তা পার্ব্বত্য পথে উপরে উঠিবার পর দু'টী রাস্তা দেখা যায়। একটি ঐরূপ সটান রাস্তা; অপরটী বহু পুরাকালের ইষ্টক-নির্ম্মিত ভগ্ন সোপান-শ্রেণী। কেহ কেহ বলেন যে ৮০০ আটশত সোপান ছিল, কিন্তু আমি গণিয়া দেখিয়াছি যে, ৪৬০ চারি শত ষাটি মাত্র। তবে মধ্যে মধ্যে অনেক স্থানে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে সুতরাং সুন্দররূপে গণিতে পারা যায় না।

শুনিতে পাইলাম যে ২৪ পরগণা জেলার খড়দহ গ্রামের স্বনামধন্য জমিদার পরলোকগত সুরেশ বিশ্বাস মহাশয় কর্ত্তৃক বহুকাল পূর্ব্বে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু এই সোপান-শ্রেণী সাহায্যে পর্ব্বতারোহণ করা কিছু কঠিন ব্যাপার। সেই জন্য পাণ্ডাঠাকুরেরা নিয়ম করিয়া দিয়াছেন যে, যাত্রীগণ, এই দুই রাস্তার সন্ধিস্থলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া, দক্ষিণদিক্স্থিত সোপানারোহণ না করিয়া, বামদিক্কার পথে উপরে উঠিবেন। আমরা তদনুযায়ী উপরের দিকে অর্দ্ধ মাইল রাস্তা উঠার পর শ্রীশ্রী৺ বিরূপাক্ষ দেবের মন্দির-সান্নিধ্যে উপনীত হইলাম। একজন পূজারি প্রত্যহ প্রাতঃকালে আসিয়া পূজাদি শেষ করিয়া বসিয়া থাকেন এবং দ্বিপ্রহর হইয়া গেলে, দরজা চাবিবন্ধ করিয়া চলিয়া যান। ইতিমধ্যে যিনি আসেন, তাঁহারই দর্শন হয়; তারপর আর হয় না।

আমরা এখানে পূজা সমাপ্ত করিয়া আরও ১০।১৫ মিনিট উপরের দিকে উঠার পর বাবা চন্দ্রনাথ দেবের মন্দির-সমীপে উপস্থিত হইলাম। এই চূড়াটীর উপর ৭০।৮০ জনের অধিক লোকের স্থান সংকুলান হয় না। মন্দিরটীর দু'টী দ্বারপথ; খুব অন্ধকার নহে। ৮।১০ জন লোক এক সঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করিয়া পূজা করিতে পারে এরূপ স্থান আছে। মন্দির প্রদক্ষিণ জন্য, বাহিরে চারিপাশেই ২ হাত প্রস্থ বাঁধান "রোয়াক" আছে। শিব-চতুর্দ্দশীর সময় এখানে ৭।৮ সহস্র যাত্রী-সমাগম হয় শুনিলাম। পর্ব্বতের উপর হইতে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, মনে যে কি ভাবের উদয় হয় তাহা লিখিয়া বা বলিয়া বুঝান যায় না। ক্ষণকালের জন্য মন হইতে হিংসা, পাপ, দ্বেষ, অভিমান প্রভৃতি দূরে যায়। মনে হয় যে, এই বুঝি ঋষি-বর্ণিত স্বর্গ-রাজ্য। চারিদিকে অত্যুচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী—কেবল পূর্ব্ববর্ণিত সোপানাবলি সাহায্যে নামিবার দক্ষিণদিকে সীতাকুণ্ড সহর ও তৎপরেই সীমাহীন সমুদ্রের ক্ষীণরেখা দৃষ্টিগোচর হয়। একদিকে অভ্রভেদী পর্ব্বত ও তন্নিম্নে কিছুদূরেই অতলস্পর্শ মহাসমুদ্র—একাধারে এরূপ মনোমুগ্ধকর স্থান পৃথিবীর অন্য কোথাও আছে বলিয়া মনে হয় না।

মন্দিরমধ্যে মহেশ্বরের যে লিঙ্গমূর্ত্তি আছেন, তাহার উত্তর দিকের কতকাংশ ভগ্ন দেখিলাম। এইরূপ প্রবাদ যে দেবীদাস নামক কোনও এক হিন্দু যুবক, মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার ভয়ে, দুর্গার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেবীদাস অত্যন্ত দুর্গাভক্ত ছিলেন, তাই তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, যবনেরা যতই চেষ্টা

করুক, কিছুতেই আমাকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারিবে না। পরিশেষে যবনেরা বলপূর্ব্বক তাঁহাকে মুসলমান করিলে পর, তাঁহার সে বিশ্বাস ভঙ্গ হইল। তখন তিনি কালাপাহাড় নাম ধারণ পূর্ব্বক অত্যন্ত দেবদ্বেষী হইয়াছিলেন। ইতিহাসজ্ঞ পাঠক এ সমস্ত অবগত আছেন। যাহা হউক সেই সময়ে ৺ চন্দ্রনাথ দেব, কালাপাহাড়ের ভয়ে রাত্রিযোগে কাশী হইতে পলায়ন করিয়া এই স্থানে আগমন করেন ও যবনের অত্যাচার নিবৃত্ত হইলে কোনও যোগ্যতর ব্যক্তিকে স্বপ্নাদেশ দিয়া এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

(৬)

আমরা যথাবিধি পূজাদি সমাপ্ত করিয়া, সোপান বহিয়া নামিয়া আসিয়া বেলা ১টার সময় বাসায় পৌঁছিলাম। আজ একাদশী; সুতরাং বিধবা ছাড়া যাঁরা সধবা স্ত্রীলোক সঙ্গে ছিলেন, তাঁহারাও দেবস্থানে আসিয়া, অন্নব্যঞ্জন না খাইয়া, জলযোগ দ্বারাই ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলেন। পরে নিদ্রা দেওয়া গেল। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে পাণ্ডাঠাকুরের প্রাপ্য চুকাইয়া দিয়া 'সুফল' লইলাম। পয়সার জন্য যাত্রীদিগের উপর কোনও অত্যাচার বা 'জুলুম' দেখিলাম না। সে দিনের মত সমস্ত শেষ হইল। আমরা পুনরায়, সন্ধ্যার পর কিছু কিছু জলযোগ করিয়া শয়ন করিলাম।

৩রা এপ্রিল বৃহস্পতিবার। খুব প্রাতে উঠিয়া, হস্ত মুখ প্রক্ষালনান্তে গোমস্তা ক্ষুদিরাম পাণ্ডাকে সঙ্গে লইয়া ষ্টেশনে গেলাম। কিছুক্ষণ পরে বাড়বকুণ্ডের গাড়ী আসিলে, আরোহণ পূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হইলাম। ষ্টেশন হইতে যাতায়াতে কিঞ্চিদধিক ৪ মাইল হইবে। রাস্তা সমতল ভূমির উপর। এখানে একটী উষ্ণ প্রস্রবণ আছে; তাহাতে ক্রমাগত জল উঠিতেছে ও তদুপরি অগ্নি জ্বলিতেছে; সেই জল একটী "চৌবাচ্চা"তে পড়িতেছে। সেইটীতে স্নান করাকেই 'বাড়বকুণ্ড-স্নান' কহে। কিন্তু ইহাতে স্নান করার পূর্ব্বে ইহার বাহিরে—অর্থাৎ এই 'চৌবাচ্চা'র জল ছাপাইয়া পয়ঃপ্রণালী সাহায্যে বাহিরের অন্য একটীতে পড়িতেছে,—তাহাকে 'বাসিকুণ্ড' কহে—এইখানে স্নান করিতে হয়। শুনিলাম, এই স্থানের নীচেও 'কেরোসিন-খনি' আছে। খনিজ-বিদ্যা-বিশারদদিগের দ্বারা ইহাই স্থিরীকৃত হইয়াছে। এখানকার কার্য্যাদি সমাপ্ত করিয়া ষ্টেশনে আসিলাম ও তৎপরে পুনরায় সীতাকুণ্ড পার হইয়া 'বারৈয়াঢালা' অভিমুখে চলিলাম। যথাসময়ে ষ্টেশনে পৌঁছিয়া ৩ মাইল (যাতায়াতে) দূরবর্ত্তী স্থানে 'ব্রহ্মকুণ্ড' 'সূর্য্যকুণ্ড' 'লবণাক্ষকুণ্ড' ও

'সহস্রধারা' দর্শন করিয়া, পুনরায় ষ্টেশন অভিমুখে অগ্রসর হইলাম। ইহার বিষয় বিশেষ লিখিবার কিছু নাই। বাড়বকুণ্ডের ন্যায়ই সমস্ত করিতে হয়। কেবল 'লবণাক্ষে'র জল ঈষৎ লবণাক্ত ও 'সহস্রধারা'টী একটী বৃহৎ 'ঝরণা'মাত্র। ক্রমশঃ।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

পল্লী-কথা।

পল্লী-ভবন-প্রান্তে পলাশ-পনস বেণব-বেতস বিদ্যমান আছে, পল্লী-ভবনের অধুনাতন সর্ব্বত্র বিস্তৃত বৃক্ষডালে বসিয়া বিহগেরা গান গায়, পল্লীভবন-তলে পূর্ণিমার চাঁদ জ্যোৎস্নালোক ঢালিয়া দেয়, পল্লী-ভবনের সর্ব্বত্র মুক্ত বাতাস প্রবাহিত হয়, পল্লী-ভবনের আশে-পাশে বন্যকুসুমে পরিমল প্রদান করিয়া থাকে—তুমি সাহিত্যিক, তুমি কবি—তুমি একদিন গিয়া এসকল দেখিয়া মুগ্ধ হইতে পার!

পল্লীর হাটে-বাজারে মৎস্য-তরকারী বিক্রয় হয়, পল্লীর জমীদারী কাছারীতে জমীদারের কর সংগ্রহ হয়, পল্লীর চৌকিতে জীর্ণদেহ চৌকিদার ক্ষীণ-কণ্ঠে হাঁকিয়া ফিরে, পল্লীর ক্ষেত্রে পাট-সরিষা ধান্য কড়াই জন্মে—বাহির হইতে তুমি পরিদর্শক এ সকল দর্শন করিয়া আনন্দিত হইতে পার।

সহর হইতে জুতা, ছাতা, কাপড়, জামা এবং বিলাস-দ্রব্য নিত্য রাশি রাশি রেল-গাড়ী বোঝাই হইয়া পল্লীর বিপণীতে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইতেছে, সহরের পোষ্টাফিষ হইয়া সহস্র সহস্র টাকার ভিঃ পিঃ পার্শেল পুস্তক পত্রিকাদি পল্লীতে প্রেরিত হইতেছে, কোটি কোটি টাকার দেশী-বিলাতী পেটেণ্ট ঔষধ মফস্বলের লোকের সেবনার্থ বিক্রীত হইতেছে,—এ সকল দর্শন করিয়া বাহিরের লোকে ভাবিতে পারে, পল্লীর অবস্থা সমুন্নত।

কিন্তু বাস্তবিক ভাল নহে। যাহা ছিল, তাহা নাই। যাহা থাকিলে মানুষ সর্ব্বসুখে সুখী হয়, পল্লীবাসী তাহাই হারাইয়া ফেলিয়াছে। সে কি? খুঁজিয়া পাই না, তাহা কি? ভাবিয়া পাই না, এক কথায় তাহার কি নাম প্রদান করিব? প্রথমে মনে হয়, বুঝি স্বাস্থ্য। বঙ্গের প্রতি পল্লী-তলে অনুসন্ধান করিলেই দেখা যাইবে—অস্বাস্থ্যের তুষানলে ধিকি ধিকি জ্বলিয়া জ্বলিয়া পল্লী ছারখার হইয়া গেল। যে গ্রামে কুড়ি বৎসর আগে পাঁচশত ঘর

লোকের বসতি ছিল, এখন সেখানে একশত ঘরে ঠেকিয়াছে। পরিত্যক্ত নিষ্প্রদীপ ভিটাগুলি ভাঁইট-আইস সেওড়া প্রভৃতি আগাছার স্তূপ বুকে করিয়া নীরবে পড়িয়া আছে। যে একশত ঘর লোক আছে, তাহার মধ্যে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখ—বুঝিয়া দেখ,—গণিয়া দেখ,—আর পঁচিশ ঘরও যায় যায়! হয় ত দশঘরে দশটী বা পনরটী বিধবা মাত্র বাস করিতেছে, তাহারা মরিলেই সব ফুরাইয়া যায়—তাহাদের বাস্তুভিটাগুলিও তাহাদের বক্ষ হইতে বহুদিবসের আবাস-গৃহগুলি নামাইয়া ফেলিয়া দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে। আরও পাঁচ ঘর দেখ, হয় ত দুইটী স্ত্রী-পুরুষে বাস করিতেছে,—তাহাদের কতটী সন্তান হইয়াছে,—সবগুলিকে ক্রমে ক্রমে অকালে কালের কোলে ঢালিয়া দিয়া, শোকের হাহাকার বুকে চাপিয়া, মৃত্যুর অপেক্ষায় জীর্ণ-শীর্ণ দেহে স্ত্রী-পুরুষে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি যাপন করিতেছে। তাহারা গেলেই সে বংশের শেষ হইয়া গেল। কয়েক ঘরের বা সন্তান আদৌ হয় নাই। স্ত্রী-টির হয় ত বারমেসে জ্বর—নয় ত পুরুষটির মেহ ও কাস। তিনি আরোগ্যের আশায় পূর্ব্বপুরুষগণের বিষয়ের উপস্বত্বে কলিকাতার বিজ্ঞাপন-দাতাগণের পার্শেল গ্রহণ করিয়া নিত্য ঔষধ ক্রয় করিতেছেন। ফল, তাঁহা-দেরও বাস্তুভিটা শীঘ্রই জঙ্গলে পূর্ণ হইবে, সন্দেহ নাই। তারপরে দুই চারি ঘর এমন বাড়ীও দেখিতে পাওয়া যায়, শুনিতে তাঁহারা সকলেই আছেন, কিন্তু সকলেই সহরবাসী ;—বাড়ীতে থাকেন, তাঁহাদের বৃদ্ধা মাতাঠাকুরাণী আর এক একটি দাসী। দেশে আসিলে ছেলেপুলে বাঁচান দায়,—পাঁচদিন না যাইতে যাইতে সবগুলিকে অসুখে ধরে। আর পল্লীতে স্কুল নাই, লেখা-পড়া হয় না। পল্লীতে তাঁহাদের অনেক জায়গা-জমী আছে, বাড়ী আছে, বাগান আছে, পুকুর আছে, মান আছে, সম্ভ্রম আছে,—নাই কেবল শান্তি আর সুখ। তাঁহাদের আগেকার সেই সদা সহাস্য অতিথি-অভ্যাগত আত্মীয়-কুটুম্বগণপূর্ণ বাড়ী—দেবদোল পূজাপার্ব্বণের আনন্দ-কোলাহলোজ্জ্বল বাড়ী—প্রজামণ্ডলীর যাতায়াতে, ভিখারী-ভিখারিণীর গতায়াতে, গুরু-পুরোহিত ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের আশীর্ব্বাদ-প্রসাদে নিত্য সুখকর বাড়ী ঊর্ণাতন্তুতে সমা-বেষ্টিত, বাদুড়-চামচিকায় পরিপূর্ণ ও বন্য কপোত-কপোতীর বাসায় পূর্ণিত ও ইঁদুর আরসুল্যা পূরিয়া রহিয়াছে। তাঁহার মাতার মৃত্যুর শ্রাদ্ধের সঙ্গে সঙ্গেই সে বাড়ীরও ধ্বংসসম্ভব পনর আনা তিন পাই।

কেন এমন হইল ? কেন দেশব্যাপী সাধের সাজানো কাননে এত শীত

এমন দাবানল জ্বলিল? অনেকে বলেন, স্বাস্থ্য। কাল ম্যালেরিয়া আর কলেরা বঙ্গের পল্লীভূমির এই দুর্দ্দশা করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে।

বাস্তবিক ম্যালেরিয়া ও কলেরার কাল-কবলে পতিত হইয়াই বঙ্গমাতা তাঁহার পল্লী-ভবনের সন্তান হারাইয়া নীরব-রোদনে শোকের হাহাকার তুলিতেছেন।

আমাদের দয়ালু ও প্রজাবৎসল বৃটিশরাজ প্রজাক্ষয়ে বড় বিচলিত হইয়াছেন। প্রজার নীরব-রোদনে তাঁহার রত্ন-সিংহাসন টলিয়া গিয়াছে,—তাই ম্যালেরিয়া কমিসন বসিয়াছে এবং কি উপায়ে বাঙ্‌লা হইতে কাল ম্যালেরিয়া বিদুরিত হয়, কি উপায়ে দেশ রক্ষা হয়, কি উপায়ে পল্লীর প্রজা দীর্ঘজীবী হয়, তাহার জন্যে অভিজ্ঞ জনগণের সমিতি বসিতেছে, অনুসন্ধান হইতেছে, বিজ্ঞানের মাপকাটিতে পরিমিত হইতেছে এবং তজ্জন্য রাজকোষ হইতে অর্থও প্রচুরতর ব্যয়িত হইতেছে, কিন্তু ফলে কিছুই হইতেছে না। জনক্ষয়ের মাত্রা যেমন বর্দ্ধিত বেগে চলিতে হয়, তেমনই চলিতেছে,—যেমন গ্রামে গ্রামে মহামারী, পাড়ায় পাড়ায় ক্রন্দন-রোল, গৃহে গৃহে হাহা-রব—তেমনই থাকিয়া যাইতেছে।

সহরে ম্যালেরিয়া নাই, পল্লীতে ম্যালেরিয়ায় সর্ব্বনাশ-সাধন করিতেছে,—অথচ তাহা কি এবং কেমন করিয়া বিদুরিত হয়, তাহাই স্থির করিবার জন্য রাজকোষ হইতে রাশি রাশি অর্থ ব্যয়িত হইয়া যাইতেছে। আ'জ যে অভিমতি স্থির সিদ্ধান্তে পরিণত হইতেছে, কালি তাহা কাজের কথা নহে বলিয়া পরিত্যক্ত হইতেছে।

এতদ্ভিন্ন পল্লীর শান্তি, পল্লীর সুখ, পল্লীর আনন্দ আরও বহুপ্রকারে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। এক কথায় পল্লীর স্বাস্থ্য গিয়াছে, পল্লীর সুখ গিয়াছে, পল্লীর শান্তি গিয়াছে।

সহরে কেহ কাহারও সন্ধান রাখে না, কেহ কাহারও অপেক্ষা করে না, কেহ কাহারও খাতির করে না। এক কথায় সমাজ ও সহানুভূতি এবং সমবেদনা বলিয়া কোন জিনিষ এখানে নাই। সবাই আপন আপন। আগে পল্লীতে এ জিনিষগুলা বড় অধিক ছিল—প্রতি গৃহস্থের প্রাণের ত্বকে ইহা বিজড়িত ভাবে অবস্থান করিত,—সর্ব্বজাতির মধ্যে কেমন প্রীতির বাঁধন ছিল,—যেন এক একটি পল্লী এক একটি সংসার—পার্শ্ববর্ত্তী দশ বারখানি গ্রাম লইয়া এক একটি সমাজ। সকলেই একই সুখ-দুঃখে সুখ-দুঃখভাগী

ছিল। এখন তাহা নাই—এখন সকলেই স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙ্খল। এখন বুঝি সমাজের বাঁধন নাই, প্রীতির আনন্দ নাই। কেহ কাহারও কথা শুনে না,—কেহ কাহাকেও মান্য করে না। যাহার মনে যাহা আইসে, সে তাহাই করিয়া চলিতেছে।

ব্রাহ্মণ-শূদ্রে—হিন্দু-মুসলমানে—সর্ব্বজাতিতে এক হইয়া, সমাজ ও সম্পর্ক পাতাইয়া—পরস্পর পরস্পরের স্বার্থ বজায় রাখিয়া পল্লী-ভবনের সুখদ আলোকতলে বড় শান্তিতে দিন কাটাইত, কিন্তু তাহা আর নাই।

গিয়াছে, আমাদেরই দোষে। আসে আবার যদি আমাদেরই যত্নে। সে যত্ন বিনা শিক্ষায় আর আসিবে না। সে শিক্ষা-দীক্ষা আমাদের হৃদয় হইতে সম্পূর্ণরূপে অপগত হইয়াছে। তাহাতেই ইতঃপূর্ব্বে পল্লীকথা প্রবন্ধে আমরা বলিয়াছি, জাতীয় শিক্ষা জাতীয় হস্তে না আসিলে জাতির উন্নতি অসম্ভব। কিন্তু রাজশক্তি ব্যতিরেকেও উচ্চ-শিক্ষা অসম্ভব। অতএব পল্লীর উন্নতি করিতে হইলে আমাদিগের কিছু কাজ করিবার আবশ্যক হইয়াছে। রাজা আমাদের পরম দয়ালু,—আমাদের দুরবস্থা দেখিয়া তাঁহার প্রাণ বিচলিত হইয়াছে। আমরা যদি কাজ করিতে পারি, আমরা যদি আমাদের উন্নতি করিতে পারি, রাজা আমাদের সহায়তা করিতে পারেন,—ইহা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করা যাইতে পারে।

অনেকে মনে করিতে পারেন, আমরা ইহা কেবল নিরর্থক বলিয়া যাই-তেছি,—রাজা আমাদের এই দুরবস্থা অপনোদনার্থ কোন ব্যবস্থাই করেন নাই, বা করিবেন না।

রাজা চেষ্টা করিয়াছেন—কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার অবস্থায় তাহাতে কোন ফল প্রদান করিতে পারে নাই।

সহর ও মফস্বলের স্বাস্থ্যের অবস্থার তুলনায় মনে হয়, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাবেই পল্লীতে পল্লীতে জনক্ষয় হইতেছে। গভর্ণমেণ্ট হইতে তাই দুইটী বিধান প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছিল,—এক ইউনিয়ান কমিটি বা পল্লী-সমিতি, আর বর্ত্তমান পঞ্চাইত প্রথা। কিন্তু আমাদের পল্লীবাসীর দোষে দুইটীই নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে।

বলিতে লজ্জায়, ক্ষোভে ও ঘৃণায় মুখ বন্ধ হইয়া আইসে যে, আমরা রাজ-দত্ত ক্ষমতা ও অর্থের সম্পূর্ণ অপব্যবহার করিয়া রাজ-সাহায্য হইতে সাধা-রণকে প্রবঞ্চিত করিয়াছি ও করিতেছি। যাঁহার হস্তে এতটুকু ক্ষমতা

দেওয়া হইয়াছে, তিনিই তাহা নিজের স্বার্থে প্রয়োজিত করিয়াছেন। গুটি-কয়েক টাকা যাঁহাকে পল্লীর জঙ্গল কাটাইবার জন্য একটু রাজশক্তি দেওয়া হইয়াছে, তিনি আগেই গিয়া তাঁহার বিপক্ষের অর্থাৎ যাঁহার সহিত মনো-বিবাদ বা আগেকার ঝগড়া-কলহ আছে, তাঁহার জীবিকার উপায়-স্বরূপ আম-কাঁঠালের বাগান, বাঁশ-বাগান বা কলাবাগানগুলি কাটিতে বসিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার নিজের বা নিজ-পক্ষীয়গণের বাজে জঙ্গলে যে দিক্ সমাচ্ছন্ন হইয়া আছে, সেদিকে দৃষ্টিক্ষেপও করেন নাই। যিনি পল্লীর রাস্তা-সংস্কারের জন্য ত্রিশ টাকা হাতে পাইয়াছেন, তিনি তাহা হইতে পনরটী টাকা নিজের তহবিলে মিশাইয়া দিয়া বাকি পনরটী টাকার কার্য্য নিজের বাড়ীর পার্শ্ববর্ত্তী রাস্তাটুকুর উপরেই করাইয়া লইয়াছেন। কোথাও সম্পূর্ণ টাকাই আত্মারাম সরকারের হাড় হইয়া উড়িয়া গিয়াছে।

স্পষ্ট কথা বলিতে হইলে বলিতে হয়, পল্লীর মানুষ আমরা দানব সাজিয়াছি। স্বার্থপরতা পাপে আমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সেই মহাপাতকের ফলেই আমাদের দেশব্যাপী সর্ব্বনাশ উপস্থিত। আমাদের দুঃখ-দুর্দ্দশা—আমাদের রোগ-যন্ত্রণা—আমাদের শোক-তাপ ঘুচাইতে হইলে আমাদের সেই পাতকরাশির প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। কথাটা শুনিতে আপাততঃ ভাল লাগিবে না—বিশ্বাসও হইবে না, কিন্তু প্রমাণে ছিদ্র নাই। যদি অবসর পাই, আর অবসর-সম্পাদক অবসরে স্থান দেন,—সব কথাগুলি এক এক করিয়া গুছাইয়া বারান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

মানব-জীবন।

কে বলে জীবন মাত্র সুখের স্বপন ?
কে বলে সংসার শুধু শান্তি-নিকেতন ?
শুধু ভ্রান্তি, শুধু দাহ, শুধু অসারতা।
বুকফাটা হাহাকার, দুঃখের বারতা॥
জীবনের প্রতিপদে কতই যে ভুল।
কত কষ্ট সেই ভুলে নাহি তার কূল॥
সুখের স্বপন নহে—দুঃখের কাহিনী।
মর্ম্মভেদী হা-হুতাস্ দিবস-যামিনী॥
দূর হ'তে মনে হয় সুখের আগার।
কাছে গেলে দেখি তাহে দুঃখের আধার॥
সুখ শান্তি এ জীবনে কোথায় বা পাই ?
শুধু ভ্রম, মহাভ্রম, বুঝি যে সদাই॥
এক বিন্দু শান্তি যদি থাকিত এখানে,
তা' হ'লে কি এত ভ্রম হ'ত এ জীবনে ?

শ্রীজ্ঞানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

শিক্ষার দোষ।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

নূতন ব্যবস্থা।

ননিলাল প্রায় একমাস হইতে ছাত্রকে শিক্ষা দিতে আসিতেছেন। দুই বেলার একবেলাও কোন দিন অনুপস্থিত হন নাই। যথোচিত মনোযোগ-সহকারেই ছাত্রকে অধ্যয়ন করাইতেন। ছাত্রের নাম আর্য্যকুমার। আর্য্য-কুমার মেধাবী বালক,—শিক্ষকের উপদেশ সম্যক্‌ভাবে গ্রহণ করিত এবং পড়াশুনায় বেশ কৃতিত্ব দেখাইত।

ইহার মধ্যে এক ব্যবস্থা ছিল,—আর্য্যকুমার রাত্রি আটটার সময় গ্রন্থাধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া সঙ্গীত শিক্ষা করিত। পৃথক্ একজন সঙ্গীত-অধ্যাপক আসিয়া তাহাকে হারমোনিয়ম বাজনা ও তাহার সঙ্গে কণ্ঠসঙ্গীত শিক্ষা দিত। আটটার পূর্ব্বে ননিলাল চলিয়া যাইত। যিনি সঙ্গীত-শিক্ষক, তিনি আরও দুই তিন স্থানে গান-বাদ্য শিক্ষা দিতেন। এখন এমন এক ঘটনা উপস্থিত হইল, যাহাতে সঙ্গীত-শিক্ষক রাত্রি আটটার সময়ে আর্য্যকুমারকে শিক্ষা দিতে উপস্থিত হইতে পারেন না। আটটার পূর্ব্বে যে কোন সময়ে হইলে তাঁহার সুবিধা হয়।

আর্য্যকুমারের পিতা ভোলানাথ বাবু সে কথা শুনিয়া ব্যবস্থা করিয়া দিলেন,—তুমি সন্ধ্যার সময়ে আসিয়া এক ঘণ্টা সঙ্গীত শিক্ষা দিয়া গেলে, তারপরে মাষ্টার মহাশয় গ্রন্থাধ্যয়নাদি করাইবেন। কাজেই ননিলালের সময় সন্ধ্যার একঘণ্টা পরে নির্ণীত হইল।

ননিলাল আফিষ হইতে আসিয়া হাত-মুখ ধুইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ছাত্রের বাড়ী ছুটিয়া আসিতেন। পূর্ব্বে মেসে আসিয়া যে মুড়ী ভোজন করিতেন, বর্ত্তমানে তাহার আর তাহা প্রয়োজন হইত না। তিনি ছাত্রাবাসে আসিয়া এক পেয়ালা চা ও কয়েকখানা বিস্কুট ভোজনে ক্ষুন্নিবারণ করিতেন। এখন তাঁহার সময় পরিবর্ত্তন হওয়ায় বড়ই অসুবিধা হইল। এক পয়সার মুড়ী খরচে যত অসুবিধা না হউক, এক পেয়ালা চা যে অন্ততঃ চারি পয়সা! দুই বেলা চা' পান এখন তাঁহার মৌতাতের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। চা' পান

না করিলে শরীর মাটী মাটী করে—ভার ভার জ্ঞান হয়। সমস্ত দিবসের পরিশ্রমের ক্লান্তি যেন সর্ব্বাঙ্গে জড়াইয়া বসিয়া থাকে।

দুইদিন দোকান হইতে কিনিয়া চা পান করিলেন,—কিন্তু তেমন মধুর লাগিল না। সে যেমন প্রস্তুত—যে আস্বাদ বিশিষ্ট, দোকানের চা' তেমন লাগিল না। বিস্কুটগুলি তেমন গন্ধাস্বাদ বিশিষ্ট নহে,—অথচ চা-বিস্কুটে বৈকালে ছয় পয়সা করিয়া ব্যয় হইতে লাগিল। ননি বড়ই অসুবিধা জ্ঞান করিতে লাগিল। তবে সকালের ব্যবস্থা পূর্ব্ববৎই ছিল।

অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া ননিলাল এক মতলব আঁটিল, এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে হেদোর ধারে উপস্থিত হইল। সে জানিত, ভোলানাথ বাবু আর্য্যকুমারকে সঙ্গে লইয়া প্রায় প্রত্যহ বৈকালে হেদোর ধারে বেড়াইতে আসিতেন। ননিলাল পদচারণা করিয়া বেড়াইতেছিল, তাঁহারাও বেড়াইতেছিলেন—সাক্ষাৎ হইল। ভোলানাথ বাবুকে ননিলাল নমস্কার করিল।

ভোলানাথ বাবু প্রতিনমস্কারার্থ হস্তোত্তোলন করিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"মাষ্টার মহাশয় যে! আপনি কি প্রত্যহই ভ্রমণ করিতে আসেন?"

বিনীতভাবে ননি বলিল,—"সমস্ত দিনের আফিষ-খাটুনী। সন্ধ্যার পূর্ব্বে একটু ভ্রমণ করিলে যেন ক্লান্তি দূর হয়।"

ভোলানাথ চলিতে আরম্ভ করিলেন। পুত্র আর্য্যকুমার, মাষ্টার ননিলাল তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল।

ননিলালের কথার উত্তরে ভোলানাথ বাবু বলিতে লাগিলেন,—"হাঁ হাঁ, অঙ্গচালনা উৎকৃষ্ট ব্যায়াম। আমিও আর্য্যকে লইয়া তাই প্রত্যহ এখানে বেড়াইতে আসি। এখানকার বায়ুও অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ।"

ননি। আজ্ঞে, এখানে রোজ রোজ আসার পক্ষে আমার কিছু অন্তরায় ঘটিয়া উঠিয়াছে।

অন্যমনস্কভাবে ভোলানাথ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি?"

ননি। এখান হইতে আমাদের মেস অনেক দূর।

ভোলা। তাই কি? একটু অধিক হাঁটনা ত ভাল। বিশেষতঃ আমাদের বাড়ী যাইবার পথও তোমার এই।

ননি। আজ্ঞা হাঁ। তবে এখানে আসিয়া বেড়াইয়া আবার আমাকে বাসায় যাইতে হয়,—আবার আসিতে হয়। দোকার হাঁটুনী পড়ে।

ভোলা। "কেন? আবার বাসায় যাও কেন?

ননি। সন্ধ্যার একঘণ্টা পরে পড়াইতে হয়,—কাজেই এতক্ষণ কোথায় থাকি!

ভোলা। বাহবা—আমাদের বাড়ী গিয়া বসিলেই পার। এখানে বেড়াইয়া আমাদের বাড়ী গিয়া চা'-টা খেয়ে, তোমার ছাত্রের ঘরে গিয়া বা সঙ্গীত আলোচনাই করিলে? সঙ্গীত মানব-জীবনের শান্তিদায়ক একটি পরম আশ্রয়, কি বল মাষ্টার?

ননি সে কথার উত্তর করিল না।

ভোলানাথ বাবু পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন,—"মাষ্টার ঘাড় নত করিয়া রহিয়াছ যে? তুমি কি উহার পক্ষপাতী নহ?"

ননি। আজ্ঞে, সঙ্গীত আলোচনার পক্ষপাতী নয়, এমন মানুষ বোধ হয় নাই।

ভোলা। তবে?

ননি। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি উহার কিছুই জানি না।

ভোলা। সে কি মাষ্টার, তুমি ইয়ংম্যান,—হারমোনিয়ম বাজনা খুব সহজ,—তাও কি তুমি জান না?

ননি। আজ্ঞা, না।

ছাত্র আর্য্যকুমার একবার বিস্মিত নয়নে শিক্ষকের মুখের দিকে চাহিল।

ভোলা। তবে তোমার এক কাজ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

ননি। আজ্ঞা করুন।

ভোলা। তুমি প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে তোমার ছাত্রের গৃহে গমন করিয়ো, এবং উহার মাষ্টারের নিকটে হারমোনিয়ম বাজান শেখ। সব বিষয়ে একটু আধটু অভিজ্ঞতা থাকা নিতান্ত প্রয়োজন,—বিশেষতঃ গান-বাজনা সম্বন্ধে। আমার বিশ্বাস, সঙ্গীত শ্রান্তজীবনের একমাত্র শান্তিদায়ক।

ননি সাহ্লাদে তাহাতে স্বীকৃত হইল।

তারপরে আরও কিয়ৎক্ষণ পদচারণা করিয়া বেড়াইয়া ভোলানাথ বাবু পুত্র ও পুত্রের গৃহশিক্ষক সমভিব্যাহারে স্বগৃহে চলিয়া গেলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সঙ্গীতশিক্ষক।

বাড়ী আসিয়া আর্য্যকুমার উপরে চলিয়া গেল, ভোলানাথ বাবু নিম্নতলের বৈঠকখানায় গমন করিলেন,—ননিলাল ভোলানাথ বাবুর সহিত গমন করিল।

ভোলানাথ বাবু গৃহপ্রবেশ করিবামাত্র ভৃত্য পায়ের জুতা খুলিয়া লইল। বাবু ফরাসে উপবেশন করিলেন এবং বলিলেন—"এস, মাষ্টার; তোমার সহিত আ'জও ভাল করিয়া আলাপ করা হয় নাই। আ'জ একটু আলাপ করি। কা'ল হ'তে তুমি উপরে যাইয়া হারমোনিয়ম বাজাইতে শিখিয়ো।"

"যে আজ্ঞা" বলিয়া ননিলাল ফরাসে গিয়া উপবেশন করিল। সেখানে তখন আরও তিন চারিজন ভদ্রলোক আসিয়া বসিয়াছিলেন।

ভৃত্য চা লইয়া আসিল। বাবু পান করিলেন, পার্শ্বের ভদ্রলোক কয়জন পান করিলেন। চা'র পাত্র লইয়া ননিলাল বাহিরে উঠিয়া গিয়া পান করিয়া আসিল।

এই সময় একটি ভদ্রলোক আসিয়া নিম্নতল হইতে "পাঁচকড়ি" বলিয়া ডাক দিল। পাঁচকড়ি বাড়ীর প্রধান ভৃত্যের নাম।

সে উত্তর দিল। যিনি ডাকিয়াছিলেন, তিনি আর্য্যকুমারের সঙ্গীত-শিক্ষক—দেবদাস বাবু।

পাঁচকড়ি উত্তর দিয়া বলিল,—"আসুন মোশায়, উপরে আসুন।"

সঙ্গীত-শিক্ষক উপরে যাইতেছিলেন, ভোলানাথ বাবু ডাকিয়া বলিলেন,—"কে, মাষ্টার মহাশয় নাকি?"

দেব। আজ্ঞা হাঁ।

ভোলা। এ দিকে আসুন।

দেবদাস বাবু গৃহপ্রবেশ করিলেন।

ননিলাল দেখিল, সুন্দর সাজে সজ্জিত একটি যুবক। তাঁহার গায়ে একটি আদ্ধির পাঞ্জাবি। পায়ে সু, পরিধানের কাপড়খানি সুন্দরভাবে কোঁচান। বুক-পকেটে ঘড়ী, হাতে ছড়ি,—চোখে চশমা। মাথার চুল সম্মুখের দিকে লম্বা, তাহাতে টেড়ী কাটা। পশ্চাৎ দিকের চুল অতিশয় ছোট করিয়া

কাটা। দাড়ীগুলি ফ্রেন্স কাটে কর্ত্তিত। বুক-পকেটে রুমাল—গায়ে সুগন্ধ ভরভর করিতেছে।

দেবদাস বাবু গৃহপ্রবেশ করিলে, ভোলানাথ বাবু বলিলেন,—"আপনার ছাত্র কেমন অভ্যাস করিতেছে?"

দেবদাস বাবু গোলাপী রকমের একটু হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"ভারি প্রতিভা। কালে একটা মানুষ হইবে। দেখুন ত উহাকে কি করিয়া তুলি।"

ননিলাল হাঁ করিয়া সঙ্গীত-শিক্ষকের রূপ দেখিতেছিল। তারপরে তাহার দাঁড়ানভঙ্গী, হাসির কায়দা আর কথার ভাব দেখিয়া-শুনিয়া ননি বুঝিল,—লেখাপড়ার চেয়েও যেন গানের গর্ব্ব অধিক। ইনি গান শিখাইয়া আর্য্যকে উন্নত করিবেন—মানুষের মত মানুষ করিয়া দিবেন,—ইহা ত নূতন শুনিলাম। ননিলালের এতদিন ধারণা ছিল, গান-বাজনা শিখিলে—ওকাজে মাতিলে লোকের লেখাপড়া ভাল হয় না। বিশেষতঃ ছেলেদের ওদিকে মাথা দিতে দিলে বিগড়াইয়া যায় বৈ সৎ হইবার আশা কেহ করে না। আর্য্যকুমারে যে সে দোষ ধীরে ধীরে—অল্প অল্প রূপে প্রবেশ করিতেছে না, তাহা কেহই বলিতে পারিবে না। আর্য্যকুমার গান লইয়া সময় কাটাইতে যেমন ভালবাসে, লেখাপড়ায় তেমন নহে।

ননি সে কথা ভাবে, সে হয়ত পল্লীরাজ্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া—সহরের বর্ত্তমান শিক্ষা পায় নাই বলিয়া। আমরা জানি, থিয়েটার আ'জ কা'ল কলিকাতার বাবু মহাশয়দিগের স্ত্রীপুত্রাদির শিক্ষার আদর্শ-আগার! অভিনেতা-অভিনেত্রীকুলের হাব-ভাবময় মূরতির প্রতিকৃতি পুস্তকে ও পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হইতেছে! বালক-বালিকা ও তাহাদের কন্যাভগিনী দর্শন করিতেছে। ননি তাহা জানিত না,—তবে সহরে থাকিতে হইলে জানিতে হইবে।

ননি এইরূপ কি ভাবিতেছিল,—ভোলানাথ বাবু বলিলেন,—"ইনি আর্য্যের গৃহশিক্ষক। ভদ্রলোক—আপনার সহিত আলাপ হয় নাই?

ঈষৎ উদাস, ঈষৎ অবজ্ঞা, ঈষৎ গম্ভীরভাবে এবং অধরে মধুর ঈষৎ হাসির একটু রঙ ফলাইয়া, ঈষৎ বক্র চাহনিতে ননির মুখের দিকে চাহিয়া দেবদাস বাবু বলিলেন,—"নমস্কার মোশাই।"

প্রতি নমস্কার করিয়া ননি বিনীতভাবে বলিল,—"আপনার সহিত আলাপে আপ্যায়িত হইলাম।"

দেবদাস বাবু মৃদু একটু হাসিলেন, সে কথার কোন উত্তর করা প্রয়োজনীয় জ্ঞান করিলেন না। তারপরে তিনি সগর্ব্বে উপরে যাইতেছিলেন।—ভোলানাথ বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"এঁর নাম, ননি বাবু। ননিবাবু মোটে গান-বাজনা জানেন না।"

দেবদাস বাবু যেন চমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। যেন তাঁহার মনে হইল, 'কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরং'—মানুষে বিশেষতঃ ভদ্রনামধারী ব্যক্তি গান-বাজনা জানে না, ইহা হইতেই পারে না। অন্ততঃ মুখের ভঙ্গীতে সেইরূপ ভাব দেখাইয়া মৃদু হাসিয়া দেবদাস বাবু বলিলেন,—"দুঃখের কথা! শাস্ত্রে আছে, 'সঙ্গীত-সাহিত্যে জ্ঞানহীন ব্যক্তি পশু।' তা' কেবল বুঝি হারমোনিয়মটা বাজাইতে জানেন?"

ননি বলিল—"না মহাশয়; তাও না।"

আরও আশ্চর্য্য, আরও দুঃখিত, আরও ব্যথিত হইয়া দেবদাস বলিলেন,—"তবে?"

ননি। তবে আর কি মহাশয়! পল্লীগ্রামে শিক্ষা-দীক্ষা ও-সব কিছুই জানা নাই।

দেব। পল্লীগ্রামে! কেন, সেদিন আমাদের থিয়েটারের ড্রামেটিক্ মাষ্টার মহাশয় যখন লেক্‌চার দেন, তখন ভারতের বর্ত্তমান সম্পদ ও ভবিষ্যৎ আশার কথা বলিতে বলিতে বলিতেছিলেন—"এখন পল্লীতে বালকেরা ক্লাব করিয়াছে—থিয়েটার করিতেছে—গান-বাজনা ও বক্তৃতা শিক্ষা করিতেছে। নৃত্য-কলাতেও চূড়ান্ত শিক্ষা লাভ করিতেছে।" কিন্তু আপনার কথা শুনিয়া আমার প্রাণটা যেন কেমন ধোঁয়াটে ধোঁয়াটে হইয়া উঠিল।

ননি। সে হয় ত আমাদের গ্রামের চেয়েও উন্নত পল্লীতে।

দেব। পল্লীরও আবার উন্নত অবনত আছে নাকি? চোরের মধ্যেও মহাশয় আছেন!

উপস্থিত ভদ্রলোকেরা সে কথায় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। স্বয়ং ভোলানাথ বাবুও হাসিলেন। সে হাসিতে দেবদাস বাবু উৎফুল্ল হইলেন, গর্ব্বিত পদক্ষেপে গৃহের বাহির হইয়া উপরে চলিয়া গেলেন, এবং ননিলাল অপ্রতিভের মন্দীভূত হাসি ফলাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া একপার্শ্বে বসিয়া রহিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্মমত।

একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক ননিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমাদের দেশ কোথায় বাপু?"

ননি। * * জেলায় * * গ্রামে।

প্রৌঢ়। সে কি খুব ক্ষুদ্র পল্লী?

ননি। আজ্ঞে, হাঁ।

প্রৌঢ়। সেখানে ইলেক্‌ট্রিক লাইট্ জ্বলে না গ্যাসের আলো?

ননি। আজ্ঞে না—কোন আলোই জ্বলে না। ক্রাসিনের ডিবায় কৃষক পাড়ায় রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত আলোক দেয়। ভদ্রলোকের বাড়ী কোথাও কাচাধারে ক্রাসিন জ্বলে, কোথাও মৃৎপ্রদীপে রেড়ীর তেল পুড়ে। তাহার সময় রাত্রি নয়টা বা দশটা পর্য্যন্ত :—

প্রৌঢ়। তারপর?

ননি। তারপর সব একাকার। জ্যোৎস্নারাত্রে জ্যোৎস্নার কোলে এবং অন্ধকার রাত্রে অন্ধকারের তলে ধনী-দরিদ্রের প্রাসাদ-কুটীর একাকার সুপ্ত থাকে।

প্রৌঢ়। কি ভয়ানক! এ যে অসম্ভব কথা! সেখানে লোক বাঁচে কি করিয়া? তবে কি জলের কলও নাই?

ননি। জলের কল নাই—

প্রৌঢ়। মানুষের চলে কি করিয়া?

ননি। পুকুরের জল, নদীর জল, পাতকূয়ার জল,—কিন্তু গ্রীষ্মকালে সর্ব্বত্র জল থাকে না। তখন স্থানে স্থানে জলের কষ্ট উপস্থিত হয়।

প্রৌঢ়। আমাদের এই মাতৃভূমে—এই বঙ্গে?

পার্শ্বোপবিষ্ট আর একজন ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মতিভায়া কি কখন পল্লীতে যাও নাই?"

প্রৌঢ়। যাব না কেন,—একবার বর্দ্ধমান গেছিলুম।

ভদ্র। নিজ বর্দ্ধমানে?

প্রৌঢ়। হাঁ। ভাবিয়াছিলাম, পল্লীর উহাই পরিসমাপ্তি। আমি যে, নূতন নভেলখানা লিখিয়াছি—

ভদ্র। ও, তোমার পল্লীচিত্র ?

প্রৌঢ়। হাঁ হাঁ—সে যে সব সম্পাদক উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছে। কিন্তু আমি দেখিতেছি, পল্লীর ত আমি কোন খোঁজই রাখি না।

ভদ্র। খবরের কাগজের প্রশংসা—ও ছেড়ে দাও। তুমি একখানা খবরের কাগজের সম্পাদক—চিঠি লিখে বই পাঠিয়েছ, কাজেই প্রশংসা না ক'রে থাকে কেমন করিয়া। তারা কি আর বই পড়ে সমালোচনা করে, না বেদ-বেদান্তাদি যত বইয়ের সমালোচনা করে, তাতে তাদের কিছুমাত্র অধিকার আছে।

প্রৌঢ়। যাক্,—মাষ্টার মহাশয়, পল্লীর মানুষ দেখিতে কি এক অদ্ভুত রকমের ?

ননি। না, এমন কি অদ্ভুত রকমের। এই রকমের। আমরা ত পল্লীর লোক।

প্রৌঢ়। তোমরা ত শিক্ষিত,—

আর একজন বলিলেন,—"তবু বোঝা যায়, যে মাষ্টার মহাশয় পাড়াগেঁয়ে।"

সকলেই তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক ওরফে মতিবাবু বলিলেন—"তা ঠিক ব'লেছেন। মাষ্টার মহাশয়ের পরণ-পরিচ্ছদ—ভাবভঙ্গী যেন কিছু সাধারণ।"

ভদ্র। সাধারণ কি প্রকার ?

মতি। যেন কেমন কেমন। দেখিতে ভাল নয়—অগোছাল। মাথার চুল লম্বা লম্বা ইত্যাদি।

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। ননি আরও অপ্রতিভ হইল।

হাসির বেগ প্রশমিত হইলে, মতিবাবু বলিলেন,—"মাষ্টার মহাশয়, অপরাধ লইবেন না। কথার উপরে কথা পড়িয়া গিয়াছে। জানেন কি,—আপনি ইয়ংম্যান—শিক্ষিত। আপনার একটু ছিমছামে থাকা উচিত। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা স্বাস্থ্য ও মনের উন্নতিকারক। তবে পাড়াগেঁয়ে লোক আপনারা, সেদিকে আপনাদের লক্ষ্য নাই। যাক্, মনে কিছু করিবেন না। আপনাদের পাড়াগাঁয়ে সাধারণের ধর্ম্মমত কি ?"

ননি গলা ঝাড়িয়া বলিল—"ধর্ম্মমত কি এক রকম আছে। যারা ব্রাহ্মণ, তারা সন্ধ্যা-আহ্নিক করে, শিবপূজা, নারায়ণপূজা করে। কায়স্থাদি উচ্চ জাতিগণও ঐরূপ করে। ইতর শূদ্রগণ কেউ মালা জপে, কেউ পূজা-পার্ব্বণে

যোগ দেয়। ছেলেমেয়ের অন্নপ্রাশন-বিবাহে লোকজন খাওয়ায়। সঙ্গতি-শালী ব্যক্তিমাত্রেরই বাড়ীতে দোল-দুর্গোৎসব হয়। এই গেল, হিন্দুর বাড়ী। মুসলমানেরা নমাজ পড়ে—মহরম-ইদ প্রভৃতি করে, আর আপন আপন ছেলে-মেয়ের বিবাহে কুটুম্ব সাক্ষাৎ খাওয়ায়।"

মতিবাবু একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"ইহাই ধর্ম্ম-জীবনের পরি-সমাপ্তি।"

ভোলানাথ বাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"আর কি করিতে বল,—মতিদা?"

মতি। বাস্তবিক কি ইহাই ধর্ম্ম?

ভোলা। তবে কি?

মতি। ইহা সকাম ধর্ম্ম।

ভোলা। তবে নিষ্কাম ধর্ম্ম কি?

মতি। সে অনেক কথা। সম্প্রতি আমি 'নিষ্কামধর্ম্ম' নাম দিয়া এক-খানি গ্রন্থ লিখিব স্থির করিয়াছি—তাহাতে ধর্ম্মের রূপ অতি স্ফুটতর ভাবেই প্রকাশ করিব।

ভোলা। সে যখন প্রকাশ হয়, তখন পড়িব—আপাততঃ একটু বলই না।

মতি। দেখুন, সকল কথা মৌখিক বলা পোষায় না। তবে আমি একথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারি, জগতে যদি কোন ধর্ম্ম থাকে, তবে সে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম;—অপরগুলি সব উপধর্ম্ম।

ভোলা। এ কথা কি ঠিক হইল?

মতি। কেন হইল না?

ভোলা। একজন ক্ষুদ্র মানবের বুদ্ধিতে কোন্ ধর্ম্ম ভাল, কোন্ ধর্ম্ম মন্দ, তাহা স্থির করা যায় না বা করিতেও নাই। হিন্দু বলিয়াছেন—"যে যে ধর্ম্মাচারীবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে—তাহার সেই ধর্ম্ম পালন করাই কর্ত্তব্য। এখানে গুণ ও ধর্ম্ম বোধ হয়, একার্থবাচক হইয়াছে।

মতি। উহা অতি অশ্রদ্ধেয় কথা।

ভোলা। কথাটার মূল্য কত, হয় ত ভাবিয়া দেখ নাই বলিয়া, ধাঁ করিয়া একটা উত্তর করিয়া ফেলিলে।

মতি। অনেক ভাবিয়াছি—সকল হিন্দুই প্রায় ঐ কথা বলে। কিন্তু কেন বলে, জান কি?"

মতি। হিন্দু ধর্ম্মটা অত্যন্ত দোষপূর্ণ। তাই বলে, সদোষ স্বধর্ম্মও ভাল, সু-অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম দোষাবহ। কেননা, তাহাদের এই কথায় কোন হিন্দুই নিজের দোষযুক্ত ধর্ম্মত্যাগ করিয়া সু-অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম গ্রহণ করিবে না।

ভোলা। না ভায়া, হিন্দু সে ভাবে ঐ কথা প্রয়োগ করেন নাই। সমগ্র ধর্ম্মীর জন্যে ঐ কথা বলিয়াছেন—কেবল হিন্দুর জন্যে বলেন নাই। এই স্থানেই হিন্দুর দূরদর্শিতা ও মাহাত্ম্য। গোবংশে জন্মিয়া গরু যদি মহিষের আচার-ব্যবহার পালন করিতে যায়, কখনই তাহা পালন করিতে পারে না।

মতি। তুমিও গোঁড়া হিন্দুর মত তর্ক কর।

ভোলা। আমি হিন্দু, খ্রীষ্টান, জৈন, ব্রাহ্ম বা কোন ধর্ম্মেরই নিন্দা করি না—বা গোঁড়ামী ভালবাসি না। তবে হিন্দুবংশে জন্মিয়াছি, হিন্দু-ধর্ম্ম ভালবাসি। আমার বিশ্বাস—স্ত্রীলোককে পুরুষের মত শিক্ষা দিলে, মেথরকে ব্রাহ্মণের মত ধর্ম্মমতে চলিতে দিলে তাহারা তাহা পারে না। তবে ক্রমশিক্ষায় উন্নত হইতে পারে,—জন্মের পর জন্মান্তরে মেথর ব্রাহ্মণ হইতে পারে।

মতি। ব্রাহ্মণ কি তবে চিরদিনই ব্রাহ্মণ থাকিয়া যাইবে?

ভোলা। যাহার উন্নতি আছে, তাহার পতনও আছে। ব্রাহ্মণও মেথর হইতে পারে। উন্নতির চেয়ে সব বিষয়েরই পতন যেমন শীঘ্র হয়, ইহাতেও তাহাই হয়। তবে চেষ্টায় একজন্মেও সব হইতে পারে। হিন্দুও সে কথা মানেন।

মতি। তুমি ব্রাহ্ম ধর্ম্মের তত্ত্ব দিনকতক আলোচনা কর।

ভোলা। না ভায়া,—আমি হিন্দুকুলে জন্মিয়াছি, হিন্দুধর্ম্মই আমার প্রতিপাল্য। তবে আমি কোন ধর্ম্মেরই নিন্দা করি না।

আরও অনেক কথা হইল। ননি সে সকল শুনিতে শুনিতে অনেক কথা ভাবিতেছিল। সে ভাবিতেছিল,—ভোলানাথ বাবুর আচার-ব্যবহার দেখিয়া উঁহাকে কখনই হিন্দু বলিয়া মনে করিতে পারা যায় না। কিন্তু কথায় ত জ্ঞান হইতেছে, উনি গোঁড়া হিন্দু। কিন্তু যখন আমার কাপড়-চোপড় ও কেশ-বিন্যাসাদির কথা হইল, তখন অমন 'বাবু-মেজাজী' হইলেন কেন? ছেলে মেয়েদের শিক্ষাও কি হিন্দুজনোচিত! ঐ যে উপরে হারমোনিয়মের সুরের সহিত বালক-পুত্রের কণ্ঠস্বর উঠিয়া আকাশপথে চালিত হইতেছে, ইহাও কি হিন্দু-মত! হবে—সহুরে শিক্ষা হয় ত এইরূপেই দিতে হয়!

ক্রমে তাহার সময় হইল। পার্শ্বের ঘড়ীতে টং টং করিয়া আটটা বাজিল। উপরের হারমোনিয়ম নিস্তব্ধ হইল। পাঁচ মিনিট পরে সঙ্গীত-শিক্ষক নামিয়া চলিয়া গেলেন,—ননি তাহা বুঝিতে পারিয়া উঠিয়া উপরে গেল। তখন আর্য্যকুমারের গ্রন্থপাঠ হইবে।

তখনও ভোলানাথ বাবুদের মধ্যে ধর্ম্মালোচনা হইতেছিল, ছাত্রের শিক্ষার সময় হওয়ায় ননিকে উঠিয়া যাইতে হইল, সুতরাং আর শোনা হইল না।

ক্রমশঃ।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

সমাচার।

২৬এ মাঘ রবিবার কলিকাতা-সিমলা মহেন্দ্রনাথ গোস্বামীর লেনস্থ প্রভু-পাদ ৺মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী মহাশয়ের ভবনে "গৌরীয়-বৈষ্ণব-সম্মিলনী"র বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। প্রভুপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন। প্রথমে মধুর হরিসংকীর্ত্তন-ধ্বনিতে সভাস্থল প্রেম-ভক্তির ভাবলহরীতে পূর্ণ হইয়া উঠে। তারপরে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপরে টাকীর জমিদার শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রমোহন চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বামাচরণ বসু ও বঙ্গবাসী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয়গণ বক্তৃতা করেন। তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র-মোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে সভাপতি মহাশয় কিছু বলিবার জন্য অনুরোধ করেন, কিন্তু তিনি সে দিন নিতান্ত অসুস্থ থাকায় তাহাতে অপারগতা জানাইলে শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ভাগবতভূষণ মহাশয় কিছু বলেন। তদনন্তর ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস ও রামদাস বাবাজী মহাশয়গণ সংকীর্ত্তন করেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

আমরা এই সম্মিলনীর স্থায়ীত্ব ও প্রসার কামনা করি। আ'জ কা'ল নানা অবতার—নানা ধর্ম্ম—নানামতে বঙ্গভূমি ছাইয়া বসিতেছে। পবিত্র—উদার—মহৎ বৈষ্ণব-ধর্ম্মও অকলঙ্ক স্পর্শিত নহে, এমত অবস্থায় ইহার কর্ম্ম—ইহার আচার-ব্যবহার—ইহার গম্ভীর ও উদার ভাব যাহাতে দেশের লোক সম্যক্ প্রকারে বুঝিতে পারে, তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সম্মিলনীর সে আশা আছে। তবে ইহার পরিচালনায়—আলোচ্য নির্ব্বাচনে একটু মনো-যোগী হওয়া আবশ্যক। শ্রীভগবান্ সে দিকে নিজেই গতি ফিরাইবেন। তাঁহার কার্য্য তিনিই করিয়া থাকেন।

গত অগ্রহায়ণ মাসের 'নাট্যমন্দির' নামক প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রে নায়কাদি কাগজের সম্পাদক শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ছাতুর হাঁড়ীতে বাড়ী' দেওয়া হইয়াছে। পাঁচকড়ি বাবু পত্র সম্পাদকরূপে অনেকেরই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, কিন্তু ইদানীং দেশের গণ্যমান্য সাহিত্যিকগণকে তিনি যেরূপ ভাবে গালি দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা মনে করিয়াছিলাম, শীঘ্রই তাঁহাকে অনেক অপ্রিয় শুনিতে হইবে। ঘটিয়াছেও তাহাই।

বসন্ত-আবাহন।

এস গো বসন্ত-লক্ষ্মী বঙ্গনিকেতনে,
আবরিয়া চারু-কায়া হরিত-বসনে।
মৃদুল মন্থর পদে ফুলের সুবাসে—
উড়ায়ে অঞ্চলখানি দক্ষিণ বাতাসে।
ললিত অধর-প্রান্তে ল'য়ে স্মিতহাসি,—
ফুটায়ে চরণতলে শত ফুলরাশি।
সাজায়ে বরণডালা প্রীতি পুষ্পদলে,
অর্পিছে বসুধা সতী চরণ-যুগলে!
মুঞ্জরিত কুঞ্জবনে গুঞ্জরিছে অলি,
গাহিছে মঙ্গলগাথা বিহঙ্গম মিলি।
পুলকিছে দশদিশি,—সুমন্দ পবন—
মৃদু মন্দ পুষ্প-গন্ধ করিছে বর্ষণ।
কুসুমের চারু সাজে সেজেছে ধরণী,
বর্ষ পরে হর্ষভরে এস আজি রাণী।

শ্রীমন্মথনাথ বিশ্বাস।

আদিশূরের আবির্ভাব।

বঙ্গের প্রাচীন ইতিহাস অবগত হইবার নিমিত্ত ইদানীং বঙ্গবাসীর যেন একটু কৌতূহল, অনুসন্ধিৎসা প্রবল হইয়াছে। নিজের দেশের—জন্মভূমির—কথা জানিবার জন্য এই প্রয়াস যে নিশ্চয়ই শুভ লক্ষণের,—জাতীয় উদ্দীপনার পরিচায়ক, তদ্বিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। যাহাতে এই সাধু উদ্যমের পথ ক্রমশঃ অধিকতর উন্মুক্ত হয়, প্রত্যেকেরই তৎসাধনে সাধ্যানুসারে যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য।

বঙ্গের শেষ হিন্দু নরপতিদিগের সহিত আদিশূরের শোণিতসম্পর্ক থাকা প্রযুক্তই হউক, অথবা তাঁহাদ্বারা বঙ্গে সাগ্নিক পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়নের প্রবাদের নিমিত্তই হউক, আদিশূরের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে অধুনা প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ও ঐতিহাসিক সমাজে কথঞ্চিৎ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। একপক্ষ বলিতেছেন, আদি-শূর নামে কোন নরপতিই বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই। অন্যপক্ষ আদিশূরের অস্তিত্ব-সপ্রমাণে দৃঢ়সঙ্কল্প। এ সম্বন্ধে আমরা যে তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাই পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থাপিত করিব।

যাঁহারা আদিশূরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে অভিলাষী, তাঁহাদিগের প্রধান অবলম্বন প্রাচীন কুলগ্রন্থ। ইহা এদেশে সামাজিক ও ঐতিহাসিক তত্ত্বনির্ণায়ক বিশিষ্ট প্রামাণ্য পুস্তক বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে পাশ্চাত্য প্রথানুসারে ইতিহাস লিখিবার পদ্ধতি পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল না। শ্রুতি, স্মৃতি তাহার প্রমাণ। কালক্রমে বংশপরম্পরায় এই শ্রুতি ও স্মৃতি অনুসারে যাহা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে তাহা অগ্রাহ্য করা সমীচীন কি না, ধীমানেরাই তাহা স্থির করিবেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আদিশূরের রাজত্ব সপ্রমাণ করিতে হইলে ঘটকের কারিকা প্রভৃতির সাহায্য গ্রহণ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। বাঙ্গালায় যখন হিন্দু রাজা ছিলেন, বাঙ্গালার হিন্দু সমাজের প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত যখন রাজার শ্যেনদৃষ্টি ছিল, যখন সামাজিক শৃঙ্খলা ও বন্ধন অটুট ছিল, তখন সামাজিক তথ্য প্রকাশার্থ ঘটকের প্রাবল্য প্রতীয়মান হইত। এই ঘটকশ্রেণী সমাজের বিশুদ্ধতা রক্ষার নিমিত্ত নিয়োজিত থাকিতেন। বিবাহাদি সামাজিক উৎসবে ইঁহারা কুলজী গাহিতেন। যে বংশের যে গুণ বা

দোষ থাকিত, তাহা সর্ব্বজনসমক্ষে কীর্ত্তন করিতেন। এক কথায়, ইঁহারা সমাজশাসনের মেরুদণ্ডস্বরূপ ছিলেন।

যাঁহাদিগের উপর এরূপ গুরুভার ন্যস্ত ছিল, তাঁহাদিগকে যে অতি সাবধানতা সহকারে 'কুলজী' সংগ্রহ করিতে হইত, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। ঘটকশ্রেণীর মধ্যে অনেক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। কোন ঘটকের 'কুলজী' বর্ণনে তিলমাত্র ত্রুটি ঘটিলে, তৎক্ষণাৎ অন্যান্য ঘটককর্ত্তৃক তাহা প্রদর্শিত হইত এবং অসত্যবাদী ঘটকের নিন্দা রাখিবার স্থান থাকিত না। এরূপ অবস্থায়, ঘটকেরা যে বিশেষ সাবধান হইয়া 'কুলজী' সংগ্রহ করিতেন, তাহা স্থির। পাছে কোনরূপ ত্রুটি ঘটে, এই আশঙ্কায় ঘটকেরা বংশানুক্রমে উচ্চবর্ণদিগের 'আদান প্রদান' প্রভৃতি বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। এইরূপ গ্রন্থকে ঘটকের কারিকা নামে অভিহিত করা হয়। এই ঘটকের কারিকা বা কুলপঞ্জিকা বা কুলজীগুলিকে অপ্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইলে বিশেষ প্রমাণ প্রয়োগ করা আবশ্যক। তাহা না করিতে পারিলে, প্রতিপক্ষের উক্তি অবিসংবাদী সত্য বলিয়া মনীষিবর্গ গ্রহণ করিতে পারিবেন কি?

আদিশূর কোন্ সময়ে বঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন? তিনি কোন্ বংশসম্ভূত ছিলেন? তাঁহার সময়ে কান্যকুব্জ হইতে সাগ্নিক পঞ্চব্রাহ্মণ বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন কি না? ঘটকের কারিকায় এতৎসম্বন্ধে কিরূপ প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে, এক্ষণে তাহাই দ্রষ্টব্য।

কুলরামাদি গ্রন্থে দেখা যায়, ৯৫৪ শকে বঙ্গে সাগ্নিক বেদপারগ পঞ্চব্রাহ্মণ সমাগত হইয়াছিলেন।

"বেদবাণাঙ্কশাকেতু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ।"

কুলমিশ্র।

মহারাজ আদিশূর কান্যকুব্জাধিপতি রাজা বীরসিংহকে তাঁহার নিকট ব্রাহ্মণ প্রেরণ করিবার জন্য যে পত্র লিখিয়াছিলেন, কুলরামে তাহা এইরূপে লিখিত আছে,

"নৃপতি-সুকৃতিসারঃ স্বীয়বংশাবতারঃ
প্রবলবলবিচারো বীরসিংহোঽতিবীরঃ॥
ময়ি বরসখিতাস্তে ভূমিদেবান্ সভৃত্যান্
কুলরূপি মম গৌড়ে প্রাপয় ত্বং জিতাক্ষান্॥"

ইহা পাঠে বুঝা যায়, আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে গৌড়ে দুইবার ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন। নতুবা "পুনরপি" শব্দের সার্থকতা থাকে না। কিন্তু ইহাতে সময় নির্ণয় করিবার কোন সুবিধাই নাই।

শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় 'সম্বন্ধ-নির্ণয়' গ্রন্থে ধ্রুবানন্দ মিশ্র নামক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া এই কবিতা লিখিয়াছেন,

"শুভক্ষণ শুভ তিথি, যে অঙ্কের নান্যগতি,
ত্রিরাবৃত্তি তায় মাঘ মাসে।
শুক্লায় পুষ্যায় আসি, পঞ্চভৃত্য পঞ্চঋষি,
প্রদীপ্ত করয়ে রাজবাসে।"

কুলরাম গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে ৯৫৪ শকে পঞ্চ ব্রাহ্মণ গৌড়ে আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু ধ্রুবানন্দ মিশ্রের মতে ৯৯৯ সম্বৎ বা ৯৪২ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মণগণ পদার্পণ করেন। এই সময়ের পার্থক্য আদিশূরের অস্তিত্ব বিলোপ-করণ সম্বন্ধে প্রতিপক্ষীয়দিগের প্রধান সহায়।

বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস-প্রণেতা শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস সান্যাল মহাশয় তদীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"মদনপাল গৌড়রাজ্যে পালবংশের শেষ রাজা। শূরসেন নামক একজন বৈদ্য তাঁহার সেনাপতি ছিলেন। মদনপাল ভ্রষ্টা পত্নীকর্ত্তৃক বিষপ্রয়োগে নিঃসন্তান অপহৃত হইলে, শূরসেন সেই রাণীকে ও তাহার উপপতিকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া স্বয়ং রাজা হইয়াছিলেন। বৈদ্যজাতির মধ্যে তিনিই প্রথম রাজা; এইজন্য তিনি আদিশূর নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। * * * ৯৪৪ শকাব্দের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গৌড়ে বৈদ্য-রাজত্ব স্থাপিত হইয়াছিল।"

শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায় "সম্মিলন" পত্রে লিখিয়াছেন, বারেন্দ্র কুল-পঞ্জিকায় যে লেখা আছে (শাকে বেদকলঙ্কষট্‌ক-প্রমিতে) ৬৫৪ শকে অর্থাৎ ৭৩২ খৃষ্টাব্দে আদিশূর পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন, তাহা লিপিকারের ভ্রমপ্রমাদ-বশতঃ, কোন কোন গ্রন্থে "ঙ্ক" স্থলে "ঙ্ক" লিখিত হইয়াছে। "বেদকলঙ্কষট্‌কের" অর্থ ৬৯৪ শক।

(২) রাঢ়ীয় ঘটককারিকায় "বেদবাণাঙ্কশাকেতু" স্থানেও কোন কোন গ্রন্থে "বেদবাণাঙ্কশাকেতু" পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। "বেদবাণাঙ্গশাকেতু" অর্থ ৬৫৪ শক অর্থাৎ ৭৩২ খৃঃ অঃ। "বেদবাণাঙ্কশাকেতু" অর্থ ৯৫৪ শক। এস্থলেও লিপিকারের দোষে, "ঙ্গ" স্থলে কেহ "ঙ্ক" করিয়া গোলযোগ ঘটাইয়াছেন।

(৩) কুলার্ণব গ্রন্থে "বেদবাণাহিমে শাকে" পাঠ পরিলক্ষিত হয়। ইহার পাঠান্তর দেখা যায় না বটে, কিন্তু অর্থান্তর পরিদৃষ্ট হয়। "অহিম" অর্থ ৮ বলা হইয়াছে। হিমালয় প্রভৃতি ৭টী বর্ষ-পর্ব্বত আছে। তন্মধ্যে অহিম অর্থাৎ হিমালয় বাদে ৬টী পর্ব্বত অবশিষ্ট থাকে, তদনুসারে অহিম অর্থ ৬ বুঝিতে হইবে। সূর্য্যসিদ্ধান্তের মতে ৭টী গ্রহ আছে। যথা "মন্দামরেজ্যভূপুত্র সূর্য্যশুক্রেন্দুজেন্দবঃ।" অর্থাৎ শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল, সূর্য্য, শুক্র, বুধ ও চন্দ্র। এখানে চন্দ্র সপ্তমে আছে। চন্দ্রের এক নাম হিম। এই সপ্তগ্রহকে অহিম করিলে, অর্থাৎ চন্দ্র বাদ দিলে ৬টী থাকে। এরূপে অহিম অর্থ ৬ হয়। শব্দটী অহিম ধরিলে বসন্ত হইতে হিম ঋতু পর্য্যন্ত ৬ ঋতু হয়, এ অর্থেও ৬ পাওয়া যায়। অতএব এখানেও "বেদবাণাহিমে" অর্থ ৬৫৪ পাওয়া গেল।

যদি বেদ-বাণ-অহি অর্থাৎ নাগ ধরা যায়, তাহা হইলে ৮৫৪ হয়। কারণ অহি অর্থে আট বুঝা যায়।

দেবীচরণ হড় ঠাকুর মহাশয়ের ভাষাবাণী নামক পুস্তকের পরিশেষে যে শ্লোকমালা আছে, তাহাতে লিখিত আছে, যে চারিজন বৈদ্য আদিশূরের সভায় ছিলেন, তাঁহারা যে কবিতা লিখিয়াছিলেন, আদিশূর সেই কবিতা কান্যকুব্জাধিপতির নিকট পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়নার্থে প্রেরণ করেন। শ্লোকটী এই :—

"তৈশ্চতুর্ভিঃকৃতৈঃ কাব্যৈরাহূতাঃ সাগ্নিকা দ্বিজাঃ।
ভূপেন্দ্রেণাদিশূরেণ কান্যকুব্জস্য সংসদঃ॥"

রাঢ়ীয় কুলজ্ঞদিগের মধ্যে প্রচলিত কুলজীতে আদিশূর সম্বন্ধে নিম্নোক্ত শ্লোকও পরিলক্ষিত হয়।

"আসীৎপুরা মহারাজ আদিশূরঃ প্রতাপবান্।
আনীতবান্ দ্বিজান্ পঞ্চ পঞ্চগোত্র-সমুদ্ভবান্॥

অন্যত্র—

"তত্রাদিশূরঃ শূরবংশসিংহো বিজিত্য বৌদ্ধান্ নৃপপালবংশান্।
শশাস গৌড়ং"—

পূর্ব্বোদ্ধৃত প্রমাণাদিদ্বারা আদিশূরের অস্তিত্ব ও তাঁহার শাসনকাল ৬৫৪ শক বা ৭৩২ খৃষ্টাব্দ বলিয়া নির্ণীত হইতেছে।

"বিপ্রকুল কল্পলতায়" এইরূপ লিখিত আছে—

"আসীৎ বৈদ্যো মহাবীর্য্যঃ শালবান্নাম ভূপতিঃ।
বঙ্গরাজ্যাধিরাজঃ সঃ স্বধর্ম্মপ্রতিপালকঃ॥

তদ্বংশে জনিতশ্চৈকঃ প্রতাপচন্দ্র-ভূপতিঃ।
তৎকুলে জনিতশ্চান্য স্তেজঃশেখর-সংজ্ঞকঃ॥
বিধুবাণগ্রহমিতে শাকে শকপতেঃ পুরা।
তদ্বংশে জনিতঃ শ্রীমান্ আদিশূরো মহীপতিঃ॥"

এই শ্লোকে আদিশূরের তিনজন পূর্ব্বপুরুষের নামোল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথম শালবান (বা শালিবাহন), তৎপরে প্রতাপচন্দ্র এবং তৎপরে তেজঃ-শেখর। ইঁহারা বৈদ্যবংশসম্ভূত। আদিশূরের প্রাদুর্ভাব সময় ৯৫১ শক বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

প্রতিপক্ষীয়েরা বলিয়া থাকেন, আদিশূর যে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া-ছিলেন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, তাঁহাদিগের প্রকৃত নাম জানিতে পাওয়া যায় না।

এতদুত্তরে নিম্নলিখিত প্রমাণগুলি দেওয়া যাইতে পারে।

কুলরামে লিখিত আছে—

"শাণ্ডিল্যঃ কাশ্যপোবাৎস্যো ভরদ্বাজস্তথাপরঃ।
সাবর্ণঃ কথিতাঃ পূর্ব্বং পঞ্চগোত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
তত্রাদৌ সর্ব্বতোমান্যঃ শাণ্ডিল্যোমুনিসত্তমঃ।
শাণ্ডিল্যগোত্রজ-শ্রেষ্ঠো ভট্টানারায়ণঃ কবিঃ॥
দক্ষোহম্ কাশ্যপশ্রেষ্ঠো বাৎস্য-শ্রেষ্ঠোহম্ ছান্দড়ঃ।
ভরদ্বাজ-কুলশ্রেষ্ঠঃ শ্রীহর্ষো হর্ষবর্দ্ধনঃ।
বেদগর্ভোহম্ সাবর্ণো যথাবেদমতিঃ স্মৃতঃ॥"

শাণ্ডিল্যগোত্রে ভট্টনারায়ণ, কাশ্যপগোত্রে দক্ষ, বাৎস্যগোত্রে ছান্দড়, ভরদ্বাজগোত্রে শ্রীহর্ষ ও সাবর্ণগোত্রে বেদগর্ভ এই পঞ্চগোত্রসম্ভূত পঞ্চব্রাহ্মণ গৌড়ে আসিয়াছিলেন।

মহেশের "নির্দ্দোষ কুলপঞ্জিকায়" আছে—

"ক্ষিতীশো তিথিমেধা চ বীতরাসঃ সুধানিধিঃ।
সৌভারঃ পঞ্চধর্ম্মাত্মা আগতা গৌড়মণ্ডপে॥"

এখন দেখা যাইতেছে, আদিশূর যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নামের পার্থক্য থাকিলেও গোত্রসম্বন্ধে কেহই ভিন্নমত প্রকাশ করেন নাই। এই নামগত্যা পার্থক্য-বিশেষ দোষাবহ নহে। ইহাতে আদি-শূরের অস্তিত্ব অথবা তাঁহা কর্ত্তৃক পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন-ব্যাপারের সত্যতাই

সপ্রমাণ হইতেছে। আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে দুইবার ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। সুতরাং কুলপঞ্জিকায় দুই দল ব্রাহ্মণের নামোল্লেখ থাকা বিচিত্র নহে।

তাহার পর আদিশূরের সহিত বল্লাল সেনের সম্বন্ধ-নির্ণয় সম্পর্কে কুলজ্ঞীতে যে সকল বচন পরিদৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে কয়েকটী উদ্ধৃত করিলাম।

(১) জাতো বল্লালসেনো গুণিগণগণিতস্তস্য দৌহিত্রবংশে।

অর্থাৎ "বল্লাল সেন আদিশূরের দৌহিত্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।"

(২) আসীৎ গৌড়ে মহারাজ আদিশূরঃ প্রতাপবান্।
তদাত্মজাকুলে জাতো বল্লালাখ্যো মহীপতিঃ॥

ইহার অর্থ "গৌড়ের প্রতাপবান মহারাজ আদিশূরের কন্যার কুলে মহীপতি বল্লাল জন্মিয়াছিলেন।"

"আদিশূর পঞ্চগোত্রের পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করিলেন। (পঞ্চব্রাহ্মণের পরিচয়) এই পঞ্চব্রাহ্মণকে সংস্থাপন করিয়া আদিশূর স্বর্গারোহণ করেন। তদন্তে কিছুকালান্তর তস্য দৌহিত্রকুলে উদ্ভব হইলেন বল্লালসেন। (বল্লাল-সেন কর্তৃক কুলমর্য্যাদা স্থাপন এবং রাঢ়ী ও বারেন্দ্র-বিভাগ)। ইত্যবকাশে অন্যান্য দেশীয় রাজাসকল ব্রাহ্মণহীন দেশ বিবেচনা করিয়া বল্লালসেনের নিকট ব্রাহ্মণ যাচিঞা করিয়া কহিলেন, শুনহে বল্লালসেন! তোমার মাতামহ কুলোদ্ভব আদিশূর পঞ্চগোত্রে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া গৌড়মণ্ডপ পবিত্র করিয়াছেন। আমরা যবনাক্রান্ত দেশে বাস করি, আমাদিগের দেশে কিঞ্চিৎ ব্রাহ্মণ প্রেরণ করিয়া আমাদিগের দেশ পবিত্র কর।"

অন্যত্র—

গৌড় রাজমালা-লেখক বলেন, "আদিশূর সম্বন্ধে যে সকল জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে এইটীই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। কুলজ্ঞগণের মুখ্য উদ্দেশ্য ইতিহাস সঙ্কলন নহে, বংশাবলী রক্ষা। বংশাবলী অনুসারে হিসাব করিলে, আদিশূরের যে সময় নির্দ্ধারিত হয়, তাহার সহিত এই জনশ্রুতির সামঞ্জস্য করা যাইতে পারে। "গৌড় ব্রাহ্মণকার বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 'শাণ্ডিল্য গোত্রীয় বর্ত্তমান ব্যক্তির পুরুষ সংখ্যা ভট্টনারায়ণ হইতে ৩৬।৩৭ এবং ৩৮ পুরুষ, কাশ্যপগোত্র ৩১ ৩২।৩৩।৩৪ পুরুষ ভরদ্বাজ গোত্রে ৩৫ হইতে ৩৯ পুরুষ, কিন্তু বাৎস্য গোত্রে ২৫ হইতে ২৮ পুরুষ দৃষ্ট হয়। রাঢ়ীয় সমাজে ৩৫০হইতে ঊর্দ্ধতন পর্য্যায়ের লোক বিরল। বাৎস্য গোত্র ছাড়িয়া

দিলে, বর্ত্তমান কালকে আদিশূর আনীত ব্রাহ্মণগণের কাল হইতে গড়পড়তায় ৩৪।৩৫ পুরুষের কাল বলা যাইতে পারে। প্রতি পুরুষে ২৫ বৎসর ধরিয়া লইলে আদিশূর ৮৫০ বৎসর পূর্ব্বে (১০৬০ খৃষ্টাব্দে) বর্ত্তমান ছিলেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। এই অনুমান "বেদবাণাঙ্কশাকেতু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ" (৯৫৪ শাকে বা ১০৩২ খৃষ্টাব্দে গৌড়ে ব্রাহ্মণগণ আগমন করিয়াছিলেন) এই কিংবদন্তীর বিরোধী নহে এবং তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে কর্ণাট রাজকুমার বিক্রমাদিত্যের সহিত বল্লালসেনের পূর্ব্ব-পুরুষের গৌড়ে আগমনকালের সহিত ঠিকঠাক মিলিয়া যায়। প্রথম রাজেন্দ্রলালের তিরু-মলয় লিপিতে দক্ষিণরাঢ়ের অধিপতি রণশূরের পরিচয় পাওয়া যায়। আদিশূরকে রণশূরের পুত্র বা পৌত্র ধরিয়া লইলে কোন গোল থাকে না।" গৌড় রাজমালা ৫৮ পৃঃ।

বিগত ফাল্গুনমাসের "সম্মিলন" পত্রিকায় এইরূপ লিখিত আছে—"বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে,

"আদিশূরাৎ কুলে জাতা পুরুষাৎ সপ্তমাৎ পরম্।
কন্যকা সুন্দরী সাধ্বী নাম্নী শ্রীঃ শ্রীরিব শুভা॥"

ইহাতে বুঝা যাইতেছে, আদিশূরের কুলে জাত তাঁহার সপ্তম পুরুষের "শ্রী" নাম্নী কন্যা ছিল।

"আদিশূরের সপ্তম পুরুষ রণশূর। ইনি বল্লাল সেনের পিতামহ হেমন্ত সেনের সমসাময়িক। এই শ্লোকের "সপ্তমাৎ পরং" কথা ক্রমে বাদ পড়িয়া গিয়া "তদাত্মজাকুলে জাতো" হইয়া পড়িয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বল্লাল নামটীও বসিয়া গিয়াছে। বাস্তবিক বল্লাল রণশূরের অনেক পরে, সুতরাং তাঁহার দৌহিত্র হইতে পারে না।"

বৈদিক কুলাচার্য্য মহাদেবশাণ্ডিল্যের "সম্বন্ধ ভবার্ণবে" লিখিত আছে—

"যতো জগদ্রাজজয়ীশবর্য্য ঐশ্বর্য্য-শৌর্য্যার্জ্জববীর্য্যভাজী।
অপূর্ণভক্তির্ভবদেবদেবেষ্বাব্দে শশাঙ্কস্মররন্ধ্রশাকে।
জাতো বিজয়সেনো গুণিগণগণিতস্তস্য দৌহিত্রবংশে।
পুণ্যাত্মা দোষশূন্যো ধরণিপতিগণৈঃ পূজ্যমানঃ প্রধানঃ॥

আদিশূরের দৌহিত্রকুলে ৯৫১ শকে (১০২৯ খৃষ্টাব্দে) বিজয়সেন জন্মগ্রহণ করেন।

উপরিউক্ত শ্লোক কয়েকটী হইতে জানা যাইতেছে, আদিশূরের সপ্তম

পুরুষ রণশূরের কন্যার সহিত হেমন্তসেনের বিবাহ হইয়াছিল। এই গর্ভে বিজয়সেনের জন্ম হইয়াছে। এই বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেন। সুতরাং তিনি আদিশূরের দৌহিত্রকুলজাত নহেন। আদিশূরের সপ্তমপুরুষ রণশূরের দৌহিত্র-কুলজাত।

আদিশূর সম্বন্ধে কুলপঞ্জিকায় ধনঞ্জয় লিখিয়াছেন,—

"শ্রীমদ্রাজাদিশূরোঽভবদবনিপতি স্তত্র বঙ্গাদিদেশে
সল্লোকঃ সদ্‌বিচারৈ র্বিদিত-সুরপতিঃ স্বর্যথাসীৎ তথাসীৎ।
প্রতাপাদিত্যতপ্তাখিলতিমিররিপু স্তত্ত্ববেত্তা মহাত্মা
জিত্বা বুদ্ধান্ চকার স্বয়মপি নৃপতি র্গৌড়রাজ্যাৎ নিরস্তান্॥"

দেবীবর ঘটকের কারিকায় আছে,—

অম্বষ্ঠকুলসম্ভূত আদিশূরো নৃপশ্চ যঃ।
রাঢ়োগৌড়োবরেন্দ্রশ্চ বঙ্গদেশ স্তথৈবচ॥
এতেষাং নৃপতিশ্চৈব সর্ব্বভূমীশ্বরো যদা।
অমাত্যৈর্বান্ধবৈশ্চৈব মন্ত্রিভির্দ্বিজবৃন্দকৈঃ॥
এতৈঃ সহ মহীপাল একদা স নিজালয়ে।
উপবিষ্টো দ্বিজান্ পৃষ্টঃ ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণঃ॥

লঘুভারতপ্রণেতা গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন,—

আদিশূর স্তদা তস্য সভাসন্মন্ত্রিণাং করঃ।
সহায়ঃ শ্বশুরস্যৈব বীরসিংহোনিরস্তবান্।

স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে বীরসেন (আদিশূর) ৯৮৬ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

বিক্রমপুরের ইতিহাস প্রণেতা শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বলেন, কান্য-কুব্জাগত পঞ্চব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে যে গজারীবৃক্ষ পুনরুজ্জীবিত হয়, তাহা আদিশূরের অস্তিত্বের জ্বলন্ত প্রমাণ। এই প্রাচীন গজারীবৃক্ষ কিছুকাল পূর্ব্বে মরিয়া যাইলে তৎস্থানে পুনর্ব্বার একটী গজারীবৃক্ষ সমুদ্ভূত হইয়াছে। উক্ত বৃক্ষ অদ্যাপি জীবিত আছে। এতদঞ্চলে এরূপ বৃক্ষ আর নাই।

কেহ কেহ বলেন, জয়ন্তসেনই আদিশূর। শ্রীযুত বিনোদবিহারী রায় গতপূর্ব্ব ফাল্গুন মাসের সম্মিলন পত্রে লিখিয়াছেন, "কাশ্মীরপতি জয়াপীড় ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতে করিতে ক্রমে গৌড়রাজাশ্রিত জয়ন্ত রাজার রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে উপনীত হইয়াছিলেন। তথায় একটি নর্ত্তকীর গৃহে গুপ্তভাবে বাস

করিয়াছিলেন এবং একটি সিংহ হত্যা করিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তখন রাজা জয়ন্ত তাঁহাকে সমাদরপূর্ব্বক আনয়ন করিয়া স্বীয় দুহিতা কল্যাণদেবীর সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। জয়াপীড় বিনা আয়োজনে পঞ্চগৌড়ের অধিপতিদিগকে পরাজিত করিয়া শ্বশুরকে তাহার অধীশ্বর করিয়াছিলেন।"

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন, "ধর্ম্মপালের পূর্ব্বে এখানে জয়ন্ত ব্যতীত আর কোনও হিন্দু রাজাকে ঐরূপ উচ্চ সম্মানে অলঙ্কৃত দেখি না। ইত্যাদি কারণে সহজেই বোধ হইতেছে, গৌড়াধীশ জয়ন্ত জামাতা কর্ত্তৃক পঞ্চগৌড়ের অধীশ্বর হইলে "আদিশূর" উপাধি গ্রহণ করেন।"

"ব্রাহ্মণডাঙ্গা নিবাসী ৺বংশী বিদ্যারত্ন ঘটকের সংগৃহীত কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে,—"ভূশূরেণ চ রাজ্ঞাপি শ্রীজয়ন্ত-সুতেন চ।" ইহার "আদিশূর-সুতেন চ" পাঠান্তরও দেখা যায়। ইহাতেই জানা যায়, জয়ন্ত ও আদিশূর একই ব্যক্তি।

* * * *

"কহ্লনের মতে জয়াপীড় ৭৪৯ হইতে ৭৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কাশ্মীরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে পঞ্চগৌড় জয় করিবার সময় কান্যকুব্জরাজ যশোবর্ম্মার উল্লেখ নাই, সুতরাং তিনি নিশ্চয়ই যশোবর্ম্মার মৃত্যুর পরে গৌড়ে আসিয়াছিলেন। ৭৫৩ খৃষ্টাব্দে যশোবর্ম্মার মৃত্যু হয়, ৭৫৫ খৃষ্টাব্দে জয়াপীড়ের গৌড়ে আগমন অনায়াসে ধরিতে পারা যায়। এই সময় জয়ন্ত পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের রাজা ছিলেন।"

আদিশূরের অস্তিত্ব ও রাজত্ব কাল সম্পর্কে প্রাচীন গ্রন্থোক্ত কয়েকটী প্রমাণের অবতারণা করা হইল। এতদ্ব্যতীত প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মার্শম্যান সাহেব লিখিয়াছেন,

"The only authentic event to be further noticed previous to the irruption of Mahmud of Ghazni, relates to the kingdom of Bengal. Canouj, the cradle and the citadel of Hindusthan had recovered its importance under a new dynesty. Adisoor, of the Vaidia or Medical race of kings then ruling Bengal, and holding its court at Naddea, became dissatisfied with the ignorance of his priests and applied to the king

of Canouj for a supply of Brahmins wellversed in the Hindoo shastras and observances. That monarch, about nine centuries ago sent here five Brahmins, from whom all the brahmun ical families in Bengal trace their descent, while the Kayests, the next in order derive their origin from the five servants who attended the priests"

ইহার মর্ম্মার্থ, গিজনীয় মামুদ কর্ত্তৃক সমরাগ্নি প্রজ্বলিত হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রামাণ্য ঘটনা সম্পর্কে যাহা জানা যায়, তাহা বঙ্গসংক্রান্ত। হিন্দুস্থানের দুর্গ ও কেন্দ্র-স্বরূপ কান্যকুব্জ এই সময়ে পুনঃ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। বৈদ্যজাতীয় বঙ্গাধিপ আদিশূর স্বকীয় পুরোহিতবৃন্দের অজ্ঞতাসন্দর্শনে মর্ম্মাহত হইয়া কান্যকুব্জাধিপতির নিকট হইতে শাস্ত্রজ্ঞ ও যাগযজ্ঞপরায়ণ ব্রাহ্মণ যাচ্ঞা করেন। নবম শতাব্দীতে কান্যকুব্জপতি পঞ্চব্রাহ্মণ প্রেরণ করেন। বঙ্গের বর্ত্তমান প্রধান ব্রাহ্মণবংশকেই পঞ্চব্রাহ্মণ সমুদ্ভূত এবং পঞ্চব্রাহ্মণের ভৃত্যস্বরূপ সমাগত কায়স্থগণ বর্ত্তমান কায়স্থগণের পূর্ব্বপুরুষ।

এ পর্য্যন্ত আমরা আদিশূরের অস্তিত্ব প্রতিপাদক যাহা কিছু বলা যাইতে পারে, তাহারই উল্লেখ করিলাম। এক্ষণে ইহার বিরুদ্ধে কিরূপ আপত্তি উত্থাপন হইতে পারে, তাহারই আলোচনা করিব।

প্রথমতঃ দ্রষ্টব্য, বঙ্গের শেষ হিন্দুনরপতি "সেনগণ" পূর্ব্বাপর বঙ্গে অবস্থান করিতেছিলেন, অথবা অন্যত্র হইতে বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন? বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসলেখক শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সান্যাল মহাশয় আদিশূর ও সেনবংশীয়গণ সম্বন্ধে যে আখ্যায়িক [illegible] কিম্বা সুধীসমাজে উপস্থাপিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, তাহা সর্ব্বথা সর্ব্বত্র গ্রাহ্য না হইতে পারে। সান্যাল মহাশয় লিখিয়াছেন "আদিশূর কান্যকুব্জের ক্ষত্রিয় চন্দ্রকেতুর কন্যা চন্দ্রমুখীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।" সান্যাল মহাশয় বলেন, "বৈদ্য রাজাদের পুত্র কন্যাকেই ক্ষত্রিয় রাজাদের পুত্রকন্যার বিবাহে আদান প্রদান প্রচলিত ছিল।" তিনি আরও বলেন, "শূরসেন (আদিশূর) হইতে মাধবসেন পর্য্যন্ত এগার জন রাজার প্রায় তিনশত বৎসর বাঙ্গালা দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। যদি তাঁহারা ক্ষত্রিয় হইতেন, তবে তাঁহাদের জ্ঞাতি কুটুম্ব অবশ্যই বাঙ্গালা দেশে থাকিত। কিন্তু তাদৃশ কোন ক্ষত্রিয় বাঙ্গালা দেশে বা কোন নিকটবর্ত্তী স্থানেই নাই এবং কখন ছিল বলিয়াও

জানা যায় না। সুতরাং সেন রাজারা যে ক্ষত্রিয় ছিলেন না, ইহা তাহার অকাট্য প্রমাণ। দ্বিতীয়তঃ ক্ষত্রিয়দিগের কোথাও কৌলিক "সেন" উপাধি নাই। তৃতীয়তঃ রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের কুলশাস্ত্রে ইঁহাদিগকে বৈদ্যজাতীয় বলিয়া উল্লেখ আছে। চতুর্থতঃ বৈদ্যদিগের মধ্যে লক্ষ্মণসেন মতের বৈদ্য এবং বল্লালসেনের মতাবলম্বী বৈদ্য এখনও আছে। পঞ্চমতঃ রামগতি ন্যায়রত্ন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং ইংরাজ ইতিহাস লেখকগণ সকলেই ইহাদিগকে বৈদ্য বলিয়া লিখিয়াছেন।"

যাহারা আদিশূরকে বা সেনবংশীয়দিগকে বৈদ্য বলিয়া স্বীকার করেন না, তাহারা এই বলিয়া তর্ক উপস্থিত করিতে পারেন, শূরসেন যে আদিশূর, তাহার প্রমাণ কি? শূরসেন হইতে মাধবসেন পর্য্যন্ত যে এগার জন রাজা ছিলেন, সান্যাল মহাশয় তাহা কিরূপে অবগত হইলেন? আদিশূর যে কান্যকুব্জের ক্ষত্রিয় চন্দ্রকেতুর কন্যা চন্দ্রমুখীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ কোথায়? ক্ষত্রিয় ও বৈদ্যদিগের মধ্যে কস্মিন্‌ কালে কোনস্থানে যে বিবাহাদি হইত, তাহার স্বপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সেনরাজাদিগের বংশধর নাই বলিয়া তাহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলা যাইতে পারে না, ইহা কল্পনা ব্যতীত আর কি হইতে পারে? ক্ষত্রিয়দিগের 'সেন' উপাধি আছে।

বৃটিশ এম্পায়র সিরিস প্রথম খণ্ডে (British Empire Series Part 1. Page 101) লেখা আছে যে, বঙ্গের পাল ও সেনবংশীয় নরপতিগণ ক্ষত্রিয় ছিলেন।

রাজসাহীর দেবপাড়ায় যে প্রশস্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহার রচয়িতা উমাপতি ধর। কবিবর জয়দেব তদীয় গীতগোবিন্দে যে উমাপতিধরের উল্লেখ করিয়াছেন, ইনি তিনি। এই প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ শ্লোকাবলী বিজয় সেন কর্ত্তৃক শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে রচিত হইয়াছিল। ইহার তৃতীয় শ্লোক হইতে পরবর্ত্তী কয়েকটী শ্লোকে বিজয়সেনের পূর্ব্বপুরুষের যে পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার মর্ম্ম এইরূপ—

"দাক্ষিণাত্যে বীরসেন নামক এক নরপতি ছিলেন। তাঁহার বংশের উপাধি "সেন" ছিল। সামন্ত সেন নামক জনৈক নরপতি এইকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দাক্ষিণাত্যে—বিশেষতঃ কর্ণাটে—যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিয়া অবশেষে গঙ্গাতীরে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করেন। তদীয় পুত্র হেমন্ত সেন

ভার্য্যা মহারাণী যশোদেবীর গর্ভজাত বিজয় সেন নামক পুত্ররত্ন লাভ করেন। বিজয় সেন বাহুবলে কামরূপ প্রভৃতি রাজ্য জয় করেন। তাঁহার নৌবাহিনী গঙ্গার শোভাবর্দ্ধন করিত।"

তর্পণদীঘির প্রশস্তি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বিজয় সেনের পুত্রের নাম বল্লাল সেন। বল্লালের পুত্র লক্ষ্মণ সেন। যদিও প্রশস্তিতে কোন সময়ের উল্লেখ নাই, তথাপি উহা একাদশ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে লিখিত, ইহা নিঃসন্দেহে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

অধ্যাপক কীলহর্ণ বলেন,—"Lakshman Sena was the founder of an era, which undoubtedly dates from the beginning of his reign and which as I have tried to show elsewhere, commenced in A D. 1119. Vijay Sen's reign therefore may reasonably be supposed to have begun about the beginning of the last quarter of the eleventh century."

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, কীলহর্ণ সাহেবের মতেও বিজয় সেনের প্রাদুর্ভাব প্রশস্তির কালের সহিত ঐক্য হইতেছে।

বল্লালসেনের দানসাগর গ্রন্থের বয়স নির্ণয় কালে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখিয়াছেন, "Ballal Sena in Danashagar calls himself the son of Vijay Sena and grandson of Hemanta Sena *. It was composed in 1097 A. D. †

সেনবংশ সম্বন্ধী ঐতিহাসিক প্রমাণ স্বরূপ ১৮৩৭ সালে সর্ব্বপ্রথমে বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত ইদিলপুর গ্রাম হইতে একখানি তাম্রশাসন পাওয়া যায়। ‡ বাৎস্যগোত্রসম্ভূত ঈশ্বর দেবশর্ম্মা জনৈক ব্রাহ্মণকে কেশব সেন কর্ত্তৃক এই দানপত্র প্রদত্ত হইয়াছিল। এই তাম্রলিপির আলোচনাকালে প্রিন্সেপ সাহেব সেনবংশের জাতিনির্ণয় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "বঙ্গের হিন্দুরাজত্বের ইতিহাস যেরূপ সংশয়পূর্ণ, সেনবংশের বৈদ্যজাতীয়ত্ব প্রমাণ তদ্রূপ সংশয়মূলক। কেহ কেহ আদিশূরকে এই বংশের প্রধান পুরুষ বলিয়া নির্ণয় করেন। কিন্তু আইন আকবরীতে লিখিত হইয়াছে যে, আদিশূরের পর

* Our inscription is not date, but it may be assigned with confidence to the end of the eleventh century A. D.

Epigraphica Indica Vol. XI.

† Notices of Sanskritness. by Dr. Rajendra Lala Mitra

‡ Journal of the Asiatic Society of Bengal vol VII. Pages 40-48. Edited by James Prinsep.

৬৯৮ বৎসর পালবংশ বাঙ্গালা শাসন করিয়াছিলেন। তাহার পর সুখসেন রাজা হন। সুখসেনের পুত্র বল্লাল সেন গৌড় দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। এই দানপত্রে কিন্তু পালবংশের বা আদিশূরের আদৌ নামোল্লেখ নাই। অপিচ ইহা পাঠে প্রতীয়মান হয়, বল্লালসেনের পিতার নাম বিজয়সেন। আমরা এই তাম্রশাসন অগ্রাহ্য করিয়া আইন আকবরীপ্রণেতা আবুল ফজেলের উক্তি প্রামাণ্য বলিয়া কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারি না। আইন আকবরীতে সেনবংশের শাসনকাল নিম্নরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

১০৬৩ সালে	সুখসেন—৩ বৎসর
১০৬৬ "	বল্লালসেন—৫০ "
১১১৫ "	লক্ষ্মণসেন—৭ "
১১২৩ "	মাধবসেন—১০ "
১১৩৩ "	কেশবসেন—১৫ "
১১৫৪ "	সুধাসেন—১৮ "
১২০০ "	লক্ষ্মণীয়া—শেষ রাজা।

তাম্রশাসন মতে।

বিজয়সেন
বল্লালসেন,
লক্ষ্মণসেন
কেশবসেন।

যাহা হউক, ইহাতেও আদিশূরের কোন নামোল্লেখ নাই দেখা গেল।

তাহার পর সেনবংশের জাতিনির্ণয় সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন, তাম্রশাসনে "শঙ্কর গৌড়েশ্বর" শব্দ পরিলক্ষিত হয়। এই "শঙ্কর" শব্দের "স" লিপি-করের ভ্রমপ্রমাদবশতঃ "শ" হইয়াছে। উহা "সঙ্কর" হইলেই বৈদ্যজাতি নির্ণয়াক পদ বলিয়া নিঃসন্দেহে উল্লেখ করা যাইতে পারিত।

যাহারা সেন রাজাদিগকে বৈদ্যজাতি বলিয়া প্রতিপন্ন করণার্থ এবংবিধ অপূর্ব্ব যুক্তির অবতারণা করিতে লজ্জিত হন না, আমরা তাঁহাদিগের সহিত কোনরূপ সমবেদনা প্রকাশ করিতে পারি না। সেনরাজাদিগের শাসনকালে তাঁহাদিগের বংশোল্লেখ স্থলে একজন দরিদ্র কবি যে "সঙ্কর" শব্দ বৈদ্যজাতি বোধার্থক স্বরূপ ব্যবহার করিতে সাহসী হইবেন, ইহা কখনই অনুমান করিতে পারা যায় না। সুতরাং উহাকে লিপিকরের ভ্রান্তি বলিতে আমরা প্রস্তুত নহি।

কথিত আছে যে, বল্লালসেন পূর্ব্বজন্মে পরম শৈব ছিলেন। তদনুসারে শঙ্কর শব্দে তিনি অভিহিত হইয়াছেন।

উপরে যে তর্পণদীঘি তাম্রলিপির কথা বলিয়াছি, তৎসম্বন্ধে আলোচনা কালে ওয়েষ্টমকট সাহেব বলিয়াছেন, "আবুল ফজেল সুখসেনকে বল্লালের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মুসলমান শাসনের পূর্ব্ববর্ত্তী ইতিহাস সম্বন্ধে আবুলফজেলের উক্তি প্রামাণ্য বলিয়া আমি গ্রহণ করিতে পারি না। তর্পণদীঘি তাম্রশাসনে বল্লালের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা বিজয়সেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। আমি তাহাই গ্রাহ্য করি।" *

আবুল ফজেলের বর্ণিত সুখসেনকে যদি বিজয়সেন বলিয়াই গ্রহণ করা যায়, তথাপি আবুলফজেলের গণনা অনুসারে আদিশূরের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। আইনআকবরীর মতে সুখসেন বা বিজয়সেন ১০৬৩ সালে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী পালবংশীয় রাজাদিগের শাসনকাল, আইনআকবরীর মতেই—৬৯৮ বৎসর। ১০৬৩ হইতে ৬৯৮ বাদ দিলে বাকী থাকে ৩৬৫। আদিশূর যে ৩৬৫ সালে রাজত্ব করিয়াছিলেন, ইহা আদিশূরের অস্তিত্ব প্রমাণপ্রয়াসীরাও বলিতে সাহস করেন না।"

দেবপাড়ার প্রশস্তিতে সেনবংশের যে তালিকা উৎকীর্ণ আছে, তাহা পাঠে অবগত হওয়া যায়—

১ সামন্তসেন তস্যপুত্র
২ হেমন্তসেন তস্যপুত্র
৩ বিজয়সেন তস্যপুত্র
৪ বল্লালসেন তস্যপুত্র
৫ লক্ষ্মণসেন ১১৯৯ সাল তস্যপুত্র
৬ বিশ্বরূপসেন।

প্রতিপক্ষীয়েরা ভুবনেশ্বরের প্রশস্তির উল্লেখ করিয়া বলেন, আদিশূরের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে এই প্রশস্তির সহিত আদিশূরের শাসনকালের সামঞ্জস্য থাকে না। 'সম্মিলন' পত্রে শ্রীযুত বিনোদবিহারী রায় ইহার যথাসাধ্য উত্তর প্রদান করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন।

যখন কোন প্রশস্তিতে আদিশূরের নামগন্ধ নাই, যখন কোন স্থান বা কীর্ত্তিদ্বারা আদিশূরের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় না, তখন কেবল

* Journal of the Asiatic Society, Vol XIIV Part I.

জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া প্রতিপক্ষীয়েরা আদিশূরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা আরও বলেন, আদিশূরের কর্ত্তৃক পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন কাহিনী মহীয়সী কল্পনার অপূর্ব্ব সৃষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে। আদিশূর যদি পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করিতেন, তাহা হইলে কৌলীন্যপ্রথা স্থাপনকালে আদিশূরের কীর্ত্তিকাহিনী অবশ্যই বল্লালসেনের স্মরণ থাকিত। সুতরাং বল্লালসেনকৃত দানসাগর গ্রন্থেও আদিশূরের নামোল্লেখ হওয়া বিচিত্র ব্যাপার হইত না।

আদিশূরের অস্তিত্ব যাঁহারা অস্বীকার করেন, তাঁহারা আরও বলিতে পারেন, ভূশূর বা জয়ন্তসেনকে আদিশূর বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা নিরর্থক। কারণ তিরুমার প্রভৃতি স্থান হইতে প্রাপ্ত প্রাচীন প্রশস্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিলে বুঝা যায়, ১০২০ সালে দাক্ষিণাত্যপতি রাজেন্দ্র সেন দিগ্বিজয় করিবার সময় রাঢ়ে রণশূর রাজত্ব করিতেছিলেন। আদিশূরের অস্তিত্ব প্রমাণপ্রয়াসীর দল যদি এই রণশূরকে আদিশূরের সপ্তমপুরুষে শ্রীনাম্নী কন্যার স্বামী বলিয়া উল্লেখ করেন, তাহা হইলে বল্লালসেন বা লক্ষ্মণ-সেনের শাসনকাল ইতিহাসবর্ণিত সর্ব্ববাদিসম্মত শাসনকাল হইতে অনেক পিছাইয়া পড়ে।

তাহার পর তর্কানুরোধে যদি স্বীকারই করা যায় যে, রণশূরের কন্যার সহিত বল্লালসেনের পিতামহ হেমন্তসেনের বিবাহ হইয়াছিল, তাহা হইলে কুলজীতে যে লেখা আছে, বল্লালসেন আদিশূরের দৌহিত্র বংশজ, সে কথার কোন মূল্যই থাকে না। রণশূরের পরিচয় প্রশস্তিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তিনি যে হেমন্তসেনের শ্বশুর, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই রণশূরের সহিত সেনবংশের যে কোন সম্বন্ধ ছিল, তাহা "সম্বন্ধ তত্ত্বার্ণবে"র প্রাগুক্ত বচন ব্যতীত আর কিছুতেই পাওয়া যায় না। কুলজী গ্রন্থে অনেক প্রক্ষিপ্তাংশ পরিদৃষ্ট হয়। রণশূরের নামও যে ঐ প্রক্ষিপ্তাবস্থায় কুলগ্রন্থে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই, তাহাই বা কে বলিল?

তাহার পর দেখা যাউক, জয়ন্তসেন আদিশূর কি না? জয়াপীড়ের পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে প্রবেশ সম্বন্ধে রাজতরঙ্গিণীর চতুর্থ তরঙ্গের ৪২১ শ্লোকে লিখিত আছে,—

"গৌড়রাজাশ্রয়ং গুপ্তং জয়ন্তাখ্যেন ভূভুজা।
প্রবিবেশ ক্রমেণাথ নগরং পৌণ্ড্রবর্দ্ধনম্।"

অর্থাৎ "গৌড়রাজাধীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-নগরে তিনি উপস্থিত হইলেন। সে সময়ে ঐ নগর ভূপতি জয়ন্ত কর্ত্তৃক শাসিত হইতেছিল।"

এই পাঠে বুঝা গেল, জয়ন্ত গৌড়েশ্বরের অধীন ছিলেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, রাজতরঙ্গিণীর মতে জয়াপীড় ৭৪৯ হইতে ৭৮০ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহা হইলে জয়ন্তের রাজ্যশাসনও এই সময়ে হইয়াছিল। কারণ উভয়েই সমসাময়িক। এখন কথা হইতেছে, জয়ন্ত যদি আদিশূর হইলেন, তাহা হইলে আদিশূরের শাসনকাল ৭৪৯ হইতে ৭৮০ খৃষ্টাব্দ স্থির করিতে হয়। কুলজীর মতে এবং শ্রীযুত বিনোদবিহারী রায়ের গণনা অনুসারে ৭৩২ খৃষ্টাব্দে আদিশূর পঞ্চব্রাহ্মণ গৌড়ে আনয়ন করিয়াছিলেন। এই কালের পার্থক্য যে আদিশূর প্রতিপন্ন করার পক্ষে বিষম অন্তরায় হইয়াছে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই।

আর এক কথা।—কুলজী পাঠে উপলব্ধি হয়, কান্যকুব্জপতি গৌড়েশ্বর আদিশূরের মিত্র বা হিতৈষী ছিলেন। নতুবা তিনি কান্যকুব্জাধিপতির নিকট ঐভাবে পত্র লিখিয়া ব্রাহ্মণ যাচ্ঞা করিবেন কেন? কিন্তু রাজতরঙ্গিণী পাঠে বুঝা যায়, গৌড় জয় করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমনকালীন জয়াপীড় কান্যকুব্জ জয় করিয়াছিলেন। জয়াপীড়ের পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আগমন, বারবণিতা ভবনে অবস্থান, সিংহবধ, জয়ন্তের সহিত পরিচয়, জয়ন্তের দুহিতার পাণিগ্রহণ, গৌড় অধিকার, কান্যকুব্জ জয় প্রভৃতি ব্যাপার যে অল্পসময়ের মধ্যে সমাহিত হয় নাই, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। এখন যদি কেহ বলেন যে, জয়াপীড়ের গৌড় হইতে প্রস্থান এবং কান্যকুব্জ জয়ের পর জয়ন্ত আদিশূরের নাম ধারণ করিয়া পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহা হইলে কুলজী লিখিত সময়ের সহিত এই আনুমানিক সময়ের অনেক পার্থক্য ঘটিয়া যায়। সুতরাং আদিশূরের অস্তিত্ব প্রমাণের পক্ষে ঐরূপ উক্তির মূলেও কোন সারবত্তা পরিলক্ষিত হয় না।

আদিশূরের অস্তিত্ব প্রমাণের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষদিগের এই সকল হেতুবাদ যে নিরর্থক ও মূল্যহীন, তাহা বলিবারও উপায় নাই। আমরা আদিশূরের অস্তিত্ব প্রমাণের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যত কিছু তর্ক উপস্থিত হইতে পারে, যথাসাধ্য তাহার আলোচনা করিলাম। এক্ষণে বুধমণ্ডলী যে পক্ষের হেতুবাদ সমীচীন বলিয়া বিবেচনা করিবেন, গ্রহণ করিবেন।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

থাকিব কেমনে ?

(১)

সেই বংশীবট,
যমুনার তট,
(মোর) মানস-মোহন—
পড়ে যে লো মনে
(আমি) থাকিব কেমনে ?

(২)

বাঁশরীর তান,
রাধা-প্রেম গান,
কানু সুধাস্বর—
পশে লো শ্রবণে—
সখি ! থাকিব কেমনে ?

(৩)

সেই নিধুবন,
নিকুঞ্জ-কানন,
(মোর) ব্রজের-মোহন—
নাচিছে নয়নে
(বল) বাঁচিব কেমনে।

(৪)

কৃষ্ণ কালশশী
হাতে লয়ে বাঁশী
কদম্বেরি মূলে,—
দেখেছি স্বপনে
আজি থাকিব কেমনে ?

(৫)

সেই শুকসারি,
চকোর চকোরী,
ভ্রমর ভ্রমরী
(সুধা) ঢালিছে পরাণে,
বল থাকিব কেমনে।

(৬)

ধবলী-শ্যামলী,
রাঙ্গা গাভীগুলি,
(সেই) রাখাল বালক
খেলিছে নয়নে—
আমি থাকিব কেমনে ?

(৭)

শুভ্র সুধাহাসি,
পায়ে ফুলরাশি,
ত্রিভঙ্গ মুরারি—
পড়ে সখি মনে—
সখি ! থাকিব কেমনে ?

(৮)

সুচারু বদন,
বঙ্কিম নয়ন,
(সেই) লুকায়ে পিরীতি,
জাগিছে পরাণে—
রাধা থাকিবে কেমনে ?

(৯)

মরাল গমন,
আবেশ-কম্পন,
উঁকি ঝুঁকি মারা—
দহিবে পরাণে
মোর ! জীবনে মরণে।

শ্রীফণিভূষণ মুস্তোফী, বি, এ।

চোর-ধরা।

(গল্প)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সাক্ষাতে।

পার্ব্বত্য পথে ট্রেণখানি সর্পের ন্যায় বক্রগতিতে আরোহণ করিতেছিল—আমি আর একটুও ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিতেছিলাম না, কতক্ষণ পরে বাল্যবন্ধু মিঃ সান্ন্যালকে দেখিব, এই চিন্তাতেই আমার মন পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। কতদিন তাহাকে দেখি নাই! আজ সুদীর্ঘ দশ বৎসর পরে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছি! আমার সারা হৃদয়টা তাহার সহিত মিলনের আনন্দে উছলিয়া উঠিতেছিল। পূর্ব্বে মিঃ সান্ন্যালের সহিত আমার কি প্রণয়টাই না ছিল! নিম্নশ্রেণী হইতে এম-এ ক্লাস অবধি আমরা দুইজনে একত্রে একই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। তাহার পর আমি 'ল' পাশ দিয়া হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করি, আর মিঃ সান্ন্যাল বিলাত গিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসে। সেই সময় হইতে আমাদিগের ছাড়াছাড়ি হয়। তাহার পর প্রায় দশবৎসর পরে একদিন তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তখন তাহার আট বৎসরের একটী পুত্র এবং ছয়বৎসরের একটী কন্যা।—সে তখন পূর্ণমাত্রায় সংসারী। তাহার পর আবার দশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে,—ইহার মধ্যে আর একদিনও তাহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই।

সে দিন মিঃ সান্ন্যালের নিকট হইতে একখানি পত্র পাইলাম। তাহাতে জানিলাম, সে এখন বায়ুপরিবর্ত্তনার্থ দার্জ্জিলিংএ আসিয়াছে। সামনেই বড় দিনের ছুটি; সান্ন্যাল লিখিয়াছে,—"অনেক দিন তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি, বড়দিনের ছুটিতে অবশ্য অবশ্য এখানে এস। তুমি বোধ হয় শুনে দুঃখিত হবে, আমি বিপত্নীক হ'য়েছি।" তাহার এ আহ্বান—এ আন্তরিক আহ্বান আমি অগ্রাহ্য করিতে পারিলাম না;—বিশেষ এক্ষণে পত্নী বিয়োগ হওয়ায় মনকষ্টে আছে, এ সময় বাল্যবন্ধু আমি যদি তাহাকে সান্ত্বনা না দিই, তবে জগতের লোকে কি বলিবে?

কতক্ষণ পরে ট্রেণখানি আসিয়া ষ্টেসনে শ্রান্ত শ্বাস ত্যাগ করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। আমি নামিতে নামিতে একবার সাগ্রহ দৃষ্টিতে সারা প্ল্যাটফরমটা দেখিয়া লইলাম। মন যাহাকে খুঁজিতেছে, তাহাকে বাহির করিতে বিশেষ কষ্ট হইল না। কিন্তু মিঃ সান্ন্যালের এ কি পরিবর্ত্তন? হঠাৎ দেখিলে তাহাকে চিনিবার উপায় নাই; সারা মুখমণ্ডল শ্মশ্রুগুম্ফ-বিমণ্ডিত; চোখের নীচে একটা গভীর কাল দাগ, কপালে চিন্তারেখা পরিস্ফুট!

আমায় দেখিয়াই মিঃ সান্ন্যাল একটু স্মিতহাস্য করিল। সাগ্রহে করকম্পনার্থ হস্ত বাড়াইয়া দিয়া বলিল,—"তবে, সেন ভাল ত?"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আমি বলিলাম,—"আর দাদা, দিনগুলো অম্নি একরকম কেটে যাচ্চে; তাই যদি ভাল ব'লতে হয়, তবে ভাল বই কি!"

মিঃ সান্ন্যালের মুখে একটু বিষাদের হাসি ফুটিয়া উঠিল। আমরা ষ্টেসন ছাড়িয়া তাহার বাংলা অভিমুখে যাত্রা করিলাম। মিঃ সান্ন্যাল একবার আমার দিকে চাহিয়া পার্শ্বে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল, বলিল "এদের চিন্‌তে পার?"

তাহার নির্দ্দিষ্ট পথে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলাম, একটী ষোড়শী কিশোরী ও একটী যুবক। আমি চেষ্টা করিয়াও তাহাদের চিনিতে পারিলাম না। প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে মিঃ সান্ন্যালের দিকে চাহিলাম।

এবার সে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। ঠিক সেই বাল্যকালে যে সরলতা মাখা হাস্য করিত, এ সেই হাস্য। বহুদিন তাহাকে এরূপ ভাবে হাসিতে দেখি নাই। কাজেই আমি একটু বিস্মিত হইলাম। সে বলিল,—"সে কি হে! আমার ছেলে রমেশ আর মেয়ে ইলাকে তোমার মনে পড়ে না? এরি মধ্যে ভুলে গেছ?"

আমি নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া তাহাদের সহিত করকম্পনার্থ হস্ত প্রসারণ করিলাম। সস্মিতাননে তাহারা আমার সহিত করকম্পন করিল। ইলা হাসিতে হাসিতে আমায় বলিল,—"কাকা বাবু! এখানে আর কখনও এসেছিলেন আপনি?"

"না মা, জীবনে এই প্রথম!"

উৎসাহিত হইয়া ইলা নানারূপ গল্প করিতে লাগিল। নানা কথায় আমরা পথটা অতিক্রম করিতে লাগিলাম। হঠাৎ একবার ইলার সহিত গল্প করিতে করিতে আমি অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলে, পথে একটা লোকের একে-

বারে ঘাড়ে পড়িয়া গেলাম। অপ্রতিভ হইয়া তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে সে বলিল,—"না, এতে আর আপনার দোষ কি, আপনি ত আর ইচ্ছে ক'রে করেন নি!"

তাহার অদ্ভুত কণ্ঠস্বর বা আকৃতি,—যাহাতেই হউক, আমি কিয়ৎক্ষণ তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। লোকটা দ্রুত সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। এই স্থানে একটা কথা বলিয়া রাখি,—সর্ব্বদা দুষ্টলোকের সংস্পর্শে আসিয়া আমার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা জন্মিয়াছিল; আমি লোকের মুখ দেখিলেই তাহার প্রকৃতি বলিয়া দিতে পারিতাম। লোকটার দিকে চাহিতেই আমার মনে হইয়াছিল, তাহার প্রকৃতিটা তেমন ভাল নহে, আর তাহাকে যেন পূর্ব্বে কোথায় দেখিয়াছি!

যাহাহউক, এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ আমার মনে অধিকক্ষণ স্থান পাইল না। ইলা বলিয়া উঠিল,—ঐ দেখুন কাকাবাবু আমাদের বাংলা! চলুন না, ঐ জলাটার উপর একটু নৌকা ক'রে বেড়াই।

আমি তাহার কথায় অসম্মত হইতে পারিলাম না। মিঃ সান্ন্যাল ও রমেশের নিকট আমার দ্রব্যাদি দিয়া ইলার সহিত নৌকায় উঠিলাম। তখন সূর্য্য প্রায় অস্তগত; সারা পশ্চিম আকাশটা সিঁদুরে মেঘে রাঙ্গা! আমরা দুইজনে নানা কথা কহিতে কহিতে বেড়াইতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে আর একটী যুবক আসিয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হইল। ইলার নিকট শুনিলাম, তাহার নাম হরেন; সেও আমারই মত একজন নিমন্ত্রিত! সন্ধ্যা তখন প্রায় হয় হয়। ইলাকে তীরে তুলিয়া দিলে সে বাংলা অভিমুখে চলিয়া গেল। আমি নৌকার দাঁড়গুলা লইয়া যাইবার জন্য সেগুলা গুছাইতে লাগিলাম।

তীরের দিকে একবার চাহিয়া দেখিলাম, সেখানে কেহ নাই। আমি হঠাৎ অন্যদিকে চাহিতেই দেখিলাম, ছিন্ন বস্ত্র-পরিহিত একটা দরিদ্র লোক আমারই দিকে আসিতেছে। মনে করিলাম, লোকটার উদ্দেশ্য বোধ হয় ভিক্ষা করা; কাজেই আমি বলিলাম,—"দেখ বাপু! শুধু শুধু আমি পয়সা দিচ্চি না, এই হালগুলো নিয়ে চল কিছু দেওয়া যাবে।"

লোকটা আমার কণ্ঠস্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিল ও দ্রুতবেগে কেলুকুঞ্জের দিকে অগ্রসর হইল। আমি মনে করিলাম,—আমায় দেখিয়া লোকটা বোধ হয় বড়ই ভয় পাইয়াছে; আহা কেন এমন করিলাম। কিন্তু তাহার পরই

দেখিলাম, হরেন্দ্র দ্রুতবেগে তাহার অনুসরণ করিতেছে। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার প্রায় ঘনাইয়া আসিয়াছিল। কাজেই সে আমায় দেখিতে পায় নাই; আমিও একটু দূরে থাকিয়া তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলাম।

একটা ঝোপের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সবিস্ময়ে দেখিলাম, হরেন্দ্র সেই ছিন্ন বসন-পরিহিত লোকটার সহিত সাগ্রহে আলাপ করিতেছে! আমার উপর তাহার দৃষ্টি পড়িতেই সে পলায়ন করিতে উদ্যত হইল; কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তে হরেন্দ্র তাহার পকেট হইতে কি একটা বাহির করিতেই সে সাগ্রহে তাহা লইয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। আমি ততক্ষণে হরেন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলাম। সে আমায় দেখিয়া প্রথমটা কিঞ্চিৎ হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল; আমি তাহার সেভাব দেখিয়াও দেখিলাম না; জিজ্ঞাসা করিলাম,—"লোক-টাকে কিছু দিলে নাকি?"

আত্মসম্বরণ করিয়া হরেন্দ্র বলিল,—"হ্যাঁ; বড় দুঃখে কষ্টে প'ড়েছে শুন্‌লুম। তার জীবনের এমন করুণ কাহিনী বল্লে, যে আমি তাকে একটা সিকি না দিয়ে থাকতে পাল্লুম না।"

আমি বলিলাম,—"ভাল করনি কিন্তু, এতে শুধু কুড়েমিকে প্রশ্রয় দেওয়া হ'ল। আমি লোকটাকে দাঁড়গুলো নিয়ে যেতে বল্লুম,—নিয়ে গেলে আমি-ই তাকে পারিতোষিক দিতুম; কিন্তু বেটা এমন কুড়ে যে, কাজ করবার কথা ব'লতেই ছুটে পালাল। ঐ সব লোককে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। ওবেটারা বদমাইসের ধাড়ি!

তাহার পর আমরা দুইজনে দাঁড়গুলো লইয়া মিঃ সান্ন্যালের বাংলায় প্রবেশ করিলাম। সেখানে গিয়া অন্য পাঁচ কথায় এঘটনাটা একপ্রকার ভুলেই গেলাম।

সেদিন রাত্রে আমি মিঃ সান্ন্যালের সহিত অতীত জীবনের নানা সুখ-দুঃখের কাহিনী আলোচনা করিতেছিলাম। অন্যদিকে রমেশ, ইলা, হরেন্দ্র ও যোগিন চারিজনে বসিয়া নানারূপ খোসগল্পে সময় কাটাইতেছিল। যোগিনও একজন নিমন্ত্রিতের মধ্যে; শুনিলাম সে এবং হরেন্দ্র বড়দিন উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া আমারই ন্যায় বঙ্গ-দেশ হইতে এই দার্জ্জিলিংশৈলে কয়েক দিনের জন্য আসিয়াছে। তবে তাহারা পরস্পর ইতিপূর্ব্বে পরিচিত ছিল না। রমেশই উভয়কে উভয়ের নিকট পরিচিত করিয়া দেয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ভূতের ভয়।

সে দিন বড়দিন। পৌষের শীতজর্জ্জর রজনী। বাহিরে অবিশ্রান্ত তুষার বৃষ্টি হইতেছিল। দুই হস্ত দূরের মনুষ্য দেখা যায় না। একখানি সাদা পরদার ন্যায় তুষাররাশি সারা দেশটাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল। আমরা বসিবার ঘরের দ্বার জানালা বন্ধ করিয়া আরামে অগ্নি সেবন করিতেছিলাম। গৃহের অপর পার্শ্বে যুবকগণ ও ইলা নানারূপ আলাপ করিতেছিল, আর মধ্যে মধ্যে উচ্চহাস্য করিতেছিল। সেদিন ইলাকে যেন অপূর্ব্ব সুন্দরী দেখাইতেছিল! আমার মনে অতীত যৌবনের কথা জাগিয়া উঠিল। তখন এমনি সুন্দরী যুবতীর সহিত কতদিন কত রহস্যামোদে কাটাইয়াছি! কিন্তু এখন আর সেদিন নাই। অকালে জরা আসিয়া আমার দেহ হইতে যৌবনের সকল স্বপ্ন দূর করিয়া দিয়াছে!

যুবকের দল ইলাকে মধ্যে রাখিয়া নানারূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। যুবক হরেন্দ্র যেন সেদিন সকলের অপেক্ষা অধিক আনন্দ-বিহ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কি জানি, কেন আমার নিকট তাহার হাবভাব কথাবার্ত্তা সকলই যেন কেমন কেমন ঠেকিতেছিল। কি জানি, কেন তাহাকে কিছুতেই নিরীহ বলিয়া মনে করিতে পারিতেছিলাম না। আমি তাহাদিগের কথোপকথন শুনিতে লাগিলাম।

রমেশ নানাকথার পর ভূতের গল্পের অবতারণা করিল। হাসিয়া হরেন্দ্র বলিল,—"আচ্ছা ভূত আছে ব'লে তোমরা বিশ্বাস কর? আমি কিন্তু যতদূর বুঝেছি, তাতে ভূত ব'লে পৃথিবীতে একটা কিছুর অস্তিত্ব একেবারেই নেই। কেবল বদলোকে ঐ একটা বাজে গুজোব রটায়, মূলে কিন্তু এতটুকু সত্য নেই।"

যোগীন্দ্র এতক্ষণ নীরবে বসিয়াছিল। এইবার সে হরেনকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তা হ'লে তুমি ভূতের অস্তিত্ব একেবারেই মান না? এই যে শোনা যায়, কোন কোন লোক ম'রে গিয়েও পৃথিবীর মায়া ছাড়তে না পেরে কোন একটা যায়গায় আশ্রয় নিয়ে থাকে কি কোন বাড়ী অধিকার ক'রে বসে, সেও কি মিথ্যে ব'লতে চাও?"

"নিশ্চয়-ই। কথাগুলোর আগাগোড়া মিথ্যে!"

"আচ্ছা, তবে লোকে যেখানে ভূত আছে বলে, সেখানে যেসব অসম্ভব কাণ্ড ঘটে, সেগুলো কি ব'লতে চাও ?"

"একেবারে বাজে কথা। যে ভীরুগুলো সেখানে কখনও পা দেয় না, তারাই কল্পনার সাহায্যে ঐ রকম আজগুবি গল্পের সৃষ্টি করে; তারা শুধুই যে ভীরু তা নয়, নির্ব্বোধও বটে!"

বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া যোগিন বলিল,—"তুমি তবে নিশ্চয়ই ভূতকে ভয় কর না ?"

সগর্ব্বহাস্যে হরেন বলিল,—"মোটে না—মোটে না।"

সুখের বিষয় ইহাতে তাহাদিগের বন্ধুত্ব আহত হইল না।

যোগিন বলিল,—"বেশ, তবে আজ তোমার সাহসের পরীক্ষা দাও। ওই জলার ধারে একটু ভেতর দিকে একটা ভাঙ্গা বাড়ী আছে, আজ রাত বারটার সময় সেখানে গিয়ে একটা খোঁটা পুতে এস। এখানকার লোকের ধারণা—ওবাড়ীতে ভূত থাকে। তা যদি তুমি পার, তবে আর তোমার কথায় আমাদের একটুও অবিশ্বাস থাকবে না। কি বল, পারবে ?"

হরেন ঈষৎ বিবর্ণ হইয়া গেল। চকিতে আত্মসম্বরণ করিয়া ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার পর বলিল,—"আচ্ছা তাই।" কথাটা বলিতে তাহার স্বর যেন ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল। সকলে তখন উৎসাহিত হইয়া তাহাকে বেষ্টন করিয়া কিভাবে কার্য্য করিতে হইবে, তাহারই আলোচনা করিতে লাগিল। আমরা দুইজনে তাহাদিগকে এ সংকল্প হইতে বিচ্যুত করিতে পারিলাম না।

তাহাদিগের মধ্যে রমেশই কতকটা প্রকৃতিস্থ ছিল। সে এই উত্তেজনার উন্মাদনায় একেবারে বিভোর হইয়া পড়ে নাই। নীরবে বসিয়া তাহাদিগের কৌতুক দেখিতেছিল।

ক্রমে সময় কাটিয়া গেল। রাত্রি প্রায় পৌনে বারটার সময় সেই উত্তেজিত বালকদল ভগ্নগৃহের উদ্দেশে যাত্রা করিল। যাত্রার পূর্ব্বে তাহারা যথাসম্ভব শীত-নিবারক বস্ত্রে উত্তমরূপে গাত্রাবৃত করিয়া লইল। সেই পৌষের দুরন্ত শৈত্যে অবিশ্রান্ত তুষারপাতের মধ্যে বাহির হওয়া যে কি বিড়ম্বনাময়, তাহা যাঁহারা জানেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন; সাধারণে তাহা কল্পনাও করিতে পারেন না। তাহাদিগের এ উন্মাদ উত্তেজনায় আমিও যে অভিভূত হই নাই, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু হায়! তখন

আমার যৌবন অস্তমিত হইয়াছে, কাজেই ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে পারিলাম। হৃত যৌবনের অভাব তখন আমায় আবার নূতন করিয়া কষ্ট দিল। আমি তাহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে দ্বার অবধি গেলাম, ফিরিবার সময় বলিলাম,—"তোমাদের পাগলামী যত শীঘ্র পার শেষ ক'রে এস, যে বরফ পড়ছে, বেশীক্ষণ বাইরে থাকলে একেবারে জ'মে যাবে।

রাত্রি একটা বাজিল, তবুও তাহারা ফিরিল না। মিঃ সান্ন্যাল শয়ন করিতে গেলেন: আমি বলিলাম,—"এরা ফিরে এলে আমি শুতে যাব।" মিঃ সান্ন্যালকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, রমেশ একবার কলিকাতায় গিয়াছিল, সেই সময় হরেনের সহিত তাহার আলাপ হয়, সেই হইতে তাহাদিগের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মে। ইহার অধিক আর কিছুই তিনি বলিতে পারিলেন না। হরেনের চেহারা দেখিলে ভদ্র-সন্তান বলিয়াই মনে হয়। জন্মের মধ্যে এই প্রথম সে দার্জ্জিলিং আসিয়াছে!

আরও একঘণ্টা কাটিয়া গেল। আমি যেন আর বসিয়া থাকিতে পারিতেছিলাম না। ঠিক সদর দ্বারের সম্মুখেই আমি বসিয়াছিলাম। সেটী মিঃ সান্ন্যালের ধূমপানের ঘর। নীরবে বসিয়া বসিয়া আমি একান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম; সময় কাটাইবার জন্য একটী সিগারেট ধরাইলাম। ঠিক সেই সময় বাহিরে যেন কি একটা গোলমাল শুনিলাম। মনে করিলাম, তবে বুঝি তাহারা ফিরিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে দ্বারের নিকট উঠিয়া গেলাম।

দ্বার খুলিবামাত্র পতঙ্গপালের ন্যায় তুষারচূর্ণ আসিয়া আমার নয়নদ্বয় অন্ধ করিয়া দিল। চকিতে আমি দ্বার বন্ধ করিয়া দিলাম।

বাহিরে কেহই ছিল না, কিন্তু তবু আমি মিলিত কণ্ঠস্বর বেশ স্পষ্ট শুনিতে পাইয়াছিলাম—কে বা কাহারা যে সে শব্দ করিল, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। শব্দটা মিঃ সান্ন্যালের পুস্তকাগারের দিক হইতে আসিয়াছিল—আমি যে ঘরে বসিয়াছিলাম, পুস্তকালয়টী ঠিক তাহার পার্শ্বেই অবস্থিত।

অবশেষে যখন যুবকগণ কেহই আসিল না, তখন মনে করিলাম, আমি বোধহয় হাওয়ার শব্দকে তাহাদিগের কণ্ঠস্বর বলিয়া ভ্রম করিয়াছি।

ক্রমে রাত্রি আড়াইটা হইল। আমি তখন যুবকগণের জন্য অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া উঠিলাম। আর স্থিরভাবে বসিয়া থাকা অনুচিত বিবেচনায় পরিচ্ছদাদি পরিয়া বাহির হইলাম।

সুখের বিষয় মোড় পার হইবার পূর্ব্বেই তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইল। দেখিলাম হরেন্দ্র অত্যন্ত ভয় পাইয়াছে,—তাহার মুখখানি মৃত ব্যক্তির ন্যায় বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। রমেশ বলিল—"কাকাবাবু! বড় মজা হ'য়েছে। আমাদের বাইরে দাঁড়াতে ব'লে হরেন একলা বাড়ীটার ভেতর গেল;—তখন ঠিক দুপুর রাত্রি! খানিক পরেই একটা আর্ত্তনাদ শুনতে পেলুম,—সঙ্গে সঙ্গে একটা জিনিষ পড়ার শব্দও হল। যোগিন তাড়াতাড়ি ছুটে গেল; গিয়ে দেখে হরেন মড়ার মত পড়ে আছে—তার কাপড়ের অনেকটা ছিঁড়ে গেছে! যোগিন কি ক'রে যে ওকে শান্ত ক'ল্লে আর উঠিয়ে নিয়ে এল, তা কিছুতেই বুঝিতে পাচ্ছি না; কিন্তু যা ক'রে হোক, এনেচে বটে। ওকে জিগেস ক'রে কিন্তু বিশেষ কিছু বুঝতে পাল্লুম না।"

ইতি মধ্যে আমরা গৃহে প্রবেশ করিলাম। গৃহে আসিয়া হরেন্দ্র ব্যতীত অন্য সকলের লুপ্তসাহস ফিরিয়া আসিল। এতক্ষণ পরে হরেনের মুখ ফুটিল,—সে বলিল,—"এখন আমার বাজীর টাকা দাও। আমি খোঁটা ঠিক পুতে এসেছি।"

দলস্থ সকলে কিন্তু তখন তাহাকে কিছুতেই টাকা দিতে চাহিল না। তাহারা বলিল, চীৎকারের কারণ না জানিয়া এবং দিবালোকে তাহার পোতা খোঁটা না দেখিয়া তাহাকে টাকা দেওয়া হইবে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ছায়ামূর্ত্তি।

আমরা যখন সে রাত্রে শয্যা গ্রহণ করিলাম, তখন রাত্রি প্রায় চারিটা। শরীর ও মন নিশাজাগরণে অবসাদগ্রস্ত হইলেও সহজে আমার নিদ্রাকর্ষণ হইল না।। মনে মনে সে সময় কেবল হরেনের কথাই ভাবিতেছিলাম—তাহার সেই ভগ্নগৃহে প্রবেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন অবধি সকল কথাই একে একে মনে আসিতেছিল। যুবকগণের ন্যায় আমিও প্রভাত-সমাগমে তাহার পোতা খোঁটা দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে বাল্যে শ্রুত

বহু ভৌতিক কাহিনীও আমার মনে আসিতেছিল। হঠাৎ আমি চমকিয়া উঠিলাম—উৎকর্ণ হইয়া শুনিলাম,—বাহিরে একটা বংশী ধ্বনি হইল। এবারেও শব্দটা সেই পুস্তকাগারের দিক হইতেই আসিল।

আমি বিছানার উপর উঠিয়া বসিলাম, আরও মনোযোগের সহিত শুনিতে লাগিলাম—কিন্তু না, আমার ত শুনিবার ভুল হয় নাই! না এবারে আমি কিছুতেই ভুল করি নাই। আবার—আবার সেই বংশীধ্বনি! কিন্তু সে শব্দ এতই মৃদু যে সহজেই বায়ুগর্জ্জন বলিয়া ভ্রম হয়। ক্রমে শব্দ আমার জানালার অতি নিকটে আসিল। আমি ভাল করিয়া উঠিয়া বসিলাম। তাহার পর যথাসম্ভব ক্ষিপ্রপদে ও নিঃশব্দ পদসঞ্চারে জানালার নিকট গিয়া জামা পরিয়া লইলাম।

আমি যে ঘরে শুইয়াছিলাম, সেটী দ্বিতলের একটী কক্ষ; মিঃ সান্ন্যালের পুস্তকাগারের ঠিক উপরের ঘরটী! গতকল্য আমি এ ঘরে শয়ন করি নাই; মিঃ সান্ন্যাল আমার সুবিধার জন্য আজই এই ঘরে আমার শয়নের বন্দবস্ত করিয়াছিলেন। ঘরের পার্শ্বেই একটী অপ্রশস্ত বারান্দা সারা দ্বিতলটা বেষ্টন করিয়াছিল। তাহার উপর হইতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দিবালোকে অতি মনোরম দেখায়। ভূমি হইতে বারান্দা প্রায় কুড়ি ফুট উচ্চ। কোন লোক ইহাতে আরোহণ করিয়াছে কিনা এবং এই বংশীধ্বনির অর্থ কি, এই দুই প্রশ্নের মীমাংসার্থ আমি ভাল করিয়া জানালা দিয়া বারান্দাটী দেখিব বলিয়া স্থির করিলাম।

জানালার নিকট উপস্থিত হইয়া সেই অজস্র ধারে তুষারপাতের মধ্য দিয়া আমি বাহিরে চাহিয়া দেখিলাম। আকাশে চাঁদ ছিল না। কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া থাকিবার পর বরফের মধ্য দিয়া অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইতে লাগিলাম। কিন্তু তবুও কোন মানবের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিলাম না। যাহা হউক, আমার অদম্য কৌতূহলবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য তথাপি জানালার ধারে দাঁড়াইয়া রহিলাম। গৃহের মধ্যে তখন অত্যন্ত অন্ধকার; বিশেষতঃ আমি মশারির পার্শ্বে আত্মগোপন করায় বাহিরের কোন লোকের দৃষ্টি সম্মুখে পড়িবার ভয় ছিল না; উপরন্তু জানালার নিকট দিয়া কেহ গমন করিলে আমার দৃষ্টি এড়াইবার উপায় ছিল না।

কিয়ৎক্ষণ অবধি আমি উৎকর্ণ হইয়া দণ্ডায়মান রহিলাম, কিন্তু বাঁশরীর শব্দ আর শুনিতে পাইলাম না। বহুক্ষণ পরে আমি ধৈর্য্যের পুরস্কার

পাইলাম,—অদূরে তুষাররাশি দলিত করিয়া কেহ অগ্রসর হইলে যেরূপ শব্দ হয়, সেইরূপ একটা মৃদুশব্দ শুনিতে পাইলাম। ক্রমে সেই পদশব্দ নিকট হইতে নিকটতর হইতে লাগিল,—আর রুদ্ধশ্বাসে আমি তাহাই শুনিতে লাগিলাম। অবশেষে আমার জানালার সমীপবর্ত্তী হইয়া শব্দ একেবারে থামিয়া গেল।

আমি ভীরু নহি, কিন্তু তখন যে একটুও ভীত হই নাই এ কথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। ঐ, ঐ আবার সেই বংশীধ্বনি! তাহার পরই সে ব্যক্তি হস্তপদে ভরদিয়া আমার জানালার পার্শ্বে উঠিতে লাগিল; সেই তুষারপাতের ক্ষীণালোকে আমি তাহার অস্পষ্ট মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম;—লোকটা সোজা হইয়া আমার জানালায় উঁকি মারিতে লাগিল। সেই অস্পষ্ট আলোকে আমি লোকটাকে ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম না। তাহার পরই সে একটী ক্ষুদ্র পকেটল্যাম্পের আবরণ মোচন করিয়া জানালার গরাদে গুলা পরীক্ষা করিতে লাগিল। সেই আলোকে আমি চকিতে লোক-টাকে চিনিয়া ফেলিলাম।

যে লোকটাকে প্রথমদিন আমি ভিক্ষুক মনে করিয়া দাঁড় বহিতে বলিয়া-ছিলাম, এ সেই!

প্রথম বংশীধ্বনির প্রত্যুত্তর স্বরূপ আর একটা বংশীধ্বনি শুনিতে পাইলাম। ব্যাপার দেখিয়া আমি প্রায় হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাম—কি করিব, প্রথমে তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। মুহূর্ত্তপরে আলোক অদৃশ্য হইল, সঙ্গে সঙ্গে লোকটাও অগ্রসর হইতে লাগিল।

লোকটার উদ্দেশ্য বুঝিতে আমার কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। তখনই বুঝিতে পারিলাম, সে একজন পাকা নেশাখোর এবং চোর। তখনই কর্ত্তব্য চিন্তা করিয়া লইলাম। একটা রবারের জুতা পরিয়া পকেটে একটা পিস্তল লইলাম। তাহার পর নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলাম।

লোকটার কার্য্যকলাপ দেখিয়া আমি দুইটী সিদ্ধান্ত করিয়া লইলাম। প্রথমতঃ লোকটা বারান্দার ধারের কোন একটা জানালা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে চায়। দ্বিতীয়তঃ সে একাকী নহে, আরও একজন সঙ্গী আছে; সেই দ্বিতীয় বংশীধ্বনি করিয়াছে। কিন্তু সেই সঙ্গীটী কোথায়, সে কি বাটীর মধ্যে ইতিপূর্ব্বেই প্রবেশ করিয়াছে অথবা নিমন্ত্রিতগণের মধ্যেই

কেহ তাহাকে সাহায্য করিতেছে? কিন্তু নিমন্ত্রিতগণের মধ্যে যে কেহ এরূপ কৃতঘ্ন থাকিতে পারে, তাহা আমার সম্ভব বলিয়া মনে হইল না। কাজেই আমি বারান্দার শেষ প্রান্তে অবস্থান করিয়া, লোকটার কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিব মনে করিলাম; কিন্তু কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া একটী কক্ষে মৃদু কথোপকথন শুনিতে পাইলাম।

আমি আর অগ্রসর না হইয়া সেই দ্বারেই কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিলাম। দ্বারে হাত দিয়া বুঝিলাম, দ্বার বন্ধ নহে, কেবল মাত্র ভেজান আছে।

দ্বার ঈষৎ ফাঁক করিয়া আমি ভিতরে চাহিয়া দেখিলাম;—দেখিলাম গৃহের শেষ প্রান্তে দুই ব্যক্তি বসিয়া কথোপকথন করিতেছে, পার্শ্বে স্তিমিত-প্রায় পকেট লণ্ঠনটী পড়িয়া রহিয়াছে। একজন দ্বারের দিকে পশ্চাৎ রাখিয়া বসিয়াছিল, অপর ব্যক্তি একখণ্ড কাগজ লইয়া সেই স্তিমিতপ্রায় আলোকে পরীক্ষা করিতেছিল। লোকটা কাগজখানি আরও ভালরূপে পরীক্ষা করিবার উদ্দেশে আলোর নিকট ঝুঁকিয়া পড়িতেই আমি তাহাকে আবার চিনিয়া লইলাম—সেই ভিক্ষুক! এবার আর কোন সন্দেহ রহিল না। আমি যে স্থানে দাঁড়াইয়াছিলাম, সে স্থান হইতে কাগজে লিখিত বিষয় দেখিতে পাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। তবে তাহাদের অস্পষ্ট কথাবার্ত্তা হইতে বুঝিতে পারিলাম, সেই কাগজ খানি লইয়াই তাহাদিগের মধ্যে বাদানুবাদ চলিতেছে!

আমি মনে মনে কর্ত্তব্য স্থির করিতে লাগিলাম। আমার চক্ষুর সম্মুখে বন্ধুর দ্রব্যাদি অপহৃত হয় এরূপ আমার ইচ্ছা নহে, আবার শব্দ হইলে পাছে তাহারা আমার অস্তিত্ব অবগত হয়, এই ভয়ে আমি অন্য কাহারও নিকট যাইতে পারিতেছিলাম না। যাহাহউক, গৃহস্থিত ব্যক্তিদ্বয় উঠিয়া দাঁড়াইলে আমি অগত্যা বাধ্য হইয়া সে স্থান হইতে সরিয়া একটী থামের অন্তরালে আত্মগোপন করিলাম। কিঞ্চিৎ পরেই তাহারা গৃহ হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

হাতেকলমে।

আমি ঠিক সময়েই আত্মগোপন করিয়াছিলাম। কারণ, তখনই তাহারা নিঃশব্দে দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া বাহিরে আসিল এবং অন্ধকারের মধ্যে সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তখন আলোটী একেবারে নিভাইয়া দেওয়া হইয়াছিল ; ইহাতেই আমি বুঝিলাম, দ্বিতীয় ব্যক্তি আমাদিগের অতিথিগণের মধ্যেই একজন। তাহারা সাবধানে আমার নিকট দিয়া চলিয়া গেল। আমি উৎকর্ণ হইয়া তাহাদিগের পদধ্বনি শুনিতে লাগিলাম ;—শুনিলাম, তাহারা সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতেছে।

চকিতে আমি আমার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলাম। সেখান হইতে বরাবর রমেশের কক্ষাভিমুখে গেলাম এবং অল্প চেষ্টাতেই তাহাকে জাগাইতে সমর্থ হইলাম।

যথাসম্ভব ক্ষিপ্র হস্তে পোষাক পরিয়া লইয়া রমেশ বলিল,—"চলুন হরেনকে ডাকি, সে এসব কাজে বেশ সাফাই!"

আমার তখনও মনে ছিল যে, বেচারা এই কতক্ষণপূর্ব্বে ভূতের ভয় পাইয়াছে, কাজেই তাহাকে আর বিরক্ত করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিলাম না। তাহার পরিবর্ত্তে যোগিনকে ডাকিব স্থির করিলাম। যোগিনকে সঙ্গে লইয়া আমরা তিনজনে দ্রুতপদে নীচে নামিয়া আসিলাম।

রমেশ বলিল,—"তারা বোধহয় রূপার বাসনগুলা বাগাবার উদ্দেশে লাইব্রেরির পাশে খাবার ঘরে গেছে। চলুন, আগে সেইদিকেই যাওয়া যাক্। লাইব্রেরী ঘরেই বাবার টাকা কড়ি থাকে।"

রমেশের কথামত আমরা সেইদিকেই গমন করিলাম। দ্বারের নিকট আসিয়া রমেশ চাবি খুঁজিল, কিন্তু পাইল না। চুপি চুপি আমায় বলিল,—"কাকা বাবু! যা ভেবেছি তাই হ'য়েছে। বেটারা ভেতর দিক থেকে চাবি বন্ধ ক'রে দিয়েছে। বাইরের দিকে যখন চাবি নেই, তখন তারা নিশ্চয়ই ঘরের ভেতর আছে।"

আমরা দ্বারে কাণ পাতিয়া মনোযোগের সহিত শুনিতে পাইলাম ;—

গৃহের মধ্যে রেকাব নাড়ার মৃদু ঠুন ঠান্ শব্দ ছাড়া আর কিছুই প্রথমে শুনিতে পাইলাম না। আমরা ভাবিয়া দেখিলাম, চোরদিগকে বিরক্ত না করিলে তাহারা নিশ্চয়ই জানালা দিয়া পলায়ন করিবে না। এখন আমাদিগের প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয় হইল,—তাহারা মিঃ সান্ন্যালের পুস্তকালয়ে প্রবেশ করিয়াছিল কি না। রমেশ এই প্রশ্নের মীমাংসা করিবার জন্য সেই গৃহে গমন করিল এবং অনতিবিলম্বে ফিরিয়া আসিয়া জানাইল যে, চতুর্দ্দিকের অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, এখনও তাহারা সে কক্ষে প্রবেশ করে নাই। অতঃপর আমরা এইভাবে কার্য্য করিতে অগ্রসর হইলাম;—আমি এবং রমেশ পুস্তকালয়ে প্রবেশ করিয়া কোন এক স্থানে আত্মগোপন করিয়া চোরের আগমন প্রতীক্ষা করিব। অন্যদিকে যোগীন্দ্র হলঘরের দ্বার চাবি বন্ধ করিয়া সে পথে পলায়নের উপায় বন্ধ করিয়া দিয়া ভোজন কক্ষ পাহাড়া দিবে। যদি চোরেরা ভোজন কক্ষ হইতে পুস্তকালয়ের অপর পার্শ্বস্থ হলঘরের দিকে চলিয়া যায়, তবে সে তখনি আমাদের সে সংবাদ জ্ঞাপন করিবে। যোগীনকে বলিয়া গেলাম, সেরূপ অবস্থা দেখিলে পিস্তল ছুড়িয়া আমাদিগকে বিপদের কথা জানাইবে।

আমাদিগের মৎলব ভাঁজা অতি সুন্দর হইয়াছিল। চোর দুইজনের দেখিলাম, টাকার সিন্ধুকের কথা বেশ জানা ছিল! আমরা অল্পক্ষণ ঘরে আত্মগোপন করিয়া থাকিবার পরই দেখিলাম, একজন লোক অতি সন্তর্পণে দ্বার খুলিয়া ঘরের কোণের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বলা বাহুল্য, সেই দিকেই টাকার সিন্ধুক ছিল। লোকটা যেই হোক, দেখিলাম গৃহটী তাহার সম্পূর্ণ পরিচিত, কাজেই বেশ পরিচিতের ন্যায় অগ্রসর হইতে লাগিল। কিঞ্চিৎ পরে একটী পকেট লণ্ঠন বাহির করিয়া সিন্ধুকের চাবি খুঁজিতে লাগিল। চাবির তাড়া বাহির করিয়া তাহা হইতে একটী চাবি বাছিয়া লইয়া এবং বিনা ক্লেশে সিন্ধুক খুলিয়া ফেলিল। তাহার পর বেশ নিশ্চিন্ত ভাবে তাড়া তাড়া নোটে পকেট ভরিতে লাগিল। ঠিক সেই সময় রমেশ ও আমি পিছন হইতে তাহাকে আক্রমণ করিলাম। লোকটা কোন শব্দ করিতে না করিতেই রমেশ দৃঢ় হস্তে তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল; সে আর কোন শব্দ করিতে পারিল না। প্রথমে সে একবার ক্ষীণ প্রতিবাদ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু প্রথম উদ্যমেই আমাদের সম্মিলিত শক্তির নিকট পরাজয় স্বীকার করিল। আমরাও তৎক্ষণাৎ ক্ষিপ্র হস্তে তাহার হাত

দুইখানি দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া ফেলিলাম। চোর বাঁধা হইলে, রমেশ তাহার পকেট ল্যাম্পটা তুলিয়া লইয়া চোরের মুখের উপর ধরিল।

গভীর বিস্ময়ে আমাদিগের হস্ত হইতে লণ্ঠনটী ভূমিতে পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল। সেই পকেট ল্যাম্পের ক্ষীণ আলোকে দেখিলাম, আমরা যাহাকে চোর বলিয়া ধরিয়াছি, সে হরেন্দ্র !!

* * * *

হরেন্দ্রকে সেই স্থানে বন্দী করিয়া রাখিয়া আমরা ভোজন কক্ষের দিকে অগ্রসর হইলাম।

আমরা ঠিক সময়েই সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলাম, হরেন্দ্রের সঙ্গী তাহার বিলম্ব দেখিয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। সে ঘরটী তখন সম্পূর্ণ অন্ধকার। যোগীন আসিয়া আবার আমাদের সহিত মিলিত হইল। ঘরের দ্বার উন্মুক্ত ছিল। সে-ই সর্ব্বাগ্রে সেই ঘরে প্রবেশ করিল, আমরা তাহার অনুসরণ করিলাম।

নিম্ন স্বরে চাপাগলায় লোকটা জিজ্ঞাসা করিল,—কত টাকা আনলে? সঙ্গে সঙ্গে একটা আধোজ্জ্বল পকেট লণ্ঠনের আলো আসিয়া যোগীনের মুখের উপর পড়িল।

চোখের পলক ফেলিতে না ফেলিতে যোগীন লোকটাকে আক্রমণ করিল; সঙ্গে সঙ্গে একটা পিস্তলের শব্দ হইল এবং একটা গুলি আমার কাণের পাশ দিয়া গিয়া দ্বারে বিদ্ধ হইল।

চপলার চকিত বিকাশের ন্যায় চোরটা আলো নিভাইয়া দিল;—আবার ঘরটা অন্ধকার হইয়া গেল। শব্দ শুনিয়া বুঝিলাম, উভয়েই উভয়কে আক্রমণ করিয়াছে এবং একে অন্যের কবল হইতে মুক্তি-লাভার্থ প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে।

যোগীন চোরটাকে অনেক বশে আনিয়া ফেলিয়াছিল, কিন্তু অনুমানে যতদূর বুঝিলাম, তাহাতে বুঝিতে পারিলাম যে, তাহার দক্ষিণ হস্তে একটা পিস্তল আছে। এটা আমার বড় নিরাপদ বলিয়া মনে হইল না।

প্রাণপণ চীৎকারে আমি বলিয়া উঠিলাম,—"আলো আলো! ওগো একটা আলো কেউ নিয়ে এস!" সঙ্গে সঙ্গে যোগীনের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলাম। ইতিমধ্যে রমেশ একটা দেশলাই জ্বালিল। আমি ক্ষিপ্রহস্তে বাতিদান হইতে একটা বাতি খুলিয়া লইয়া জ্বালিয়া ফেলিলাম।

তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, যোগীন লোকটার বুকের উপর চাপিয়া বসিয়াছে আর সে প্রাণপণে দক্ষিণ হস্ত মুক্ত করিয়া লইয়া তাহাকে গুলি করিবার উপক্রম করিতেছে! তখনকার অবস্থা দেখিলে মনে হয়, লোকটা সুবিধা পাইলে যোগীনকে খুন করিতেও ইতস্ততঃ করিবে না। রমেশ অতি সন্তর্পণে সেই ভীষণ অস্ত্র চোরের হস্তচ্যুত করিতে অগ্রসর হইল।—রুদ্ধশ্বাসে আমি অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

সে দৃশ্য অতি ভয়াবহ। আমার হস্তস্থিত বাতির আলোক সুচিক্কণ ওক কাষ্ঠ নির্ম্মিত দ্রব্যাদির উপর পড়িয়া শতখণ্ডে রশ্মিমালা বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতেছিল, আর সেই রশ্মি-উজ্জ্বল গৃহের মেঝ্যে দুই ব্যক্তি তখনও প্রাণপণ শক্তিতে পরস্পর পরাজিত করিতে প্রয়াস পাইতেছে!

অতি সন্তর্পণে রমেশ তাহার সমীপবর্ত্তী হইয়া ক্ষিপ্রহস্তে তাহার দক্ষিণ কব্জি চাপিয়া ধরিল। লোকটা একবার শেষ চেষ্টা করিল—ভীমনাদে একটা গুলি গিয়া ঘরের কার্ণিশ স্পর্শ করিল। সঙ্গে সঙ্গে রমেশ পিস্তলটী কাড়িয়া লইল। এই শব্দে বাটীর অন্যান্য সকলে জাগিয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই মিঃ সান্ন্যাল শ্লথ বস্ত্রে পিস্তল হস্তে সেই কক্ষে আসিয়া প্রবেশ করিল।

তখনও যোগীন প্রাণপণ শক্তিতে চোরটাকে ধরিয়াছিল। আমরা সকলে সম্মিলিত চেষ্টায় তাহাকেও হরেনের মত বাঁধিয়া ফেলিলাম।

*　　　*　　　*　　　*

শেষ কথা।

"রাঙা বরণ সোণার উষা" যখন পূর্ব্বগগনে অলস চরণে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন আমরা বহু আয়াসধৃত চোর দুইটীকে লইয়া হল ঘরে প্রবেশ করিলাম।

তৎক্ষণাৎ স্থানীয় দারোগা সাহেবকে সংবাদ প্রেরণ করিলাম। অনতিবিলম্বেই তিনি দুইজন অনুচরের সহিত ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইলেন। আমরা তখন অপহৃত দ্রব্যগুলি দেখিতে গেলাম।

ভোজন কক্ষের রৌপ্য রেকাবগুলি যথাসম্ভব ক্ষুদ্র পুটলী বদ্ধ করিয়া হাতের নিকট রাখিয়াছিল। শুধু রৌপ্যপাত্র নহে, পরন্তু সকল দামী জিনিষগুলিই তাহার মধ্যে স্থান পাইয়াছিল—একটীও পরিত্যক্ত হয় নাই!

*　　　*　　　*　　　*

তাহার পর কি হইল না বলিলেও সকলে বুঝিতে পারিবেন যে, হরেন্দ্র ও তাহার সঙ্গীর দুই বৎসর কারাবাস হইয়াছিল।

এক্ষণে পূর্ব্ব রাত্রের হরেন্দ্রের ভয়ের কথা বলি। অন্ধকারে সেই ভগ্ন বাড়ীতে প্রবেশ করিবার অঙ্গীকার করিবার সময় তাহার মোটেই ভয় হয় নাই ; কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া তাহার মনে অত্যন্ত ভয়ের সঞ্চার হয়। একে অন্ধকার, তাহার উপর ভূতের ভয়। বেচারা তাড়াতাড়ি খোঁটা পুতিতে গিয়া আপনার জামার এক অংশও তাহার সহিত বিদ্ধ করিয়া ফেলে। কাজেই বাহির হইবার সময় তাহার জামায় টান পড়ে। সে মনে করিল, ভূতে তাহার জামা টানিয়া ধরিয়াছে, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সে করুণ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে।

* * * *

আদালতে প্রকাশ হইল, হরেন্দ্রের সহিত তাহার সঙ্গীর প্রথম সাক্ষাৎ হয় কলিকাতায়। তখন সে তাহার চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিত না। ক্রমে তাহাদিগের আলাপ ঘনীভূত হইয়া বন্ধুত্বে পরিণত হয়। দার্জ্জিলিং আসিয়া হরেন্দ্র তাহার বন্ধুকেও তথায় উপস্থিত দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া পড়ে। সেই সময় তাহারই প্ররোচনায় হরেন্দ্র তাহাকে চুরি করিতে সাহায্য করিবে বলিয়া স্বীকার করে এবং আমি সেদিন তাহাকে সেই ভিক্ষুকরূপী চোরের সহিত আলাপ করিতে দেখি। সেইদিনই সে তাহার শয়ন কক্ষও চুরি করিবার সময় বলিয়া দেয় এবং একটী বাঁশীও দেয়। তাহার সে কার্য্য আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম, কিন্তু কোন সন্দেহ করিতে পারি নাই। মনে করিয়াছিলাম, সে বুঝি ভিক্ষুকটাকে অর্থসাহায্য করিল! তাহার পর চুরির রাত্রে দৈবক্রমে আমার শয়ন কক্ষ হরেন্দ্রের কক্ষে নির্দ্দিষ্ট হয়, আর হরেন্দ্রকে স্থানান্তরে শয়ন করিতে দেওয়া হয়। কাজটা এমনি অসময়ে হয় যে, সে তাহার বন্ধুকে সাবধান করিবার সময় পায় নাই। তাহাতেই এই অনর্থপাত হয়!

* * * *

চোর ধরিবার সময় আমরা সকলেই পরিশ্রম করিলেও যোগীন্দ্রের বীরত্বই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয়। পরে ন্যায়বান্ মিঃ সান্ন্যাল তাহাকে উপযুক্ত পুরস্কার দিয়াছিলেন। কয়েকমাস পরেই সুন্দরী ষোড়শী ইলাকে সে পত্নী রূপে লাভ করে।

শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ফলকথা।

পঞ্জিকা-সংস্কার সম্বন্ধে গত বৎসরের পত্রিকায় আমরা অনেক কথাই পাঠক পাঠিকাগণকে অবগত করাইয়াছি। ফলকথা,—পঞ্জিকাগণনায় সকল অঙ্কই রবিস্ফুটের উপর নির্ভর করে, ইহা নিশ্চিত। সুতরাং রবিস্ফুট স্থির করিবার প্রণালী সম্বন্ধে এস্থলে কিছু বলা কর্ত্তব্য। সূর্য্যসিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্ত-শিরোমণি, গ্রহলাঘব, সিদ্ধান্তরহস্য, মকরন্দ প্রভৃতি গ্রন্থানুসারে রবির স্ফুট নির্দ্ধারণ করিলে পণ্ডিতগণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, প্রত্যেক গ্রন্থেরই এক একটী নূতন ফল পাওয়া যাইবে। কিন্তু সিদ্ধান্তশাস্ত্রই বলিতেছেন যে, রবিস্ফুট ইত্যাদি সম্বন্ধে গণিতফল ও দৃষ্টফলের ঐক্য হওয়া আবশ্যক।

তত্তদ্‌গতিবশান্নিত্যং তথাদৃক্‌তুল্যতাং গ্রহাঃ।
প্রয়ান্তি তৎপ্রবক্ষ্যামি স্ফুটীকরণমাদরাৎ॥

গতিবশাৎ একস্মিন্ দিনে শীঘ্রাপরদিনেঽতিশীঘ্রেত্যাদিনা যস্মিন্ দিনে যা গতি স্তৎ-সম্বন্ধানুরোধাদিত্যর্থঃ। দৃক্‌তুল্যতাং বেধিতগ্রহসমতাং। প্রবক্ষ্যামি সূক্ষ্মত্বেন কথয়ামি।

গ্রহগণের নিত্য গতি আছে। ঐ গতি কখনও শীঘ্র কখনও বা অতিশীঘ্র হয়, সুতরাং সেই গ্রহগণের স্থিতিনিরূপণার্থ সূক্ষ্মভাবে স্ফুটপ্রকরণ বলিব। এই স্ফুটীকরণদ্বারা যাহা স্থির হইবে, দর্শন করিলেও তাহাই জানা যাইবে। যদি দর্শন ও গণিত ফলের ঐক্যই শাস্ত্র সম্মত হইল, তবে বৃথা অভিমান পরিত্যাগ করিয়া এই ফলের ঐক্য যাহাতে হয়, তাহার চেষ্টায়ই সকলের মনযোগী হওয়া উচিত নয় কি? দর্শন সম্বন্ধে একটী কথা এই যে, অংশ কলাদি কেবল যন্ত্রসাহায্যেই দেখা যাইতে পারে। অতএব আমাদের শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে যন্ত্রনির্ম্মাণ করিয়া, শাস্ত্রের ও দেশের গৌরব বৃদ্ধি করা অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা নিশ্চিত। শাস্ত্রানুসারে যন্ত্রনির্ম্মাণ অধিক ব্যয়সাপেক্ষও নহে, কিন্তু নির্ম্মাণকুশল ব্যক্তির বিরলতাই ইহার প্রধান অন্তরায়। যাহা হউক, যদি যন্ত্রের অভাবই হইয়া থাকে, তাহা হইলে পাশ্চাত্য যন্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া অংশ কলাদি নির্দ্ধারণ করায় বিশেষ কোন দোষ আছে কি? অংশ কলাদির সংখ্যা নির্দ্ধারণই যন্ত্রের উদ্দেশ্য, সুতরাং সেই উদ্দেশ্যসাধনপর যন্ত্র হইলেই আমাদের উদ্দেশ্য সাধন হইবে। বংশনির্ম্মিত যন্ত্রের দ্বারা

কার্য্য সাধন হইলে পাশ্চাত্য যন্ত্রাদির সাহায্য গ্রহণ নিষ্প্রয়োজন; কিন্তু যদি বংশযন্ত্রের অভাব বাস্তবপক্ষেই ঘটিয়া থাকে, তাই বলিয়াই কি শাস্ত্রকে জলাঞ্জলি দেওয়া কর্ত্তব্য! বিশেষতঃ পাশ্চাত্য যন্ত্রাদি শাস্ত্রপ্রমাণের অনুরূপও বটে। গোলযন্ত্রের সহিত পাশ্চাত্য গ্লোব বা আরমিলারী স্ফীয়ার (Armillary Sphere) মিলাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, উভয়ের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই এবং উক্ত পাশ্চাত্যযন্ত্র অনেকাংশে আমাদের শাস্ত্রসম্মত। কপালযন্ত্র, নরযন্ত্র, ফলকযন্ত্র, শঙ্কু বা ঘটী নির্ম্মাণ প্রভৃতি অতি সহজ ব্যাপার; সুতরাং সেগুলি নির্ম্মাণ করিয়া লওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে বস্তুতঃপক্ষে জ্যোতিঃশাস্ত্র গণনা অসম্ভব। যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত সময় নিরূপণ হইতেই পারে না। দিবা-দণ্ড জানিতে হইলে পচ্ছায়া বা শঙ্কুছায়া-পরিমাণ স্থির করিতে হইবেক। রাত্রি-দণ্ড জানিতে হইলে জ্যোতির্ব্বিদাভরণ মতে মস্তকোপরিস্থিত নক্ষত্র দর্শন করিতে হইবে! কিন্তু নক্ষত্রটী মস্তকোপরিস্থিত রেখার প্রায় ২০ অংশ পূর্ব্বে বা পশ্চিমে থাকিলেও মাত্র চর্ম্মচক্ষুদ্বারা দর্শন করিলে সাধারণের প্রতীতি হইবে যে, উক্ত নক্ষত্র উক্ত রেখায় স্থিত হইয়াছে। এতাদৃশ ভ্রম নিরাকরণের জন্য একটী মাত্র উপায় অবলম্বিত হইতে পারে; যথা—নলিকাযন্ত্র সাহায্যে দর্শন। জ্যোতির্ব্বিদাভরণমতে রাত্রিলগ্ন স্থির করিতে হইলে নক্ষত্রটীকে কোথায় দর্শন করিতে হইবে? উত্তরে গ্রন্থকার বলিয়াছেন;—"গগনমধ্য-বর্ত্তিনি" "মস্তকোপরি সমাগতে" "মধ্যভাজি নভসঃ" ইত্যাদি। সুতরাং উক্ত লগ্ন স্থির করিবার পূর্ব্বেই দিক্‌নির্ণয় ও মধ্যরেখা নির্ণয় এবং মধ্যরেখাস্থ কোন্ স্থান আমাদের মস্তকের উপরিস্থিত, এই সকল বিষয় জানা আবশ্যক!

শিলাতলেঽম্বসংশুদ্ধে বজ্রলেপেঽপি বা সমে।
তত্র শঙ্কঙ্গুলৈরিষ্টৈঃ সমং মণ্ডলমালিখেৎ॥
তন্মধ্যে স্থাপয়েচ্ছঙ্কুং কল্পনাদ্বাদশাঙ্গুলং।
তচ্ছায়াগ্রং স্পৃশেদ্‌যত্র বৃত্তে পূর্ব্বাপরার্দ্ধয়োঃ॥
তত্র বিন্দু বিধায়োভৌ বৃত্তে পূর্ব্বাপরাভিধৌ।
তন্মধ্যে তিমিনা রেখা কর্ত্তব্যা দক্ষিণোত্তরা॥
যাম্যোত্তরদিশোর্ম্মধ্যে তিমিনা পূর্ব্বপশ্চিমা।
দিঙমধ্যমৎস্যৈঃ সংসাধ্যা বিদিশস্তদ্বদেবহি॥

যাঁহারা সূর্য্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, এই কয়টী শ্লোকের উপর সমস্ত গ্রন্থ নির্ভর করিতেছে। দিক্, দেশ ও কালজ্ঞান ব্যতীত কোনও জ্ঞান সম্ভব হইতে পারে না। দিক্, দেশ ও কালজ্ঞান সর্ব্বকালেই যন্ত্রসাপেক্ষ। যথা আপস্তম্বীয় শুল্বসূত্র—বিহারযোগান্ ব্যাখ্যাস্যামঃ। এই সূত্রের করবিন্দস্বামিকৃত ভাষ্য যথা—"উচ্যতে সত্যং। তথাপি কালবদ্দেশস্যাঙ্গত্বাদুক্তপ্রমাণস্য মাত্রয়াপি ন্যূনাধিকভাবে সতি অঙ্গবৈগুণ্যং স্যাদিতি মন্যমান আচার্য্যো রজ্জ্বাদীনামসন্দিগ্ধমীষৎকরমুপায়ভাবং স্বয়মেব প্রতিপাদিত মিদং ব্রতে। অতোন্যূনাধিকভাবে যত্নেন পরিহরণীয়ে সতি প্রমাদাদসদামর্থ্যাদ্ বা যদি ত্বেব উপজায়তে, তত্রাবশ্যং প্রায়শ্চিত্তং কর্ত্তব্যমিত্যেবমর্থামিদমুচ্যতে—বিহারযোগান্ ব্যাখ্যাস্যামঃ। * *

ভগবান্ কাত্যায়ন বলিয়াছেন,—"সমে শঙ্কুং নিধায় শঙ্কু-সম্মিতয়া রজ্জ্বা মণ্ডলমালিখ্য যত্র লেখয়োঃ শঙ্ক্বগ্রচ্ছায়া নিপততি সা প্রাচী" ইত্যাদি।

ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, দিক্, ইত্যাদি স্পষ্ট নির্ণয় না হইলে প্রায়শ্চিত্ত করা নিশ্চয়ই আবশ্যক এবং স্থূল জ্ঞানের দ্বারা যজ্ঞাদি ক্রিয়া হওয়াও সম্ভবপর নহে। দিক্, দেশ ও কালাদির জ্ঞান হইলে রবির স্ফুট নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে রবির স্ফুট নির্দ্ধারণের প্রণালী কথিত হইতেছে। যথা,—

প্রথমতঃ উজ্জয়িনী নামক নগরীর রবিমধ্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। (১ অঃ ৬৩ শ্লোঃ)। পরে দেশান্তর-সংস্কার। তাহা হইলে রবির তাৎকালিক মধ্য জানা যাইবে। পরে রবিমন্দসংস্কার (১ অঃ ৪১ শ্লোঃ)। ইহা দ্বারা রবিমন্দকেন্দ্র জানা যাইবে। (২।২৯।৩০।) তৎপর জ্যাসংস্কার করিয়া ভুজজ্যা নির্দ্ধারণ করিবে, এবং ২।৩০।৩৯।৪৫ অনুসারে ভুজজ্যাফল ও মান্দ্যফল প্রাপ্ত হইয়া রবিস্ফুট নির্দ্ধারণ করিবে। স্ফুটনির্দ্ধারণ করিলে দৃশ্য ফলের সহিত ঐক্য হইবে। এই বিষয় বিশ্বনাথ দৈবজ্ঞকৃত সূর্য্যসিদ্ধান্তোদাহরণ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

এষা স্ফুটগতিঃ প্রোক্তা সূর্য্যাদীনাং খচারিণাম্ ॥

হে ময়! তোমাকে সূর্য্যাদি সপ্তগ্রহের স্ফুটগতির বিষয় এই বলিলাম।

উপরোক্ত প্রণালী অনুধাবন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রথমতঃই রবিমধ্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, এবং রবিস্ফুট দৃশ্য ফলের সহিত ঐক্য হইবে। দৃগ্‌গণিতের ঐক্য না হইলেই বুঝিতে হইবে যে, গণিতফল

ঠিক নহে। রবিমধ্য নির্দ্ধারণ করিতে হইলে ১ অধ্যায় ৫৩ শ্লোকোক্ত প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে হইবে ; যথা,—

যথা স্বভগণাভ্যস্তো দিনরাশিঃ কুবাসরৈঃ।
বিভাজিতো মধ্যগত্যা ভগণাদির্গ্রহোভবেৎ॥

দিনরাশিকে ভগণদ্বারা গুণ করিয়া সাবন দিন দ্বারা ভাগ করিলে গ্রহগণের ভগণাদি মধ্য হইবে। সুতরাং প্রথমেই দিনরাশি জানা আবশ্যক এবং দিনরাশি জানিতে হইলে কোন দিনের দিনরাশি আবশ্যক, সেই দিন স্থির করিতে হইবে। কাযে কাযেই শকাব্দার প্রথম দিন জানিতে হইবেক, অর্থাৎ মেষসংক্রান্তির মুহূর্ত্ত-জ্ঞান আবশ্যক।

সৌরেণ দ্যুনিশোর্ম্মানং ষড়শীতিমুখানি চ।
অয়নং বিষুবচ্চৈব সংক্রান্তেঃ পুণ্যকালতা॥ (১৪ অঃ ৩ শ্লোঃ)

অতএব রবিমধ্য গণনা করিতে হইলে কালজ্ঞান একান্ত প্রয়োজনীয়। কালনির্দ্ধারণ করিতে হইলেই ত্রিপ্রশ্নাধ্যায় এবং যন্ত্রাধ্যায়োল্লিখিত যন্ত্রাদির সাহায্য আবশ্যক। এক্ষণে জ্যোতিঃশাস্ত্রবিৎ মহানুভব সুধীবৃন্দ বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, যন্ত্র-সাহায্য ব্যতিরেকে জ্যোতিঃশাস্ত্রসম্বন্ধীয় কোনও গণনা সম্ভবপর কি না ?

উল্লিখিত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বহুল যুক্তি ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্রহাদির স্ফুট নির্দ্ধারণ করিবার উপায় সিদ্ধান্তশিরোমণি নামক গ্রন্থে অবগত হওয়া যায় ;—

পৈত্রর্ক্ষপুষ্যান্তিমবারুণানা-
মৃক্ষদ্বয়ং নেমিগতং যথা স্যাৎ।
দূরেঽন্তরেল্পেযু ভখেচরৌ বা
তথাত্র যন্ত্রং সুধিয়া প্রধার্য্যম্॥
নেমিস্থদৃষ্ট্যাঙ্কগতং প্রপশ্যেৎ
খেটঞ্চ ধিষ্ণ্যস্থ চ যোগতারাং।
নেম্যঙ্কয়ো রক্ষযুজোস্ত মধ্যে
যেঽংশাঃস্থিতা ভধ্রুবকো যুতস্তৈঃ॥

যন্ত্রাধ্যায়ের প্রথমেই ভাস্করাচার্য্য বলিয়াছেন ;—

দিনগতকালাবয়বা জ্ঞাতুমশক্যা যতো বিনা যন্ত্রৈঃ।
বক্ষ্যে যন্ত্রাণি ততঃ স্ফুটানি সংক্ষেপতঃ কতিচিৎ॥

উপরিলিখিত যুক্তি ও বচনাদি দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, জ্যোতিঃশাস্ত্রে উল্লিখিত তিথি নক্ষত্র যোগ করণাদি সকল বিষয়ই যন্ত্রপ্রমাণসাপেক্ষ। কিন্তু সম্প্রতি বিবেচ্য বিষয় এই যে, কোনও বিষয়ে এই সিদ্ধান্তের বিরোধী যুক্তি-বচনাদি জ্যোতিঃশাস্ত্রের কোনও অংশে পাওয়া যায় কি না? প্রথমতঃ তিথিসম্বন্ধে দেখা যাইতেছে, তিথিগণনা সূর্য্যসিদ্ধান্তের স্ফুটগতি অধ্যায় বা স্বপ্নাধিকারে পাওয়া যায়।

অর্কোনচন্দ্রলিপ্তাভ্যস্তিথয়ো ভোগভাজিতাঃ।
গতা গম্যাশ্চ ষষ্টিঘ্না নাড্যোভুক্ত্যন্তরোদ্ধৃতাঃ॥

চন্দ্রস্ফুট হইতে রবিস্ফুট হীন করিয়া অবশিষ্টাংশকে ভোগ (৭২০) দ্বারা বিভক্ত করিলে ভাগফল যাহা লব্ধ হইবে, তাহাই তিথি। গত ও গম্যাংশকে ষষ্টি দ্বারা গুণ করিয়া যে ফল লব্ধ হইবে, তাহাকে রবি ও চন্দ্রের দৈনিক গতির প্রভেদাংশ দ্বারা বিভাগ করিলে তাহাতে যে ফল লব্ধ হইবে, তাহাই তিথি মান। এই তিথি ও মান পঞ্জিকায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং এতদ্দ্বারাই ধর্ম্ম-কর্ম্মের সময় নিরূপিত হয়।

ভভোগেঽষ্টশতীলিপ্তাঃ খাশ্বিশৈলাস্তথা তিথেঃ॥ ইত্যাদি।

পুনশ্চ উক্ত গ্রন্থে মানাধিকারে উক্ত হইয়াছে—

অর্কাদ্বিনিঃসৃতঃ প্রাচীং যদ্‌যাত্যহরহঃ শশী।
তচ্চান্দ্রমানমংশৈস্তু জ্ঞেয়া দ্বাদশভিস্তিথিঃ॥

উপরোক্ত দুইটী বিবরণ সর্ব্বাংশে এক, বর্ণনাভঙ্গীর প্রভেদ মাত্র। সূর্য্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থে এই একমাত্র তিথির বর্ণনা আছে। বস্তুতঃ পক্ষে আর্য্যগণের প্রাচীন জ্যোতিঃশাস্ত্রে এই একমাত্র ভিন্ন দ্বিতীয় কোনও তিথির বর্ণনা পাওয়া যায় না। কিন্তু এই সিদ্ধান্তসম্বন্ধে আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদগণের মধ্যে মতদ্বৈধ দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ, কেহ কেহ বলেন যে, তিথি দুই প্রকার; স্থূল ও সূক্ষ্ম। তিথির এইরূপ বিভাগ কোনও প্রকারে হওয়া সম্ভবপর কি না, কিম্বা এই দুইটীর লক্ষণই বা কি, তাহা আমরা অদ্যাপি অবগত নহি; কিন্তু আমরা যথাজ্ঞান বলিতে পারি যে, এতাদৃশ বিভাগ শাস্ত্র-সম্মত নহে। সূর্য্যসিদ্ধান্ত নামক গ্রন্থের একটী শ্লোকের উপর বিশেষ নির্ভর করিয়াই এই প্রকার বিভাগ কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু শ্লোকটীর অর্থবিচার না করিয়া আমরা আপাততঃ নূতন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি না। শ্লোকটী গ্রহণাধিকারে লিখিত হইয়াছে; যথা—

অথ মধ্য-গ্রহণ-স্পর্শ মোক্ষকালানাহ।
স্ফুটতিথ্যবসানেতু মধ্যগ্রহণমাদিশেৎ।
স্থিত্যর্দ্ধনাড়িকাহীনে গ্রাসো মোক্ষস্ত সংযুতে॥

এই শ্লোকটী মধ্যগ্রহণ, স্পর্শ ও মোক্ষকালের নিরূপক। স্ফুটতিথির অন্তকাল অথবা পূর্ণিমার শেষ মুহূর্ত্তকেই মধ্য গ্রহণের সময় বলিয়া স্থির করা হইতেছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীকালীকণ্ঠ কাব্যতীর্থ।

বক্ষ-মাঝেও নাই।

তখন গগনযুড়ে তুমি ছিলে,
তোমার সনে মাতি,
কেমন হাসিভরা নেশার মত
কাট্‌তো দিবা-রাতি।
কোথা সাগরপারে পাহাড় তলে
থাক্‌লে কভু একা,—
যেন তাড়িত হয়ে আমার সাথে
কর্‌তে গিয়ে দেখা।
তোমার কথায়, তোমার ভাষায়,
তোমার স্বপন লয়ে—
নদীর বানের স্রোতের মতন
জীবন গেছে বয়ে।
অমন বিশ্বব্যাপী বিপুল দেহ
কেমন করে ভাই,—
এমন ক্ষুদ্র করি পালিয়ে আছ;
বক্ষ-মাঝেও নাই।

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।

স্বপ্নের কথা।

এমন মানব নাই, যিনি জীবনে কখন স্বপ্ন দেখেন নাই। স্বপ্নে মানুষ রাজা হয়, স্বপ্নে মানুষ পথের ভিখারী হয়, স্বপ্নে ধার্ম্মিক সাজিয়া স্বর্গে বিচরণ করে, স্বপ্নে নরকের ভীষণ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া হাহাকার করিতে থাকে,—স্বপ্নে প্রাণের মানুষ পাইয়া প্রেমের সোহাগে মধুযামিনী অতিবাহিত করে। স্বপ্নে চিরপ্রণয়ীকে হারাইয়া কাঁদিয়া উপাধান ভিজাইয়া দেয়। স্বপ্নে না হয়, স্বপ্নে না ঘটে, এমন কার্য্য নাই। নিদ্রাভঙ্গ হইলে, জাগ্রত হইলে স্বপ্নের ঘোর কাটিয়া যায়,—কিন্তু মনের উদ্বেগ দূর হয় না। স্বপ্ন-দৃষ্ট সুখ বা শোক প্রাণে যেন জড়াইয়া থাকে। মানবের নিত্য-দৃষ্ট স্বপ্ন—মানবের জীবনসহচর স্বপ্ন—মানবের হাসি কান্নার আর এক অবস্থা স্বপ্ন,—সে স্বপ্নটা কি, আমাদের জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। অন্ততঃ জানিবার জন্য প্রত্যেকের প্রাণ ব্যগ্র হইয়া থাকে।

অনেকে বলেন,—স্বপ্ন অমূলক চিন্তা মাত্র। কিন্তু, এ কথায় কেহ সন্তোষ লাভ করিতে পারেন বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। স্বপ্ন অমূলক চিন্তা হইলে, স্বপ্নদৃষ্ট শোকে চক্ষুর জল পড়ে কেন? চিন্তা যদি অমূলক হয়, তবে শারীরিক ক্রিয়া তাহাতে সম্পাদিত হইবে কেন?

আরও ভাল করিয়া কথাটা বুঝিতে হইলে আমাদিগকে ভাবিতে হইবে, স্বপ্ন যেন অমূলক চিন্তাই হইল, কিন্তু যাহা অমূলক—যাহার কোন সত্তা নাই, তাহার দ্বারা স্থূল শরীরের ক্রিয়া সম্পাদিত হয় কেন? 'আকাশ-কুসুম' 'শশবিষাণ' প্রভৃতি অমূলক কথা আছে,—কিন্তু তাহার দ্বারা কখনও কোন কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে কি? স্বপ্ন অমূলক, স্বপ্ন মিথ্যা,—একথা কখনই বলিতে পারা যায় না। স্বপ্নের কথা অনেক সময়ে সত্য হয়, সে কথা পরিত্যাগ করিলেও স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে মানুষ হাসে কাঁদে—অশ্রুজলে উপাধান ভাসায়, এমন কি মল মূত্র প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

তবে বলিতে পারা যায়, মনের বিকৃতি বশতই ঐরূপ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু তাহা হইলেই স্বপ্নটাকে একেবারে শূন্যে উড়াইয়া দেওয়া চলিবে না। যেহেতু যে বিষয় বা অবস্থা কর্তৃক মনের বিকৃতিভাবের উৎপত্তি হয়, তাহা যে নিতান্ত নিষ্ফল নিশ্বাসের নিদারুণ অভিশম্পাত নহে,—তাহাকে যে এক অবস্থা বা বিষয় বলিতেই হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এখন যদি কেহ বলেন, যাহার মূল নাই, যাহা নিদ্রিতের অশান্তিজনক এক চিন্তা প্রবাহ মাত্র, তাহা আবার বিষয় কি ?

সে কথা হইতে পারে না,—সে প্রকার বলিলে, জাগ্রদবস্থার কোন কার্য্যেরও মূল নাই—জন্মযোড়া ভাগ্য-ভঙ্গ লইয়া আমরা যে দিন-রাত্রি ছুটাছুটি করিতেছি, আহার বিহার নিদ্রা ঝড় বৃষ্টি অন্ধকার জ্যোৎস্না নদ নদী পর্ব্বত প্রান্তর বৃক্ষ লতা ফল পুষ্প পশু পক্ষী জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি যাহা কিছু দেখিতেছি, শুনিতেছি,—যাহাদিগের সঙ্গে সতত মিশ্রিত হইতেছি, বাস্তবের ইন্দ্রধনু লইয়া যাহাদিগকে গগনের গায়ে লিখিয়া বিশ্লেষণে ব্যস্ত হইতেছি—তাহারাও ত কিছু নহে! তাহাও যেমন একটা অবস্থা মাত্র—স্বপ্নও তদ্রূপ একটা অবস্থা মাত্র।

যে দিন শৈশবের প্রথম ক্রন্দন সম্বল মাত্র লইয়া জননীর স্নেহ-পুষ্পিত ক্রোড়মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলাম,—সে দিবসকে কি বলিবে? তুমি যাহাই বল, আমি বলিব তাও স্বপ্নের মত একটা 'হাওয়ার চাদর'। তাহা ছিল,—না থাকিলে এই ভূর্লোকের সেই বায়ু-প্রবাহ আমাকে তেমন আকুল করিবে কেন? আমাকে তেমন করিয়া কাঁদাইয়া ছাড়িবে কেন? আবার স্বপ্নকে যদি অমূলক বল,—তবে সে অবস্থাকেও অমূলক বলিতে পার—সে একটা ক্ষণিক আবর্ত্তন মাত্র। সেটা যদি সত্য হইত—সেটা যদি জগতের জন্মলগ্ন হইত, তবে সেই মুহূর্ত্তে এখানকার যত শিশু জন্মিয়া পড়িত। সে মুহূর্ত্ত আমার জন্মলগ্ন, আর এক বৃদ্ধের মৃত্যুর কাল-সন্ধ্যা এবং আর এক যুবকের বিবাহের বাসর-সজ্জা। তবে তাহাকে কি বলিবে,—বলিতে হইবে, তাহার বা সে অবস্থার কোন সত্তা নাই—তাহা অমূলক কল্পনা মাত্র।

তারপরে শৈশব-সঙ্গে কিশোর হইলাম। জগৎ অপার্থিব সৌন্দর্য্যরাশি লইয়া রসে গন্ধে স্পর্শে ফুটিয়া উঠিল। চাঁদের জ্যোৎস্নায়, নদীর কলতানে, কোকিলের কুহু-গানে, কুসুমের সুবাসে, মলয়ের মধুশ্বাসে আমি মুগ্ধ হইলাম। কিন্তু ঐ সংসার-বিরাগী বৃদ্ধ তখন সে সকলে আর মুগ্ধ নহেন—তিনি আমার অবস্থা দেখিয়া, আমার অনুভূতির অসারতা দর্শন করিয়া মৃদু মৃদু হাসিবেন, আর বলিবেন—ও সকল কিছুই নহে, অমূলক; উহা নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। জ্যোৎস্নার কোলে 'মেঘমাশ্লিষ্ট' অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার আছে, নদীর কলতান-কোলে হাসির কুম্ভীর লুক্কায়িত আছে,

কোকিলের কুহু-তানে বর্ষার বিরতি আছে; কুসুম-বাসের পূতিগন্ধ পরিণতি আছে, মলয়ের মধুশ্বাসে জগতের ভীতিদায়ক ঝটিকা আছে। আমি যাহা সত্য ভাবিতেছি, আর একজন তাহাকে মিথ্যা ভাবিতেছে;—আমি যাহাতে মুগ্ধ হইতেছি, আর একজন তাহাকে নিত্য পরিবর্ত্তনময়ী প্রকৃতির স্বপ্নলীলা ভাবিয়া উপেক্ষার মৃদু হাসিতে উড়াইতে চেষ্টা করিতেছেন। অতএব ইহাও স্বপ্নের মত অসত্য—স্বপ্নের মত একটা কাল্পনিক অবস্থা। তবে এসকল যদি সত্য বলিয়া ইহাদের তত্ত্ব আবিষ্কারে চেষ্টা করিতে ইচ্ছা হয়, তবে স্বপ্ন-ব্যাপারটায়ও উড়াইয়া দিবে কেন?

আরও দেখ। যৌবনের সুবাস-পরিচ্ছদে আবৃত হইয়া যখন জ্ঞানের প্রথম বিকাশ লইয়া জগতের সত্য আবিষ্কারের জন্য দণ্ডায়মান হইলাম, যখন জ্ঞানের নব অরুণ-উন্মেষে মনে হইল, জগতে আমি একা। একা আসিয়াছি, একা যাইব। জন্ম রথে মর্ত্ত্যে নামিয়াছি, মৃত্যু পথে উর্দ্ধে যাইতে হইবে—জগতে আমি একা!

অমনি সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমর-গুঞ্জন-মধু-শব্দে একজন পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হইয়া বলিল—"তুমি একা নহ, আমি তোমার; তুমি আমার।"

চাহিয়া দেখিলাম—কৈশোর-স্বপন-ভঙ্গে সরমজড়িতা জগতের রূপ রস গন্ধাদিভারে অবনতা এক সুকুমারী তাহার সর্ব্বস্ব লইয়া আমার কণ্ঠ-লগ্ন হইয়াছে। তবে আমি একা নহি—আমার আছে, আমি আর এক জনের আছি। একা ছিলাম, দু'জন হইলাম।

কেবল দু'জন! আমার সেই প্রথম অবস্থা লইয়া কতকগুলি মানুষ আসিয়া আমার সংসারে 'আমিত্বের' ছাপ মারিয়া বসিল। দেহের রক্তের মত, প্রাণের মানুষের মত তাহারা আমার হইয়া বসিল। আমি 'আমার' ভুলিয়া তাহাদিগকে লইয়া ব্যস্ত হইলাম।

যাহাদিগকে 'এত আমার' ভাবিলাম, তাহারা কিন্তু সকলে আমার কাছে রহিল না—অনেকে ফাঁকি দিয়া যে অন্ধকার যবনিকার মধ্য দিয়া আসিয়াছিল, সেই পথেই সেই দেশেই চলিয়া গেল—আমার বলিয়া রাখিতে পারিলাম না। যাহারা রহিল, তাহারা আমারই মত কৈশোর জীবন লাভ করিল। আর সেই রূপ-যৌবন-ফুল্ল যুবতী—যাহাকে জগতের সার সৌন্দর্য্য-দায়িনী বলিয়া দেখিয়াছিলাম, লোকে দেখিল—বার্দ্ধক্যের বাসিভস্মে সর্ব্বাঙ্গ অবলেপিত করিয়া যৌবন জবাব দিয়া চলিয়া গিয়াছে,—আমি কিন্তু

দেখি তা' নয়, সে সোণার অঙ্গে তখনও রূপের প্রভা খেলিয়া ফিরিতেছে। তাহার রূপ দেখিয়া উর্ব্বশীও বুঝি লাজে আর মর্ত্ত্যে আসে না।

এগুলি কি সত্য? ইহাও কি কল্পনার অবাস্তব বিষয় নহে? তবে এ সকলের তথ্য লইয়া যদি আলোচনা আবশ্যক হয়,—স্বপ্ন লইয়া হইবে না কেন? এসকল যদি সত্য হয়, স্বপ্নকেও সত্য বলিতে হইবে।

তারপরে যখন আমার দেহের উপর মহাকালের মরণ-মার্কা আসিয়া পতিত হইল, তখনও আমার পরিবর্ত্তন। যাহা ছিল, তাহা নাই—অতীত অবস্থাকে শত চেষ্টা করিয়াও আর মিলাইতে পারা যাইবে না—যাহা ছিল, তাহা গিয়াছে, নাই। যাহা ছিল, এখন নাই;—তাহাকে কি বলিবে? অমূলক না একটা অবস্থা?

জন্মের পর মৃত্যু হয়, মৃত্যুর পর জন্ম হয়। সে গুলাকেও অমূলক বলিতে পার না। অবস্থার পরিবর্ত্তন। স্বপ্নও সেইরূপ একটা অবস্থা মাত্র। সে অবস্থা কিরূপ—সে অবস্থা কাহার, দেহের না আমার? এবং সেই অবস্থায় যাহা দৃষ্ট হয়,—যাহা জানা যায়, শোনা যায়, তাহাতে সত্যের কোন সংশ্রব আছে কি না, তাহাই আমাদের আলোচ্য।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

বাঁশীরবে যমুনা।

চঞ্চলা শ্যামাঙ্গী বালা ওই লো তটিনী!
মনে কি সে পড়ে তব অতীত কাহিনী?
বাঁশীর মোহন তান তুলিয়া ঝঙ্কার
সিঞ্চিত অমৃত যবে পুলিনে তোমার,
নাচিত শিখীর দল যবে পুচ্ছ মেলে,
গাহিত পঞ্চমে পিক তমালের ডালে,
ফুটিত পুলিন ভরি কুসুম সম্ভার,
বহিত উজান মুখে সলিল তোমার,
কৃষ্ণপ্রেম-গাথা গাহি কুলুকুলু রবে
তুষিতে জগৎ-প্রাণ সদা তুমি যবে?
এখন নিঝুম রাতে পুলিনে তোমার
দাঁড়াইলে পশে কানে ও স্বর কাহার?
বুঝেছি, সে বাঁশীরব ভোল নি যমুনে,
তাই তুমি গুণ তাঁর গাহিছ গোপনে।

শ্রীললিতকুমার সিংহ

কামাখ্যা ও চন্দ্রনাথ ভ্রমণ।

গতকল্য হইতে আহারাদি হয় নাই, সেই জন্যই ষ্টেশনে পৌঁছিয়াই হাত মুখ ধুইয়া যৎসামান্য জলযোগ করিলাম। আজ এতগুলি 'কুণ্ড' স্নান করিতে প্রায় ৩০।৩৫টী ডুব দিয়া (প্রত্যেক স্থানে বাসিকুণ্ডে ৪ বার ও ভিতরে ৪ বার) শরীর বড়ই খারাপ ছিল। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এইখানেই অপেক্ষা করিতে হইল। সন্ধ্যাকালে চট্টগ্রামের গাড়ী আসিলে, আরোহণ পূর্ব্বক, রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় চট্টগ্রাম পৌঁছিয়াছিলাম। ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া, আমাদের পূর্ব্বপরিচিত (আসাম বেঙ্গল রেলপথের ক্যাসিয়ার) শ্রীযুক্ত বাবু ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হইলাম। তাঁহার বাসাটী ষ্টেশনের খুব নিকটেই ছিল বলিয়া বেশী কষ্ট পাইতে হয় নাই।

৪ঠা এপ্রিল শুক্রবার। প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিয়া দেখি যে 'প্রকৃতি দেবী' অভিনব সাজে সাজিয়াছেন। মুসলধারে বৃষ্টি ও ঝটিকাবর্ত্ত আরম্ভ হইয়াছে। চৈত্রমাসের প্রাতঃকালে এরূপ ভীষণ ঝড় বৃষ্টি আমাদের দেশে প্রায় দেখা যায় না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে ১ ঘণ্টা পরেই সমস্ত নিবৃত্তি হইল। কোথাও কাদার চিহ্ন নাই। পার্ব্বত্য প্রদেশমাত্রেই এই-রূপ। প্রাতঃকালে সকলে মনে করিয়াছিলাম যে, আজ আর বাটীর বাহির হইতে পারিব না, কিন্তু সে সব ঝড় বৃষ্টি থামিল; সুতরাং আমরাও স্নানাদি সমাপন করিয়া "চট্টেশ্বরী' দর্শনে যাত্রা করিলাম। ইনি প্রস্তরনির্ম্মিত কালীমূর্ত্তি। সর্ব্বাঙ্গে স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কারে পরিশোভিত। এখানকার পূজাদি যথাবিধি সমাপ্ত হইলে বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, মেয়েরা রন্ধনের যোগাড় আরম্ভ করিলেন, আমি সহর দর্শনে বাহির হইলাম। সহরটী বেশ পরিপাটী নহে। মাঝে মাঝে সমতল ভূমি ও স্থানে স্থানে এক একটী ছোট ছোট পাহাড়। তদুপরি এক একটী "বাংলা" জজ সাহেব, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজপুরুষদিগের বাসস্থানরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সহরের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান; হিন্দু খুব কম। দোকানদারগণ প্রায় সকলেই মুসলমান। এমন কি দুধ বিক্রেতাও মুসলমান। এখানে পানীয় জলের বেশ বন্দোবস্ত দেখিলাম। স্থানে স্থানে এক একটী পাতকুয়ার মত

আছে। পর্ব্বতনিঃসৃত ঝরণা হইতে জল আসিয়া তাহাতে পড়িতেছে। সাধারণ লোকে তাহাই ব্যবহার করেন। রেলকর্ম্মচারীদিগের বাসায় কেবল পাইপ লাগান আছে; তদ্দ্বারা সর্ব্বদাই জল আসে। রেলকর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের কর্ম্মচারীদিগের পানীয় জলের এরূপ সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া সাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এখানে গবর্ণর বাহাদুরের, সুন্দর একটী প্রাসাদ আছে। সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এখানকার কাছারী বাড়ী (General court Building) ও রেলওয়ে আপিস। (General Building A. B. Railway)। ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ, গৌহাটী অপেক্ষা এখানে অধিক আছে। কয়েকটী বড় বড় সাহেব দোকানদারও আছে দেখিলাম। কাছারী বাড়ী হইতে কর্ণফুলি নদী ও বাণিজ্য বন্দর (Jetty) বেশ দেখা যায়।

সাধারণভাবে এই সমস্ত দেখিয়া বাসায় ফিরিলাম ও তৎপরে আহারাদি সম্পন্ন করিয়া, সকলে ষ্টেশনাভিমুখে রওয়ানা হইলাম। ২ টা ৩৫ মিনিটের সময় আমাদের ট্রেণ ছাড়িল এবং রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় লাকসাম জংসনে পৌছিলাম। এখানে চাঁদপুর মেলের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ১২ টার সময় গাড়ী আসিলে তাহাতে উঠিয়া শয়নের ব্যবস্থা করিয়া লইলাম। তৎপর দিবস ৫ই তারিখে বেলা ৭॥০ টার সময় বদরপুর জংসন ষ্টেশনে পৌছিলাম। এখানে আসিয়া হস্তমুখ প্রক্ষালন পূর্ব্বক সকলেই কিছু কিছু জলযোগ করিলাম, E. Standford & Sons এর Refreshment Stall হইতে এক পেয়ালা চা খাইয়া লইলাম।

বদরপুর হইতে যথাকালে গাড়ী ছাড়িল। এইবার এই রেলপথের সুড়ঙ্গ (Sunnels) সম্বন্ধে বলিব। চট্টগ্রাম হইতে গাড়ীতে চাপিয়া লাকসাম জংশনের দিকে আসিতে হইলে, পর্ব্বতসমূহ দক্ষিণ দিকে পড়ে এবং রেলপথ হইতে ২॥০ মাইল ৩ মাইল মধ্যেই পর্ব্বতের সানুদেশে উপস্থিত হওয়া যায়। লাকসাম হইতে বদরপুর পর্য্যন্ত পর্ব্বত দৃষ্টিগোচর হয় না। তৎপরে বদরপুর হইতে হাতিখালি ষ্টেশন পর্য্যন্ত রাস্তার মধ্যে রেলপথটী কোথাও পর্ব্বতের উপরে, কোথাও বা মধ্যে এবং কোথাও বা নিম্নদেশ দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে। এই রাস্তার মধ্যে ঠিক সোজা একমাইল রাস্তা একেবারেই নাই। এক এক স্থানে গাড়ী উঠিলে তথা হইতে ৩টী লাইন দেখা যায়—১টী উপরে, ১টী নিম্নে ও মধ্যস্থল দিয়া গাড়ী চলিতেছে।

(Between Doutuhaja and Mohur) বড়ই মনোরম দৃশ্য। স্বচক্ষে না দেখিলে বুঝিতে পারা যায় না; এবং আনন্দানুভবও হয় না। এই রেল-পথের স্থানে স্থানে, 'ডিনামাইট' নামক বিস্ফোরক পদার্থের সাহায্যে পাহাড় উড়াইয়া দিয়া লাইন পাতিতে ও সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছে। ইহার নির্ম্মাতাকে (Engineer) শতমুখে প্রশংসা করিতে ইচ্ছা হয়। এবং কতকোটী টাকা এই রেলপথ তৈয়ার করিতে ব্যয় হইয়াছে, তাহা ভাবিবার বিষয় বটে। 'হারাঙ্গাজাও' হইতে 'ব্যাঙ্ক' ষ্টেশনের মধ্যে ২টী এঞ্জিন সাহায্যে গাড়ী যাতায়াত করে। দিনের বেলা গাড়ী যাতায়াত করে বলিয়া আমি ঘড়ি খুলিয়া কোন্ সুড়ঙ্গটী অতিক্রম করিতে কত সময় লাগে, তাহা লিখিয়া রাখিয়াছিলাম, নিম্নে অবিকল তাহার নকল দিলাম। অবশ্য ২।৩ সেকেণ্ড এদিক ওদিক হওয়া সম্ভব। এই লাইনে গাড়ীর গতি—ঘণ্টায় ৭।৮ মাইল। স্থানে স্থানে ১৫।১৬ মাইল পর্য্যন্ত। 'ফেণী' নদীর উপর একটী সেতু আছে, তাহার দৃশ্য অতি সুন্দর এবং উহার ব্যয় ও খুব বেশী পড়িয়াছে, তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। এরূপ সেতু এই রেলপথের মধ্যে একটীও নাই। ইহা অতিক্রম করিতে ১১ মিনিটের কাছাকাছি সময় লাগে।

হাতিখালি পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। তৎপরেই লামডিং জংশন। এখানে গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া, দুগ্ধ ও খাবার কিনিয়া খাইলাম; পরে গৌহাটীর গাড়ীতে আরোহণ করিলাম। রাত্রি ২ঘটিকার সময় গৌহাটী পৌঁছিয়াছিলাম। তথা হইতে অশ্বযানারোহণে শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বাবুর বাসায় আসিলাম। রাত্রিটুকু এইখানে কাটাইয়া, প্রাতঃকালে উঠিয়া ব্রহ্মপুত্র স্নান করিলাম। পরে আহারাদি সমাপ্ত করিয়া, এই পরিবারের নিকট যথারীতি বিদায় গ্রহণ করিয়া পুনরায় গৌহাটী ষ্টেশনে উপনীত হইলাম। ১১টার সময় গাড়ী ছাড়িয়া, ১৭ মিনিট পরেই পাণ্ডুঘাটে উপস্থিত হইল। সকলে নামিয়া ষ্টীমারে উঠিলাম, এমন সময় খুব বৃষ্টি আরম্ভ হইল। পরপারে আসিয়া ভিজিয়া ভিজিয়া সারাঘাটের গাড়ীতে উঠিলাম। তৎপর দিন সোমবার বেলা ৩ টার সময় পুনরায় শিয়ালদহ ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছিলাম।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয়।

এই "ধন-ধান্যে-পুষ্পভরা আমাদের বসুন্ধরায়" প্রতিনিয়ত কত প্রশংসনীয় ও ন্যক্কারজনক কর্ম্ম সম্পাদিত হইতেছে। কেহ বা সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে যশঃ, কেহ বা অসৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে নিন্দা অর্জ্জন করিতেছে। কেহ বা অত্যাচারের বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তিতে মানব প্রকৃতির ভিতর সয়তানবৃত্তির পাপ অভিনয় করিয়া থাকে। তাহার অত্যাচারে কত অমরাবতী তুল্য নগরী অরণ্যে পরিণত হইয়াছে, কত প্রজা অন্নাভাবে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে, কত কুলললনা পবিত্রতা হারাইয়াছে, ব্রাহ্মণ জাতিভ্রষ্ট হইয়াছে ও কুলে অনপেনয় কলঙ্ক পরিয়াছে। আবার হয় ত, কাহারও আগমনে অরণ্য জনপদ হইয়াছে, তাঁহার চরণস্পর্শে পৃথিবী পবিত্রীকৃত হইয়াছে, তাঁহার অন্নে অসংখ্য নরনারী প্রতিপালিত হইতেছে ও তাঁহার বাসস্থান বারাণসীবৎ পবিত্রধাম হইয়াছে। এই দ্বিবিধ লোক জগতে আছে। মানুষ দুই নামে অক্ষয় হয়—কেহ বা সুনামে, কেহ বা কুনামে। রাবণ, দুর্য্যোধন, ক্লাইভ ইহাদের নাম আজিও ধরণীপৃষ্ঠ হইতে বিলীন হয় নাই; এবং রাম, যুধিষ্ঠির, আকবরের নামও অদ্যাপি উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। কিন্তু একের নাম করিলে আমাদের মনে যুগপৎ ঘৃণা ও রাগের উদ্রেক হয়; ও অন্যের নাম করিলে ধর্ম্মভাব ও শান্তভাব জাগ্রত হয়। ইহাদের মধ্যে প্রাতঃস্মরণীয় কে? যাহারা মরজগতে থাকিয়া স্ব স্ব কার্য্যকলাপ দ্বারা অঙ্গুলিনির্দ্দেশে আমাদিগকে ধর্ম্মের পথ দেখাইয়া দিতেছেন ও পাপপথের আপাত-মধুর-পরিণামে বিষের কথা বলিয়া দিতেছেন এবং "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" অথবা "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন" ইত্যাদি কথা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন, সে সব মহাত্মাই আমাদের আদর্শ। তাই প্রাচীন হিন্দুগণ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগের পর একটী শ্লোক পাঠ করিতে বলিয়াছেন,

পুণ্যশ্লোকো নলো রাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।
পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দ্দনঃ॥

আমাদের মনে সাধারণত একটী প্রশ্নের উদয় হইয়া থাকে "পাপের পথ ধর্ত্তব্য না পুণ্যের পথ ধর্ত্তব্য।" পুণ্যের পথ বন্ধুর, সুতরাং কষ্টপ্রদ ও পাপের

পথ স্বচ্ছল। কত ব্যবসায়ী, কত জমীদার, সয়তানের মত প্রজাগণ হইতে শোণিতসম অর্থ নিষ্কাশন করিয়া সৌধমালায় পরিবেষ্টিত হইয়া থাকে; তাহাদের সুখের শেষ নাই, অন্ত নাই। কিন্তু যে জন পুণ্যের পথ অবলম্বনে ভগবানের নাম লইয়া সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া থাকেন, তাঁহার বাটীতে খেড়ের ঘর, পরিধানে মলিন বস্ত্র। কিন্তু প্রকৃত সুখী কে? তাহার উত্তর ঃ—যাহার প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হইয়াছে। যাহার প্রবৃত্তির নিবৃত্তি নাই, সে কখনই শান্তিলাভ করিতে পারে না।

কারণ,

> ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
> হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন,

> আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
> সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
> তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
> স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥

অর্থাৎ 'যেমন চারিদিকের নদ নদীর জলে পরিপূরিত সুগভীর সমুদ্রে বর্ষার বারিধারা প্রবিষ্ট হইলেও সমুদ্র যেমন স্থিরপ্রতিষ্ঠ থাকে, সেইরূপ জিতেন্দ্রিয় মুনিগণের মনোমধ্যে শব্দাদি বিষয়সকল প্রবিষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাঁহারা তাহাতে বিচলিত হয়েন না, বরং শান্তিলাভ করিয়া থাকেন। বিষয়কামী ব্যক্তি কখনও শান্তিলাভ করিতে পারে না।'

মনের শান্তিই প্রকৃত সুখ। পাপীর হৃদয় সর্ব্বদা সশঙ্ক ও চিন্তাপূর্ণ, আর ধার্ম্মিকের হৃদয় সাগরের ন্যায় স্থির ও গম্ভীর।

পাপের প্রথমে জয়, কিন্তু পরিশেষে পরাজয়। আর ধর্ম্মের প্রথমে পরাজয়, কিন্তু পরিণামে জয়। দুর্য্যোধন প্রথমে জয়ী হইয়া আস্ফালন করিয়াছিল, কিন্তু যুদ্ধশেষে পরাজিত হইয়া রণভূমিতে প্রাণত্যাগ করিল। ম্যাকবেথ সর্ব্বদা দুশ্চিন্তায় জর্জ্জরিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে (মৃত্যু) পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সক্রেটিশ অম্লানবদনে অকুট বিষপান করিয়া ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছেন। যুধিষ্ঠির রাজ্যবিতাড়িত হইয়া অরণ্যে অরণ্যে বাস করিয়া ন্যায়যুদ্ধে হৃতরাজ্য পুনঃ লাভ করিলেন। পাপ ও পুণ্যের ফল একদিন ইহলোকেই ভোগ করিতে হইবে—

ত্রিভির্বর্ষৈস্ত্রিভির্মাসৈ স্ত্রিভিঃ পক্ষৈ স্ত্রিভির্দিনৈঃ।
অত্যুৎকটৈঃ পাপপুণ্যৈরিহৈব ফলমশ্নুতে ॥

জর্ম্মনললনা জেকব-দুহিতা মেরীও প্রথমে পরাজিত, অধিকন্তু বিতাড়িত হইয়া, পরিশেষে জয়যুক্তা হইয়াছিল।

মেরী পিতামাতার একমাত্র সন্তান। তৎকালে জর্ম্মন-রাজপরিবারের সকলে ভৃত্য জেকবকে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। জেকবও প্রভুপরায়ণ ছিল। কালক্রমে তাহার একটী কন্যারত্ন জন্ম পরিগ্রহ করিল। কন্যার নাম রাখিলেন—মেরী। কিন্তু দুর্দ্দৈববশতঃ মেরী মাতৃহীনা হইল। তদবধি জেকব মেরীকে সযত্নে লালনপালন করিতে লাগিল। মেরী যখন পঞ্চবয়স্কা বালিকা, তখন জেকবকে রাজসরকার একখণ্ড ভূমি দান করিল। জেকব তথায় গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিল। সে একটী ফুলবাগানও করিল। মেরী প্রত্যহ ফুলের মালা গাঁথিয়া রাজকন্যাকে উপহার দিয়া আসিত। রাজকন্যাও তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। কিন্তু এই ভালবাসা কাহার চক্ষে ভাল লাগিল না, কাহার পিশাচ হৃদয়ে ঈর্ষানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল! সে রাজকন্যার পরিচারিকা এমেলী।

"আমা হ'তে অন্য যদি কেহ
অধিক গৌরব করে, দহে যেন দেহ
হৃদে জ্বলে হলাহল ॥"

আজ রাজকন্যার জন্মোৎসব। রাজবাটীতে আমোদ চলিতেছে। মেরী একগাছি সুন্দর মালা গাঁথিয়া আনিয়াছে। রাজকন্যা পরিচারিকাসহ বেশ-ভূষা করিতেছেন। মালার সৌন্দর্য্য দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদ সহকারে মেরীকে বাহুলতায় বদ্ধ করিয়া চুম্বন দিতে লাগিলেন। এত দৌরাত্ম্য এমেলীর ভাল লাগিল না। পিশাচী কক্ষ হইতে চলিয়া গিয়া প্রচ্ছন্নভাবে রহিল। ইত্যবসরে রাজকন্যা টেবিলের উপর আপনার বহুমূল্য অঙ্গুরীয়ক রাখিয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন। মেরীও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া গেল। এমেলী দ্রুতপদে আসিয়া অঙ্গুরীয়ক লইয়া প্রস্থান করিল। রাজকন্যা আসিয়া দেখেন যে, আংটী নাই। তিনি মনে করিলেন, বোধ হয় এমেলী বা মেরী কৌতুহল করিবার জন্য লইয়া গিয়াছে! এমেলীকে জিজ্ঞাসা করিলে সে স্পষ্ট অস্বীকার করিল; সুতরাং সন্দেহ অভাগিনী মেরীর উপর পতিত হইল।

রাজকন্যা ত্বরিত পদে মেরীর বাটী আসিয়া তাহাকে অঙ্গুরীয়ক প্রত্যর্পণ করিতে অনুরোধ করিলেন। এতচ্ছ্রবণে মেরীর চক্ষু স্থির, সে নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল, তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। বলিল যে, তৎসম্বন্ধে সে বিন্দুবিসর্গ জ্ঞাত নহে। কিন্তু রাজকন্যার মন হইতে সন্দেহ দূর হইল না। তিনি জেকবের নিকট সবিশেষ বলিয়া চলিয়া আসিলেন। মাতার নিকটও বলিলেন। জেকব কন্যাকে তিরস্কার করিলেন। সেই দিন সন্ধ্যাসমাগমে রাজমহিষী জেকবের বাটী আসিয়া মেরীকে অনেক বুঝাইলেন; কিন্তু মরুভূমিতে বৃষ্টির ন্যায় কোনও ফলোদয় হইল না। মেরী মনে মনে নিরতিশয় যাতনা পাইতেছিল; এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনায় তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল। আর এমেলী? আনন্দে উৎফুল্লা, নববারি-সিঞ্চনে প্রস্ফুটিত বল্লরীর ন্যায় আনন্দময়ী। কিন্তু পাপীয়সী জানে না, সুখসূর্য্য চিরদিন থাকে না।

এইরূপে কয়েক দিবস অতীত হইয়া গেল। জেকব মেরীকে অত্যন্ত ভয় দেখাইল; কিন্তু মেরী বাত্যাহত বিগতকুসুমা লতার ন্যায় ম্রিয়মাণা। সে পিতৃসমীপে বলিল যে, তৎসম্বন্ধে সে কিছুই জানে না। কন্যার মর্ম্মন্তুদ অবস্থা দর্শনে তন্নির্দ্দোষতায় তাহার প্রত্যয় জন্মিল। রাজবাটীতে তাহাদের ডাক পড়িল। অদৃষ্টবৈগুণ্যে তাহারা নির্ব্বাসিত হইল।

জেকব ও মেরী দেশান্তরে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। জেকব সযত্নে একটী ফুলবাগান প্রস্তুত করিল। মেরী প্রত্যহ মালা বেচিত। তদ্দ্বারা তাহাদের দু'পয়সা উপার্জ্জন হইত। কোন কোন দিন তাহারা অনাহারে থাকিত। প্রতিবাসিগণ দয়ালু ছিল, তাহারা তাহাদের বন্ধুর ন্যায় যত্ন করিত। যখন সূর্য্যদেব অস্তগত হইত, সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোক ক্রমে ক্রমে পড়িতে থাকিত, পক্ষিকুল নিঃশব্দ হইয়া নিদ্রার ক্রোড়ে আশ্রয় লইত, তখন মেরী কুটীরের দ্বারদেশে কপোলে হস্ত বিন্যস্ত করিয়া, নিজের অদৃষ্টের দুঃখ, পিতার শারীরিক কষ্ট, মাতার মৃত্যু ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করিতে থাকিত; অথবা প্রতিবাসিগণ সহ নানাবিধ কথোপকথনে মত্ত থাকিত। দেখিতে দেখিতে দু'বৎসর অতীত হইল। এমেলী নিশ্চিন্ত মনে আপন পাপবৃত্তি চরিতার্থ করিতে লাগিল। আর মাতৃহীনা মেরী? দুঃখ কষ্টে জর্জ্জরিতা, সন্ধ্যাসমাগমে মলিনবদনা, পিতৃকষ্টে দুশ্চিন্তাপরায়ণা, মাতৃশোকস্মরণে ব্যথিতহৃদয়া ও প্রখর রৌদ্রতপ্ত-মৃতকল্পা লতার ন্যায় মেরী অতিকষ্টে কালাতিপাত করিত। আবার কখন, পিতার সদুপদেশে, অথবা প্রতিবেশিনীর

কথোপকথনে কখন কখন শান্তি পাইত। কিন্তু মেরীর দুঃখসূর্য্য ক্রমে ক্রমে অস্তগত হইতে লাগিল।

সন্ধ্যাকাল। নক্ষত্রবিভূষিত আকাশ। শনৈঃ শনৈঃ প্রবাহমান বায়ু। প্রকৃতির প্রশান্ত ভাব। কিন্তু দেখিতে দেখিতে আকাশে মেঘ উঠিল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল, নদীর জল কাল হইল, বৃক্ষপত্র কটা হইল, বায়ু নিস্তব্ধ হইল। কিয়ৎকালপরে ভীষণ বেগে ঝটিকা আরম্ভ হইল; বৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত হইতে লাগিল। প্রায় দুই ঘণ্টা পরে ঝটিকাবেগ প্রশমিত হইল। পরদিন প্রাতে রাজরাণী রাজকন্যা ও পরিচারিকাগণ বাগানের বৃক্ষাদির অবস্থা দেখিবার জন্য বহির্গত হইলেন। প্রবল ঝটিকাবেগে কয়েকটী চারাগাছ ভূমিসাৎ হইয়াছে। কয়েকটী বৃক্ষবাহিনী লতা স্থানচ্যুত হইয়াছে। ছিন্নপত্রে বাগানপথ আকীর্ণ হইয়াছে। রাজকন্যা এদিক ওদিক ঘুরিতেছিলেন। ঘুরিতে ঘুরিতে রাজকন্যা একটী বৃক্ষতলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, বৃক্ষতলস্থ একটী স্থানের মৃত্তিকাগুলি অপসারিত হইয়াছে। তাহাতে এক-স্থান হইতে কি এক পদার্থের জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছে। কৌতূহলবশে নিকটস্থ হইয়া দেখিলেন যে, তাঁহার সেই বহুদিনের অপহৃত অঙ্গুরীয়ক। তিনি বিস্ফারিত নয়নে দেখিলেন যে, সত্য সত্যই তাঁহার অঙ্গুরীয়ক। তখন তাহা মাতাকে ডাকিয়া দেখাইলেন। অন্য সকলেই দেখিল, কিন্তু এমেলী বায়ুতাড়িত কদলীপত্রের ন্যায় কাঁপিতেছে। তাহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, চক্ষুতে যেন কালিমা পড়িয়া রহিয়াছে। যখন সকলে তাহার দিকে চাহিল, সে বলিয়া উঠিল, আমি ইহা চুরি করি নাই। তখন সকলেই বুঝিল যে, এমেলীই চোর। রাজকন্যা সরোষে মারিতে গেলেন। এমেলী শীঘ্রই শৃঙ্খলাবদ্ধ হইল। রাজরাণী তাহাকে সত্য ঘটনা কহিতে বলিলে এমেলী যথাযথ বৃত্তান্ত বর্ণন করিল। তচ্ছ্রবণে রাজরাণী ক্রুদ্ধা হইয়া তাহাকে সপ্রাণে মৃত্তিকায় প্রোথিত করিতে আদেশ দিলেন।

জেকব ও মেরী তাহাদের কুটীরে বসিয়া আছে। এমন সময় রাজরাণীর জনৈকা আত্মীয়া কুটীরের নিকটে যাইতেছিলেন। তিনি মেরীর নষ্টসৌন্দর্য্য দর্শনে ব্যথিতা হইয়া তাঁহার নিকট সবিশেষ নিবেদন করিতে বলিলেন। মেরী সকল বৃত্তান্ত বলিল। তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, রাজবাটী পৌঁছিয়াই রাজরাণীকে এবিষয় জ্ঞাপন করিবেন। তিনি আসিয়াই এমেলীর অনৈসর্গিক মৃত্যুকথা শুনিলেন। ইতঃপূর্ব্বে জেকব ও মেরীকে আনিবার জন্য লোক

প্রেরিত হইয়াছিল। কয়েকদিবস পরে তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজকন্যা সাশ্রুনেত্রে তাহাদিগকে বাটী আনিলেন ও মেরীর নিকট ভূয়োভূয়ঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

তবেই দেখা গেল, ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয়। এমেলী পাপজাল বিস্তার করিয়া, মেরীকে তাহাতে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়া আপনিই তাহাতে পতিত হইল। পক্ষান্তরে মেরী ধর্ম্মের পথ অবলম্বন-পুরঃসর প্রথমে পরাজিত। কিন্তু পরিশেষে জয়যুক্তা হইয়াছিল। তাই কবি বলিয়াছেন।

"যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ।"

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিরাশ।

মূর্খ আমাকে যে বলে পণ্ডিত
সে-ই চির মূর্খ সংসারে।
পণ্ডা যাহার আদতেই নাই
পণ্ডিত বলে বা কে তারে ?
'তন্ন তন্ন' ক'রে খুজিয়াছি কত
পুথির ভিতরে ; পাই নি।
'নেতি নেতি' ক'রে শ্রান্ত হ'য়েছি
'সোঽহং' বুঝিতে যাই নি।
বেদ-চতুষ্টয় ছয়টী দর্শন
তন্ত্র স্মৃতি পুরাণ ;—
কতবার ঘুরে' ফিরিয়ে পড়েছি
হয় নি ত কোনো জ্ঞান।
যাঁহাকে পাইতে মত্ত সকলি
নিত্য সত্য শুদ্ধ।
খুজিলেও তাঁকে জনমের তরে
হবে না আমার বোধ্য॥

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন কাব্যব্যাকরণতীর্থ।

পেশোয়া ও নিজাম।

(ঐতিহাসিক চিত্র)

সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোগল সাম্রাজ্যের অবনতি আরম্ভ হয়—এ কথা সর্ব্বজনবিদিত। মহারাষ্ট্রশক্তির উদ্বোধনই মোগলশক্তির অবনতির অন্যতম কারণ। এই দুর্জ্জয় মোগল-শক্তি—যাহারা প্রায় আড়াই শত বৎসর কাল দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে সমগ্র ভারতবর্ষ শাসন করিয়া আসিতেছিল, এইবার তাহারা দুইটী প্রবল রাজশক্তির ক্রীড়া-পুত্তলিকারূপে পরিণত হইল। সেই দুইটী রাজশক্তি—পুণার পেশোয়া এবং হায়দ্রাবাদের নিজাম।

আজ পারস্যের যে অবস্থা,—তখন দিল্লীর অবস্থাও ঠিক এই প্রকার। আজ যেমন কুচক্রী রুস প্রাচীন পারস্য রাজবংশের উচ্ছেদ সাধনপূর্ব্বক আত্মসাৎ করিবার জন্য লালায়িত এবং সদাশয় ইংরেজ যেমন রুসের এ দুরাকাঙ্ক্ষায় প্রশ্রয় না দিয়া—পারস্য রাজবংশ বজায় রাখিয়া শান্তি কামনায় আধিপত্য-প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর ;—নিজামও তখন প্রাচীন মোগল-বংশের উচ্ছেদ পূর্ব্বক ভয়-মৈত্রী-প্রদর্শনে দিল্লীর সিংহাসন করায়ত্ত করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং পক্ষান্তরে পেশোয়া প্রাচীন মোগল-রাজবংশের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া, তাহাদের উপর আধিপত্য স্থাপনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন।

উভয়ের স্বার্থ যেখানে বিভিন্নমুখী,—বিবাদ সেখানে অনিবার্য্য। কাযেই পেশোয়া ও নিজামের মধ্যে লোক-ক্ষয়কর সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

মীর কমরুদ্দীন নামক জনৈক বহুদর্শী সমরনিপুণ রাজনীতিবিশারদ পুরুষসিংহ তখন হায়দ্রাবাদের নিজাম। ইনি বিখ্যাত আওরঙ্গজেবের সমসাময়িক লোক। আওরঙ্গজেবের সেনাদলে প্রথমে ইনি সামান্য সৈনিকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন ; পরে প্রতিভার প্রভাবে মীর সাহেব ক্রমে ক্রমে সেনাপতির পদ অধিকার করেন। সম্রাট্ আওরঙ্গজেব কার্য্য-নৈপুণ্যে পরিতুষ্ট হইয়া ইঁহাকে হায়দ্রাবাদের সুবেদার নিযুক্ত করেন। সামান্য সৈনিক আজ স্বীয় প্রতিভার বিকাশ করিয়া হায়দ্রাবাদের শাসন-ভার প্রাপ্ত হইলেন ; প্রতিভার পথ সকল স্থলে সকল ক্ষেত্রেই এইরূপ বিমুক্ত !

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দিল্লীর সিংহাসন লইয়া তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে

সংঘর্ষণ আরম্ভ হইল; মোগল শাসনাধীন রাজ্যসমূহে অরাজকতা উপস্থিত হইল। সুযোগ বুঝিয়া মীর কমরুদ্দীন আপনাকে হায়দ্রাবাদের স্বাধীন অধিপতি বলিয়া ঘোষণা করিয়া নিজাম-উল্-মুল্ক উপাধি গ্রহণ করিলেন। অতঃপর নিজাম বাহাদুর আপনাকে অজেয় শক্তিসম্পন্ন করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইলেন। তিনি সৈন্য-বিভাগের সংস্কার সাধন করিলেন, উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কামান বন্দুক তরবারি প্রভৃতি প্রস্তুত করাইতে লাগিলেন, রাজ্যের চতুর্দ্দিক হইতে লোক সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে সৈন্যদলভুক্ত ও সুশিক্ষিত করিতে তৎপর হইলেন।—কয়েক বৎসরের মধ্যেই হায়দ্রাবাদের নিজামের অতুলনীয় শক্তি-সামর্থ্যের কথা ভারত-ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। নিজামী-সেনার নাম শুনিলে তৎকালে অতি বড় সাহসী রাজারও হৃদয় আতঙ্কে কম্পিত হইয়া উঠিত। নিজামের তোপখানা তৎকালে এতদূর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল যে, সমগ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজন্যবর্গের তোপসমূহ একত্রিত হইলেও নিজামী তোপখানার সমতুল্য হইতে পারিত না।

এই সময় মহারাষ্ট্র রাজ্যেও দারুণ অরাজকতা বিরাজ করিতেছিল। ছত্রপতি শিবাজীর মৃত্যুর পর আওরঙ্গজেব বার লক্ষ সৈন্য লইয়া মহারাষ্ট্র দেশ আক্রমণ করেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়গণ সেই বিপুল বাদশাহী বাহিনীকে উপেক্ষা করিয়া সগৌরবে স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন। এই সময় দুর্ভাগ্য-ক্রমে শিবাজীর কনিষ্ঠ পুত্র বাদশাহের গুপ্তচরের কৌশলে ধৃত হইয়া বাদশাহ সমীপে নীত ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। এবং তাঁহার পুত্র শিশু সাহুও বন্দী হন। বাদশাহের এই বীভৎস আচরণে সমগ্র মহারাষ্ট্র দেশ উন্মত্ত হইয়া উঠে, ফলে বাদশাহকে দাক্ষিণাত্য বিজয়ের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া ভগ্ন-মনোরথে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় এবং পথিমধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হয়। শিবা-জীর কনিষ্ঠ পুত্র রাজারামের মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা মহিষী তারাবাই রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হন; এই সময় নিজাম বাহাদুর মহারাষ্ট্র-শাসনাধীন কর্ণাট রাজ্য অধিকার করিয়া লন। রাণী তারাবাইয়ের শাসনে রাজ-কর্ম্ম-চারিগণ সন্তুষ্ট ছিলেন না, বিশেষতঃ কর্ণাট নিজাম কর্ত্তৃক অধিকৃত হওয়ায় তাঁহারা বড়ই বিচলিত হইয়া উঠেন। এই সময় শম্ভুজীর পুত্র সাহু মোগল হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মহারাষ্ট্র প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহারাষ্ট্রীয় বীরগণ সাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তারাবাই সহজে সাহুকে আমল দিতে চাহিলেন না;—তিনি তাঁহার পুত্রকে দ্বিতীয় শম্ভুজী

নামে মহারাষ্ট্রদেশের রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। পক্ষান্তরে সাহুর পক্ষভুক্তগণ সাহুকে সাতারার সিংহাসনে স্থাপন পূর্ব্বক ছত্রপতি বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

সাতারাধিপতি সাহুর সৌভাগ্য ক্রমে এই সময় সুপ্রসিদ্ধ বলাজী বিশ্বনাথ তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিলেন। এই বহুদর্শী রাজ-কর্ম্মচারীর বিচক্ষণতায় সাহুর আধিপত্য অনেকটা প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। ইঁহারই বুদ্ধিকৌশলে কতিপয় ক্ষমতাশালী সেনাপতি রাণী তারাবাইএর পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া সাহুর পক্ষাবলম্বন করিলেন। গুণগ্রাহী সাহু বলাজী বিশ্বনাথকে সাতারার পেশোয়া পদে অভিষিক্ত করিলেন। মহারাষ্ট্রপ্রদেশে ছত্রপতির নিম্নেই পেশোয়ার আসন। পেশোয়ার পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই বলাজী বিশ্বনাথ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ছত্রপতি সাহুর আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় প্রবৃত্ত হইলেন।

এই সময় আওরঙ্গজেবের প্রপৌত্র ফরুখ্‌শিয়র দিল্লীর সিংহাসনে সাক্ষী-গোপালের মত অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইয়া সুপ্রসিদ্ধ সৈয়দ-ভ্রাতৃযুগল—আবদুল্লা খাঁ ও হুসেনআলি খাঁই প্রকৃত প্রস্তাবে বাদশাহী করিতেছিলেন। এই সৈয়দ ভ্রাতৃযুগলের সহিত হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুরের তখন ভয়ঙ্কর মনোমালিন্য চলিতেছিল। মীর কমরুদ্দীন দিল্লীশ্বরের অধীনতাপাশ ছেদন পূর্ব্বক সগর্ব্বে স্বাধীনতা ঘোষণা করিতেই, সৈয়দ ভ্রাতৃযুগল মীর সাহেবের উপর ভয়ঙ্কর অসন্তুষ্ট হইয়া উঠেন এবং তাঁহাকে বিদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করেন। এদিকে মীর সাহেবও (নিজাম বাহাদুর) সৈয়দ ভ্রাতৃযুগলকে বিতাড়িত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন করায়ত্ত করিবার জন্য বিপুল সৈন্য-সজ্জা করিতে লাগিলেন।

সৈয়দ ভ্রাতৃযুগল নিজামকে উত্তমরূপে চিনিতেন। নিজামের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য তাঁহারা এক অভিনব উপায় অবলম্বন করিলেন। বলাজী বিশ্বনাথ সাতারাধিপতি সাহুর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিপুল সমরা-য়োজন করিতেছেন শুনিয়া, তাঁহারা তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিলেন। তাহার ফলে পেশোয়া বলাজী বিশ্বনাথের সহিত সৈয়দ ভ্রাতৃযুগল বাদশাহের নামে এক সন্ধি স্থাপন করিলেন। এই সন্ধির সর্ত্তানুসারে মহারাষ্ট্র-ভূপতি দক্ষিণা-পথের অন্তর্গত বিজাপুর, হায়দ্রাবাদ, কর্ণাট, তাঞ্জোর, ত্রিচিন পল্লী ও মহী-শূর—এই ছয়টী রাজ্যে চৌথ-পদ্ধতি প্রবর্ত্তন ও সরদেশমুখী (রাজ্যের মোট

আয়ের দশমাংশ) আদায় করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইলেন এবং বিনিময়ে মহারাষ্ট্রাধিপতি প্রতিশ্রুত হইলেন যে, বাদশাহের সহায়তা করিবার জন্য পঞ্চদশ সহস্র মহারাষ্ট্র-সৈন্য সর্ব্বদা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাকিবে। এই সন্ধিস্থাপনে মহারাষ্ট্রীয়গণ যেমন আনন্দিত হইলেন, নিজামও তেমনই ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। ক্রোধে ক্ষোভে মর্ম্মাহত হইয়া নিজাম সৈয়দ ভ্রাতৃযুগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়া দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মোগলাধিকৃত সুপ্রসিদ্ধ আশীর-গড়ের দুর্গ অধিকারপূর্ব্বক নর্ম্মদাতীর পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ আক্রমণ করিলেন।

সৈয়দ ভ্রাতৃযুগলও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না; তাঁহারা বহুসংখ্যক সৈন্যসহ দিলাবর-খাঁ নামক জনৈক সেনানীকে নিজাম-উল-মুল্কের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন এবং আওরাঙ্গাবাদ হইতে সৈয়দ ভ্রাতৃযুগলের পরমাত্মীয় আলম আলিও বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া নিজামের বিরুদ্ধে ধাবিত হইলেন। নর্ম্মদাতীরে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল; এই যুদ্ধে বাদসাহী সৈন্যদল সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইল, ফলে নর্ম্মদাতীর পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ নিজামের করায়ত্ত হইল; আওরাঙ্গাবাদের দুর্গে নিজামী-পতাকা উড্ডীন হইল।

এই শোচনীয় পরাজয় বার্ত্তা দিল্লীতে পঁহুছিলে দিল্লীর অমাত্যবর্গ আতঙ্কে অস্থির হইয়া উঠিলেন। এই সময় জনরব উঠিল যে, বিজয়ী নিজাম তাহার বিজয়োন্মত্ত অজেয় বাহিনী লইয়া দিল্লী আক্রমণ করিতে আসিতেছে। সৈয়দ ভ্রাতৃযুগল এ সংবাদ অবগত হইলেন। কিন্তু তাঁহারাও এক চাল চালিয়া বসিলেন। সৈয়দ হুসেন আলী দিল্লী হইতে বাদশাহকে লইয়া বহুসংখ্যক বাদশাহী ফৌজসহ নিজামকে আক্রমণ করিতে চলিলেন। বাদশাহ স্বয়ং নিজামকে আক্রমণ করিতে যাইতেছেন—এ সংবাদে সর্ব্বত্র একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল—নিরুদ্যম বাদশাহী-বাহিনীর শ্লথ হৃদয়েও একটা নূতন উৎসাহের সঞ্চার হইল। কূটবুদ্ধি সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় ভাবিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে বাদশাহকে সাক্ষী-গোপাল স্বরূপ উপস্থিত করার ফল কখনই বৃথা হইবে না—নিজাম-উল-মুল্কের পতন অনিবার্য্য! কিন্তু নিয়তি এই কূটনীতিপরায়ণ ভ্রাতৃযুগলের জন্য যে জাল রচনা করিতেছিলেন, অদূর ভবিষ্যতে তাহা প্রাণনাশক মৃত্যুপাশরূপে তাহাদের উপর পতিত হইল; পথিমধ্যে গুপ্ত ঘাতকের হস্তে সৈয়দ হুসেন আলি হত হইলেন এবং এই শোচনীয় সংবাদ দিল্লীতে উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহার ভ্রাতা সৈয়দ আবদুল্লা বন্দী হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন! নিজাম-উল-মুল্কের সৌভাগ্য পথ এইরূপে অতি সহজেই পরিষ্কার হইয়া গেল!

বাদশাহী ও নিজামী সেনার এই প্রকার সংঘর্ষের সময় মহারাষ্ট্র-রাজ্যেও এক পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। সেইজন্য মহারাষ্ট্র-শক্তি বাদশাহ-বাহিনীর পক্ষাবলম্বনে সমর্থ হন নাই। দিল্লী হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরই বলাজী বিশ্বনাথ সহসা কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় মহারাষ্ট্র প্রদেশে দারুণ শোকের ছায়া পতিত হয়; মহারাজ সাহু কর্ম্মবীর বিশ্বনাথের মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকাতুর হইয়া উঠেন। অবশেষে তাঁহার অনুরোধে জগদ্বিখ্যাত যোদ্ধা বাজীরাও পেশোয়ার পদে অভিষিক্ত হন; কিন্তু তাঁহার নিয়োগে প্রধান সেনাপতি চন্দ্রসেন ও তাঁহার পথাবলম্বী কতিপয় রাজ-কর্ম্মচারী অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া বিদ্রোহোন্মুখ হন; সেনাপতি চন্দ্রসেনের আশা ছিল, বিশ্বনাথের পর তিনিই পেশোয়ার পদ প্রাপ্ত হইবেন; কিন্তু রাজা তাঁহাকে নিরাশ করিয়া বাজীরাওকে সেই পদ প্রদান করাতেই তিনি ও তাঁহার পক্ষাবলম্বিগণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া একটা গোলযোগ বাধাইবার উপক্রম করেন।

বাজীরাও যখন পেশোয়ার পদে অভিষিক্ত হইলেন, তখন তাঁহার বয়স বাইশ বৎসর মাত্র। কিন্তু এই অল্প বয়সে পেশোয়ার পদে অভিষিক্ত হইয়াই তিনি এরূপ ক্ষিপ্রতা ও দৃঢ়তার সহিত এই আভ্যন্তরীণ গোলযোগ নিষ্পত্তি করিলেন যে, তদ্দৃষ্টে শত্রু মিত্র সকলেই বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন।

এই সময় মহম্মদসাহ দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। খানদৌরা ও সৈয়দ খাঁ নামক দুইজন প্রসিদ্ধ রাজকর্ম্মচারী বাদশাহ মহম্মদ শাহকে ক্রমাগত মহারাষ্ট্র-শক্তির বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। বাদসাহও তাঁহাদের প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য করিয়া যাইতে লাগিলেন। তাহার ফলে দিল্লীশ্বরের সহিত মহারাষ্ট্রপতির যে সম্প্রীতি স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। অতঃপর মন্ত্রিগণের পরামর্শ অনুসারে বাদশাহ মহম্মদ শাহ নিজাম-উল-মুল্ককে তাঁহার প্রধান মন্ত্রীর পদে বরিত করিয়া রাজধানীতে আহ্বান করিলেন। নিজাম বুঝিলেন, তাঁহার উচ্চ আশা সফল হইবার আর বড় বিলম্ব নাই, একবার দিল্লীর দরবারে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে, দিল্লীর শাসনদণ্ড আয়ত্ত করা তাঁহার পক্ষে নিশ্চয়ই সহজসাধ্য হইবে।

নিজাম মহা-আড়ম্বর সহকারে দিল্লী যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন; কিন্তু সহসা এক ভীষণ প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইল। তিনি সংবাদ পাইলেন, ইতিপূর্ব্বে তিনি মহারাষ্ট্রীয়গণের গৃহযুদ্ধের অবকাশে বাহুবলে তাহাদের অধিকৃত যে সকল ভূখণ্ড অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন, পেশোয়া বাজীরাও

এখানে সেই সকল ভূভাগ উদ্ধার করিতে এমন কি নিজাম বাহাদুরের নিকট ভূতপূর্ব্ব বাদশাহ প্রদত্ত সনন্দ বলে চৌথ আদায় করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এ সংবাদে নিজাম বজ্রাহতবৎ স্তম্ভিত হইলেন; তাঁহার দিল্লীযাত্রা আপাততঃ স্থগিত রহিল; তিনি পেশোয়া বাজীরাওকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য বিপুল সমরায়োজন করিতে লাগিলেন। বাজীরাওয়ের প্রথম লক্ষ্য কর্ণাট প্রদেশে শুনিয়া, তিনি সেই অঞ্চলে পঞ্চাশ সহস্র নূতন সৈন্য প্রেরণ করিলেন এবং সেই সৈন্যদলের অধ্যক্ষ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ইওয়াজ খাঁকে আদেশ করিলেন যে, তিনি যেন পেশোয়া বাজীরাওয়ের আক্রমণ প্রতীক্ষা না করিয়া, কর্ণাটে অবস্থিত নিজামী বাহিনী লইয়া মহারাষ্ট্র রাজধানী সাতারা রাজ্যে অভিযান করেন। এই বিপুল বাহিনী পাঠাইয়াও নিজাম নিশ্চেষ্ট রহিলেন না, আরও বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তিনিও অন্য পথে মহারাষ্ট্র প্রদেশে অভিযান করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

সমগ্র ভারতবর্ষ বিস্ময়-বিস্ফারিত লোচনে পেশোয়া ও নিজামের বাহুবল পরীক্ষা করিবার জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

তখন মালব রাজ্যও একটি সুপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যরূপে পরিগণিত হইত। মালবের ব্রাহ্মণ রাজা গিরিধর নিজামের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। নিজাম কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া তিনি ৭০ হাজার সৈন্য যুগপৎ সাতারা ও পুণার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। পেশোয়া বাজীরাও নিশ্চেষ্ট ছিলেম, ভারতের সকল কার্য্যকলাপের উপর তখন তাঁহার দৃষ্টি বিশেষভাবে নিবদ্ধ ছিল। মালবী সৈন্যগণ নাসিকে আসিয়া শিবির স্থাপন করিল। ইতিমধ্যে বাজীরাও বিদ্যুদ্বেগে নাসিকে উপস্থিত হইয়া সমগ্র মালবী সৈন্যদলকে আক্রমণ পূর্ব্বক সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন। এই যুদ্ধে প্রায় ত্রিশ হাজার মালবী সৈন্য হতাহত ও দশ সহস্র সৈন্য বন্দীকৃত হইল; অবশিষ্ট সৈন্যদল লইয়া সেনাপতি চন্দ্রসেন কর্ণাটে পলায়ন করিলেন! বাজীরাও তখন বিজয়ী সৈন্যদল লইয়া মালবে ধাবিত হইলেন। রাজা গিরিধর বাজীরাওয়ের গতিরোধ করিবার জন্য রাজ্যের যাবতীয় সৈন্যদলকে একত্রিত করিলেন,—কিন্তু তাঁহার সৈন্যদল পেশোয়ার গতিরোধে সমর্থ হইল না. তাহারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। রাজা গিরিধর তখন আত্মমর্য্যাদা রক্ষার্থ পরিজনবর্গকে লইয়া, রাজধানী রক্ষার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া কর্ণাটে পলায়ন করিলেন। সমগ্র মালব বিজয়ী বাজীরাওয়ের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল. —মালবের দুর্গশিরে পেশোয়ার বিজয়-পতাকা উড্ডীন হইল।

কূটবুদ্ধি নিজাম, পেশোয়া বাজীরাওয়ের এই অসাধারণ ক্ষিপ্রতা ও সমর-নিপুণতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতেছিলেন। কর্ণাট-দুর্গে তখন পঞ্চাশ সহস্র মহাতেজস্বী সুশিক্ষিত নিজামী সৈন্য পেশোয়াকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। মালবেশ্বর গিরিধর তাঁহার পরাজিত সৈন্যদল লইয়া কর্ণাটে অবস্থিত নিজামী বাহিনীর সহিত যোগদান করিলেন। তখন মালব ও কর্ণাটে সম্মিলিত বাহিনী পেশোয়া বাজীরাওকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

এদিকে বাজীরাও অধিকৃত মালব-রাজ্যের শাসন-পদ্ধতির সুবন্দোবস্ত করিয়া, সুযোগ্য প্রতিনিধির হস্তে মালবের শাসনভার অর্পণ করিয়া মহা উৎসাহে কর্ণাটে অভিযান করিলেন। কর্ণাট সীমান্তে তিনি মালব ও কর্ণাটের সম্মিলিত সৈন্যদলের সাক্ষাৎ পাইলেন। তখনই তিনি তাঁহার সেনানীগণের প্রতি অবিলম্বে শত্রুসৈন্য আক্রমণ করিবার আদেশ করিলেন। পেশোয়ার জয়দৃপ্ত সৈন্যগণ বিপুল বিক্রমে শত্রুসৈন্যকে আক্রমণ করিল; শত্রুসৈন্যের তোপখানা অত্যুৎকৃষ্ট ছিল,—কিন্তু সৈন্য-সংস্থানের দোষে তাঁহাদের তোপ-খানা পেশোয়ার বিশেষ অনিষ্ট সাধন করিতে পারিল না এবং কয়েক ঘণ্টা যুদ্ধের পর অসাধারণ ক্ষিপ্রতা ও কৌশলের সহিত পেশোয়া বাজীরাও শত্রু-পক্ষের তোপখানা আক্রমণ পূর্ব্বক অধিকার করিয়া লইলেন। এইবার শত্রুগণ প্রমাদ গণিল। পেশোয়ার সৈন্যগণ এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় অধিকতর উৎসাহের সহিত শত্রুগণকে আক্রমণ করিতে লাগিল। সম্মিলিত মালব ও কর্ণাটবাহিনী কর্ণাট দুর্গাভিমুখে পলায়ন করিতে লাগিল। পেশোয়া-বাহিনী উৎসাহ সহকারে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইল। পলায়িত সৈন্যদল কর্ণাট-দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল; পেশোয়া কর্ণাট-দুর্গ অবরোধ করিলেন এবং নিজাম যাহাতে কর্ণাট-দুর্গের অবরুদ্ধ সৈন্যদলের সাহায্যার্থ নূতন সৈন্য প্রেরণ করিতে না পারেন, সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিলেন। কয়েক সপ্তাহ মধ্যেই কর্ণাট-দুর্গের পতন হইল; দুর্গের প্রায় চল্লিশ সহস্র সৈন্য সারি সারি দুর্গ হইতে বাহির হইয়া পেশোয়ার পদতলে তাহাদের অস্ত্র শস্ত্র সমর্পণ করিল!

রাজা গিরিধর সীমান্ত-যুদ্ধের পর কর্ণাট-দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া হায়দ্রাবাদে পলায়ন করিয়াছিলেন। নিজাম বাহাদুর তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। ইতিমধ্যে মহারাষ্ট্রপ্রদেশাধিপতি ছত্রপতি শাহুর জ্ঞাতি-ভ্রাতা কোল্হাপুরাধিপতি শম্ভুজী নিজামের প্রলোভনে পতিত হইয়া তাঁহার পক্ষ গ্রহণ করিলেন। নিজাম শম্ভুজীকে মহারাষ্ট্রপ্রদেশের ছত্রপতি বলিয়া

ঘোষণা করিলেন। এই সময় কর্ণাটের পতন সংবাদ নিজামের কর্ণ-গোচর হইল। এই ভীষণ সংবাদে তিনি বজ্রাহতবৎ স্তম্ভিত হইলেন।

দুর্জ্জয় পেশোয়াকে দমন করিবার জন্য তখন মহাবল নিজাম তাঁহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিবার সংকল্প করিলেন এবং তাঁহার প্রিয়সুহৃদ্ ও আত্মীয় গুজরাটের নবাব সরবুলন্দ খাঁকে পেশোয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন।

পেশোয়া বাজীরাও তাঁহার রণকুশল সেনানী ও জয়োন্মত্ত সৈন্যদল লইয়া ধীরে ধীরে নিজামের রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং আওরাঙ্গাবাদের সুবিস্তৃত প্রান্তরে শিবির স্থাপন করিলেন। মহাবুদ্ধিমান্ পেশোয়া, নিজামকে উত্তমরূপে চিনিতেন, সুতরাং হঠকারিতার সহিত নিজামকে আক্রমণ না করিয়া তিনি উপযুক্ত অবসর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। নিজামও তাঁহার বিপুল সৈন্যদল লইয়া আওরাঙ্গাবাদের প্রান্তরের অপরপ্রান্তে শিবির ফেলিলেন। এই সময় মালব ও কোহ্লাপুরের সম্মিলিত পঞ্চাশ সহস্র সৈন্য তাঁহার সহিত যোগদান করিল; নিজামের পতাকামূলে প্রায় দেড় লক্ষ সুশিক্ষিত সৈন্য যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া রহিল এবং নিজামের আমন্ত্রণে ও পরামর্শ-অনুসারে গুজরাটের নবাব সরবুলন্দ খাঁ পঞ্চাশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া বন্যার ন্যায় বেগে পেশোয়ার পৃষ্ঠদেশ আক্রমণ করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছিলেন। নিজামের দৃঢ় সংকল্প, যে মুহূর্ত্তে নবাব সরবুলন্দ খাঁর সৈন্যদল পেশোয়ার পৃষ্ঠদেশে আপতিত হইবে, তাহার পরমুহূর্ত্তেই দেড় লক্ষ সৈন্য লইয়া সিংহবিক্রমে নিজাম পেশোয়ার সৈন্যদলকে আক্রমণ করিবেন; এই যুগপৎ আক্রমণে পেশোয়ার ধ্বংস অনিবার্য্য!

কিন্তু পেশোয়া বাজীরাওয়ের লক্ষ্য কেবল নিজামের উপরই নিবদ্ধ ছিল না,—আওরাঙ্গাবাদের শিবিরে বসিয়া তিনি সকল দিকেই লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। গুজরাটের নবাবকে নিজামের আহ্বান-কাহিনী তাঁহার অবিদিত রহিল না; চতুর নিজামকে প্রতারিত করিবার জন্য তিনিও এক চমৎকার চাল চালিয়া বসিলেন। পেশোয়া তাঁহার বহুদূরব্যাপী শিবিরের সমস্ত ঠাট-ঠমক বজায় রাখিয়া—তাঁহার বিশ্বস্ত সেনানী মলহররাও হোলকারের নেতৃত্বে কয়েক সহস্র মাত্র সৈন্য রাখিয়া, নিজামের চক্ষে ধূলি দান করিয়া—অতি সন্তর্পণে ও গোপনভাবে গুজরাটে ধাবিত হইলেন এবং ইরম্মদবেগে গুজরাট আক্রমণ পূর্ব্বক নবাব সরবুলন্দ খাঁর সৈন্যদলকে

বিধ্বস্ত ও গুজরাট অধিকৃত করিলেন এবং তাঁহার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই সেনানী মলহররাও পেশোয়ার নামে ঘোষণাবাণী প্রচার করিলেন যে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পেশোয়া বাজীরাও নিজামের মহাসমৃদ্ধ নগরী বুরহানপুর লুণ্ঠন করিবেন। তখন নিজাম সমস্ত সৈন্যদল লইয়া বুরহানপুর রক্ষা করিতে ধাবিত হইলেন। সেই অবসরে মলহররাও হোলকার আওরাঙ্গাবাদের শিবির খুলিয়া গুজরাটে গিয়া পেশোয়ার সহিত যোগদান করিলেন।

প্রতারিত নিজাম, পেশোয়ার প্রতারণা এবং গুজরাটের পতনের পরিচয় পাইয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। পেশোয়া যখন গুজরাটে শাসন-পদ্ধতি সংস্থাপনে ব্যাপৃত, নিজাম তখন তাঁহার সমুদয় সৈন্যদল লইয়া পেশোয়ার প্রতিষ্ঠিত পুণা নগরী আক্রমণ করিবার জন্য ধাবিত হইলেন। কিন্তু পেশোয়া বাজীরাও সুদূর গুজরাট হইতেই নিজামের গতিবিধির লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন।

গোদাবরী-তীরে নিজামের নেতৃত্বে দেড় লক্ষ সৈন্য সমবেত হইল। গোদাবরীর পর পারেই পেশোয়ার পুণা। নিজামের আদেশে সমগ্র নিজামী সেনা সেই রাত্রিটুকু নদীতীরে—পালখেড়ের প্রান্তরে বিশ্রাম করিতে লাগিল। নিজামের শিবিরে নর্ত্তকীবৃন্দের নৃত্য-গীত চলিতে লাগিল। গভীর রাত্রে যামিনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া পেশোয়ার দিগ্বিজয়ী সৈন্যদল আচম্বিতে নিজামী সৈন্যদলকে আক্রমণ করিলেন। নিজামের শিবির ও সমগ্র নিজামী বাহিনী পেশোয়া সৈন্য কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইল; নিজামী সৈন্যগণও মহাবিক্রমে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, উভয়পক্ষে তুমুল সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। দ্বাদশ ঘণ্টাব্যাপী ভীষণ যুদ্ধের পর নিজামী সৈন্যদল পরাস্ত হইয়া আত্মসমর্পণ করিল, মহাবল মহাদর্পী মহাকৌশলী নিজাম, মালবেশ্বর গিরিধর, কোহ্লাপুরাধিপতি শম্ভুজী সকলকেই পেশোয়ার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে হইল। কিন্তু উদার পেশোয়া প্রগাঢ় শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন, ছত্রপতি শাহুর প্রভুত্ব স্বীকার এবং চৌথ প্রদানে সম্মত করাইয়া পেশোয়া বাজীরাও তাঁহাদিগকে সসম্মানে মুক্তিদান করিলেন। কিন্তু নিজাম এ অঙ্গীকার পালন করেন নাই; তাহার ফলে পেশোয়ার সহিত তাঁহার পুনর্ব্বার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। সে কথা আমরা প্রবন্ধান্তরে উল্লেখ করিব।

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

—

অনন্ত দাসের অপ্রকাশিত পদাবলী।

তপনে তাপিত পথ চরণ তাপই।
মন যায় বিথাইয়ে হৃদয় বিছাই ॥
ধবলী সাধন করি ধরণী হইব।
মনঃ প্রাণ ইন্দ্রিয়গণ সজ্জাদি করিব ॥
কহ গো ললিতা সখি করি কি উপায়।
কৃষ্ণদুঃখ সওঁরিয়ে হৃদয় সুখায় ॥
ললিতা কহয়ে যেই জগতের সুখ।
সুখময় তনু যাঁর তার কি বা দুঃখ ॥
কৃষ্ণপদ সুধা পশি ক্ষিতি তাপ হরে।
দরশে শীতল হয় কোটি দিবাকরে ॥
কোটি গোপাঙ্গনা যাঁর পাদুকা হইয়া।
পদতলে অনন্ত রয়েছে ভুলিয়া ॥

২

বঁধুয়ার গুণ শুনি, সুখী হয়ে কমলিনী,
ললিতারে দেন আলিঙ্গন।
তুহুঁ সে আমার সখী, আয় গো হৃদয়ে রাখি,
তুহুঁ জান বঁধুয়া মরম ॥
ললিতা কহয়ে ধনি, আমি দাসী কিবা জানি,
যাঁর রূপে ভুলাইল তোমা।
এই মোরা ভাগ্য বাসি, করেছ চরণ-দাসী
দোষের সমূহ করি ক্ষমা ॥
কাঁদি রাই বলে তবে, বঁধুরে মিলাতে হবে,
ললিতা কহয়ে যুক্তি কথা।
শাশুড়ীর কাছে গিয়া, কান্দি কান্দি কহ ইহা,
অনন্ত চলিল তব সাথা ॥

৩

কান্দি কান্দি রাই, নিজ ঘরে যাই,
জটিলা দেখিয়ে তা।
মুখানি মুছায়ে, কহে ক্রোড়ে লয়ে,
কেন কান্দিয়াছ মা॥
স্বপনে দেখেছি পতি অকুশল,
মনে কিছু সুখ নাই।
কহয়ে জটিলা হইয়ে বিকলা,
সূর্য্য আরাধহ যাই॥
কহয়ে কুটিলা, জান কত ছলা,
মিলিতে মাধব সাথ।
অসতী হইলি, কুলে কালি দিলি,
শুনি ধনী কহে বাত॥
হওনা ননদী, বাদ কি বিবাদী,
বলিলে বলিতে হয়।
যদি সতী হতে, দেশে না রাখিতে,
কি গরবে এত কও॥
ছিদ্র কুম্ভ জলে, আনিবারে গেলে,
সে কথা কি মনে হয়?
অনন্ত উত্তর, খুঁড়িয়ে ডাগর,
হলে কি ডাগর হয়॥

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

কবি ধোয়ী।

মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সভায় ধোয়ী নামে এক প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। ধোয়ী কবিত্বশক্তির জন্য কবিত্বপতি অর্থাৎ কবিরাজ উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি কাশ্যপ-গোত্রীয় পালধি-গ্রামীণ ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধ। কবি 'পবন দুত' নামক কাব্য রচনা করিয়া খ্যাতি লাভ করেন।

ধোয়ী-রচিত 'পবনদুত' গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয়—একবার মহারাজ লক্ষ্মণসেন দিগ্বিজয় করিতে গিয়া ভারতের দক্ষিণাংশে মলয় পর্ব্বতে উপস্থিত হন, তাঁহাকে দর্শন করিয়া কুবলয়নাম্নী গন্ধর্ব্বকন্যা কুসুমশরে হতজ্ঞানা হন। তখন তিনি পবনকে সন্দেশবহ-পদে নিযুক্ত করিয়া লক্ষ্মণসেনের নিকট পাঠাইতেছেন ও গমনপথ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন। মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূত' গ্রন্থের যক্ষও মেঘকে পথ বলিয়া দিয়াছিল। সে পথের বর্ণনা অতি মনোহর—সংস্কৃত ভাষায় অতুলনীয়। যেন মহাকবি রামগিরি হইতে কৈলাস পর্য্যন্ত সমুদয় স্থান স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন—এইরূপ বর্ণনা। কিন্তু ধোয়ী কবির বর্ণনা পাঠ করিলে বোধ হয়, তিনি স্বচক্ষে গন্তব্য পথ দর্শন করেন নাই।

কবির গ্রন্থ পবনদূতে সুহ্মের বর্ণনা আছে। ঐতিহাসিকেরা বলেন, দক্ষিণ রাঢ়ের প্রাচীন নাম সুহ্ম। প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বা তমলুক প্রাচীন সুহ্মের অন্তর্গত ছিল। সুহ্মের পর উৎকল দেশ। কবির বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায়, তৎকালে তাম্রলিপ্ত নগরী সুহ্মের রাজধানী ছিল। সুহ্মের পরিসর ভাগ গঙ্গাতরঙ্গ-বিধৌত ছিল। সে দেশ বড় সুন্দর। সেখানে সেনবংশের ইষ্টদেব মুরারিদেব রাজ্যে অভিষিক্ত, তিনি সুহ্মেই থাকেন। কিন্তু কোন্ নগরে মুরারিদেবের মন্দির ছিল, জানা যায় না। কেহ কেহ বলেন, কাশীপুরীতে (বর্ত্তমান কাশীয়াড়ি নামক স্থানে) মুরারিদেবের মন্দির ছিল।

ইহার পর গৌড়দেশের বর্ণনা। লিখিত আছে, সেখানে মহাদেবের নগর শ্বেত অট্টালিকাশ্রেণীতে কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় শোভমান। সেখানে গঙ্গা-নদীর তীরে অর্দ্ধগৌরীশ্বর মূর্ত্তি বিরাজমান। মহাদেবের স্থান হইতে পবিত্র-তোয়া ভাগীরথী নাতিদূরস্থিতা। কিন্তু ইহার মধ্যে বৃহৎ বাঁধ আছে, তাহা

মহারাজ বল্লালের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। তথায় জাহ্নবী উত্তাল-তরঙ্গমালা-সঙ্কুলা। দ্বিজকন্যাগণ যমুনায় জলক্রীড়া করিতে আসিলে, তাঁহাদের স্তনস্থিত মৃগমদ, তরঙ্গ-বিধৌত হইয়া যমুনার জল আরও অধিক কৃষ্ণবর্ণ করিয়া দেয় ইত্যাদি। এই বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায়, ইহা গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলনক্ষেত্র ত্রিবেণীর বর্ণনা। সেনরাজগণের সময় ত্রিবেণী অতি সমৃদ্ধিসম্পন্ন প্রকাণ্ড নগর ছিল।

ত্রিবেণী হইতে আরও উত্তর দিকে গিয়া লক্ষ্মণসেনের রাজধানী বিজয়-পুরের বর্ণনা আছে। গন্ধর্ব্বদুহিতা কুবলয়বতী পবনকে বলিতেছেন—"বিজয়পুরে প্রকাণ্ড ছাউনি দেখিবে। তথায় অট্টালিকার শীর্ষদেশে পরম রমণীয় গৃহ, তাহার ভিত্তিগাত্র চিত্রবিচিত্র নানাবিধ পুত্তলিকা-শোভিত। সে স্থান অতি পবিত্র। তথায় মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সপ্তমহল প্রকাণ্ড প্রাসাদ। তন্মধ্যে এক প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা। রাজধানীর প্রকাণ্ড রাজবর্ত্ম-সমূহ বারবিলাসিনীগণের মঞ্জীর-নিক্কণে চমকিত;—নিশীথে স্বেচ্ছাবিহারিণী অভিসারিকাগণের অব্যাহতগতিতে মুখরিত;—প্রেমলিপ্সু কামিনীকুলের প্রেমালাপে সমস্ত বিভাবরী উদ্‌ভ্রান্ত।" যে নগরী এরূপ বিলাস-স্রোতে সদা ভাসমান, তাহার অধিপতি যে নিতান্ত বিলাসী ও অকর্ম্মণ্য হইবেন, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কবি ধোয়ী লিখিয়াছেন, বিজয়পুরে লক্ষ্মণসেনের নূতন রাজ্যাভিষেক হইয়াছে। ইহা হইতে জানা যায়, গৌড়ে লক্ষ্মণসেনের রাজ্যা-ভিষেক হয় নাই, তিনি সর্ব্বদা গৌড়ে থাকিতেন না। তিনি পিতার ন্যায় রাজনীতিজ্ঞও ছিলেন না। তাহা হইলে তিনি গৌড় ত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে রাজধানী স্থাপন করিতেন না।

কবি ধোয়ী কাব্য লিখিয়া রাজার নিকট হইতে 'কবিরাজ' উপাধি এবং হস্তী ও সুবর্ণচামরাদি লাভ করেন। গঙ্গাতীরে তাঁহার বাস ছিল, কিন্তু গঙ্গাতীরবর্ত্তী কোন্ নগরে, তাহা জানিবার উপায় নাই। তাঁহার কোন বস্তুর অভাব ছিল না। কবির প্রার্থনা—নারায়ণে যেন তাঁহার সর্ব্বদা অচলা ভক্তি থাকে।

পবনদূত গ্রন্থ ১০৪টী কবিতায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। আমরা যে আদর্শপুথি অবলম্বনে এই বৃত্তান্তটী লিপিবদ্ধ করিলাম, সেই পুথিখানি শকাব্দা ১৬৪০, সন ১০২৪ সনের হস্তলিপি।

এক্ষণে আমরা গ্রন্থের শেষ ভাগ হইতে একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া

পাঠকবর্গকে উপহার প্রদান করতঃ প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম যথা,—

"সন্তি ব্যূহং কনকলতিকাং চামরং হৈমদণ্ডং
যো গৌড়েন্দ্রাদলভত কবিঃ ক্ষ্মাভৃতাং চক্রবর্ত্তী।
শ্রীধোয়ীকঃ সকলরসিকপ্রীতি-হেতোর্মনস্বী
কাব্যং সারস্বতমিব মহামন্ত্রমেতজ্জগাদ॥"

পবনদূত ১০১ শ্লোক।

শ্রীরজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ।

কোন দোষে।

কে বলিবে কোন দোষে কোন অপরাধে,
অমন সোণার লতা ধূলায় লুটায়।
বাসনা মরম মাঝে ফুকারিয়া কাঁদে,
আশা ভালবাসা দোঁহে করে হায় হায়!
সকলি ত আছে তার তবু কিছু নাই;—
ফুরায়ে গিয়াছে সব কোন অভিশাপে!
বিশ্বের সকল সাধে পড়িয়াছে ছাই,
ভবিষ্যৎ পুড়ে ক্ষার যেন কোন পাপে!
অভিশপ্ত অনুতপ্ত এ ছার জীবন,
এমনি কি কেটে যাবে, মিটিবে না আশ?
বাঞ্ছিতে পাব না ফিরে, হবে না মিলন?
অতৃপ্ত হৃদয়ে রবে অতৃপ্ত পিয়াস!
হে ধরা! তোমার বুকে এত স্নেহ ভরা,
পার না মুছাতে তুমি এই অশ্রু-ধারা।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুহ।

দেহান্তে।

(গল্প)

জায়গীরদার-পুত্র, চতুর্দ্দশবর্ষীয় রাজপুতবালক কুমারসিংহ, আপন অম্বর-স্থিত অট্টালিকা-সন্নিধানে, ক্ষুদ্রতোয়া তটিনীসন্নিহিত পুষ্পোদ্যানে ক্রীড়ারত। মস্তকোপরে সুনীল অম্বরপ্রান্তে জ্যোৎস্নাপূর্ণ হাস্য দীপ্ত চন্দ্রমা! সম্মুখে কুমুদিনী প্রস্ফুটিতা, গোলাপপরিমলে উদ্যান আমোদিত। এমন সময় কুমারের নবপরিণীতা মনোরমা লাল চেলী পরা বধূরূপিণী বালিকা আসিয়া তাঁহার খেলায় যোগদান করিতে লাগিল।

কুমার একবার আপন নববধূর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি দেখিলেন,—মনোরমা নিরুপমা, সুষমা-পরিব্যাপ্ত লাবণ্য প্রতিমা, চঞ্চলা বালিকা যেন সৌন্দর্য্যের রাণী। তাহার নয়ন দুটী বড়ই উজ্জ্বল। নিমিষের মধ্যে সে চিত্র কুমারের অজানিতভাবে তাঁহার হৃদয়পটে অঙ্কিত হইয়া গেল। মনোরমা চঞ্চল পদবিক্ষেপে সম্মুখস্থিত গোলাপবৃক্ষরাজির এক বৃক্ষ হইতে, এক বৃন্তে দুটী সদ্যঃ-বিকশিত পুষ্প আনিয়া আপন নবপতির হস্তে প্রদান করিল, এবং সুধামাখা হাসিমুখে কহিল, "পাহাড়েও গোলাপ কেমন সুন্দর ফুটে রয়েছে"।

কুমার বাল-স্বভাবসুলভ ঈষৎ হাসি হাসিয়া হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিলেন।

আহা, বালক-বালিকার প্রেম কি মধুর, কি উজ্জ্বল! স্বার্থহীন উদ্দেশ্য-হীন, লজ্জা নাই আবেশ নাই। দূর হইতে কুমারের পিতা দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন, উভয়ের মঙ্গল কামনায় ঈশ্বরোদ্দেশে করযোড় করিলেন।

দেখিতে দেখিতে কুমারের বিবাহোৎসব থামিয়া গিয়াছে। নববধূ মনোরমা নিজ পিত্রালয়, জয়পুরান্তঃপাতী সুশীলপুর গ্রামে চলিয়া গিয়াছে,—আর কোন গোলযোগ নাই। বাটী পূর্ব্বের ন্যায় শান্ত ভাব ধারণ করিয়াছে।

অকস্মাৎ একদিন কুমারের পিতা ভৈরবসিংহ অত্যন্ত জ্বরাক্রান্ত হইলেন। বিমর্ষ পুত্র তাঁহার নিকট দণ্ডায়মান। পিতা ডাকিলেন, "কুমার, বাবা বংশধর আমার!"

আর্দ্রস্বরে কুমার কহিলেন, কি বাবা? পিতা কহিলেন, "বৎস, আমার একটী অন্তিমের কঠোর আদেশ পালন করিতে হইবে, তুমি তাহা পালন করিতে পারিবে কি?"

কুমার কহিলেন, "পিতা, এমন কি কঠিন আদেশ আছে, যে আপনার এ বালকপুত্র পালনে অসমর্থ বলিয়া বিবেচনা করেন।"

পিতা কহিলেন, "আদেশ কঠিন—ভয়ানকই, তথাপিও আমার মনে হয়, তুমি এখন নিতান্ত বালক। যাহা হউক, জীবনাধিক পুত্র আমার, তোমার ঐ শান্ত স্নিগ্ধ মুখখানি দেখিয়া, তোমায় তীক্ষ্ণবুদ্ধি, ধর্ম্মবিবেচক মেধাবী দেখিয়া আশা হয়, তুমি এ আদেশ পালনে অসমর্থ হইবে না। বৎস, তুমি যদি হৃদয়ে বিন্দুমাত্র রাজপুতবীর্য্যের শোণিত ধারণ করিয়া থাক; সত্য পালন অবশ্য করিবে।"

কুমার কহিলেন, "পিতঃ! যতই নিদারুণ 'আজ্ঞা' হউক না কেন, প্রতিজ্ঞা করিলাম, প্রাণপাত করিতে হয়; তাও করিতে প্রস্তুত আছি।" হায় কুমার, পিতৃপ্রীতি হেতু কি করিলে! এক বহ্নিতে দুইটী হৃদয় আজীবন দগ্ধ বিদগ্ধ হইবে যে!

পিতা কহিলেন, "বাবা জীবনধন, মৃত্যুকালেও তোমার কথাগুলি স্মরণে মনে হয়, সুখে শান্তিতে মরিতে পারিব। যদিও একটী নিরপরাধিনী বালিকার কথা ভাবিয়া বক্ষ বিদীর্ণ হইতেছে; কিন্তু হায়! ভগবানের খেলা কেহ বুঝিতে পারে না—নিয়তি অপরিহার্য্য। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, ভৈরবসিংহ পুনরায় কহিতে লাগিলেন, "নিদারুণ আদেশ শুন—গত রজনীতে নিদ্রিত কালে স্বপ্নে দেখিলাম, একটী সৌম্য, শান্ত, স্থিরমূর্ত্তি, দেবাদিদেবের ন্যায় আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান! তাঁহার ত্রিনয়ন হইতে জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে। তিনি আমায় গম্ভীর স্বরে বলিলেন, 'বৎস, তোমার পুত্রবধূ মনোরমাকে তোমার গৃহে আর কখনও আনিও না, তাহার স্পর্শে তোমার পুত্রের, তোমার বংশের সর্ব্বনাশ হইবে। একবার আগমনেই তোমার মৃত্যু সন্নিকট।' নিদ্রাভঙ্গে দারুণ কথা ভাবিয়া চিন্তিয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইতেছি। না না, চিন্তায় ক্লান্ত হইতে না হইতেই দেহ অবসন্ন হইয়া আসিল, ক্রমে জ্বর আসিতেছে, উত্তাপও বাড়িতেছে; খুব সম্ভব আমার অন্তিমকাল আগতপ্রায়,—অতএব দেখিও বাবা, আমার নিকট সত্য অঙ্গীকার যাহা করিয়াছ, তাহার অবহেলা করিও না।"

সহসা বালকের হৃদয়-মাঝে কি এক তীব্র ঝটিকা উঠিল, চকিতের মত সে দেখিতে পাইল—হৃদয়ে কাহার বড় বড় চক্ষু! তৎক্ষণাৎ সংযত হইয়া বালক দৃঢ়স্বরে কহিল, "আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য, যেদিন ইহা ভঙ্গ করিব, সেদিন ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিব।

পুত্রের বাক্যে পিতার প্রাণ শীতল হইল, জরাভিভূত নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিয়া কহিলেন, "রাজরাজেশ্বর হ'ও আশীর্ব্বাদ করি, অন্য বিবাহ করিয়া সুখী হ'ও।" কুমার নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

পুত্রের প্রতি পিতার "আদেশ" গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পৌঁছাইল; অভাগিনী মনোরমাও যে শুনিল না, তাহা নহে। কিন্তু তখন সে অনাঘ্রাত কলিকা,—অবুঝ বালিকা বুঝিল না যে, শ্বশুরভবন হইতে তাহার চির-নির্ব্বাসন হইল।

ক্রমে ভৈরবসিংহের জ্বর ঘোর বিকারে দাঁড়াইল। বিকার অবস্থায় প্রলাপ বাক্যেও ঐ কথা, মনোরমাকে ছুঁয়ো না, এন না ইত্যাদি। সপ্তম দিবসে ক্ষণেকের জন্য তাঁহার যেন বেশ চৈতন্যোদয় হইল। কুমারকে নিজের নিকটে বসাইয়া তাহার দক্ষিণ হস্ত নিজ বক্ষোপরি স্থাপিত করিলেন, দুই নয়ন বহিয়া অজস্র অশ্রু-সলিলে উপাধান সিক্ত হইল। কুমারও প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারিলেন না, বালকের দুই গণ্ড বহিয়া অবারিত অশ্রু ভূচুম্বন করিতে লাগিল।

কিঞ্চিৎ পরে পিতা পুত্রকে কহিলেন, "আমার আদেশ ভুলিবে না ত কুমার?" কুমার কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন—'না'।

ক্রমেই তাঁহার আসন্নকালের অবস্থাসকল পরিলক্ষিত হইল। শোকাভি-ভূত, বিষণ্ণ কাতর ম্লান মাতা-পুত্র পার্শ্বে উপবিষ্ট! ভৈরবসিংহ নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া, অনন্তধামে লীন হইলেন।

* * * * *

দেখিতে দেখিতে মনোরমার দুঃখময় বিবাহিত জীবনের নয় বৎসর অতীত হইতে চলিল! কতশত ভীষণ ঝটিকা তাহার হৃদয় দলিত করে, কত বিষাদ-নিশ্বাস নৈশ বায়ুতে মিশায়, কত নৈরাশ অশ্রু বিজনশয্যা মিশায়। এখন সে নিজের অবস্থা সমস্ত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, অভাগিনীর কত সময় স্বামি-গৃহে যাইবার বাসনা জাগে, কিন্তু সহসা তাহার গমনে পরশনে পতির অমঙ্গল হইবে, শ্বশুর-আদেশ স্মরণে বালিকা-হৃদয় কাঁপিয়া উঠে! সতী বুকের ব্যথা বুকে চাপিয়া পতির মঙ্গল কামনায় দিবানিশি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে, কিন্তু পতির মূর্ত্তি তাহার মনে আসে আসে, আসে না।

বৈশাখান্তে নিদাঘে উত্তপ্ত হৃদয় জুড়াইবার সুন্দর সময়, সূর্য্যদেবের প্রচণ্ড উত্তাপ নির্ব্বাণ হইয়াছে, সন্ধ্যা-গগনে দুই একটী সান্ধ্য তারা প্রকাশিত;

দেখিতে দেখিতে অসংখ্য নক্ষত্রখচিত সুনীল অম্বর-প্রান্তে শুক্লপক্ষের চতুর্থীর চন্দ্রমা নিরাশ হৃদয়ের ক্ষীণ আশার মত, মলিন জ্যোৎস্না' বিকীর্ণ করিয়াও করিতে পারিতেছে না। অমানিশা নদী-বক্ষ ঈষৎ উজ্জ্বল করিয়া চাঁদের জ্যোৎস্না মনোরমার মলিন মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। বালিকা-হৃদয় অদৃষ্ট-চিন্তায় মগ্ন। দুর্ভাগিনী সময় পাইলেই প্রায়ই এমন সময় এখানে আসিয়া বসিত, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিতে সে বড় ভাল বাসিত। তটিনী-দুকূল তৃণাচ্ছাদিত, আম্রকানন নব-মুকুল-সমাচ্ছন্ন, পাতায় শাখায় সন্নিবিষ্ট নানা রকমের পাখীর মধুর গানের কি এক মদিরতায় তাহার কর্ণ কুহর ভরিয়া যাইত। সে মুগ্ধ নেত্রে নৈসর্গিক শোভা দেখিয়া আত্ম-হারা হইত, আত্মহারা হৃদয়ের চমক ভাঙ্গিলে বিশ্বের সৌন্দর্য্য মুছিয়া যাইত।

চতুর্থীর চাঁদ যেমন জ্যোৎস্না বিকীর্ণ করিয়াও করিতে পারিতেছে না, মনোরমা সেইরূপ তাহার 'অতীত স্মৃতি' বাল্য বিবাহের নাথ-সম্মিলন স্মরণ করিয়াও করিতে পারিতেছিল না। নিভৃত মরম-যাতনায় তাহার হৃদয় অলোড়িত হইয়া উঠিল। আপনা আপনি হৃদয় ভেদিয়া এই বাক্যগুলি উত্থিত হইল—"হে পরমেশ্বর, হৃদয়ে কি যাতনা, প্রাণে কি কষ্ট, উঃ! কতদিনে ইহার শেষ হইবে, দয়াময়! আমার জীবনেই বা কি প্রয়োজন"!

অদূরে একটী বিংশবর্ষীয় যুবক দণ্ডায়মান। তাঁহার প্রশান্ত বদন, মুখমণ্ডল চিন্তারেখাঙ্কিত, প্রশস্ত ললাট সঙ্কুচিত। তিনি দেখিলেন, মনোরমা এখন ফুটন্ত-প্রায় কলিকা, কিন্তু তাহার অবস্থা ও বাক্যাবলী দেখিয়া শুনিয়া যুবকের বক্ষ বিদীর্ণ হইতে লাগিল, মুহূর্ত্তের জন্য যুবক আত্ম-বিস্মৃত হইলেন। মর্ম্মভেদী যাতনায় তাঁহার হৃদয় অবশ হইল। ইচ্ছা হইল, একবার হৃদয়েশ্বরীকে হৃদয়ে রাখিয়া হৃদয় জুড়াই। বলা বাহুল্য, যুবক আমাদের পরিচিত কুমারসিংহ। মনোরমাকে হৃদয়ে রাখিবার বাসনা তাঁহার তৎক্ষণাৎ লীন হইয়া গেল, পিতার মৃত্যুকালীন কঠোর আদেশ শ্মশানেও তাঁহার কর্ণে সর্ব্বদা প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, মনোরমাকে ছুঁয়ো না, এন না। সেই শ্মশানের ভীষণ দৃশ্য, চিতার নৈরাশ্যজনক ধূ ধূ শব্দ, হৃদয় যাহা বিস্মৃত হইতে পারে নাই, আরো দ্বিগুণ বেগে বুকের মাঝে জ্বলিয়া উঠিল, তাঁহার চারিদিক শ্মশানময় বোধ হইতে লাগিল। পরে ভাবিলেন, আত্ম পরিচয় না দিয়া দূর হইতে বাক্যালাপে দোষই বা কি? তিনি বলিলেন, বালিকা তোমার জীবনে কি কোনই প্রয়োজন নাই? দয়াময় পরমেশ্বরের কার্য্য কর, কর্ম্মই মানব-জীবনের শান্তি, 'প্রীতি,

স্নেহ, ভালবাসা' দিয়া জগৎজনকে রমণীগণ স্নিগ্ধ করিয়া রাখে,- ইহা মহাত্মারা বলেন—তাহা কি তুমি জান না বালিকে ? তুমি যে এখনও অফুটন্ত ফুল !

হঠাৎ কথা শুনিয়া মনোরমা চমকিত নয়নে চাহিল, সম্মুখে যুবক দেখিয়া তাহার আপাদমস্তক কে জানে কোন্ অজানিত স্মৃতিতে কাঁপিয়া উঠিল, তাহা সে বুঝিল না। কুমার পুনরায় তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন ; দেখিলেন—মনোরমা অবনত বদনে নিরুত্তরা, কিন্তু তাহার নীরবতাই সকল কথা যেন বুঝাইয়া দিল। কুমার আর মুহূর্ত্তেক সময়ও অপেক্ষা করিলেন না, কঠোর কর্ত্তব্য স্মরণ করিয়া বুক ভরা ব্যথা লইয়া প্রস্থান করিলেন। মনোরমা যখন মস্তকোত্তোলন করিল, দেখিল,—সেই চিরপরিচিত দিগন্ত-প্রসারিত রাজপুতানার বালুকাময় প্রান্তর মধ্য দিয়া, বেলাভূমি চুম্বন করিয়া পর্ব্বত-নির্ঝরিণী অমানিশা বক্রভাবে বহিয়া যাইতেছে ; ম্লান জ্যোৎস্না নিবিল, জগৎ অন্ধকারময় হইল, পিছনে আঁধার—চতুর্দ্দিক আঁধার ! সে দেখিল, তাহার হৃদয়ও অনন্ত আঁধার।

কিছু দিবস পরে আর একবার মনোরমার করুণ ম্লান মূরতি দেখিবার জন্য প্রাণের প্রবল আবেগে কুমার দেখিতে আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার বক্ষ ফাটিয়া শোণিতধারা বাহির হইবার উপক্রম হইল। বিমাতার কঠোর দুর্ব্বাক্য প্রায়ই অভাগিনীর উপর বর্ষিত হইত। অদ্য তাঁহার নির্দ্দয় বাক্য-যন্ত্রণা বজ্রসম প্রাণে বাজিয়াছে, তাই সে দুর্ব্বিহনীয় ক্লেশে কাতর প্রাণে, আপন জুড়াইবার স্থানে গিয়া বসিল ; তীব্র যাতনার মর্ম্মভেদী উচ্ছ্বাসে আকাশপানে উর্দ্ধমুখে আর্দ্রনয়নে চাহিয়া দুই জানু পাতিয়া বসিয়া বলিতে লাগিল, "স্বর্গ-বাসিনী জননী আমার, তোমার চরণতলে আশ্রয় দেও মা তোমার স্নেহ জানি না, জানি না মা স্বামী কেমন, কোন সুদূর অস্মরণীয় স্মৃতি হৃদয় আলোড়িত করিতেছে, কবে তোমার স্নেহময় ক্রোড়ে শান্তি পাব মা ?" তাহার দুই গণ্ড বহিয়া অবারিত অশ্রুবারি পড়িতে লাগিল।

এ দৃশ্য দর্শনে ব্যথিতহৃদয়ে নির্ব্বাক, নিস্পন্দ কুমার দাঁড়াইয়া আছেন। নির্ম্মল জ্যোৎস্নালোকে মনোরমা দেখিল, কিঞ্চিৎ ব্যবধানে সেই যুবক উপস্থিত, চারিচক্ষু সম্মিলনে উভয়ে নত ! অব্যক্ত বেদনা বুকে চাপিয়া মৃদুস্বরে কুমার বলিলেন, "তোমার হৃদয় বড়ই অশান্তিপূর্ণ, চিত্ত সংযম কর, তলহীন সীমা-শূন্য সমুদ্র-রূপ ভীষণ সংসার-স্রোতে আমরা ভাসিয়া বেড়াইতেছি, কূল কিনারা পাইতেছি না।"

মনোরমার রুদ্ধ যাতনা তাঁহার বাক্য শ্রবণে দ্বিগুণ উথলিয়া উঠিল। প্রকৃত ব্যথার ব্যথী পাইলে এইরূপই হয়। সে বলিল, "আপনি কে তাহা জানি না, কিন্তু পরদুঃখে যাহার হৃদয় কাঁদে, সে দেবতা! অসহায়া অভাগিনীর জন্য আপনি কেন দুঃখ পা'ন"। যুবক বলিলেন, আমিও বড় অভাগা, দেবতা নহে, আমি ভিখারী। এই কথায় মনোরমার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল, সে ব্যথিতচিত্তে বলিল,—শূন্য হৃদয়ে শান্তি কি পাব না!"

যুবক বলিলেন, "শূন্য হৃদয় ঐশ্বরিক প্রেমে পূর্ণ কর, প্রতিদানের আশা না রাখিয়া নিঃস্বার্থ ভাবে সর্ব্বজীবের সেবা কর, আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন হবে,—শান্তিও পাইবে।" কুমার এই বলিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য স্মরণ করিয়া,—একবার প্রাণ ভরিয়া আপনার আরাধ্য দেবী দর্শন করিয়া চলিয়া গেলেন।

মনোরমা বহুক্ষণ যুবকের কথাগুলি ভাবিতে ভাবিতে সহসা তাহার মনের ভাব পরিবর্ত্তন হইল। মানুষের এমনই এক ক্ষুদ্র কথায় কত পরিবর্ত্তন হয়; যুক্ত কর, মুক্ত কেশ, আর্দ্র নয়নে সে শ্রীভগবান্‌কে প্রাণ ভরিয়া ডাকিল, তাঁহার ধ্যান করিতে লাগিল। আহা, এ সময় সে দৃশ্য কি সুন্দর! যেন উমা হর-ধ্যানে মগ্না! ধ্যানে দেখিল—সেই যুবক, তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে অনৈসর্গিক জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে, সুন্দর বদনমণ্ডল শান্ত পূর্ণ। কুমারী আঁখি উন্মীলন করিয়া ভাবিল এ কি! তাহার মনের মধ্যে কেমন একটা ধাঁ ধাঁ লাগিয়া গেল।—আকাশে, ভূতলে, পর্ব্বতে, নির্ঝরিণীতে যে দিকে তাকায়, তাঁহারই প্রতিমা দেখিতে পাইতে লাগিল। সে ব্যথিত চিত্তে গৃহে আসিল; কিন্তু মুখের ভাবে কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না। মনোরমা বেশ মন দিয়া কায কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল। তাহার আত্মহারা হৃদয়ের মরমব্যথা কেহই জানিল না।

* * * * *

কুমারসিংহ তিন চারি বৎসর অতীত হইল, মনোরমার সহিত দেখা করিতে আর যান নাই, পাছে চিত্তদমনে অশক্ত হন, পিতৃ-আজ্ঞা ভঙ্গ হয়। কিন্তু নিদারুণ যন্ত্রণা মরমে লুকাইয়া রাখিতে অসমর্থ হওয়ায়, আর একবার দর্শনাভিলাষ তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলিল, দেহকান্তি পাণ্ডুবর্ণ হইতে লাগিল, তাঁহার সংসারের প্রতি বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। এক দিবস ঘোর চিন্তা-মগ্ন ম্রিয়মাণ কুমার আপন কক্ষে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় স্নেহের মূর্ত্তিমতী মাতা আসিয়া বলিলেন, "বাবা কুমার, তোমার

শরীর দিন দিন অত শীর্ণ দুর্ব্বল হইতেছে কেন? তোমার কি কোন অসুখ হইয়াছে বাবা।" কুমার মনের ব্যথা মনে চাপিয়া ঈষৎ হাস্যে বলিলেন, "না, মা, আমার কোন অসুখ হয় নাই।" মাতা স্নেহবিজড়িত স্বরে বলিলেন, "বাছা, তোমায় কত দিন হইতে বলিতেছি, বিয়ে থা কর, মন ভাল থাকিবে। যাহা হউক, তোমায় এই মাসেই বিয়ে করিতে হইবে, সমস্ত স্থির হইয়া গিয়াছে।" মাতার কথায় তিনি নীরব—নিরুত্তর, কিন্তু এ সংবাদ তাহার অন্তরে মর্ম্মান্তিক আঘাত করিল। মাতার প্রীতিভাজন হইতে মন কিছুতেই চাহিল না,—কিছুতেই মনোরমার স্মৃতি চিত্তপট হইতে অপসৃত হইল না। পরদিন ঊষা-আলোকে একবার তাহাকে দেখিতে চলিলেন।

মনোরমা এখন পূর্ণ যুবতী, কিন্তু পবিত্রতার মূর্ত্তিমতী ছবি! সে এখন আবেগ লালসা-ভাব সংযম করিয়াছে। তাহার একনিষ্ঠতা ও কার্য্য-পারিপাট্য দেখিয়া, বিমাতার আর তাহার প্রতি উগ্র ভাব নাই, সে এখন অসঙ্কোচে যেখানে বিপদাপদ হয়,—যায়; সে শোকার্ত্তকে প্রৌঢ়ার মত সান্ত্বনা দান করে, রোগীর পার্শ্বে সেবাশুশ্রূষায়, স্নেহময়ী জননীর ন্যায় সর্ব্বদাই উপস্থিত থাকে। তাই সে এখন সকলের প্রীতিময়ী। কুমার আসিয়া দেখিলেন, সেই বালুকাপ্রান্তর জনমানবশূন্য ধূ ধূ করিতেছে; তাঁহার প্রাণও হু হু করিতে লাগিল। তিনি তৃষিত নয়নে বহুক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া হতাশ প্রাণে উদাস মনে উপবেশন করিলেন। প্রায় দু-দণ্ড কাল পরে তাঁহার জীবন-প্রতিমা যেন জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী এইদিকেই আগমন করিতেছে, দেখিয়া হৃদয় হর্ষোৎফুল্ল হইল।

মনোরমা সম্মুখে তাঁহাকে দেখিয়া লজ্জা-বিজড়িত চরণে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে দেখিল—যুবকের নয়নদ্বয় জল ভরা, স্বভাবতঃ রমণীহৃদয় কোমল, সুতরাং এ দৃশ্যে তাহার নেত্র শুষ্ক থাকে কি করিয়া? সে ব্যথিত প্রাণে বলিল, "আপনি কাঁদছেন কেন?" কুমার আবেগ ভরে বলিলেন, "হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আমার, হৃদয়ে এস একবার, আমি তোমারই ভিখারী—তোমার হতভাগ্য স্বামী কুমার। আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিও, আমি তোমার অনুপযুক্ত, তথাপি মনোরমে, বল বল—একবার বল, আমি কখন কি তোমার প্রাণের কোণে স্থান পাইব?" তাহার ভাষা আসিল না, নচেৎ বলিত—সে তোমাতেই পূর্ণ। মনোরমা আর আপনাকে সামলাইতে পারিল না। স্বামী-দেবতার চরণ-ধারণ অভিলাষে হৃদয় তাহার উদ্বেলিত হইল, কিন্তু সহসা মনে জাগিয়া

উঠিল, তাহার স্পর্শে পতির অমঙ্গল হইবে, তাই সে দুই হস্ত পরিমিত স্থানে সরিয়া দাঁড়াইল ; ক্ষণেকের তরে স্থান-কাল বিস্মৃত হইল ? তারপর সে দুই কর যুক্ত করিল। তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল।

এ দৃশ্যে কুমার স্থির থাকিতে পারিলেন না। মুহুর্ত্তের জন্য পিতৃ-আদেশ ভুলিলেন,—প্রিয়তমার মুখচুম্বন করিলেন। করিবামাত্রই পিতার আদেশ বজ্রধ্বনি সম প্রাণে বাজিয়া উঠিল, তিনি আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না, বলিলেন, "জীবন সর্ব্বস্ব মনোরমে ? আজ তোমার ভিখারীপতি পিতৃ-আজ্ঞা ভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত করিতে জন্মশোধ চলিল। বনে—নির্জ্জনে তোমারই ধ্যানে এ জীবন কাটাইব। তোমার আলেখ্য দিবসে—নিশীথে কত শত বার দেখিয়াছি, তথাপি আঁখি অতৃপ্ত ! ব্যাকুল আবেগে দুইবার তোমার সহিত কথা কহিয়াছি। মনোরমা, আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিও।" তাহার স্পর্শে পতির অকল্যাণ হইবে স্মরণ করিয়া মনোরমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তখন সে করুণ কণ্ঠে বলিল, "নাথ, আমিই তোমার অযোগ্য দাসী, আমার অপরাধ লইও না। তোমার চরণ দেখিবার কারণ কতবার এ প্রাণ আকুল হইয়াছে, কিন্তু তোমার অকল্যাণ হইবে ভাবিয়া, সে আকুলতা দূর করিয়াছি। দেবতা এ কি করিলে, কেন দেখা দিলে ?"

কেন দেখা দিলাম, উঃ ! বড় মর্ম্মান্তিক কথা ! কিন্তু জানি না কেন আসি! এইবার আমি তাঁহার কার্য্য করিতে চলিলাম, বলিয়া কুমার দণ্ডায়মান হইলেন এবং পুনরায় বলিলেন, "তোমার শান্ত স্থির জ্যোতিঃ বড়ই মনোরম, তুমি আপন কর্ত্তব্য হারাইও না।"

মনোরমা কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "তবে আর দেখা পা'ব না" ? পাবে বৈ কি, বলিয়া কুমার একবার স্থির দৃষ্টিপাত করিলেন,—মনোরমার বড় বড় চক্ষু হইতে বড় বড় অশ্রুজল গড়াইতেছে দেখিয়া সত্য অঙ্গীকার স্মরণ করিয়া ভাবিলেন,—ভাবিলেন "আর নহে।"

মনোরমা বলিল, "কবে দেখা হ'বে।"

ভগ্ন শূন্য অন্ধকার হৃদয় লইয়া যাইবার সময় কুমার বলিয়া গেলেন, "দেহান্তে।"

শ্রীসরযূবালা ঘোষ।

এস মা !

আমার মতন ক্ষুদ্রবুদ্ধি প্রাণিবিশেষের প্রবন্ধ লিখিবার আশা করা উপহাসের বিষয়, ইহা ধ্রুব—নিশ্চিত। তবে, যাঁহার অমৃতময়ী লেখনীপ্রসূত পুস্তকাবলী পাঠ করিয়া ভারতবাসী মুগ্ধ—বিস্মিত—স্তম্ভিত! যাঁহার অলৌকিক কল্পনাপ্রসূত 'পথের আলো' আজ জনসাধারণের বাস্তবিকই পথের আলো হইয়া দাঁড়াইয়াছে! স্বীয় অনুপম প্রতিভাবলে ও রচনা-নৈপুণ্যে কাব্যজগতের আদর্শস্থানীয় সেই পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় একদা তদীয় বন্ধুবর্গের সহিত কথাচ্ছলে কয়েকটী সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করেন, ঘটনাচক্রে আমিও তথায় উপস্থিত ছিলাম। উপদিষ্ট বিষয়গুলি অর্থগৌরব এবং গভীর ভাবপূর্ণ হইলেও সুচতুর কবি এমনই প্রাঞ্জলভাষায়—এমনই সরল ভাবে সাধারণের চিত্তপটে অঙ্কিত করিয়া দিলেন যে, গাঢ় তমসাচ্ছন্ন মদীয় অন্তঃকরণেও তাহার একটুকু আলো আসিয়া পতিত হইয়াছিল। জানি না, কবির প্রকৃত ভাবগ্রহণে সমর্থ হইয়াছি কি না; তবে উহাই যে আমার প্রধান অবলম্বন, ইহা নিঃসন্দেহ। উহাই আমার মূলভিত্তি,—ক্ষেত্র। ভাগ্যফলে ক্ষেত্রটী ভালই যুটিয়াছে।

চীয়তে বালিশস্যাপি সৎক্ষেত্রপতিতা কৃষিঃ।
ন শালেঃ স্তম্ভকরিতা বপ্তুর্গুণমপেক্ষতে॥

উর্ব্বরা ভূমিতে নিতান্ত মূর্খেও বীজ বপন করিলে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া সময়ে পুষ্পফলাদি প্রদান করিয়া থাকে। কারণ, বীজ বর্দ্ধিত হইবার পক্ষে বপনকর্ত্তা মূর্খ কি বিদ্বান্, সুন্দর কি কুৎসিত—ইহার কিছুরই অপেক্ষা করে না। তাই আমার বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার আশা।

পক্ষান্তরে আত্মনিষ্ঠ ইচ্ছাই ইহার বলবৎ কারণ। মায়াময় সংসারে স্বেচ্ছায় প্রণোদিত হইয়া কে কি করিতে অগ্রসর না হয়? স্বীয় মানসিক বৃত্তিতে মত্ত হইয়া সকলেই সকল কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। জগতে গান না করে, এমন কোন লোক আছে কি? তবে সমাজে বসিয়া তান-লয়-বিশুদ্ধ গান কয় জনে করিতে পারে! তাই মনে হয়;—

যদিও না থাকে তাল-মান-জ্ঞান,
যদিও না থাকে রাগিণী বশে।
তবুও কি কেহ নাহি করে গান,
মাতিয়ে আপন মানস-রসে॥

পূর্ব্বেই বলিয়াছি জমীটুকু উর্ব্বরা, এখন বীজ বপন করা। কিন্তু সেই বীজগুলি সারবান্ কি অসার, সে বিচারে অধিকার আমাদের আদৌ নাই, সহৃদয় পাঠকবর্গই উহার একমাত্র অধিকারী। যাক্, অপ্রস্তুত বিষয় লইয়া আমরা অনেকটা দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, অথচ সত্যের অনুসরণ করিতে হইলে কথাটা না বলিয়াও পারা যায় না, তাই বাধ্য হইয়াই বলিতে হইল। এজন্য আমাদের পাঠকপাঠিকাদিগের ধৈর্য্যচ্যুতির সম্ভাবনা হইলে তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক ক্ষমা করিবেন।

দিনের পর দিন, মাসের পরে মাস, বৎসরের পরে বৎসর, যুগের পর যুগ। এইভাবে কত যুগযুগান্তর চলিয়া গিয়াছে, কত আসিতেছে। দিন যায় রাত্রি আসে, রাত্রি যায় দিন আসে, গ্রীষ্মের পর শীত, শীতাপগমে গ্রীষ্ম; ইহাই প্রকৃতি-রাজ্যের চিরন্তনী প্রথা -সাধারণ ধর্ম্ম। সুখের পরে দুঃখ, দুঃখান্তে সুখ, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। একটীমাত্র অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া চিরকাল কিছুই থাকে না; নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। জড়জগতের সমস্ত পদার্থই সুখদুঃখ-বিজড়িত। সুখের পর দুঃখ বা দুঃখান্তে সুখ পদার্থমাত্রেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। তাই আজ চরাচর বিশ্ব বিষাদক্লিষ্ট হইলেও দুর্গতিনাশিনী জগজ্জননীর আগমনে নূতনভাবে নূতন সাজে সজ্জিত, সকলেই হৃষ্ট—সকলেই পুলকিত।

এস মা বিশ্বজননি! সন্তানের পর্ণকুটীরে আগমন কর! মা দুর্গতিনাশিনি! ত্বদীয় শুভাগমনের সূচনাতেই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাব ধারণ করিয়াছে! বৃক্ষরাজি জীর্ণ শীর্ণ পুরাতন পত্রাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নবোদ্‌গত পত্রপুষ্পে সুশোভিত হইয়া, তোমারই আগমন প্রতীক্ষায় সতৃষ্ণ নয়নে পথপানে চাহিয়া আছে। ব্রততিসকল তাহাদের আশ্রয়ে থাকিয়া, কোথাও বা প্রণয়িনীর ন্যায় সাগ্রহে অঙ্গ জড়াইয়া ধরিয়া তাহাদিগকে আরও শোভাসম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছে। কলকণ্ঠ স্বীয় মধুময় কুহু রবে জগৎ মাতাইয়া তোমারই আগমন ঘোষণা করিতেছে। প্রিয় সহচর বসন্তের সহিত সুগন্ধ গন্ধবহ জগতের পদার্থ-মাত্রকেই ঘাটে পথে মাঠে সর্ব্বত্র তোমারই শুভাগমনের সংবাদটা বলিয়া দিতেছে। বিদ্বান্ মূর্খ, ধনী দরিদ্র, উত্তম অধম, আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেই আজ নূতন ভাবে নূতন সাজে সাজিয়া, সারা বৎসরের চেষ্টার ফলে তোমারই ঐ কোকনদতুল্য রাঙা পা দুখানি পূজা করিবার আশায়, কায়মনোবাক্যে দিবা-নিশি তোমাকেই মা ডাকিতেছে। সকলেই ভাবিতেছে – সকলেরই বিশ্বাস—

সিতাষ্টম্যাস্তু চৈত্রস্য পুষ্পৈস্তৎকালসম্ভবৈঃ।
অশোকৈরপি যঃ কুর্য্যাৎ মন্ত্রেণানেন পূজনম্।
নতস্য জায়তে শোকো রোগো বাপ্যথ দুর্গতিঃ॥ কালিকাপুরাণ।

কালিকা পুরাণে কথিত আছে,—চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে বসন্তকালোৎপন্ন পুষ্প এবং অশোক পুষ্পদ্বারা যে তোমার অর্চ্চনা করে, তাহার রোগ, শোক বা দুর্গতি কিছুই হয় না।

তত্রাষ্টম্যামন্নপূর্ণাং পূর্ব্বাহ্নে সাধকোত্তমঃ।
রক্তবাসৈ রক্তপুষ্পৈ র্ব্বলিভিঃ পূজয়েচ্ছিবাং॥ মায়াতন্ত্র ৭ম পটল।

মায়াতন্ত্রের সপ্তম পটলে উক্ত হইয়াছে যে, চৈত্রমাসের শুক্লাষ্টমীতে সাধক রক্তপুষ্প ও রক্তবস্ত্রাদি উপহার দ্বারা পূর্ব্বাহ্নে জগজ্জননী দেবী অন্নপূর্ণার পূজা করিবে। তাহা হইলে তাহার কোনরূপ অভাব থাকিবে না। সুতরাং সকলেই অবনত মস্তকে যুক্তকরে ভক্তিভরে বলে যে—

বন্দে মাতরমম্বিকাং ভগবতীং স্বর্গাপবর্গপ্রদাম্॥

অতএব এস মা! এ দীন দরিদ্রের জীর্ণ কুটীরে একবার এস মা! বিভবানুসারে কতলোকে তোমায় কত উপহার, কত উপচার দিয়া পূজা করিয়া থাকে; আমার যে কিছুই নাই মা! আমি যে মা তোমার অবোধ দরিদ্র সন্তান! আমি আর কি দিব, এস মা করুণাময়ী শঙ্করি! এই হৃদয়রূপ আসন দান করিতেছি; করুণাময় শঙ্করের সহিত কৃপাপূর্ব্বক ইহাতে উপবেশন কর মা! তোমার ঐ শ্রীপদে মদীয় হৃদয় কাননজাত ভক্তিরূপ কুসুমাঞ্জলি প্রদান করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ করি এবং ভক্তিভরে তোমার মধুমাখা মাতৃনামটী উচ্চারণ করিয়া মানবজীবন ধন্য করি—ধরাধামে স্বর্গসুখ অনুভব করি। তাই বলি, এস মা, জগদম্বিকে! সন্তানের সারা বৎসরের দুঃখকাহিনীটা একবার শোন মা! তোমার অভয় পদে আশ্রয় নিলে ত আর কোন ভাবনা থাকে না? দেবগণ তোমার আশ্রয় নিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা যতবারই বিপদে পড়িয়াছেন, প্রতিবারেই ত তুমি তাঁহাদিগকে বিপদ্ হইতে রক্ষা করিয়াছ; আশ্রিত অধম সন্তানের প্রতি কি কৃপাবারি পতিত হইবে না! এস মা, দুর্গতিনাশিনি! আমরা মনপ্রাণ খুলে তোমার মধুমাখা নামটী গান করি এবং তোমার ঐ অভয় পদে প্রণাম করি।

কিন্তু মা একি! পঞ্চাননের আবার এ কিরূপ ভাব! পাঁচমুখে পঞ্চানন তোমারই গুণগাথা গান করিয়া থাকেন। তবে মা পঞ্চাননের এমন অবস্থা কেন? মা! মনে বড়ই ভয় হয়—

কোটয়ো ব্রহ্মহত্যানামগম্যাগমকোটয়ঃ।
সদ্যঃ প্রলয়মায়ান্তি মহাদেবেতি কীর্ত্তনাৎ॥ স্কন্দপুরাণ।
নমস্তে ত্বাং মহাদেব লোকানাং গুরুমীশ্বরং।
পুংসামপূর্ণকামানাং কামপূরামরঙ্ঘ্রিপম্॥ শ্রীমদ্ভাগবত।

যাঁহার নাম একবার মাত্র উচ্চারিত হইলে কোটি কোটি ব্রহ্মহত্যা এবং কোটি কোটি অগম্যাগমন জনিত পাপরাশি তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হইয়া থাকে; যিনি অপূর্ণকাম পুরুষদিগের সকল কামনা পূর্ণ করিয়া থাকেন, সেই ত্রিলোক-পূজ্য দেবাদিদেব মহাদেব আজ ভিখারীর বেশে করপ্রসারণ পূর্ব্বক তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান! তবে কি মা, তোমার নাম নিলে তার এই পরিণাম! এ আবার মা কেমন খেলা! ষড়ৈশ্বর্য্যময় শঙ্কর আজ শঙ্করীর নিকট ভিক্ষুকবেশে উপস্থিত! তুমিও ত মা অম্লানবদনে তোমার সেই অমৃতময় দর্ব্বীবিঘট্টিত সুধারসপ্লুত অন্নব্যঞ্জনাদি অকাতরে স্বামিকরে প্রদান করিতেছ। কি আশ্চর্য্য! চরাচর বিশ্বের মঙ্গল বিধান কর বলিয়াই ত শঙ্করী নাম ধারণ করিয়াছ। তবে আবার এ কিরূপ ভাব! অবোধ সন্তান আমরা, তোমার মর্ম্ম কি বুঝিব!

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ॥

যিনি সমস্ত প্রাণীতে বুদ্ধিরূপে অবস্থিত আছেন, সেই দেবী তুমি, তোমাকে নমস্কার।

কিন্তু মা, তোমার এ লীলাখেলার মর্ম্ম আমরা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কেহ বলেন,—প্রার্থনা না করিলে কেহ কাহাকেও কিছু দান করে না। আবার অভাব না হইলে প্রার্থনাও আসে না, অভাবের সঙ্গে প্রার্থনার যেন নিত্য সম্বন্ধ। সুতরাং অভাব হইলেই মায়ের নিকট প্রার্থনা করিবে। ধন রত্নাদিতে পরিপূর্ণ মায়ের ভাণ্ডারে কিছুরই অভাব নাই। প্রার্থনা করিলেই মা তোমার সমস্ত অভাব দূর করিবেন, তোমায় তোমার প্রার্থিত ফল দান করিবেন। না চাহিলে কেহই কিছু পায় না, ইহা সাধারণকে বুঝাইয়া দিবার নিমিত্তই তোমাদিগের এই লীলাখেলা—ষড়ৈশ্বর্য্যশালী শঙ্করের ভিখারীর বেশ পরিগ্রহ! এ কথা মা আমাদের নিকট ভাল বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, আমরা ত তোমার অতিবড় পাষণ্ড সন্তান! আমাদের অভাব বোধ আছে, কিন্তু চাহিবার ক্ষমতা মোটেই নাই। কিরূপে তোমার নিকট প্রার্থনা করিতে হয়, তাহা আদবেই জানি না। তবে কি আমরা

চিরকাল অজ্ঞান দুঃখরাশির অতলতলে চিরনিমগ্ন থাকিব! আমাদের প্রতি কি ত্বদীয় কৃপাবারির একবিন্দুও পতিত হইবে না! মা, তাও কি হয়? তবে আর অজ্ঞান পশু গাভীগুলি স্তনমণ্ডল দুগ্ধভারে সমাক্রান্ত হইলেই হাম্বা হাম্বা রবে বৎসান্বেষণে ছুটিতে থাকে কেন?

কেহ কেহ বলেন,—প্রকৃতি পুরুষ নিয়াই জগৎ। পুরুষ দ্রষ্টা সাক্ষি-স্বরূপ; প্রকৃতিই সমস্ত করেন। প্রকৃতি ব্যতীত পুরুষের একপদও নড়িবার শক্তি নাই। শক্তিহীন সমস্তই মিথ্যা, প্রকৃতিই প্রধান। ইহা দেখাইবার নিমিত্তই তোমাদের এই লীলা! দেবাদিদেব ভগবান্ স্বয়ং ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ হইয়াও তোমার নিকট ভিক্ষুক বেশে উপস্থিত হইয়া মরজগতে ইহাই শিক্ষা দিতেছেন যে, চরাচর বিশ্ব ইহাই দেখ, ইহাই শিক্ষালাভ কর যে, জগতে প্রকৃতিই একমাত্র অদ্বিতীয়। কারণ, সকলের সর্ব্বাভীষ্ট দান করিতে সমর্থ সর্ব্বদা আমিও প্রকৃতির অধীন! এই জন্যই বুঝি মা শক্তিবিদ্বেষী শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্যের দর্প চূর্ণ করিয়াছিলে! সুতরাং তাঁহারা বলেন, প্রকৃতির প্রাধান্য পরিদর্শনের নিমিত্তই তোমাদের এই খেলা—শঙ্করের ভিখারীর বেশ ধারণ।

রামচন্দ্র সমুদ্রে সেতুবন্ধনকালে শিবলিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহাকে রামেশ্বর নামে আখ্যাত করেন। ভোলানাথ আশুতোষ তথায় উপস্থিত হইয়া রামেশ্বর নামের অর্থ করিলেন— রামঃ ঈশ্বরো যস্য অর্থাৎ রাম যাঁহার ঈশ্বর। রামচন্দ্র বলিলেন—রামস্য ঈশ্বরঃ—রামের ঈশ্বর। অপরাপর সকলে—রামশ্চাসৌ ঈশ্বরশ্চেতি অর্থাৎ যিনি রাম তিনিই ঈশ্বর—'অভেদঃ শিবরাময়োঃ' বলিলেন। আমাদেরও মনে হয়, আমরাও বুঝি যে, লীলাপ্রকাশার্থ তোমরা পরস্পর যাহাই বল না কেন, তোমাদের মধ্যে আবার ছোট বড় কি? তোমাদের মধ্যে আবার ভেদ কি আছে, শঙ্কর শঙ্করী অভিন্ন—প্রকৃতি পুরুষ এক। অতএব কৃপাপূর্ব্বক এস মা সর্ব্বদেব বন্দিতে! মাগো!

তুমিই দেবতা এই বিশাল জগতে,
প্রণমি মা পদপ্রান্তে, অন্তে রেখ পদোপান্তে,
এইভিক্ষা ভিক্ষাদাত্রি তব চরণেতে,
আসিতে না হয় যেন পুনঃ এ মরতে॥

এস মা! বর্ষপরে দাসের ভবনে এস মা! তাই বলি ভ্রাতৃগণ! এস আজ সকলে মিলিয়া সমস্বরে মধুমাখা মা মা শব্দে জীবন মন ধন্য করি।

মধুময় মাতৃনাম করি উচ্চারণ।
ধন্য হোক্ ধন্য হোক্ মানবজীবন।
মধুমাখা মা মা শব্দ করি উচ্চারণ,
ধরাধাম হোক্ আজি স্বরগভুবন॥

শ্রীকালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।

অবসর—

বারুণী পুষ্করিণী। [ভ্রমর।
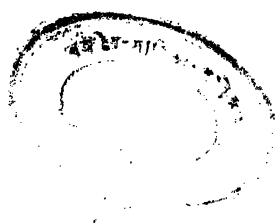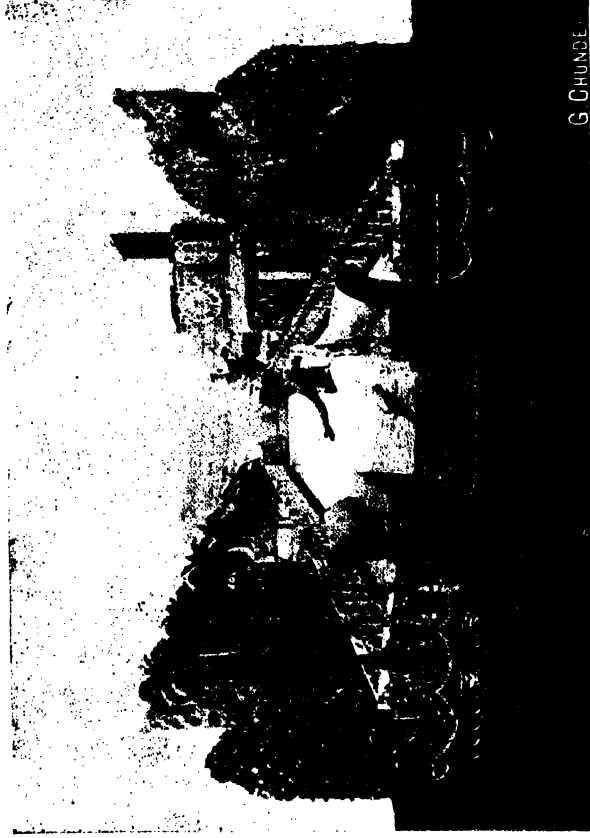
জলমগ্না রোহিণী। উদ্ধারার্থে গোবিন্দলাল।

বর্ষ বরণ।

নীলিম-বাসে আবরি অঙ্গ
ফুল্ল প্রসূন সাজে
বিকশিতা বরা শান্তা উজলা
পুলকা প্রকৃতি রাজে।
কান্তার ঝাট পুষ্প-বাটিকা
বিশোভিত চারি-ধার,
প্রেম আবেশে জড়িতা বল্লী
সহকারে সহকার।
কল কল স্বনে নানা বিহঙ্গ
সুরঙ্গ বিটপাসীন,
গাহিছে হরষে মাঙ্গলিক গান
সুমধুর সমীচীন।
কলাপী-কলাপ মধুর আলাপে
ধরিয়া পঞ্চম-তান
রেণু-বিজড়িত দ্বিপ-পুঞ্জ
করিছে প্রভাতী গান।
মাধব-আলস-লুলিত-সমীর
দোদুল আঁচলখানি
অশোক দলের চরণ দুটী
কোমল মৃদুল গামী;
দেহ-লতাখানি ভূষিত হ'য়েছে
অভিনব রঙ্গ-রাগে,
চাঁপার কলি আঙ্গুল হেলনে
বরিবারে তোমা ডাকে।
বিদূরিত সব পুরাতন, শুধু
কর্ম্ম-ফল আর স্মৃতি,
নব উপাদান আসন রেখেছে
পরমা প্রকৃতি কৃতি।
এস মহী'পরে হে নব অতিথি!
মধু ঋতু তোমা বরিয়া,
বিদায় লইবে তাই আবাহনে
বারেক তোমারে হেরিয়া।
প্রিয়তম, এস, কুন্দ-নীরদ-
স্যন্দন'পরে চড়িয়া
বাল্য-নিদাঘ-রাতুল-কিরণ
সারাটী অঙ্গে মাখিয়া।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষাল।

মায়ের ডাক।

১

"হাঁ বাবা, মা কোথায় গেছে?" পাশের ঘর হইতে এই কথা শুনিয়া একটী চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা ছোট ভাই নরেশকে কোলে লইয়া তাহারা মুখ-চুম্বন করিল। বালক এই অপ্রত্যাশিত সোহাগে তাহার মায়ের কথা ভুলিয়া গেল। তাহার মা তাহাকে এমনই করিয়া কোলে লইয়া চুম্বন করিত, এমনই করিয়া আদর করিত, এমনই ভালবাসায় ডুবাইয়া রাখিত। সেইজন্য সে আর কাঁদিত না। অভাব পূর্ণ হইলে ছোট ছেলের মন স্থির থাকে; তাহার ক্ষুদ্র ভাবনা মিলাইয়া যায়। কিন্তু একজনের অভাব পূর্ণ হয় নাই—সে কে—তাহার পিতা। তিনি গীতার মধ্যে অনুসন্ধান করিতেছিলেন, তাহার স্ত্রী কোথায়! সব শাস্ত্র সেখানে নীরব! তিনি আকাশতলে নক্ষত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন, যদি সেই দূরদেশে সে লুকাইয়াথাকে! তাঁহার বাগানের ফুলগুলির প্রতি চাহিয়া থাকিতেন, যদি সে সেখানে ফুটিয়া থাকে! ভাগীরথীর নৃত্যশীলা বীচিমালা দেখিয়া ভাবিতেন, যদি সে তরঙ্গের উপর দিয়া আসিয়া সৈকত-লীন হয়! কোথাও যখন মিলিল না,—কেহই যখন বলিয়া দিল না, তখন তিনি নিজের অভাবটী হৃদয়ের কোণে লুকাইয়া রাখিলেন। খুঁজিতে লাগিলেন, কোন্ পথে সেখানে যাওয়া যায়! তিনি তাঁহার অন্ধকার ঘরের প্রদীপ দুইটী—কন্যা ও পুত্রকে লইয়া সেই পথ খুঁজিতে লাগিলেন। যখন এই তিনটী ভালবাসা একত্রিত হইল, জলাশয় নদীতে পরিণত হইল, অচঞ্চল জল বেগগামী তরঙ্গের সৃষ্টি করিল, তখন সেই পথের দ্বার খুলিয়া গেল। কে যেন আসিয়া বলিয়া গেল, মহামিলনের জন্য অপেক্ষা কর। তোমার কর্ম্মসূত্র তোমাকে সংসারে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, সময় হইলেই বন্ধন খুলিয়া দিবে। এতদিনে তিনি বুঝিলেন, ইহাই মঙ্গলনিয়ন্তা বিশ্বপতির আদেশ। পুত্র-কন্যা সহ তিনি ভগবচ্চরণে প্রণিপাত করিলেন। সেই দিন হইতে শোকের গভীর খাদ কে যেন পূর্ণ করিতে লাগিল, কে যেন সেই নিদারুণ অভাবের তীব্র অনুভূতির উপর সুষুপ্তির হাত বুলাইয়া দিল।

পাঁচ বৎসরের বালক নরেশ, সে এত বুঝিতে পারিত না। তাই সে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিত—"বাবা, মা কোথায় গেছে?" এই একটী

কথাতে তাহার পিতা রমাপ্রসন্নের নীরব তপস্যা যেন ভাঙ্গিয়া যাইত, এই একটী কথাতে তিনি তাঁহার স্বর্গীয়া স্ত্রী সুরবালার মুখচ্ছবি দেখিতে পাইতেন। যাহারা চিরদিনের জন্য চলিয়া যায়, তাহারা কি নিষ্ঠুর! এত ক্রন্দনধ্বনি, এত দীর্ঘনিশ্বাস তাহারা কি শুনিতে পায় না! আমরা কাঁদিয়া আকুল হই, ছেলেগুলি কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়ে, কই সে তো আসিয়া দেখিয়া যায় না! রমাপ্রসন্ন পরে বুঝিতে পারিলেন, দেখে একজন, যে চিরকাল সকল-কেই দেখিয়া আসিতেছে। যিনি সতত জাগ্রত, যিনি সকল সময়েই চেতন, যিনি অব্যক্ত, যিনি বর্ণনাতীত, যিনি সচ্চিদানন্দ, যিনি সোঽহং, সেই পরম ব্রহ্ম!

বালিকা অমলা পিতার অভিপ্রায় বুঝিয়া, তাঁহার এই নীরব সাধনার সময় গৃহ-প্রবেশ করিত না। বালক মাঝে মাঝে ছুটিয়া আসিত। আজ যেন তাহার কোমল প্রাণে কে যেন একটী অভাবের অনুভূতি জাগাইয়া দিয়াছে, তাই সে ছুটিয়া আসিয়াছিল।

অমলা ও নরেশ চলিয়া গেলে, রমাপ্রসন্ন ভাবিলেন, এমন করিয়া কয় দিন যাইবে! অমলা বিবাহের পর হয় তো আর আসিতে পাইবে না—তখন নরেশ কোথায় দাঁড়াইবে! তিনি একাকী কেমন করিয়া এই বালককে অভাব-মুক্ত করিবেন। তাঁহার ভালবাসা ছিল, মমতা ছিল, দয়া-দাক্ষিণ্য ছিল, সে সবগুলি কাহার চিতার সঙ্গে যেন পুড়িয়া গিয়াছে! তিনি বাগানে গিয়া পুত্রকে কোলে লইলেন; পুত্রটী হাসিল,—কন্যা হাসিল, সেই সঙ্গে জগৎ সংসার হাসিল—এত হাসি দেখিয়া তাঁহার অধর-প্রান্তে একটু ক্ষীণ হাসির রেখা মিলাইয়া গেল।

বালক নরেশ পিতার গলা ধরিয়া বলিল,—“বাবা, ও কথা আর ব’লবো না।”

রমাপ্রসন্ন পুত্রের মুখ-চুম্বন করিয়া বলিলেন,—“কি কথা বাবা?”

মাতৃ-হীন বালক উত্তর করিল,—“মা কোথায় গেছে, এই কথা বাবা। দিদি বারণ ক’রেছে।”

অমলা আসিয়া পিতার চরণে ধরিয়া বলিল,—“হাঁ বাবা, তুমি যে কষ্ট পাও!”

রমাপ্রসন্ন দেখিলেন, অমলার নয়ন অশ্রুসিক্ত, তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় তরঙ্গো-চ্ছ্বাসিত। সেও তো বালিকা, বন্যার মুখে বালির বাঁধ টিকিবে কেন!

তাহার বুকটী চাপিয়া সেই তরঙ্গকে বাধা দিবার প্রয়াস পাইল, বুক সেই ভারে কাঁপিয়া উঠিল, তারপর সেই রুদ্ধ উচ্ছ্বাস নয়ন-পথে বাহির হইল। জন্মিয়া আগে চক্ষু খুলিয়া দেখি সংসার, যাইবার সময়ও চক্ষু মুজিয়া চলিয়া যাই—তাই নয়ন আমাদের পথপ্রদর্শক—আগম-নিগমের দ্বার।

রমাপ্রসন্ন কাতর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার কষ্ট হয়, তোমাদের হয় না মা ?"

বালিকা তখন চক্ষের জল মুছিল। পিতার হাত ধরিয়া বলিল, "বাবা, দেখ, কেমন সুন্দর এই গোলাপ ফুলটী !"

পিতা বুঝিলেন, কন্যা তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে। হায় রে বালিকা-হৃদয়! তুমি শোকে অবনত হইলেও ভাঙ্গিতে চাহ না, সেই শোকের আবর্ত্তে কেহ আসিয়া পড়িলে দুইহাতে সরাইয়া দাও। বালিকা, তোমার ত সব গিয়াছে, তোমারও মা বলা ফুরাইয়াছে, তুমি চেষ্টা করিতেছ, ছোট ভাইটীকে শান্ত করিবার জন্য, তোমার পিতাকে শান্ত করিবার জন্য। তোমার পিতা চেষ্টা করিতেছেন, তোমাদের শান্ত করিবার জন্য। সহানুভূতি আর সমবেদনা না থাকিলে সংসার চলিত না। দুঃখের ভার কেহ বহন করিতে পারিত না। সংসারে দান সেই জন্য বড় পুণ্যের কায।

সেই অবধি রমাপ্রসন্ন অনেকটা স্থির হইলেন।

২

যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া রমাপ্রসন্ন অমলার বিবাহ দিলেন। যাহারা কেবল টাকা চিনিয়াছে, তাহারা পরের দুঃখে দুঃখিত হয় না। সংসার সেই জন্য রমাপ্রসন্নের কন্যার বিবাহে যথাসর্ব্বস্ব ব্যয়িত হওয়াতেও দুঃখিত হইল না ; বরং হাসিল যে, বড়লোকের উপেক্ষার জন্য আর একজন অভাগার স্থান হইল।

আগে পাঁচটী ফল দিয়া লোকে কন্যা সম্প্রদান করিত। তখন শান্তি যেন সংসারে ছড়ান থাকিত, ভগবানের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া নবদম্পতী বড় সুখে কাল কাটাইত। কোথায় গেল সে যুগ, কোথায় গেল আমাদের সেই মন!

তারপর আসিল কুল-মর্য্যাদা। যে প্রকৃত মহৎ, যে প্রকৃত কুলশীলসম্পন্ন, তাহার মর্য্যাদা সম্মান সংসার করিবেই করিবে। সকল দেশেই তাহাই করিয়া থাকে। কিন্তু বঙ্গের দুর্দ্দিন বলিতে হইবে,—যে দিন বল্লালসেন

কুলীননামধেয় একটী স্বতন্ত্র জাতির সৃষ্টি করিলেন। সে জাতি শুধু পদস্পন্দনায় ভুলিত না, স্বামিপরায়ণা স্ত্রীতে ভুলিত না, ভুলিত কেবল টাকায়! কুলীনের মর্য্যাদা টাকার ওজন দরে বিক্রয় হইতে লাগিল। কৌলীন্যের কঙ্কাল পরিয়া এক অদ্ভুত জাতি অতীতের ভস্মাবশেষ হইতে উত্থিত হইল। তাহারা তাহাদের পাপদেহ ঢাকিবার জন্য গাত্রাবরণের টাকা চাহিল। কত রকমের যৌতুক, কত রকমের অলঙ্কার, কত ফ্যাসানের জুতা, কত রকমের শাল, দোশাল কুলীনপুঙ্গবদিগের গৃহে বন্যার ন্যায় ঢুকিতে লাগিল। সেই দিন হইতে বঙ্গের প্রতি ঘরে দুর্দ্দশার স্রোত ঢুকিয়াছে, সেই দিন হইতে বঙ্গলক্ষ্মী চঞ্চলা হইয়াছেন, সেই দিন হইতে ভারতমাতা বঙ্গ-দুহিতার দুর্দ্দশা দেখিয়া মস্তক অবনত করিয়া আছেন! এ দুর্দ্দশা কি মোচন হইবে না প্রভু!

অমলা যে দিন প্রথম স্বামি-গৃহে আসিল, দেখিল শাশুড়ী ও বিধবা ননদী সংসারের কর্ত্রী। জমা-জমী যৎসামান্য, প্রাচীন গৃহটী ভগ্নপ্রায়, পচা পুকুরটী শৈবালে পরিপূর্ণ। তাহার স্বামী ডেলি-প্যাসেঞ্জার, কলিকাতার জেটীতে কায করে। অতি প্রত্যুষে তথায় যায়, সন্ধ্যার পর ফিরিয়া আসে। এহেন পাত্রের জন্য রমাপ্রসন্ন যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিলেন। রমাপ্রসন্নের দুর্ভাগ্য, বঙ্গের দুর্ভাগ্য!

প্রথমদিনের কথাবার্ত্তাতেই অমলা শাশুড়ীকে বিশেষ করিয়া চিনিতে পারিল। তার উপরে ননদিনীর বাক্য-বাণ!

শাশুড়ী ডাকিল,—ওগো বড়লোকের মেয়ে, এতক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুমুলে আমাদের ঘরে পোষাবে না। ননদিনী বলিল, আহা বেচারীর একটী মেয়ে, একেবারে ভাত খাবার সময় উঠ্‌বে।

অমলা তখন শয্যা হইতে উঠিয়া তাহার পিতা ও ছোট ভাইটীর জন্য ভাবিতেছিল। "আমি তো বলিয়া আসিয়াছি, কে তাহাদের দেখিবে, কে তাহাদের সেবাযত্ন করিবে। দুধের গোপাল নরেশ হয় তো আমাকে না পাইয়া কাঁদিতে থাকিবে, পিতাও হয় তো কাঁদিবেন। মায়ের শোক অনেক কষ্টে চাপা দিয়া আসিয়াছি, আবার সেই শোক যদি নূতন মূর্ত্তি ধারণ করে, কে তাহাদের সান্ত্বনা করিবে।

এমন সময়ে শাশুড়ীর এলারমিং ঘড়ির শ্রুতিমধুর গৎ বাজিয়া উঠিল। ননদিনীও মধুর ললিত রাগিণীতে পোঁ ধরিয়া ঐক্যতান বাদন সমাপ্ত করিলেন।

অমলা তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুইয়া গৃহকার্য্যে মনোনিবেশ করিবার চেষ্টা করিল। স্ত্রীলোক ভাগ্যের উপর কথা কহে না, সেই জন্য সেই "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়" ন্যায় পতি-গৃহে শাকান্নও মিষ্টমুখে খাইতে আরম্ভ করিল। একমাত্র সম্বল—তাহার হৃদয়ের প্রসন্নতা, একমাত্র ভরসা—তাহার আত্ম-নির্ভরতা। এই দুইটী সে তাহার পিতার নিকট শিখিয়াছে, এই দুইটী তাহার পিতার যৌতুক। সে এই দুইটীকে জোর করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিল। সেই দিন হইতে শাশুড়ী ননদীর বিদ্রূপ গঞ্জনা সে অম্লানবদনে সহ্য করিতে লাগিল।

তাহার স্বামী সমস্তদিন কুলীমজুরদের সহিত থাকিয়া মিলিটারি মেজাজ অর্থাৎ রুক্ষ ভাব ধারণ করিয়া প্রত্যাগমন করিত। কিন্তু গৃহে আসিয়া সে দেখিত, তাহার যা কিছু দরকার, সমস্ত ঠিক হইয়া আছে; এমন সুন্দর শৃঙ্খলা সে কখনও লক্ষ্য করে নাই। ক্রমে তাহার হৃদয় স্ত্রীর দিকে একটু টলিয়া পড়িল। পাষাণ হৃদয়ে করুণার রেখাপাত হইল।

শাশুড়ী ক্রমে বুঝিল, তাহার গৃহকর্ম্ম করিবার আর কিছুই বাকী থাকে না। সে যাহা খাইতে ভালবাসে, বালিকা বধূ তাহাই সযত্নে রন্ধন করে। ননদী-পুত্র অবাধ্য ও দুরন্ত নগেন্দ্র ক্রমে পোষ মানিল। ক্রমে এমন হইল যে, শাশুড়ী ননদী বধূর সাহায্য ভিন্ন কোন কার্য্য করিতে সাহস করিতেন না, পাছে পুত্রের মনোমত না হয়। এক বৎসরের মধ্যে সংসারে সুনীতি আসিয়া প্রবেশ করিল। যে শাশুড়ী ননদিনীর বাক্যবাণে পাড়ার লোকে জর্জ্জরিত থাকিত, তাহাদের এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল। এই বালিকা বধূ সকলকেই স্নেহের চক্ষে দেখিত, বর্ষীয়সী হইতে সমবয়স্কা স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত তাহার নিকট একবার আসিলে আর উঠিতে চাহিত না। তাহার নিকট রামায়ণ মহাভারত শুনিতে আরম্ভ করিলে, তাহারা নিজের কার্য্য ভুলিয়া যাইত। তাহার মধুর চরিত্রে সকলেই বশ হইল। রূপে নয় গুণে, উজ্জ্বলতায় নহে মধুরতায়, কপটতায় নহে সরলতায়।

৩

চার পাঁচ বৎসর পরে অনেক সাধ্য সাধনার পর অমলা আজ পিতৃগৃহে আসিয়াছে। প্রথম সন্দর্শনেই তাহার পিতা বিস্মিত হইলেন, এই কি সেই অমলা! ফুল্ল-যৌবনা অমলার প্রাণ সংসার-ভারে অবনত হইয়া পড়িয়াছে! !সতেজ রক্তকণিকার পরিবর্ত্তে ব্যাধিসূচক পাণ্ডুর রেখার দাগ

পড়িয়াছে! অমলা জীবন তুচ্ছ করিয়া যে সংসারে অশান্তির স্থানে মিলন সংঘটিত করিয়াছে, সেই সংসার তাহাকে নিষ্পেষিত করিয়াছে। ভোর হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত প্রাণপাত পরিশ্রমে তাহার কোমল হৃদয় বলহীন হইয়া পড়িয়াছে। তাহার তো একটা দিক নহে, পিতৃগৃহও তাহার সুন্দর স্বাস্থ্যের উপর অনেকটা নির্ভর করে। তবে কেন সে এমন করিল। পিতা কি এই সংসারে তাহার কেহই নয়! মাতৃহীন নরেশ যে তাহার দিদির স্নেহের উপর অনেক দাবী রাখে!

অমলা আসিয়া পিতাকে প্রণাম করিল, নরেশকে কোলে লইল। সেই গরীবের কুটীরে সে দিন যে আনন্দের বিমল জ্যোতি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তেমনটী অনেক দিন ফোটে নাই।

নরেশ এখন স্কুলে পড়ে। ৯।১০ বৎসরের বালক এতদিনে বুঝিয়াছে যে, সে মাতৃহীন। কিন্তু তাহার স্নেহশীল পিতার যত্নে ও চেষ্টায় একদিনও সে অভাব বুঝিতে পারে নাই।

দুঃখের সংসারে ক্ষমা ও তিতিক্ষা আসিয়া সাহায্য করে। নরেশও এই অল্প বয়সে সহিষ্ণুতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই জন্য তাহার মনটাকে আপনার আয়ত্তের ভিতর আনিতে পারিয়াছিল, তদুপরি তাহার পিতার ধর্ম্ম উপদেশ তাহার চরিত্রটীকে সুন্দরভাবে গঠিত করিতেছিল।

বালক নরেশও তাহার দিদিকে দেখিয়া যেন একটু চিন্তান্বিত হইল। তাহার সেই দিদি এই ৪।৫ বৎসরেই যেন শুষ্ক ভাব ধারণ করিয়াছে, গোড়ায় জল না দিলে চারাগাছ কতকাল না শুকাইয়া থাকে!

এসেছ দিদি, অনেকদিন তোমায় দেখতে পাই নাই। কত—এই কথা বলিয়া নরেশ থামিয়া গেল।

অমলা বুঝিল, নরেশ এই অল্প বয়সেই ভাবিতে শিখিয়াছে। তাহার হাত ধরিয়া উভয়ে বাগানে গেল। তখন জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। মধুমাসের মৃদু পবন ফুলের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছিল। দুই একটী শুভ্র মেঘ-খণ্ড আকাশতলে উড়িয়া যাইতেছিল।

অনেকক্ষণ পরে অমলা, নরেশের হাত ধরিয়া বলিল, ভাই, আমি তো মায়ের নিকট যাচ্ছি, তোমার নিকট বাবাই রহিবেন। আর বোধ হয় আমার—

নরেশ তাহার দিদির শেষ কথা শুনিল না। সে বলিয়া উঠিল, তা কি

হয় দিদি, তোমার তো যাবার সময় হয় নাই। তুমি তো সবে ২০ বৎসরে পড়েছ। এত সকাল সকাল মা কখনই ডাকিবেন না।

অমলা বুঝিল—ঈশ্বরের প্রতি স্থির বিশ্বাস বালক-হৃদয়ে কতদুর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। নরেশ, ভাই! আমার সাধ মিটিয়াছে, আমি শেষে স্বামীর সুখ পাইয়াছি, বোধহয় আগে পাইলে এত শীঘ্র—

তোমাদের এত কষ্ট সহ্য ক'রতে হয় দিদি। আমি যে মনটাকে এখনও আয়ত্ত ক'রতে পারি নাই। আশ্চর্য্যান্বিত হচ্ছ দিদি, বাবা আমাকে অনেক শিখিয়েছেন, কিন্তু কিছুতেই পার্‌ছি না দিদি। এক সঙ্গে গেলে হয় না দিদি! দুঃখের তাড়নায় বালক-হৃদয়ও জ্ঞানলাভ করে।

অমলা এই কথা শুনিয়া একবার উপরপানে তাকাইল—যদি তাহার মাকে একবার দেখিতে পায়। আজ ৪।৫ বৎসর নরেশ তাহার দিদিকে দেখে নাই, সেই দুঃখই কি তার কোমল হৃদয়ে আঘাত করিয়াছে। তাহার অতৃপ্ত ভালবাসা দিদির জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতেছিল, কিন্তু সেই ভালবাসা ৪।৫ বৎসর তাহাকে না পাইয়া বালকহৃদয় ভগ্ন করিতেছিল। স্নেহশীল পিতা এক একদিন রাত্রে লক্ষ্য করিতেন, বালকের হৃদয় ভেদ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পড়িত, তাহার সুপ্ত আনন্দে কে যেন চাপিয়া ধরিত।

সেদিন উভয়ে একগৃহে শয়ন করিল। পরদিন উভয়ে আর শয্যা ত্যাগ করিল না। রমাপ্রসন্ন দেখিলেন, উভয়েরই জ্বর, অবস্থা ভাল নয়। বালকের কণ্ঠতালু শুষ্ক—অমলা ভাইএর মাথায় হাত দিয়া যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে! রমাপ্রসন্ন নরেশকে শীতল জল পান করিতে দিলেন, অমলার উষ্ণমস্তিষ্কে জলের পটী দিয়া নরেশের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। চাকর ডাক্তার আনিতে গিয়াছে।

রমাপ্রসন্ন বুকে হাত দিয়া ডাকিলেন, বাবা নরেশ, তোমাদের যেতে কোন কষ্ট হবে না! আমায় ফেলে যেতে পারবে! রমাপ্রসন্নের শাস্ত্রাধ্যয়ন বৃথা হয় নাই।

নরেশ ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর দিল, এ যে মায়ের ডাক বাবা, কি ক'রে অগ্রাহ্য করি বাবা!

এই কথা অমলার কাণে গেল। সেও বুকে হাত দিয়া বলিল, "ছি নরেশ! ও কথা ব'লতে আছে। আমরা সেরে উঠ্‌বো, ভয় কি ভাই?"

অমলা আবার বলিল, বাবা ভয় কি তোমার। আমরা নিশ্চয় সেরে উঠবো! কিন্তু বাবা একটীবার ডাকে ক—

এমন সময়ে ডাক্তার ও ঘটনাক্রমে অমলার স্বামীও তথায় উপস্থিত হইলেন। ভগবান্ সতীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন।

ডাক্তার বুঝিলেন, আর বিলম্ব নাই। ভাই বোন উভয়েই মৃত্যুর দ্বারস্থ। অমলা একটীবার মাত্র উদ্দেশ্যে সকলকে প্রণাম করিল, নরেশ যাইবার পূর্ব্বে একবার মাত্র বলিয়া উঠিল, এ যে বাবা মায়ের ডাক। তারপর—আর লিখিব না।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর সিংহ

লজ্জাবতী লতা।

ছুঁ'ওনা ছুঁ'ওনা উটী লজ্জাবতী লতা।
এসে এ অবনী-তলে,
কোনদিন কোন কালে,
এর মত লজ্জাবতী দেখি নাই কোথা।
ছুঁ'ওনা ছুঁ'ওনা উটী লজ্জাবতী লতা॥

হৃদয় জড়িয়ে আছে পূত-লজ্জা-সুতা।
প্রাণটুকু লজ্জা মাখা,
সর্ব্বাঙ্গ লজ্জায় ঢাকা,
লজ্জা উপাদানে বুঝি গড়িলা বিধাতা!
ছুঁ'ওনা ছুঁ'ওনা উটী লজ্জাবতী লতা॥

লজ্জার পবিত্র চিত্রে কত পবিত্রতা।
নখে পরশিলে তায়,
অমনি সে মোহ যায়,
প্রাণ দিবে;—পর-সঙ্গে নাহি ক'বে কথা।
ছুঁ'ওনা ছুঁ'ওনা উটী লজ্জাবতী লতা॥

পতিপ্রেম-আকাঙ্ক্ষিণী সদা পতিরতা
পতি-সুখে সদা সুখ,
পতির দুঃখেতে দুঃখ,
পতি বিনে জানে না সে অপর দেবতা।
ছু'ওনা ছুঁ'ওনা উটী লজ্জাবতী লতা॥

দেখেছ কি এর মত সতী পতিব্রতা ?
নাহি গন্ধ রূপ রস,
নহে পর-প্রেমে বশ,
হেন পতি-ভক্তি জানি শিখিয়াছে কোথা ?
ছুঁ'ওনা ছুঁ'ওনা উটী লজ্জাবতী লতা ॥

সতীত্ব রক্ষার তরে সদা ব্যাকুলিতা ;
তাই বুঝি নিরজনে,
কণ্টকের আভরণে,
ঢাকিয়াছে দেহখানি, হয়ে শত্রুভীতা।
ছুঁ'ওনা ছুঁ'ওনা উটী লজ্জাবতী লতা ॥

কেন হেন সতী-লক্ষ্মী প'ড়ে আছে হেথা ?
হায় বুঝি এ সতীরে,
রাখিতে আদর ক'রে,
নাহিক জগতে কেহ, করিতে মমতা !
ছুঁ'ওনা ছুঁ'ওনা উটী লজ্জাবতী লতা ॥

এস গো বঙ্গ-ললনে ! এস ত্বরা হেথা ;
শিখে লও এর কাছে,
এর যত গুণ আছে,
তুচ্ছ নাহি কর এরে ভাবি বনলতা।
ছুঁ'ওনা ছুঁ'ওনা উটী লজ্জাবতী লতা ॥

পতিরে ভাবিও সদা প্রত্যক্ষ দেবতা ;
রাখিতে সতীত্ব-রত্ন,
প্রাণপণে কর যত্ন,
পর-পুরুষের সঙ্গে নাহি ক'ও কথা।
এর মত সাজ সবে লজ্জাবতী লতা ॥

শ্রীরমেশচন্দ্র বণিক্।

অপূর্ব্ব মিলন।

(১)

ভাদ্রমাসের ভরা জাহ্নবীর বুকের উপর দিয়া একখানি ক্ষুদ্র তরণী তীরবেগে ছুটিতেছিল। নৌকায় মাঝি মাত্র একজন, দাঁড়ি ছিল না। অনুকূল বাতাস পাইয়া মাঝি পাল তুলিয়া দিয়াছিল। পালভরে নৌকাখানা যেন পক্ষিণীর ন্যায় উড়িয়া যাইতেছিল। মাঝিও একহাতে হাল ধরিয়া অপর হাতে জ্বলন্ত কলিকা লইয়া মহাসুখে ধূমপান করিতেছিল।

সহসা আরোহী-বাবুর কণ্ঠস্বরে মাঝির সুখের ধূমপানে বাধা পড়িল।

বাবু ডাকিলেন—"মাঝি!"

মাঝি তাড়াতাড়ি কলিকাটী সরাইয়া বলিল—"আজ্ঞে।"

"আকাশটা দেখেছ কি?" বাবু এই কথা বলিয়া চুপ করিলেন।

মাঝি এতক্ষণ ধূমপানেই ব্যস্ত ছিল, অন্য কোন দিকেই সে চাহিয়া দেখে নাই। বাবুর কথা শুনিয়া সে ভীত হইল। ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল; দেখিল প্রায় অর্দ্ধাকাশ যুড়িয়া একখানা ঘন কৃষ্ণ মেঘ উঠিয়াছে। সে আর কথা কহিতে পারিল না, স্থির-দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল।

কোন উত্তর না পাইয়া বাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"দেখেছ?"

বাবুর কণ্ঠস্বর কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিবামাত্র মাঝির মোহ-ভাব তিরোহিত হইল। ক্ষিপ্রহস্তে কলিকার আগুণ জলে ফেলিয়া দিয়া সে বলিল—"আজ্ঞে হাঁ, দেখছি ত!"

"কেমন বুঝ্‌ছ?"

"বুঝ্‌ব আর কি বলুন!"

"কেন হে? ঝড় উঠেছে নাকি?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"সে কি! তা হ'লে উপায়?"

"তাই ত ভাব্‌ছি!"

"ঝড় আসবার আগে কি আমরা ডাঙ্গায় পৌঁছাতে পারব না?"

"বোধ হয় পারব না।"

"তবু চেষ্টা কর—নৌকার মুখ ফেরাও ।"

"যে আজ্ঞে" বলিয়া মাঝি হালটা ঈষৎ ঘুরাইয়া ধরিল। নৌকাখানা কল কল শব্দে ঘুরিয়া বেগে তটের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বাবু পুনরপি ডাকিলেন—"মাঝি !"

"আজ্ঞে।"

"কেমন দেখ্‌ছ ? ঝড়ের আগে পৌঁছিতে পার্‌ব কি ?"

"না, তা পার্‌ব না, ঝড় এসে পড়েছে"—বলিয়া মাঝি উঠিয়া দাঁড়াইল। দেখিতে দেখিতে ভাগীরথী-বক্ষ আলোড়িত করিয়া, হু হু শব্দে ঝড় আসিয়া পড়িল এবং তৎসঙ্গে মুষলধারে বারিপাতও আরম্ভ হইল। পালে বাতাস লাগিবামাত্র নৌকাখানা একবার লাফাইয়া উঠিল, পরে তীরবেগে তটের দিকে ছুটিয়া চলিল। মাঝি প্রাণপণ শক্তিতে হাল চাপিয়া ধরিয়া হাকিল—"বাহিরে আসুন বাবু, ডাঙ্গায় পৌঁছিলেই নৌকোর মুখ ধর্‌তে হবে।"

বাবু ধীরে ধীরে বাহিরে আসিলেন। আসিয়াই দেখিলেন, তরণী তীর-বেগে আসিয়া তটস্পর্শ করিল। ধাক্কা খাইয়া নৌকাখানা মচ মচ শব্দ করিয়া উঠিল। ভিতরের আরোহিগণ ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। এক-লম্ফে জলে পড়িয়া বাবু নৌকা চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—"ভয় নেই—এ ডাঙ্গায় ধাক্কা লেগেছে।"

মাঝি সম্মুখে আসিয়া লগী পুতিয়া নৌকা বাঁধিল। বাবু উপরে উঠিয়া বলিলেন—"মাঝি, একবার দেখে এস ত জায়গাটা কেমন।"

মাঝি প্রস্থান করিল। বাবুও ছহির ভিতরে যাইয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মাঝি ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"বাবু, এটা একটা খুব বড় বাগান ব'লে বোধ হ'চ্ছে।"

"লোকজনের বাড়ী দেখ্‌তে পেলে না ?"

"না।"

"তবে উপায় ?"

"ভয় কি ? নৌকাতেই থাকুন না।"

তাহাই স্থির হইল। অন্য উপায় কিছু ছিল না, সুতরাং বাধ্য হইয়া নৌকাতেই থাকিতে হইল।

(২)

নৌকায় আরোহী ছিল মাত্র চারিজন। বাবুর নাম মাধবলাল চক্রবর্ত্তী।

কলিকাতায় তিনি চাকুরী করিতেন। সাতদিনের ছুটি লইয়া সম্প্রতি শ্বশুরালয়ে গিয়াছিলেন। আজ দুইদিন হইল স্ত্রী, পুত্র এবং কন্যাটীকে সঙ্গে লইয়া নৌকাযোগে রওনা হইয়াছেন। তখন রেল হয় নাই, কলিকাতায় যাইতে ষ্টীমার কিম্বা নৌকাযোগেই যাইতে হইত। মাধববাবু সপরিবারে নৌকাযোগেই কর্ম্মস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন; কারণ, নৌ-যাত্রায় তিনি বিশেষ সুখানুভব করিতেন।

ঝড়ের সহিত বৃষ্টিধারা প্রবলবেগে ছুটিয়া আসিয়া ছহির উপর আছড়াইয়া পড়িতেছিল। সূক্ষ্ম জলকণা-সমূহ জীর্ণ ছহির ফাঁক দিয়া প্রবেশ করিয়া আরোহিগণের পরিহিত বস্ত্রাদি ভিজাইয়া দিতেছিল। বাহিরে দাঁড়াইয়া মাঝিও ভিজিতেছিল। সে সারা ভাগীরথীর বুকের উপর এবং স্বীয় পরিপুষ্ট নগ্ন দেহখানির উপর জল ঝড়ের সেই ভীষণ মাতামাতি অবাক্ হইয়া দেখিতেছিল।

মাধববাবু বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া ডাকিলেন—"মাঝি!"

মাঝি উত্তর করিল—"আজ্ঞে।"

বাবু বলিলেন—"তুমি ভিতরে এস।"

মাঝি অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে ভিতরে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া করুণ-হৃদয় মাধববাবু মনে মনে বড় ক্লেশানুভব করিলেন; বলিলেন—"ইস্! তুমি এতক্ষণ ভিজ্‌ছিলে কেন?"

মাঝি বলিল—"কি ক'রব বলুন?"

বাবু বলিলেন—"ভিতরে এলে না কেন?"

মাঝি কোন উত্তর করিল না, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মাধববাবু তাহার হস্তে একখণ্ড শুষ্ক বস্ত্র প্রদান করিয়া বলিলেন—"যাও, ওপাশে গিয়ে কাপড় ছেড়ে ফেল গে।"

মাঝি যে সময় বস্ত্র লইতে হস্ত প্রসারণ করিল, ঠিক সেই সময় তীরের উপর হইতে কে যেন বলিল—"ওরে এই যে—এখানে লেগেছে।"

কথা শুনিয়া মাধববাবু ভীত হইলেন। মাঝিকে নিকটে ডাকিয়া নিম্ন-স্বরে বলিলেন—"দেখ ত হে ব্যাপারটা কি!"

মাঝি ছহির মুখের নিকট যাইয়া দেখিল, কয়েকটা ঘোরতর কৃষ্ণকায় বিকটাকার ব্যক্তি তটভূমি হইতে নামিয়া তাহাদেরই নৌকার দিকে অগ্রসর হইতেছে। কি উদ্দেশ্যে ঐ বিকটাকার লোকগুলা যে নৌকার দিকে অগ্রসর

হইতেছে, তাহা আর তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না। সে মাধববাবুর দিকে ফিরিয়া বিচলিত স্বরে বলিল—"বড় ভাল বোধ হ'চ্ছে না বাবু, বোধ হয় এখনি নৌকোয় ডাকাত পড়বে।"

"সর্ব্বনাশ! সেকি!" বলিয়া মাধববাবু উঠিবার উপক্রম করিলেন। কিন্তু তাঁহাকে আর উঠিতে হইল না, একটা কৃষ্ণকায় বিকটাকার লোক ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তিনি আক্রমণের বেগ সহ্য করিতে পারিলেন না, পড়িয়া গেলেন। লোকটা দুইহস্তে তাঁহার গলদেশ চাপিয়া ধরিল। মাঝি আর সহ্য করিতে পারিল না, সে ঐ আক্রমণকারী লোকটার উপর ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় লাফাইয়া পড়িল। কিন্তু হায়! তাহার আশা পূর্ণ হইল না। পরমুহূর্ত্তেই আরও দুইটা লোক তাহাকে আক্রমণ করিল।

বাধ্য হইয়া মাঝিকে আত্মরক্ষায় যত্নবান্ হইতে হইল। এদিকে মাধববাবুর চেতনাও ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া আসিল। দস্যু তাঁহার সংজ্ঞাহীন দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মাঝিকে আক্রমণ করিল। তিনজনের সহিত রিক্তহস্তে একাকী লড়াই করা অসম্ভব। মাঝি বলিষ্ঠ হইলেও আর পারিল না। অনতিবিলম্বে দস্যুগণ তাহাকে নীচে ফেলিয়া গলা টিপিয়া ধরিল। মাঝির কণ্ঠনালীতে ঘড় ঘড় শব্দ হইতে লাগিল, তাহার চক্ষুর্দ্বয় ক্রমে কপালে উঠিল, দেখিতে দেখিতে সেই হতভাগ্য জীবের প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল।

এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য অবলোকন করিয়া মাধববাবুর স্ত্রী মূর্চ্ছিত হইলেন; সুতরাং দস্যুগণ তাঁহার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিল না। বাক্স, ট্রাঙ্ক প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া যাহা পাইল, লইয়া তাহারা বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু এত অত্যাচার এবং অর্থাপহরণ করিয়াও তাহারা ক্ষান্ত হইল না; দুর্ব্বৃত্তগণ লগীর দড়ী কাটিয়া নৌকা ভাসাইয়া দিল।

তখনও প্রচণ্ডবেগে ঝড় বহিতেছিল। মুক্ত তরণী বাতাসের মুখে তীরবেগে ছুটিল। মণীন্দ্রনাথ, মাধববাবুর দ্বাদশবর্ষীয় পুত্রটীর নাম। বালক এতক্ষণ ভয়ে জড়সড় হইয়া একপার্শ্বে বসিয়া কত কি ভাবিতেছিল। ভাবিতে ভাবিতে সহসা একটা কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। সে একদিন তাহার এক আত্মীয়ের নিকট শুনিয়াছিল যে, ঝড়ের সময় নৌকার ছহির ভিতর অবস্থান করা নিতান্তই নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য; কারণ, বিপদ উপস্থিত হইলে তখন আত্মরক্ষা করিবার কোন উপায় থাকে না। তাই সে মনে মনে স্থির করিল, একে একে সকলকেই টানিয়া বাহিরে লইয়া যাইতে হইবে। বহু পরিশ্রম

করিয়া সে তাহার মাতার সংজ্ঞাহীন দেহটীকে টানিয়া বাহিরে আনিল। তাহার রোরুদ্যমানা কনিষ্ঠা ভগ্নীটীও ধীরে ধীরে তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। ঠিক এই সময় একটা দমকা বাতাস হু হু শব্দে ছুটিয়া আসিয়া নৌকা উল্টা-ইয়া দিল।

জাহ্নবী নৌকাখানিকে গ্রাস করিলে, বালক মণীন্দ্রনাথের সকল চেষ্টাই এইস্থানে শেষ হইয়া গেল। ডুবিবার সময় বালক 'মা মা' রবে চীৎকার করিয়া, মাতার সংজ্ঞাহীন দেহ জড়াইয়া ধরিল। ঝড়ের বাতাস একবার হা হা করিয়া সেই স্থানটার উপর দিয়া বহিয়া গেল।

(৩)

মণীন্দ্রনাথ রক্ষা পাইয়াছিল। একটী ভদ্রলোক ঝড় বৃষ্টির পর নৌকাযোগে সেই পথে যাইতে যাইতে তাহাকে এবং তাহার মাতাকে অচেতনাবস্থায় দেখিতে পাইয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই অবধি কিন্তু মাধববাবুর আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। মাধববাবু ভবানীপুরে একটা বাটী ক্রয় করিয়াছিলেন। মণীন্দ্র মাতার সহিত সেই বাটীতেই থাকিয়া পড়াশুনা করিতে লাগিল। ক্রমে সে এফ্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। কিন্তু এফ্ এ পাশ করিয়াই তাহাকে চাকুরিতে প্রবেশ করিতে হইল, কারণ চাকুরি না করিলে আর চলে না। মাধববাবু যে অর্থ রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে এতদিন কোনও মতে সংসারের ব্যয় ও মণীন্দ্রের লেখাপড়ার খরচ চলিয়া গেল, কিন্তু এখন আর চলে না।

এদিকে মণীন্দ্রের চাকুরি হওয়ার অব্যবহিত পরেই মাতা গৃহে বধূ আনিবার জন্য বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কন্যা দেখিবার ভার পড়িল রামধন ভট্টাচার্য্যের উপর। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত মৃত মাধববাবুর বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর রামধন ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বেচ্ছায় এই বিপন্ন পরিবারের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। মণীন্দ্রের বাটীর দক্ষিণেই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটী।

একদিন অপরাহ্নকালে মাতাপুত্র বারাণ্ডায় বসিয়া সুখদুঃখের নানারূপ গল্প করিতেছিল। তখনও সন্ধ্যা হয় নাই। ভোলা কুকুরটা মণীন্দ্রের পার্শ্বে বসিয়া তাহার পা চাটিতেছিল। মণীন্দ্রনাথ মাতার সহিত গল্প করিতে-ছিল, আর মধ্যে মধ্যে প্রিয় কুকুরের মস্তকে হাত বুলাইতেছিল। সহসা কুকুরটা লম্ফ দিয়া উঠিয়া দ্বারের দিকে ছুটিল। মাতাপুত্র নীরব হইল।

কড়ানাড়ার শব্দ উভয়ের কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। মণীন্দ্র ত্বরিত পদে যাইয়া দ্বার খুলিয়া দেখিল, ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাহিরে দাঁড়াইয়া নাসারন্ধ্রে নস্য গুঁজিতেছেন। সে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের চরণে প্রণাম করিয়া বলিল—"ভিতরে আসুন।"

ভট্টাচার্য্যমহাশয় উভয় কর্ণমূল চাপিয়া ধরিয়া মহাশব্দে দুই তিনবার হাঁচিয়া বলিলেন—"বৌদি কোন কাযে ব্যস্ত আছেন না কি?"

মণীন্দ্র উত্তর করিল—"না, আপনি আসুন! মা বারাণ্ডাতেই বসে আছেন।"

ভট্টাচার্য্যমহাশয় বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মণীন্দ্র দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। যেস্থানে মাতা বসিয়াছিলেন, সে ভট্টাচার্য্য-মহাশয়কে সেই স্থানে লইয়া গেল। মণীন্দ্রের মাতাকে দেখিতে পাইয়া ভট্টাচার্য্যমহাশয় বলিলেন—"বৌদি, আজ একটা কাযের কথা বলিতে এসেছি।"

মণীন্দ্রের মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি?"

মণীন্দ্রনাথ একখানি আসন আনিয়া তথায় পাতিয়া দিয়া বলিল—"কাকাবাবু আপনি বসুন, দাঁড়িয়ে থাক্‌বেন কতক্ষণ?"

ভট্টাচার্য্যমহাশয় আসন পরিগ্রহ করিয়া বলিলেন—"পাত্রী ঠিক করেছি, এখন মণীন্দ্রের মনে ধরলেই হয়।"

মণীন্দ্রনাথ বড় লজ্জিত হইল। সে মস্তক নত করিয়া উত্তর করিল—"আজ্ঞে না, আমার দেখ্‌বার কিছু দরকার নেই।"

"কেন?"

"আপনি যখন দেখেছেন, তখন আমি আর কি দেখ্‌ব?"

"তোমার মত ছেলে বাবা আজকাল মেলা ভার। লোকে অনেক পুণ্যের ফলে তোমার মত ছেলে জামাই লাভ করে।"

মণীন্দ্র কোন কথা কহিল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ভট্টাচার্য্য-মহাশয় তখন মণীন্দ্রের মাতার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"কি বল বৌদি! তোমার মতটা কি?"

"মেয়েটী কেমন?"

"খুব সুন্দরী।"

"মেয়ের বাপ মা আছে?"

"হাঁ। বাপ বেশ সঙ্গতিপন্ন লোক, মফস্বলে তার জমীজমাও কিছু আছে।"

"ভাই বোন্ কটী?"

"আর ভাই বোন নেই, এই মেয়েটীই ভদ্রলোকের একমাত্র সন্তান।"

"আমার অমত কিছু নেই।"

"তবে সব ঠিক ঠাক করে ফেলি?"

"তা ফেল।"

তারপর বহুক্ষণ ধরিয়া নানারূপ গল্প করিয়া ভট্টাচার্য্যমহাশয় প্রস্থান করিলেন। এই বিবাহের সংবাদ শুনিয়া আর এক ব্যক্তি বড় সুখী হইল, সে বৃদ্ধ ভৃত্য নিধিরাম গোপ। নিধিরাম মণীন্দ্রকে প্রাণের অধিক ভাল বাসিত, কারণ সে কোলেপিঠে করিয়া তাহাকে মানুষ করিয়াছে।

(৪)

আজ মণীন্দ্রনাথের বিবাহ। বরণ শেষ হইয়া গেল। মেয়ের দল বরকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া হাঁকিল—"ওরে তোরা কেউ ক'নে নিয়ে আয় ত!"

কন্যাকে বরণের স্থানে আনয়ন করিবার নিমিত্ত যে দুইজন লোক গমন করিল, আমাদিগের নিধিরাম তাহার একজন। পাঁচ, দশ, পনের, ক্রমে ত্রিশ মিনিট অতিবাহিত হইয়া গেল, তথাপি ক'নের দেখা পাওয়া গেল না। স্ত্রীলোকগণ বড় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। দুই তিনজন কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া হাঁকাহাঁকি করিতে লাগিল; কিন্তু কেহই কন্যাকে বরণের স্থানে আনয়ন করিল না।

কতক্ষণ পরে বাটীর ঝী 'পঞ্চার-মা' হাপাইতে হাপাইতে তথায় আসিয়া দাঁড়াইল। স্ত্রীলোকেরা তাহাকে ঘিরিয়া নানারূপ প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু পঞ্চার মা কাহারও কথায় কর্ণপাত করিল না; সে আপন মনে বলিতে আরম্ভ করিল—"ও মা, কোথা যাব! এ আবার কি কাণ্ড দেখ দেখি গা? কর্ত্তা যখন মেয়েটাকে কুড়িয়ে আনেন, তখনই আমরা সকলে বলেছিলুম, এ বোঝা আবার ঘাড়ে করবার দরকার কি? কর্ত্তা ত তা শুনলেন না! এখন কেমন?" ভিড়ের ভিতর হইতে একটী স্ত্রীলোক প্রশ্ন করিল—"কি লা—হয়েছে কি?"

পঞ্চার মা বলিল—"হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু! গেছে সব গোল পাকিয়ে।"

স্ত্রীলোকটী পুনরায় প্রশ্ন করিল—"কি গোল হয়েছে লা ?"

পঞ্চার মা বলিল—"বিয়ে যে বন্ধ হয়ে গেল গা ! তোমরা বুঝি শোন নি তা ?"

স্ত্রীলোকগণ প্রায় সকলেই পঞ্চার মাকে ঘিরিয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিল—"ও মা সে কি ! বন্ধ হ'ল কেন জানিস্ ?"

পঞ্চাব মা গম্ভীর হইয়া বলিল—"তোমরা কি গা ? এ কথাটাও শোন নি ? ক'নে যে বরের বোন !"

আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত আছি যে, সেই রাত্রেই অন্য পাত্র-পাত্রীর সহিত ভগ্নী এবং ভ্রাতার শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছিল।

শ্রীললিতকুমার সিংহ।

ভালবাসা।

১

লোকে বলে ভালবাসা,—
ভালবাসা কিবা তাহা নিবসে কোথায় ;
কেমনে প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকে কিবা বেশে ;
কিরূপে উত্থিত হয়, কেমনে জানায় ;
না পারি বুঝিতে কিছু কেন উঠে ভেসে !

২

ভীষণ হরিদ্র-মরু বিস্তৃত প্রান্তর,
শোভে মাঝে মাঝে যথা মনোরম স্থান,—
সুশীতল ছায়াময় নীল সরোবর
নিরাশার আশা পূর্ণ শ্যাম মরূদ্যান।

৩

যেরূপ সরসীজাত বিম্ব সমুত্থিত,
মিলায় পলক মধ্যে উদক উপরে
অথবা আকাশ-মার্গ বিহগ উত্থিত
ছায়ারূপে ভাসে যথা সলিলের পরে ;—

৪

হৃদয়-পয়োধি-মাঝে কিগো সেইরূপ,
ভাসিয়া মিলায়ে পুনঃ যায় ভালবাসা ?
তা নয়—তা নয় কভু, তাহার স্বরূপ
কখন' না হ'তে পারে এই ভালবাসা !

৫

তাই যদি হবে তবে জনম অবধি,
পিতা মাতা দারা সুতে করি আকর্ষণ,
সুপবিত্র প্রেম-পাশে বাঁধি নিরবধি,
কেটে যায় শান্তি-পূর্ণ মানসে কেমন!

৬

তবে কি এ ভালবাসা মায়ার বন্ধন?
হ'লেও হইতে পারে; তাই কি সকলে,
না পারিয়া করিবারে তার উৎপাটন
দেবতা অর্চ্চনা করে কুসুমের-দলে?

৭

কখনই নহে; তাহা না হইতে পারে!
মায়ার বন্ধন হ'লে তিল অদর্শনে,
মেঘ-সম কেটে যেত বিস্মৃতির-পারে;
ক্ষণেকের তরে আর না আসিত মনে।

৮

ভালবাসা নহে কিছু ভালবাসা ছাড়া,
অদৃষ্ট অমর স্নিগ্ধ পবিত্র উজ্জ্বল!
শ্রবণ শুনিতে নারে; নয়নের তারা
না পারে স্পর্শিতে; মন প্রফুল্ল—বিহ্বল—

৯

মরমে প্রেমের-স্রোত তরঙ্গিণী-সম;
নিমেষের অদর্শন-বিচ্ছেদ-কাতর—
দহে অন্তস্তল, যথা জ্বলে অনক্রম
তুষানল ধিকি ধিকি,—পোড়ে না সত্বর!

১০

সেই সে দাহন, যেন তাহাতেও সুখ;
আশা-মরীচিকা সম বিচ্ছেদ মিলন;
হৃদয়ে না বিন্দুমাত্র উপজয় দুঃখ;
প্রেমের স্বপন যেন স্মৃতির-স্পর্শন!

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষাল।

কুচবিহার ও দার্জ্জিলিং ভ্রমণ।

(১)

একদিন মনের মধ্যে এক খেয়াল চাপিল যে দেশ ভ্রমণে যাইতে হইবে; কিন্তু কথা মনে উঠিলেই তো আর কোন কায হয় না; সুতরাং তার যোগাড় করিতে নিযুক্ত হইলাম। রেলে চাকুরি করি, কাযেই 'পাস' (Pass) অনায়াসেই পাইতে পারিব, এই বিবেচনায় 'কপালঠুকে' এক লম্বা দরখাস্ত সাহেবের নিকট 'পেশ' করিলাম; লিখিয়া দিলাম,—"আগামী ২২এ আগষ্ট (১৯০৯ খৃঃ অঃ) সোমবার জন্মাষ্টমীর ছুটী আছে, দয়া করিয়া মঙ্গলবার ও বুধবার ছুটী ও নিজের জন্য কলিকাতা হইতে জয়ন্তী (Cooch Behar state Railway) পর্য্যন্ত যাতায়াতের 'পাস' মঞ্জুর করিবেন।" সৌভাগ্যের বিষয়, তৎপর দিনই 'ছুটী মঞ্জুর' ও পাস পাইলাম; এইবার উৎসাহের সহিত আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত রহিলাম; কিন্তু আধুনিক নভেলী ধরণের, ছয়হাত লম্বা চারহাত চওড়া হোয়াইটওয়ে সেড্‌ল'র ব্যাগ, (Rug) কোয়ার্টার ডজন 'ষ্টকিন্স', 'হাণ্ডকারচিফ্', চারটা 'পেণ্ট', হাফ্ ডজন 'সার্ট' ও চার রকমের চারটা 'নেকটাই' ইত্যাদির কোনওটাই লওয়া হইল না। কিম্বা প্রাইমাস্ সুপিরিয়র ষ্টোভ, লিপ্‌টন্‌স অরেঞ্জ পিকো বা হাণ্টলি পামারের মিক্‌সড হাউস্‌হোল্ড বিস্কিট—এ সবেরও কোনও যোগাড় করিতে পারিলাম না। তবে কি নিয়ে দেশ ভ্রমণে যাওয়া হবে! আর এসব যদি লওয়া হইল না, তবে এমন 'বিদখুটে' খেয়ালই বা কেন চাপিল! কিন্তু 'গরীবের কি ঘোড়া চড়িতে সাধ যায় না?' যাই হউক্, আমার ভ্রমণোপযোগী দ্রব্যসমূহের দীর্ঘ তালিকা একবার প্রকাশ করি; একখানি বালাপোষ, দুইখানি মোটাধুতি, একখানি গামছা ও দুটী সাদা জিনের কোট লইয়া একটী অর্দ্ধছিন্ন ক্যানভাসের (Canvas) ব্যাগে পূরিয়া রাখিয়া দিলাম।

২০ এ আগষ্ট শনিবার দিন বৈকালের গাড়ীতে উঠিয়া যাত্রা করিলাম। আমাকে ফেয়ার ওয়েল (Farewell) দিবার জন্য কেহই ষ্টেশনে উপস্থিত হন নাই, কিম্বা ট্রেণ ছাড়িয়া দিলে রুমাল উড়াইয়া বিদায়সূচক আনন্দ প্রকাশ করিতেও কেহ আসিলেন না, অথচ আমি বেশ সন্তুষ্টচিত্তে গাড়ীতে বসিয়া রহিলাম। যথাসময়ে ঘণ্টাধ্বনি ফ্ল্যাগ (Flag) ও বংশীধ্বনি

দ্বারা আদেশবাণী হইলে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। পথিমধ্যে প্রধান প্রধান ষ্টেশন, বারাকপুর, নৈহাটী, রাণাঘাট, বগুলা, পোড়াদহ প্রভৃতি যথাক্রমে ছাড়াইয়া গেল। সন্ধ্যার ক্ষণপরেই খরস্রোতা, বিপুলকায়া পদ্মানদীতীরে, দামুকদিয়াঘাট ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিয়া ষ্টীমারে উঠিলাম। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য স্বতন্ত্র রাস্তা; মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণীর স্বতন্ত্র রাস্তা নির্দ্দিষ্ট আছে। তবে রেলওয়ে মুটিয়াদিগের বড়ই উৎপাত দেখিলাম। তাহারা দুই চার পয়সার স্থলে "আট আনা লইব, একটাকা লইব" ইত্যাদি বলিয়া যাত্রীদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে। সকলেরই মনে মনে ইচ্ছা যে শীঘ্র শীঘ্র ষ্টীমারে যাইবে; কিন্তু মুটিয়াদিগের ঐরূপ দর দেখিয়া শুনিয়া, কখনও বা তাহাদিগকে গালাগালি দিতেছে, কখনও বা নিজের অদৃষ্টের নিন্দা করিতেছে। বিশেষ যাঁহাদিগের সহিত স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি আছে, তাঁহারা তো কুলিরা যে ভাড়া বলিতেছে, প্রায় কতকটা তাহাতেই রাজী হইতেছেন। অন্য কোনও উপায় নাই—থাকিলেও তখন সে সব করে কে! যাহা হউক, এইরূপে প্রায় ৩৫।৪০ মিনিটের পর ষ্টীমার ছাড়িল। একঘণ্টা পরে ষ্টীমার সারাঘাট ষ্টেশনে নোঙ্গর করিল।

(২)

আমি ষ্টীমার হইতে নামিয়া ধুবড়ীঘাটগামী ট্রেণে উঠিলাম। কিছুক্ষণ পরে গাড়ী ছাড়িয়া নাটোরে উপস্থিত হইল। এই সেই অর্দ্ধবঙ্গেশ্বরী, প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী রাণী ভবানী-দেবীর রাজধানী। এইস্থানে একদিন কত জমীদার, তালুকদার, রাজা, প্রজা, দীন, দুঃখী মহারাণীর নিকট উপস্থিত হইয়া নিজ নিজ প্রার্থনা জানাইয়া, সফলকাম ও সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া যাইতেন। এখন কেবলমাত্র সেই নামের সুমধুর, সুখময় স্মৃতিটুকু পড়িয়া আছে, সে গৌরব এখন কোন অজ্ঞাত অতীতের গর্ভে লুক্কায়িত।

আমাদের গাড়ী ক্রমে ক্রমে অনেক ষ্টেশন ছাড়াইয়া পরদিবস প্রাতঃকাল সাতটার সময় 'গিতালদহ' জংসন (Gitaldah Junction) ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। এখান হইতে একটী ক্ষুদ্র লাইন (2—6 "Gange Line) জয়ন্তী অভিমুখে গিয়াছে। তাহাকে কুচবিহার ষ্টেট্ রেলওয়ে (Cooch Be har state Railway) কহে। (তখন এই লাইনটী Narrow gange

ছিল, এখন Methe gange হইয়াছে)। আমি এখানে নামিয়া কুচবিহার লাইনের গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। কিছুক্ষণ পরেই গাড়ী ছাড়িল ও বেলা আন্দাজ নয়টার সময়ে জয়ন্তী পাহাড় আমার নয়ন-গোচর হইল। দুর হইতে পর্ব্বত দেখা যে কত সুখকর, তাহা লেখনীমুখে ব্যক্ত করা শক্ত। প্রথমটা মনে হইল যে, দিগন্তের কোলে খুব মেঘ করিয়াছে, বৃষ্টিপাতের পূর্ব্বলক্ষণ। ক্রমে গাড়ী আরো অগ্রসর হইলে মনে হইল 'খুব কুয়াসা' করিয়াছে; ক্রমে সেই পর্ব্বতমালা বেশ স্পষ্টরূপে দৃষ্টি-গোচর হইল। বেলা ১০ টার কিছু পরে কুচবিহার ষ্টেশনে অবতরণ করিলাম।

আমাদের আপিসের একটী বাবুর জনৈক বন্ধু কুচবিহার রাজকলেজের 'প্রফেসার', নাম শ্রীযুক্ত তারাপদ মুখোপাধ্যায়। আমি আসিবার সময়ে, এই তারাপদ বাবুর নামীয় একখানি 'পরিচয় পত্র' Letter of Introduction সঙ্গে আনিয়াছিলাম। এখানে নামিয়া অল্পায়াসেই তারাপদ বাবুর বাসা অনুসন্ধান করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। তাঁহার বাসায় উপস্থিত হইয়া, পত্রখানি তাঁহার হাতে দিলাম। তিনি উহা পাঠান্তে অতি সমাদরে আমাকে ভিতরে লইয়া গেলেন।

তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর স্নান করিতে গেলাম। এখানকার প্রায় সমস্ত পুষ্করিণী মহারাজাধিরাজের ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার জলও বেশ স্বাস্থ্যকর ও পানযোগ্য। স্নান ও আহারাদি সম্পন্ন করিয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য বিশ্রাম লইলাম।

বেলা ৪টার সময় উঠিয়া নগর পরিদর্শনের অভিপ্রায় প্রকাশ করাতে শ্রীযুক্ত তারাপদ বাবু তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রটীকে আমার সঙ্গে দিলেন। এখানকার রাজপথসকল বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও আমাদের দেশীয় রাজপথ অপেক্ষা অনেক পরিমাণে উন্নত। এখানকার মহারাজের বাটী বেশ সুন্দর ও সুসজ্জিত। শুনিলাম মহারাজা খুব শিকারপ্রিয়; শৃঙ্গসমেত নানা আকারের হরিণমস্তিষ্ক অনেক পরিমাণে দেখিয়া, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণও পাইলাম। স্কুল, কলেজ, হোষ্টেল প্রভৃতি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এখানকার জেল-খানায় যে সব কয়েদী থাকে, তাহাদের অবস্থা ভাল। যাহা হউক, এখানে মহারাজাবাহাদুর নিজে মধ্যে মধ্যে আসিয়া জেল পরিদর্শন ও কয়েদীদিগের স্বাস্থ্যবিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখেন; সুতরাং হতভাগ্যদিগকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না।

(৩)

ফকিরার তকিয়া হইতে বাণেশ্বর পর্য্যন্ত চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ মহারাজের এলাকাধীন,—কুচবিহার রাজধানী। এখানকার বিচার-বিভাগ, শাসন ও শিক্ষা-বিভাগের বন্দোবস্ত মহারাজের ইচ্ছাক্রমেই হইয়া থাকে এবং উর্দ্ধতন ও নিম্নতন কর্ম্মচারিগণ সকলেই এতদ্দেশীয়। কেবল একজন মাত্র বিচক্ষণ ইংরাজ রাজপুরুষ রেসিডেণ্ট (Resident of the state) নামে অভিহিত হইয়া এখানে বাস করেন। কোনওরূপ হত্যাসম্বন্ধীয় বিচার ব্যাপারে বা অত্যাবশ্যক গুরুতর রাজকার্য্যে মহারাজার সহিত পরামর্শ করিয়া রেসিডেণ্ট সাহেব ঐসকল কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। মুদ্রা প্রচলন সম্বন্ধে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিয়মানুসারেই চলিত হয়, যেহেতু তাহা না করিলে ব্যবসা বাণিজ্যের অসুবিধা হইতে পারে। ভারতবর্ষের সমস্ত স্বাধীন ও সামন্ত নরপতিগণের মধ্যে এখানকার মহারাজাও একজন!—নাম নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর। (His Highness the Moharaja Nripendra Narain Bhup Bahadur K. C. I. E)

এক্ষণে এই কুচবিহার সম্বন্ধে একটু ঐতিহাসিক আলোচনা বোধহয় এস্থলে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। শুনা যায়, পূর্ব্বকালে মহাযোগী শঙ্কর জগন্মাতা দক্ষরাজনন্দিনীকে উপেক্ষা করিয়া, মধ্যে মধ্যে 'কুচনী-পাড়াতে' যাতায়াত করিতেন। অবশ্য তিনি দ্বাপর যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় (আধ্যাত্মিক ভাবে গোপবালার সহিত রাসলীলা করার মত) কোনওরূপ লীলা করিয়াছিলেন কি না, তাহা জানি না। হিমালয়-প্রদেশের স্থানবিশেষ হইতে একটী রাস্তাও নাকি এখান পর্য্যন্ত আছে, এইরূপ শুনা যায়। যাহা-হউক, সেই 'কুচনীপাড়া' হইতে ক্রমে ইদানীন্তন 'কুচবিহার' নাম হইয়া থাকিবে, ইহা কতকটা অনুমান করিতে পারা যায়।

আবশ্যকীয় ও দর্শনযোগ্য স্থানসমূহ পরিদর্শন সমাপ্ত করিয়া, বাসায় ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। সে রাত্রির মত শ্রীযুক্ত তারাপদ বাবুর বাটীতে আহার ও বিশ্রাম করিয়া তৎপর দিবস প্রাতে দশটার সময় পুনরায় আহা-রাদি শেষ করিয়া, এই ভদ্র পরিবারের নিকট বিদায় লইয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে 'জয়ন্তীর' ট্রেণ আসিলে তাহাতে আরোহণ করিলাম। কুচবিহার ষ্টেশনের পরেই 'বাণেশ্বর' নামক ষ্টেশন হইতে প্রায় ৩ মাইল দূরে 'বাণেশ্বর' নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন; সেই নামানু-

সারেই বোধহয় এস্থানের নাম 'বাণেশ্বর' হইয়া থাকিবে। একটী ভদ্রলোক যাত্রীর মুখে শুনিলাম—পূর্ব্বে এই স্থানেই 'বাণরাজার' বাটী ছিল এবং তিনিই এই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহাকে 'বাণেশ্বর' কহে।

শিবরাত্রির সময়ে এখানে বহু যাত্রী-সমাগম হইয়া থাকে। ইহার একটী ষ্টেশন পরেই 'বক্সারোড্' নামক ষ্টেশন; এখান হইতে অন্যূন ৪।৫ মাইল দূরে পর্ব্বতোপরি ইংরাজ-রাজের একটী সুরক্ষিত দুর্গ বর্ত্তমান আছে। এই স্থান হইতে আমাদের গাড়ীখানি উপর দিকে উঠিতে লাগিল; প্রায় এক ঘণ্টা পরে 'জয়ন্তী' ষ্টেশনে উপনীত হইলাম।

(৪)

এ স্থানটা একেবারে লোকালয়শূন্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কারণ, ভদ্রলোকাশ্রয় তো নাই-ই,—অধিকন্তু পাহাড়িয়া কুলিদের যে সমস্ত বসতি আছে, তাহাও সংখ্যায় অত্যন্ত অল্প। ষ্টেশন মাষ্টার বাবুটীর সহিত আলাপ পরিচয়ে বুঝিলাম যে, এখানে মধ্যে মধ্যে বন্য জন্তুর উপদ্রবও হইয়া থাকে। ইঁহারা অতি ভীতচিত্তে, চাকুরির খাতিরে থাকিতে বাধ্য হইয়াছেন। ষ্টেশন হইতে ২।৩ মিনিটের পথ গমন করিয়া 'তীস্তা' নদী দর্শন করিলাম; নদীতে জল অধিক নহে; হাটিয়া পার হওয়া যায়—কিন্তু জলের মধ্যে এত বেশী প্রস্তরখণ্ড বিক্ষিপ্ত আছে যে, একটু অসাবধান হইলেই জলের মধ্যে পড়িয়া গিয়া আঘাত লাগিতে পারে। ইহার স্রোতও খুব বেশী; একস্থানে ১ মিনিট নিরবলম্বনে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারা যায় না,—অধিকন্তু এরূপ ভীষণ জল-কল্লোল ইতিপূর্ব্বে কখনও শুনি নাই। পর্ব্বত গাত্র হইতে নিঃসৃত নদীসকল একেই অত্যন্ত বেগবতী; তদুপরি সেই বেগ প্রস্তরখণ্ডসমূহে বাধা প্রাপ্ত হইয়া ভীষণ গর্জ্জনের সহিত প্রবাহিতা; সমুদ্রগর্জ্জন কখনও শুনি নাই—কিন্তু এইস্থানে—এই চতুর্দ্দিক বেষ্টিত পর্ব্বতমালার মধ্যস্থিতা—এই বেগবতী নদীর গর্জ্জন শ্রবণ করিলে প্রকৃতই মনোমধ্যে আতঙ্ক-সঞ্চার হয়। এখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা আকারের প্রস্তরখণ্ড ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। আমি কয়েকটী সঙ্গেও লইলাম। তৎপরে তথা হইতে ফিরিয়া ষ্টেশনে আসিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। কিছুক্ষণ পরেই গাড়ী ছাড়িল ও সন্ধ্যার অর্দ্ধঘণ্টা পরেই পুনরায় 'গিতালদহ' পৌঁছিলাম;—তথায় অবতরণ করিয়া প্রধান লাইনের (Main Line) গাড়ীতে উঠিলাম। তৎপরদিবস বেলা ৩ টা ১২ মিনিটের সময় কলিকাতায় পৌঁছিয়াছিলাম।

(৫)

কুচবিহার হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পার্ব্বত্যপ্রদেশে বেড়াইতে যাইবার বাসনা মনোমধ্যে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। মনে করিলাম, দার্জ্জিলিংএর মত পার্ব্বত্য প্রদেশ, অথচ এমন সুন্দর স্বাস্থ্যকর স্থান খুব কমই আছে, কিন্তু এবার আশ্বিন মাসের শেষে ৺পূজার ছুটী; সুতরাং সে সময়ে দার্জ্জিলিংএ খুব শীত; তারপর বড়দিনের ছুটী—সে সময়ের শীতের তো কথাই নাই; কষ্টে-সৃষ্টে কয়টা মাস কাটাইয়া দেওয়াই শ্রেয়ঃ বিবেচনায় চুপ করিয়া থাকিলাম। তারপর গরম পড়িলে, ইষ্টার হলিডে'র (Easter Holiday) ছুটীতে পাস লইয়া দার্জ্জিলিংএ যাত্রা করিলাম।

বৃহস্পতিবারের বারবেলাতে ৫টা'র দার্জ্জিলিং মেলে, এখান হইতে অন্য কয়েকটী আপিসের বন্ধুসহ যাত্রা করিলাম ও তৎপরদিবস শুক্রবার প্রাতঃ-কালে শিলিগুড়ি ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। এখানে অবতরণ করিয়া,—এখান হইতে যে ছোট লাইন (2 ft Gange) দার্জ্জিলিং অভিমুখে গিয়াছে—তাহাতে আরোহণ করিলাম। ইহাকে দার্জ্জিলিং হিমালয়ান রেলপথ (Darjeeling Himalayan Railway) কহে। ইহাতে মধ্যম শ্রেণীর কামরা নাই। তৃতীয় শ্রেণীর যে কামরা আছে, তাহাও দরজা, জানালা-বিহীন। বেশী অসাবধানে গাড়ীতে বসিয়া থাকিলে, হঠাৎ পড়িয়া যাওয়াও অসম্ভব নহে। 'সাম্‌না-সাম্‌নি' দুইখানি বেঞ্চ, ৩ জন করিয়া ৬ জন বা ৪ জন করিয়া ৮ জনে বসিতে পারে; কিন্তু অধিক মোটমাটারি থাকিলে বড়ই কষ্টে পড়িতে হয়। গাড়ী শিলিগুড়ি ছাড়িয়া যখন শুক্‌না (Sukna) ষ্টেশনে উপস্থিত হইল, তখন পর্য্যন্ত নিম্নোচ্চতার বিশেষ তারতম্য উপলব্ধি হয় না। তথা হইতে গাড়ী ছাড়িলে বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, গাড়ী উর্দ্ধ-দিকে উঠিতেছে। তখন আমার মনে এত বেশী আনন্দ হইয়াছিল যে, তাহা বুঝাইয়া লিখিবার ক্ষমতা আমার মত অল্পবুদ্ধি বালকের নাই। প্রকৃতি দেবীর, অভিনব ও অদৃষ্টপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যরাশি দর্শন করিতে করিতে আত্মহারা হইতে হয়। একটা প্রবাদ বচন প্রচলিত আছে যে "অমুক জিনিষটা দেখ্‌লে আর ক্ষুধা তৃষ্ণা মনে হয় না"। এরূপ কথা, এতদিন কবি-কল্পনা জ্ঞানে হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছি; কিন্তু তখন প্রকৃত পক্ষেই ইহার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিয়াছিলাম। যিনি এই সমুদয় নয়নানন্দকর সুন্দর দৃশ্যাবলী সৃজন করিয়া-ছেন—না জানি, তিনি কত সুন্দর! দুর্ব্বলচিত্ত মানব আমরা—সেই

অনন্তময়ের, অনন্ত শক্তির বিকাশ দেখিয়া আহ্লাদে আত্মহারা হই, কিন্তু একবারও তাঁকে ভাবিতে পারি না ;—সর্ব্বদা আত্মসুখেই ব্যস্ত থাকি। যাহা হউক, এ স্থলে এ সকলের অবতারণা করিয়া, অনর্থক গ্রন্থকলেবর পুষ্ট করিয়া পাঠকবর্গের অসন্তোষ-ভাজন না হওয়াই উচিত।

(৬)

রেলপথের কোথাও বা 'খানিকটা' সোজা (বড় জোর ৪০।৫০ হাত), 'খানিকটা' একেবারে নীচের দিকে ঢালু, 'খানিকটা' আবার হয় তো একেবারে 'খাড়া' উপরের দিকে উঠিতে হয়। বড়ই সুন্দর—বড়ই মনোরম। পর্ব্বত-গাত্রে সংখ্যাতীত ঝরণা ;—কোনওটী বৃহৎ, কোনওটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। সেই সমস্ত ঝরণা হইতে টিনের নল সাহায্যে, জল লইয়া গিয়া চা-বাগান বা অন্যান্য সাময়িক ফসলাদির চাষ হইয়া থাকে। আমাদের বাষ্পীয় যান, ক্রমে ক্রমে, রংটং (Rungtong), টিনধরিয়া (Tindharia), মহানদী (Mahanodi) প্রভৃতি কয়েকটী অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট ষ্টেশন ছাড়াইয়া—কারসিওং (Kurseong) ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। পার্ব্বত্য প্রদেশীয় স্থানের নামানুসারেই বোধহয় (এতদ্দেশের শ্রুতি-কটু) এই ষ্টেশনসকলেরও নামকরণ হইয়াছে।

কারসিওং ষ্টেশনটী বেশ বৃহৎ ষ্টেশন। এখান হইতে নিম্নে, দক্ষিণ পশ্চিমদিকে দৃষ্টিপাত করিলে সমতলভূমি দৃষ্টিগোচর হয়। অনেক বড় বড় সাহেব, কার্য্যব্যপদেশে বা স্বাস্থ্যরক্ষার্থে এখানে বাস করেন। শুনা যায়, দার্জ্জিলিং অপেক্ষাও অধিক সাহেব নাকি এইখানে থাকেন। স্থানটীকে একটী 'ছোট-খাট' রকমের সহর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ষ্টেশনে একটী প্রথম শ্রেণীর হোটেল (Refreshment Hall) বর্ত্তমান আছে। ধনবান সাহেব ও বাঙ্গালিগণ এখানে অবতরণ করিয়া হোটেলে গিয়া স্নান ও ভোজনাদি করিয়া লইতে পারেন। সে জন্য গাড়ীও এখানে প্রায় ৪৫ মিনিট অপেক্ষা করে। এখানে পেঁপে বেশ সস্তা দেখিলাম। মহিষ-দুগ্ধের ক্ষীরও যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। আমাদের মত দরিদ্র ভ্রমণকারীদের পক্ষে এ দুইটীই উৎকৃষ্ট খাদ্য ; অথচ আমাদের দেশ অপেক্ষা এখানে সস্তা। যাহা হউক, এখান হইতে গাড়ী ছাড়িয়া আরও দুই তিনটী ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া 'ঘুম' (Ghoom) ষ্টেশনে পৌঁছিল। এই স্থানটী দার্জ্জিলিং অপেক্ষাও অধিক উচ্চ। এখান হইতে গাড়ী ছাড়িলে—বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, গাড়ী বরাবর নীচের দিকে নামিয়া আসিতেছে। বেলা ১টার কিছু পরেই

আমরা দার্জ্জিলিং পৌঁছিলাম। এই চৈত্র মাসের শেষেও এখানে এত বেশী শীত যে, আমাদের দেশের পৌষ মাঘ মাসে বৃষ্টি বাদলা হইলে যেরূপ শীতানুভব হয়, ঠিক সেইরূপ বা তদপেক্ষাও কিছু অধিক বলিলেও ক্ষতি নাই। আমরা সকলেই, গরম গাত্রবস্ত্রাদি সঙ্গে আনিয়াছিলাম; টিনধরিয়া, রংটং প্রভৃতি ষ্টেশনের পর হইতেই ক্রমে সেই সমুদয় গায়ে দিতে আরম্ভ করিয়া এতক্ষণে সমস্তই যথাযথ স্থানে পরিধান করিয়াছি। আমরা ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া অনেকগুলি (Rickshaw) রিক্‌স দেখিলাম; সেগুলি সাধারণতঃ এতদ্দেশীয় ছোট টম্‌টম (Tandum) গাড়ীর ন্যায় ও তাহাতে একজন কিম্বা অতিকষ্টে দুইজন ব্যক্তি বসিতে পারে মাত্র। মানুষেই টানে ও অপর একব্যক্তি পিছন হইতে ঠেলে। কারণ, এখানে সমতল রাস্তা একেবারেই নাই। অন্য কোনও প্রকার 'যান' এখানে পাওয়া যায় না। ছোট ছোট কয়েকটী ঘোটক ভাড়া পাওয়া যায়।

আমরা বাহির হইয়া, সকলেই যে যার, নিজ নিজ আত্মীয় কুটুম্বদের বাসার অনুসন্ধানে চলিলাম। আমিও একজন আত্মীয়ের বাসা অনুসন্ধান করিয়া লইলাম। বাসায় পৌঁছিয়া আহারাদি করিতে প্রায় সন্ধ্যা হইল। সুতরাং বিদেশে, সান্ধ্যভ্রমণ সুবিধাজনক নহে বিবেচনাতে আর বাহির হইলাম না। পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া বাসার বাহিরে আসিয়া জগদ্বিখ্যাত ধবলগিরি দর্শন করিলাম। সে যে কি সুন্দর দৃশ্য, তাহার বর্ণনা করা অসম্ভব। তুষারস্তূপের উপর তুষার রাশি—আবার তেমনি শুভ্র। মনে হয় যেন, আকাশ ভেদ করিয়া সেই তুষারস্তূপ কোন অনির্দ্দিষ্টের দিকে প্রধাবিত।

(৭)

বেলা ৭॥০ টার পর চা-পান শেষ করিয়া সহর পরিদর্শন করিতে বাহির হইলাম। প্রথমেই সেখানকার ভূটীয়া বঙ্গবিদ্যালয় দর্শন করিলাম। তৎপরে বাজার ও অন্যান্য কয়েকটী ছোট গিরিচূড়া বেড়াইয়া আসিয়া লিবং কেন্‌টন্‌মেণ্ট (Lebong Cantonment) দেখিতে চলিলাম। উক্ত পর্ব্বতচূড়াটী দার্জ্জিলিং বাজার হইতে যাতায়াতে প্রায় চারি মাইল হইবে। এই পর্ব্বতশিখরে ইংরাজরাজের একটী সুরক্ষিত দুর্গ বর্ত্তমান আছে। দুই তিন দল গোরা ফৌজ এখানে থাকে। এখানে উঠিবার যে রাস্তা আছে, তাহা অত্যন্ত কষ্টকর। রাস্তা যদিও বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও স্থানে স্থানে প্রস্তর বাঁধান আছে, কিন্তু অত্যন্ত উচু নীচু ও স্থানবিশেষে একেবারে সোজা উপরের দিকে

উঠিতে হয়। উঠিবার সময়অপেক্ষা নামিবার সময় বেশী কষ্ট হয়। যাহা হউক, তথা হইতে বাসায় ফিরিয়া স্নানাহার সম্পন্ন করিলাম। এখানেও কারসিওংএর ন্যায় পেঁপে বেশ সস্তা। চারি পয়সায় যত বড়টী পাওয়া যায়, কলিকাতায় সেই আকারের একটী সুপক্ক পেঁপের দাম তিন আনা বা তদপেক্ষাও বেশী পড়ে। কপি, মটরশুটী, শিম, পালংশাক প্রভৃতি শীতঋতুর সাময়িক শাক সব্‌জী এখনও এখানে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় এবং প্রায় সর্ব্ব ঋতুতেই মেলে। ঐ সমস্ত জিনিষ সস্তাও বেশ দেখিলাম। মৎস্য প্রায়ই পাওয়া যায় না। অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী আমাদের দেশ অপেক্ষা সামান্যই বেশীমূল্যে বিক্রয় হয়। এখানকার রবিবারের বাজার সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য। সাহেবেরা সান্‌ডে মার্কেট (Sunday market) কহে। কতকটা আমাদের দেশের 'হাটের' মত। সপ্তাহে একদিন মাত্র হয়, সুতরাং অনেক-দূর হইতে পণ্যদ্রব্যাদি আসিয়া বিক্রীত হয়। সহরটী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; দেখিলে সত্যই মনে বেশ আনন্দানুভব হয়। এতক্ষণ ঘুরিয়া আসিয়াও বিশেষ কোনও কষ্টানুভব হয় নাই। আহারাদির পর পুনরায় নিম্নদিকে অবতরণ করিয়া কোম্পানির বাগান (Natural Botanical Garden) দর্শন করিয়া ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত (Victoria waterfalls) দর্শন করিতে করিতে খানিকটা নিম্নে (প্রায় দুই বা আড়াই মাইল) নামিয়া গেলাম। ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম। দার্জ্জিলিংএর উচ্চতা ৭৫০০ ফুট (Form the sea level) এখানকার লোকসংখ্যা ৯৪৭১২ (Census report of 1901)।

(৮)

পরদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক 'ম্যাল' বা 'চৌরাস্তা' (Male or chourasta) দর্শন করিলাম। বড় বড় সাহেবেরা এই স্থানটীকে মনোনীত করিয়া নিজেদের বাসোপযুক্ত করিয়া লইয়াছেন। হোয়াইটওয়ে লেড্‌ল, গ্র্যাণ্ডইষ্টার্ণ হোটেল, (Whiteaway Laidlaw & Co & Grand Eastern Hotel) প্রভৃতি কয়েকটী বড় বড় সাহেবের দোকানও আছে। অনেকে সাধারণ কথায় ইহাকে 'সাহেব-বাজার'ও বলেন। এই সমস্ত দর্শনাদি সমাপ্ত করিয়া, বাসায় ফিরিয়া আহারাদি সম্পন্ন করিয়া,—দীঘা-পাতিয়া, বর্দ্ধমান, কুচবিহার, নড়াইল প্রভৃতি কয়েকটী বঙ্গদেশীয় স্বনামধন্য রাজা ও জমীদারদিগের প্রাসাদ দর্শন করিলাম। বড়ই সুন্দর ও মনোরম স্থান পছন্দ করিয়া ইঁহারা প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। 'লাটপ্রাসাদ'ও

(Government House) দর্শন করিলাম। এখানে একটী প্রবাদ শুনিলাম যে, পূর্ব্বে এস্থানে 'কাক' দেখা যাইত না। কিছুকাল পূর্ব্বে বর্দ্ধমানের মহারাজা কয়েকটীকে আনিয়া, এখানে ছাড়িয়া দেন। এস্থান ত্যাগ করিয়া, 'জালা-পাহাড়' (Jallapahar) উদ্দেশে উপরের দিকে উঠিতে লাগিলাম। প্রায় ২ দুই মাইল রাস্তা উঠিয়া এইস্থানে উপস্থিত হইলাম। এই স্থানে একজন সন্ন্যাসী দলবলসহ বাস করেন। সেইখানে তাঁহার প্রণামী স্বরূপ কিছু দিয়া, একটী 'ন্যাকড়ার টুক্‌রা' তৎসন্নিকটস্থ একটী বৃক্ষে বাঁধিয়া আসিতে হয়। এই স্থানে 'দুর্জ্জয়লিঙ্গ' নামে এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁহা একটী গহ্বর মধ্যে স্থাপিত আছে বলিয়া, সমাগত যাত্রীরা, তাঁহার দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হন না;—উদ্দেশেই প্রণাম করিয়া যাইতে হয়। গহ্বরমুখ 'জাল' (Net) দ্বারা ঘেরা আছে। এই প্রবাদ যে, এই স্থান হইতেই 'কুচ-বিহার' যাইবার রাস্তা আছে, কিন্তু কোনও ব্যক্তি এই রাস্তা ধরিয়া 'কুচবিহারে' উপস্থিত হইতে পারিয়াছেন, এরূপ কথা শুনিলাম না বা কখনও শুনি নাই; সুতরাং ইহার সত্যাসত্য সম্বন্ধে সহৃদয়, অনুসন্ধিৎসু, পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন। শুনিলাম, এই 'দুর্জ্জয়লিঙ্গ' নাম হইতেই ক্রমে 'দার্জ্জিলিং' নাম হইয়াছে। এই শিবলিঙ্গ কাহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাও জানিতে পারিলাম না। তত্রত্য অনেক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন তথ্যাবিষ্কার করিতে সমর্থ হইলাম না।

(৯)

যাহা হইক, এখানকার উল্লেখযোগ্য স্থান-সমূহ প্রায় সমস্তই দেখা সমাপ্ত করিয়া, বাসায় আসিয়া সে দিনের মত বিশ্রাম করিলাম। তৎপর দিন প্রাতে 'লইয়া যাওয়ার মত' আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি কিনিয়া বাসায় ফিরিলাম ও স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া ষ্টেশনে 'রওনা' হইলাম। ষ্টেশনে আসিয়া আপিসের বন্ধুদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সকলেই মহানন্দে, 'কে কতদূর বেড়াইয়াছে' 'কে কি দেখিয়াছে', ইত্যাদি বিষয়ের গল্প ও আলোচনা করিতে করিতে গাড়ীতে উঠিলাম। সন্ধ্যার পরেই 'শিলিগুড়ি' পৌঁছিলাম। এখানে গাড়ী বদল করিয়া, কলিকাতাভিমুখী ট্রেণে চাপিলাম। পরদিন প্রাতে ১০৷৷০ সাড়ে দশঘটিকার সময় কলিকাতায় পৌঁছিলাম।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

অশ্রুজল।

অকস্মাৎ একি বাণী পাইরে শুনিতে।
নাই আর পিতৃদেব এ মর-জগতে॥
আর কি এ দুনয়ন, হেরিবে সে চন্দ্রানন!
পা'ব কি শুনিতে আর সেই সুবচন!
আর কি হেরিব কভু পিতৃ-শ্রীচরণ॥

হৃদি ক্ষেত্রে জ্ঞানবীজ করিয়া বপন।
না হইতে প্রস্ফুটিত করিলে গমন॥
কে আর তেমন করে, সুধারা ঢালি সু-ধারে,
উর্ব্বরা করিবে এই হৃদয়-মন্দিরে।
ফুরাল কি সুখ-স্বপ্ন অকালে অচিরে॥

চলি গেলে পিতৃদেব সে সুখ-সদনে।
ছাড়িয়া অভাগা তব এ সন্তান-গণে॥
শূন্যময় তোমা বিনে, কেমনে ধরি জীবনে,
কি আর রাখিব বাবা তোমার স্মরণ।
বিরলে বসিয়া করি অশ্রু বিসর্জ্জন॥

তোমা বিনা চারিদিকে হেরি অন্ধকার।
জলদে ঢাকিলে রবি যেমতি আঁধার॥
হইয়াছি লক্ষ্যভ্রষ্ট, নাহি হয় দৃশ্য দৃষ্ট,
অজ্ঞান-তিমিরে ঢাকা মোদের অন্তর।
জ্ঞানালোক বিতরি কে করিবে অন্তর॥

যাও যাও পিতৃদেব সে সুখ-সদনে।
ভুলিতে না পারি পিতা ভুলিব কেমনে॥
লভিলে অতুল কীর্ত্তি, রাখিলে অসীম কীর্ত্তি,
তব নাম উচ্চারিব সবে একমনে।
যতদিন পিতৃদেব বাঁচিব জীবনে॥

আরে রে নিঠুর কাল! কি করিলি হায়!
খাইয়া চোখের মাথা হরিলি তাঁহায়॥

কালাকাল পাত্রাপাত্র, ভেদ নাহি কিছুমাত্র,
সম্মুখে যাহারে পাস হরিস্ তাহায়।
তোর এ কেমন রীতি বুঝা নাহি যায়॥

কি দিয়ে পূজিব পিতা তোমার চরণ।
কিছু মাত্র নাই মোর পূজা-আয়োজন॥
শুধু ভক্তি বিল্বদল, তপ্ত অশ্রু গঙ্গাজল,
কন্যার সম্বল যাহা আছে হে জনক?
লও যদি কৃপা করি, জনম সার্থক॥

নিত্য আমি হেরি পিতৃ-স্নেহ নিদর্শন।
যেখানেই থাকি বাবা যখন যেমন॥

এ মরু সংসার' পরে, ক'দিন রাখিবে মোরে,
কতকাল তীব্র জ্বালা রহিব সহিয়া।
নিত্য ভাবি তব দয়া বিরলে বসিয়া॥

কিন্তু সেই দেশ তব কেমন প্রকার।
পরিজনে ছাড়ি যেথা গমন তোমার॥
সেথাও কি রবি শশী, বহে হেন পরকাশি,
আনন্দ, বিলাপ, প্রেম, বন্ধুত্ব, প্রণয়,
এ সকল মর্ত্ত্যদ্রব্য সেখানে কি রয়?

তটিনী কি বহে সেথা কলকল করি?
ফুটে কি কুসুম-কলি সৌরভ বিতরি?

তরুলতা মনোহর, আছে কি সেথা ভূধর,
শুধু আলো সেথা কিম্বা শুধু অন্ধকার?
যাহা থাক, শান্তি লাভ হয়েছে তোমার॥

পরিশেষে নিবেদন কাতর অন্তরে।
তব দৃষ্টি থাকে যেন মোদের উপরে॥
আদরের পৌত্রগুলি, পুত্র পরিজন মিলি,
তোমার আশিস বাণী লভুক সকলে।
পুণ্যের দৃষ্টান্ত লভি ইহ পরকালে॥

শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী।

নুরজাহান।

(১)

কান্দাহার হইতে ভারতবর্ষে আসিবার পথ পার্ব্বত্য; সুতরাং বন্ধুর ও দুর্গম। এই দুর্গম পথের কোথায়ও বা সুন্দর উপত্যকা কিংবা দাড়িম্ববন, আবার কোথায়ও বা ধূ ধূ বালুকাপূর্ণ মরুভূমি।

ঈদৃশ ভয়ানক পার্ব্বতীয় পথ দিয়া খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে বসন্তকালের প্রারম্ভে একদিন একটী পুরুষ ও একটী স্ত্রীলোক একটী গাভীর উপর আরোহণ করিয়া ভারতবর্ষাভিমুখে আগমন করিতেছিলেন।

পুরুষটীর আকৃতি কবিজন-কল্পিত, মহাজন-লক্ষণ-সংযুক্ত নহে বটে, তথাপি তাঁহাকে দেখিলে একটু সম্ভ্রান্ত ও উন্নত-বংশীয় বলিয়া প্রতীতি হয়। তাঁহার ললাটদেশ দুঃখরেখা-সমাকীর্ণ, অথচ তাহা দৃঢ়-সংকল্পব্যঞ্জক। কুন্তলদাম প্রশস্ত স্কন্ধে লম্বমান; পরিচ্ছদ নিতান্ত দীন-জন-সুলভ হইলেও, মেঘাচ্ছাদিত মার্ত্তণ্ডের ন্যায় তন্মধ্য হইতে অপূর্ব্ব উচ্চান্তঃকরণতার ছটা প্রকাশিত হইতেছিল।

সমভিব্যাহারিণী স্ত্রীলোকটী তাঁহার পরিণীতা ভার্য্যা। আকার দীর্ঘ, বর্ণ গৌর, মুখমণ্ডল শারদীয় পৌর্ণমাসীর-শশধরের ন্যায়; কিন্তু শারীরিক অথবা মানসিক তাপে এখন কিঞ্চিৎ বিবর্ণা; তাহার কুরঙ্গ নয়ননিন্দী নেত্রযুগলে মাধুর্য্য ও কোমলতা উদ্ভাসিত।

একটু করুণস্বরে স্ত্রীলোকটী তাহার স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমি আর চলিতে পারিতেছি না। ব্যথিত-হৃদয় স্বামী, সহধর্ম্মিণীর কাতরোক্তি শ্রবণে সমবেদনাজ্ঞাপক স্বরে বলিলেন, প্রিয়তমে, আর একটু পথ চল। ঐ যে অনতিদূরে উপত্যকার নিম্নে দ্রাক্ষাবনের পার্শ্ব দিয়া নদী প্রবাহিতা হই-তেছে, ওখানে নিশ্চয়ই গ্রাম আছে।

স্ত্রী, স্বামীর কথার জবাব না দিয়া আবার কাতরস্বরে বলিতে লাগিলেন, না, আর পারি না। প্রিয়! যদি তুমি আমাকে সত্য সত্যই ভালবাস, তবে একবার আশ্রয়ের অনুসন্ধান কর। আমি এইখানেই থাকি। যদি কাহারও নিকট কিছু সাহায্য পাও, তবে কাল প্রভাতে আসিয়া আমায় লইয়া যাইও। এখন তুমি যাও—

গঙ্গাবতরণ।

স্বামি-গত-প্রাণা রমণী এতক্ষণ ধরিয়া পাছে স্বামী মনে কষ্ট পান, এই ভয়ে সমস্ত যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন, কিন্তু সকল বিষয়েরই ত একটা সীমা আছে! তিনি স্বামীকে আশ্রয়ানুসন্ধানে যাইবার কথা বলিতে বলিতে গাভী হইতে পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইলেন; অমনি তাহার স্বামী দু'বাহু দিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন।

গিয়াস্‌বেগ মূর্চ্ছিতা স্ত্রীকে অতি সন্তর্পণে আনিয়া নিকটবর্ত্তী একটী বৃক্ষের ছায়ায় পত্রোপরি শয়ান করিলেন। পত্নীর মূর্চ্ছিত-কলেবর দর্শনে তাঁহার নয়ন দিয়া দর-বিগলিত ধারায় অশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল। তিনি অস্ফুট স্বরে বলিতে লাগিলেন, যদি আমার নিদ্রায় স্বপ্ন, রোগে ঔষধ, দুঃখে সমভাগী, পিপাসার পানীয়, জীবনের ধ্রুবতারা এমন সোণার পত্নীই না থাকিল; তবে আর এ অকিঞ্চিৎকর জীবনে প্রয়োজন কি?

গিয়াস, উর্দ্ধশ্বাসে গিয়া নিকটবর্ত্তী একটী পার্ব্বত্য নির্ঝরিণী হইতে কর-পুটে সলিল আনয়ন করিয়া তাঁহার তৃষ্ণার্ত্ত পত্নীর বিম্বাধরে ধীরে ধীরে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। কিন্তু পত্নীর তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া গিয়াসের হৃদয় একেবারে নৈরাশ্যান্ধকারে আবৃত হইল। তিনি পত্নীর পদতল স্বহস্তে মার্জ্জনা করিলেন, পত্র-বীজনদ্বারা তাহার অঙ্গে সমীর-সঞ্চারণ করি-লেন, কিছুতেই মূর্চ্ছিতা পত্নীর সংজ্ঞালাভ হইল না। তখন অনন্যোপায় গিয়াস্ নানা প্রেম-গর্ভ কথায় তাহার চেতনা সম্পাদনের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অভাগা গিয়াসের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল।

এই ভাবে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইলে গিয়াস-পত্নী অকস্মাৎ চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। গিয়াসের তখন আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না! অসংখ্য নক্ষত্র-বেষ্টিত স্বয়ং শশাঙ্ক তখন মার্গচ্যুত হইয়া যেন তাঁহার করতলে উপস্থিত হইল। অনেকক্ষণ উভয়েই নিস্তব্ধ রহিলেন। যেহেতু প্রগাঢ় দুঃখ বা সুখের ভাষা, বাক্য দ্বারা ব্যক্ত নহে; পরন্তু বাক্‌শক্তির অতীত। গিয়াস্‌বেগ, তাঁহার পত্নীকে শারীরিক সন্তাপের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। গিয়াস-পত্নী বলিবার চেষ্টা করিলেও পুনর্ব্বার বেদনার সঞ্চার হওয়ায় কাঁদিতে কাঁদিতে, সেই তৃণ-শয্যাচ্ছাদিত উপত্যকার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটা-ছুটি করিতে লাগিলেন। নিরাশ্রয় গিয়াস্, পত্নীর যন্ত্রণা লাঘবের যত উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলেন, তাহার কোনটীই প্রয়োগ করিতে ক্রটী করিলেন না; ফলে কিছুতেই কিছু হইল না। পত্নীর বেদনা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে

লাগিল। অনন্যোপায় গিয়াস্ তখন নতজানু হইয়া, নিমীলিত নয়নে, কৃতাঞ্জলিপুটে, একমনে, একপ্রাণে পত্নীর যন্ত্রণা-উপশমের জন্য ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন। দয়াময় পরমেশ্বরও তখন তাঁহার অকৃত্রিম প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন। কারণ, গিয়াস্ যখন প্রার্থনা সমাপন করিয়া নেত্রদ্বয় উন্মোচন করিলেন; তখন তিনি বিস্ময়-সহকারে দেখিলেন যে, হস্তে একটী সদ্য-প্রসূত শিশু লইয়া সহাস্যমুখী পত্নী তাঁহার দিকে আসিতেছেন। গিয়াস্ তদ্দর্শনে একেবারে আত্মবিস্মৃত হইলেন, উন্মত্তের ন্যায় প্রাগুক্ত নির্ঝরিণী হইতে আবার করপুটে সলিল আনয়ন করিয়া পত্নী-গতপ্রাণ গিয়াস্ তাহার হস্ত-মুখাদিতে সিঞ্চন করিলেন।

দুঃখের সময় সুখের হাসি মানুষের বড় দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। বর্ষা-কালীন মধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ড যেমন অকস্মাৎ ঘন-ঘটায় আচ্ছাদিত হয়, গিয়াসের শিশু-মুখসন্দর্শন ও পত্নীর বেদনামুক্তি-দর্শন-সুখও বড় বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না। সেই জনমানব-বিহীন, হিংস্রশ্বাপদ-সঙ্কুল পার্ব্বত্য বনে নিশাযাপন কখনই শ্রেয়স্কর ও বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া গিয়াস্, পত্নীসমভিব্যাহারে গ্রামানুসন্ধানে পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ যাত্রা করিবার ইচ্ছা করিলেন। পত্নী একে দুর্ব্বলাঙ্গী, তাহাতে এই মাত্র একটী কন্যা প্রসূত হওয়ায় আরও দুর্ব্বল ও ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছেন। গিয়াস্ পত্নীকে গাভীপৃষ্ঠে উঠাইয়া তাহাকে এক হস্তে ধরিলেন এবং তাহার হস্তস্থিত শিশুটীকে অন্যহস্তে ধরিয়া, স্বয়ং পদব্রজে চলিতে লাগিলেন। কিন্তু পথশ্রান্ত ক্ষুধার্ত্ত গিয়াস্ আর বেশীদূর যাইতে পারিলেন না। শারীরিক দৌর্ব্বল্য, মানসিক দুশ্চিন্তা, অত্যধিক জঠর জ্বালা ও অনিবার্য্য পিপাসা তাঁহার অগ্রসরের প্রতিবন্ধক হইল। তিনি মনে মনে অনেক বাদানুবাদের পর আপনাদের উভয়ের প্রাণ-রক্ষার জন্য শিশুটীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে সংকল্প করিলেন। হায়! কুসুম-কোমল গিয়াস্ আজ খাদ্যাভাবে, বজ্র অপেক্ষা কঠিন হইলেন—পিতা হইয়া আপন কন্যাকে পথি-পার্শ্বে ফেলিয়া যাইতে দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন। তিনি নানা কৌশলে পত্নীর নিকট হইতে শিশুটীকে লইয়া, আপনার একমাত্র গাত্রাবরণের মধ্যে স্থাপিত করিয়া পথি-পার্শ্বে রাখিয়া আসিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, শিশুটী তাহাতে না কাঁদিয়া বরং একটু হাসিল।

গিয়াস্ গাভীর নিকট ফিরিয়া আসিলে তাঁহার পত্নী তাঁহাকে বলিলেন, "আমার মেয়ে কোথায়"? গিয়াস্ বলিলেন, সে নিরাপদে আছে, তাহার

জন্য কোন চিন্তা করিও না। পত্নী সে কথায় কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন, আমার মেয়ে আমাকে আনিয়া দেও! এই বলিয়া গিয়াস্-পত্নী আবার মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেলেন। গিয়াস্ তাহাকে তৃণশয্যোপরি শয়ান করাইয়া, শিশুর উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

যে স্থানে শিশুটীকে রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেই স্থানে আসিয়া দেখেন, একটী বৃহদাকার কৃষ্ণসর্প ফণা বিস্তার করিয়া শিশুটীর মুখ ঢাকিয়া রহিয়াছে। গিয়াস্ প্রথমতঃ কিং-কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন; পরে সর্পটীকে শমনসদনে প্রেরণের নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সর্পটী তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে—কোথায় যে অদৃশ্য হইল, শত-চেষ্টা করিয়াও গিয়াস্ তাহার সন্ধান পাইলেন না। তখন অতি সন্তর্পণে শিশুটীকে লইয়া গিয়াস্ আপন পত্নীর হস্তে অর্পণ করিলেন। স্নেহশীলা জননী অমনি পীযূষ-পূরিত স্তন্য দু'টী শিশুর মুখে পূরিয়া দিলেন।

এদিকে ভগবদ্ভক্ত গিয়াস্, শিশুটীর অসম্ভাবিত উপায়ে প্রাণরক্ষা হওয়ায় ভক্তিগদ্‌গদকণ্ঠে একমনে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন। দেব মরীচিমালী যখন আপন রক্তিমচ্ছটা বিস্তার করতঃ ক্রমশঃ পশ্চিম-গগনে অস্ত যাইতেছিলেন, আর স্ফটিকস্বচ্ছ জলাশয়ে যখন কমলবঁধু সলজ্জভাবে আপন চক্ষু নিমীলিত করিতেছিল এবং বায়সাদি বিহঙ্গমগণ যখন সন্ধ্যাগম-দর্শনে আপন কুলায়াভিমুখে ফিরিতেছিল, গিয়াস্ তখন গাত্রোত্থান করিয়া হতাশ্বাসে চীৎকার করিয়া বলিলেন, হায়! আমাদিগের যদি নিকটবর্ত্তী পান্থনিবাসে পৌঁছিবার কোন উপায় থাকিত!

অকস্মাৎ পশ্চাদ্দিক হইতে কে একজন তাঁহার খেদোক্তির উত্তর দিয়া বলিল, আমিই আপনাকে পৌঁছাইয়া দিব। আপনি জানিবেন, যে ভগবান আপনার এই শিশুটীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই ভগবানই ইহার লালন পালনাদিরও ব্যবস্থা করিয়াছেন।

পশ্চাৎ ফিরিয়া গিয়াস্ দেখিতে পাইলেন, একটী দীর্ঘকায়, উষ্ট্রারোহী সুপুরুষ তাঁহার কথার উত্তর দিতেছেন। গিয়াস্‌বেগ শুনিয়াছিলেন, বিপদের সময় বিপদুদ্ধারী ভগবান স্বয়ং মনুষ্যমূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া বিপদ্‌গ্রস্তকে বিপন্মুক্ত করেন। আগন্তুকের দীর্ঘশ্মশ্রু দর্শনে গিয়াসের হৃদয়ে এই ধারণা দৃঢ়ীভূত হইল। তিনি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, মহানুভব! আপনি যেই-ই হউন, আপনি আমার হৃদয়ে আশার-বর্ত্তিকা প্রদর্শন

করাইয়াছেন এবং সম্ভবতঃ আমাদিগকে আসন্নমৃত্যুর কবল হইতেও উদ্ধার করিবেন।

আগন্তুক তাহার উষ্ট্র হইতে অবতরণ করিয়া গিয়াসের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমার নাম মালক মসুদ। এই পথে যে সমস্ত অশ্বারোহী যাইতেছে, আমি তাহাদের অধ্যক্ষ। আমি সৈন্যদলের অগ্রে অগ্রে আসিতেছিলাম; কিন্তু নিতান্ত ক্লান্ত হওয়ায়, একটী তরুতলে শয়ন করিয়াছিলাম। আপনার স্ত্রীর ক্রন্দন শুনিয়া আপনাদের সাহায্য করিতে আমার ইচ্ছা হয়। আমার উচিত ছিল যে, আমি তৎক্ষণাৎ আপনাদের নিকট আগমন করি; কিন্তু অনধিকার আগমনে আমার মনে ভীতির সঞ্চার হওয়ায়, মন হইতে সে বাসনা উৎপাটিত করি। আপনাদের কন্যাটী জন্মগ্রহণ করিবামাত্র আমি তাহার জন্ম-মুহূর্ত্ত লিখিয়া রাখি এবং কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য একটী কোষ্ঠীও প্রস্তুত করিয়াছি। কোষ্ঠী প্রস্তুত বিষয়ে আমি এত তন্ময় হইয়াছিলাম যে, আপনাদের স্থানত্যাগের বিষয় আমি আদৌ জানিতে পারি নাই। সে যাহা হউক, আপনাদের অধীর হইবার কোন কারণ নাই। আমি আপনাদের শান্তি ও সুবিধার ভার গ্রহণ করিতেছি। এই লউন, এই দুইটী ঝুড়ি গাভীর পৃষ্ঠে ঝুলাইয়া দিয়া আপনারা দুইজনে তাহাতে বসুন।

গিয়াস্‌বেগ আবার নতজানু হইয়া ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ জানাইলেন, আর তাঁহার বিপদুদ্ধারকের প্রতি যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন।

মালক মসুদ বলিলেন, ধন্যবাদের বা কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। বিপদ্‌কালে একে অপরের সাহায্য করাই মানবের ধর্ম্ম ও মানবজীবনের বিশেষত্ব। আল্লা এ সংসারে আমাদিগকে মনুষ্যোচিত কর্ম্মসম্পাদনের জন্যই প্রেরণ করিয়াছেন, সংসারে আসিয়া যদি তাহা না করিলাম তবে এ জীবনে ও পশু-জীবনে পার্থক্য কি?—এই বলিয়া মালক মসুদ, গিয়াস্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি বোধ হয় একজন আফগান পল্লীবাসী?

গিয়াস্‌বেগ বলিলেন,—না, আমি পল্লীবাসী নই। মালক মসুদ বলিলেন, আপনার আকৃতি দর্শনে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, আপনি একজন উচ্চদরের লোক, কিন্তু আপনি এ দুর্গম পার্ব্বত্য পথে গমন করিতেছেন কেন? গিয়াস্‌বেগ বলিলেন, মহানুভব! এ হতভাগ্যের জীবন-কাহিনী শুনিয়া আর কি করিবেন! আমার কাহিনী শুনিলে, নিতান্ত পাষাণের হৃদয়েও করুণাস্রোত প্রবাহিত হয়। আমার পিতা সাহ মহম্মদ সেরিক্, সাহমহম্মদ তকলুর

প্রধান সচিব ছিলেন। মহম্মদ তকলুর স্বর্গপ্রাপ্তির পর তিনি রাজা তেহমাশার অধীনে বিশেষ যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিতে থাকেন। পিতার মৃত্যুর পর আমি বৈদেশিক সচিবের পদে নিযুক্ত হই; কিন্তু আমার পিতার অসংখ্য শত্রু থাকায় আমি শান্তিতে বাস করিতে পারিলাম না। রাজা স্বয়ং নিতান্ত দুর্ব্বল ছিলেন, মিথ্যা সংবাদের উপর আস্থা স্থাপন করিতেন। রাজা দুর্ব্বল, কাযেই পিতৃশত্রুর বিরুদ্ধে রাজ-দ্বারে কোন অভিযোগ করিলে, তাহার কোনই প্রতীকার হইত না; অধিকন্তু আমাকেই রাজার তীব্র কটাক্ষে পতিত হইতে হইত। একদিন আমার পিতৃ-শত্রুরা আমার প্রাণবধের প্রয়াস পাইল, আমি রাজার শরণাগত হইলাম; কিন্তু ভীত রাজা কিছুই করিলেন না। আমি রাজার এবম্বিধ আচরণে মর্ম্মে নিতান্ত আঘাত পাইয়া, একদিন তমিস্র-ময়ী রজনীতে কতিপয় অনুচরকে সঙ্গে লইয়া, আমার পিতৃ-পৈতামহের কীর্ত্তি-ক্ষেত্র, জন্মভূমি পারশ্য পরিত্যাগ করিলাম। দুঃখের বিষয় কি বলিব, আমরা পারশ্যের সীমা অতিক্রম করিতে না করিতে একদল আফ্‌গান দস্যু আমাদের যাহা কিছু ছিল, সমস্ত লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গেল। আমাদের এই গাভীটী ভিন্ন অন্য কিছু রহিল না,—এই বলিয়া গিয়াস্ একবার গাভীটীর প্রতি সাশ্রু-নয়নে দৃষ্টিপাত করিলেন।

মালক জিজ্ঞাসিলেন, আপনারা কোথা যাইতে ইচ্ছা করেন? এই দেশে কি আপনাদের কোন বন্ধু আছে?

গিয়াস্‌বেগ বলিলেন, আমার কোন বন্ধু নাই বটে, কিন্তু আমি একবার ভারতেশ্বর সদাশয় সম্রাট্ আকবরের দর্শনাভিলাষে ভারতাভিমুখে যাইতেছি। সম্রাট্ হুমায়ুন যখন সের শাহ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত ও পরাজিত হইয়া তিহারাণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমার স্বর্গগত পূজ্যপাদ পিতা তখন তাঁহার তত্ত্বাবধারণ করিয়াছিলেন। সম্রাট্ হুমায়ুন ভারতে ফিরিয়া আসিয়া একখানি লিপি দ্বারা তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি আমার পিতার শুশ্রূষা ও তত্ত্বাবধারণে বড় সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং প্রয়োজন হইলে তিনি তাঁহাকে পুরস্কৃত করিবেন। সম্রাট্ আকবর যদি আমার পিতার কার্য্য-কলাপের কথা স্মরণ করিয়া, আমাকে জীবিকা উপার্জ্জনের একটী পথ করিয়া দেন, এই উদ্দেশ্যে আমি তাঁহার নিকট যাইতেছি।

মালক বলিলেন, আমি সম্রাটের ব্যক্তিগত মহানুভবতার বিষয় বিশেষ অবগত আছি। তিনি আপনাকে নিশ্চয়ই সাহায্য করিবেন। সম্রাট্-সমীপে

ইচ্ছামত গমনাগমনে আমার অধিকার আছে, আমি আপনাকে তাঁহার নিকট লইয়া যাইব।

কৃতজ্ঞ উদ্বেলিত-হৃদয় গিয়াসের চক্ষু দিয়া দর্ দর্ ধারায় অশ্রু নিপতিত হইল, তিনি মালককে সেলাম করিলেন।

মালক মসুদ অতিবিনীত ভাবে গিয়াসের সেলামের পাল্‌টা সেলাম করিলেন। তারপর আপন পুঁটুলী হইতে একগুচ্ছ কীট-দষ্ট পুস্তক বাহির করিয়া কহিলেন, আমি এখনও আপনার কন্যার কোষ্ঠী-রচনা শেষ করিতে পারি নাই। তৎপর প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরিয়া সেই কীটদষ্ট পুস্তকের পাতা উল্টাইয়া বলিলেন, ভবিষ্যতে আপনার এই কন্যা সম্রাজ্ঞী হইবে এবং স্বহস্তে রাজদণ্ড লইয়া দেশ শাসন করিবে। আর ভীষণ সংগ্রামে রণ-মত্তমাতঙ্গিনীর ন্যায় যোদ্ধৃ-পরিচালনা করিবে। তাহার পর গিয়াসের দিকে ফিরিয়া তিনি বলিলেন, আপনি হয় ত আমার কথায় অবিশ্বাস করিতেছেন ; কিন্তু দেখিবেন, আমার ভবিষ্যদ্বাণী কখনই বৃথা হইবে না।

গিয়াস্ বলিলেন, আমার আর এখন জ্যোতিষের উপর আস্থা নাই। আমার পিতা বিশেষ গণনা করিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন যে, আমার ভাগ্যে সুখ হইবে ; কিন্তু এই দেখুন, আমি এখন অন্ন-বস্ত্রহীন, গৃহচ্যুত ভিখারী !

মালক সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন, আপনি কন্যাটীর নাম 'মেহের—উন্—নিসা' রাখুন।

এই ভাবে কথা বলিতে বলিতে তাঁহারা অচিরে পান্থনিবাসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে আহারাদি করিয়া নিদ্রার ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

অলির দুঃখে কবির সান্ত্বনা।

পত্র—মধুমাস গেছে চলি, কুসুম পড়েছে ঢলি,
পবন বহে না তা'র বাস,
এস অলি মম পাশে, পুলকে মধুরে হেসে,
আমি তব মিটাইব আশ।

অলি—গেছে চলি' মধুমাস, ফুলের নিভেছে হাস,
নীরবে কাঁদিব তা'র লাগি,
ভূপতিত দেহে তা'র ঢালিব আঁখির ধার,
কাটাব দুখের নিশা জাগি।
জানা'ব জগত-জনে, কি ব্যথা আমার প্রাণে,
গাহি' শত বিষাদের গান,
কাঁদিবে প্রকৃতি ধনি, আমার বিলাপ শুনি,
পবন ধরিবে দুখে তান।
আজি হায় মনে পড়ে, হাসিত দেখিয়া মোরে,
আবেশে চাহিত মম পানে,
বদনে বিষাদ মাখি, কখনো মুদিয়া আঁখি,
নীরব রহিত অভিমানে।
গাহি কত প্রেম-গান, ভাঙ্গিতাম অভিমান,
আবার উঠিত হাসি' সুখে,
সেকাল গিয়াছে চলে, আজি এ নীলিমাতলে,
আমি দিন যাপিতেছি দুখে।

কবি—মোছ অলি আঁখি ধার, কেন এত হাহাকার,
কে ঘুমায় চিরদিন তরে,
নিশীথে অথবা প্রাতে, মাধুরী করিয়া সাথে,
আসে সবে পুনঃ ধরাপরে।
ঋতুরাজ আগমনে, হরষ ধরিয়া প্রাণে,
আবার চাহিবে ফুল হাসি,
তখন মিটায়ে আশা, দিও তারে ভালবাসা,
ঘুচি' যাবে বিষাদের রাশি।

শ্রীবামনদাস মৈত্র।

স্বপ্নের কথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

জাগ্রৎ অবস্থা।

আমরা এই জগতে আসিয়া মহাকাযে ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছি। আমাদের ঘর বাড়ী বিষয় বৈভব স্ত্রী পুত্র লইয়া অহোরাত্র খাটিয়া মরিতেছি,—বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই,—কেবল গাধার খাটুনী।

মনে আছে, মরিতে হইবে। যে বান্ধবের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, মৃত্যু-কথাকে পদদলিত করিয়া ঘর্ম্মাশ্রুসিক্ত মুখে কায করিয়াছি—সে বন্ধু সে দিন কালের কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে—শ্মশানের ভস্মস্তূপে তাহার দেহের শেষ চিহ্ন মুছিয়া গিয়াছে। সে গিয়াছে, আমি আছি। তাহার শূন্য সংসার পূর্ণ করিয়া অপরে বাস করিতেছে—কায করিতেছে—শুধু সে নাই। আমি থাকিব না, ইহা আমি নিশ্চয়ই বুঝি—নিশ্চয়ই জানি। তথাপি ধর্ম্ম-কর্ম্ম করি না—করিতে পারি না। কেন এমন হয় ? স্ত্রীপুত্র আমার নয় জানিতেছি। বিষয় বিভব আমার নয়, জানিতেছি,—তথাপি এত মমতা কেন ? মমতা জ্ঞানের অভাবে। কেন, জ্ঞান ত আছে ;—সকলেই বুঝে, মরিতে হইবে—সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া যাইতে হইবে। বাস্তবিক সেটা জ্ঞান নহে—সে বিষয়-গোচর জ্ঞান।

এই দেহ, ঐ ঘর বাড়ী, ঐ স্ত্রী পুত্র পরিবার—এ সকল আমার এই মিথ্যা জ্ঞান—ইহাই আত্মার বন্ধন। ইহা হইতে নিবৃত্তিই মুক্তি।

কথা হইতে পারে, মানবের যখন জ্ঞান আছে যে, এসকল কিছু না, তখন তাহাতে মরিয়া মজিয়া থাকে কেন ? থাকিবার কারণ অবিদ্যা। অনাত্ম-স্বরূপ দেহাদির প্রতি এই প্রকার অভিমান যে জন্মাইয়া দেয়, তাহার নাম অবিদ্যা ; আর ঐ অভিমান যাহার দ্বারা নিবৃত্তি হয়, তাহার নাম বিদ্যা।

মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, রসনা, ঘ্রাণ, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই চতুর্দ্দশ করণ দ্বারা যে অবস্থাতে যথাক্রমে, সঙ্কল্প, অধ্যবসায়, চেতনা, অভিমান, শব্দ স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, মুখব্যাদান, গমন, মলমূত্র পরি-

ত্যাগ এবং আনন্দ এই সমস্ত স্থূল বিষয়ের উপভোগ যখন করা যায়, তখন সেই অবস্থাকে জাগ্রৎ অবস্থা বলে।

অবস্থা চারি প্রকার,—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়। এই চারি প্রকার অবস্থাই আত্মার।

এক এবাত্মা মন্তব্যো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু।
স্থানত্রয়াদ্ব্যতীতস্য পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥
এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ॥

ব্রহ্মবিন্দুপনিষৎ।

"এক আত্মাই জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ে বিরাজ করিতেছেন। যিনি এই অবস্থাত্রয় অতিক্রম করিয়া আত্মার তুরীয় অবস্থার উপলব্ধি করিতে পারেন, তাঁহার আর পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না।

জলস্থ চন্দ্র যেমন বহুপ্রকারে পরিদৃষ্ট হয়, তেমনি এক আত্মাই ভূতে ভূতে অবস্থিত থাকিলেও উপাধিভেদে বহুভাবে দৃষ্ট হন।"

আপত্তি উঠিতে পারে, আত্মা অসঙ্গ, উদাসীন ও অদ্বিতীয় বস্তু, তিনি কেন অবিদ্যাকর্ত্তৃক আবদ্ধ হইয়া এমন অবস্থায় পতিত হইবেন। অতএব জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয় অবস্থা দেহাদির হইতে পারে,—আত্মার নহে।

না,—ঐ অবস্থাগুলি আত্মারই। আত্মা অসঙ্গ এবং উদাসীন হইয়াও অর্থাৎ আবরণ ও বিক্ষেপকারিণী আত্মশক্তি দ্বারা পরিমোহিত হইয়া মনুষ্যাদি দেহ অবলম্বনপূর্ব্বক সমস্ত কার্য্য নিষ্পন্ন করিতেছেন, এবং স্ত্রী ও অন্নপানাদি বিবিধ ভোগ্য বস্তুর উপভোগ দ্বারা জাগরণ অবস্থা অর্থাৎ বিষয়োপলব্ধিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পরিতৃপ্ত হইতেছেন।

জাগ্রৎ অবস্থা স্বপ্নাবস্থারই স্থূল ভাব।

উর্ণনাভির্যথা তন্তূন্ সৃজতে সংহরত্যপি।
জাগ্রৎ-স্বপ্নে তথা জীবো গচ্ছত্যাগচ্ছতে পুনঃ॥

ব্রহ্মোপনিষৎ।

"যে প্রকার উর্ণনাভি (মাকড়সা) তন্তুরাশি সৃষ্টি করিয়া আবার আত্মাতে সংহর করে, তেমনি জীব জাগ্রৎ কালে নিজের ইন্দ্রিয়াদি অঙ্গসকল প্রসারণ করিয়া আবার স্বপ্নাবস্থায় আপনাতেই সংহৃত করে।"

পণ্ডিতগণের মতে জাগ্রৎ অবস্থা স্বপ্নেরই তুল্য। আমরা জাগিয়া যাহা

করিতেছি, তাহা স্বপ্নেরই মত। স্ত্রী-পুত্র-পরিবার ধন জন বিষয় বিভব শত্রু মিত্র ভাল মন্দ সবই স্বপ্ন—এ সকল কিছুই নাই। সবই আত্মার খেলা।

স্বপ্নাবস্থা।

এক এবাত্মা মন্তব্যো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু।

ব্রহ্মবিন্দূপনিষৎ।

"জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ে এক আত্মাই বিরাজ করিতেছেন।"

এই অবস্থাত্রয়ের পর আর এক অবস্থা আছে, তাহার নাম তুরীয় অবস্থা। তুরীয় অবস্থা জীবন্মুক্ত অবস্থা।

অতএব দেখা গেল, স্বপ্নাবস্থা একেবারে অমূলক নহে। জাগ্রৎ অবস্থাও তদ্রূপ। জাগ্রৎ অবস্থাকে যদি সত্য বলা যায়, জাগ্রৎ অবস্থার কর্ম্মফলে যদি সার থাকে, তবে স্বপ্নাবস্থার কর্ম্মেরও সার বা সত্তা আছে। স্বপ্ন কেবল অমূলক চিন্তা মাত্র বলিয়া উড়াইয়া দিবার বিষয় নহে।

স্বপ্নে স জীবঃ সুখ-দুঃখভোক্তা
স্বমায়য়া কল্পিত-জীবলোকে।

কৈবল্য-উপনিষৎ।

"সেই জীব (আত্মা) স্বপ্নাবস্থাতে স্বীয় মায়া-কল্পিত বিবিধ বাসনাময় ভোগ্যবস্তুর উপলাভ করিয়া থাকেন।"

কথাটা পরিষ্কার করিয়া বুঝিলে এইরূপ বোঝা যায় যে,—আত্মা অসঙ্গ, উদাসীন, নির্ব্বিকল্প ও নিরঞ্জন হইলেও তিনি নিজ মায়া দ্বারা জগৎ সৃজন করিয়াছেন—বালক যেমন দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের সহিত কথা কহে, হাসে, ক্রীড়া করে—আত্মাও তদ্রূপ আত্মমায়ার সহিত ক্রীড়াপর আছেন। তাই মায়া-কল্পিত বিবিধ বাসনাময় ভোগ্যবস্তুর উপলাভ করিয়া থাকেন। জাগ্রৎ অবস্থাতেও যেমন তিনি একই বহুরূপ ধারণ করিয়া ক্রীড়াপর আছেন,—স্বপ্নেও তাহাই।

শব্দাদীন্ বিষয়ান্ স্থূলান্ যদোপলভতে
তদাত্মনো জাগরণং; তদ্বাসনারহিতশ্চতুর্ভিঃ
করণৈঃ শব্দাদ্যভাবেঽপি বাসনাময়ান্
শব্দাদীন্ যদোপলভতে তদাত্মনঃ স্বপ্নম্।

সর্ব্বোপনিষৎসার।

"শব্দাদি স্থূল বিষয়ের উপভোগ কালকে আত্মার জাগ্রৎ অবস্থা বলে, এবং যে সময়ে শব্দাদি বিষয়রাশি উপস্থিত না থাকিলেও বিষয়-বাসনাবাসিত হইয়া

মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার এই অন্তঃকরণ চতুষ্টয় দ্বারা বাসনাময় শব্দাদি বিষয়-সমূহের উপলব্ধি করে, তাহার নাম স্বপ্নাবস্থা।"

এই কথাগুলি পরিষ্কার করিয়া বুঝিয়া রাখিতে হইবে। আত্মা এক, অসঙ্গ;—তিনি বহু হইয়াছেন। কেমন করিয়া হইয়াছেন?

নদীর জলকে উদাহরণ গ্রহণ করা যাউক। বাতাস নাই, নদীর জল স্থির হইয়া আছে;—সে এক, জল। তারপরে বাতাস উঠিল;—সেই এক এবং অদ্বিতীয় জল হইতে বায়ুসংঘাতে বহু তরঙ্গ উঠিল। অতএব জলই তরঙ্গ নামে বহু হইল। বাস্তবিক তরঙ্গগুলি অন্য কোন পদার্থ নহে, জল মাত্র। জলের উপরেই আছে,—বাতাস থামিলেই যে জল, সেই জলই হইবে। তবে আমরা তরঙ্গকে তরঙ্গ বলিব, না জল বলিব?

তরঙ্গ বলিতেই হইবে; কেন না, যখন তাহার নাম-রূপ সবই আছে, তখন কি করিয়া বলিব যে, সে জল—তরঙ্গ নহে। কিন্তু বাস্তবিক সে জল।

এই যে, পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং জগতীস্থ পদার্থসমূহ দেখা যাইতেছে,—ইহাও ঐ প্রকার। ইহা ব্রহ্মেরই ব্যবর্ত্তন। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড—সবই এক আত্মা। যেমন বায়ু সহযোগে জল হইতে তরঙ্গ উঠে, তেমনি মায়া সহযোগে তাঁহা হইতে জগত্তরঙ্গের উদ্ভব হইয়াছে। মহদাদি অণুপর্য্যন্ত সমস্তই সেই আত্মা,—মায়া-বিরহিত হইলে সবাই সেই আত্মা। মুক্তি আর কিছুই নহে—তরঙ্গ-গর্ভস্থ বায়ু দুর হইলে সে যেমন জল, তেমনি মায়া দুর হইলে আমাদের মুক্তি। আমরা যে আত্মা, সেই আত্মা।

এখন জলোত্থিত তরঙ্গ যেমন চন্দ্র-সূর্য্য-কর গ্রহণ করিয়া শোভান্বিত হয়, বাতাসে নৃত্য করে; আমরাও তদ্রূপ এজগতে মায়াকল্পিত শব্দ রূপ রস গন্ধ প্রভৃতি লইয়া প্রমত্ত হইয়া আছি। জাগ্রৎ অবস্থাতেও যেমন শব্দ শুনিয়া, রূপ দেখিয়া, রস উপভোগ করিয়া, গন্ধ লইয়া মুগ্ধ হইয়া থাকি,—আনন্দিত হই, দুঃখিত হই,—স্বপ্নেও তাহাই করি। জাগ্রৎ অবস্থাতেও যেমন মায়া-কল্পিত মধুর শব্দে মুগ্ধ হই, কর্কশশব্দে বিরক্ত হই,—সুন্দর রূপ দেখিয়া আনন্দিত হই, কুরূপ দেখিলে সরিয়া যাই, সুরসে অনুরক্ত ও বিরসে বিরক্ত এবং উত্তমগন্ধে পুলকিত ও পূতিগন্ধে দুঃখিত হই,—স্বপ্নেও তদ্রূপ হই। জাগ্রৎ অবস্থাতেও যা,' স্বপ্নেও তা'।

তবে কথা উঠিতে পারে, জাগ্রৎ অবস্থায় যাহা উপভোগ করা যায়, তাহা মায়া-কল্পিত বা বায়ু সহযোগে তরঙ্গের ন্যায় হইলেও তাহা বাস্তব;—আর

স্বপ্নোপভোগ্য বিষয় বাস্তবিক অসত্য। কিন্তু তাহা নহে। এখানেও যা,'—সেখানেও তা'।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের দেহ, আমাদের ইন্দ্রিয়াদি, আমাদের ইন্দ্রিয়োপভোগ্য সমস্ত পদার্থাদি—এককথায় এই পরিদৃশ্যমান জগতের মহদাদি অণু পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থ ব্রহ্মেরই ব্যবর্ত্তন। সবই তিনি।

স্বয়মমনস্কমশ্রোত্রমপাণিপাদং জ্যোতির্ব্বর্জ্জিতম্।
তত্র লোকা ন লোকাঃ দেবা ন দেবাঃ বেদা ন
বেদাঃ যজ্ঞা ন যজ্ঞাঃ মাতা ন মাতা পিতা
ন পিতা স্নুষা ন স্নুষা চাণ্ডালো ন চাণ্ডালঃ
পৌল্কসো ন পৌল্কসঃ শ্রমণো ন শ্রমণঃ
পশবো ন পশবঃ তাপসো ন তাপস ইত্যেক-
মেব পরং ব্রহ্ম বিভাতি ॥

ব্রহ্মোপনিষৎ।

"আত্মা স্বয়ং মনোবিহীন এবং কর্ণ, হস্ত ও পদ-রহিত, এবং ইন্দ্রিয়াদি বর্জ্জিত হইয়াও প্রকাশ-স্বরূপ। একমাত্র ব্রহ্মই প্রকাশ পাইতেছেন;—সুতরাং স্বর্গাদি লোক, ইন্দ্রিয়াদি দেবগণ, বেদ, যজ্ঞ, মাতা, পিতা, পুত্রবধূ, পুক্কস, নীচজাতি ও পশু অথবা তাপস কিছুরই প্রকৃত সত্তা নাই।"

তত্র চতুষ্পাদং ব্রহ্ম বিভাতি ॥

ব্রহ্মোপনিষৎ।

সেই ব্রহ্মের চতুষ্পাদ। পাদ অর্থে পর্য্যায় বা অবস্থা। সেই চতুষ্পাদ বা অবস্থা এই—

জাগরিতং স্বপ্নং সুষুপ্তং তুরীয়মিতি।
জাগরিতে ব্রহ্মা স্বপ্নে বিষ্ণুঃ সুষুপ্তে রুদ্রঃ
তুরীয়ে পরমক্ষরম্।
স আদিত্যশ্চ বিষ্ণুশ্চেশ্বরশ্চ স পুরুষঃ
স প্রাণঃ স জীবঃ সোঽগ্নিঃ সেশ্বরশ্চ
জাগ্রৎ তেষাং মধ্যে যৎ পরং ব্রহ্ম বিভাতি ॥

ব্রহ্মোপনিষৎ।

"জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্ত এবং তুরীয় এই চারিপাদ। জাগ্রদবস্থাপন্ন আত্মাকে ব্রহ্মা, স্বপ্নাবস্থাপন্ন আত্মাকে বিষ্ণু, সুষুপ্তাবস্থাপন্ন আত্মাকে রুদ্র এবং তুরীয়াবস্থাপন্ন আত্মাকে পরম অক্ষর অর্থাৎ পরমাত্মা বলে। ইনি আদিত্য,

বিষ্ণু, ব্রহ্মা, পুরুষ, প্রাণ. জীব, অগ্নি এবং ঈশ্বর নামে অভিহিত হয়েন। এই সমস্ত অবস্থাতেই পরম ব্রহ্ম প্রকাশিত আছেন।”

আমাদের জাগ্রৎ অবস্থায় যেমন আত্মাই সব হইয়া আপনার ছায়া লইয়া আপনি করিতেছেন, স্বপ্নেও তাহাই। জাগ্রৎ অবস্থায় যেমন আমিও তিনি, আমার পুত্রও তিনি, শত্রুও তিনি,—স্বপ্নাবস্থাতেও তেমনি সেই আমার আত্মাই এক বহু হইয়া বিষয় উপভোগ করিয়া থাকেন।

আমিত্বের ছাপ মায়া আমিও তিনি থাকিতেছেন, বনও তিনিই হইতেছেন, বনের বাঘও তিনিই সাজিতেছেন,—আমি স্বপ্নে দেখিতেছি, বনের মধ্যে গমন করিলাম, বাঘ আসিল, আমাকে খাইবার জন্য তাড়া করিল—আমি আর দৌড়িতে পারি না, যাই যাই—গলদ্‌ঘর্ম্ম ছুটিতে লাগিল, চীৎকার ক্রন্দন করিতে লাগিলাম, আত্মাই আর একজন হইলেন—রক্ষাকর্ত্তারূপে আসিয়া উদ্ধার করিলেন।

স্বপ্নে আমার টাকার অভাব। বড় দুঃখ পাইতেছি—ছেলেপুলে না খাইয়া শুকাইয়া মরিতেছে,—উত্তমর্ণের তাড়নায় ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতেছি। স্বপ্নের সন্তানও সাজিয়াছেন আত্মা বা আমি। উত্তমর্ণও আমি,—তারপরে আবার আমি বা আত্মাই টাকা হইয়া এক গর্ত্তমধ্যে রহিলাম—গর্ত্তও আমি বা আত্মা।

স্বপ্নে আত্মাই আবার স্ত্রী সাজিলেন,—রূপে রসে হাবে ভাবে মুগ্ধ করিলেন। যিনি মুগ্ধ করিলেন, তিনিও যিনি, মুগ্ধ হইলেন, তিনিও তিনি।

স্বপ্নে যমালয় দর্শন হইল—পাপীর আর্ত্তনাদ, সাধুর পুরস্কার, যমের বিচার, বৈতরণীর ফুটন্ত বারিপ্রবাহ,—সবই তিনি।

এক আত্মা বহু হইয়া মায়ার কোলে খেলা করিলেন।

তবে কি স্বপ্নটা কিছুই নহে? কিছু বৈ কি! জাগ্রৎ অবস্থার কার্য্য বা চিন্তা এই অবস্থাকে প্রাপ্ত করায়, সুতরাং ইহারও ফলাফল আছে।

ভূয়স্তেনৈব স্বপ্নায় গচ্ছতি জলৌকাবৎ।
যথা জলৌকা অগ্রমগ্রং নয়ত্যাত্মানং নয়তি
পরং সন্ধায় যৎপরং নাপরং ত্যজতি
স জাগ্রদভিধীয়তে॥

ব্রহ্মোপনিষৎ।

“জীব (আত্মা) জলৌকার ন্যায় যেমন সুষুপ্তি অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকারেই স্বপ্নাবস্থা প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ জলৌকা যেমন একটী তৃণ অবলম্বন

করিয়া পূর্ব্ব তৃণকে পরিত্যাগ করে, আত্মাও তদ্রূপ স্বপ্নাবস্থা পরিত্যাগ করিবার সময় সুষুপ্তি অবস্থা বা জাগ্রৎ অবস্থা গ্রহণ করে। এই প্রকারে মৃত্যুকালেও দেহান্তর অবলম্বন পূর্ব্বক পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করিয়া থাকে। যে অবস্থাতে জীব (আত্মা) ধর্ম্মাধর্ম্মকে পরিত্যাগ করে না, অর্থাৎ শুভাশুভ কর্ম্মের অধিকারী হয়, তাহার নাম জাগ্রৎ অবস্থা।”

জাগ্রৎ অবস্থারই সূক্ষ্মাবস্থা স্বপ্ন ;—কর্ম্মের এ পিঠ, আর ও পিঠ ;—সুতরাং স্বপ্নের কাযেরও শুভাশুভ ফল আছে।

সে ফল ভোগ করে কে ? জীব (আত্মা) যেমন জাগ্রৎ অবস্থার কর্ম্মফলে আবদ্ধ থাকেন,—স্বপ্নের ফলও তদ্রূপ উপভোগ করিয়া থাকেন।

জাগ্রৎ অবস্থার কর্ম্মও যেমন রূপান্তরিত হইয়া ফলদান করিয়া থাকে, স্বপ্নেরও তাহাই।

একটা উদাহরণ লইয়া কথাটা বুঝিয়া দেখা উচিত। প্রত্যূষে উঠিয়া ভ্রমণ করিলে, তাহার ফলে স্বাস্থ্য ভাল হয়। যেদিন প্রভাতে ভ্রমণ করা যায়, সেই দিনই কিছু ভগ্ন স্বাস্থ্য একেবারে ভাল হয় না ;—ভ্রমণ এই কর্ম্মটা রূপান্তরিত হইয়া স্বাস্থ্য উৎপাদন করে। তদ্রূপ স্বপ্নের বিষয়ও রূপান্তরিত হইয়া বাস্তবে পরিণত হইয়া থাকে।

সুষুপ্তি-অবস্থা।

শব্দ রূপ রস গন্ধ স্পর্শ প্রভৃতি বিষয় জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় উপলব্ধি হয়, এবং তাহারই ফলাফল উপভোগ হইয়া থাকে। আমার দেহ, আমার সন্তান, আমার স্ত্রী, আমার বিষয় বিভব,—আমার সুখ-দুঃখ-ইষ্টানিষ্ট, এ সমুদায় জাগ্রৎ ও স্বপ্ন-অবস্থাতেই উপলব্ধি হয়। সুষুপ্তি অবস্থাতে এ সমুদায়ের কিছুই থাকে না।

চতুর্দ্দশ করণোপরমাদ্বিশেষবিজ্ঞানা-
ভাবাদ্যদা তদাত্মনঃ সুষুপ্তম্ ॥

সর্ব্বোপনিষৎসার।

“যে সময়ে মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, রসনা, ঘ্রাণ, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই চতুর্দ্দশ করণ স্ব স্ব কারণে উপরত হইয়া যায়, সুতরাং সংকল্প, অধ্যবসায়, চেতনা প্রভৃতি বিষয়ের কোন প্রকারেই (সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বা বাসনা রূপে) উপলব্ধি হয় না, তাহাই আত্মার সুষুপ্তি অবস্থা।”

সুষুপ্তিকালে সকলে বিলীনে
তমোঽভিভূতঃ সুখরূপমেতি ॥

কৈবল্যোপনিষৎ।

"সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম যখন স্ব স্ব কারণে বিলীন হয়, তখন আত্মা সেই সুষুপ্তি অবস্থায় অজ্ঞানাবৃত হইয়া আনন্দ স্বরূপের উপলব্ধি করেন।"

কিন্তু সুষুপ্তির আনন্দ স্থায়ী হয় না। সুষুপ্তির সুখ ছুটিয়া যায়।

পুনশ্চ জন্মান্তরকর্ম্মযোগাৎ
স এব জীবঃ স্বপিতি প্রবুদ্ধঃ ॥

কৈবল্যোপনিষৎ।

"জীব (আত্মা) আনন্দস্বরূপ বস্তু পাইয়াও পুনরায় পূর্ব্ব জন্মীয় কর্ম্মবশতঃ সুষুপ্তি অবস্থা হইতে জাগ্রদ্দশা প্রাপ্ত হয়।"

সুষুপ্তিতে যে আনন্দ, আত্মা তাহা হইতে আর বিরত হইতে চাহেন না, কিন্তু পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল নিষ্ক্রিয় হইবার নহে,—সে-ই আবার তাঁহাকে টানিয়া জাগাইয়া দেয়; আবার কর্ম্ম-শক্তির সুখ-দুঃখ আসিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরে।

কেহ কেহ সন্দেহ করিতে পারেন, যাহাকে কর্ম্মফলের অধীন হইতে হয়, তিনি জীব বা জীবাত্মা—প্রকৃত পরমাত্মা বা অনন্ত অসঙ্গ উদাসীন আত্মা তিনি নহেন। জীব ও ব্রহ্ম বুঝি পৃথক্।

বাস্তবিক কিন্তু তাহা নহে।

পুরত্রয়ে ক্রীড়তি যশ্চ জীব—
স্ততস্তু জাতং সকলং বিচিত্রম্।
আধারমানন্দমখণ্ডবোধং
যস্মিল্লঁয়ং যাতি পুরত্রয়ঞ্চ ॥

কৈবল্যোপনিষৎ।

"যে জীব স্থূল, সূক্ষ্ম এবং জ্ঞানাত্মক শরীরত্রয়ে বিহার করিতেছেন, সেই জীব হইতে অভিন্ন আত্মা হইতে সমস্ত বিচিত্র বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে।"

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্জ্যোতিরাপশ্চ পৃথ্বী বিশ্বস্য ধারিণী ॥

কৈবল্যোপনিষৎ।

"রজ্জু যেমন সর্পজ্ঞানের আধার, তদ্রূপ এই ব্রহ্মই সমস্ত বিশ্বের আধার—নিরতিশয় আনন্দ স্বরূপ এবং অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ। ইঁহাতেই স্থূল, সূক্ষ্ম ও জ্ঞানাখ্য শরীরত্রয় বিলীন হইয়া থাকে। এই তুরীয়াবস্থ ব্রহ্ম হইতেই ক্রিয়াশক্তি অন্তঃকরণ অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি এবং সমস্ত জ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয়, দেহাদি, আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল এবং সর্ব্ববিধারিণী পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়া থাকে।"

অতএব জীব ও ব্রহ্মে পার্থক্য নাই। জল ও তরঙ্গের যে পার্থক্য, এখানেও তাহাই।

সুষুপ্তি-অবস্থাতে আত্মা আত্মানন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন।

প্রাণদেবতাস্তাঃ সর্ব্বা নাড়াঃ সুস্বপে শ্যেনাকাশবৎ। যথা খং শ্যেনমাশ্রিত্য যাতি স্বমালয়মেবং সুষুপ্তঃ॥

ব্রহ্মোপনিষৎ।

"নাড়ীসমূহের প্রাণই দেবতা অর্থাৎ প্রাণ বা আত্মা দ্বারাই নারীসমূহের ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। সুষুপ্তিকালে এই নারীসমূহ শ্যেনাকাশের ন্যায় স্বীয় আলয় স্বরূপ আত্মাতে বিলীন হইয়া যায়। যেমন শ্যেনপক্ষী আকাশের আশ্রয়ে স্বনীড়ে গমন করে, তেমনি সুষুপ্ত অবস্থায় নাড়ীসমূহ ব্রহ্মবস্তুকে প্রাপ্ত হয়।"

ব্রহ্মই পূর্ণানন্দ। সুষুপ্তিকালে জীব যে সেই আনন্দ প্রাপ্ত হয়, ইহা ব্যবহারিক ব্যাপারেও অবগত হওয়া যায়। স্বপ্নহীন নিদ্রা বা সুষুপ্তি হইতে উত্থিত হইয়া লোকে বলে—"সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম।" ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়াছিল।

এখন কথা উঠিতে পারে, শুভাশুভ কর্ম্ম—পাপ পুণ্য প্রভৃতি জন্মযোড়া অদৃষ্ট বর্ত্তমান থাকিতে, সুষুপ্তি অবস্থাতে কি প্রকারে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ হইতে পারে?

যেমন কর্ম্মফলের প্রতি আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে, যাগাদির কর্ত্তা যাগাদি-জনিত কর্ম্মফলের অধীন হয়েন না, সেইরূপ মানুষও সুষুপ্তি কালে ইতর বস্তুর প্রতি আসক্তি শূন্য হওয়ায় পূর্ণানন্দ লাভ করেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, সুষুপ্তি কালে মানুষের নিকট শত প্রলোভনের বস্তু উপস্থাপিত করিলেও তাহার আসক্তি উপস্থিত হয় না,—সগুড়াদির দ্বারা তাড়না করিলেও তাহার ভীতি উৎপাদিত হয় না। শাস্ত্র বলেন—

যথা কুমারো নিষ্কাম আনন্দমুপযাতি তথৈবৈষ
দেবদত্তঃ স্বপ্নে আনন্দমভিযাতি॥

ব্রহ্মোপনিষৎ।

"বালকের কামনা থাকে না বলিয়া যেমন সে সর্ব্বদাই আনন্দ উপভোগ করে, তেমনি সুষুপ্তাবস্থ লোকও তৎকালে কামনার অভাববশতঃ আনন্দ উপভোগ করে।"

আর এক আপত্তি আছে। মানুষ যখন স্বপ্নহীন নিদ্রায় অভিভূত,—যখ তাহার জ্ঞানমাত্র নাই, তখন সে আনন্দ উপভোগ করিবে কি প্রকারে ?

বেদ এব পরং জ্যোতির্জ্জ্যোতিকামো জ্যোতিরানন্দয়তে ॥

ব্রহ্মোপনিষৎ।

"যিনি আত্মজ্ঞানী, তিনি সুষুপ্তাবস্থায় কেবলমাত্র পরম জ্যোতিঃ পদার্থেরই অনুভব করেন। এই জ্যোতিঃ পদার্থ ই আনন্দস্বরূপ, সুতরাং সুষুপ্তিতে আনন্দেরই অনুভব হইবে।"

অগ্নি জ্বলন্ত জিনিষ। ধূম ও বাতাস যখন তাহাকে আবৃত ও চালিত করে, তখনই তাহার বিকৃতি দর্শন হয়,—কিন্তু ধূম ও বায়ু না থাকিলে তাহা শুদ্ধ অগ্নি—শুদ্ধ জলন্তভাব।

বাসনাদি আছে বলিয়াই আত্মা জীব বা সুখ-দুঃখের অধীন,—সুষুপ্তিকালে সেই বাসনাদির অভাব হয়, কাযেই তখন তিনি যে আনন্দময়, সেই আনন্দময় অবস্থাপ্রাপ্ত হয়েন।

তুরীয় অবস্থা

সুষুপ্তি অবস্থার উপরে চিন্তা করা সংসারী মানবের পক্ষে বড়ই কঠিন কথা। সুষুপ্তি অবস্থার আরও সূক্ষ্মাবস্থাই তুরীয় অবস্থা। আত্মা যখন জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় হইতে বিমুক্ত হয়েন, এবং সমস্ত পদার্থরাশি হইতে অসংসৃষ্ট হইয়া উহাদের সাক্ষিস্বরূপে বিরাজমান থাকেন, এবং যখন ইহার কোন প্রকার বস্তু ব্যবধায়ক থাকে না, কেবল একমাত্র ইনিই প্রকাশ স্বরূপে বিদ্যমান থাকেন, তখন আত্মার তুরীয় অবস্থা।

স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তঞ্চোভৌ যেনানুপশ্যতি।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥

কাঠকোপনিষৎ।

"স্বপ্নপরিজ্ঞেয় বিষয় এবং জাগ্রদবস্থার পরিজ্ঞেয় বিষয়, এই উভয় বিষয়ই যে আত্মা দ্বারা উপলব্ধি করে, ধীর ব্যক্তি সেই পরিব্যাপক আত্মাকে "অহমস্মি" ভাবে সাক্ষাৎকার করিয়া শোকাদি হইতে বিমুক্ত হয়েন।"

সুষুপ্তিতে "অহমস্মি" ভাবের পূর্ণস্ফূর্ত্তি না থাকিলে, "অহমস্মির" আনন্দ আছে,—তুরীয় অবস্থাতে সেই আনন্দের পূর্ণতম স্ফূর্ত্তি।

কথাটা আরও একটু বিশদভাবে আলোচনা করিয়া আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। আমার টাকা নাই, আমার শারীরিক অসুখ, আমার স্ত্রীর রূপ নাই,

আমার সন্তানেরা বড় দুষ্ট—ইত্যাদি যে দুঃখ-ভাব, তাহা অজ্ঞান হইতেই হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে এই মর্ত্ত্যভূমিতে যাহার যতপ্রকার অভাব বা নিরানন্দ, সে সমস্তই অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়। অজ্ঞান আবার সত্য ও অসত্যের মধ্যে পার্থক্য দৃষ্টির অভাব হইতে উৎপন্ন হয়। আমরা সর্ব্বদাই স্বপ্নের সংসার সাজাইয়া লইয়া বিব্রত হইয়া থাকি। স্বপ্ন ভাঙ্গে না,—জাগরণের অবস্থা আসে না, তাই অবান্তরের মোহে মুগ্ধ হইয়া দুঃখ ভোগ করি। আত্মাই একমাত্র সত্য,—আমরা তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। শরীর মিথ্যা স্বপ্ন, তথাপি কিন্তু আমরা ভাবি—আমার শরীর। শরীর না থাকিলে আমাদের সুখ নাই,—শরীর যদি ধ্বংস হয়, কেমন করিয়া থাকিব। সুতরাং জানা গেল যে, অবিবেকই দুঃখের কারণ। অবিবেক অবিদ্যা হইতে জন্মে। ইহাদেরই দ্বারা আমরা স্বপ্নের সংসার গঠন করিয়া সুখ-দুঃখের আবর্ত্তে পড়িয়া ঘুরিতে থাকি।

যাঁহারা বিবেকী, তাঁহারা জানেন যে, আত্মা শুদ্ধ-স্বভাব ও সদা পূর্ণস্বরূপ এবং জগতের মধ্যে তিনিই একমাত্র অমিশ্র বস্তু। শরীর মনাদি আর সমস্তই মিশ্র পদার্থ,—সুখে দুঃখে মিশান। কিন্তু আমরা সর্ব্বদাই আমাদিগকে উঁহাদের সহিত মিশাইয়া ফেলিতেছি। যখন আমাদের বিবেক আসে,—আমাদের এই বিচার শক্তি লব্ধ হয় যে, বাহ্য বা আভ্যন্তর জগতের সমুদায় বস্তুই মিশ্র পদার্থ,—সুতরাং উঁহারা আত্মা নহে।

আত্মা এক এবং অদ্বিতীয়। আত্মা একক বা কেবল। তাঁহাকে সুখী করিতে আর কাহারও প্রয়োজন নাই। যত দিন আমরা আমাদিগকে সুখী করিবার জন্য আর কাহাকে চাহি,—তত দিনই আমাদের জাগ্রৎ বা স্বপ্নাবস্থা—ততদিন আমরা দাস-মাত্র। যখন জীব জানিতে পারেন যে, তিনি মুক্ত-স্বভাব ও তাঁহাকে পূর্ণ করিতে আর কাহারও প্রয়োজন হয় না,—জানিতে পারেন—যে, এই প্রকৃতি ক্ষণিক. ইহার কোন প্রয়োজন নাই, তখনই মুক্তি হয়,—তখনই কৈবল্যলাভ হয়। যখন আত্মা জানিতে পারেন যে, জগতের ক্ষুদ্রতম পরমাণু হইতে দেবগণ পর্য্যন্ত কিছুরই উপর তাঁহার নির্ভরের প্রয়োজন নাই, তখনই আত্মার সেই অবস্থাকে কৈবল্য ও পূর্ণতা বলে। যখন শুদ্ধি ও অশুদ্ধি উভয় মিশ্রিত মন আত্মার ন্যায় শুদ্ধ হইয়া যায়, তখনই মন নির্গুণ, পবিত্র স্বরূপকে অর্থাৎ পুরুষকে প্রতিফলিত করে।—এইরূপ অবস্থার সহিত বোধ হয়, তুরীয় অবস্থার তুলনা হইতে পারে।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

আশালতা।

—০৩০—

অমর গম্ভীরভাবে বলিল "তোমার সঙ্গে আড়ি—"আশালতা বলিল "না ভাই—আড়ি কেন?" অমর পুনরায় বলিল "না ভাই আড়ি—"

আশালতা মুখ ভার করিয়া বলিল "এই যে তুমি কা'ল বলিলে, তোমাতে আমাতে বিয়ে হবে—কত কি হবে, আবার আড়ি—"

অমরনাথ তখন হাসিয়া বলিল "ওহো! ভুলে গেছি—আচ্ছা—আর কখনও আড়ি ক'রব না"। অমরনাথের হাসিমাখা কথা শুনিয়া আশালতার মুখ হইতে গাম্ভীর্য্য উড়িয়া গেল—তখন তাহার মুখখানি সরল সুন্দর হাস্যে সুশোভিত হইল।

অনেক পাঠক পাঠিকা মনে করিতে পারেন যে, অমরনাথ হয় ত পঞ্চবিংশবর্ষবয়স্ক সুপুরুষ কলেজের 'পাস' করা ও চসমা পরিহিত নবীন যুবা,—এবং আশালতা হয় ত ষোড়শী রূপসী ইত্যাদি; কিন্তু তাহা নহে। যদি কোন পাঠক পাঠিকা এরূপ মনে করিয়া থাকেন, তবে তিনি নিজেই তাহার সংশোধন করিয়া লইবেন। অমরনাথের বয়স আট বৎসর এবং আশালতা সবে পঞ্চমবর্ষে পতিতা। যদি কোন পাঠক পাঠিকা এই কথা শুনিয়া এই খানেই 'ইতি' করেন, তবে আমি নাচার।

বালক বালিকা পুনরায় ক্রীড়া করিতে লাগিল। এবং পরস্পরের মনের মিলে উভয়ের কত অসংবদ্ধ গল্প হইল।

(২)

উল্লিখিত ঘটনার পর প্রায় দশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। এই দশ বৎসরের মধ্যে সংসারের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে। আমাদের অমর-নাথ ও আশালতারও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। অমরনাথ এখন যুবক হইয়াছে, তাহারা এখন আর কলিকাতায় নাই। পিতার মৃত্যু হওয়াতে অমরনাথ স্বীয় গণ্ডগ্রামে গিয়াছে। প্রায় ৭।৮ বৎসর আর উভয়ের দেখা সাক্ষাৎ নাই। আশালতাও এখন বড় হইয়াছে। আশালতার পিতা তাহার বিবাহের জন্য বড় বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। তবে তাঁহার সাহস এই যে, আশালতা পরমা সুন্দরী। কত সম্বন্ধ আসিল, কিন্তু হাজারের কমে কেহই নামিতে চান না। অবশেষে অনেক কষ্টে একটী পাত্র যুটিল। পাত্রটী আশালতাকে দেখিয়া সাতশত টাকাতেই সম্মত হইল।

অমরনাথের এক বন্ধু ছিল, তাহার নাম হিমাংশুভূষণ। আশালতার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে, এমন সময়ে অমরনাথ একদিন তাঁহার কলিকাতাস্থ বন্ধু হিমাংশুর বাটী গিয়া উপস্থিত হইল। উভয় বন্ধুতে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। তন্মধ্যে যে গুলি আমাদের ক্ষুদ্র গল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট, তাহাই নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

অম। কিন্তু, তাহা হইলেও আমি আশাকে আজীবন ভালবাসি।

হিমা। ভালবাসিলে কি হইবে, তোমাদের বিবাহ হইতে পারে না। কায়েতে আর বৈছিতে বিয়ে হয় না।

অম। তাহা হইলে এখন আমি কি করিব। আমার বুক যে ফাটিয়া যাইতেছে।

হিমা। তুমি এক কায কর, বিবাহের পরে তুমি একবার আশালতাকে তাহার শ্বশুর বাড়ীতে যাইয়া দেখিও ; একমাত্র দর্শনই ত তোমার দাবী ?

অমরনাথ বলিল, হ্যাঁ ভাই ! যাহাকে রাত্রি-দিন হৃদয়-মন্দিরে পূজা করিয়াছি, তাহাকে একবার মাত্র চোখের দেখা দেখিব। যাহা হউক, আশালতার শ্বশুর বাড়ীর ঠিকানা কি তুমি জান ?

হিমাংশু আশালতার শ্বশুর বাড়ীর ঠিকানা বলিয়া দিল।

(৩)

অমরনাথ একদিন সটান আশালতার শ্বশুর বাড়ীর অন্দরমহলে প্রবেশ করিল। যাইয়া দেখে, আশালতা মাছ ভাজিতেছে। অমর বাল্যকালে যাহাকে দেখিয়াছিল—এখন সে যুবতী—বড়ই সুন্দরী। অমর বলিল “কি আশা ! কেমন আছ ?” আশালতা একমনে মাছ ভাজিতেছিল, সহসা অমরনাথের কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। আশালতা অমরকে চিনিতে পারিল না। সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল “ওমা ! এ কে গো—” !

আশালতার ভীতি-বিহ্বল চীৎকারে পার্শ্বের কক্ষ হইতে তাঁহার স্বামী বাহির হইয়া আসিল। আসিয়াই দেখে,—“এক অপরিচিত ব্যক্তি তাঁহার অন্দরে।” তারপর—তারপর যাহা ঘটিল, তাহা আর শুনিয়া কায নাই। দ্বারবান, পানওয়ালা প্রভৃতি পাড়ার লোকে মারিয়া ধরিয়া অমরনাথকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল। ইহার পর আর কেহ অমরনাথের খোঁজ খবর পাইল না।

শ্রীরাধাবল্লভ নাগ।

ফল-কথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এক্ষণে স্ফুট তিথি শব্দের অর্থ কি? তাহাই নির্ণয় করা যাইতেছে। রঙ্গনাথ এবিষয়ে—সুস্পষ্ট বলিয়াছেন যে, যদি রবি ও চন্দ্রের স্ফুট না ধরিয়া তাহাদিগের মধ্য হিসাবে তিথিগণনা করা যায়, তবে সেই গণিত ফলকেই মধ্য তিথি বলা হইয়া থাকে। সূর্য্যসিদ্ধান্ত বলিতেছেন যে, এই প্রণালীতে গণনা করিয়া যে তিথি লব্ধ হইবে, তদন্তে মধ্য গ্রহণ হইবে, এরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রমপূর্ণ। স্ফুট তিথির অন্তেই গ্রহণের মধ্যকাল হইয়া থাকে। বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়া অর্থাৎ একেবারে বাঙ্গালাভাবে বলিতে হইলে বলিতে পারা যায় যে, তিথির ঠিক শেষ মুহূর্ত্তই গ্রহণের মধ্য কাল। মধ্যতিথি যে কল্পনামাত্র, তাহা জ্যোতিঃশাস্ত্রাবগাহী পণ্ডিতগণ সবিশেষ অবগত আছেন। মধ্যাধিকারে তিথির উল্লেখ নাই বটে, কিন্তু স্পষ্টাধিকারে আছে; এমন কি অংশকলাদিরও উল্লেখ পর্য্যন্ত আছে। সুতরাং সাধারণতঃ আমরা যে তিথি গণনা করিয়া থাকি, সেই তিথি স্ফুটতিথি। ইহার উত্তরে বলিতে পারা যায় যে, তাহাই যদি শাস্ত্রের মর্ম্ম হইবে, তাহা হইলে স্ফুট শব্দের ব্যবহারের প্রয়োজন ছিল না? তদুত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, মধ্যগ্রহণের ঠিক মুহূর্ত্ত উপদেশের জন্যই ঐ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ তিথির ঠিক শেষ মুহূর্ত্তকেই গ্রহণের মধ্য বলিতে হইবে। ইহাও বিবেচ্য যে, স্ফুট তিথি আনয়ন বলিয়া কোনও প্রণালী সূর্য্যসিদ্ধান্তে নাই। কিন্তু গ্রহণাধিকারে যে তিথির উল্লেখ আছে, তাহাও দ্রষ্টব্য।

অথ গ্রহণদ্বয়সম্ভূতিমাহ—

ভানোর্ভোর্দ্ধে মহীচ্ছায়া তত্তুল্যোঽর্কসমেঽপি বা।
শশাঙ্কপাতে গ্রহণং কিয়দ্ভাগাধিকোণকে॥
নমু কুত্র তদ্ভবতীত্যতস্তয়ো গ্রহণয়োঃ কালমাহ—
তুল্যৌ রাশ্যাদিভিঃ স্যাতামমাবস্যান্তকালিকৌ।
সূর্য্যেন্দূ পৌর্ণমাস্যন্তে ভার্দ্ধে ভাগাদিকৌ সমৌ॥

অমাবস্যান্তকালোৎপন্নৌ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ—রাশ্যাদ্যবয়বৈঃ সমৌ ভবতঃ। পৌর্ণমাস্যন্তে ভাগাদিকৌ তুল্যৌ সূর্য্যাচন্দ্রৌ ষড়্ভান্তরে স্যাতাম্। তথা চামান্তে

সূর্য্যাচন্দ্রয়োরেকত্রোর্দ্ধাধরান্তরেণ সত্বাৎ সূর্য্যগ্রহণম্। পৌর্ণমাস্যন্তে চন্দ্রভূভয়োরেকত্রাবস্থানাচ্চন্দ্রগ্রহণম্ ইত্যাদি।

গতৈষ্যপর্ব্বনাড়ীনাং স্বফলেনোনসংযুতৌ।
সমলিপ্তৌ ভবেতাং তৌ পাতস্তাৎকালিকোঽন্যথা॥

স্বফলেন স্বগতিসম্বন্ধেন যৎফলমিতি যাবৎ।

ইত্যাদি বহুতর প্রমাণ আছে, বাহুল্য ভয়ে উদ্ধৃত হইল না। এই কয়েকটী শ্লোকে স্ফুটাধিকারোল্লিখিত প্রণালী অবলম্বনে গণিত তিথিই গৃহীত হইয়াছে। হৃদয়বান্ ব্যক্তিমাত্রেই ইহা বিনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন যে, যে ঘটনার সময় বা তিথি নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, সেই সময়কার বা তাৎকালিক তিথিই সর্ব্বথা গ্রাহ্য; ঔদয়িক বা আর্দ্ধরাত্রিক তিথির অন্তে তিথ্যন্তর প্রাপ্ত হইয়া তৎকালে যে ঘটনা ঘটিবে, সেই সময়ের গণনা করিয়া সেই মুহূর্ত্তের তিথি নক্ষত্রাদি স্থির করিতে হইবে। ইহাকেই পণ্ডিতগণ তাৎকালিক গণনা বলিয়া থাকেন। কোনও নির্দ্ধারিত সময়ের দুই প্রকার তিথিকল্পনা যুক্তি বা শাস্ত্র সম্মত নহে; কিন্তু, আর্দ্ধরাত্রিক তিথ্যাদি অবগত হইয়া ঘটনাকালীন অর্থাৎ তাৎকালিক তিথ্যাদি স্থির করিবার উপায় শাস্ত্রসম্মত বটে। গ্রহণ গণনার প্রণালীও উপরোক্ত সিদ্ধান্তের অনুকূল প্রমাণ।

প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, কোনও নির্দ্ধারিত পূর্ণিমা কি অমাবস্যায় গ্রহণসম্ভাবনা আছে কি না? যদি সম্ভাবনা থাকে, তবে দেখিতে হইবে, কত ঘটিকা অন্তরে উহা ঘটিবার সম্ভাবনা। ইহা দ্বিতীয় অধ্যায় ৬৬ শ্লোক দ্বারা নির্দ্ধারিত করা যাইতে পারে। তৎপরে ৪৬, ৫৯, ৬০-৬৩ শ্লোক দ্বারা সংস্কার করিতে হইবে। পরে ৪র্থ অধ্যায় ৮ম শ্লোক এবং ১ম অধ্যায় ৬৭ শ্লোকোল্লিখিত তাৎকালিক গণনা করিতে হইবে।

উদাহরণ যথা—

যদি স্থির করা যায় যে, কোনও সম্বৎসরে কোনও পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ হইবে। তবে প্রথমতঃ পূর্ণিমার পূর্ব্ব রাত্রের আর্দ্ধরাত্রিক অহর্গণ স্থির করিতে হইবে। পরে রবি ও চন্দ্রের মধ্য ও চন্দ্রমন্দোচ্চ স্থির করিতে হইবে। (১।৫৩)। ৩। রবি ও চন্দ্রের স্ফুটগতি নির্দ্ধারণ (২।২৯।৩০।৩৮।৩৯।৪৭।৪৮।৪৯)। ৪। অর্দ্ধরাত্রি হইতে পূর্ণিমান্তকালের অন্তর। ৫। দেশবিশেষের গণনার জন্য পূর্ণিমান্তকালের নির্দ্ধারণ। ৬। রবি, চন্দ্র ও ছায়ার ব্যাস নির্দ্ধারণ (৪।২,৪)

স্থিতি, স্পর্শ, মোক্ষ, উন্মীলন, নিমীলন ইত্যাদি নির্দ্ধারণ (৪।১৩, ১৪)। উপরি উক্ত প্রণালী মধ্যে অতিস্ফুটতিথির কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। সূর্য্যসিদ্ধান্তানুসারে সূর্য্য গ্রহণ গণনা করিলেও দেখা যায় যে, তিথি সম্বন্ধে এক ভিন্ন দ্বিতীয় নিয়ম নাই। সিদ্ধান্ত-শিরোমণিও উক্ত মতেরই সমর্থন করিয়াছেন

গণিতাধ্যায় গ্রহস্পষ্টীকরণাধ্যায়ে ৬৫ শ্লোকে তিথির বর্ণনা আছে।

রবিরসৈর্বিরবীন্দুলবাহ্বতাঃ ফলমিতাস্তিথয়ঃ করণানি চ।
কুরহিতানি চ তানি ববাদিতঃ শকুনিতোসিতভূতদলাদনু॥

টীকা—বার্কেন্দোর্ভাগা দ্বিঃস্থাঃ একত্র রবিভির্ভাজ্যা স্তত্র ফলং গতাস্তিথয়ঃ অন্যত্র রসৈর্ভাজ্যাস্তত্র ফলং গতকরণানি। তানি তু একোনানি ববাদিতো ভবন্তীত্যাদি।

প্রবন্ধ বাহুল্য ভয়ে উদাহরণ প্রদর্শিত হইল না। বস্তুতঃ দৃষ্টান্তের সহিত শ্লোকার্থ মিলাইয়া দেখিলেই স্পষ্ট রবি বা স্পষ্ট চন্দ্র প্রভৃতি সমস্তই সবিশেষ অবগত হইতে পারা যায়; কিন্তু একটী উদাহরণ প্রদর্শন করিতে হইলেও প্রবন্ধ বিষয়ে আশাতিরিক্ত বহুলতা হইয়া পড়ে; সুতরাং ইচ্ছা সত্ত্বেও বিরত হইতে হইতেছে। ফল কথা, তিথিসাধনের পক্ষে এই এক প্রণালী ব্যতীত দ্বিতীয় উপায় কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না। সূর্য্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থসম্বন্ধে তিথিবিচার উপরেই করা হইয়াছে। সম্প্রতি সিদ্ধান্ত-শিরোমণি গ্রন্থে উপরোল্লিখিত অংশ ব্যতীত অন্যান্য অংশে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার আলোচনা করা যাইতেছে।

কথিত আছে যে, গ্রহণাধিকারে অত্যন্ত স্ফুটতিথির গণনা আবশ্যক। এ বিষয় সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্ত প্রণালী পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, এক্ষণে সিদ্ধান্ত-শিরোমণিবিহিত প্রণালী প্রদর্শিত হইতেছে।

শ্রীগণেশায় নমঃ। অথ সিদ্ধান্তশিরোমণেশ্চন্দ্রগ্রহণস্যোদাহরণম্।

শাকে ১৬৬৪ বৈশাখ শুক্ল ১৫ দং ৩৮।৩০, বিশাখা দং ১১।৩৭, পরিঘ দং ১৮।৪০, শনৌবৃষাংশ ক ৮, কল্যব্দাঃ—২৯৭২৯৪৮৮৪৩ অহর্গণঃ—৭২০৬৩৫২১১-৭০১ রবিমধ্যং ১।৭।৩১।৫৫ ইত্যাদি সমস্ত নির্ণয় পূর্ব্বক গ্রহণ সম্ভাবনা আছে কি না, স্থির করিবে। গ্রহণ সম্ভাবনা স্থির করিয়া তৎপর প্রকৃত গ্রহণ গণনা করিতে হয়।' উপরিলিখিত প্রণালী মধ্যে কোনও অংশ হইতে অতিস্ফুটের উপদেশ পরিলক্ষিত হয় না। উহাতে ঔদয়িক স্ফুট ও তিথি প্রথমে স্থিরীকৃত

হইয়াছে, তৎপরে গ্রহণ কালীন (তাৎকালিক) স্ফুট ও তিথি স্থির করা হইয়াছে। ইহা সকলেই অনায়াসে দেখিতে পারেন যে, সাধারণতঃ স্পষ্ট রবি, চন্দ্র বা তিথি যে প্রণালীতে আনয়ন করা হয়, গ্রহণ গণনা সম্বন্ধেও সেই প্রণালীই ব্যবহৃত হইয়াছে। আমরা স্পষ্ট রবি, চন্দ্র বা তিথি সম্বন্ধে যে সকল বচন প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি, তদ্ব্যতীত দুইটী একটী শ্লোক এতৎসম্বন্ধে আধুনিক পণ্ডিতগণ কর্তৃক উদ্ধৃত হইয়া থাকে। যথা—

প্রাক্ পশ্চিমস্থস্তরণি বিধুঃস্যা-
দৃণে ফলে যুক্তইতোহন্যথোনঃ।
মুহুঃ স্ফুটাতো গ্রহণে রবীন্দ্বো-
স্তিথিস্থিদং জিষ্ণুসুতো জগাদ ॥

এই শ্লোকটী ইহার পূর্ব্বশ্লোকের সহিত পাঠ করিয়া অর্থসঙ্গতি করিলেই যাথার্থ্যের উপপত্তির কোন বাধা হইবে না।

শ্লোকটী এই :—

তিথ্যন্তনাড়ীনতবাহুমৌর্ব্যা
লব্ধার্কশীতাংশুফলে বিনিঘ্নে।
ক্রমেণ ভক্তেন খগোসমুদ্রৈঃ
ধ্বঙ্গাগ্নিবেদৈঃ কলহীনযুক্তঃ ॥

গ্রহস্পষ্টীকরণাধ্যায়ে এই শ্লোকদ্বয় দেখা যায়। বস্তুতঃ গ্রহণকালীন নতস্থির করাই শ্লোকদ্বয়ের উদ্দেশ্য, তিথ্যানয়ন নহে। নতদণ্ড দুই প্রকার, প্রাঙ্নত ও পশ্চান্নত। অমাবস্যার স্থিতিদণ্ড দিনার্দ্ধের ন্যূন হইলে তাহাকে প্রাঙ্নত এবং অধিক হইলে পশ্চান্নত বলা যায়। সিদ্ধান্তরহস্যেও এবিষয়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—

দিনার্দ্ধদণ্ডান্তরপূর্ব্বদণ্ডঃ
পূর্ব্বাপরাখ্যঃ কথিতো নতোহত্র ॥

সুতরাং পূর্ব্বোক্ত শ্লোক হইতে নতানয়ন ব্যতীত তিথি-নির্দ্দেশাদি হইতে পারে না, ইহাই বুঝিতে হইবে। ভাস্করাচার্য্যোপদিষ্ট পর্ব্বসম্ভবাধিকার, গ্রহণাধিকার ও গোলাধ্যায়োল্লিখিত নতকর্ম্মোপপত্তি বিশেষ করিয়া দেখিলেই এবিষয় সকলেই অবগত হইতে পারিবেন। বাস্তবপক্ষে গ্রহণ গণনাসম্বন্ধে সিদ্ধান্তশিরোমণিগ্রন্থের যাবতীয় অধ্যায় বা উপদেশের সারসঙ্কলন করিয়া বিশদভাবে ভাষানুবাদ, উদাহরণ ও উপপত্তি প্রভৃতির একত্র

সমাবেশ পূর্ব্বক একখানি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিলে, তদ্দ্বারা সাধারণের প্রভূত উপকার দর্শে, ইহা নিঃসন্দেহ। পরন্তু তদ্দৃষ্টে সকলেই গ্রহণ প্রণালী ও গ্রহণ সম্বন্ধে তিথিগ্রহস্ফুটাদি অক্লেশে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়েন।

ক্রমশঃ—

শ্রীকালীকণ্ঠ কাব্যতীর্থ।

পরী।

তা'রা সবে হাওয়ায় ভেসে চ'ড়ে বেড়ায় মেঘের দোলা।
নেমে এসে মর্ত্ত্যভূমে ফুলের সনে করে খেলা।
জ্যোছ্‌না গড়া দেহ তাদের তুলি টানা ভুরুর রেখা।
কোমল চিকণ অলকরাজি পায়ের তলে আঁকা বাঁকা।
পাতার মাঝে ফাঁকে যেথা চাঁদের আলো উপ্‌চে যায়।
আশে পাশে ঝিল্লী যেথা মৃদু মধুর মন্দ্রে গায়।
আলো আঁধার মিলে যেথা নবীন রঙ্গের ঢেউ খেলে।
হাওয়ায় যেথা লবঙ্গ্‌লতা তন্দ্রাঘোরে মৃদু দোলে।
পাহাড় যেথায় ঘুমিয়ে পড়ে ঠেকিয়ে মাথা আকাশ পানে।
তাহার পাশে নির্ঝরিণী বহে মৃদু কল স্বনে।
নীরব নিঝুম জ্যোছ্‌না রাতে এ হেন সে কুঞ্জবনে।
ফুলের সনে হাওয়ার সনে খেলে তারা আপন মনে।
ফুলকে তা'রা ভালবাসে মুক্ত করি হৃদয় প্রাণে।
ছড়িয়ে দিয়ে প্রাণের সুধা জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গনে।
আবার কখন জাগায় পরাণ নীরব মুখের মধুর গানে ;
মৃদু-মধুর মূর্চ্ছনা তার বাজে শুধু হিয়ার কাণে।
সারা বিশ্বের চোখের পাতায় তন্দ্রা যখন কমে আসে।
পূরব পানে ঊষার মৃদু মোহন হাসি উঠে ভেসে।
তখন ত'ারা বিদায় নিয়ে উড়ে যায় সে সোণার দেশে।
তাদের তরে ফুল লতা নিতুই আঁখির জলে ভাসে।

শ্রীরমানাথ দাস।

ঊনবিংশ শতাব্দী ও ভারতবর্ষ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দুঃখ-স্মৃতি ভারতবক্ষে রক্তাক্ষরে লিখিত থাকিবে, এবং তন্নিবন্ধন ইতিহাস ও সাহিত্য চিরদিনের জন্য কলঙ্কিত হইবে। যতদূর সম্ভব, ভারতের সমগ্র ইতিহাস অনুসন্ধান করিলেও বর্ত্তমান শতাব্দীর মত শোচনীয় হৃদয়-বিদারক দৃশ্য আর একটী পরিলক্ষিত হইবে না। দুর্ভিক্ষ এবং মহামারী নামক মানবের সুখ-সমৃদ্ধি-বিনাশক রিপুদ্বয় প্রতিনিয়তই যেন ভারতবর্ষের ধনজন অপহরণ করিতে প্রয়াস পাইতেছে। ১৮৯৬ খৃঃ শেষভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া এপর্য্যন্ত প্লেগদৈত্যের প্রবল পরাক্রমে দেশের যে অনিষ্ট সংসাধিত হইয়াছে, তাহা বোধহয় আর কাহারও জানিবার বাকী নাই। এই দৈত্যটীর আক্রমণে যে কেবল দেশের শোচনীয় লোকহানি ঘটিয়াছে তাহা নহে, ইহার আগমন ফলে দেশের ব্যবসায় বাণিজ্যেরও সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। ইহারই কল্যাণে পশ্চিম প্রদেশের উন্নতিমার্গ এখন কণ্টকাকীর্ণ; মহারাষ্ট্র রাজ্যের রাজধানী, দাক্ষিণাত্যে প্রাচ্য সভ্যতার কেন্দ্র-স্থল ও শিবাজীর লীলাক্ষেত্র কীর্ত্তিময়ী পুণা এখন হিংস্রজন্তু-নিনাদিত গহন কাননে পরিণত। বৃটিশ ভারতবর্ষের সৌন্দর্য্যনিকেতন কীর্ত্তিময়ী ও প্রাসাদময়ী রাজধানী কলিকাতাও প্রকৃতি-প্রেরিত এই শাস্তিবিধাতার আক্রমণ হইতে রক্ষা পায় নাই।

সহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সমবেত চেষ্টার সহিত রাজপুরুষগণের ঐকান্তিক যত্ন সংমিশ্রণেও ইহার যাদৃচ্ছিক আক্রমণ নিরস্ত হয় নাই। ইহার নারকীয় শক্তির নিকট মানবীয় শক্তি পরাভূত হইয়াছে, এবং আক্রান্ত স্থানসকল আর্ত্তনাদপরিপূর্ণ মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াছে। এখনও ইহার কার্য্য সমাপ্ত হয় নাই; এত করিয়াও দৈত্যটী সন্তুষ্ট হন নাই। ইনি বিরাটবদন ব্যাদান করতঃ এখনও আমাদের পশ্চাদনুসরণ করিতেছেন, এবং মৃত্যুবাণ সঙ্গে লইয়া, শৈলস্খলিত তুষারস্তূপের মত, খরবেগে একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতেছেন ও সম্প্রতি আবার ইহার প্রিয়সহচর কালান্তক যমপ্রায় দুর্ভিক্ষদেবের সহিত সম্মিলিত হইয়াছেন। এতদ্দেশীয় হতভাগ্য লোকসমূহের সহন-শক্তি কতদূর প্রবল, তাহা একরূপ প্লেগের হস্তেই পরীক্ষিত হইয়া গিয়াছে, দুর্ভিক্ষ কেবল এখন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিতে আসিয়াছেন।

ভারতবর্ষ এখন দুর্ভিক্ষের বিলাসভবন, দুঃখী ও বিপন্নের পর্ণশালা। যতদিন পর্য্যন্ত ভারতীয় শিল্পবাণিজ্যের উৎকর্ষসাধন না ঘটিয়া উঠিবে, এবং ভারতবর্ষ বিদেশীয় শিল্পীর অন্যায় অসঙ্গত প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে ত্রাণ না পাইবে, যতদিন বিজ্ঞানবলে কৃষিশিল্প পরিপুষ্ট না হইবে; ততদিন ভারতবর্ষের অবস্থা এইরূপই থাকিয়া যাইবে। কেবল ইহাতেই হইবার নহে; যদি এদেশীয় ব্যবসায় বাণিজ্যের নির্ব্বাণোন্মুখ অগ্নিকুণ্ডে অধিক পরিমাণ অর্থ-ইন্ধন নিক্ষিপ্ত না হয় কিম্বা যদি গবর্ণমেণ্ট ও প্রজাসাধারণ শিল্পকার্য্যের জন্য কল কারখানার সুবন্দোবস্ত না করেন, তবে ভারতবর্ষের উন্নতি-আশা সুদূর-পরাহত। যদি এইরূপ করা যায়, তবে অনতিবিলম্বেই ভারতের সুখসমৃদ্ধি পুনরুজ্জীবিত হইবে, নিয়তি-পরিচালিত কালের চারু আবর্ত্তনে তখন কেহই আর দাসত্ব স্বীকার করিতে চাহিবে না। সকলেই কেবল স্বাধীন-স্বচ্ছন্দ জীবন যাত্রার নিদানভূত বাণিজ্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতে মাতিয়া উঠিবে। ভারতবাসিগণ যদি জমীজিরাত ও চাকুরী বাকুরীর মমতা কাটাইয়া সর্ব্ব-প্রযত্নে বাণিজ্যের উপর নির্ভর করিতে না শিখে, তবে ভারতবর্ষের লুপ্তগৌরব উদ্ধার চেষ্টা এবং শূন্যে দুর্গ নির্ম্মাণ সমান হইয়া দাঁড়াইবে। সুতরাং চাকুরী প্রভৃতিকে উন্নতির গৌণ এবং বাণিজ্য ও শিল্পকে মুখ্যকারণ ধরিতে হইবে, তদন্যথায় আমাদের গুরুতর ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। কেন না, জমীজিরাত হইতে যে লাভ, তাহা অনেকাংশে জলবায়ু প্রভৃতি নৈসর্গিক উপাদান সমূহের উপর নির্ভর করে; কিন্তু আমাদের এমন ক্ষমতা নাই যে, প্রয়োজন মত ঐ সমুদায় সংগ্রহ করিয়া শস্যোৎপাদনের পথ সুগম করিয়া লইব। চাকুরীতেও তেমন সুবিধা নাই, সবদিকই প্রায় অতি-পূরিত হইয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতিরেকে, দেশের উৎপন্ন শস্যে যে পরিমাণ লোকের আহার সংস্থান হইতে পারে, আজকাল তদপেক্ষা সংখ্যা অনেক বাড়িয়া চলিয়াছে। এবং উপযুক্ত চাকুরী পাইতে কাযেই লোকের বড়ই কষ্ট হইয়াছে। ব্যবসায় বাণিজ্য মানবীয় শক্তির বহির্ভূত নহে এবং ইচ্ছাকরিলেই আমরা অত্যাশ্চর্য্য-রূপে ইহা হইতে লাভ করিতে পারি ও আমাদের দেশীয় লোকের শিল্প প্রতিভার সাহায্যে অচিরেই আমরা পৃথিবীর যে কোন সভ্যজাতির সমকক্ষ হইতে পারি। চিন্তাশীল সুধীমাত্রেই সহজে বুঝিতে পারেন যে, ভারতীয় কৃষিশিল্পের শোচনীয় অবস্থা এবং তৎফল-প্রসূত লোক-দারিদ্র্যই এ দেশের

যে, ভারতবর্ষের প্রকৃত সুখসমৃদ্ধি একমাত্র বাণিজ্যের সম্যক্ উৎকর্ষের উপরই নির্ভর করিয়া থাকে। ভারতবর্ষের ক্রমবর্দ্ধমান লোকসংখ্যা দেখিলে ও একটু চিন্তা করিলে সহজেই মনে হয় যে, শিল্প ও বাণিজ্য ব্যতিরেকে আর দেশের কল্যাণ এবং অন্নসংস্থানের যোগাড় নাই।

বাণিজ্যের উন্নতি অবনতির সঙ্গে ভারতবর্ষের উত্থান-পতন অবশ্যম্ভাবী। বাণিজ্যে দেশের শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারে, কিন্তু ইহার এমন শক্তি নাই যে, আমাদের জাতীয় জীবনের অস্থিমজ্জাগত দোষসমূহের অপকারিণী শক্তির সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারে। একথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, ভারতবর্ষ এখন অনেকাংশেই ঠাকুরমার সোহাগ-দুষ্ট আবদারে ছেলের মত হইয়া পড়িয়াছে। স্বভাবদত্ত ঐশ্বর্য্যই এখন তাহার প্রবল শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে, নতুবা তাহার এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিত না। প্রকৃতি দেবী যদি তাহার বিপুল খাজাঞ্চীখানার দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া প্রশ্রয়দাত্রী ঠাকুরমার মত যথেচ্ছ-বিহারের বিলাস-সামগ্রী না যোগাইত, তবে এই রাষ্ট্রবিপ্লবের দিনে বক্তৃতা শুনিয়া অনেকেই আত্মনির্ভরী হইত এবং ভারতবাসীকেও আর নিত্যব্যব-হার্য্য খুটিনাটি দ্রব্যসম্ভারের জন্য বিদেশের দিকে তাকাইয়া থাকিতে হইত না। আর শতসহস্র ভারতসন্তান আজ চাকুরী-প্রত্যাখ্যাত হইয়া যেখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইত না। কিম্বা ভারতের অর্থরাশিও বৈদেশিক শিল্পি-গণের গ্রাসাচ্ছাদন-পুষ্টির কারণ হইত না।

১৮৯৬খৃঃ যে মহাদুর্ভিক্ষানল সন্দীপিত হইয়াছিল, লর্ড এলগিনের যত্ন-সঞ্চিত অর্থবারি সিঞ্চনে তাহা নির্ব্বাপিত হইল। সেই ধাক্কা সামলাইতে না সামলাইতেই আবার ১৯০০ অব্দে দুর্ভিক্ষ আসিয়া উপস্থিত।

এই দুর্ভিক্ষের অনলে ৫৫০০০০ বর্গ মাইলেরও অধিক পরিমিত স্থান দগ্ধ হইয়াছিল। তৎকালীন গবর্ণমেণ্ট-নির্দ্দিষ্ট দুর্ভিক্ষ-বিবরণ পাঠ করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, ভারতে এমন দুর্ভিক্ষ আর পূর্ব্বাপর কোন কালেই ঘটে নাই। বোম্বে, পাঞ্জাব, রাজপুতানা ও মধ্যপ্রদেশের দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট প্রজাসাধারণের শোচনীয় অবস্থা পাঠ করিলে, বিস্ময় দুঃখে অভিভূত হইতে হয়! দুর্ভিক্ষ-সমাচ্ছন্ন দেশসমূহের লোকজন ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে কালের করাল কবলে নিপতিত হইয়াছে! গার্হস্থ্য জীবনের সুখশান্তিরূপিণী—যে প্রেম-মন্দাকিনীর সুমিষ্ট প্রবাহে মর্ত্ত্যেই অমরার নন্দনসুখ অনুভূত হয়, দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট স্থানসমূহে তাহা অতীব বিরল—

এবং দারিদ্র্য ঝঞ্ঝাবাতের প্রবল পীড়নে তাহা নিতান্ত দীন ও মলিন। সেখানকার সংসারকুঞ্জ যেন সুখস্বচ্ছন্দতার পরিবর্ত্তে অভাব অনাটনের ঘাত-প্রতিঘাতে নিত্য আন্দোলিত ও উদ্বেলিত; নিরীহ প্রজাপুঞ্জের বাস্ত-বাস যেন ক্ষুদ্র মরুভূমি। সেখানে রাখালের কলকণ্ঠনিঃসৃত সরস-মধুর গ্রাম্যগীতির পরিবর্ত্তে নীরস—কঠোর বায়স রব ও আমোদ পরিহাসের পরিবর্ত্তে মুমূর্ষুর আর্ত্তনাদ স্বতঃ বিরাজিত।

দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত অস্থিকঙ্কালসার শতসহস্র লোক অন্নাভাবে যেখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইত;—কোন স্থানেই তাহাদের উদর পূর্ত্তির সুবিধা হয় না। এই সমুদায় দুর্ভাগ্য বিপন্ন লোকের প্রাণস্পর্শী নিরাশ কাতর আর্ত্তনাদ শুনিলে হৃদয়-তন্ত্রী শতধা বিদীর্ণ হইয়া যায়। স্মিতমুখ বালক-বালিকাগণ পিতামাতার সোহাগ-ক্রোড়ে উপবেশন করতঃ সতৃষ্ণ নিবদ্ধ-দৃষ্টিতে যখন মুখের দিকে তাকাইয়া খাদ্যবস্তু প্রার্থনা করে, তখন নিরাশ নিরন্ন পিতামাতার বিষাদম্লান মুখচ্ছবি দেখিলে পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া যায়। এই সমস্ত বালক বালিকা আবার যখন খাইতে না পাইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখন তাহাদের গলদশ্রু-বিধৌত পিতামাতার উচ্ছ্বসিত শোকা-বেগে সান্ত্বনা দিতে কেহই থাকে না। হায়, সে দৃশ্য কতই ভীষণ! কতই নিদারুণ!! তার পর যদি কোন হতভাগ্য দুর্ভিক্ষের এই প্রবল উৎপীড়ন সহ্য করতঃ বাঁচিয়া উঠে, তবে তাহাকে চিরদিন পুত্রের মৃত্যু-স্মৃতি মনে করিয়া কাঁদিতে হয়। দুর্ভিক্ষের কল্যাণে কতশত পুত্র কন্যা পিতৃ-মাতৃহীন হইয়া চিরদুঃখ পঙ্কে নিমজ্জিত হয়, কতশত প্রফুল্ল-কমলিনী সতীলক্ষ্মী পতি-বিয়োগ জনিত অরুন্তুদ যন্ত্রণায় শুষ্ক ও মলিন হইয়া যায়। কতশত সোণার সংসার মহাশ্মশানে পরিণত হয়! দুর্ভিক্ষজীর্ণ, শ্মশানপ্রায় স্থানসমূহের শোচনীয় দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিলে হৃদয়-শোণিত শুকাইয়া যায়, বিস্ময়-ভয়ে বালকের ন্যায় কাঁদিতে হয়, অজ্ঞাতসারে হৃদয়মাঝে দয়ার উৎস খুলিয়া যায়! দুর্ভিক্ষের দুর্দ্দিনে, আমাদের নিজের একটু অসুবিধা করিয়াও অন্যের সুবিধা করা উচিত। কেন না, আর্ত্তের ত্রাণই মহতের লক্ষণ। দুর্ভিক্ষের পীড়নে অন্নাভাবে শতসহস্র দেশবাসী মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, আর আমরা সংসারে সুখশান্তির বিমল সুধা পান করিয়া তাহাদের দুঃখ যন্ত্রণা প্রত্যক্ষ করিব, ইহা কিছুতেই জগদীশ্বরের অভিপ্রেত নহে। ধনের সদ্ব্যবহার করাই ধনীর প্রধান কর্ত্তব্য; সুতরাং ধনবিসর্জ্জনে যদি শত শত

মুমূর্ষুর প্রাণ রক্ষা পায়, তাহা করা প্রত্যেক বিত্তশালী ব্যক্তিরই উচিত।

এই অভিশপ্ত ভারতবর্ষের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত আত্মনির্ভরতা। যতদিন ভারতবাসী আপনার পায়ে আপনি না দাঁড়াইতে শিখিবে, ততদিন ভারত-বর্ষের উন্নতি নিতান্তই অসম্ভব। সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের চমৎকার সৃষ্টি-কৌশলের অন্তর্নিহিত প্রাকৃত নিয়ম-নিচয় পরীক্ষা করিয়া দেখিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, এসংসারে প্রত্যেক জিনিষই যৌথ কারবারের মত কোন একনিষ্ঠ কারবারের অধীন। যদি এই একনিষ্ঠতার অস্তিত্ব লোপ করিয়া দেওয়া যায়—তাহা হইলে সমগ্র বিশ্বসৃষ্টি এক অত্যদ্ভুত বিশৃঙ্খল বিবর্ত্তে পরিণত হইবে। সুতরাং একনিষ্ঠ সমভাব যাহাতে আমাদের সহিত অস্থি-মজ্জার মত ঐক্যসূত্রে সংসৃষ্ট হইতে পারে, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টার আবশ্যক। একতা ও বিশ্বজনীন প্রীতি যে জাতির ভরভিত্তি না হইয়াছে, সে জাতির অস্তিত্ব অতি অনিত্য ও অস্থায়ী। এই দুইটী সদ্‌গুণ ইংরেজ জাতির রক্ষা-মন্ত্র, তাই তাহারা জগতে আদর্শ স্থানীয়, তাই তাহাদের দয়া সৌজন্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকসমূহ আশান্বিত। তাহারা আত্মপর অভেদ জ্ঞানে আমাদের দুর্দ্দিনে যাহা করিয়াছে, তাহা অতুলনীয়। সহৃদয় গবর্ণমেণ্টের বদান্যতা দেখিয়া আমাদের শিক্ষালাভ না হইলে, আর কিছুতেই হইবে না এবং এই পতিত ভারতবর্ষ চিরদিনের জন্যই শুধু পরের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবে। গবর্ণমেণ্ট দ্বারাই দেশের সমস্ত অভাব দুর হইতে পারে না, কিন্তু যদি আমরা গবর্ণমেণ্টের সহিত মিলিয়া আমাদের উপকারার্থে কায করিতে থাকি, তবেই দেশের উদ্ধার, নতুবা আমাদের ও আমাদের জন্মভূমির উন্নতি অসম্ভব।

শ্রীবেণীমাধব দত্ত।

মাতৃ-উপাসনার আবশ্যকতা ও মাতৃ-উপাসনাই সহজ সাধন।

মাকে কেবল প্রকৃতি বলিয়া জ্ঞাত হইলেই যে সন্তানের কর্ত্তব্যের শেষ হইল, তাহা নহে ; মাতৃরূপিণী প্রকৃতির উপাসনা না করিলে অভীষ্ট ফললাভ হয় না। শুধু আকাঙ্ক্ষাতেই ফলের উৎপত্তি হইতে পারে না, ফলের আশা করিলে কর্ম্ম করিতে হয়, কর্ম্মই অনুরূপ ফল প্রসব করে। দোহন ব্যতীত যেরূপ গাভীর শরীরাবচ্ছিন্ন দুগ্ধ লাভ হয় না ; মন্থন দণ্ডের দ্বারা আলোড়ন না করিলে যেরূপ দুগ্ধগত নবনীতের উৎপত্তি হয় না, জীবাত্মা যেরূপ পর-মাত্মার সহিত এক দেহে অবস্থান করিয়াও উপাসনা ব্যতীত তাঁহার স্বরূপ অবগত হইতে পারে না ; সন্তানও তদ্রূপ মাতার উপাসনা না করিয়া কেবল তাঁহার প্রকৃতিত্ব জ্ঞান দ্বারাই আত্মার উন্নতি-সাধন করিতে সমর্থ হয় না। সন্তান কায়-মনে জননীর সেবা পূজা না করিলে তাঁহার প্রতি সন্তানের ভক্তিশ্রদ্ধার উদ্রেক হয় না। ভক্তি না হইলে আত্মার উন্নতি সাধন সম্ভব-পর নহে ; আত্মার উন্নতি না হইলে সংসার-বন্ধন ছিন্ন হয় না। অতএব আত্মহিতাভিলাষী সন্তানের মাতৃ-উপাসনা অবশ্য কর্ত্তব্য।

মাতৃ-উপাসনা সহজ সাধন। সাধনের দুইটী পথ, জ্ঞান ও ভক্তি। গৃহাশ্রমীদিগের পক্ষে জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তির সাধনই সহজ। জ্ঞানী বিবেক-বিচার দ্বারা যে সমস্ত বৃত্তিকে নিস্তেজ করিয়া আত্মার নির্গুণ অবস্থায় উপস্থিত হইতে যত্ন করেন, ভক্ত সেই সমস্ত বৃত্তিকে সতেজ রাখিয়া আত্মার সগুণ বিগ্রহের সেবা পূজা ও রূপ দর্শন করিয়া, নয়ন মন তৃপ্ত করেন। ভক্তগণ প্রস্তর এবং মৃণ্ময় প্রভৃতি নানাবিধ, অভিলষিত মূর্ত্তিতে ভগবানের আবির্ভাব জ্ঞান করিয়া, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং কান্ত ভাবে তাহার সেবা করেন, ভগবানকে স্নান আহার করান, শোয়ান, বসান ইত্যাদি নানাভাবে ঠিক আত্মীয়, কুটুম্ব প্রভৃতির ন্যায় তাঁহার প্রতি ব্যবহার করেন। এরূপ ব্যবহার দ্বারা ভগবানের প্রতি দৃঢ় অনুরাগ জন্মিলে, পরম দয়াল ভক্ত-বৎসল ভগবান্ ভক্তের প্রতি অবশ্যই প্রসন্ন হইয়া থাকেন। তবে এরূপ প্রসন্নতা লাভ সহজ কথা নহে, গৃহাশ্রমীদিগের মন বিষয়াসক্ত ও দুর্ব্বল। চক্ষে যাহা দেখিতে পাওয়া যায় না, মন তাহাতে সহজে

অনুরক্ত হয় না; সুতরাং প্রস্তরাদি নির্ম্মিত মূর্ত্তিতে ভগবানের আবির্ভাব জ্ঞান করিয়া, তাহাতে অনুরক্ত হওয়া সামান্য ভাগ্যের বিষয় নহে। কিন্তু মাতৃ-উপাসনা দ্বারা আত্মার উন্নতি সাধন অতি সহজেই হইতে পারে। মাতার প্রতি সন্তানের এবং সন্তানের প্রতি মাতার পরস্পর স্বাভাবিক একটী অনুরাগ আছে; এজন্য ঈশ্বরকে মাতৃজ্ঞান করিয়া, মাতার ন্যায় কায়মনে তাঁহার সেবা পূজা করিলে, তাঁহার প্রতি অনুরাগের সঞ্চার হয়। কিন্তু আমাদের গর্ত্তধারিণী মাতৃরূপা প্রকৃতিকে ত আর মা বলিয়া জ্ঞান করার প্রয়োজন হয় না, তিনি ত স্বয়ংই আমাদের মাতা; তিনি ঈশ্বরের প্রস্তরময়ী মূর্ত্তির ন্যায় নির্জ্জীব, নিস্পন্দ মাতা নহেন; তিনি আমাদের জীবন্ত মাতা। তিনি স্বয়ং আমাদিগকে গর্ব্তে ধারণ করিয়াছেন, প্রসব করিয়াছেন, লালন পালন করিতেছেন, অযাচিত-ভাবে স্নেহ করিতেছেন; আমাদের মঙ্গল-কামনায় আজীবন রত রহিয়াছেন। আমরা মাকে চক্ষু ভরিয়া দেখিতেছি, ডাকিলে তিনি নিকটে আসিতেছেন, প্রাণ ভরিয়া আদর করিতেছেন। পাষাণময়ী মূর্ত্তি-রূপিণী মা খান না, পরেন না, শুনেন না, বলেন না; কিন্তু গর্ত্তধারিণী প্রকৃতি-রূপিণী মা খান, পরেন, বলেন শুনেন; তাঁহাকে যত ইচ্ছা খাওয়াইতে পারি, প্রাণ ভরিয়া ভক্তি করিতে পারি, চক্ষু ভরিয়া তাঁহার পবিত্র মূর্ত্তি দর্শনে প্রাণ মন শীতল করিতে পারি, মনের সাধে মনের মত তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিয়া মানব জীবন সার্থক করিতে পারি, ইহা অপেক্ষা মানবের সহজ সাধন আর কি হইতে পারে?

শ্রীব্রজেন্দ্রলাল চৌধুরী।

মান ও প্রাণ।

মান, প্রাণ কথা দু'টো বল্‌তে কিছুই নয়।
ভাব্‌তে গেলে এরি মাঝে উচু কথা হয়।
সবাই বলে প্রাণটা দিয়ে মানই রাখি আগে।
প্রাণের প্রতি এত ঘৃণা সব-হৃদে কি জাগে?
কথায় কথায় যেই করে প্রাণ মানের গর্ব্ব,
তার কখনও হয় না কিছু, (সে) সবার কাছে খর্ব্ব॥

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ।

রোরুদ্যমানা রমণী

ENGRAVED & PRINTED BY
THE ACME PRINTING & PROCESS WORKS,
115, Amherst St., Calcutta

সাধনায় সিদ্ধি।

কাহিনী।

(১)

একা।

সংসারে আমি একা। যথার্থই সংসারে আজ আমি একা! আজ সংসারের যে দিকে চাহিতেছি,—আশা-মরীচিকাময় হৃদয়ে সংসারের যে দিকে চাহিতেছি, সেই দিকেই শূন্য!—সেই দিকেই অন্ধকার!!—সেই দিকই ভীষণতাময়!!! হায়! তাই সংসারে আজ আমি একা।

পূর্ব্বে আমি এমন একা ছিলাম না। এমন করিয়া পথে দাঁড়াইয়া কখন কাঁদি নাই। পরের আশায় বুক বেঁধে, পরের মুখ চেয়ে জীবন ধারণ করি নাই। এমন এক সময়ও গিয়াছে, যখন ধনবান্ পিতার স্নেহে, আত্মীয়-স্বজনের আদর-যত্নে, প্রতিবেশিগণের ভালবাসায় পরম সুখে দিন কাটাইয়াছি! এখন যেমন চক্ষের জলের বিচ্ছেদ নাই, তখন তেমনি হাসিরও বিচ্ছেদ ছিল না, সর্ব্বদাই হাস্যধ্বনিতে পিতার অভ্রভেদী প্রকাণ্ড অট্টালিকাটী মুখরিত করিয়া, বড়মানুষের ছেলে বড়মানুষী বসন-ভূষণে বিভূষিত হইয়া মনের আনন্দে দিন কাটাইয়াছি। হায়! এ অভাগার অতীত জীবনের সে অতীত ইতিহাস,—সে সুখময় অতীত ইতিহাস আজ যেন স্বপ্ন!—যেন কবির মনগড়া আষাঢ়ে গল্প!! অথবা যেন বচনবাগীশের আসর জমান বাক্যের ঘটা!!!

শৈশবেই আমি মাতৃহীন। কিন্তু আমার স্নেহময় বৃদ্ধ পিতা সর্ব্বাপেক্ষা আমাকেই অধিক স্নেহ করিতেন,—প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিতেন,—মাতৃহীনের অপরিহার্য্য কষ্ট একদিনের জন্যও জানিতে দেন নাই। আমিই যেন বৃদ্ধ পিতার সংসার-বন্ধনের একমাত্র কারণ হইয়াছিলাম। পিতা আমাকে এক দণ্ড না দেখ্‌তে পেলে বড়ই কাতর হ'তেন। সর্ব্বদাই চক্ষে চক্ষে রাখ্‌তেন। হায়, আমার সেই স্নেহময় পিতা এখন কোথায়? আজ আমি পথের ভিখারী!—আশ্রয় শূন্য!!—একমুষ্টি অন্নের কাঙ্গাল!!! অহো! আমার এ অভাবনীয় দুঃখের কারণ কে? আমার অদৃষ্ট, না আমার বৌ-দিদি?

প্রায় দুই বৎসর অতীত হইল, পিতা আমার পশ্চিম গিয়াছেন। জানি,

এই বৃদ্ধ বয়সে সুদূর তীর্থপর্য্যটনে যাইতে তাঁহার আদপে ইচ্ছা ছিল না। তিনি বলিয়াছিলেন,"না, এ বয়সে বাড়ীর বাহির হইলে পথকষ্টে মারা যাইব,— আর ফিরিতে হইবে না!" কিন্তু দাদা, বৌ-দিদি, এমন কি দাদার শ্বশুরকুলের বন্ধু বান্ধব পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহাকে শেষ দশায় পরকালের কার্য্য করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। শেষে দাদা একরূপ জোর করিয়াই তাঁহাকে পশ্চিমে পাঠান। প্রথম প্রথম কয়েকবার আমি তাঁহার শারীরিক সংবাদ পাইয়াছিলাম। কিন্তু হঠাৎ তিনি নিরুদ্দেশ হইয়া যান,—তদবধি তাঁহার আর কোন খবর পাই নাই। তিনি বাঁচিয়া আছেন কি না, তাও জানি না। আহা, বিদায়কালীন পিতার যে স্নেহময় সজল নয়ন দেখিয়াছিলাম, সে নয়ন কি আর এ জীবনে দেখিব না?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাবা সর্ব্বাপেক্ষা আমাকেই অধিক ভালবাসিতেন। এমন কি, আমার পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক দাদা ও বৌ-দিদির সহিত সময় সময় বকাবকি করিতেও ছাড়িতেন না। কালে এমনি হইয়া উঠিল যে, সকলেই বুঝিল, বাবার যা কিছু স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি আছে, তৎসমস্তই তিনি আমাকে দিয়া যাইবেন। ক্রমে আমার বিদুষী বৌ-দিদির বাক্যবিন্যাসে দাদাও ইহা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইলেন। তাহার ফলে বাবার পশ্চিম-গমন এবং এই অভাগার নিশাচর-রব-মুখরিত গভীর রজনীতে বাড়ী হইতে,—স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী জন্মভূমির স্নিগ্ধ কোল হইতে বিতাড়ন-কার্য্য সমাধা হইয়া গেল। একদিন যে বিপুল বিষয়-বৈভবের একমাত্র অধিকারী হইব ভাবিয়া গর্ব্বানুভব করিতাম, আশামরীচিকায় মুগ্ধ হইয়া আকাশ-ভবনে সুখের কাল্পনিক প্রতিমা গড়িয়া হৃদয়ের মধ্যে তমোভাব টানিয়া আনিতাম, তাহা আজ কোথায়? আজ যে আমি পথের ভিখারী!—একমুষ্টি অন্নের কাঙ্গাল!!

ধনমদগর্ব্বিত মূঢ় মানব! কখন দম্ভ করিও না, কখনও অহঙ্কার করিও না। ভগবৎ-কৃপায় ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া কখন ঐশ্বর্য্যের কথা মনে মনে চিন্তাও করিও না। এই নশ্বর জগৎসংসারের সমস্তই ভাবিবে—ভোজবাজী! সমস্তই ভাবিবে—শূন্যাকার!! ভাবিবে, ইহা কেবল কবি—কল্পনা, কেবল সান্নিপাতিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তির প্রলাপ মাত্র!! অথবা ভাবিও, ইহা নিশার দুঃস্বপ্ন!—আকাশ-কুসুমের অলীক কুহক!!

যে ভাই একদিন আমাকে কত ভালবাসিতেন,—কোলে লইয়া মুখচুম্বন করিয়া কত যত্ন, কত স্নেহ-মমতা দেখাইতেন, সেই ভাই,—সেই প্রাণের

সহোদর ভাই, আজ আমার শত্রু? আজ আমার উচ্ছেদকামী? ইহা ভাবিতেও চোখ ফেটে জল, বুক ফেটে রক্ত বাহির হয়! হায়! কেন এমন হইল, কিসে এমন হইল? কোন্ দোষে, কার রোষে; কোন্ পাপে, কার শাপে; কোন্ নিয়তির ফলে আমি প্রাণারাম ভ্রাতৃ-প্রেম হইতে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হইলাম,—ভ্রাতৃ-কোলরূপ মধুর শান্তি-নিকেতন হইতে বিতাড়িত হইলাম; কে বলিয়া দিবে, কেন হইলাম?

অথবা ইহা সংসারের অপরিহার্য্য গতি! স্বার্থময় সংসারের সকলেই স্বার্থের দাস। তবে কেহ বা স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য বিপক্ষের স্বার্থ ধ্বংস করিয়া সন্তুষ্ট হয়, কেহ বা নিজের কোন স্বার্থ না থাকিলেও, পরের স্বার্থ নষ্ট করিয়া আনন্দ লাভ করে। প্রবল স্বার্থের তাড়নাতেই সময় সময় মানুষ পশুরও অধম হইয়া পড়ে,—স্বার্থবশে লোক করিতে পারে না এরূপ গর্হিত কার্য্য এ জগতে নাই। কত সোণার সংসার স্বার্থের জন্যই প্রেতের লীলাভূমি, পিশাচের নাট্যশালায় পরিণত হয়। স্বার্থবশতঃই ভ্রাতৃবিচ্ছেদের অঙ্কুর স্বার্থময় হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। আবার রমণীগণ জল-সেচনাদি দ্বারা এই বিষ অঙ্কুর অল্প দিনেই ফলফুল সমন্বিত প্রকাণ্ড বিষবৃক্ষে পরিণত করিয়া তুলে!—ইহাই সংসারের গতি! ইহাই সংসারের ধারা!!—ধিক্! এমন সংসারে ধিক্!! শত ধিক্!!!

সংসারমায়ামুগ্ধ মূঢ় মানব! জানিও,—সংসারের সকলকেই আপনার করিতে না পারিলে, আত্মার কখনও উন্নতি হয় না, জীবাত্মা কখন মুক্ত হইতে পারে না। মুক্তিই যদি তোমার একান্ত বাঞ্ছনীয় হয়, তবে জগৎকে আপনার চক্ষে দেখিতে শেখ, ভাইকে পর না ভাবিয়া আপনার ভাবিতে আরম্ভ কর। পার্থিব বিষয়-বৈভব যদি ভাইকে দিয়া প্রাণ ধরিতে না পারিবে, তবে কিসে তুমি আত্মার উন্নতির আশা করিতে চাও? জগতে ত্যাগেই সুখ, ভোগে কেহ কখন সুখী হইতে পারে না। ভোগস্পৃহা কখন কাহার মিটে না,—মিটিবে না;—মিটিতে পারে না। ক্ষুদ্র স্বার্থ বা তুচ্ছ অর্থের মোহে ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদ ঘটাইয়া সংসারে—এই বঙ্গের বহুপরিজনপূর্ণ দাম্পত্যপ্রেমময় শান্তি-নিকেতনে আর আগুন জ্বালিও না। জানিও, ভ্রাতৃ-বিরোধ ধর্ম্ম ও শ্রীভগবানের চক্ষে গর্হিত কার্য্য। জগতে যাহা গর্হিত, যাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ; তাহাতেই পাপ এবং পাপেই আত্মার অবনতি হয়।

বাড়ী হইতে বিতাড়িত হইয়া আমি পথে আসিয়া দাঁড়াইলাম! কৃষ্ণা

চতুর্দ্দশী তিথি। চারিদিকে ঘোর অন্ধকার। সেই নিবিড় অন্ধকারময় গভীর নিশীথে নির্জ্জন পথপ্রান্তে একাকী দাঁড়াইয়া আমি নীরবে কাঁদিতে লাগিলাম। সুষুপ্ত জগৎ মুখরিত করিয়া শৃগালের কঠোর কণ্ঠরব আমার হৃদয়ে আশঙ্কার সঞ্চার করিতে লাগিল। গ্রাম্য কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দে আমার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া আমি আকাশ পাতাল অনেক ভাবিলাম। ভাবিলাম, এখন করি কি ? যাই কোথায় ? এ সংসারে যে আমার কেহ নাই ;—সংসারে আমি যে একা !

লোকে আসে একা, যায় একা। কিন্তু এমনি সংসারের সুদৃঢ় বন্ধন, এমনি সংসারের মায়া, এমনি সংসারের প্রবল আকর্ষণ যে, জেনে শুনে তবুও বল্‌ছি, এ সংসারে আমি একা ! সপ্তদশবর্ষ মাত্র এ সংসারে এসেছি—সংসারের কর্ম্ম-কুটীরদ্বারে এসেছি মাত্র, ইহারই মধ্যে সংসারের নিত্য কত আবর্ত্তন, নিত্য নূতন পরিবর্ত্তন, উৎপীড়ন দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি। তাই অবসন্ন-হৃদয়ে ভবিষ্যৎ অদৃষ্টগগনের যে দিকে চাহিতেছি, সেই দিকই অন্ধকারাচ্ছন্ন;—সেই দিকই বিভীষিকাময়। পথ-প্রদর্শক নাই,—পথের সাথী নাই,—পাথেয় নাই, দীন-দরিদ্র আমি, আজ নিতান্ত একা হয়ে এই সংসারসাগরে জীবনতরী ভাসাইতে বাধ্য হইয়াছি। কালের প্রবল পবন-প্রবাহে এখন আমাকে যেখানে লইয়া যাইবে, সেই আমার গম্যস্থল ;—তথায় আমাকে যাইতে হইবে। কিন্তু সে যে কোথায়, তাহা জানি না, ধারণা নাই, ব'লে দেবারও কেহ নাই !—হা ভগবান !—আমি একা ! !

(২)

জ্বর।

ক্রমে রাত্রির অবসান হইল। দূরে—দিক্‌চক্রবালরেখায় ঊষা দেবী দেখা দিলেন। মৃদু বাতাসে শিউলি ফুল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। পাখীর রবে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল। আমিও পথ চলিতে আরম্ভ করিলাম। গন্তব্য স্থানের স্থিরতা না থাকিলেও বরাবর পূর্ব্বাভিমুখে চলিলাম। রাত্রে দাদার ভীষণ "অর্দ্ধচন্দ্র" খাইয়া পড়িয়া গিয়াছিলাম। সর্ব্বশরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল। ঠোঁট কাটিয়া ওষ্ঠ বহিয়া রক্তস্রোত তখনও অল্পে অল্পে বহিতেছিল এবং বৌ-দিদির প্রবল পদাঘাত-প্রপীড়িত উরুদেশে বেদনা করিতেছিল। আমি একমাত্র রুধির-রঞ্জিত-বস্ত্র ও চোখের জল সম্বল করিয়া দেশত্যাগী হইলাম।

বর্ষাকাল; ভাদ্রমাসের শেষ। পল্লী-পথ জলে পূর্ণ। ধানের ক্ষেত ভাসিয়া, কৃষির বাঁধা মাটির বাঁধ ছাপাইয়া গৃহীর গৃহের অঙ্গন-পার্শ্বে জল থৈ-থৈ করিতেছে। আমি মাঠে মাঠে আল্‌পথ দিয়া জলকাদা ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে স্খলিতপদে চলিতে লাগিলাম। শরতের প্রচণ্ড রৌদ্র-তাপে মাথার চাঁদি ফাটিতে লাগিল। পিপাসায় বুক শুকাইয়া আসিল। সর্ব্বাঙ্গ স্বেদসিক্ত হইয়া উঠিল। বৌ-দিদিই যে আমার এই দুঃখের মূল কারণ—তিনিই যে বহুদিন হইতে আমাকে ভিটা ছাড়া করিবার জন্য ছল্ খুঁজিতেছিলেন এবং অবশেষে আমার একটা মিথ্যা দুর্নাম দিয়া তাঁহার গুপ্ত মনোভিলাষ পূর্ণ করিয়া লইলেন, ইহা ভাবিয়া রোষে—ক্ষোভে—দুঃখে আমার সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল। মাথা ঘুরিতে লাগিল। প্রাণের ভিতর একটা অব্যক্ত বেদনা-বহ্নি হু-হু করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

ক্রমে রবি দিগন্তের কোলে ঝুলিয়া পড়িলেন। মাথার উপর দিয়া পাখীর ঝাঁক নীড়াভিমুখে উড়িয়া যাইতে লাগিল। সন্ধ্যার আঁধার পাদপপত্রের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে ধরাপৃষ্ঠে নামিয়া আসিতে লাগিল। আমিও ১২।১৩ ক্রোশ দুর্গম পথ হাঁটিয়া অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। সারাদিনের অনাহারে শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। পদে পদে পদ স্খলিত হইতে লাগিল। দাঁতে দাঁত লাগিতে লাগিল। আমি আর পারিলাম না—সম্মুখের এক গ্রামের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম।

গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র একটা ক্রন্দনের অস্পষ্ট শব্দ শুনিয়া চমকিত হইলাম। ক্রমে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই ভীষণ হৃদয়-বিদারক ক্রন্দনধ্বনি সুস্পষ্টরূপে আমার কর্ণ-বিবরে প্রবেশ করিতে লাগিল। কয়েকটা বিভিন্ন বাড়ী হইতে এই ক্রন্দনধ্বনি উঠিতেছিল। দেখিলাম, পল্লীটী নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। জন-সম্পদে শোভন-শ্রী বলিয়াই বোধ হইল। কিন্তু অনেক বাড়ী জনশূন্য, অনেক ভিটা গৃহশূন্য, অনেক গৃহ-প্রাঙ্গণ ভাঁইট-শেঁকুল গাছে পরিপূর্ণ দেখিয়া বিস্মিত হইলাম।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল। গৃহে গৃহে শঙ্খধ্বনি হইয়া গেল। অন্ধকারে চারিদিক আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। আমি একটী বাড়ীর রুদ্ধদ্বারে আঘাত করিলাম। কিন্তু কেহই কোন উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ তথায় অপেক্ষা করিয়া নিকটবর্ত্তী আর একটী বাড়ীতে পূর্ব্ববৎ আঘাত করিলাম। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেখানেও কোন সাড়াশব্দ পাইলাম না। বড়ই বিরক্তি

বোধ হইল। কিন্তু কি করি, উপায় কি? অন্ধকারে অন্ধকারে একটা সুঁড়িপথ দিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলাম। এবার সম্মুখে একটী প্রকাণ্ড সুধা-ধবলিত অট্টালিকা দেখিয়া আশান্বিত হৃদয়ে বাড়ীর সদর দরজায় আঘাত করিলাম। দরজা খুলিয়া গেল। আমি সদরমহল অতিক্রম করিয়া ভিতর মহলে প্রবেশ করিলাম। কাতরস্বরে বলিলাম;—"আমি বিদেশী। অত্যন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত। রাত্রির মত একটু স্থান চাই।" গৃহাভ্যন্তর হইতে ক্ষীণ কম্পিত-কণ্ঠে উত্তর হইল, "আমাদের বাড়ীশুদ্ধ জ্বর। উঠিবার শক্তি নাই। আপনি অপর যায়গায় দেখুন।"

দ্রুতপদে বাড়ীর বাহিরে আসিলাম। ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় প্রাণ আকুল,—আর চলিতে পারিলাম না। "হা ভগবান্" !—বলিয়া বসিয়া পড়িলাম। ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল। চোখের জলে বুক ভাসিয়া মাটি ভিজিয়া উঠিল। হায়! যখন আমার সুসময় ছিল;—ধনী পিতার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পুত্র ছিলাম, তখন—সেই সুদিনে কত লোকেই আমাদের বাড়ীতে আসিয়া অতিথি হইত—ইত্যাকার কত কথাই একে একে মনে পড়িতে লাগিল। মনে পড়িল, একদিন সন্ধ্যার সময় একটী দ্বাদশবর্ষীয় বালক তাহার বৃদ্ধ অন্ধ পিতার হাত ধরিয়া আমাদের বাড়ীতে আসিয়া আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া-ছিল। আমি তাহাদিগকে নিতান্ত রূঢ়কথা বলিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলাম, আর তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ীর বাহির হইয়া গিয়াছিল।

কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া পড়িলাম। খানিক দূর যাইয়া একটা সামান্য চালা ঘরের ভিতর হইতে প্রদীপের ক্ষীণ আলোক-রশ্মি দেখিতে পাইলাম। জলমগ্ন ব্যক্তি যেমন একখণ্ড তৃণকেই আশ্রয় স্থল ভাবিয়া ধরিতে যায়, আমিও তদ্রূপ আশ্রয় পাইব ভাবিয়া সেই কুঁড়ে ঘরের দিকে চলিলাম। দেখিলাম, একটী বৃদ্ধা একখানি ছিন্ন মলিন কাঁথা গায়ে জড়াইয়া জ্বরে থরথর কাঁপিতে ছেন। তাঁহার পার্শ্বে একটী মাটির প্রদীপ মিটিমিটি জ্বলিতেছে। বৃদ্ধার অবস্থা দেখিয়া প্রাণে বড় কষ্ট হইল। তিনি কিন্তু আমাকে দেখিয়া অতি কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন,—"কে গা?" আমি আমার বৃত্তান্ত বলিলাম। তিনি পূর্ব্ববৎ ক্ষীণ স্বরে বলিলেন, "বস"। আমি কর্দ্দমাপ্লুত দেহে দাওয়ার উপর বসিয়া পড়িলাম। বৃদ্ধা উঠিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না,—পড়িয়া গেলেন। তাঁহার দন্তপাটি ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তিনি অঙ্গুলি-সঙ্কেতে একটা ঘটী দেখাইয়া দিয়া বলিলেন,—"পা ধোও।" আমি ঘটীর

জলে মুখ হাত ধুইয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলাম। ক্ষণপরে বৃদ্ধা ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কাঁপিতে কাঁপিতে একটা মাটির হাড়ি হইতে কিছু মোটা চিঁড়া ও খানিক খেজুরগুড় বাহির করিয়া আনিলেন। তারপর কম্পিতকলেবরে আমার আহারের যোগাড় করিয়া দিলেন। এই দীন-হীনা দারিদ্র্য-প্রপীড়িতা বৃদ্ধার অতিথি-সৎকারের আয়োজন দেখিয়া—সর্ব্বোপরি তাঁহার সদ্ইচ্ছা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। চিড়া-গুড়ই আমার নিকট অতি উপাদেয় খাদ্য বলিয়া বোধ হইল। ভীষণ ম্যালেরিয়া জ্বরের কুক্ষিগত অস্থিসার বৃদ্ধার স্নেহ-যত্নে, আদর-আপ্যায়নে আমার বুকের ভিতর বড় দ্রুত স্পন্দন হইতে লাগিল,—বাষ্পবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল,—নয়নে জলের প্রবাহ ছুটিল।

আ মরি মরি! হিন্দুকুললক্ষ্মি! তোমাদের ন্যায় সতীশিরোমণি দয়াবতীর গুণেই আজ আমরা পবিত্র, দেশ পবিত্র। তোমরাই দয়াধর্ম্মে অদ্যাপিও ধর্ম্মজগতে বাঙ্গালী জাতির নাম রক্ষা করিতেছ। মা! তোমরাই কদাচারী বাঙ্গালীর পাপাধার গৃহে পুণ্যোজ্জ্বল মাণিক! পরের পীড়িত ছেলেকে নিজের ছেলে জ্ঞানে তাহার শুশ্রূষা করিতে, পরের দুঃখকে নিজের দুঃখ বোধ করিয়া কাতরে অশ্রু ফেলিতে, আপন অন্ন পরকে দিয়া নিজে অভুক্ত থাকিতে পৃথিবীর আর কোন জাতিই শিক্ষা করে নাই। এ বিষয়ে তোমরাই আদি ও অন্ত।

দাওয়াতেই রাত্রি কাটিয়া গেল। প্রভাতে উঠিয়া গ্রামটী একবার বেশ করিয়া দেখিয়া লইলাম। দেখিলাম, ভীষণ ম্যালেরিয়ার করাল কবলে গ্রামখানি উচ্ছন্নপ্রায়। জ্বরের তাড়নায়, বাড়ী বাড়ী—ঘরে ঘরে আবাল-বৃদ্ধ নর-নারী ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। কেহ কাহাকেও দেখিবার নাই—কেহ কাহাকেও একবিন্দু জল দিবার নাই। সকলেই জীর্ণ দীর্ণ,—সকলেই ক্ষীণ দুর্ব্বল। সকলেই ম্লান মুখে কুইনাইন সেবন করিতেছে। সকলেরই চক্ষু কোটর-গত, মুখমণ্ডল হরিৎবর্ণ, উদর প্লীহা যকৃতের লীলা-নিকেতন। অনেকেরই অবস্থা শোচনীয়, উঠিবার সামর্থ্য নাই, শয্যায় শুইয়া আপাদ মস্তক লেপ কাঁথায় ঢাকিয়া রোগ-যন্ত্রণায় দিবানিশি অতিবাহিত করিতেছে।

তখন পল্লীভূমির খাল জোল ডোবায় জল জমিয়াছিল। গলিত বংশ-পত্রাদি তাহাতে পড়িয়া পচিতেছিল। শরতের সূর্য্য তীক্ষ্ণ কিরণজালে তাহা নিতান্ত উত্তপ্ত করিয়া বাষ্প সংগ্রহ করিতেছিল। বায়ু সেই দূষিত বাষ্পকে দিকে দিকে বিকীর্ণ করিতেছিল। পাট, পচিয়া একপ্রকার তীব্র বিষ-গন্ধ

উদ্‌গীরণ করিতেছিল। সমীরণ তাহা আপন অঙ্গে মাখিয়া মানুষের নাসারন্ধ্র পথে দেহের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। পল্লী-গৃহস্থের বাড়ীর আশে পাশে যে সকল পশু এবং মানবের মলমূত্র বর্ষার জলে পচিয়াছিল, শরতের প্রচণ্ড রৌদ্রে তাহা হইতে তীব্র গন্ধ উঠিয়া চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইতেছিল। আর স্বল্পজলবিশিষ্ট পানা-পুকুর দুর্গন্ধরাশি বাতাসের গায়ে ঢালিয়া দিতেছিল।

ম্যালেরিয়া একপ্রকার দূষিত বাষ্প ব্যতীত আর কিছুই নহে। ঐ বিষাক্ত বাষ্প পানীয় জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া নিশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত মানবদেহে প্রবেশ করে। এই কালান্তক ম্যালেরিয়া বঙ্গের অনেকানেক নয়নাভিরাম শ্যামল-শস্য-দাম-দল-তৃণাদি সমাচ্ছন্ন গণ্ডগ্রামকে একেবারে শ্মশানে পরিণত করিয়াছে,—শৃগাল শকুনির বাসস্থানে গড়িয়া তুলিয়াছে। তথায় কেবল স্বজন-বিয়োগ-বিধুর মানব-মণ্ডলীর ক্ষীণ কণ্ঠের হা—হা রব ভিন্ন আর কিছুই শুনিতে পাইবে না,—কেবল শ্মশানাগ্নির আকাশভেদী ধূমরাশি ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইবে না!!

এই করুণ ক্রন্দন-মুখরিত গ্রামে আর আমি কোন ক্রমে থাকিতে পারিলাম না। থাকাও শ্রেয় বোধ করিলাম না। পূর্ব্ববৎ দ্রুতপদে চলিতে লাগিলাম। কিন্তু কয়েক ক্রোশ অতিক্রম করিতে না করিতে আমার শরীর কেমন ভাঙ্গিয়া পড়িল। যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই শরীরের অবস্থা শোচনীয় হইতে লাগিল। ক্রমে শৈত্যানুভব, শেষে স্পষ্ট জ্বর বোধ হইল। আর চলিতে পারিলাম না; কোন গ্রামের ভিতর কাহার বাড়ীতে যাইয়া আশ্রয় লইবার শক্তি রহিল না; কাঁপিতে কাঁপিতে পথ-পার্শ্বস্থ এক বট-বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িলাম। অতি দুঃখে নয়নদ্বয় আর্দ্র হইয়া উঠিল। হৃদয়-পটে পূর্ব্বস্মৃতি জাগরুক হইয়া বড় ব্যথা বাজাইয়া দিল। প্রতিদিন সকালেও সন্ধ্যায় গৃহ-চিকিৎসক আসিয়া আমার শরীরের অবস্থা দেখিয়া যাইতেন—সুকোমল দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিতাম—দাস-দাসীরা পদসেবা করিত;—ইত্যাদি কত কথাই একে একে মনে পড়িতে লাগিল।

সংসারে মানুষ না ঠেকিলে শিখে না। বিপদে না পড়িলে ভগবানের নাম লয় না। যখন আমার সুসময় ছিল, তখন একবারও জননী জগদারাধ্যা জগদম্বার নাম এ মুখে উচ্চারণ করিয়াছি কি না, সন্দেহ; আর এখন অতি দুঃখের আবর্ত্তে পড়িয়া কম্পিত কাতর কণ্ঠে ডাকিলাম,—মা! দুর্গে! আর

কেন মা! তোর এ অধম সন্তানকে কোলে স্থান দে; আমার ইহ জীবনের সমস্ত সাধ মিটিয়াছে, এখন—"আর কথা বাহির হইল না। ভীষণ কম্পের বেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। ক্রমে সংজ্ঞা লোপ হইয়া আসিতে লাগিল। আর বসিয়া থাকিতে পারিলাম না;—শুইয়া পড়িলাম। পরিশেষে আমার মুখ হইতে অতি ক্ষীণ জড়িত স্বরে একবার মাত্র উচ্চারিত হইল,—উঃ—বড় —জ্বর—!!

(৩)

চপলাবালা।

জ্ঞান হইলে চক্ষু মেলিয়া দেখিলাম, আমি একটী উত্তম সুসজ্জিত কক্ষে দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া আছি; একটী মোটা লেপে আমার সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত, আর মস্তকের পার্শ্বে একটী অপূর্ব্বলাবণ্যময়ী অনিন্দ্য-সুন্দরী বালিকা মূর্ত্তি বসিয়া একখানি পুস্তক পড়িতেছে। বালিকার বয়স চতুর্দ্দশ বৎসরের কম হইবে না।

তখন প্রভাতের আলো সবে মাত্র কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। উন্মুক্ত গবাক্ষ-পথে নবোদিত রবির রক্তবর্ণ রশ্মি আসিয়া বালিকার মুখের উপর পড়িয়াছিল। প্রভাত-পবনে তাহার সুচারু অলকাবলী কম্পিত হইতে-ছিল, ক্বচিৎ অঞ্চিত অঞ্চল চঞ্চল হইতেছিল। আমি একমনে, স্থির দৃষ্টে সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী—সেই প্রাণ-মনোমোহিনী—সেই ফুল্ল-কুসুমরূপিণী বালিকার দিকে চাহিয়া রহিলাম।

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। বালিকা পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া একবারও আমার দিকে ফিরিয়া চাহিল না। তখন আমি আর চঞ্চল মনাবেগ সহ্য করিতে পারিলাম না। বিস্ময়-বিজড়িত-স্বরে—বলিলাম,—"আমি এখন কোথায়?—আমি একি দেখিতেছি!!—স্বপ্ন?—না সত্য!!"

এবার বালিকার চমক ভাঙ্গিল। সে চকিত দৃষ্টিতে একবার আমার মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ মন্দ-মধুর হাস্য করিল, তাহার সেই ক্ষীণ হাস্যটুকুতে যেন আনন্দস্রোত উথলিয়া উঠিল,—যেন তাহা দিবালোক-দীপ্ত দেওয়ালে দেওয়ালে প্রতিভাত হইল!! তারপর সে ধীরে সুগোল সুগঠিত বাহু যুগল দুলাইয়া প্রকোষ্ঠের বাহিরে চলিয়া গেল।

আমি উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিলাম; কিন্তু মাথা অত্যধিক ভার থাকায় সমর্থ হইলাম না। বিস্ময়-বিহ্বল-নেত্রে দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

অল্পক্ষণ পরেই একটা চটি জুতার চটাচট্ শব্দ শুনিতে পাইলাম। একটী অর্দ্ধবয়স্কা ভদ্রলোক কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। গৃহের এক কোণে একখানি অতি পুরাতন চেয়ার ছিল, তিনি সেই চেয়ারখানিকে আমার কাছে খানিক টানিয়া আনিয়া বসিয়া পড়িলেন। পরক্ষণেই আমার পূর্ব্ববর্ণিত সুন্দরী বালিকাটী আসিয়া দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সঙ্গে সঙ্গে একটী উড়িয়া ভৃত্যও তথায় দর্শন দিল।

ভদ্রলোকটী সুস্পষ্ট অথচ কোমল স্বরে বলিলেন—"আপনি কেমন আছেন"? আমি সে কথার কোন উত্তর না দিয়া করুণ নয়নে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। বলিলাম,—"আমি এখানে কিরূপে আসিলাম?" তিনি বলিলেন,—"কাল যখন আমরা কলিকাতা হইতে এ বাড়ীতে আসি, তখন আপনি স্বরূপ নগরের রাস্তার ধারে এক বট-বৃক্ষ-তলায় অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া ছিলেন। ভদ্রলোকের ছেলে বোধে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি।"

আমি নম্রভাবে বলিলাম,—"আপনিই আমার রক্ষাকর্ত্তা। আপনার যত্নে ও দয়ায় এ যাত্রা রক্ষা পাইবার আশা করিতেছি। কিন্তু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার শক্তি এখন আমার নাই।" ভদ্রলোকটী মৃদু হাসিয়া বলিলেন "না, না, সেজন্য আপনাকে বেশী কিছু বলিতে হইবে না। আপনার শরীরের অবস্থা এখন কেমন, তাই বলুন;—বেশী কথা—"

বাধা দিয়া আমি বলিলাম, "আপনি আমার জীবনদাতা,—আপনি পিতৃতুল্য। আমি চিরদিন কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ"—আর বলিতে পারিলাম না। কৃতজ্ঞতার আবেগে নয়নদ্বয় অশ্রু-ভরাকীর্ণ হইয়া উঠিল। বুকের মধ্যে একপ্রকার দপ্ দপ্ শব্দ হইতে লাগিল।

ভদ্র। কৃতজ্ঞতার কথা যদি বলিতে হয়, তো আমার এই মেয়েটীর কাছে বলিবেন। এই মেয়েটী সারারাত্রি আপনার মাথার কাছে বসে ছিল—ঔষধ দিয়াছে—একটীবারও চোকের পাতা বোঁজে নাই। এই বলিয়া তিনি তাহার কন্যার দিকে স্নেহপূর্ণ কটাক্ষপাত করিলেন। ইহাতে বালিকার মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। বালিকা দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠের নখর দ্বারা কক্ষটীর মেঝে মণ্ডিত পুরাতন গালিচাখানি খুঁটিতে লাগিল।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

গঙ্গা-সৈকতে।

নিবিয়া গিয়াছে দিবসের বাতি
ফুরায়ে এসেছে বেলা,
নিরজন ঘাট নীরব এখন
ভেঙ্গেছে রমণী-মেলা ;
কৃষক গিয়াছে গৃহাবাসে চলি,
ধেনুদল ধায় উড়াইয়া ধূলি,
কুলায় উদ্দেশে চলে পাখীগুলি,
গগনে গাঁথিয়া মালা—
শোভে শিরপরে সুনীল আকাশ
নিয়ে অসীম বেলা।

নীরবে বহিছে পুণ্যা তটিনী
নাহি কল কল ধ্বনি,
থেকে থেকে শুধু শুশুক দেখায়
আপনার দেহখানি,
ওপার হইতে মহিষের দল
সাঁতারিয়া আসে,—ছল্, ছল্, ছল্,
জন-কলরব, ছায়া সুশীতল
বিছায়ে সন্ধ্যা রাণী,
নামে ধীরে ধীরে ধরণীর বক্ষে
এলায়ে মুক্ত বেণী।

ক্রমশঃ শুভ্র— সৈকত পরে
আঁধার ঘেরিয়া আসে,
ধবল-ভবেশ— অঙ্গ-উপরে
শ্যামা যেন এলোকেশে।
নাহি এবে সেই প্রভাতের হাসি,
বিহগকাকলী মনোহর বাঁশী,
প্রকৃতিবদনে দুখ তমোরাশি-
কে দিল মাখায়ে,—ত্রাসে
কম্পিত হৃদি হেরি— প্রকৃতিরে ভীমা
ভৈরবী-বেশে।

প্রভাতে তোমারে হেরিনু প্রকৃতি!
নব-যৌবনা বালা,
তরুণ-অরুণ— সিন্দূর ফোঁটা
কণ্ঠে কুসুমমালা;
গণ্ডযুগলে রক্তিমভাতি,
শুভ্র-বসনা নির্ম্মল জ্যোতি,
নিজ নিশ্বাস— সৌরভে মাতি,
সঙ্গীত-বিহ্বলা—
আবার এখন কি সাজে সাজিলে?
একি অপূর্ব্ব ছলা?

শিখাইতে বুঝি মানব সমাজে
কালের কঠোর রীতি,
প্রভাতে প্রদোষে হেন রূপে দেবি!
সাজ তুমি নিতি নিতি;
সুখ যায় আর দুখ ঘেরে আসে,
এই হাসে নর, এই কেঁদে ভাসে
শ্রাবণের ধারা রবি-কর-পাশে,
দিবসের পাশে রাতি—
কতবার মাতঃ— শিখায়েছ তুমি
হেন অপরূপ নীতি।

বুঝেও বুঝি না, শিখেও শিখি না
শুধু কাঁদি দিবানিশি,
কালের কঠোর পীড়নের মাঝে
বিধাতায় বড় দুষি—
কবে ঘুচে যাবে বিষম ভ্রান্তি,
দূর হবে যত জ্বালা, অশান্তি,
উদিবে পরাণে বিমল শান্তি
দুখ-তমসায় নাশি—
ফুটিয়া উঠিবে হৃদয়-কুঞ্জে
স্বরগ-সুষমা-রাশি।

শ্রীচণ্ডিদাস মজুমদার বি, এ।

———

নূরজাহান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

(২)

গিয়াস্-পত্নী যাহাতে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিতে পারেন, মালক-মসুদ তদভিপ্রায়ে সেই পান্থনিবাসে এক পক্ষকাল অতিবাহিত করিলেন। তৎপর সেই রমণী সুস্থ হইলে তাঁহারা সেই পান্থশালা হইতে যাত্রা করিলেন। পূর্ব্বগগনে যখন উষার আগমনে বালভানুর রক্তিমচ্ছটা বিভাসিত হইত, আর কাননাভ্যন্তরে যখন নানাজাতীয় বিহঙ্গমকুল আনন্দে কাকলী করিত, তখন তাঁহারা গমন আরম্ভ করিতেন, এইভাবে মধ্যাহ্ন কাল পর্য্যন্ত তাঁহারা একক্রমে গমন করিতেন। তৎপর মধ্যাহ্নকাল কোনও তরুতলে যাপন করিয়া চন্দ্র-তারকা-বিভাসিত সন্ধ্যাকালে পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করিতেন; এইভাবে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত গমন করিয়া যখন তাঁহারা শ্রান্ত, ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন, তখন কোন সন্নিহিত পান্থনিবাসে রাত্রি অতিবাহিত করিতেন। এইভাবে অহোরাত্র ভ্রমণের পর তাঁহারা একদিন প্রাতঃকালে লাহোরে আসিয়া উপনীত হইলেন। মোগল-কুল-রবি সম্রাট্ আকবর তখন লাহোরে অবস্থান করিতেছিলেন। গিয়াস্-বেগ লাহোরের রাজবর্ত্মসমূহের দুইপার্শ্বে সুসজ্জিত বিপণীসমূহ ও দুগ্ধ-ফেননিভ পরিধেয়পরিহিত যুবকদিগকে দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। গিয়াসের অপরিসীম কৌতূহল দর্শনে মালক-মসুদ তাঁহাকে বলিলেন, আজ নাগরিকগণ নববর্ষের উৎসবে আত্মহারা, আজ তাহারা প্রাণ খুলিয়া "হোলি" খেলায় মত্ত হইয়াছে। কাল এই সহরে আমাদের পুণ্যশ্লোক সম্রাট্ একটী দরবারের উদ্বোধন করিবেন, আমি কাল আপনাকে তাঁহার নিকট উপস্থিত করিব। এই কথা শুনিয়া গিয়াস্ আনন্দে আত্মবিস্মৃত হইয়া বলিলেন, "আমি আপনাকে আর কি বলিয়া ধন্যবাদ দিব। যদি আমার মস্তকের এক একটী কেশ এক একটী রসনা হইত, তাহা হইলেও আপনার প্রতি সমুচিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে সমর্থ হইতাম না।" এই বলিয়া গিয়াস্ বিস্ময়-বিস্ফারিত কণ্ঠে আপনা আপনি বলিলেন, অহো! এত আড়ম্বর সত্বেও সহরটী কেমন শান্তিময়!।

মালক-মসুদ বলিলেন, এই সহরেই আপাততঃ আপনাকে বাস করিতে

হইবে। মালক-মসুদ ও গিয়াস-বেগে যখন এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, তখন মালকের কয়েকজন বন্ধু মালককে অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন, মালক উষ্ট্র হইতে অবতরণ করিয়া একে একে বন্ধুবর্গকে আলিঙ্গন করিলেন। বন্ধুবর্গ ও আত্মীয়বর্গ-পরিবৃত হইয়া মালক-মসুদ গিয়াস্-বেগকে নিজ বাটীতে লইয়া গেলেন। বাটীতে উপস্থিত হইয়া মালক বিশেষ যত্ন সহকারে গিয়াস্-বেগের আতিথ্য সৎকার করিলেন। পরে তাঁহাকে প্রকোষ্ঠান্তরে লইয়া গিয়া বিনীতভাবে বলিলেন, এই গৃহ আপনার নিজগৃহ মনে করিয়া আপনি এইখানে অবস্থান করুন। কল্য যথাসময়ে আমরা সম্রাট্-সমীপে গমন করিব।

ইত্যবসরে একজন ভৃত্য আসিয়া গিয়াসের হস্তে এক তাড়া চাবি দিয়া বলিল, এই সম্মুখস্থ বাক্স আপনাদের।

গিয়াস্-বেগ প্রথমতঃ চাবি লইতে অস্বীকার করিলেন, কিন্তু যখন তাঁহার পত্নী তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, মালক-মসুদ প্রকোষ্ঠাভ্যন্তরস্থ যাবতীয় বস্তু তাঁহাদিগকে দান করিয়াছেন; তখন গিয়াস্ আর ভৃত্যের হস্ত হইতে চাবি লইতে দ্বিরুক্তি করিলেন না। বলা বাহুল্য, বাক্সের আভরণ উন্মোচন করিয়া গিয়াস্ তন্মধ্যে মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগী যাবতীয় পদার্থ দেখিতে পাইলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে গিয়াস্-বেগ তদীয় বন্ধু মালক-মসুদের সমভিব্যাহারে সুসজ্জিত অশ্ব-সমন্বিত শকটারোহণে সম্রাট্ আকবরের প্রাসাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অদূরে দিল্লীশ্বরের দরবার—ই—আম্। এই দরবার-ই—আমের কিয়দ্দূর থাকিতে তাঁহারা উভয়ে শকট হইতে অবতরণ করিলেন এবং বিবিধ কারু-কার্য্য সমন্বিত শিবির ও প্রকোষ্ঠ অতিক্রম পূর্ব্বক রাজকীয় অভ্যর্থনা-প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। সেখানে ফৈজীর সহিত মালকমসুদের অনেক কথাবার্ত্তা হইল।

এদিকে স্নানের সময় উপস্থিত হইলে সম্রাট্ আকবর স্নান সমাপন পূর্ব্বক নূতন পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করিলেন। তাঁহার বেশ পরিবর্ত্তনের সময় হিন্দু ও মুসলমান এতদুভয়-সম্প্রদায়োচিত সঙ্গীত ও নৃত্য হইল। নির্দ্ধারিত সময়ে মহামতি সম্রাট্ আসিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। অমনি ঘোরগর্জ্জনে কামানধ্বনি তাঁহার সিংহাসনোপবেশন চতুর্দ্দিকে ঘোষণা করিল। এই সময়ে বৃহৎ দ্বার খুলিয়া দেওয়া হইল, অমনি সভাসদ্-

গণ দরবার গৃহে প্রবেশ করিয়া সম্রাট্‌কে যথোচিত বিনয় সহকারে "কুর্ণিশ" করিয়া স্ব স্ব পদোচিত আসনে উপবেশন করিলেন।

সম্রাট্‌ আকবর যে সিংহাসনখানিকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, সেখানি সুবর্ণ ও রজত-বিনির্ম্মিত। সিংহাসনের পাদদেশে চারিটী রৌপ্যনির্ম্মিত সিংহমূর্ত্তি, সিংহাসনের উপরিভাগে হীরক-খচিত সুবর্ণের মশারি, সেই মশারির ঝালর দেখিলে চক্ষু সত্য সত্যই ঝলসিয়া যায়। বহুমূল্য পরিচ্ছদে আজ ভারতেশ্বরের অঙ্গ সুশোভিত হইয়াছে। তাঁহার পরিচ্ছদের উপমা একমাত্র সেই পরিচ্ছদ, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা দ্রষ্টব্য সম্রাট্‌ আকবরের সৌম্যমূর্ত্তি। তাঁহার উন্নত বক্ষঃস্থল দর্শনে তাঁহাকে একজন অমিত তেজঃশালী বীর বলিয়া মনে হয়। তাঁহার সিংহগ্রীবা যে কেহ দর্শন করিতেছে, তাহারই মনে কালিদাসের এই শ্লোকটী উদিত হইতেছে,—

"ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশু র্মহাভুজঃ।
আত্মকর্ম্মক্ষমো দেহঃ ক্ষাত্রোধর্ম্ম ইবাশ্রিতঃ"॥

সম্রাটের বামভাগে যুবরাজ সেলিম উপবিষ্ট। তাঁহার বয়স এখন তিন-বৎসর মাত্র। সেলিমের কৃষ্ণকুন্তলদাম ও কৃষ্ণাক্ষি বস্তুতঃই দর্শনযোগ্য।

দক্ষিণভাগে রাজনীতিবিদ্‌ আবুল ফজল দণ্ডায়মান। আবুলের সন্নিকটে তাঁহার ভ্রাতা সঙ্গীতাচার্য্য ফৈজী; ইহাদের বামদিকে সভাসদ্‌গণ দণ্ডায়মান, তাহারা সুশীল সুবোধ বালকের ন্যায় সম্রাটের প্রতি-বাক্যে সম্মতি জ্ঞাপনার্থ পুনঃপুনঃ মস্তক নত করিতেছে। সেলিমের দক্ষিণভাগে গর্ব্বিত রাজপুত রাজন্যবর্গ। তাঁহারা ক্ষণে ক্ষণে একহস্তে গুম্ফ স্পর্শ করিতেছেন, আবার কখনও বা অপর হস্তে তীক্ষ্ণধার তরবারি স্পর্শ করিতেছেন। সিংহাসনের পশ্চাদ্দিকে পাখাবাহক ও নাবিকের দল। তাহারা প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত লোকের নাম ধরিয়া ডাকিবামাত্র তাঁহারা আসিয়া কুর্ণিশ করিতেছেন। রাজ্যস্থ সমগ্র সম্ভ্রান্ত লোকদিগের কুর্ণিশ সমাপ্ত হইলে মালক-মস্যুদ ও গিয়াস্‌-বেগ সম্রাটের সিংহাসনাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। নকিব তাঁহাদের নাম ডাকিবামাত্র তাঁহারা সিংহাসনের সম্মুখে আসিয়া নতজানু হইয়া বসিলেন এবং দক্ষিণহস্ত-তালুর দ্বারা ললাট দেশ স্পর্শ করিয়া সম্রাট্‌কে তিনবার সেলাম করিলেন।

মালক-মস্যুদ বহুমূল্য রত্ন ও সুবাসিত কুসুম-পরিপূর্ণ একটী আধার

লইয়া তাহা প্রথমে সিংহাসনের চতুঃপার্শ্বে দোলাইয়া তৎপর সম্রাটের চরণোপরি অন্যান্য রত্নাদির উপর স্থাপন করিলেন।

আকবর তাহাদিগকে ভূপৃষ্ঠ হইতে উঠিতে আদেশ দিয়া বলিলেন, আমি তোমাকে দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। সে যাহা হউক, তোমার সহিত এই ভদ্রলোকটী কে? মালক উত্তর করিলেন, জাহাপানা! ভগবান্ যেন আপনাকে দীর্ঘকাল জীবিত রাখেন। আপনার গোলাম একজন পারস্যবাসীকে আপনার সম্মুখে আনিতে দুঃসাহস করিয়াছে। এই ব্যক্তি আপনার চরণ দর্শনে বড় ইচ্ছুক। ইহার নাম গিয়াস-বেগ, ইনি পারস্যের স্বর্গীয় প্রধান মন্ত্রী মির্জ্জা মহাম্মদ সেলিয়োর পুত্র। আপনার স্বর্গীয় পিতা হুমায়ুন যখন পারস্য ভ্রমণ করেন, তখন তিনি এই ব্যক্তির পিতার শুশ্রূষায় যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ভারতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি একখানি পত্রদ্বারা এই ব্যক্তির পিতাকে জানাইয়াছিলেন যে, মহম্মদ যখনই সম্রাটের নিকট কোন উপকার প্রত্যাশা করিবেন, সম্রাট্ সানন্দে তন্মুহূর্ত্তেই তাহার আশা পূরণ করিবেন।

মালক-মসুদের নিবেদন শেষ হইলে, গিয়াস্-বেগ পুনরায় নতজানু হইয়া বসিলেন এবং ললাটে মৃত্তিকা স্পর্শ করিলেন। তৎপর দণ্ডায়মান হইয়া আবুলফজলের নিকট হুমায়ুন-লিখিত পত্রখানি দিলেন। তিনি আবার সেই পত্রখানি পাঠ করিয়া সম্রাট্‌কে শুনাইলেন।

আবুল ফজলের নিকট হইতে পত্রখানি লইয়া আকবর তাহা চুম্বন করিলেন. সিংহাসনের উপর পত্রখানি স্থাপন করিলেন এবং তারপর গিয়াস্-বেগের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"আপনাকে আমি সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি। যিনি দুরবস্থার সময় আমার পিতাকে রক্ষা ও যত্ন করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র আমার পরম বন্ধু।" এই বলিয়া সম্রাট্ আবুল ফজলের প্রতি ইঙ্গিত করিলেন, ইঙ্গিতমাত্রে আবুল ফজল একজন ভৃত্যকে বহুমূল্য পরিচ্ছদ আনিতে আদেশ করিলেন। অমনি পরিচ্ছদ আনীত হইল। আবুল সেই পরিচ্ছদ গিয়াস্‌কে দিয়া বলিলেন, আজ হইতে আপনি সম্রাটের ব্যক্তিগত কর্ম্মচারী-শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

গিয়াস্-বেগ পুনর্ব্বার নতজানু হইয়া বসিয়া "সম্রাটের এই অপরিসীম অনুগ্রহের জন্য আমি যে কিরূপে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিব, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।" এই বলিয়া তিনি পশ্চাদ্দিক না ফিরিয়া আপন আসনে

গিয়া উপবেশন করিলেন। সমবেত সমস্ত রাজন্যবর্গের সম্মাননা প্রদর্শন সমাপ্ত হইলে সম্রাট্ গাত্রোত্থান করিলেন। রাজপুত-রাজন্যবর্গ ব্যতীত অন্য সকলেই ভূমিস্পর্শ করিয়া সম্রাট্‌কে সেলাম করিলেন। সম্রাট্ তাঁহাদিগকে লইয়া নক্ষত্র-বেষ্টিত শারদীয় পৌর্ণমাসী-সুধাংশুর ন্যায় অন্য শিবিরে চলিয়া গেলেন।

সম্রাটের সিংহাসনের সম্মুখে যে সমস্ত রজত কাঞ্চনাদি বহুমূল্য পদার্থ ছিল, তাহা সম্মিলিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ছড়াইয়া দেওয়া হইল, তাহারা সকলে তল্লাভাশায় ছুটাছুটি করিতে লাগিল। সম্রাট্ স্বয়ং স্বহস্তে সুবর্ণ-নির্ম্মিত সুপারি ছড়াইতে লাগিলেন, অতি গম্ভীর প্রকৃতির সভাসদ্‌গণও তাহা লাভ করিবার জন্য দৌড়াদৌড়ি ও বালক-সুলভ ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন।

সম্রাট্ তদনন্তর আবুলফজলের বাহুতে ভর দিয়া প্রকাশ্য দরবার-গৃহে গমন করিলেন। এখানে তিনি সুবর্ণ-নির্ম্মিত চন্দ্রাতপ-নিম্নে সুগন্ধি চন্দন-কাষ্ঠ নির্ম্মিত সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। এখন সম্রাট্ সকলেরই দৃষ্টিপথে পড়িলেন। সম্রাট্‌কে দেখিবামাত্র চতুর্দ্দিক হইতে অমনি "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" এই ধ্বনি উত্থিত হইয়া আনন্দ কোলাহলে সে স্থানটী মুখরিত করিল। সম্রাট্ স্বয়ং তাহাদিগকে সেলাম করিলেন। তখন পঞ্চাশ সহস্র সুসজ্জিত গজ, দ্বাদশ সহস্র বলিষ্ঠকায় অশ্ব, গণ্ডার, সিংহ, ব্যাঘ্র, শিকারী কুকুর প্রভৃতি পশুগণ একের পশ্চাতে অন্যটী সারিবদ্ধ ভাবে গমন করিল। সে শোভাযাত্রা বস্তুতঃই অবর্ণনীয়। অপরাহ্নে শোভাযাত্রার অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইলে, সমাগত সম্ভ্রান্তলোক ও অতিথি অভ্যাগতবর্গকে সরবৎ, ফল ও অন্যান্য সুমিষ্ট দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে প্রদান করিয়া সম্রাট্ রাজভবনে প্রত্যাগমন করিলেন।

পাঠক, চলুন একবার ইত্যবসরে আমাদের গিয়াস্-বেগের সন্ধান করি। সম্রাট্ আকবরের এইরূপ অত্যুদার কৃতজ্ঞতা, অনন্য-সাধারণ পিতৃভক্তি ও অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রকৃতিপুঞ্জের প্রতি অনুরাগ দর্শনে গিয়াস্-বেগ যুগপৎ বিস্মিত, স্তম্ভিত ও কৌতূহলাক্রান্ত। তিনি মালক-মসুদের নিকট যাইয়া একবার তৎপ্রতি নিজের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইবার চেষ্টা করিতেছেন, আবার হৃদয়ের ভাব মুখে ব্যক্ত করিতে না পারিয়া, তৎপার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিতেছেন। গিয়াসের সহিত মালক-মসুদের যখন এইরূপ নীরব ভাষায় উভয়ের হৃদয়-নিহিত কৃতজ্ঞতার বিনিময় হইতেছিল, তখন রাজা, বীরবল ও ফৈজী সেখানে

উপস্থিত হইলেন। মালক-মস্থুদ তাঁহাদের সহিত গিয়াসের পরিচয় করাইয়া দিলেন।

ফৈজী, বীরবল, গিয়াস্-বেগ ও মালক-মস্থুদ এই চারিজনে বসিয়া যেন পরস্পর পরস্পরের চিরপরিচিত বন্ধু,—এই ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, অকস্মাৎ সম্রাট্ আসিয়া সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। প্রকোষ্ঠটী বিবিধ সুগন্ধি দ্রব্যে পরিপূর্ণ—বোধ হয়, যেন কেহ ইহার প্রতি বালুকণায় গোলাপ-নির্য্যাস সংমিশ্রিত করিয়াছে। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যে সম্রাটের সহিত তাঁহারা ভয়ে ভয়ে কচিৎ কথা বলিতে সাহস করিয়াছিলেন, এখন এই প্রকোষ্ঠ মধ্যে কি আশ্চর্য্য! সেই সম্রাট্ তাঁহাদের সহিত একজন সমপদস্থ বন্ধুর ন্যায় কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন।

অনিন্দ্যসুন্দরী একদল বালিকা নর্ত্তন করিয়া সুস্বরে সুমধুর সঙ্গীত করিতে লাগিল। সেই প্রকোষ্ঠ মধ্যে—মর্ত্ত্যভূমির অমরাবতীতে, অতিথি চতুষ্টয় কতক্ষণ ছিলেন, তাহা তাঁহাদের আদৌ জ্ঞান ছিল না। অবশেষে যখন প্রভাতাগমনের ঘোষণাসূচক বাদ্য বাজিয়া উঠিল, তখন সকলের চৈতন্য হইল যে রাত্রি প্রভাতা হইয়াছে। তখন সম্রাট্ আকবর অন্তঃপুরে গমন করিলেন এবং আমাদের বন্ধুচতুষ্টয়ও আপন আপন গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

যুবা ও বৃদ্ধ।

"বৃদ্ধ তব ধনু এ'টা নিছ কত দিয়ে"?
জিজ্ঞাসিলা বিদ্রূপাক্ষী ভ্রমান্ধ যুবক;
উত্তরিলা ধীরকণ্ঠে মস্তক তুলিয়ে
লোলচর্ম্ম, বয়ঃকুব্জ যষ্টির বাহক,—
"এই ধনু মূল্য দিয়া হয় না কিনিতে
কালভেদে সবাকার হইবে অধীন;
রাজা রাজ্যেশ্বর কভু পারে না বাঁচিতে;
লইতে হইবে সবে—যুবা কি নবীন।
যুবা তুমি স্ফীতবক্ষে করিছ প্রয়াণ
সময়ে তুমিও—ইহা কর্‌বে পরিধান—"

আলি আহ্‌ম্মদ।

বিবাহ-সমস্যা—বিচার

গত বৈশাখ সংখ্যার ভারতীতে বিবাহ-সমস্যা-শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রায় লিখিয়াছেন যে, সীমাবদ্ধ বয়সে বিবাহ দিতে হইলে কন্যা-পক্ষীয়েরা অর্থাৎ কন্যার পিতা বা তিনি অবর্ত্তমানে যাঁহারা তাহার বিবাহ দিতে ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ বাধ্য বা দায়ী, তাঁহারা বিশেষরূপে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া থাকেন; সেইজন্য সীমাবদ্ধ বয়স ব্যতীত পিতার অর্থ-সংস্থানের সহিত কন্যার বিবাহ নিহিত থাকা উচিত। অষ্টমবর্ষে গৌরীদান অকল্যাণকর, সুতরাং তাহা পরিত্যাগ করা বিশেষরূপে কর্ত্তব্য। সহরে সমাজ-বন্ধন না থাকা বিধায় তথায় বক্তৃতা বর্ষণ বৃথা; কেন না, তাহা বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে পৌঁছায় কি না সন্দেহ। পুত্র যেমন তাহার পৈতৃক সম্পত্তির মালিক; বিবাহকালীন কন্যাকে যদি পৈতৃক সম্পত্তির মালিক করা যায়, তবে কন্যারও বিবাহের সময় পিতাকে কিছুই ভাবিতে হইবে না। কেন না, আজকাল অধিকাংশ কন্যার পিতার আয় মাসিক পনর কি বিশ টাকা হইতে ত্রিশ টাকা পর্য্যন্ত, তাহাতে কন্যার বিবাহের পণ-কার্য্য সম্পাদিত হওয়া দুরূহ।

যে পুত্রগণ উপার্জ্জনে সমর্থ নহে, তাহাদের বিবাহ করা কেবল মাত্র ভিখারীর দল বর্দ্ধিত করা ব্যতীত আর কিছুই নহে। স্বেচ্ছা-বিবাহ য়ুরোপের আদর্শ। এক্ষণে আমাদের দেশে স্বেচ্ছা-বিবাহের (Courtship) প্রচলন করা এবং তৎসঙ্গে পৈতৃক সম্পত্তির অংশ শ্বশুরালয়ে আনয়ন না করিলে শ্বশুর শ্বাশুড়ীর ভালবাসা, স্বামীর প্রীতি হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। আরও লিখি-য়াছেন যে, যদি পুষ্করিণীর এক পাড় ধসিয়া অন্য পাড় পরিপূরিত হইত, কথা ছিল না, কাঁচা পয়সা পাইয়া দু এক দিন ক্ষুদ্র নবাবীর পর সমস্ত নিঃশেষান্তে পুনর্মূষিক রূপ ধারণ করে; তাহাতে ফল কি?

সহরে সমাজ-বন্ধন নাই, এ বাক্য মহাবাক্য; তবে সহরের লোকদ্বারা যে এ কার্য্যটী সম্পদিত হইতে পারে না, সেটী ভুল ধারণা। সহরের লোকের দ্বারা এইরূপ মহৎ কার্য্য সাধিত হইবার অত্যন্ত সম্ভাবনা। পল্লীগ্রামের যত নিষ্কর্ম্মার দল পরচ্ছিদ্রান্বেষী পরকুৎসা-পরায়ণ ও পরের সর্ব্বনাশ সাধনে বিশেষ মনোযোগী। বরং পল্লীবাসীদিগের নিকট কোন প্রত্যাশা দুরাশা মাত্র। আমার বিবেচনায় সহরবাসীদিগের অনুকরণে অধিকাংশ গ্রাম এবং পল্লীগ্রাম-

বাসিগণ অনেক সময় চলিয়া থাকেন। সহরে ব্রাহ্মণমণ্ডলী ও মনীষিগণের মুখ-নিঃসৃত, প্রাক্তন মুনিঋষিগণের প্রাচ্য পুরাণ সকল হইতে উদ্ধৃত শ্লোকের প্রমাণসকল মধ্যে মধ্যে এইরূপ তাহাদের মনোবীণার তন্ত্রীতে ঝঙ্কারিত হইলে, বঙ্গদেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতাগণ কালে এই প্রথার প্রচলন করিতে যত্নবান হইতে চেষ্টিত হইবেন, নিঃসন্দেহ।

আমাদের বঙ্গদেশে বসন্তের আগমন আমরা অনুভব করিতে পারি না, তবে শীত ঋতুর পর যখন কানন নবরূপ ধারণ করতঃ নবনব পত্রপুষ্পে সুশোভিত হয় এবং কোকিলের প্রাণোন্মাদকর কুহুরবে কাননের একপ্রান্ত হইতে প্রান্তান্তর পর্য্যন্ত নর্দ্দিত হইতে থাকে, তখন যেমন আমরা বসন্তের আগমন উপলব্ধি করিয়া থাকি, সেইরূপ যদি পুনঃপুনঃ এরূপ বক্তৃতা না দেওয়া হয়, কাষ্ঠাঙ্গারের ন্যায় ছাই পড়িয়া তাহা নির্ব্বাণোন্মুখ হইবেই হইবে। এমন কি,কালে তাহার অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া শুদ্ধ যে ভস্মে পরিণত হইবে,তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিবাহের বয়স নির্দ্ধারণের বিশেষ উপকারিতা এই, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের বালক-বালিকাগণ দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করিলেই তাহাদের হৃদয়ে একটী নব যুগ আবির্ভূত হইয়া, হৃদয়ের পবিত্র সরলতাটুকু বিদূরিত করিয়া দেয়। সে যেন সেই সময় মহাভীত, যেন কোন অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত বলিয়া পিতা মাতার দ্বারা বিশেষরূপে লাঞ্ছিত হইবার ভয়ে সর্ব্বদাই শঙ্কিত। সেই সময় তাহারা কতিপয় কুৎসিত প্রক্রিয়া দ্বারা আপনাপন স্বাস্থ্য চিরদিনের জন্য নষ্ট করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়, এমন কি নষ্ট করিয়া ফেলে।

অস্মদ্দেশীয় অষ্টমবর্ষে যে গৌরীদানের প্রথা প্রচলিত, তাহা অকল্যাণকর হইলেও, কোন কন্যার পিতা কি কখনও সেই দানে বিরত হইয়াছেন? গৌরীদান আমাদের বিজ্ঞ পূর্ব্বপুরুষগণের অনুমোদিত এবং তাঁহাদিগের দ্বারা পরিচালিত, ইহা স্থির নিশ্চিত। এক্ষণে বোঝা উচিত, ১২।১৩ বৎসর বয়সেও যদি কন্যার বিবাহ না হয়, পুত্রের বিষয়ে ততটা ভয়ের কারণ না হইলেও, কন্যাগণ যে যৌবন-সুলভ চপলতায় উচ্ছৃঙ্খল হইয়া কুলের বাহির হইয়া পড়িবে না, বা লুক্কায়িত ভাবে কুৎসিত আচারে প্রবৃত্ত হইবে না, কে বলিতে পারে? স্ত্রী অর্দ্ধাঙ্গিনী, ধর্ম্ম-কর্ম্মে স্বামীর সহিত তাহার পূর্ণ অধিকার ; সেই পত্নীর সহিত ধর্ম্ম-কর্ম্মে সমস্ত পণ্ড হইবার সম্ভাবনা নয় কি? স্বামীর কামোদ্দীপন চরিতার্থের জন্যই ত স্ত্রী নয়, স্ত্রী সন্তানোৎপাদনানন্তর স্বামীর বংশ রক্ষার জন্য।

বাল্যবিবাহ বন্ধ করিয়া পূর্ণ যৌবনসম্পন্না দ্বিচারিণীর পাণিগ্রহণ করিলে, তাহারা তাহাদের প্রথম প্রণয়ীর প্রতিচ্ছায়া হৃদয় হইতে অপসারিত করিতে না পারিয়া, হয় ত আত্মহত্যা সাধনে প্রবৃত্ত হইবে, নয় ত কুলের বাহির হইয়া যাইবে। "জংলা কখন পোষ না মানে।" সেই কুলটার সহিত আমাদের কি অধর্ম্মরূপ ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিতে হইবে? হিন্দুধর্ম্ম এক্ষণে বিংশতি শতাব্দীর বাবুদিগের নিকট এইরূপ ক্রীড়ার সামগ্রীই হইয়াছে বটে। কাল-ক্রমে সনাতন আর্য্যধর্ম্মের সমস্তই নষ্ট হইতে বসিয়াছে, ঘরে ঘরে এইরূপ কুলটা কুলললনা ও পুরস্ত্রীগণ বিরাজিত হইলেই ধর্ম্মের যেটুকু গৌরব ছিল, তাহাও যে লোপ পাইবে। তবে এ কথা ঠিক, যাহার পত্নী কুলটা, তাহার পত্নীকে আর কেহ কোনরূপ কথা বলিতে পারিবে না, তাহাকে গ্লানি সহ্য করিতে হইবে না; কেন না, সকলেই সমান। সম ব্যব-সায়ীদিগের মধ্যে কোনরূপ মনোমালিন্য ভাবের উদয়, বা কোনরূপ কাণা-ঘুসা হইতে পারে না। সেই সঙ্গে সেই ভ্রষ্টার নিরীহ স্বামীও কুলটা সহ-বাসের গঞ্জনা লাঞ্ছনা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন।

তৎপরে যদি চৌদ্দর স্থলে ষোল বৎসরে পদার্পণ করিবার পর, পিতার ধনালঙ্কারাদি সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে, কন্যা কুলের মুখে মসী নিক্ষেপ করতঃ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শনানন্তর প্রয়াণ করেন; তবে পিতার পক্ষে মহালাভ, তাঁহার কিছু সঞ্চয় হইয়া গেল। তাহার পর আবার পরকালের আর পাথেয়ের চিন্তাটী পর্য্যন্ত নাই! আর্য্যজাতি ব্যতীত আর কোন্ জাতির বিবাহ-বয়স নির্দ্ধারিত আছে? যাহাদের তাহা নাই, একটু বিশেষরূপ লক্ষ্য করিলে বেশ বোধগম্য হয় যে, তাহাদেরই গোড়ায় গলদ। তবে কদাচিৎ দৃষ্ট হয় যে, বল্লালী কৌলীন্য প্রথার খাতিরে এবং অর্থাভাব বশতঃ কোন কোন হিন্দুললনার ২০।২৫ বৎসর পর্য্যন্ত বিবাহ হয় নাই। ইহা কতদূর অন্যায়! এমন কি, কেহ বা চির-কুমারী-ব্রত গ্রহণে জীবনাতিপাত করিতেছে; তাহারা কি তাদের স্বভাব ঠিক রাখিতে সমর্থ হইয়াছে না পারে? তবে সমস্ত একরূপ নহে। তাহা হইলে পৃথিবী এত দিন রসাতলে যাইত এবং পুনরায় নব যুগের উৎপত্তি হইত। শতকরা ক'টী সেরূপ নয়ন-গোচর হয়? সামান্য ২।১ টী লইয়া ত সংসার নহে, বরং দু একটী বাদ দেওয়া যাইতে পারে।

পুত্র ব্যতীত কন্যা পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী নহে এবং হইতেও পারে না। পুত্র না থাকিলে যত দিন পর্য্যন্ত কন্যা পরিণতবয়স্কা না হয় বা তাহার বিবাহ

কার্য্য সাধন না হয়, ততদিন সে কন্যার পৈতৃক বিষয়ে কোন অধিকার হয় না। তবে বিবাহকালীন পিতা মাতা স্ব-ইচ্ছায় এবং সাধ্যমত যে যৌতুক দান করেন, মাত্র সেইটুকুতে কন্যার অধিকার; পরে স্বামী যাহা কিছু দেন, তাহাই তাহার স্ত্রী-ধন। আমাদের সনাতন ধর্ম্মে চিরকাল এই নিয়ম প্রচলিত রহিয়াছে। কিছু পূর্ব্বে কন্যা অর্থাৎ পাত্রী-বিক্রয়ের প্রথা প্রচলিত ছিল, এক্ষণে পুত্রের পিতাগণ পুত্র-বিক্রয়ে প্রবৃত্ত—অমুক চাই—ওটা না হইলে একদম চলিবে না, খাট না দিলে আপনার কন্যারই শয়নের কষ্ট হইবে ইত্যাদি; যাহাতে সেটী না হয় এবং যাহাতে গাভী-দোহনরূপ কন্যার পিতাকে মন্থন করা না হয়, সেই বিষয় সকলেরই সচেষ্ট হওয়া উচিত। লেখক যখন কোন মুনিঋষিগণের কোনরূপ শাস্ত্রপ্রমাণ গ্রাহ্য করেন নাই, তখন আমিও তাহার প্রমাণসমূহ এই স্থানে সন্নিবেশিত করিলাম না, তবে আমার ইচ্ছা, তিনি একবার মনুসংহিতা ও হরিবংশ পাঠ করিলেই সম্যক্ অবগত হইবেন।

কন্যার পিতা যদি পুত্রকে ক্রয় করিয়া কন্যার বিবাহ দেন, তবে "আপন পাঠা লেজের দিকে কাটিতে পারেন," অর্থাৎ জামাতা ক্রীতদাস ব্যতীত আর কিছুই নহে, তিনি ক্রীত জামাতার দ্বারা সাংসারিক কার্য্য, কৃষিকার্য্য প্রভৃতি করাইয়া লইতেও পারেন? না লইবেনই বা কেন,—এই প্রসঙ্গে একটী কথা মনে পড়িল ঃ—কাশ্মীরে পাহাড়ী নামক এক প্রকার জাতি আছে, তাহাদের পিতা বা পিতৃব্যগণ কন্যার বিবাহ দেয় না, বরং পর্ব্বতে উপল খণ্ডের উপর বসাইয়া এক এক খানি বস্ত্রের দ্বারা পদদ্বয় ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া রাখিয়া দেয়। পরে খরিদ্দার আসিলে যাহার যাহাকে পছন্দ, মাত্র পদদ্বয় দেখিয়া, পছন্দ করিয়া লয় এবং দর চুক্তির পর নির্দ্ধারিত মূল্য দিয়া ক্রীতদাসীর হাত ধরিয়া তুলিয়া লয়। তাহার ভাগ্যে যাহাই উঠুক, কেহ বা পূর্ণ যুবতী ষোড়শী লাভ করে, আবার কাহারও ভাগ্যে অশীতিপরা বৃদ্ধা। যাহা হউক, ক্রেতা তাহাকে গ্রহণ করিতে বাধ্য। আর যদি বৃদ্ধা বলিয়া পরিত্যাগ করে, তবে বিক্রেতার দুনো লাভ। সে পর হাটে পুনরায় ঐরূপে তাহাকে বিক্রয় করিবে। কিন্তু ক্রেতারা তাহাদিগকে লইয়া আইসে এবং গৃহকার্য্যে নিযুক্ত করে। এমন কি, কোন কোন যুবতী আপনাপন রূপ-সৌন্দর্য্যের প্রভাবে প্রভুপত্নীও হইয়া যায়। সে ক্রীতদাসী, তাই তার এত কদর।

টাকা লইয়া বিবাহ করিলে সকলে তাহাকে ভালবাসিবে, আর যে গরীবের কন্যা, যাহার পিতার জামাতা-ক্রয়ের সংস্থান নাই, তিনি কি কন্যা দান করিতে পারিবেন না? তাঁহার কন্যা কি পাঁড় শশার ন্যায় পাঁড় কন্যা থাকিয়া যাইবেন? না টাকা বিনা যদি কেহ তাহাকে বিবাহ করে, সে তাহাকে ভালবাসিবে না বা লইয়া ঘর করিবে না! তাহা কি হইতে পারে? বাটীর পাঁচ জনের আদর যত্ন না পাইলেও স্ত্রীলোকের কিছুই আসে যায় না, তবে স্বামী তাহাকে ভালবাসিবেই বাসিবে। বিবাহ, যাহা ঢাক ঢোল বাজাইয়া রোসনাই করিয়া পাঁচজন বরযাত্র সঙ্গে লইয়া, মালা বদল বরণ ইত্যাদি ও মন্ত্র পাঠদ্বারা সাধিত হয়, তাহা ত লৌকিক। যেটী প্রজা-পতির নির্ব্বন্ধ, বশিষ্ঠ প্রজাপতির প্রজা-সৃষ্টির পন্থা, সেটী ত পূর্ব্ব হইতে সম্পা-দিত হইয়াছে, তাহা আর নূতন করিয়া কি হইবে? যদি পূর্ব্ব হইতেই বিবাহের বন্ধন না থাকিবে, তবে কি বিবাহের রাত্রে শুভদৃষ্টির সময় একবার চারি চক্ষের সম্মিলনে কি যে তড়িৎ হৃদয়ের শিরায় সঞ্চালিত হইয়া যায়, এবং তাহার আকর্ষণিক ক্ষমতার প্রভাবে হৃদয়কে কিরূপ উদ্বেলিত করিয়া দেয়, তাহাকে ভালবাসিবার জন্য হৃদয় সাতিশয় ব্যস্ত হইয়া উঠে; যেন সে জোর করিয়া হৃদয়ের কোন নিভৃত প্রদেশের লুক্কায়িত ভালবাসাটুকু খুঁজিয়া বাহির করিয়া লয়; জানি না, সে এক দিনের সহবাসে কেমন করিয়া জানিতে পারে, অমুক স্থানে তাহা আছে এবং সেটী তাহারই ন্যায্য প্রাপ্য। সেটী কি এক দিনের? পূর্ব্ব হইতে তাহার সহিত সম্বন্ধ না থাকিলে কি একেবারে এতটা হইতে পারে? স্ত্রী চিরদিনই বড় আদরের। পাঠক আমার প্রগল্‌ভতা মাপ করিবেন। পিতা-মাতাপেক্ষাও যেন সে অধিক পরিমাণে প্রীতি পাইবার পাত্রী। তবে তাহাকে লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করিতে হইবে কেন বা পৈতৃক ধনের অংশভাগী না হইলে ভালবাসা পাইবার জন্য লালায়িত হইতে হইবে কেন? তবে বলিতে পারি না, আধুনিক স্বামীরা কি স্ত্রীকে ভাল বাসিতে ইচ্ছা করেন না, স্ত্রীর সহিত সম্পর্ক রাখিতে মাত্র তাহার পিতৃদত্ত ধনের সেবায় জীবনাতিপাত করিতে বদ্ধপরিকর?

বঙ্গদেশের অবস্থা যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা একান্ত সত্য। এক্ষণে কন্যা সম্প্রদানের সময় যাহার আপন একখানি মাত্র বাড়ী সম্বল, সেই নিজ বাটী হইতে অংশ দান করিতে হইলে বাড়ী খানি বিক্রয় ব্যতীত যাঁহার অন্য উপায় নাই, বা যাঁহার বাড়ী নাই, মাসিক ১৫৲ টাকা বেতন, দু এক খানি

খোলার ঘর ভাড়া করিয়া জীবন যাপন করিতেছেন; এই উভয় সম্প্রদায়ের অবস্থা কিরূপ হইবে? যাহার বাটী নাই, তাহার ত দুর্দ্দশা আছেই; কিন্তু যাহার বাটী আছে, কন্যা সম্প্রদানের জন্য বিক্রয় করিয়া কন্যা পাত্রস্থ করিয়া কাঁচা টাকায় কিছু দিন রাজ-ভোগের পর স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি স্বজনগণের হস্ত ধারণ করিয়া ব্যোম-আচ্ছাদিত-বৃক্ষতলবাসী হইতে হইবে। সামান্য পনর টাকায় যাহা হউক, একবেলা অর্দ্ধাহার করিয়াও মান বাঁচাইয়া আপনার বাড়ী খানিতে মাথা গুঁজিয়া বাস করিতেছিল, এক্ষণে কন্যা দায়গ্রস্ত হইয়া তাহাও গেল, তখন তাহার বৃক্ষতল সার, আর কন্যা-জামাতার মান-বৃদ্ধি! বা বা বেশ কন্যাদান!!! ইহা কি প্রলাপ নয়? তবে ত কন্যা জন্মগ্রহণ করিবার পরক্ষণেই, সেই আঁতুড় ঘরে বৃক্ষতলা-শ্রয়ের ভয়ে, কন্যার বাপ মা নুণ দিয়া তাহাকে ধরা হইতে বিদায় দিবে। তাহা হইলে মেয়ের দল কমিতে পারে এবং যাহারা উপার্জ্জনাক্ষম, তাহাদের বিবাহ, এমন কি কাহারও বিবাহের কন্যা না মিলিতেও পারে। এখন এক স্নেহলতার জন্য এত হাহাকার, তখন ঘরে ঘরে কত স্নেহলতা এইরূপ ভূমণ্ডল হইতে অপসারিত হইবে, তাহার কি নিরূপণ আছে?

বিবাহ সকলেরই করা উচিত। বিবাহ না করিলে—পুত্র কন্যাদি না হইলে, পূর্ব্ব পুরুষগণের নাম লোপ পাইল; এমন কি কুলাঙ্গার সন্তানের জন্য তাঁহাদিগকে চিরকাল নিরয়-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল। যদি সন্ন্যাস গ্রহণ করে, কলিতে সন্ন্যাস নাই, সংসারই এক মাত্র আশ্রয়; তবে তাহার কোন ফল ফলিল না। (ইহা শঙ্করাচার্য্যের মত।) এক্ষণে সংসারই সন্ন্যাস। যদি পিতা মাতা বিবাহ না দেন,কাহারও বিবাহ না হয়, কেন না, সে সামান্য রোজগার করে, তখন সে তাহার পাশববৃত্তি চরিতার্থের জন্য, অর্থের অসঙ্কুলান বশতঃ চুরি ডাকাইতি দাগাবাজী বাটপাড়ী প্রভৃতি যাবতীয় নীচ কর্ম্মের দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিবে, তখন তাহার সেই পাপ কি সেই পিতা মাতাকে স্পর্শ করিবে না? তদপেক্ষা বিবাহ কি উত্তম নয়? বিবাহ করিলে পুত্র হইবে, ভিখারীর দল বৃদ্ধি হইবে; ক্ষতি কি? দু একটী পুত্র হইলে যদি সঙ্কুলান না হয়, তবে না হয় দ্বারে দ্বারে মুষ্টি ভিক্ষায় প্রবৃত্ত হইবে। চিরকাল যাহারা দাসত্বে অভ্যস্ত, সে জাতির মুষ্টি ভিক্ষাও যে মানের কার্য্য।

কন্যার জন্মদান করিয়া যদি পিতা দায়ী হইয়া থাকেন, তবে না হয় জামাতা শ্বশুরের দ্বারে ভিক্ষার্থী হইয়া দাঁড়াইল, তিনি আপন কন্যার আহারের

জন্য মুষ্টিভিক্ষা না দিয়া চাউল ডাইল তরি তরকারী ইত্যাদি দিবেন। তারপর জামাতার ভিক্ষাদ্বারা সংসার চলিবে এবং পুত্রগণ ভিক্ষাদ্বারা যাহা উপার্জ্জন করিবে, সেগুলি অসময়ের জন্য সঞ্চিত থাকিলেই প্রচুর হইল।

স্বেচ্ছা-বিবাহ ইউরোপের আদর্শ হইলেও যে আমাদের তাহা প্রচলন করা প্রয়োজন, তাহার কি কথা আছে? সেখানে মেয়েরাই সর্ব্বে সর্ব্বা; আমাদের সেইরূপ করিয়া জাতিনাশের পর পুরুষের ইচ্ছা হইল, বিবাহ করিলাম, নচেৎ নয় এরূপ হইবে? আমাদের স্ত্রীলোকেরা মুখ ফুটিয়া তাহার নাগরকে বলিবে যে, আমার তোমায় পছন্দ হইয়াছে, তোমার রূপে গুণে আমি মোহিত, সুতরাং তোমাকেই বিবাহ করিব। আমরা বহু দিবসেও সেরূপ বাক্য পাই নাই। বরং এ কাপড়টা পছন্দ সই নয়, অমুক দ্রব্যটা চাই, ওবাড়ীর অমুকের স্ত্রীর মত অমুক গহনাটা চাই; কিন্তু বলে না ত যে অমুকের স্বামীর মত আমার স্বামী হইলে বড় সুখ হইত, তোমায় আমার পছন্দ হয় না কিম্বা আদর করিয়া আর কিছু চাহে। তাহা হইতেই পারে না। হিন্দুললনাদের সেইটুকুই সৌন্দর্য্য। অভিসারিকার বেশ পরিধান পূর্ব্বক স্বামীর অন্বেষণে পার্কে পার্কে (Park এ Park) ভ্রমণ করা আমাদের সোহাগিনীগণের সাধ্যাতীত। তাহারা জানে, পিতা মাতা আমাদিগকে যাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, খাঁদা খোঁড়া, কুটে কাণা, হাবা তিনি যাহাই হউন না, আমাদিগের প্রত্যক্ষ দেবতা, তাঁহাকে ভক্তি করিতে, পূজা করিতে, আদর যত্ন করিতে আমরা ন্যায়তঃ বাধ্য; বরাবর তাহা চলিয়াও আসিতেছে। পুত্রদিগেরও তদ্রূপ পিতা মাতা ইত্যাদি গুরুজনগণ যাহাকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিবেন, তাহাকেই ভালবাসা স্নেহ করা তাহাদের উচিত।

পুত্রগণ স্বেচ্ছা-বিবাহে যদি স্বচক্ষে দেখিয়া বিবাহ করে, তবে তাহারা শেফালী-বৃন্তবৎ অঙ্গসৌষ্ঠব, আকর্ণ ভ্রূযুগল, খগরাজ-বিনিন্দিত নাসা, বিম্বাধরা, ক্ষীণমধ্যদেশা, নিতম্ব-লম্বিত ভ্রমর-কৃষ্ণ-কুঞ্চিত-চিকুরদামবিশিষ্ট এক ডানা কাটা পরীর বাচ্ছা ব্যতীত অন্যকে নয়নপথে স্থান দিবে না, তখন যাহারা টেরা খেদা কুৎসিতা, তাহাদের উপায় কি হইবে? হায়েষ্ট-বিডার! সেখানেও কেহ লইবে না; সুতরাং কুলত্যাগ ও গণিকাবৃত্তি ব্যতীত তাহাদের আর উপায় নাই। হয় ত কেহ উপহাসচ্ছলে বলিলেন, যদি দশ সহস্র অর্থাৎ অর্দ্ধরাজ্য দাও, তবে এ রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারি; নচেৎ অন্যত্র চেষ্টা কর। কন্যার পিতা একেবারে কৃতার্থ। আরও যদিই তাহাই হইল,

কন্যা দেখিয়া পুত্রের বিবাহের ইচ্ছা হইল অর্থাৎ পছন্দ হইল, কিন্তু লোহার কার্ত্তিক দেখিয়া কন্যার পছন্দ হইল না। সে মুখ ফুটিয়া তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে পারিল না। উভয়ের বিবাহ হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি "জংলা কখন পোষ না মানে," কি ফল ফলিবে? তোমার যেমন সুন্দরী বিনা আলমারী ভাল মানাইবে না, তাহারও সেইরূপ! তাহাতে প্রণয় সম্ভবিতে পারে না। প্রণয় হইল না, কিন্তু যে বীজ বপন করা হইল, তাহাতে অঙ্কুরোদ্গমের সঙ্গে জল সেচনে শাখা প্রশাখায় পরিবেষ্টিত হইয়া পুষ্পের সহিত ফল ধরিল, সে ফল আস্বাদন করিবে কে! সে যে বিষময়! জীবন-সংহারক! সনাতন আর্য্যধর্ম্ম বহুদিনের পুরাতন। ইহার উৎপত্তি কতকাল পূর্ব্বে এবং কতকাল যাবৎ প্রচলিত, তাহার সময় নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। সামান্য দুই সহস্র বৎসরের সমুত্থিত নূতন জাতির প্রথানুসারে যে আর্য্যজাতি আজ প্রলোভিত হইবে, তাহাদের স্বরূপ কার্য্য করিতে কৃতসংকল্প হইবে, তাহা বড়ই শোচনীয়। যে আর্য্যের অনুকরণে সমগ্র ভূমণ্ডল আপনাকে গরীয়ান্ বিবেচনা করেন, যাঁহাদের স্থাপিত নীতি অনুসারে কার্য্য করিয়া আজ যাহারা বিশেষরূপে সম্মানিত, সেই জাতির সেই প্রাচীন ক্রিয়া-কলাপে অগ্রাহ্য করিয়া—হতাদর করিয়া নূতনের দিকে হৃদয় আকৃষ্ট হইবে, তাহা বড়ই শোকাবহ! হায় রে বৃদ্ধাদপিবৃদ্ধ সনাতন ধর্ম্ম! যে মুনি-ঋষিগণ আবহমান কাল তোমার সেবা করিয়া তোমাতেই লীন হইয়াছেন, তোমার বাক্যসকল ক্রীতদাসের ন্যায় পালন করিয়াছেন, এক্ষণে সেই মুনি-ঋষিদের বংশসম্ভূত কুলাঙ্গার আমরা তোমার হন্তারক হইতেছি। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি? অনন্ত নরক! জ্বলন্ত স্পষ্টাক্ষরে লেখা অনন্ত নরক!!! এই দুরাশা মন হইতে বিদূরিত করিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করাই আমাদের শ্রেয়ঃ।

আধুনিক মনীষিবর্গের এবং সমগ্র হিন্দুধর্ম্মানুমোদিগণের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে, হিন্দুধর্ম্মের প্রাচীন মত গুলি যাহাতে বিশেষ সূক্ষ্মরূপে পরিচালিত হয় এবং যাহাতে পুনরায় ব্রাহ্মণমুখ-নিঃসৃত বাগ্মিতাপূর্ণ ভাষাগুলি বেদ বিশেষ সনাতন আর্য্যজাতির নিকট সমাদৃত হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহারা যেন বিশেষ যত্নবান হয়েন। ইতি।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষাল।

পেশোয়া ও নিজাম।

ইতিপূর্ব্বে আমরা একটী প্রবন্ধে পেশোয়া ও নিজাম সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। সেই প্রবন্ধে পাঠকবর্গ নিজাম বাহাদুরকে গোদাবরী তীরে পালখেড়ের রণস্থলে পেশোয়া বাজীরাও কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বশতাপন্ন হইতে দেখিয়াছেন। পালখেড়ের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া নিজাম পেশোয়ার দুর্দ্দমনীয় শক্তির পূর্ণ পরিচয় প্রাপ্ত হন এবং পেশোয়ার সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইতে অঙ্গীকার করেন। কিন্তু নিজাম বাহাদুর তাঁহার সে অঙ্গীকার রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই।

পালখেড়ের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া পেশোয়া বাজীরাও তাঁহার অজেয় সৈন্যদল লইয়া দিল্লী আক্রমণ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। কিন্তু এই সময় সহসা আবার এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা উপস্থিত হইল।—মহম্মদ খাঁ বঙ্গশ নামক একজন দুর্দ্ধর্ষ পাঠান বীর বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া বুন্দেলা-রাজ ছত্রশালের রাজধানী অবরোধ করিয়াছিলেন। দীর্ঘকালব্যাপী অবরোধের ফলে রাজধানী পতনোন্মুখ,—দুর্গনায়কগণ আত্মসমর্পণে সমুৎসুক,—পুরবাসী নারীবৃন্দ আতঙ্কে অভিভূত,—ঘরে ঘরে জহর-ব্রতের আয়োজন অনুষ্ঠান!—বুন্দেলার অবস্থা যখন এমনই শোচনীয়,—সমগ্র ভারত যখন প্রতিমুহূর্ত্তে বুন্দেলার পতন-সংবাদ শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব,—ঠিক সেই সময় আশ্রিতবৎসল হিন্দুর মর্য্যাদারক্ষক মহাপ্রাণ বাজীরাও বিপন্ন বুন্দেলাধিপতিকে রক্ষা করিবার জন্য আবার বীরদর্পে তরবারি নিষ্কোষিত করিলেন।

পেশোয়া বাজীরাও তাঁহার সহযোগী সেনাপতি মলহররাও হোলকার ও রণজি সিন্ধিয়া এবং ভ্রাতা চিম্‌নাজি আপ্পার নেতৃত্বে অধিকাংশ সৈন্য প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে দিল্লী আক্রমণের উপদেশ দিয়া—স্বয়ং বিংশতি সহস্র অতি ক্ষিপ্রগামী অশ্বারোহী-সহ বুন্দেলায় ধাবিত হইলেন।

বুন্দেলার জীবন-মৃত্যুর মহাসন্ধিক্ষণে সঘনে পেশোয়ার রণভেরী নিনাদিত হইল। পালখেড়ের যুদ্ধে সমবেত শক্তিপুঞ্জের সহিত মহাবল নিজামকে পরাজিত করায়, পেশোয়া বাজীরাও ভারতের অদ্বিতীয় শক্তি বলিয়া আখ্যাত হন; পেশোয়া বাজীরাওএর নামে বিপক্ষ-বাহিনী আতঙ্কে অধীর হইয়া পড়িত। বুন্দেলা-অবরোধকারী আফগান বীর মহম্মদ খাঁ বঙ্গশের উপর যখন পেশোয়ার

রণোন্মত্ত বাহিনী আচম্বিতে সিংহবিক্রমে আপতিত হইল,তখন পাঠান সেনাগণ প্রমাদ গণিল! তাহাদের পলায়নের পথ অবরুদ্ধ; সম্মুখে বুন্দেলার দুর্গ—পশ্চাতে পেশোয়ার রণোন্মত্ত সৈন্য! পাঠানবীরগণ তাহাদের নায়কের আদেশে সেই মুহূর্ত্তে ফিরিয়া দাঁড়াইল,—যে অস্ত্র তাহারা বুন্দেলার উপর উগ্যত করিয়াছিল, যে সকল কামান লইয়া বুন্দেলাদুর্গের উপর অগ্নিবর্ষণ করিতেছিল,—সেই সকল অস্ত্র লইয়া তাহারা পেশোয়ার সম্মুখীন হইল—সেই সকল কামান ঘুরাইয়া পেশোয়াবাহিনীর উপর অগ্নিবর্ষণে প্রবৃত্ত হইল।—এদিকে এই মহাসুযোগ দেখিয়া বুন্দেলা-সৈন্যগণের নির্ব্বাপিতপ্রায় বীর্য্যবহ্নি আবার পূর্ণতেজে জ্বলিয়া উঠিল,—উন্মত্ত শার্দ্দূলের ন্যায় তাহারা পাঠানদিগের উপর আপতিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে পেশোয়ার অতুলনীয় অশ্বারোহী বাহিনী বিপক্ষের অগ্নিবর্ষণ তুচ্ছ করিয়া, তাহাদের সৈন্য-রেখা ভেদ করিয়া তাহাদের বক্ষের উপর পতিত হইল। কয়েকঘণ্টা মাত্র তুমুলযুদ্ধের পর পাঠানসৈন্যদল একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া গেল,—মুষ্টিমেয় মাত্র সৈন্য আত্মসমর্পণ করিয়া প্রাণ রক্ষা করিল। বুন্দেলা—এই ভাবে পাঠানের করাল কবল হইতে রক্ষা পাইল।

এই যুদ্ধের পর পেশোয়া বাজীরাওএর কর্ম্মময় জীবন-অঙ্কে স্বল্পকালস্থায়ী এক যবনিকার পতন হইল! বুন্দেলারাজ ছত্রশাল মহাপ্রাণ বাজীরাওয়ের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার হস্তে তাঁহার মস্তানী নাম্নী দুহিতাকে সমর্পণ করিলেন। এই মস্তানী রূপেগুণে তৎকালে ভারতের সুন্দরী-সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এহেন রূপসীকে লাভ করিয়া পেশোয়া বাজীরাও তাঁহার প্রেমপাশে আবদ্ধ হইয়া, কিছুকালের জন্য কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন।

দিল্লীতে অভিযান, দিল্লীর সিংহাসনে মহারাষ্ট্রের বিজয়-পতাকা স্থাপন—এই উচ্চ উদ্দেশ্য লইয়া যিনি কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি বিলাস-সজ্জায় অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া—নিশ্চিন্তমনে কালক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অদর্শনে—তাঁহার সহযোগিগণ অধীর হইয়া উঠিলেন; এদিকে শত্রুপক্ষ পেশোয়াকে কর্ত্তব্যকর্ম্মে উদাসীন দেখিয়া পরম প্রীতিলাভ করিল এবং রটাইয়া দিল যে, পেশোয়া বাজীরাও হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন।—এই সংবাদ শুনিয়া পেশোয়ার সৈন্যদল—যাহারা পেশোয়ার এক অঙ্গুলি সঞ্চালনে অসাধ্য-সাধন করিত—তাহারা

ভগ্নহৃদয়ে দলে দলে কার্য্যে ইস্তফা দিতে লাগিল। সহস্র চেষ্টা করিয়াও সেনাপতিগণ তাহাদিগকে সংযত করিতে সমর্থ হইলেন না।

এদিকে—উপযুক্ত সময় বুঝিয়া—হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুর আবার বিপুল সমরায়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। সাতারার দরবারে বাজীরাওএর প্রতিদ্বন্দ্বী সেনাপতি ত্র্যম্বকরাও সংগোপনে নিজামের সহিত যোগদান করিলেন,—সেই বন্দরের দুর্দ্ধর্ষ পোর্ত্তুগীজগণও এই দলে সম্মিলিত হইলেন। সমবেত শক্তিপুঞ্জ ঘোষণা করিলেন যে, তাঁহারা মহারাষ্ট্রপ্রদেশাধিপতি ছত্রপতি সাহুর সহিত যুদ্ধার্থী নহেন,—তাঁহারা শান্তির পরিপন্থী, অত্যাচারী, দানব-প্রকৃতি পেশোয়া বাজীরাওএর উচ্ছেদপ্রয়াসী, বাজীরাওকে ধ্বংস করা, তাহার রাজধানী পুণানগরী অধিকার করা—তাঁহাদের প্রাণের কামনা। সমবেত শক্তিপুঞ্জ এইভাবে ঘোষণাবলী প্রচারিত করিয়া সদলবলে পুণাভিমুখে ধাবিত হইলেন!

সাতারাধিপতি সাহু শক্তিপুঞ্জকে পুণায় অভিযান করিতে নিষেধ করিয়া দূত পাঠাইলেন, কিন্তু শক্তিপুঞ্জ তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিতে সম্মত হইলেন না। সাহু তখন সেনাপতি ত্র্যম্বকরাওয়ের নেতৃত্বে ত্রিশ হাজার সৈন্য পুণা-রক্ষার্থে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ত্র্যম্বকরাও পূর্ব্ব হইতেই সংগোপনে শক্তিপুঞ্জের কার্য্যে পোষকতা করিতেছিলেন; এক্ষণে তিনি এই সৈন্যদল লইয়া শক্তিপুঞ্জের সহিত যোগদান করিলেন। শক্তিপুঞ্জ ভীষণ অত্যাচার বহ্নিতে দেশ দগ্ধ করিতে পুণায় ধাবিত হইলেন।

পুণার ভীষণ বিপদ উপস্থিত! দুর্গে মুষ্টিমেয় সৈন্য; পেশোয়ার অদর্শনে তাহারাও উৎসাহবিহীন,—বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া সমবেত শত্রুগণ অগ্রগামী,—কে পুণা রক্ষা করিবে? কে পেশোয়ার সম্মান, তাঁহার বংশের সম্মান—তাঁহার স্ত্রী পুত্রের সম্মান রক্ষা করিবে? সকলেরই মুখে এই কথা, সকলেরই এই চিন্তা।

কিন্তু ভগবান যাহার রক্ষাকর্ত্তা,—তাহার পতন মানবের সাধ্যের অন্তর্গত নহে!—পেশোয়ার ধর্ম্মগুরু ভারতপূজ্য মহর্ষি ব্রহ্মেন্দ্রস্বামী—পেশোয়ার শোচনীয় অধঃপতনকাহিনী শ্রবণ করিয়া তাঁহার সংজ্ঞাসঞ্চারার্থ বুন্দেলায় গমন করিয়াছিলেন,—তাঁহার চেষ্টায় এবং মস্তানীর আত্মত্যাগে—বাজীরাওএর মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইল!—জাগরিত হইয়া তিনি দেখিলেন,—তাঁহার অজেয়বাহিনী বিচ্ছিন্ন, তাঁহার সহযোগী সেনানীগণ দিল্লী-যুদ্ধে পরাজিত—

প্রত্যাগত, তাঁহার রাজধানী পুণা সমবেত শক্তির অস্ত্রাঘাতে পতনোন্মুখ; চতুর্দ্দিকে বিভীষিকা করাল বদন বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান!

কিন্তু কর্ম্মবীর বাজীরাও - কিছুতেই বিচলিত হইলেন না; বিপদে মুহ্যমান হওয়া তাঁহার নীতির বিরুদ্ধ। তিনি ভীত হইলেন না, কৃতকার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত সাধনকল্পে নিদাঘ মধ্যাহ্নের উদ্দাম ঝটিকার ন্যায় তিনি আবার কর্ম্মসাগরে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন।

সমবেত শক্তিপুঞ্জ মহাসমারোহসহকারে পুণায় ধাবিত,—ইতিমধ্যে সহসা সংবাদ আসিল, পেশোয়া বাজীরাও প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন, তাঁহার অজেয়বাহিনী ও অদ্ভুতকর্ম্মা সেনাপতিদের সহিত তিনি বিদ্যুদ্বেগে পুণায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন।—এই সংবাদে শক্তিপুঞ্জ বজ্রাহতবৎ স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন, পুণার পথে আর পদমাত্র অগ্রসর হইতে তাঁহাদের সাহস হইল না; তাঁহারা বুঝিলেন, এ সময় পুণা আক্রমণ করিলে অগ্রপশ্চাতে আক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত বিপন্ন হইতে হইবে। সুতরাং তাহারা পরামর্শ করিয়া বরোদার সান্নিধ্যে উভই নামক বিশাল প্রান্তরে সৈন্য স্থাপন করিয়া পেশোয়ার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

উভইয়ের রণাঙ্গনে লোকক্ষয়কারী মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়। কথিত আছে, এই যুদ্ধে পেশোয়া বাজীরাও স্বয়ং নিষ্কোষিত তরবারি হস্তে উন্মত্তভাবে রণক্ষেত্রে শত্রুসংহারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। উভইয়ের যুদ্ধে পেশোয়া সম্পূর্ণরূপে জয়ী হন; সেনাপতি ত্র্যম্বকরাও এই যুদ্ধে নিহত হন;—নিজাম স্বয়ং এ যুদ্ধে অবতীর্ণ হন নাই,—তাঁহার সেনাপতি ইওয়াজ খাঁ নিজামী-সৈন্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধের শোণিতময় ফল শ্রবণ করিয়া নিজাম দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিলেন,—

"ইস্ক মুল্লুকমে এক বাজী, ঔর সব পাজী।"

উভয় যুদ্ধের পর বাজীরাও—তাঁহার নৌ-সেনাপতি কাহ্নোজী আংগ্রের সহায়তায় পোর্ত্তুগীজ—শক্তির উচ্ছেদ সাধনপূর্ব্বক সেই বন্দর ও সমগ্র কোঙ্কণ প্রদেশ অধিকার করিয়া লন। তৎপরে স্বরাজ্যের দৃঢ়তা সাধন করিয়া—অশীতি সহস্র সৈন্যসহ বাজীরাও মহা উৎসাহে দিল্লীতে অভিযান করেন।

এইবার সমগ্র ভারতবর্ষের উল্লেখযোগ্য সমগ্র শক্তি দিল্লীশ্বর মহম্মদ শাহার নেতৃত্বে সমবেত হইয়া বাজীরাওএর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন।

দিল্লী, হায়দ্রাবাদ, মালব, জয়পুর, যোধপুর, বিকাণীর প্রভৃতি রাজ্যের অধীশ্বর-গণ এবং রোহিল্লা ও সিদ্ধি দলপতিগণ এই যুদ্ধে বাজীরাওএর বিরুদ্ধে দণ্ডায়-মান হইলেন। ভূপালের বিশাল প্রান্তরে 'কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের' আয়োজন চলিতে লাগিল। সমবেত শক্তিপুঞ্জের তিন লক্ষ সৈন্যের বিরুদ্ধে অশীতি সহস্র সৈন্য লইয়া পেশোয়া বাজীরাও রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

সুকৌশলী নিজাম আবার এই সময় এক চাল চালিয়া বসিলেন। ভূপা-লের যুদ্ধে পেশোয়ার পতন স্থির জানিয়া, পেশোয়ার পলায়ন পথ অবরোধ করিবার অভিপ্রায়ে নাগপুরের পথে তিনি তাঁহার পুত্র নাসিরজঙ্গের নেতৃত্বে ত্রিশ হাজার সৈন্য স্থাপন করিলেন। ভূপালের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পেশোয়া যদি পলায়নে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে এই সৈন্যদল তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করিয়া ফেলিবে,—নিজামের এই প্রকার আদেশ ছিল। কিন্তু বাজীরাও কূট-কৌশলে নিজামকেও অতিক্রম করিবার সামর্থ্য রাখিতেন। তিনি নিজামের অভিপ্রায় অবগত হইয়া মলহররাও হোলকারকে নিজামপুত্রের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়া রণজি সিন্ধিয়া ও অন্যান্য সেনাপতিগণের সহিত ভূপালে ধাবিত হইলেন। ভূপালের প্রান্তরে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। শক্তিপুঞ্জের সৈন্য সংস্থানের দোষে পেশোয়া বাজীরাও অতি সহজে দিল্লীশ্বর নিজামের সৈন্যদলের সন্ধিস্থলে আঘাত করিয়া তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন,—রণজি সিন্ধিয়া দিল্লীশ্বরকে এমনভাবে অবরোধ করিয়া ফেলি-লেন যে, শক্তিপুঞ্জ বিশেষ চেষ্টা করিয়াও দিল্লীশ্বরের সহিত যোগদান করিতে সমর্থ হইলেন না। পেশোয়া বাজীরাও স্বয়ং নিজামীসৈন্যদলকে আক্রমণ করিলেন এবং কয়েক ঘণ্টাকালব্যাপী যুদ্ধের ফলেই সমগ্র নিজামীসেনা রাজপুতবাহিনী পেশোয়ার বাহিনী কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া পড়িল। ইতিমধ্যে মলহররাও হোলকার নিজামপুত্র নাসিরজঙ্গকে পরাজিত করিয়া পেশো-য়ার সহিত যোগদান করিলেন। মালব, রোহিল্লা ও সিদ্ধি সৈন্যদল—সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল,—তাহাদের অধিকাংশ সৈন্যই রণক্ষেত্রে পতিত হইল। নিজাম ও রাজপুতরাজগণও পরাজিত হইয়া সন্ধিস্থাপনে বাধ্য হইলেন ;—দিল্লীশ্বর মহম্মদ সাহাও সন্ধি ভিক্ষা করিয়া পেশোয়ার নিকট দূত প্রেরণ করিলেন।

সন্ধি স্থাপিত হইল। দিল্লীশ্বর, নিজাম ও রাজপুতরাজগণ পেশোয়ার আনুগত্য স্বীকার ও যৌথ প্রদানে অর্থাৎ স্ব স্ব রাজ্যের রাজস্বের চতুর্থাংশ

প্রদান করিতে এবং যুদ্ধের ব্যয়ভার বহনে সম্মত হইলেন। এইভাবে ভূপালের শোণিতময় সমরের অবসান হইল।

এই সময় নিজাম বাহাদুর এমন শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, অতি কষ্টে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করিবার সামর্থ্যও তাঁহার ছিল না। পেশোয়ার সেনাপতিগণ এই সময় নিজাম-রাজ্যের উচ্ছেদ করিবার জন্য পেশোয়াকে বারম্বার অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু মহাপ্রাণ পেশোয়া বাজীরাও তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। নিজামবাহাদুরও আর পেশোয়া বাজীরাওএর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন নাই।

শ্রীমণিলাল বন্দোপাধ্যায়।

সহিব।

(১)

সহিতে এসেছি ভবে শুধুই সহিব।
লুকা'য়ে নয়ন-কোণে মরমের জ্বালা,
বুকে পুষি' সযতনে নিরাশা আগুন,
দুর্ব্বহ জীবন-ভার সদাই বহিব।

(২)

যাতনা লাঞ্ছনা তরে অপেক্ষি রহিব।
শিরে বহি' শত-ঘৃণা-অনাদর-ভার,
বিরক্তি ভ্রূকুটী উপেক্ষার হাসি তরি,
বিদ্রূপ-ব্যঙ্গের বাণী, শুধুই সহিব।

(৩)

জগতের দুঃখ যত কুড়া'য়ে লইব;
সাধ, সুখ হৃদি হ'তে দিব তাড়াইয়ে,
বক্ষ চাপি রাখি দিব উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস
দূরে থাকি 'আছে ভাল' শুনিয়া আসিব।

শ্রী—

মুড়ি-ভাজা।

লাজে দুটী বক্ষরুহ—
লুকায়িত উরুমাঝ,
রাঙ্গা মুখ ছল ছল
ভোর বেলা একি কাজ।
ঘন ঘন ঘাম মুছি
এল চুল দোলাইয়া —
কি নাড়িছ কচি হাতে
তাতে খোলা চড়াইয়া ?
লক্ লক্ লোল জিব
মাঝে মাঝে বাড়াইয়া—
চুলা ছাড়ি আসে আগ
তব পানে গড়াইয়া।
আগুন (ও) আগুন দেখ,
কাঁপিতেছে থর থর ;—
গড়ায়ে আসিছে বুঝি
চুমিতে ও বিম্বাধর !
রমণি, তোমার হাতে—
নাড়া খেয়ে চা'লগুলি—
রাঙা হয়ে উঠিতেছে,
বালুকায় ফুলি ফুলি।
হাস তুমি, হাস রাণী
শাখা কুটি সাদা দাঁতে,—
দেখি চা'ল হবে সাদা—
আগুনেরি মৃদু তাতে।
তোমারে চুমিতে যবে—
লাফাইবে খোলা জুড়ি,
রমণী তখনি বুঝি—
সাঙ্গ হবে ভাজা মুড়ি।

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।

স্পষ্টবাদিতা।

সর্ব্বমঙ্গলময় ভগবান্ কত কৌশলজাল বিস্তারপূর্ব্বক যে এই চরাচর বিশ্ব রচনা করিয়াছেন, তাহা ক্ষুদ্র মানববুদ্ধির বিষয়াতীত। মানবের সামান্য জ্ঞান সেই রচনানৈপুণ্যের অসীম অনন্ত-গর্ভে প্রবেশ করা ত দূরের কথা, তাহার কল্পনা করিতেও সমর্থ হয় না। এই সংসারে বহুবিধ লোক দৃষ্ট হইয়া থাকে, তন্মধ্যে একপ্রকার লোক আছে, তাহাদের দৃষ্টিতেই যেন কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাব নিহিত থাকে, যাহার সংস্পর্শ মাত্রেই কতকগুলি লোকের প্রীতিপ্রফুল্ল মুখকমলও নিদাবতাপ-সন্তপ্ত শীর্ণ কুসুমের ন্যায় অতীব ম্লানভাব ধারণ করে; হৃদয়ের আনন্দলহরী একেবারে বিলীন হইয়া যায়। ফণা বিস্তার করিয়া সম্মুখে সমাগত দংশনোদ্যত কালসর্প কিম্বা বজ্রধরের পতনোন্মুখ বজ্রও বরং বিশ্বাসের যোগ্য, কিন্তু সেই বিষদৃষ্টি-দুষ্ট মানবদিগের প্রতি অনেকেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে অভিলাষ করেন না বা পারেন না, এমন কি সাহসীও হয়েন না। এই সকল নরাধম পাষণ্ডেরা সুকুমারমতি বালক হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেরই নিতান্ত বিদ্বেষভাজন হইয়া থাকে; এমন কি, ইহাদের সংসর্গ পর্য্যন্ত নয়ন-নিপতিত বালুকার ন্যায় ক্লেশাবহ। কণ্টকাকীর্ণ মন্দার বৃক্ষও বরং সুখসেব্য হইতে পারে, কিন্তু ইহাদের সংস্রব কাহারও অভিপ্রেত বা মঙ্গলদায়ক নহে। সুতরাং অনেকেই ইহাদিগকে সংসারের আবর্জ্জনা বা অমঙ্গলের নিদানস্বরূপ মনে করিয়া থাকেন। অনন্যসাধারণ বিদ্যায় বিভূষিত, অনুপম সৌন্দর্য্যের চরমসীমায় উপনীত এবং অপ্রতিহত ধীশক্তিসম্পন্ন হইলেও ইহারা উহার একটী দ্বারাও সাধারণের ভক্তি বা প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না। শ্মশান-প্রস্ফুটিত কুসুমের ন্যায় ইহাদের ধর্ম্মজ্ঞান, সৌজন্য ও পবিত্রতা প্রভৃতি গুণসকল সমাজের অধিকাংশ স্থলেই উপেক্ষিত হইয়া থাকে। ইহাদের সত্য ও উপদেশপূর্ণ বাক্যাবলীও বিষদিগ্ধ বাণের ন্যায় প্রায় সাধারণের মর্ম্মন্তুদ হইয়া থাকে। সুতরাং উহারা আত্মীয় হইলেও পর, মিত্র হইলেও শত্রু, ভদ্র হইলেও অভদ্র এবং পরমপূজ্য গুরু হইলেও সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য; কারণ, ইহারা স্পষ্ট বাক্যের মুর্ম্মুর দহনে

আত্মপর-নির্ব্বিশেষে সকলকেই দগ্ধীভূত করিতে সর্ব্বদা যত্নশীল ও তাহাতেই স্বীয় বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে।

আমি পরিচ্ছদ-পারিপাট্যে অর্থাৎ বিচিত্র বসনভূষণে মদীয় জীর্ণ দীর্ণ ব্রণাকীর্ণ অঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া, সাধারণের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপপূর্ব্বক সৌন্দর্য্যের হাট খুলিয়া বসিয়াছি, আপামর সাধারণ আমার মোহন ঠমকে বিমোহিত হইতেছে! তুমি কি না, তোমার ঐ বাক্যানলে আমার এত সাধের পরিচ্ছদাদি ভস্মীভূত করিয়া, অঙ্গের ক্ষতসকল সাধারণের গোচর করিয়া দিতেছ; সুতরাং তুমি আমার আত্মীয় হইলেও পর, মিত্র হইলেও শত্রু এবং গুরু হইলেও পরিত্যাজ্য।

কেহ বা মনের আবেগে তীব্রকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিতেছেন—আমি এই সংসারারণ্যে দুর্লক্ষ্য মায়াজাল বিস্তারপূর্ব্বক সুমধুর বংশীরবে অবোধ কুরঙ্গদিগকে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু তোমার স্পষ্ট বাক্যের গভীর হুঙ্কারে তাহারা সতর্ক হইয়া পলায়ন করিল, চিরকালের তরে আমার আশালতা সমূলে নির্ম্মূল হইয়া গেল; সুতরাং তুমি আমার আত্মীয় হইলেও পর, মিত্র হইলেও শত্রু ও গুরু হইলেও সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

কেহ বা নাসাগ্র কুঞ্চিত করিয়া বিরক্তিপূর্ণ বাক্যে কহিতেছেন—আমি বিলাসের দোলায় আন্দোলিত হইয়া, সুখময়ী তন্দ্রার আকর্ষণে শান্তিময়ী নিদ্রাদেবীর সুকোমল অঙ্কে শয়ন করিয়া শান্তিপূর্ণ অপূর্ব্ব স্বপ্ন দর্শন করিতেছিলাম; তোমার গভীর গর্জ্জনে তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, সুতরাং শান্তিময় স্বপ্ন অন্তর্হিত হইল; অতএব তুমি আমার পরম শত্রু ও অবশ্য বধ্য।

কোনও যুবক মৃদুমন্দভাবে করুণস্বরে প্রকাশ করিতেছেন যে, আমি কোকিলের কলকণ্ঠে বিমুগ্ধ হইয়া—আত্মহারা হইয়া—এমন কি, নশ্বর মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া স্বকীয় দেবত্ব কল্পনা করিতেছিলাম, তুমি কি না, স্পষ্ট বাক্যের লগুড়াঘাতে অতিমাত্র বাঞ্ছিত আমার সেই দেবভাব চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিলে, আমার চিরসুখে বাদ সাধিলে; সুতরাং তুমি একান্ত আততায়ী, অতি নিষ্ঠুর; তোমাকে বধ করিলে আমার পাপ নাই—আমার কলঙ্ক নাই।

কেহ বা মনে মনে বলিতেছেন তোমার অঘটন-ঘটন-পটু স্পষ্ট বাক্যের অপ্রতিহত প্রভাবে কত ব্যাঘ্র মূষিকে পরিণত হইতেছে, কত কুসুম-গুচ্ছের অন্তরালে ভয়ঙ্কর সর্প পরিদৃষ্ট হইতেছে, কত কাঁসা পিত্তলে পরিণত হইতেছে,

কত শত অমৃতভাণ্ডের অভ্যন্তরে কালকূটের অস্তিত্ব অনুভূত হইতেছে। তাই বলি, তুমি ক্ষণকালের জন্য মৌনভাব অবলম্বন কর। এই ভবের হাটে খাটি ও ভাজাল তুল্য মূল্যে বিক্রীত হউক, ব্যবসায়িগণের চিরপোষিত আশা পূর্ণ হউক, আমরা সকলে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া একাগ্রমনে তোমারই গুণগাথা গান করিতে থাকি।

স্পষ্টবাদিগণ এতাদৃশ কঠোর বাক্যে তিরস্কৃত হইলেও সত্যের অপলাপ করিয়া, মানব-সমাজে প্রীতি ও ভক্তি লাভ করিতে অভিলাষী হয়েন না। তাঁহারা বলেন যে, তাঁহাদের বাক্যপরম্পরা আপাতমধুর না হইলেও উহা পরিণামে বীর্য্যবান্ ঔষধের ন্যায় সাধারণের কল্যাণসাধন করিয়া থাকে। উচ্ছৃঙ্খল মানবসমাজ যখন মিথ্যা প্রবঞ্চনা প্রভৃতি বিবিধ কুক্রিয়াপরতন্ত্র হইয়া নারকীয় ভাব ধারণ করে, তখন স্পষ্টবাদিগণের মৃদু-মধুর স্পষ্টবাক্য প্রয়োগই উহা হইতে একমাত্র পরিত্রাণের উপায়। স্পষ্টবাদিগণ কাচ ও কাঞ্চনের তুল্যমূল্য এবং চন্দন-পুরীষের আদর-সাম্য জগতের নিতান্ত অকল্যাণকর বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। তাই তাঁহারা স্পষ্টবাক্যের দুন্দুভিনাদে মোহমূর্চ্ছিত মানবগণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া, সত্যের গৌরব রক্ষা করিতে যত্নশীল হইয়া থাকেন। এই নশ্বর সংসারে মানবরহস্য ভেদ করা অতি দুরূহ ব্যাপার। পিপাসা-নিবারণার্থ স্বচ্ছ সরোবর পরিত্যাগপূর্ব্বক কেহ মৃগতৃষ্ণিকায় আত্মবিসর্জ্জন না করে, স্পষ্টবাদীদিগের স্পষ্টবাক্যের হাই মুখ্য উদ্দেশ্য। কারণ, তাঁহারা জানেন—

নহি সত্যাৎ পরো ধর্ম্ম স্ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে॥

তাই তাঁহারা বাক্যরূপ অঞ্জনশলাকা দ্বারা ভ্রমান্ধ মানবগণের নয়ন উন্মীলন করিয়া, সত্যের পবিত্র মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করাইতে সর্ব্বদা যত্নপর হইয়া থাকেন।

সত্যমেব জায়তে নানৃতং সত্যেন পন্থা বিততো............দেবযানঃ॥

এই বাক্যের ধ্রুব সত্যতা তাঁহাদের অন্তঃকরণে সর্ব্বদা জাগরূক থাকে। লোকে বিরাগভাজন হইতে হইবে বলিয়া তাঁহারা কদাপি স্বীয় কর্ত্তব্য হইতে ভ্রষ্ট বা বিচলিত হয়েন না। পাপপঙ্কে যাঁহাদের অন্তঃকরণে কলুষিত হয় নাই, কর্ম্মক্ষেত্র সংসারে আসিয়া মানব-সমাজের প্রভূত কল্যাণসাধনই যাঁহাদের জীবনের চরম উদ্দেশ্য, সত্যের শুভ্র জ্যোতিতে যাঁহাদের হৃদয় সমুদ্ভাসিত, সৎপ্রবৃত্তির সুবিমল প্রবাহ যাঁহাদের অন্তঃকরণে অন্তঃসলিলা ফল্গুর প্রবাহের

ন্তায় নিরন্তর প্রবহমান, তাঁহারাই মানবকল্পিত তুচ্ছ সম্মানকে অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া অচল অটলভাবে স্পষ্টবাক্যের শাসন-দণ্ডদ্বারা বিপথগামী ভ্রান্তি-পরায়ণ মানবদিগকে প্রকৃত শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন। জগদুদ্ভাসক মরীচিমালীর কিরণমালা যেমন অন্ধকারপ্রিয় পেঁচকগণের সুখাবহ হয় না, উপদেশপূর্ণ স্পষ্টবাক্যসকলও তদ্রূপ পাপপরায়ণ স্বার্থপর ব্যক্তিগণের ভক্তি বা প্রীতি উৎপাদনে সমর্থ হয় না। সচ্ছিদ্র কলস যেমন সলিল ধারণে অসমর্থ, কপট পাপিগণও তাদৃশ স্পষ্ট-বাক্য প্রয়োগে সর্ব্বথা অপারগ। "সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্" এই প্রাচীন বাক্যের সহিত সৌজন্যের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা থাকিলেও, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে ইহার সারবত্তা সম্পূর্ণ ধর্ম্মানুমোদিত বলিয়া বিবেচিত হয় না। ধর্ম্ম-পরায়ণ স্পষ্টবাদীর স্বদোষ-কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া অন্তঃকরণে আপাততঃ ক্রোধের সঞ্চার হইলেও অসৎ-প্রবৃত্তির ভয়াবহ বেগ যে অল্প পরিমাণে মন্দীভূত হইতে থাকে, এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

স্পষ্ট বাক্যদ্বারা মানব-সমাজের কল্যাণ সাধন করিতে হইলে ধীর ও গম্ভীর ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক ভাষা পরিমার্জ্জিত করিয়া দোষানুদর্শন একান্ত কর্ত্তব্য। কারণ,—

"স্বভাবো যাদৃশী যস্য ন জহাতি কদাচন"।

নিম্ববৃক্ষে অমৃত সেচন করিলেও তাহা হইতে সুমধুর ফললাভ করা যেমন অসম্ভব, কল্যাণকর কঠোর-বাক্য প্রয়োগ দ্বারা বিপথগামী মানবদিগের সৎপ্রবৃত্তি উৎপাদন করাও তাদৃশ অসম্ভবই হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে ধর্ম্মজ্ঞান-বর্জ্জিত অবিজিতেন্দ্রিয় পাপপরতন্ত্র লোকের স্পষ্ট কথা প্রয়োগে, মানবের কল্যাণের পরিবর্ত্তে মহৎ অমঙ্গলই সাধিত হইয়া থাকে। যিনি দয়া-দাক্ষিণ্যাদি গুণসমূহে যথারীতি সমলঙ্কৃত, মানব-সমাজ যাঁহার চরিত্রের অনুকরণে সমধিক যত্নশীল, যিনি স্বীয় পবিত্র চরিত্রের সুবিশুদ্ধ মধুরতায় আপামর সাধারণের ভক্তি আকর্ষণে সমর্থ, তিনিই যথার্থ স্পষ্টবাক্য-প্রয়োগের উপযুক্ত অধিকারী, ভ্রান্ত বা বিপথগামী মানবদিগের দোষানুদর্শনপূর্ব্বক তাহার সংশোধনের একমাত্র মহাজন বা কর্ত্তা।

ভ্রান্ত কুপথগামী মানবদিগকে অন্যের অগোচরে স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা দোষানুদর্শন করান কর্ত্তব্য। লোকমধ্যে স্পষ্টবাক্য বলিয়া কাহারও লজ্জা উৎপাদন করা বা অন্তঃকরণে ব্যথা দেওয়া নিতান্ত অন্যায় ও নীতিবিরুদ্ধ।

স্পষ্টবাক্য প্রয়োগচ্ছলে অপরের অন্তঃকরণ ব্যথিত করাই যাহাদের উদ্দেশ্য, পরের পরীবাদ বা নিন্দা করাই যাহাদের আত্মতুষ্টির কারণ, পরচ্ছিদ্রান্বেষী মুখর বা দুর্ম্মুখ তাদৃশ লঘুচেতা মানবগণের সহিত দেবভাবাপন্ন পুণ্যশ্লোক স্পষ্টবাদীদিগের কখনও তুলনা হইতে পারে না। কোথায় বা পূর্ণ সুধাকরের জ্যোৎস্নাপ্লাবিত শারদ পৌর্ণমাসী রজনী, আর কোথায় বা নিবিড় জলদ-জালানুবিদ্ধ অমানিশার সূচীভেদ্য অন্ধকার! বসন্তবিকসিত নবমল্লিকার মন-মাতান মধুর সৌরভের সহিত গলিত শবের উদ্বমনকর পূতিগন্ধের সাদৃশ্য কখনও সম্ভবপর হইতে পারে কি? এতাদৃশ বিমল বৈসাদৃশ্য সত্ত্বেও যাঁহারা এই দেবতা ও নরপিশাচদিগের বিশেষত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন না, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত বলিয়াই আখ্যাত হইয়া থাকেন। ধর্ম্মানুরাগ, সত্যপ্রিয়তা এবং সাধারণের হিতৈষণা স্পষ্টভাষিতার দৃঢ় ভিত্তি; অন্তঃকরণের সঙ্কীর্ণতা, দ্বেষ, ঈর্ষা প্রভৃতি পৈশাচিক ধর্ম্মসকল দুর্ম্মুখতার নিদানস্বরূপ। ঐ নরপিশাচ-দিগের সভ্রূভঙ্গী অট্টহাস্যে এবং ভৈরব হুঙ্কারে সমাজে নানাপ্রকার অনর্থ উৎপাদিত হইয়া থাকে, উহাদের অন্তঃকরণ কুক্কুরলাঙ্গুলের ন্যায় চিরবক্র,—দৃষ্টি সর্ব্বদা বিষদিগ্ধ; সুতরাং ঐ নরপিশাচদিগের সংসর্গে অন্তঃকরণের সঙ্কীর্ণতা ও অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী;—অতএব উহাদের সংস্রব হইতে দূরে অবস্থান করাই মানবের উত্তম কল্প ও অবশ্য কর্ত্তব্য।

ইষ্টনাশ ও অনিষ্ট প্রাপ্তিজনিত দুর্নিবার্য্য যাতনায় এবং নৈরাশ্যের বিষম কষাঘাতে বিচলিত হইয়া, মানব যখন সংসারে অন্ধকারময়ী বিভীষিকা দর্শন করিতে থাকে; এই ক্ষণভঙ্গুর নশ্বর দেহের শোচনীয় পরিণাম চিন্তা করিয়া, শ্মশানানলের ভীষণ শিখার ভৈরবঘোর প্রতিমূর্ত্তি যখন তাহাদের কল্পনাময় দৃষ্টিপথে অবিরত আবির্ভূত হইতে থাকে; ধন, জন, পুত্র, পরিবার, অতুল বিভবাদি কিছুতেই যখন তাহাদের ভয়বিহ্বল চিত্তের শান্তি সম্পাদন হয় না; তখন তাহারা অমৃতময়ী শান্তির সুকোমল শয্যায় শয়ন করিবার নিমিত্ত ভগবৎ-সমীপে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সততই প্রার্থনা করিতে থাকে, এবং স্পষ্টভাষী মানবগণের স্পষ্টবাদিতাই উহাদের শান্তি-নিকেতনে পৌঁছিবার একমাত্র অবলম্বন হইয়া থাকে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।

কৰ্ম্মক্ষেত্ৰ।

শিশু ত বোঝে না কভু
যৌবনের সুখলেশ।
যুবাও বুঝিতে নারে
বার্দ্ধক্যের জরাক্লেশ।
বৃদ্ধ শুধু মৃত্যু লাগি
সতত কামনা করে,
ভাবে সে মৃত্যুতে কত
সুখ শান্তি আছে পড়ে'।
কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশিতে
কত জেগেছিল আশা।
সব কায ছেড়ে দিয়ে
হইয়াছি কর্ম্মনাশা।
এখন দেখি যে শুধু
ঝঞ্ঝাটের বোঝা মাথে.
দারুণ ভাবনা ফিরে
সদা মম সাথে সাথে।
জীবনে কখনো এত
ভাবি নাই, ছিনু সুখে।
শৈশব অতীত হ'লে
ঘিরে সবে শত-দুঃখে!

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন কাব্যব্যাকরণতীর্থ।

শিক্ষার দোষ।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পরিবর্ত্তন।

নানা চিন্তায়, নানা ভাবে, নানা উৎকণ্ঠায় ননিলালের দিন কাটিতে লাগিল। সকল চিন্তা, সকল ভাব, সকল উৎকণ্ঠার বর্ণনা-প্রসঙ্গে আমাদের প্রয়োজন নাই। যে দুই একটী আছে,—এস্থলে তাহারই আলোচনা করা গেল।

ননিলালের এক চিন্তা—সে পাড়াগেঁয়ে, পাড়াগেঁয়ে লোকের মত তাহার বেশ-ভূষা, তজ্জন্য সহরের বাবুরা তাহাকে একটু অমর্য্যাদা করে! তবে কি সে বেশ-ভূষার পরিবর্ত্তন করিবে? মাথার চুল কাটিয়া সম্মুখের দিকে লম্বা আর পশ্চাতের দিকে ছোট করিবে? চক্ষুতে কি অন্ততঃ এক যোড়া আট আনা দামের নীল চশমা লাগাইবে,—হাতে কি এক গাছি তৃণসম ক্ষীণকলেবর যষ্টি যখন তখন লইয়া ফিরিবে? কাপড়-চোপড় কি সদা কোচান—সদা ধৌত ব্যবহার করিবে? তাহাতে কি মানুষের মর্য্যাদা বাড়ে?

ননির এ চিন্তার শেষ হইত না—এ চিন্তার মীমাংসা হইত না। সে শুনিয়াছে—মানুষের মর্য্যাদা বাড়ে গুণে। গুণ কি? সত্য, বিনয়, বিদ্যা, স্বদেশ-হিতৈষণা প্রভৃতি। ঘড়ি ছড়ি টেড়ি চশমা প্রভৃতিতে মর্য্যাদা বাড়িবে কেন? তবে তাহার ও সকলে প্রয়োজন নাই?

আছে বৈ কি! নতুবা যে সমাজে সে গতায়াত করিতেছে, তাহারা যে পসন্দ করে না। কখন কখন মনে হইত—নাই বা করিল। তাহাদের সহিত সম্বন্ধ—কয়টী রজত-মুদ্রার। ছেলে পড়ানর বিনিময়ে সেই কয়টী রজত-মুদ্রা প্রদান করিবে বৈ ত নয়। এক পয়সাও ত অমনি দিবে না। তবে তাহাদের জন্য অত কেন? আর সেরূপ করিতে পয়সা চাই! পয়সা কোথায়? মা ও স্ত্রীর জন্যে মাসে যাহা পাঠান হয়, ওরূপে বাবুগিরি করিতে গেলে তাহা আর পাঠান হয় না। তারা খাবে কি? অতএব মীমাংসা করিত—বাবুগিরির জন্য—ফ্যাসানের জন্য কখনই মাতা ও স্ত্রীর মুখের গ্রাস কাড়িয়া লওয়া হইবে না। কিন্তু সে মীমাংসা বজায় থাকিত না।

ননিলাল যখন ছাত্রকে অধ্যয়ন করাইতে যাতায়াত করিত, তখন প্রায়ই পার্শ্বের গৃহে প্রলম্বিত পর্দ্দান্তরালে একটী সুন্দরী রমণীকে দেখিতে পাইত। প্রায়ই সে সুন্দরীর আকর্ণ-বিশ্রান্ত নয়নের দৃষ্টি তাহার পাড়াগেঁয়ে 'এলো-মেলো' বেশ-ভূষার উপরে পতিত হইত!

সে কি মনে ভাবে! সে যদি মনে মনে ননিকে পাড়াগেঁয়ে ভূত বলিয়া ভাবে, তবে ত ননির বাঁচিয়া কোন লাভ নাই। তবেই ত বেশ-ভূষার একটু পরিবর্ত্তন আবশ্যক। কিন্তু বেশ-ভূষা ভাল করিতে গেলে, বাড়ী আর কিছুই পাঠান হয় না। বাড়ী না পাঠাইলে তাহারা খাইবে কি!

অতঃপর ক্রমে ক্রমে দাঁড়াইল এই যে,—যাহাতে পয়সা ব্যয় নাই, অথচ একটু সভ্য-ভব্য হওয়া যায়, এমন করিলে দোষ কি!

প্রথমে চুল কাটা! সমান করিয়া চুল কাটিতেও যা দক্ষিণা, ছোট বড় করিয়া কাটিতেও তাই। অতএব ননি ঘাড়ের দিকে ছোট আর সাম্‌নের দিকে বড় করিয়া চুল কাটিয়া লইল।

মেসের সঙ্গিগণ যখন তাহা দেখিয়া হাসিয়া বিদ্রূপ করিল, তখন সে কৈফিয়ৎ দিল—"পরামাণিক ঐরূপ করিয়া ফেলিয়াছে।" ক্রমে দাড়ি রাখিয়া ফ্রেঞ্চকাটে ছাটা হইল।

তারপরে ধীরে ধীরে মাসে মাসে মাতা ও স্ত্রীর জন্য যে টাকা পাঠান হইত, তাহা কমিতে লাগিল। কেন না, তখনকার বুদ্ধিতে এই দাঁড়াইয়াছিল যে, ভদ্রতা রক্ষা করিয়া কলিকাতায় না থাকিতে পারিলে ত আর রোজগার হইবে না! অতএব কাপড়খানা চোপড়খানা চাই!

ভাব-বিপর্য্যয় ক্রমে এইরূপ দাঁড়াইতেছিল যে,—ননিলাল এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় শীঘ্র স্নান করিয়া উঠিতে পারে না। কলতলায় স্নানার্থে বসিয়া অন্ততঃ দুই ঘণ্টা গাত্রমার্জ্জনাদি না করিলে পোষায় না। তৎপরে মস্তকের কেশের পারিপাট্য—শ্মশ্রুগুল্‌ফের বিন্যাস প্রভৃতি কার্য্যে অনেক সময় ব্যয়িত হয়। এত দিন পরে ননির জামার পকেটে রুমাল উঠিয়াছে—রুমালে সুগন্ধি দ্রব্যের ছিটা ফোটাও যে নাই, তাহাও নহে। ফলকথা, ননিলাল অঙ্গপ্রসাধনে দিবসের অধিকাংশ সময়ই ব্যয়িত করিতে লাগিল। মেসের বান্ধবেরা এ পরিবর্ত্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিত—আমাদের সাহেব এরূপ না দেখিলে বকেন। তিনি 'ময়লা আদমী' দেখিতে পারেন না।

উৎকণ্ঠা কিসের? এইবার এক বিষম সমস্যা—কি বলিয়া বুঝাইব, কিসের উৎকণ্ঠা। যাহা বলিব,—তাহার হয় ত সেরূপ কোন প্রমাণ দেখাইতে পারিব না—তখন পাঠক-পাঠিকার 'জেরায়' আমায় 'নাস্তা-নাবুদ' হইতে হইবে।

ননিলাল ছাত্র আর্য্যকুমারের সঙ্গীত-শিক্ষক দেবদাস বাবুর নিকটে হারমোনিয়ম বাজাইতে শিক্ষা করিতেছিল। সেদিন যখন দেবদাসবাবু মুদিত নয়নে একটা গান গাহিতেছিলেন, আর ননিলাল হারমোনিয়মে বেলো করিতেছিল,—তখন ছাত্র আর্য্যকুমার হাসিতে হাসিতে গৃহে প্রবেশ করিল।

ননিলাল ছাত্রের হাসি দেখিয়া বেলো করিতে করিতেই জিজ্ঞাসা করিল,—"হাস্‌ছিস্ যে?"

আর্য্য। কে না হাসে?

ননি। কেন হাসছিস্ বল্ না?

আর্য্য। দিদির কথায়।

ননিলালের বুকের মধ্যে পড়িয়া হৃদ্‌পিণ্ডটা দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল। মনে হইল বুঝি—

"নাম পরতাপে যার ঐছন করিল গো—
অঙ্গের পরশে কি বা হয়।"

অনেক কষ্টে বক্ষঃস্পন্দন বিনিবারিত করিয়া ননিলাল জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার দিদি কি বলিলেন?"

আর্য্য। আপনার প্রশংসা করিলেন।

সঙ্গীত-শিক্ষক বাবুর মাথায় যেন একটা লৌহপিণ্ড পতিত হইল। গান বন্ধ করিয়া চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন—"কাহাকে প্রশংসা করিলেন?"

আর্য্য। স্যারকে।

দেবদাস। মিছে কথা—

আর্য্য। না মাষ্টার মশায়—মিছে নয় সত্যি। দিদি স্যারের পক্ষপাতী, আর তাইতে ত আমি হাসি চাপিতে পারি নাই।

দেবদাসবাবুর মুখ গম্ভীর এবং ননির মুখ প্রফুল্ল হইল।

গম্ভীরমুখে বিকৃত-কণ্ঠে দেবদাসবাবু বলিলেন,—"তোমার দিদি লেখা-পড়ায় এবং গান-বাজনা উভয়তেই সুপণ্ডিতা। তিনি স্যারের কোন্ গুণে প্রশংসা করেন?"

আর্য্যকুমার হাসিতে হাসিতে বলিল,—"দিদি পাগল। বোল্‌ছিলো স্যারের হাত বড় মিষ্টি—এখনও হারমোনিয়ম বাজাইতে শিখেন নাই,—তবু কেমন মিষ্টি লাগিতেছে।"

ননিলাল বলিল—"ঠাট্টা করিয়াছেন।"

দেবদাসবাবু চেয়ারের উপরে একটু ঝাঁকিয়া উঠিয়া বলিলেন—"তাই ঠিক ! নতুবা হারমোনিয়ম বাজনায় আবার হাত মিষ্টি কিগো !

আর্য্যকুমার বলিল,—"না ঠাট্টা নয় ! দিদি আপনার ভারি প্রশংসা করে। 'ললিতা' কাগজে আপনি কবিতা লেখেন ?"

ননি। হ্যাঁ, মধ্যে মধ্যে লিখি।

আর্য্য। দিদি তাই পড়ে—আর আপনার প্রশংসা করে।

দেবদাস বাবু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া অর্দ্ধনিমীলিত নয়নে বলিলেন—"কবিতা,—

আর্য্যকুমার বলিল,—"হাঁ, আমার দিদিও বেশ কবিতা লেখে।"

দেবদাস পূর্ব্বভাবেই বলিলেন,—"বর্ত্তমান নরনারীর মধ্যে ও একটা সংক্রামক ব্যাধিস্বরূপ দাঁড়াইয়াছে।"

ননিলাল ব্যগ্রোত্তেজিত ভাবে ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার দিদি কবিতা লেখেন ? কি কাগজে প্রকাশ হয় ?"

আর্য্য। অনেক কাগজেই তাঁর লেখা কবিতা প্রকাশ হয়। ললিতাতে থাকে।

ননি। কি নাম ?

আর্য্য। কবিতার নাম ?

ননি। না।

আর্য্য। দিদির নাম ?

ননি। হাঁ।

আর্য্য। ঊষাবালা।

ননি। ওঃ—আ'জ কা'লকার স্ত্রীলোকদের মধ্যে তিনি ত সর্ব্বজন-পরিচিতা। তিনি আমার অকিঞ্চিৎকর কবিতার প্রশংসা করেন—ইহা আমার পরম সৌভাগ্য।

দেবদাস বাবু কিঞ্চিৎ বিরক্তি, কিঞ্চিৎ তাচ্ছল্য, কিঞ্চিৎ হিংসার স্বরে বলিলেন—"সৌভাগ্য আপনার নিশ্চয়ই। নইলে হারমোনিয়মের রেলো করিয়া তাঁহার কাণে মাধুর্য্য-রসের অবতারণা করিতে পারেন !"

ইহা এক দিনের ঘটনা। মধ্যে মধ্যে এইপ্রকার এক-আধটা ঘটনা ঘটিত,—এবং সেই সকল ঘটনাপরম্পরায় ননিলালকে উৎকণ্ঠায় নিপাতিত করিয়া রাখিত! সে উৎকণ্ঠা ভালবাসার। ভালবাসে কি না!

ফলকথা, ননির দিন নানাভাবে সুখে-দুঃখে উৎসাহ-অবসাদে কাটিয়া যাইতে লাগিল। আর ক্রমে ক্রমে তাহার দৈহিক পারিপাট্য, পোষাক-পরিচ্ছদের পারিপাট্য ও চা'ল-চলনের পারিপাট্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহার ফলে বাড়ীতে যে টাকা পাঠাইত, ঠিক মাসে মাসে আর তাহা পাঠাইতে পারে না। প্রথম প্রথম এক মাস অন্তর, তারপরে দুই মাস অন্তর এবং বর্ত্তমানে তিন চারি মাস অন্তর বাড়ীতে টাকা পাঠাইতে লাগিল। মাতা ও পত্নীর জন্য মাসে মাসে যাহা যাইত, তাহা ব্যসনে ব্যয়িত হইতেছিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

কৌশল-জাল।

ননিলাল যখন প্রাগুক্তরূপে কলিকাতার 'নোনা-জলে' জরিয়া জরিয়া মরিতেছিল, তখন তাঁহার বাড়ীতে অনেক ঘটনা ঘটিতেছিল। সে যখন কবিতা-রচয়িত্রী প্রেমপূর্ণহৃদয়া নবরস-রসিকার একটু তরল অনুগ্রহ-দৃষ্টির লাভাশায় নিত্য নূতন নূতন ব্যসনে বিনিযুক্ত ছিল, তখন তাহার জন্মভূমি ক্ষুদ্র পল্লীতলে পড়িয়া দুইটী রমণী বহুবিধ ঘটনাচক্রে ঘুরিতেছিল। আর একটী নরপিশাচ তাহাদিগকে ছলনা-জালে পাতিত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিল।

সেই কথা এখন একটু বলিব।

ননিলাল কলিকাতায় যাইবার পরদিবসই হীরালাল আসিয়া ননির মাতার নিকটে উপস্থিত হইল।

তখন বিকাল বেলা। সূর্য্যাস্তের অধিক বিলম্ব ছিল না।

হীরালাল আসিয়া হন হন করিয়া একেবারে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। তারপরে ননির মাতাকে ডাকিল।

তখন শাশুড়ী-বৌয়ে গৃহমধ্যে কি একটা কাযে ব্যাপৃতা ছিলেন। হীরালালের আহ্বানে তিনি বাহিরে আসিলেন।

হীরালাল একবার তীব্রদৃষ্টিতে গৃহপানে চাহিয়া তারপরে বলিল;—"আপনি যে সকল লোকের নিকট খাজনার টাকা পাওনার কথা বলিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই প্রায় তত টাকা বাকি অস্বীকার করে।"

ননিলালের মাতা চমকিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন,—"না বাবা, তাদের কথা শুনিয়ো না। যার কাছে যা বাকি আছে, লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাই ঠিক। যে প্রজায় যখন যা দেয়, তখনই আমি বৌমাকে তাই বলি, বৌমা লিখিয়া রাখেন।"

হীরা। তাঁর ত ভুল হইতে পারে।

ন-মা। না বাবা, বৌমা বেশ ভাল লেখাপড়াই জানেন—তাঁর ভুল হয় না।

হীরা। তা হোক—প্রজাবেটারা অস্বীকার করুক, আমি আদায় না করিয়া ছাড়িব না। আমি কি আর যে সে লোক যে, আমার নিকটে চালাকি করিয়া কাটাইয়া যাইবে।

ন-মা। তা কি আর আমি জানি না! তবে কি জান বাবা, আমাদের বড় অভাব হইয়াছে—

কথার অসমাপ্তি অবস্থাতেই হীরালাল বলিলেন,—"কিসের অভাব খুড়ী মা ঠাক্‌রুণ;—আমি ত আছি। যখন যার অভাব হইবে, আমাকে বলিবেন—সে কথা ত আমি আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই দশ টাকার একখানা নোট আমার নিকটে আছে, আ'জ তাই রাখুন—এর দ্বারায় যে কয় দিন চলে চলুক, তারপরে আবার দেব।

ন-মা। না বাবা, কর্জ্জ করাকে আমরা বড় ভয় করি! উপোস দিয়ে থাকি, তবু ধার-কর্জ্জের দিকে যাই না।

হীরা। ও কি আর কর্জ্জ কাকীমা!

ন-মা। তবে দিলে কেন?

হীরা। খাজনা আদায় ক'রে পাছে আমি কেটে নেব।

ন-মা। তবে ভাল বাবা, তবে ভাল। আমাদের শাশুড়ী-বৌয়ের এতেই প্রায় একমাস কেটে যাবে। আর এর মধ্যে ননিও কিছু পাঠাবে।

হীরা। ননি আগে মাসে মাসে বাড়ীতে টাকা পাঠাত, এখন পাঠায় না কেন?

ন-মা। তার বোধ হয় মাইনে পেতে, এখন গৌণ হয়।

হীরা। গৌণ হ'লেও ত মাসের একটা নির্ণীত সময়ে টাকা পায়, আর নির্ণীত সময়ে টাকা পাঠাইতে পারে।

ন-মা। তবে বোধ হয়, টাকা দিতে ঐ রকম অসময় করিয়া ফেলে।

হীরা। সময়েরই নয় গোলযোগ করে, মাহিনের ত একটা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা আছে।

ন-মা। তা' আছে বৈ কি।

হীরা। তবে সকল মাসে সমান টাকা পাঠায় না কেন?

ন-মা। বাছার আমার মাইনে কম—খেয়ে-দেয়ে যে মাসে যেমন থাকে, সে মাসে সেইরূপ পাঠায়।

হীরা। ও পাড়ার প্রবোধ কলিকাতায় গেছিল।

ন-মা। ননির সঙ্গে তার দেখা হ'য়েছিল কি?

হীরা। হ্যাঁ, হ'য়েছিল।

ন-মা। ননি আমার ভাল আছে ত?

হীরা। ভাল আছে, তবে—

ন-মা। তবে কি বাবা?—সে আমার অন্ধের নয়ন। বল বাবা—তার কি হ'য়েছে?

হীরা। না না অন্য কিছু হয় নাই। বোধহয়, চরিত্র একটু বিগড়েছে।

ন-মা। সে কি? তার চরিত্র যে দেবতুল্য—

হীরা। তাই ছিল—

ন-মা। এখন সে কি করে? কোন নেশা-টেশা করে? বেশ্যালয়ে যায়?

হীরা। না—এখনও তা' কেউ জান্‌তে পারে নি। তবে তার মেসে বন্ধুগণ সেইরূপ আশঙ্কা করেন।

ন-মা। সে আশঙ্কা কিসে করে?

হীরা। হঠাৎ তার পোষাক-পরিচ্ছদ কিছু উঁচু হইয়া পড়িয়াছে। আ'জকা'ল সর্ব্বদাই বাবুগিরি—বাবুগিরির উপরেই থাকে।

ন-মা। বালাই,—এর জন্যে চরিত্র খারাপ বলিয়া স্থির করা যায় কিসে! এখন বয়স কাল, এখন দেহের পরিপাটী—কাপড়-চোপড়ের পরিপাটী—মানুষে এ করিয়াই থাকে। ননি আমার অতি সৎ ছেলে।

হীরা। ননি বৌ-ঠাকুরুণকে কি তেমন ভালবাসে না—খুড়ী মা ঠাকুরণ?

ন-মা। সে কি হীরু! ওসব কথা তুমি কেন বলিতেছ? বৌকে সে প্রাণের চেয়ে ভালবাসে!

হীরা। বলিব—আ'জ থাক্, আর এক দিন বলিব। আ'জ একটু ব্যস্ত আছি—এখন চলিলাম।

হীরালাল আর দাঁড়াইল না, সে তখনই চলিয়া গেল।

হীরালাল যখন চলিয়া গেল, তখন শাশুড়ী-বধূ একত্র হইল।

ক্রমশঃ।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

প্রবাসী যুবক।

(১)

"স্নেহের পুত্রটী অতি,
পীড়িত র'য়েছে গৃহে।
দেখিতে না পাই তারে,
পড়িয়া চাকুরি-মোহে॥

(২)

ছুটীর জন্যেতে আমি,
করিয়াছি আবেদন।
সপ্তাহ অতীত-প্রায়,
না মিলে তার বিবরণ॥

(৩)

এ হেন বিপদে কর্ত্তা,
ক'রে কিনা ক'রে কাণ।
না জানি অদৃষ্টে কিবা,
লিখিয়াছে ভগবান॥

(৪)

উচাটিত চিত্ত মোর,
হেরিবারে পুত্র-মুখ।
ছুটীর আশায় কত
বাঁধিয়া রহিব বুক॥"

(৫)

প্রবাসী যুবক এক,
এরূপ চিন্তিছে বসি।
হেন কালে পোষ্টম্যান,
পৌঁছিল তথায় আসি॥

(৬)

যুবকের হস্তে দিল,
খামাবৃত পত্রখানি।
তাড়াতাড়ি খুলে যুবা,
কর্ত্তার প্রেরিত জানি॥

(৭)

খুলিয়া পত্রের অঙ্গ,
দেখে যুবা তাকাইয়া।
তারি আবেদন পত্র,
প্রভু দিলা পাঠাইয়া॥

(৮)

অমনি যুবার দৃষ্টি,
পত্রের কোণেতে যায়।
"নট্ গ্রান্‌টেড্" লেখা,
রঙ্গীন কালীতে হায়!

(৯)

দেখিয়া কর্ত্তার কর্ম্ম,
গভীর বেদনা পেয়ে।
আচম্বিতে উঠে যুবা,
উচ্চকণ্ঠে ফুকারিয়ে।—

(১০)

"ধিক্ ধিক্ পরাধীনে,
কি কায তাহার প্রাণে।
দাসত্ব-শৃঙ্খলে যেবা,
বাঁধা থাকে নিশিদিনে॥

(১১)

পিতা মাতা, ভ্রাতা বন্ধু,
গৃহ আদি পরিবার।
ত্যজিয়া প্রবাসে থাকে,
কিবা সুখ বল তার॥

(১২)

পরাধীনে কাটি কাল,
অর্থের কুহকে পড়ি।
হারাইয়া স্বাধীনতা,
পরিয়া দাসত্ব-বেড়ী॥

(১৩)

দিনান্তে শাকান্নভোজী,
স্বাধীনতা যদি রয়।
পরাধীন কোটী-পতি—
হ'তে সে উত্তম হয়॥

(১৪)

তাহার গৌরব যশ,
ঘোষে সদা দশদিক্।
স্বাধীনতা-হীনতায়,
যে আছে তাহারে ধিক্॥

(১৫)

এতেক বলিয়া যুবা,
কাগজ কলম ল'য়ে।
কর্ম্মের জবাব পত্র,
লিখি দিলা পাঠাইয়ে॥

(১৬)

বিপদবারণ নাম,
স্মরণ করিয়া মনে।
করিল সে শুভ-যাত্রা,
আপনার গৃহপানে॥

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস।
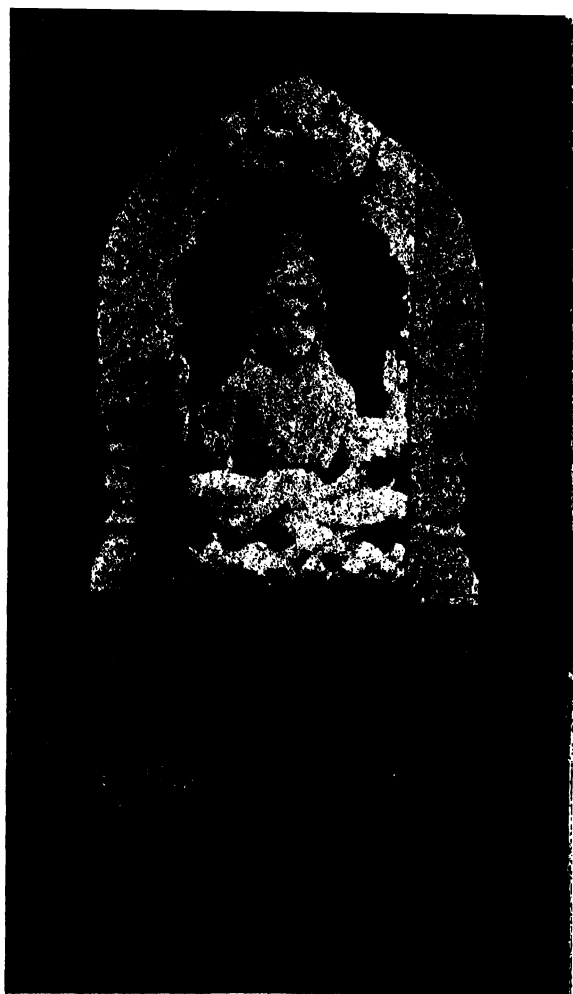
গয়ার সরস্বতী মূর্ত্তি।

ফলকথা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে যে, সূর্য্যসিদ্ধান্ত বা সিদ্ধান্তশিরোমণি গ্রন্থে তিথি ও তিথিমান নির্দ্ধারণের একটীমাত্র উপায় আছে। গ্রহলাঘব-নামক গ্রন্থ হইতেও সেই উপদেশই প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথাঃ—

ভক্তা ব্যর্কবিধোর্ল বা যমকুভির্যাতা তিথিঃ স্যাৎ ফলং।

শেষং যাতমিদং হরাৎ প্রপতিতং ভোগ্যং বিলিপ্তান্তয়োঃ॥ ইত্যাদি।

পাঠকগণ শ্লোকটীর টীকার প্রতি লক্ষ্য করিলেই সমস্ত অবগত হইতে পারিবেন।

"এবং স্পষ্টার্কোদয়কালীনৌ স্পষ্টৌ সূর্য্যাচন্দ্রৌ কৃত্বেদানীং তিথি-নক্ষত্র-যোগকরণসাধনং বৃত্তদ্বয়েন করোতি। ভক্তাইতি। তদিতি। বিগতোঽর্কঃ সূর্য্যো যস্মাদেবম্ভূতো যো বিধু শ্চন্দ্রস্তস্য লবা রাশীন্ ত্রিংশতা সঙ্গুণ্য ভাগেষু সংযোজ্য সর্ব্বে ভাগাঃ কার্য্যাঃ। তে যমকুভির্দ্বাদশভির্ভক্তাঃ সন্তো যৎ ফলং তত্তুল্যা যাতা তিথিঃ স্যাৎ, যচ্ছেষং তদপি যাতং তং হরাৎ দ্বাদশমিতাৎ পতিতং শোধিতং সৎ ভোগ্যং স্যাৎ। তয়োর্গতগম্যয়ো র্বিলিপ্তা বিকলা ভুক্ত্যোঃ সূর্য্যচন্দ্রগত্যোর্যদন্তরং তেন ভাজিতা লব্ধং যাতৈষ্যকা ঘটিকাঃ ক্রমাদ্ ভবন্তি। যাতকলাসু হৃতাসু যাতঘটিকাঃ পূর্ব্বদিনে তস্যা এব তিথে-র্ভুক্তঘটিকাঃ স্যুঃ। এবমেষ্যকলাসু এষ্যাঃ তস্মিন্ দিনে সূর্য্যোদয়মারভ্য তিথের্ঘটিকাঃ স্যুরিত্যর্থঃ।" ইত্যাদি।

টীকাটীর মুখবন্ধেই বলা হইয়াছে যে, তিথ্যানয়ন করিতে হইলে স্পষ্ট রবিচন্দ্র নির্দ্ধারণ আবশ্যক। ইহার পাঁচটী শ্লোক পূর্ব্বেই সে বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে। যথাঃ—

বিধোঃ কেন্দ্রদোর্ভাগষষ্ঠোননিঘ্নাঃ

খরামাঃ পৃথক্ তন্নঘাংশোনিতৈশ্চ।

রসাঙ্কহৃতাস্তে লবাদ্যং ফলং স্যা-

দ্রবীন্দু স্ফুটৌ সংস্কৃতৌ স্তশ্চ তাভ্যাং॥

অতএব স্পষ্ট রবিচন্দ্র নির্দ্ধারণপূর্ব্বক তিথি সাধনাদি করাই শাস্ত্রানু-মোদিত। উদাহরণ যথা ঃ—

ভক্তাইতি, তৎসৈকমিতি। তত্রাদৌ তিথিসাধনং। ব্যর্কবিধোঃ বিগতোঽর্কোযস্মাৎ অসৌ ব্যর্কঃ এবম্বিধশ্চন্দ্রঃ রবিহীনচন্দ্র ইত্যর্থঃ।

রবিঃ ১।৫।৪২।৩৭। চন্দ্রঃ ৬।২৪।১৫।৩। রবিরহিতশ্চন্দ্রঃ ৫।১৮।৩২।১৬। অস্যভাগাঃ ১৬৮।৩২।১৬ যমকুভিঃ ১২ ভক্তাঃ ফলং জাতং গততিথয়ঃ ১৪ অত্র চতুর্দ্দশবিদ্যমানত্বাৎ আগতা পূর্ণিমা শেষং জাতং গতসংজ্ঞকং। শেষং ০।৩২।২৬ ইদং হরাৎ ১২ শোধিতং জাতং ভোগ্যং ১১।২৭।৩৪। চন্দ্রগতিঃ ৮১৯।০ রবিগতিঃ ৫৭।৩৬ তয়োরন্তরং ৭৬১।২৪ ষষ্টিগুণং জাতোভাজকঃ ৪৫৬৮৪ ভাগস্য ষষ্টিগুণত্বাদ্ গতালিপ্তাঃ লিপ্তায়াঃ ষষ্টিগুণত্বাৎ গতবিলিপ্তাঃ ১৭৪৬ ষষ্টিগুণিতা ১১৬৭৬ ভাজকেন ভক্তা লব্ধা গতঘটিকাঃ ২ পলানি ৩৩। অথ এষ্যঘটিকার্থং ভোগ্যং বিকলাঃ ৪১।২৫।৪ ষষ্টিগুণিতা ২৪৫২৪০ ভাজকেন ভক্তা লব্ধা এষ্যঘটিকাঃ ৫৪। পলানি ১০।

এই প্রণালীলব্ধ ফল স্ফুটতিথি বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই বটে, কিন্তু ইহা সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্তশিরোমণি-গ্রন্থানুমোদিত তিথি এবং গ্রহলাঘব সপ্তমাধ্যায়ে চন্দ্র-গ্রহণাধিকারে এই তিথিই ব্যবহৃত হইয়াছে। 'ভক্তা ব্যর্ক' ইত্যাদি শ্লোক রবিচন্দ্র-স্পষ্টীকরণ পঞ্চাঙ্গানয়নাধিকারাধ্যায়ে পাওয়া যায়। এবং এই তিথিই পঞ্চমাধ্যায় চন্দ্রগ্রহণাধিকারে ব্যবহৃত হইয়াছে। বিশ্বনাথ দৈবজ্ঞবিরচিত উদাহরণ গ্রন্থ দেখিলেই এ বিষয়ের সত্যাসত্য বা যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

এই স্থলে আর একটী কথা উল্লেখযোগ্য। আমাদের পূর্ব্বপরিচিত তিথিনির্দ্ধারণ প্রণালী অনুসরণ করিয়া গ্রহণ-সম্ভাবনা স্থির করিবার পর গ্রহণের মধ্যকাল নির্ণয়ের জন্য গণেশ দৈবজ্ঞ যে উপদেশ দান করিয়াছেন, তাহা এই :——

> তিথিবিরতিরয়ং গ্রহস্য মধ্যঃ
> স চ রহিতঃ সহিতো নিজস্থিতিভ্যাম্।
> গ্রহণমুখবিরাময়োস্ত কালা-
> বিতি পিহিতাপিহিতে স্বমর্দ্ধকাভ্যাম্॥

তিথের্গণিতাগতায়াঃ বিরতিঃ অতঃ অয়ং গ্রহস্য গ্রহণস্য মধ্যঃ.........

ইত্যাদি।

এই শ্লোকটী পড়িয়া সূর্য্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থের "স্ফুটতিথ্যবসানে তু মধ্যগ্রহণমাদিশেৎ" ইত্যাদি শ্লোক স্মরণ করিলেই পাঠকগণ স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারি-

বেন যে, উভয় শ্লোকেরই মর্ম্মার্থ সমান—এক, এবং স্ফুটতিথি শব্দের অর্থ যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা ঠিক কি না, তাহাও বিচার করিতে পারিবেন।

গ্রহলাঘব গ্রন্থের ষষ্ঠাধ্যায় সূর্য্যগ্রহণাধিকার। এই অধিকারেও পূর্ব্ব-পরিচিত তিথিই ব্যবহৃত হইয়াছে। স্ফুট বা অতিস্ফুট তিথির উল্লেখ আবশ্যক হয় নাই। তবে সূর্য্যগ্রহণে অবশ্য কর্ত্তব্য নত ও লম্বন সংস্কার আছে। কিন্তু অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে সকল পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্তশিরোমণি গ্রন্থের নতানয়নের উপদেশক বচনকে তিথ্যানয়নোপযোগী বলিয়া শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা গ্রহলাঘব গ্রন্থের নত ও লম্বন সংস্কার সম্বন্ধে কোন উল্লেখই করেন না।

গ্রহলাঘব গ্রন্থে স্ফুটতিথির উল্লেখ দুই স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম উল্লেখ "মাসগণনাদেব গ্রহণদ্বয়-সাধনাধিকার" নামক সপ্তমাধ্যায়ে এবং দ্বিতীয় উল্লেখ "পঞ্চাঙ্গানয়নচন্দ্রগ্রহণসাধনাধিকার" নামক পঞ্চদশ অধ্যায়ে। এই দুইটীর বিষয় বলিবার পূর্ব্বে গ্রহলাঘব গ্রন্থ সম্বন্ধে পাঠকের কিছু পরিচয় অবগত হওয়া আবশ্যক। মহামতি গণেশ দৈবজ্ঞ লঘুক্রিয়াদি দ্বারা প্রত্যক্ষ ফল-প্রদ জ্যোতিঃশাস্ত্র সাধারণ জনগণের বোধগম্য করার উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, অর্থাৎ জ্যোতিঃশাস্ত্র বড়ই জটিল, সহজ-বোধ্য নহে; অল্পায়াসে অল্প পরিশ্রমে মানবগণ যাহাতে এই দুর্ব্বোধ্য জ্যোতিঃশাস্ত্র সহজে বুঝিতে পারে, ইহাই গণেশ দৈবজ্ঞের গ্রন্থ-রচনার কারণ। এই জন্য গ্রন্থারম্ভেই বলিয়াছেনঃ—

পরিভগ্নসমৌর্ব্বিকেশচাপং
দৃঢ়গুণহারলসৎ সুবৃত্তবাহু।
সুফলপ্রদমাত্তনুপ্রভং তৎ
স্মর রামং করণঞ্চ বিষ্ণুরূপম্॥

অনন্তর প্রাচীন গ্রন্থসকল হইতে ইহার বিশিষ্টতা বলিবার অভিপ্রায়ে এবং গ্রন্থারম্ভের প্রয়োজন দেখাইবার জন্যই "যাবৎ প্রয়োজনং নোক্তং তাবৎ তৎ কেন গৃহ্যতে" ইত্যাদি বৃদ্ধোপদেশ স্বীকার করিয়া—বলিতেছেন ঃ—

যদ্যপ্যকার্ষুরুরবঃ করণানি ধীরা-
স্তেষু জ্যকাধনুরপাস্ত ন সিদ্ধিরস্মাৎ।
জ্যাচাপকর্ম্মরহিতং সুলঘুপ্রকারং
কর্ত্তুং গ্রহপ্রকরণং স্ফুটমুদ্যতোঽস্মি॥

গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, পূর্ব্বাচার্য্যগণ তাঁহাদের গ্রন্থে জ্যা ও ধনু নিবদ্ধ করিয়াছেন, এই দুইটী পরিত্যাগ করিলে তাঁহাদিগের গ্রন্থসিদ্ধি হয় না, এবং এ দুইটী কার্য্য তত সহজসাধ্যও নহে। সেই জন্য আমি ঐ দুইটী পরিত্যাগ করিয়া গ্রন্থরচনা করিতেছি, সুতরাং ইহা সুলঘু প্রকার হইবে। মল্লারি এই শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—"যত্র কল্পাদে-গ্র্হানয়নং স সিদ্ধান্তঃ, যত্র যুগাদেগ্র্হানয়নং তৎ তন্ত্রম্, যত্র শকাৎ গ্রহানয়নং তৎ করণম্। গ্রহ-করণমিত্যনেন শকাদ্ গ্রহানয়নং করোমীতি সূচিতম্"। অন্যত্র আরও বলিয়াছেন যে, গ্রহণ, উদয়াস্ত এবং জাতকাদিতে বহুগ্রন্থ হইতে গ্রহগণের সাধন করিতে হয়, ইহা অতি কষ্টকর দেখিয়া আচার্য্য মহোদয় লাঘবার্থ এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন ; ইত্যাদি।

গ্রন্থারম্ভের পর গ্রন্থে প্রযোজ্য কতকগুলি সংজ্ঞা উপদিষ্ট হইয়াছে। যথা—চক্র, অহর্গণ, মাসগণ ইত্যাদি। মল্লারি এস্থলেও বলিয়াছেন যে, আচার্য্য গণনার লাঘবার্থ এবং শিষ্যপ্রশিষ্যগণের ক্লেশ-বিনাশার্থ চক্রমাসাদির বিধান করিয়াছেন। উদাহরণ যথা, বিশ্বনাথ দৈবজ্ঞকৃত—

শকাব্দাঙ্ক ১৫৩৪ অয়ং দ্ব্যব্ধীন্দ্রো-১৪৪২ নিতঃ জাতো বর্ষসমূহঃ ৯২ অয়মেকাদশভিঃ ১১ ভক্তঃ ৮ একস্থং ফলং চক্রসংজ্ঞং ৮ শেষং ৪ দ্বাদশভিগুর্ণিতং ৪৮ চৈত্রমারভ্যেষ্টকালপর্য্যন্তমেকো গতমাসঃ ১ এতেন যুতং ৪৯। ইদং দ্বিঃস্থং ৪৯ চক্রং ৮ দ্বিগুণং ১৬ এতৎসহিতং ৬৫ দশ ১০ যুক্তং ৭৫ ত্রয়স্ত্রিংশদ্ভি ৩৩ র্ভক্তং ফলমধিমাসাঃ ২ অনেন দ্বিঃস্থং ৪৯ যুক্তং জাতো মাসগণঃ ৫১ ইত্যাদি।

গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায় পর্য্যন্ত প্রাচীন উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক গ্রহণ সাধিত করিয়া সপ্তম অধ্যায় হইতে গ্রন্থকার স্বীয় অভিনব প্রণালীর বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছেন। যথা—

অথ মাসগণাৎ সুলঘুক্রিয়য়া গ্রহণদ্বয়-
সিদ্ধিকৃতেঽভিদধে।
স্ফুটসূর্য্যবিপাততিথীংশ্চ বপুগ্র্সনাদি—
বিশেষচমৎকৃতয়ে ॥

বপু—বিম্ব, গ্রসন—গ্রাস।

সপ্তমাধ্যায়ে মাসগণ হইতে ইষ্ট তিথি আনয়নের উপদেশ আছে, এবং উক্ত প্রণালী অনুসারে আনীত তিথি হইতে স্পষ্ট তিথি আনয়নের উপদেশও আছে। সেই উপদেশটী এই যে, মাসগণের দ্বারা পূর্ব্বানীত যে তিথি,

উহাকে স্পষ্ট তিথি করিতে হইলে রবি ও চন্দ্রের মন্দফল সাধনা করিতে হইবে। এই সাধনা হইলে রবি ও চন্দ্রের স্পষ্ট স্থির হইবে এবং এই ফল-স্থির করিয়া পূর্ব্বোক্ত তিথি সংস্কার করিলে যে তিথি পাওয়া যাইবে, তাহাকেই এস্থলে স্ফুটতিথি বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ এই তিথি ও "ভক্তা ব্যর্ক" ইত্যাদি শ্লোকোল্লিখিত তিথির মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই। শ্লোকগুলি পাঠ করিয়া দেখিলে অনায়াসেই তাহা অনুমিত হইয়া থাকে। অথেষ্ট-তিথি সাধনমাহ—

অভিমততিথিসিদ্ধৌ প্রাক্‌পরে যাস্ত তিথ্যঃ
স্বযুগরসলবোনাঃ শ্চালনং স্যাদ্দিনাদ্যে।
স্বযুগগুণলবোনাঃ স্যাল্লবাদ্যং দিনেশে
স্বগুণনবলবোনা বিশ্বনিঘ্নাশ্চ রুতে॥ (৭।৯)

ইহার পরেই "অথ রবিস্পষ্টার্থং তিথেরপি স্পষ্টার্থং সূর্যাচন্দ্রয়ো মন্দফলে সাধয়তি। "অত্যষ্টেতি……নাড্যঃ স্যুরিতি।" স্পষ্টতিথির দ্বিতীয় উল্লেখ পঞ্চাঙ্গানয়ন চন্দ্রগ্রহণ-সাধনাধিকারনামক পঞ্চদশাধ্যায়ে আছে। সে স্থলেও মাসগণ হইতে মধ্যতিথি আনয়ন করিয়া রবি ও চন্দ্রের মন্দ ফলের দ্বারা সাধিত তিথিকে স্পষ্ট-তিথি বলা হইয়াছে। সুতরাং সেই তিথি ও সপ্তমাধ্যায়োল্লিখিত তিথির মধ্যে কোনও প্রভেদ পরিলক্ষিত হয় না। এস্থলে এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি কোন প্রভেদই না থাকে, তাহা হইলে তিন স্থানে তিথি আনয়নের উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে কেন? ইহার উত্তর আমরা উপরেই দিয়াছি। তিথ্যানয়নের প্রথম অর্থাৎ দ্বিতীয় অধ্যায়োল্লিখিত উপদেশ প্রাচীন শাস্ত্রসম্মত, ইহা রবিমন্দ ও চন্দ্রমন্দ দ্বারা সংস্কৃত করিয়াই গণনা হইয়া থাকে। এবং এই দুই সংস্কারের দ্বারা সাধিত তিথি যদি স্ফুট-তিথি হয়, তাহা হইলে এই তিথিও স্ফুট-তিথি। সপ্তমাধ্যায়োল্লিখিত তিথি গণেশদৈবজ্ঞ স্বীয় অপূর্ব্ব ধীশক্তিপ্রভাবে মাসগণ হইতে করিয়া, উহাকে রবি ও চন্দ্রদ্বারা সাধিত করিয়া স্ফুট করিয়াছেন। অষ্টমাধ্যায় প্রথম শ্লোকে টীকায় অর্থাৎ "অথ পঞ্চাঙ্গাৎ গ্রহণদ্বয়সাধনমাহ" এইস্থলে বিশ্বনাথ দৈবজ্ঞ বলিয়াছেন—"অথবেতি। অথবা—প্রকারান্তরেণ" সুতরাং মাসগণ হইতে প্রকারান্তরে পঞ্চাঙ্গ-সাধন অষ্টম অধ্যায় হইতে আরম্ভ হইতেছে; পঞ্চদশাধ্যায়ও সেই প্রকারান্তরের অন্তর্গত বলিয়াই প্রতীয়মান হইয়া থাকে। এবং এই অধ্যায়ে যে তিথ্যানয়নের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে,

তাহাও রবি ও চন্দ্রমধ্য দ্বারা সংস্কৃত হইয়া স্ফুট নামে অভিহিত হইয়াছে। এক্ষণে অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গ বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, সর্ব্বপরিচিত তিথি ব্যতীত অন্য কোনও তিথির উল্লেখ শাস্ত্রে কোথাও আছে কি না? আমরা কিন্তু বহু অনুসন্ধানেও কুত্রাপি কিছুই লক্ষ্যের বিষয়ীভূত করিতে পারি নাই। যাঁহারা এ বিষয়ে সবিশেষ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা একটু অনুসন্ধান পূর্ব্বক মকরন্দকৃত টিপ্পনী আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেই সমস্ত অবগত হইতে পারিবেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীকালীকণ্ঠ কাব্যতীর্থ।

রোরুদ্যমানা রমণী।

কেন, রোমাঞ্চিত তনু, শিথিল বাঁধনি,
মুখারবিন্দ শিশির-ছাঁকা,
উজল কাজল অনিমিখ আঁখি,
বল কি লাগিয়ে বিষাদ-মাখা?

হৃদয়-আগার পরিশূন্যময়
স্ফীত হ'তেছে; কিবা অনুরাগি?
করতলদ্বয়ে চাপিছ বেদনা,
দহিছে মরম কিসের লাগি'?

কা'র পথবাহী', আবেশে উদাস—
একাকী বিজন-বিটপী-তলে
করিছ চরণ; কার অদর্শনে
তিতিছে বসন নয়ন-জলে?

শঠ-শিরোমণি— নাগর লো তব
শ্যামচন্দ্র সকলে জানে,
যাও বালা সাথে ল'য়ে ব্যথা-ধারা
ফিরিয়া কুঞ্জ-ভবন-পানে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষাল।

প্রাচীন নাটকের একটী দৃশ্য।

রাজবাড়ীর রঙ্গমঞ্চে আজ নূতন নাটকের অভিনয় হইবে, এই সংবাদ প্রচারিত হইয়া সমস্ত সহরকে যেন মাতাইয়া তুলিল। সন্ধ্যার পর হইতেই সহরের বালক যুবক ও বৃদ্ধসকল সুন্দর সুন্দর বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া দলে দলে আসিয়া রঙ্গালয় পূর্ণ করিতে লাগিল। রাজার আদেশে আজ নাট্যশালা সুন্দররূপে সাজান হইয়াছিল। চারিদিক হইতে নানাজাতীয় পুষ্পমালা-সকল শীতল বাতাসে আন্দোলিত হইয়া সুগন্ধে সেই বিপুল জনতার অশান্তি দূর করিতেছিল। অসংখ্য উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত নীলবর্ণের চন্দ্রাতপ সহস্রনক্ষত্র-খচিত নীল আকাশের মত দেখাইতেছিল। রঙ্গমঞ্চের সম্মুখে সুন্দর কারুকার্য্যখচিত আসনে রাজা রাজকুমারগণ এবং সম্ভ্রান্ত রাজ-পুরুষগণ আসিয়া উপবেশন করিলেন। ক্রমশঃ নগরের ভদ্র অভদ্র সকল শ্রেণীর লোকে রঙ্গস্থলে “ন স্থানং তিলধারণং” হইয়া উঠিল।

রাজার দক্ষিণ পার্শ্বে একখানি সুসজ্জিত আসনে যুবরাজ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রটীকে লইয়া অভিনয় দেখিতে বসিয়াছিলেন। তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া একটু লক্ষ্য করিলে বোধ হয় যে, তিনি কোনও এক কঠোর প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছেন।

রঙ্গমঞ্চের সম্মুখভাগে সূক্ষ্ম বস্ত্রাবৃত স্থানে মহিলাদের বসিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সেখানে রাজমহিষী আত্মীয়দিগকে সঙ্গে লইয়া অভিনয়ের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। রাজকুমারীগণ এবং রাজপুত্রবধূগণ নিজ নিজ রূপের প্রভায় আচ্ছাদনের বস্ত্রখানি উজ্জ্বলিত করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহাদের এক পার্শ্বে বিধবা রাজকন্যা মঞ্জরী মণিরত্নখচিত বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া উন্মনস্কভাবে কি চিন্তা করিতেছিল। রাজমহিষী আজ তাহার অকস্মাৎ এই বেশভূষার পারিপাট্য দেখিয়া মধ্যে মধ্যে বিস্মিতা হইতেছিলেন, কিন্তু তাহার বৈধব্য দুঃখ স্মরণ করিয়া নীরবে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

ক্রমশঃ পুরাতন দুইখানি নাটকের অভিনয় শেষ হইয়া রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময় যখন নূতন নাটক আরম্ভ করিবার জন্য সাঙ্কেতিক ঘণ্টাধ্বনি হইল; তখন ধীরে ধীরে যবনিকা অপসারিত হইয়া নাটকের প্রথম ‘প্রস্তাবনা’ দৃশ্য সকলের সম্মুখে উপস্থিত হইল। সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের মত দেখিতে লাগিল,—

সম্মুখে একটী উচ্চচূড় পর্ব্বতের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষগুলি সান্ধ্য সূর্য্যের লোহিত কিরণে রঞ্জিত হইয়া সুন্দর দেখাইতেছে। পর্ব্বতের উপর হইতে একটী ঝরণা অবিশ্রান্ত গতিতে নিম্নদিকে প্রবাহিত হইতেছে; সেই ঝরণার একপার্শ্বে একখণ্ড প্রস্তরের উপর সন্ন্যাসিবেশী সূত্রধার উপবেশন করিয়া, বীণাযন্ত্রের সহিত কণ্ঠ মিশাইয়া তারস্বরে নান্দীগীতি গাহিতে আরম্ভ করিল। দেবভাষায় দেবতার আশীর্ব্বাদময় স্তোত্রগীতি শ্রোতৃবর্গের অন্তস্থল ভক্তিরসে প্লাবিত করিয়া রঙ্গস্থল মুখরিত করিয়া তুলিল। চতুর্দ্দিক হইতে পুষ্পগুচ্ছের পবিত্র গন্ধে এবং সঙ্গীতের সেই প্রাণস্পর্শী মধুর ছন্দে মুগ্ধ শ্রোতাদের হৃদয়ে নান্দী-গীতির প্রত্যেক বর্ণ যেন দেবতার আশিষ্‌ধারা-রূপে বর্ষিত হইতে লাগিল।

সভাস্থ সকলকে চিত্রপুত্তলিকার মত স্তম্ভিত করিয়া নান্দীগীতির শেষ রাগিণী যখন ক্রমে ক্রমে মহাশূন্যে বিলীন হইয়া গেল; তখন সূত্রধার তাহার পত্নীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, অভিনেতাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া এবং যথানির্দ্দিষ্ট বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছে কি না? সূত্রধারী সমস্ত রাত্রি জাগিয়া অভিনয় করিয়াছে, এখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসি-য়াছে, এই সময় আবার নূতন অভিনয় আরম্ভ করিতে হইবে, ইহা শুনিয়া সে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া অসম্মতি প্রকাশ করিল। তাহাদের সমস্ত কথা সংস্কৃত ভাষায় হইতেছিল; সেকালের অধিকাংশ লোকেই সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করিত। সূত্রধারী অত্যন্ত অবসন্নদেহে সূত্রধারের বামপার্শ্বে প্রস্তরের উপর উপবেশন করিল। সূত্রধার অত্যন্ত বিনীতভাবে অথচ কর্ত্তব্যপরায়ণের মত প্রশান্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—

"গতা বহুতরা কান্তে স্বল্পা তিষ্ঠতি শর্ব্বরী।
ইতি চিত্তে সমাধায় কুরু সজ্জনরঞ্জনম্॥"

(প্রিয়ে! রাত্রির অধিকাংশই অতিবাহিত হইয়াছে, আর অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে এই কথা মনে করিয়া উপস্থিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের আনন্দবর্দ্ধন কর। অর্থাৎ এত দীর্ঘকাল ধৈর্য্য ধারণ করিয়া এই অল্প সময়ের জন্য অধীর হইও না।)

সূত্রধারের সেই প্রশান্ত কণ্ঠস্বর নিয়তির কোন্ অজ্ঞাত তারে যাইয়া প্রতিধ্বনিত হইল, তাহা কেহ বুঝিল না; কিন্তু শ্রোতৃবর্গের মধ্যে দুই ব্যক্তির হৃদয়ে সেই স্বর বজ্রগম্ভীরনাদে প্রতিধ্বনিত হইল। সেই দুইজনের মধ্যে একজন যুবরাজ, আর একজন বিধবা রাজকুমারী মঞ্জরী। সূত্রধারের দিগঙ্গুল-

মুগ্ধকারী নান্দীগীতি তাহাদের চিন্তাক্লিষ্ট চিত্তে স্থান পায় নাই, কিন্তু এই তাহার পত্নীর প্রবোধ-বাক্যের সহিত কোন অজানিত দৈবশক্তি নিহিত ছিল, যাহাতে তাহাদের হৃদয় এক অদম্য আনন্দস্রোতে ভরিয়া উঠিল। যুবরাজ আনন্দে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার হস্তস্থিত হীরকের অঙ্গুরীয়ক উন্মোচিত করিয়া সূত্রধারকে পারিতোষিক প্রদান করিলেন। রাজকুমারী মঞ্জরীও তাঁহার অঙ্গস্থিত সমস্ত আভরণ উন্মোচিত করিয়া পরিচারিকার হস্তে সূত্রধারকে পুরস্কার স্বরূপ পাঠাইয়া দিলেন।

রাজা দেখিলেন যে, সূত্রধারের চিত্তাকর্ষক মধুর সঙ্গীতে ইহাদের হৃদয় মুগ্ধ হইল না, আর এই সামান্য কথায় ইহারা এমন কোন্ রসের আস্বাদ পাইয়াছে, যাহার জন্য এরূপ আনন্দ প্রকাশ করিতেছে! রাজা এই বিষয়ে অত্যন্ত সন্দিহান হইলেন এবং এই প্রস্তাবনা-দৃশ্যের পটপরিবর্ত্তনের অবকাশে তিনি একটী নির্জ্জন কক্ষে প্রবেশ করিয়া সেইখানে যুবরাজ এবং রাজকুমারী মঞ্জরীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অবিলম্বে তাঁহারা আসিয়া বৃদ্ধ পিতার চরণে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। রাজা প্রথমতঃ যুবরাজকে এই অস্বাভাবিক আনন্দপ্রকাশ এবং পারিতোষিক প্রদানের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজার সেই দৃঢ়তাব্যঞ্জক প্রশ্ন শুনিয়া যুবরাজের চক্ষু প্রথমে ভীতির মলিনতায় আচ্ছন্ন হইল; তিনি মস্তক অবনত করিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাঁহার সেই ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। সত্যের বিমল জ্যোতিতে তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি পিতার চরণতলে পতিত হইয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—

"পিতঃ! আমি আপনার প্রশ্নের সত্য উত্তর দিতেছি, কিন্তু সেই সমস্ত কথা শুনিলে আমার প্রতি আপনার আজন্ম-সঞ্চিত স্নেহ দূরীভূত হইয়া অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধায় আপনার হৃদয় পূর্ণ হইবে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি; তথাপি আপনি আমার পিতা, আমার অন্যান্য সহস্র অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন, এই ভরসায় আমি আশা করি যে, আমার এ অপরাধটীও আপনি ক্ষমা করিবেন।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া যুবরাজ একবার পিতার মুখের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন—তিনি উৎকণ্ঠিতচিত্তে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। যুবরাজ আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন।

"পিতঃ! আপনি আমার পিতা, আমি আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র,—আপনার

এই সুবিশাল রাজ্যের ভাবী স্বত্বাধিকারী। আপনার এই অপ্রতিহত প্রতাপ এবং অসীম প্রভুত্বমর্য্যাদা দেখিয়া আমার চিত্তে রাজ্যশাসন করিবার ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু আপনি জীবিত থাকিতে আমার সে আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, আমি আপনার প্রাণনাশের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়াছিলাম; এমন কি, আজই রাত্রে এই অভিনয়ের শেষে আপনার পানীয় জলের সহিত বিষ মিশ্রিত করিয়া রাখিব—এই সঙ্কল্প স্থির করিয়াছিলাম। আমি অভিনয় দেখিতে দেখিতে সেই কথাই পুনঃপুনঃ চিন্তা করিতেছিলাম, এমন সময় সূত্রধার বলিয়া উঠিল—

"গতা বহুতরা কান্তে স্বল্পা তিষ্ঠতি শর্ব্বরী।
ইতি চিত্তে সমাধায় কুরু সজ্জনরঞ্জনম্ ॥"

এই কথা শুনিবামাত্র আমার জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত হইল। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলাম যে, বাস্তবিকই আপনার আয়ুর অধিকাংশ কালই অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে; এক্ষণে আর অল্পমাত্রই অবশিষ্ট আছে, আমি এত দীর্ঘকাল ধৈর্য্যধারণ করিয়া এই অল্প সময়ের জন্য অধৈর্য্য হইয়া কি ভয়ঙ্কর কার্য্যেই প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম! আজ এই সূত্রধার আমাকে পিতৃহত্যার পাপ হইতে রক্ষা করিয়াছে, এই মনে করিয়া আমি তাহাকে পারিতোষিক প্রদান করিয়াছি।"

যুবরাজ এই পর্য্যন্ত বলিয়া নিস্তব্ধ হইলেন। রাজা এই সমস্ত শুনিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন এবং কুমারী মঞ্জরীর দিকে চাহিয়া তাহার আভরণ প্রদানের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

মঞ্জরী তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা যুবরাজের এই আত্মপ্রকাশে অনেকটা সাহস পাইয়া অবনত মস্তকে লজ্জা এবং ভীতিজড়িত স্বরে পিতার নিকট বলিতে লাগিল।

"বাবা! আমার অন্তঃকরণ এতদিন অত্যন্ত কলুষিত ছিল। আজ সূত্রধারের কথায় আমার চিত্তের ভ্রম দূরীভূত হইয়াছে। আপনি যখন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তখন আর আমি সেই পাপ কথা গোপন করিয়া আরও পাপ বৃদ্ধি করিব না। আমি সমস্ত সত্য কথা আপনাকে বলিতেছি, আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন।"

এই বলিয়া সে পিতার চরণধূলি মস্তকে লইল এবং পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল।

"আমি বিধবা হইবার পর আপনারা যখন আমাকে রাজবাটীতে লইয়া আসিলেন, তখন আপনি, মা এবং অন্যান্য সকলেই আমার সন্তোষ সাধনের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। আমি যাহাতে কোনরূপ অভাব বোধ না করি, এই জন্য আমাকে অনন্ত বিলাস-সামগ্রী দিয়া ভুলাইয়া রাখিলেন। আমি বিধবা, আমার প্রধান কর্ত্তব্য ব্রহ্মচর্য্য পালন করা; কিন্তু আমাকে কেহই সেই পথে লইয়া গেল না। আমি অনন্ত ভোগবিলাসের ভিতর ডুবিয়া থাকিলাম; ইহাতে আমার ভোগস্পৃহা শতমুখী হইয়া ধাবিত হইতে লাগিল। আমি আপন ভোগাকাঙ্ক্ষা অনন্ত বিধানে পূর্ণ করিতে থাকিলাম। ক্রমে ক্রমে আমার চিত্ত অবনতির নিম্নতম স্তরে অবরোহণ করিতে লাগিল,—যৌবনের পাপ প্রলোভন আমাকে জ্ঞান-শূন্য করিল। অবশেষে আমি আজ স্থির করিয়াছিলাম যে, অদ্য শেষ রাত্রে অভিনয় দেখিয়া সকলে যখন শয়ন করিয়া গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িবে, সেই সময় আমাদের ভৃত্য রমেশের সহিত আমি কুলত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব; সেই অবকাশ অন্বেষণ করিবার জন্যই আমি বেশভূষায় প্রস্তুত হইয়া অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। সেই খানে উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করিতে করিতে যখন দেখিলাম, সূত্রধারের নান্দীগীতি শুনিয়া সকলেই মুগ্ধচিত্তে অভিনয় দেখিতেছে, আমি তখন পলায়নের উপযুক্ত অবসর মনে করিয়া রমেশকে সঙ্কেত করিবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় সূত্রধারের সেই অমৃতময় উপদেশ আমার কর্ণে প্রবেশ করিল।—

"গতা বহুতরা কান্তে স্বল্পা তিষ্ঠতি শর্ব্বরী।
ইতি চিত্তে সমাধায় কুরু সজ্জনরঞ্জনম্॥"

এ কথা শুনিয়া আমার সমস্ত পাপসঙ্কল্প দূরীভূত হইল। আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, যৌবনের অধিকাংশ কালই অতীত হইয়া গিয়াছে, আর অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে; এত দীর্ঘকাল ধৈর্য্যের সহিত অতিবাহিত করিয়া এই সামান্য সময়ের জন্য কেন পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হইতেছি। এই সূত্রধার আমার যে উপকার করিয়াছে, জগতে তাহার পুরস্কার কিছুই নাই; তথাপি আমি চিত্তের কথঞ্চিৎ শান্তির জন্য আমার সমস্ত আভরণ উঁহাকে দান করিয়াছি।"

রাজা এই সমস্ত কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হৃদয়ে একবার বাহিরের দিকে চাহিলেন। সেখানে দেখিতে পাইলেন, রজনীর দুর্ভেদ্য অন্ধকার-পুঞ্জ প্রভাতের

দিব্য আলোকে দূরীভূত হইয়া গিয়াছে। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার জীবনেরও কোন এক বিঘ্নময় অন্ধকার আজ পুণ্যের আলোকে দূরীভূত হইল।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ।

বর্ষায়।

জলে ভরা কালো মেঘে, ছেয়ে দিলে আকাশ-তল;
কালো ছায়া ছড়্‌য়ে প'ল, ঢেকে গেল জল ও স্থল।
মাঝে মাঝে চিকুর হানে,
শব্দ এসে পশে কানে;
বিলের ধারে বাঁশের ঝাড়ে দোয়েল ফিঙ্গা করে গান;
ও পারে ঐ খোলা মাঠে কৃষকেরা নিড়ায় ধান।

ঘাটের পাশে নৌকা বেঁধে জেলে আপন ঘরে যায়;
টোকা মাথায় রাখাল বালক গোরুর পালের পিছে ধায়।
ঘাসে ঢাকা বিলের ধারে,
বালকেরা খেলা করে,
ছুটছে সবাই, নাইকো তা'দের মেঘের দিকে কা'রো মন;
আমিই ব'সে দেখ্‌ছি দূরে মেঘের নীচে বাব্‌লা বন।

আস্‌ছে মনে কত দিনের কত কথা একে একে;
মেঘের কোলে ইন্দ্র-ধনু কে যেন দিতেছে এঁকে!
কত রঙের বাটি এনে,
নিপুণ তুলি দিচ্ছে টেনে,
কালো, রাঙা, জরদা, সবুজ,—আঁকছে ভাল চিত্র-পট;
পলকেতে ডুব্‌ছে কত, উঠ্‌ছে কত নবীন নট।

কতই হাসি, অশ্রু রাশি, কতই অভাব, কতই আশা;
কতই ভ্রান্তি, কতই শান্তি, কতই সোহাগ ভালবাসা।
কতই মিলন, তৃপ্তি ভরা,
কতই ব্যথা, শান্তি-হরা,
ফুটিয়ে তুলে মোছে আবার, জানি না এ খেলা কা'র;
আলোই যদি ভাল, তবে আসে কেন অন্ধকার!

গেছে সেদিন, ভালই ভাল! কথাটা তা'র ভুল্‌তে দাও,
মাঝে মাঝে স্মৃতির পটে কেন তবে আঁক্‌তে চাও?
চিন্তা-প'টো তুলি-করে,
আস্‌বে যখন, বল্‌বো তা'রে,
চাই না তোমার রঙের রেখা, কেবল কালী বুলাও ভাই;
আষাঢ়ের ঐ কালো মেঘে স্মৃতির সঙ্গে ডুবে যাই।

কখন ছিল ঊষার আলো, কখন ছিল চাঁদের কর;
ছুট্‌ল কখন ফুলের গন্ধ, মলয় হাওয়ায় করি' ভর।
গাছের ডালে লুকিয়ে থেকে,
কখন কোকিল উঠ্‌ল ডেকে,
কখন শুষ্ক শীতের কুঞ্জে এসেছিল ঋতুরাজ,
কখন বাঁশী বেজেছিল, কায কি সে সব ভেবে আজ!

আজ আষাঢ়ে কালো মেঘের গগন যুড়ে আগমন;
আজ্‌কে তা'কেই সকল ভুলে করি সাদর সম্ভাষণ,
হৃদয় উঠুক সুখে মাতি,
বজ্রে ধরি বক্ষ পাতি,
শিরে ধরি বৃষ্টি-ধারা, এমন দিনে আর কি চাই?
শান্ত স্নিগ্ধ কালো মেঘে একেবারেই মিশে যাই।

জলে ভরা কালো মেঘে ছেয়ে দিলে আকাশ-তল;
কালো ছায়া ছড়িয়ে প'ল, ঢেকে গেল জল ও স্থল।
দেখ্‌চি যতই নয়ন তুলে,
ততই জগৎ যাচ্চি ভুলে,
কি জানি কি নবীন আশা, নেশার মত নাচায় প্রাণ;
আজ্‌কে তা'তেই মত্ত চিত্ত আপন মনেই গাহে গান!

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্বপ্নের-কথা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দৈহিক গঠন।

স্বপ্নের কথা বলিব বলিয়া প্রথম অধ্যায়ে আমরা যে বিষয়গুলির আলোচনা করিলাম, তাহাকে মূল সূত্র বা প্রধান বিষয় বলা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ব্যক্তিগত ও শারীরিক গঠনগত বিশেষ ব্যাপার কিছুই অবগত হওয়া যায় নাই। এক্ষণে সেই আলোচনা করা সঙ্গত বলিয়া মনে করি।

স্বপ্নের বিষয় ভালরূপে বুঝিতে হইলে, আগে আমাদের শারীরিক যন্ত্রসমূহের গঠনের বিষয় অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। এবং সেই যন্ত্রদ্বারা কিপ্রকারে ভাবরাশি আমাদের জ্ঞান-পথে আনীত হয়, তাহা অবগত হইতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ ভাবগুলি জ্ঞান-পথে আনীত হইলে কি প্রকারে কার্য্য করে, তাহা জানিতে হইবে। তৃতীয়তঃ নিদ্রার সময় গঠনের ও জ্ঞানের কি প্রকার অবস্থা হয়, তাহাও জানা আবশ্যক। চতুর্থতঃ আমরা যে, বিভিন্ন প্রকারের স্বপ্ন দেখিয়া থাকি, তাহাই বা কি প্রকার ও কেন হয়, তাহাও জানিয়া রাখিতে হইবে।

আমাদের দেহের স্নায়ু-দণ্ড দেহের মধ্য দিয়া মস্তিষ্কে গিয়া শেষ হইয়াছে। সেখান হইতে স্নায়ু-সূত্রের জালের মত একটী জাল শরীরের মধ্য দিয়া সকল স্থানে চালিত হইয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে এই স্নায়ু-সূত্রের কম্পন দ্বারা বাহ্যিক ভাব সকল মস্তিষ্কে নীত হইয়া থাকে। তখন মস্তিষ্ক সেই সকল ভাব গ্রহণ করিয়া জ্ঞান বা অনুভব শক্তিতে চালিত করে। যখন আমরা কোন দ্রব্য হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া উষ্ণতা অনুভব করি, তখন আমাদের বোধ হয় যেন হস্ত দ্বারাই আমরা সেই উষ্ণতা অনুভব করি, বাস্তবিক কিন্তু তাহা নহে। হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিবামাত্র সেই স্পর্শ-জ্ঞান হস্তস্থিত স্নায়ু-সূত্রের কম্পন দ্বারা

আমাদের মস্তিষ্কে নীত হয়। তখন মস্তিষ্ক আবার তাহা জ্ঞান-পথে প্রেরণ করে, তখনই আমরা স্পর্শ-জ্ঞান অনুভব করি। টেলিগ্রাফের তারের দ্বারা যেমন দূর-দেশে সংবাদাদি প্রেরিত হয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্য-জ্ঞান আমাদের মস্তিষ্কে নীত হয় এবং আমরা তাহার স্পর্শানুভব করিয়া থাকি। স্নায়ু-সূত্রগুলি টেলিগ্রাফের তারের কার্য্য করিয়া থাকে।

এই যে, স্নায়ু-সূত্রের কথা বলা হইল, ইহাদের গঠন সর্ব্বত্র সমান নহে, এবং তাহাদের প্রকৃতি ঠিক একই প্রকারের নহে। হস্ত ও পদের স্নায়ু সূত্র এক প্রকারের,—দর্শনেন্দ্রিয়ের স্নায়ু-সূত্র অন্য প্রকারের। হস্ত বা পদের স্নায়ু-সূত্রগুলি একই প্রকার কম্পন দ্বারা সকল কার্য্য সম্পন্ন করে—কিন্তু চক্ষুর স্নায়ু-সূত্রের কম্পনে সে প্রকার হয় না। প্রকৃত পক্ষে শ্রবণেন্দ্রিয় ঘ্রাণেন্দ্রিয় প্রভৃতি সকল ইন্দ্রিয়ই কিঞ্চিৎ বিভিন্ন ভাবে গঠিত হইলেও এবং কিঞ্চিৎ বিভিন্ন ভাবে কার্য্য করিলেও সকলেই কম্পন দ্বারা মস্তিষ্কে ভাব পরিচালন করিয়া থাকে। ভাব মস্তকে নীত হইলে, তবে সেখান হইতে অনুভব শক্তি জন্মে।

ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যায়, মস্তিষ্কই স্নায়ু-সন্ধি-স্থান। আমরা বেশ সুস্থ আছি, কিন্তু হঠাৎ বা অতি সামান্য পরিবর্ত্তনে আমাদের মস্তিষ্কের বিকৃতি ভাব উৎপন্ন হইতে পারে। তারপরে রক্ত-সঞ্চালন ক্রিয়া অব্যাহত থাকিলে ঐ বিকৃতি ভাব অচিরাৎ দূরীভূত হয়; আর যদি রক্ত-সঞ্চালন ক্রিয়ার কোন প্রকার ব্যাঘাত হয়, তবে মস্তিষ্কের বিকৃত ভাব স্থায়ী হইয়া পড়ে। আমাদের মস্তকের শিরাগুলির মধ্য দিয়া সর্ব্বদা রক্ত সঞ্চালিত হইতেছে, এবং সেই সঞ্চালিত রক্ত আমাদের মস্তিষ্ককে নিয়মিত রূপে কার্য্য করিবার সহায়তা করিতেছে, কিন্তু ঐ রক্ত যদি পরিমাণে কম বা বেশী হয়, রক্তের যাহা সহজ গুণ, তাহার যদি ব্যতিক্রম হয়, রক্তের যে সাধারণ ও স্বাভাবিক গতি, যদি তাহার ন্যূনাধিক্য হয়; ফলকথা, যে কোন প্রকারেই হউক ঐ রক্তের স্বাভাবিক গতি, অবস্থা ও সঞ্চালনের কোন প্রকার ব্যতিক্রম ঘটিলেই মস্তিষ্কের কার্য্যেরও বিশৃঙ্খলা ঘটে এবং তদ্দ্বারা সমস্ত শরীরের স্নায়ু-সূত্রগুলিও বিকৃত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে।

মস্তিষ্কে যদি রক্ত অধিক পরিমাণে উপস্থিত হয়, শিরাগুলিতে যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত রক্ত সঞ্চালিত হইতে থাকে, তাহা হইলে মস্তিষ্কের অনিয়মিত কার্য্য হইতে থাকে। আবার যদি প্রয়োজনের অল্প পরিমাণে রক্ত

মস্তিষ্কে নীত হয়, তাহা হইলে দেহের সমস্ত স্নায়ু-সূত্রগুলি অলস ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। কেবল মাত্র রক্তের পরিমাণের অল্পতা বা আধিক্য বশতঃই যে মস্তিষ্কের অনিয়মিত কার্য্য হয়, তাহাও নহে। রক্তের গুণের তারতম্যেও ঘটিয়া থাকে। শরীরের মধ্য দিয়া যখন রক্ত প্রবাহিত হয়, তখন উহা দুইটী প্রধান কার্য্য করিয়া থাকে। এক অম্লজান নামক গ্যাস সরবরাহ করা, আর ইন্দ্রিয় সমূহে বলদান করা। যদি এই দুই কার্য্যের কোনটী সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন করিতে অসমর্থ হয়, অর্থাৎ যদি যথেষ্ট অম্লজান (Oxygen) সরবরাহ করিতে না পারে, কিম্বা যে যে ইন্দ্রিয়ের বলের প্রয়োজন, তাহাতে যথোপযুক্ত বল প্রদান করিতে না পারে, তাহা হইলে অনতিবিলম্বে অনিয়মিত বা বিশৃঙ্খল ভাবে কার্য্যারম্ভ হয়।

মস্তিষ্কে যদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অম্লজান (Oxygen) সরবরাহ না হয়, তাহা হইলে মস্তিষ্কে দ্ব্যম্ল অঙ্গার (Carbon Dioxide) নামক গ্যাস জমিয়া থাকে ; তাহার ফলে অলসতা ও কার্য্যে অনিচ্ছা প্রভৃতি উপস্থিত হয়। বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালিত নহে এমন স্থানে, বা জনবহুলস্থানে কিছুক্ষণ থাকিলে আমরা একথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই। যাত্রা থিয়েটার প্রভৃতি জনপূর্ণ স্থান হইতে ফিরিয়া আসিলে আমাদের যে অবসাদ আদি উপস্থিত হয়, তাহার কারণই এই। অধিক লোকের শ্বাস-প্রশ্বাসে সেই স্থানে অক্সিজেন গ্যাস নিঃশেষিত হইয়া যায় ;—তখন বারম্বার একই বায়ু সেবন করিতে করিতে বায়ুমধ্যস্থ অম্লজান একেবারে শেষ হয়, এবং তাহার পরিবর্ত্তে আমাদের পরিত্যক্ত দ্ব্যম্ল অঙ্গারক গ্যাস অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হয়। সুতরাং মস্তিষ্ক পরিমাণমত অম্লজান প্রাপ্ত হয় না, কাযেই নিয়মিতরূপ কার্য্য করিতে পারে না।

যে প্রকার দ্রুতগতিতে রক্ত প্রবাহিত হইয়া মস্তকে নীত হয়, তাহার তারতম্য হইলেও মস্তিষ্কের কার্য্যের ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। যদি অধিকতর দ্রুত গতিতে সঞ্চালিত হয়, তাহা হইলে জ্বরভাব হইয়া থাকে, যদি অতি মৃদুগতিতে সঞ্চালিত হয়, তাহা হইলে নিতান্ত অলস-ভাব উপস্থিত হয়।

জাগ্রৎ অবস্থার এই ভাব স্বপ্নাবস্থাতেও সম্পূর্ণ এইরূপ ভাবেই কার্য্য করিয়া থাকে।

আর একটী কথাও এস্থলে বলা কর্ত্তব্য। শারীরিক গঠনের আর একটী

বিশেষত্ব এই যে, প্রত্যেক ইন্দ্রিয় তাহাদের স্বতঃকম্পনদ্বারা বাহ্যিকভাব মস্তিষ্কে প্রেরণ করিয়া থাকে। স্বতঃকম্পন এই যে, আমাদের ইচ্ছাশক্তির বলে ইন্দ্রিয়গণ যে কার্য্য করে, এস্থলে তাহা করে না। কোন দ্রব্য হস্তদ্বারা স্পর্শ করিলাম, হস্তের স্নায়ু সূত্রগুলি কম্পিত হইয়া সেই ভাব মস্তিষ্কে প্রেরণ করিল,—মস্তিষ্ক আমাদিগকে জানাইয়া দিল যে, আমরা অমুক দ্রব্য স্পর্শ করিয়াছি। এস্থলে হস্তস্থিত স্নায়ুসূত্রগুলি আপনা আপনিই কম্পিত হয়, এবং আমাদের ইচ্ছাশক্তির সাহায্য ব্যতীত যেন আমরা সেই দ্রব্যের স্পর্শ-জ্ঞান লাভ করি। ইচ্ছার বিরুদ্ধে এইরূপ হয় বলিয়া ইহা বশের মধ্যে আনা কঠিন ব্যাপার। জাগ্রত অবস্থা অপেক্ষা নিদ্রিত অবস্থাতেই ইহা অধিক পরিমাণে কার্য্যকর হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বায়বীয় গঠন।

বাহ্যিক ভাবসকল মস্তিষ্কের দ্বারা আমাদের জ্ঞানের পথে আইসে, একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কিন্তু আর এক প্রকারে বাহ্যিক ভাবসকল আমাদের বোধগম্য হইয়া থাকে।

আমাদের এই দৃশ্যমান স্থূল শরীরকে শাস্ত্রীয় ভাষায় ষাট্‌কৌষিক শরীর বলে। * এতদ্ব্যতীত আমাদের আর এক শরীর আছে, তাহাকে সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীর বলে। ষাট্‌কৌষিক শরীর শুক্র শোণিতের পরিণামে উৎপন্ন;—সূক্ষ্ম শরীর সেরূপ নহে। সূক্ষ্ম শরীর অন্তঃকরণের অর্থাৎ বুদ্ধীন্দ্রিয়নিচয়ের সমষ্টি বা তদ্দ্বারা রচিত, সুতরাং তাহা অত্যন্ত সূক্ষ্ম। এই সূক্ষ্ম দেহেও মস্তিষ্ক আছে,—কিন্তু যে দ্রব্য-সমষ্টি দ্বারা স্থূল দেহের মস্তিষ্ক গঠিত, তদপেক্ষা কল্পনার অতীতগুণ লঘু পদার্থ দ্বারা লিঙ্গদেহের মস্তিষ্ক গঠিত। এমন কি, বায়ু অপেক্ষাও সূক্ষ্মতম পদার্থেই উহার গঠনকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলিয়াই এইদেহ অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য ও অদৃশ্য। যাহার মূর্ত্তি নাই,

* ত্বক্‌, রক্ত, মাংস, স্নায়ু, অস্থি ও মজ্জা এই ছয়টী কোষ অর্থাৎ আত্মার আবরণ। এই ষট্‌কোষাত্মক স্থূল শরীর ষাট্‌কৌষিক বলিয়া এই জন্য অভিহিত হয়।

অবয়ব নাই—কেবল জ্ঞানময় পদার্থ, কে তাহাকে দেখিতে পায়? আদি সৃষ্টিকালে প্রকৃতি হইতে প্রত্যেক আত্মার নিমিত্ত এক একটী সূক্ষ্ম শরীর উৎপন্ন হইয়াছিল, প্রকৃতির পুনঃ সাম্যাবস্থা বা জীবের মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত সে সকল সূক্ষ্ম শরীর থাকিবে ও পুনঃপুনঃ তদ্‌গাত্রে ষাট্‌কৌষিক শরীর জন্মিবে।

সূক্ষ্ম-শরীরের নামান্তর লিঙ্গ-শরীর। কোন মতে ইহার অবয়ব সপ্তদশ, কোনমতে ষোড়শ, কোনমতে পঞ্চদশ। কিন্তু সকল মতেই প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইহা রচিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বেদান্ত এই চৈতন্যাধিষ্ঠিত সূক্ষ্ম শরীরকেই জীব বলেন। বেদেও তাহাই উল্লেখ আছে। যথা—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং
পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্‌পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্ন-
ন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥

দ্বা দ্বৌ সুপর্ণা সুপর্ণৌ শোভনপতনৌ সুপর্ণৌ পক্ষিসামান্যাদ্বা সুপর্ণৌ সযুজা সহৈব সর্ব্বদা যুক্তৌ সখায়া সখায়ৌ সমানখ্যাতৌ সমানাভিব্যক্তিকরণৌ এবম্ভূতৌ সন্তৌ সমানমবিশেষমুপলব্ধাধিষ্ঠানতয়া একং বৃক্ষং বৃক্ষমিবোচ্ছেদসামান্যাৎ শরীরং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে পরিষক্তবন্তৌ। সুপর্ণাবিবৈকং বৃক্ষং ফলোপভোগার্থম্। অয়ং হি বৃক্ষ উর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখোঽশ্বত্থোঽব্যক্তমূলপ্রভবঃ ক্ষেত্রসংজ্ঞকঃ সর্ব্বপ্রাণিকর্ম্মফলাশ্রয়স্তং পরিষক্তবন্তৌ সুপর্ণাবিবাবিদ্যাকামকর্ম্মবাসনাশ্রয়লিঙ্গোপাধ্যাত্মেশ্বরৌ। তয়োঃ পরিষক্তয়োরন্য একঃ ক্ষেত্রজ্ঞো লিঙ্গোপাধিবৃক্ষমাশ্রিতঃ পিপ্‌পলং কর্ম্মনিষ্পন্নং সুখ-দুঃখ-লক্ষণং ফলং স্বাদ্বনেকবিচিত্রবেস্বাদুরূপং স্বাদ্বত্তি ভক্ষয়ত্যুপভুঙ্‌ক্তেঽবিবেকতঃ। অনশ্নন্নন্য ইতর ঈশ্বরো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সত্ত্বোপাধিরীশ্বরো নাশ্নাতি। প্রেরয়িতা হ্যসাবুভয়োর্ভোজ্যভোক্ত্রোর্নিত্যসাক্ষিত্বসত্তামাত্রেণ। স ত্বনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি পশ্যত্যেব কেবলম্। দর্শনমাত্রেণ হি তস্য প্রেরয়িতৃত্বং রাজবৎ॥

"দুইটী সুন্দর পতনসম্পন্ন পক্ষী, সংযুক্ত ও সখ্যভাবাবলম্বী হইয়া ফলোপভোগের নিমিত্ত একটী বৃক্ষ (শরীর) আরূঢ় হইয়া আছেন। এই দুইটী পক্ষীর মধ্যে অর্থাৎ লিঙ্গদেহরূপ বৃক্ষ আশ্রিত জীব, পিপ্পল অর্থাৎ কর্ম্মদ্বারা নিষ্পন্ন অনেকবিধ সুখ ও দুঃখরূপ ফল উপভোগ করিতেছেন, এবং অন্য নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তস্বভাব, সর্ব্বজ্ঞ ও সত্ত্বগুণোপাধি ঈশ্বর কর্ম্মফল ভোগ করেন না, তিনি দর্শনমাত্রেই রাজার ন্যায় প্রেরণ করিয়া থাকেন।"

এই লিঙ্গশরীরে অবস্থিত আত্মাকেই জীব বা জীবাত্মা বলে। বৃক্ষরূপ শরীরে ভোক্তা জীব অবিদ্যা, কামনা ও কর্ম্মফলানুরাগাদি দ্বারা গুরুতর ভারাক্রান্ত হইয়া দেহের সহিত ঐকাত্ম্যভাব প্রাপ্ত হন।

এখন, এই স্থূল দেহের মধ্যে যে আবার একটী সূক্ষ্ম বা লিঙ্গদেহ আছে, তাহার প্রমাণের আবশ্যক।

যোগীরা এই সূক্ষ্ম বা লিঙ্গদেহ বিশেষরূপে অবগত আছেন। স্থূলদেহ রাখিয়া ইচ্ছামত তাঁহারা সূক্ষ্মদেহকে চালিত করিতে পারেন,—যোগশাস্ত্রে তাহাকে "পরকায়-প্রবেশ" প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হয়। আধুনিক "মেস্‌মেরিজম্" 'হিপনটিজম্' প্রভৃতি দ্বারাও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মেস্‌মেরিজম্ করিলে স্থূল দেহ অসাড় হইয়া যায়, এবং সূক্ষ্মদেহ বহির্গত হইয়া দূরতর প্রদেশের সংবাদ আদি পরিজ্ঞাত হয়। "স্পিরিচুয়ালিজম্" বা প্রেততত্ত্ব দ্বারাও স্থূলদেহের অতিরিক্ত দেহের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন যুক্তি দ্বারাও এই লিঙ্গ শরীরের জ্ঞান জন্মিয়া থাকে।

"ধর্ম্ম অধর্ম্ম, জ্ঞান অজ্ঞান, বৈরাগ্য অবৈরাগ্য, ক্ষমতা অক্ষমতা এবং লজ্জা প্রভৃতি যে সকল গুণ মানুষের পুষ্পবাসিত বস্ত্রের ন্যায় নিরন্তর অধিবাসিত করিতেছে, সে সমস্তই বুদ্ধি-পদার্থমধ্যে পরিগণিত। যেহেতু বুদ্ধিরই বিশেষ বিশেষ অবস্থা ধর্ম্ম অধর্ম্ম-আদি বিবিধ নামের নামী। বুদ্ধি নিরাশ্রয়ে থাকিবার নহে;—তাহার আশ্রয় চাই। স্থিরভাবে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, বুদ্ধি মাংসলিপ্ত অস্থিপঞ্জরে বা ঐরূপ কোন একটা স্থানে অবস্থিত নহে, নিরুপাধিক আত্মাতেও থাকে না। নিরুপাধিক আত্মা নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ও নির্দ্ধর্ম্মক; কাযেই বুদ্ধির পৃথক্ আশ্রয় স্থান আছে,—সেই বুদ্ধির আশ্রয় স্থানই সূক্ষ্ম শরীর। সূক্ষ্ম শরীরেই বুদ্ধির স্থিতি ও উৎপত্তি।

চিত্র যেমন আশ্রয় ব্যতীত থাকিতে পারে না, ছায়া যেমন মূর্ত্ত পদার্থ ব্যতীত থাকে না,—বুদ্ধিও সেই প্রকার আশ্রয় ব্যতীত অবস্থিতি করিতে পারে না। তাই মনে হয়, এই বিনাশ্য স্থূলদেহের অন্তরালে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াতীত শরীর আছে। স্থূল শরীর-দশায় কর্ম্ম জ্ঞান সমস্তই সেই শরীর সহায়ে উৎপন্ন হয়, এবং তদুভয়ের সংস্কার (ছাপ বা দাগ) তাহাতেই স্থিতিলাভ করে। জন্ম-মরণের অন্তরাল অবস্থায় অর্থাৎ স্থূল শরীর ধ্বংস হইয়াছে, অথচ নব দেহ গঠিত হয় নাই, সে অবস্থাতেও ধর্ম্মাধর্ম্মাদির সংস্কার তাহাতে আবদ্ধ থাকে। ইহ জন্মে যে সকল বুদ্ধিবৃত্তির প্রাদুর্ভাব হইতেছে, তত্তাবতের সংস্কার লিঙ্গ শরীরে আবদ্ধ হইতেছে ও থাকিয়া যাইতেছে। বুদ্ধির আবির্ভাবপ্রভাবে দৃশ্যদেহটী স্পন্দিত হয় মাত্র; এবং তাহার সংস্কার ব্যতীত অন্য সংস্কার (ধর্ম্মাধর্ম্ম) ইহাতে আবদ্ধ হয় না। সেই কারণে স্থূলদেহের ধ্বংসে ধর্ম্মাধর্ম্মা-

দির সংস্কার বিলুপ্ত হয় না, এবং ইহ জন্মের কার্য্যরুচি পূর্ব্বজন্মের সংস্কারানুরূপই হইয়া থাকে।

"মাতাপিতৃজা নিবর্ত্তন্তে"

মাতৃ-পিতৃ-জাত অর্থাৎ শুক্রশোণিতের দ্বারা উৎপন্ন এই ষাট্‌কৌষিক স্থূল দেহ

"বিড়ন্তা ভস্মান্তা রসান্তা বা"

অর্থাৎ পড়িয়া থাকে,—পচিয়া যায়, মৃত্তিকা হয়, ভস্ম হয়, শৃগাল কুক্কুরাদির ভক্ষ্য হয়, বিষ্ঠাও হয়। কিন্তু

"সূক্ষ্মাস্তেষাং নিয়তাঃ"

সূক্ষ্মশরীর তন্মধ্যে নিয়ত কাল বর্ত্তমান থাকে। তাহা মোক্ষ অথবা প্রলয় না হওয়া পর্য্যন্ত থাকে।

"উপাত্তমুপাত্তং ষাট্‌কৌষিকং শরীরং জহাতি
হায়ং হায়ঞ্চোপাদত্তে।"

বার বার ষাট্‌কৌষিক শরীর গ্রহণ করে ও বার বার তাহা হইতে বিযুক্ত হয়। ষাট্‌কৌষিক শরীর উৎপন্ন হওয়া জন্ম এবং তাহা হইতে বিযুক্ত হওয়া মরণ।" *

এতক্ষণ আমরা যে লিঙ্গ শরীরের কথা আলোচনা করিলাম, তাহার কারণ এই যে, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মস্তিষ্ক ব্যতীত আর এক প্রকারে বাহ্যভাবসকল আমাদের বোধগম্য হয়,—সেই প্রকার এই লিঙ্গ দেহ।

এই লিঙ্গ শরীর কি পদার্থে গঠিত, তাহা অবধারণ করা অত্যন্ত কঠিন না হইলেও কতকটা বিচার-সাপেক্ষ। ইহা বায়ু দ্বারা সুগঠিত, কিন্তু সেই বায়ু আমাদের এই বায়ু অপেক্ষাও অত্যন্ত সূক্ষ্ম।

যদি আমরা সদ্যোজাত শিশুর দেহের আত্মিকশক্তি পরীক্ষা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে,উহা বায়ু অপেক্ষাও অনেক সূক্ষ্ম পদার্থে বিজড়িত। ইংরেজ পণ্ডিতগণ এই পদার্থকে ইথার (Ether) বলেন। যদি আমরা সূক্ষ্মভাবে উহার আভ্যন্তরিক দেহ পরীক্ষা করিয়া ক্রমে পূর্ব্বভাব হইতে উহার জন্ম পর্য্যন্ত জানিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব যে, তাহার লিঙ্গ দেহ (যে ছাঁচে তাহার স্থূল দেহ গঠিত হইয়াছে) কর্ম্ম-সূত্রের দ্বারা নির্ম্মিত সাধারণ বায়বীয় দ্রব্যগুলি সংস্কারবশতঃ অবনতিশীল দেহে একত্রিত হয়।

* সাংখ্যদর্শন।

যত কর্ম্ম-বীজ তাহাতে আছে, সে সমস্তই একেবারে উপযুক্ত স্থান না পাইয়া অঙ্কুরিত হইতে পারে না,—অব্যক্ত অবস্থাতেই রহিয়া যায়।

এ সূক্ষ্ম বায়বীয় লিঙ্গদেহকেই শাস্ত্রীয় ভাষায় প্রাণ বলে।

হৃদ্যস্তি পঙ্কজং দিব্যং দিব্যলিঙ্গেন ভূষিতম্।
কাদিঠান্তাক্ষরোপেতং দ্বাদশারং সুগোপিতম্।
প্রাণো বসতি তত্রৈব বাসনাভিরলঙ্কৃতঃ।
অনাদিকর্ম্মসংশ্লিষ্টঃ প্রাপ্যাহঙ্কারসংযুতঃ॥

শিবসংহিতা।

"জীবসমূহের হৃদয়াভ্যন্তরে দিব্যলিঙ্গ-সমলঙ্কৃত একটী মনোরম দ্বাদশদল পদ্ম আছে, ইহার প্রত্যেক দলে ক অবধি ঠ পর্য্যন্ত দ্বাদশ বর্ণের এক একটী বর্ণ বিরাজ করিতেছে। এই দ্বাদশদল পদ্মমধ্যে অনাদি-কর্ম্ম-পরম্পরায় সংশ্লিষ্ট, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাসনা-বিভূষিত আত্মাভিমানী প্রাণবায়ু অবস্থিতি করিতেছে।"

প্রাণস্য বৃত্তিভেদেন নামানি বিবিধানি চ।
বর্ত্তন্তে তানি সর্ব্বাণি কথিতুং নৈব শক্যতে।
প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চোদানো ব্যানশ্চ পঞ্চমঃ।
নাগঃ কূর্ম্মশ্চ কৃকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ।
দশ নামানি মুখ্যানি ময়োক্তানীহ শাস্ত্রকে।
কুর্ব্বন্তি তেঽত্র কার্য্যাণি প্রেরিতানি স্বকর্ম্মভিঃ॥

শিবসংহিতা।

"বৃত্তিভেদে এই প্রাণবায়ু নানাবিধ নামে কথিত হয়। তাহার মধ্যে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পাঁচটী এবং নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় এই পাঁচটী,—সমুদায়ে এই দশসংখ্য প্রাণবায়ুই প্রধান। এই দশ প্রাণ নিজ কর্ম্মবশতঃ পরিচালিত হইয়া দেহকে কার্য্য-সম্পাদক করিতেছে।"

অত্রাপি বায়বঃ পঞ্চ মুখ্যাঃ স্যুর্দ্দশতঃ পুনঃ।
তত্রাপি শ্রেষ্ঠকর্ত্তারৌ প্রাণাপানৌ ময়োদিতৌ॥

শিবসংহিতা।

"এই দশ বায়ুর মধ্যে প্রথম পাঁচ বায়ু বা পঞ্চ প্রাণ শ্রেষ্ঠ—তার মধ্যে আবার প্রাণ ও অপান বায়ু শ্রেষ্ঠতম।"

মানুষের মৃত্যুর পর যতদিন ভোগদেহ * গঠিত না হয়, ততদিন জীবাত্মা এই প্রাণের বায়ুতেই নির্ভর করিয়া থাকেন।

যেমন আকাশ এই জগতের কারণীভূত অনন্ত সর্ব্বব্যাপী মূল পদার্থ, প্রাণও সেইরূপ জগদুৎপত্তির কারণীভূতা অনন্ত সর্ব্বব্যাপিনী বিকাশিনী শক্তি। কল্পের আদিতে ও অন্তে সমুদায়ই আকাশরূপে পরিণত হয়, আর জগতের সমুদায় শক্তিগুলিই প্রাণে লয় প্রাপ্ত হয়; পরিকল্পে আবার এই প্রাণ হইতেই সমুদায় শক্তির বিকাশ হয়। এই প্রাণই গতিরূপে প্রকাশ পাইতেছে। এই প্রাণই স্নায়বীয় শক্তি-প্রবাহ (Nerve-Current) অথবা চিন্তাশক্তিরূপ,—দৈহিক সমুদায় ক্রিয়ারূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। চিন্তা-শক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া অতি সামান্য দৈহিক শক্তি পর্য্যন্ত সমুদায়ই প্রাণের বিকাশ মাত্র। বাহ্য ও অন্তর্জ্জগতের সমুদায় শক্তি যখন তাহাদের মূলাবস্থায় গমন করে, তখন তাহাকেই প্রাণ বলে। এই প্রাণই জীবদেহের জীবনী শক্তি!

যিনি প্রাণের সংযমদ্বারা প্রাণতত্ত্ব কথঞ্চিৎও উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই দেখিতে পাইয়া থাকেন, এই প্রাণদ্বারা কি প্রকারে এই কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে।

প্রাণসংযমী দেখিতে পান যে, সৌর-জীবনী শক্তির কোন প্রকার বর্ণ নাই বটে, কিন্তু উহা অতিশয় উজ্জ্বল ও কার্য্যকুশল। সূর্য্যদেব পৃথিবীর উপর ক্রমাগত এই শক্তি দান করিতেছেন। তিনি দেখিতে পাইবেন, তাঁহারই স্থূল দেহস্থ ক্ষুদ্র প্লীহাযন্ত্রটীর কার্য্য কেমন করিয়া অনন্ত বিশ্বের অনন্ত নিয়মাধীন হইয়া একই প্রকারে নিষ্পন্ন হইতেছে। ক্ষুদ্র প্লীহাটী অনন্ত শক্তিমতী ধরিত্রীরই মত অদ্ভুত আত্মিক কার্য্য করিতে করিতে কেমন করিয়া তাহার বায়বীয় অংশ সাধারণ জীবনকে গ্রাস করিতে করিতে অনন্ত প্রাণ-

---

* যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরাত্বয়-দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্॥ [স্মৃতিঃ।

জীব সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া যাহা চিন্তা করে, যে কার্য্য করে, যে অভিনিবেশে নিমগ্ন থাকে, মৃত্যুকালে সেই ভাবনাই তাহার উপস্থিত হয়,—আর সব ভুলিয়া যায়। সেই ভাবনাবশতঃ তাহার তখন তদ্দেহ উৎপন্ন হয়, এই দেহকে ভাবনাময় দেহ বা ভাবদেহ বলে। এই দেহ লইয়া জীব স্থূলদেহ পরিত্যাগ করে। ভাবদেহের অপর নাম আতিবাহিক দেহ। আতিবাহিক দেহ অল্পকাল থাকে, তৎপরে পূর্ব্ব প্রজ্ঞানুসারে যাট্‌কৌষিক ভোগদেহ উৎপন্ন হয়।

সত্তায় ডুবাইয়া দিতেছে। আর বায়বীয় প্রবাহ দ্বারাই জীবনীশক্তি, স্বাস্থ্য, কার্য্য করিবার ক্ষমতা স্থূলদেহে অনুস্যূত হয়। বায়বীয় প্রবাহে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গোলাপী বর্ণের বিন্দু বা অণুগুলি দ্রব হইয়া রক্তের সহিত মিলিত হয়, তখন অতিরিক্ত প্রাণ-শক্তি দেহ হইতে নীলাভ উজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ করে।

এইরূপ প্রাণের কার্য্য (Life Ether) পরীক্ষা করিলে স্পষ্টরূপে জানা যাইবে, স্থূল-দেহস্থ স্নায়ু-সূত্রের কম্পন দ্বারাই কেবল যে ভাব-গ্রহণ ক্ষমতা জন্মে, তাহা নহে,—স্নায়ুসূত্রের এই বায়বীয় প্রবাহ দ্বারাও হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

মানসী।

আমি ভাবিতাম যারে,
আপনার করে'
খুঁজিতাম যারে স্বপনে।
আঁকিতাম যারে
হৃদি-পটে সদা
সাধিতাম ধ'রে চরণে।
কোথায় লুকাল
তাহার প্রতিমা ?
ছায়াটীও বিশ্বে নাই যে !
স্মৃতিটুকু শুধু
রেখে গেছে মম—
মানসে, মানসী তাই যে॥

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ।

চরণামৃত।

(১)

হুগলী জেলার অন্তর্গত সেয়াখালা গ্রামে রামকৃষ্ণ তর্ক-চূড়ামণির বাস। ব্রাহ্মণ নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন, স্থানীয় সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। সংসারে ব্রাহ্মণী ভিন্ন চূড়ামণির আর কেহ ছিল না। বিবাহ, শ্রাদ্ধ, বার ব্রতে, বিদায় আদায়ে তাঁহার দিনপাত হইত।

পল্লীগ্রামে মেটে-ঘরেই লোকের বসতি। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন কোঠাঘরের প্রচলন ছিল না। মেটে-ঘরে সময়ে সময়ে সংস্কারের প্রয়োজন, রামকৃষ্ণকেও অগত্যা সে ব্যয় বহন করিতে হইত। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের যৎসামান্য আয়ের উপর নির্ভর, মোটা ভাত, মোটা কাপড়ে জীবিকা নির্ব্বাহ হয়, মধ্যে মধ্যে ঘর মেরামত একটা উপসর্গ, কিন্তু যতদিন বাস করিতে হইবে, গৃহের সংস্কার না হইলে ব্রাহ্মণ থাকেন কোথায়?

বৈশাখের দারুণ রৌদ্রে তরুলতা শুকাইয়া যাইতেছে, পুষ্করিণীর জল কমিতেছে; বায়ু-প্রবাহে অনল-শিখা বহিতেছে, তর্কচূড়ামণি মহাশয় গ্রীষ্মের পর বর্ষার আবির্ভাব বুঝিয়া পূর্ব্বাহ্নেই বাসগৃহাদির মটকার কাঠাম প্রভৃতির নব সংস্করণে উদ্‌যোগী হইয়াছেন। প্রয়োজন মত টাকার সঙ্কুলান হইলে ব্যবস্থার বিলম্ব হয় না। নিঃস্ব ব্রাহ্মণ ঘর সারাইতে মনস্থ করিয়াছেন, কিন্তু আবশ্যকীয় টাকার সংস্থান হয় নাই; অথচ এ সময়ে না মেরামত করিতে পারিলে বর্ষাকালের বারিধারায় তাঁহাকে কষ্ট ভোগ করিতে হইবে।

ভোলানাথ ঘরামী মেটে-ঘরের কাঠাম প্রস্তুত করিতে সিদ্ধহস্ত, আজ এখানে, কাল সেখানে এইরূপে কাযেই নিযুক্ত থাকিয়া ভোলানাথ দুই পয়সা বেশ উপার্জ্জন করে। একদিনও তাহাকে বসিয়া থাকিতে হয় না, ডাকের উপর ডাক সে প্রতিদিনই পাইয়া থাকে। অন্যান্য জন-মজুরের অপেক্ষা ভোলানাথ এ কাযে সুনিপুণ। ভাল কারিকর হইলে তাহার অর্থের অভাব হয় না; গ্রামের সকলকেই ঘরের কাঠাম ভোলার হাতে করাইতে হয়, এ কারণ সে দৈনিক পরিশ্রমে অন্যান্যের অপেক্ষা দুই পয়সা অধিক উপার্জ্জন করিয়া থাকে।

গৃহখানির মটকা বদলাইয়া দস্তুর মত সংস্কার করিতে রামকৃষ্ণ ইচ্ছুক, যৎসামান্য আয় হইতে তিনি কথঞ্চিৎ সংস্থান করিয়াছেন। দেশে তাঁহাকে সকলেই শ্রদ্ধা ভক্তি করে, মান্য করে। তিনি নির্ব্বিরোধী ব্রাহ্মণ, ধনী

দীন মধ্যবিত্ত সকল শ্রেণীর লোকের সহিত তাঁহার সদ্ভাব, কিন্তু গৃহ-সংস্কারের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়া চাঁদা আদায়ে তর্কচূড়ামণি মহাশয় প্রয়াসী নহেন, এজন্য কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া, তিনি ভোলানাথের বাটীতে উপস্থিত হইলেন।

চূড়ামণিকে গৃহে সমাগত দেখিয়া ভোলা এককালে জড় সড় হইল. সসম্ভ্রমে তর্কচূড়ামণিকে আসন দিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ও পদধূলি গ্রহণানন্তর সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল,—"দাদাঠাকুর! সংবাদ কি? এ গরিবের আস্তানায় আপনার পদার্পণ কেন? অনুমতি করুন, আমাকে কি করিতে হইবে?"

চূড়ামণি মহাশয় ভোলানাথের দেব-দ্বিজে বিলক্ষণ ভক্তি পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন। ভোলানাথ সরল ও উদার প্রকৃতির লোক, যাহাকে যাহা করিয়া দিবে বলিয়া অঙ্গীকার করে, তাহা শেষ না করিয়া নিশ্চিন্ত হয় না। চূড়ামণি মহাশয়ের মনোভাব ভোলার নিকট ব্যক্ত হইলে, তাহা অবশ্যই সুসম্পন্ন হইবে, স্থির জানিয়াই তিনি ভোলানাথের দ্বারস্থ হইয়াছিলেন। ভোলার সাদর সম্ভাষণে তিনি আপ্যায়িত হইলেন. সিদ্ধির পক্ষে সুযোগ অনুভব করিলেন, কথাচ্ছলে চূড়ামণি ভোলানাথের মাঙ্গলিক সংবাদ অবগত হইয়া বলিলেন,—"ভোলানাথ! আমি তোমার নিকট বার্ষিক আদায় করিতে আসিয়াছি,—আমার প্রাপ্য কবে পাইব বলিয়া দাও।"

"দাদাঠাকুর! আপনার বার্ষিক যখন ইচ্ছা,আদায় লইবেন, তবে আমার-টাও সঙ্গে সঙ্গে চাই!"

"ভোলানাথ! প্রসাদের জন্য চিন্তা কি? বামুনবাড়ী ভাতের অভাব? তুমি যে দিন মনে করিবে সেই দিনেই হইবে। দেখ গ্রীষ্মকাল উপস্থিত, ঘরটা মেরামত না হইলে বর্ষাকালে স্ত্রীপুরুষে ভিজিতে হইবে, বর্ষার আর বিলম্ব নাই, দেখিতে দেখিতে জ্যৈষ্ঠ মাসের কটা দিন চলিয়া যাইবে, এই সময়ে ঘরটার মটকা বদল না করিলে, খাড়া ভিজিতে হইবে।

"না দাদা ঠাকুর! আপনি যে দিন বলিবেন, আমি যাইয়া আপনার ঘর মেরামত করিয়া দিয়া আসিব।"

"বাপু, আমার অবস্থা ভাল হইলে যে দিন ইচ্ছা ঘর সারাইতে পারিতাম; কিন্তু তুমি ত আমার অবস্থা জান, বাঁশ দড়ি খড়ের যোগাড় কত কষ্টে কতক করিয়াছি, তুমি একবার ঘরটার অবস্থা দেখিয়া কি কি চাই আমায় পূর্ব্বাহ্নে বলিলে ভাল হয়, আমি দিন থাকিতে সেগুলি সংগ্রহ করি।"

"আচ্ছা! তাই হইবে, আমি কাল যাইয়া কি কি প্রয়োজন বলিয়া আসিব।"

"আমি তো তোমার রোজ দিতে পারিব না, তোমায় বেগারে আমার কায করিয়া দিতে হইবে।"

"দাদাঠাকুর! বলেন কি? আপনার আশীর্ব্বাদে আমি ত রোজই দুপয়সা উপায় করিতেছি, আমার অভাব কিসের? আপনার বাটীতে যাইয়া একদিন খাটিয়া আসিব, সে আমার সৌভাগ্য, আপনাকে সে জন্য ব্যস্ত হইতে হইবে না, আমার পয়সায় দরকার নাই, তবে আপনি আমাকে প্রসাদ দিবেন, তাহাতেই আমার ঐহিক পারমার্থিক সকল দিকই হইবে, নারায়ণের প্রসাদ অপেক্ষা কি পয়সা বড়? আশীর্ব্বাদ করুন, আমার শরীরটা ঠিক থাকে, আপনার যখন যাহা দরকার হইবে, আমাকে ডাকলেই হাজির হইয়া আপনার সে কায করিয়া দিব।"

চূড়ামণি ও ভোলানাথে এই কথাবার্ত্তা হইয়া উভয়েই কর্ম্মান্তরে চলিয়া গেলেন।

(২)

চূড়ামণি মহাশয় ভোলানাথের নিকট হইতে বিদায় লইয়া বাটীতে আসিলেন, বুঝিলেন যে যৎসামান্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার গৃহখানির সম্পূর্ণ সংস্কার হইবে না, বাঁশ দড়ির সম্ভবতঃ কতক কতক অভাব হইবে। লোকের বাটীতে কোন কায কর্ম্ম না হইলে চূড়ামণি মহাশয়ের অর্থোপার্জ্জন অন্য উপায়ে হয় না, সম্প্রতি কোথাও কিছু আদায়েরও সম্ভাবনা নাই, অথচ গৃহসংস্কারের মনন করিয়াছেন, দশ টাকার সংস্থান থাকিলে তাঁহাকে এ সময়ে বিব্রত হইতে হইত না, লোকের নিকট কর্জ্জ লইতে তিনি একান্ত অনিচ্ছুক, ঋণের উপর তাঁহার চিরবিদ্বেষ, তিনি তর্কস্থানে ঋণীদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন, উপস্থিত টাকার অভাবে তাঁহাকে বিশেষ বিচলিত হইতে হইল।

রামকৃষ্ণের সংসারে গৃহিণী হৈমবতী ভিন্ন আর দ্বিতীয় কেহ নাই। তাঁহার ব্রাহ্মণী স্বামীর পূজা আহ্নিকের উদ্যোগ, পাকশাক এবং সংসারের ঝাঁট পাট ও অন্যান্য কাযকর্ম্ম লইয়াই ব্যস্ত থাকেন, দরিদ্রের কন্যা পণ্ডিতের গৃহিণী হৈমবতীর অলঙ্কার ও বহুমূল্য বস্ত্রাদির প্রতি লক্ষ্যপাত হয় না, নিত্য প্রয়োজনীয় গ্রাসাচ্ছাদনের সঙ্কুলান হইলেই ব্রাহ্মণী আপনাকে ভাগ্যবতী বলিয়া জ্ঞান করেন।

রামকৃষ্ণ গৃহসংস্কার-জন্য অর্থের অভাবের কথা গৃহিণীর গোচর করিলেন। ব্রাহ্মণীর গাত্রে সুবর্ণালঙ্কারাদি তেমন নাই যে, একখানি উন্মোচন করিয়া দিয়া স্বামীকে অর্থ-দায়ে সহায়তা করিবেন।" ব্রাহ্মণীর

একটী স্মুবর্ণের নৎ ও রৌপ্যের তাবিজ ও খাড়ু ভিন্ন অন্য অলঙ্কার না থাকায়, তিনি তাহার কোনখানি খুলিয়া দিতে পারিলেন না; তখন পতিকে অর্থের অভাববশতঃ বিচলিত দেখিয়া কষ্টে সঞ্চিত চল্লিশটী রৌপ্যমুদ্রা সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া দিলেন। হৈমবতীর এরূপ ব্যবহারে চূড়ামণি মহাশয় এককালে স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন, তিনি সস্নেহে সহধর্ম্মিণীর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। পতিকে বিস্মিতভাবাপন্ন দেখিয়া সতী উত্তর করিলেন, 'আপনার টাকা আপনাকে দিলাম, প্রয়োজন মত ব্যয় করুন।' হাতে পয়সা না থাকায় রামকৃষ্ণ আকাশ পাতাল ভাবিতেছিলেন, কিরূপে ব্যয়ভার নির্ব্বাহ করিবেন, তৎ-চিন্তায় উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন, অকস্মাৎ স্ত্রীদত্ত অর্থ কয়েকটী হস্তগত করিয়া তিনি ক্ষণকালের জন্য আনন্দসাগরে ভাসিলেন। পরক্ষণে, পরদিবস ভোলানাথ ঘরটী মেরামতের জন্য যাহা যাহা প্রয়োজন চূড়ামণিকে জানাইবে, একারণ আরও কয়েকখানি বাঁশ ও দড়ির সংগ্রহ-জন্য বাটী হইতে বহির্গত হইলেন, যতক্ষণ না তাঁহার গৃহটীর সংস্কার হইতেছে, রামকৃষ্ণ কিছুতেই নিশ্চিন্ত নহেন; তবে প্রয়োজন মত টাকা সংগ্রহ হইয়াছে, ইহাতে তিনি আশ্বস্ত।

(৩)

অদ্য ভোলানাথের কার্য্যে নিযুক্ত হইবার দিন। ব্রাহ্মণ ইতঃপূর্ব্বে ভোলানাথের কথামত সমস্ত সরঞ্জাম ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি দৈনিক নিয়মে অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া হস্ত-মুখাদি প্রক্ষালন পূর্ব্বক ভোলানাথের অপেক্ষায় বসিয়া আছেন, এমত সময়ে ভোলা-নাথ তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইয়া—"দাদাঠাকুর! দণ্ডবৎ" বলিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল। ব্রাহ্মণ ভোলাকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া প্রয়োজন মত জিনিষ পত্রগুলি দেখাইয়া দিলেন। ভোলা কয়েকজন কারি-কর সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইয়াছিল, চূড়ামণির আদেশ মত তাহাদিগকে কার্য্য আরম্ভ করিতে বলিল। চূড়ামণি মহাশয় মজুরদিগকে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে দেখিয়া ফুলের সাজি লইয়া স্বহস্তে পুষ্প-চয়নে বহির্গত হইলেন। হাত মুখ ধুইয়া তিনি শুদ্ধাচারে পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন, একারণ সে কার্য্যে তাঁহার আদৌ বিলম্ব হইল না, প্রতিদিন যে সময়ে বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া থাকেন, অদ্যও যথাসময়ে বাটী হইতে বহির্গত হইলেন।

লাভের প্রত্যাশায় ভোলানাথ চূড়ামণি মহাশয়ের গৃহ-সংস্কারে নিযুক্ত

হয় নাই, তবে যে চারি পাঁচজন কারিকরকে সঙ্গে আনিয়াছে, তাহাদিগের যথাযথ পারিশ্রমিক চূড়ামণি মহাশয়ের নিকট হইতে আদায় হইবে। যাহাতে সুচারুরূপে গৃহটীর সংস্কার হয়, ঘরটীর মেরামত দেখিয়া ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট হন, সে পক্ষে ভোলানাথের কোন অংশেই ত্রুটি হইতেছে না। জনমজুর-দিগকে যথাশক্তি পরিশ্রমের জন্য ভোলানাথ ব্যবস্থা করিয়াছে, ভোলা সেই কারিকরগণের সর্দ্দার। সর্দ্দার যখন কাযটী সুচারুরূপে শেষ করিবার কথা বলিয়াছে, তখন তাহারা দস্তুরমত শ্রমসহকারে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। অন্য-স্থানে যে কার্য্য করিতে যত সময় লাগে, বিপ্রগৃহে তাহার অর্দ্ধেক সময়ে সেই কার্য্য সম্পাদন করিতে তাহারা সকলেই বদ্ধপরিকর হইয়াছে।

চূড়ামণি দেব-সেবার জন্য পুষ্প-চয়নে বহির্গত হইয়া প্রত্যহ যে যে স্থানে যে সকল পুষ্প সংগৃহীত হয়, অদ্যও সেই সেই স্থান হইতে সেই পুষ্পরাশি সঞ্চয় করিয়া গৃহে ফিরিলেন, পুষ্প-সাজি পূজাগৃহের যথাস্থানে রাখিয়া পট্টবস্ত্র-বিনিময়ে তৈলধুতি পরিধানে তিনি গৃহ-সংস্কার দেখিতে আসিলেন। ঘরামীগণ ভোলানাথ সহ মটকার কার্য্যে সংযত রহিয়াছে, সকলেই শশব্যস্তে কায করিতেছে, রামকৃষ্ণ তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু কাহা-কেও কোন কথা বলিলেন না। তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে, তাহাদের কাযে কামাই পড়িবে, একারণ তিনি কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া স্বহস্তে তামাক সাজিতে বসিলেন।এবং ভরপূর ধূমপান করিয়া ভোলানাথকে ডাকিলেন, ব্রাহ্মণের ডাক শুনিয়া ভোলানাথ মটকা হইতে নামিয়া আসিতে-ছিল, চূড়ামণি মহাশয় সে সময়টুকু বৃথা যাইবে ভাবিয়া স্বয়ং কলিকাটী সর্দ্দারের হাতে তুলিয়া দিলেন। ভোলানাথ ঠাকুর মহাশয়ের হস্ত হইতে কলিকা লইতে প্রথমে কথঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইল, কিন্তু রামকৃষ্ণ তাহার ভাব দেখিয়া বলিলেন "ভোলানাথ! ইহাতে দোষ কি! তুমি আমার কার্য্যে এখানে আসিয়াছ, আমার বাটীতে আমি তামাক খাইতেছি, সে তামাক আমাকেই সাজিতে হয়, আমার জন্য তামাক সাজিয়াছি, আমি খাইয়াছি, তোমায় প্রসাদ দিতেছি গ্রহণ কর, ইহাতে সঙ্কুচিত হইবার কি আছে?"

তদুত্তরে ভোলানাথ—"দাদাঠাকুর! আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই আমার শিরোধার্য্য" বলিয়া কলিকাটী চূড়ামণির হস্ত হইতে তুলিয়া লইল। রামকৃষ্ণের এ দিক ও দিক গৃহ মেরামতের তত্ত্বাবধারণ করিতে প্রায় এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল, চূড়ামণি মহাশয় স্নানের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ব্রাহ্মণের সকল

কার্য্যেই তাড়া হুড়া, তিনি অবিলম্বে অন্তঃপুরে যাইয়া সরিষার তৈলপূর্ণ একটী পাত্র লইয়া উপস্থিত হইলেন এবং শরীরের স্থানে স্থানে তৈল চাপড়াইয়া জলাশয় অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তৈল মালিশ ও স্নানে ব্রাহ্মণের সমধিক বিলম্ব হইল না, তিনি সিক্ত বসনে বাটীতে আসিয়া, শুদ্ধবস্ত্র পরিধানে গৃহস্থিত নারায়ণ পূজায় মনোনিবেশ করিলেন। ব্রাহ্মণ একাগ্রচিত্তে দেবসেবায় নিযুক্ত, সংগৃহীত পুষ্পরাজি তুলসীপত্র ও চর্চ্চিত চন্দনে মনসাধে নারায়ণের আরাধনায় বহুক্ষণ কাটিয়া গেল, সে বেলার দিকে বিপ্রবরের আদৌ লক্ষ্য ছিল না। প্রতিদিনই ব্রাহ্মণের পূজায় এইরূপ বিলম্ব হইয়া থাকে, ইহাতে বিস্মিত হইবার কি আছে?

পূজান্তে রামকৃষ্ণ সেই গৃহ হইতে বাহিরে আসিলেন, হস্তে জলপূর্ণ একটী সুবৃহৎ ঘটী; তিনি ভোলানাথের জন্য নারায়ণের চরণামৃত আনিতেছেন, জলপূর্ণ পাত্রে কয়েকটী ফুল, তুলসীপত্র ও দুই এক ফোঁটা সিক্ত চন্দন ভিন্ন আর কিছু নাই। ব্রাহ্মণের পূজায় সুদীর্ঘ সময় যাপিত হইয়াছিল, এ কারণ ভোলানাথ ব্যতীত অপর অপর কারিকরগণ সে দিনের মত বিদায় হইয়াছে। ভোলানাথেরও দৈনিক কার্য্য সমাধা হইয়াছে। চূড়ামণির গৃহে প্রসাদ পাইবার অপেক্ষায় ভোলা ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎকার জন্য রহিয়াছে। দৈনিক পরিশ্রমান্তে অবগাহন স্নান ভোলানাথের নিত্য অভ্যাস, চূড়ামণির গৃহ-সংস্কার করিয়া সে সন্নিকটস্থ পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া আসিয়াছিল, পরক্ষণে চূড়ামণি মহাশয় দেখা দিলেন, তজ্জন্য এভাবে ভোলানাথকে অধিকক্ষণ থাকিতে হইল না, যেহেতু সে স্নানান্তে চূড়ামণি মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইবার পরক্ষণেই রামকৃষ্ণ তাহাকে চরণামৃতের ঘটীটি অর্পণ করিলেন। ক্ষুৎপিপাসায় ভোলানাথ উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল, চূড়ামণিদত্ত চরণামৃতপূর্ণ ঘটীটী পাইয়া সে সমগ্র পানীয় স্বল্পক্ষণে গলাধঃকরণ করিল।

(৪)

এদিকে ব্রাহ্মণ আহার করিতে বসিয়াছেন, গৃহিণী পরিবেশন করিতেছেন। ভোলানাথকে আহার করাইবার জন্য অন্যান্য দিন অপেক্ষা দুই তিনটী অতিরিক্ত ব্যঞ্জনের ব্যবস্থা হইয়াছে, কিন্তু ব্রাহ্মণের খাইতে অধিক বিলম্ব হইল না। তিনি আচমন করিয়া আহারে বসিয়াছিলেন, খাদ্যগ্রহণান্তর আসন হইতে উঠিয়া পড়িলেন, উচ্ছিষ্ট পাত্রেই ভোলানাথের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে অন্নব্যঞ্জন সাজাইয়া দেওয়া হইল। ব্রাহ্মণ তাম্বুল গ্রহণান্তে

ভোলানাথকে আহারের জন্য বাটীর ভিতর আহ্বান করিলেন, কিছুক্ষণ পূর্ব্বে ভোলা উদর পূর্ণ করিয়া চরণামৃত গ্রহণ করিয়াছে, সম্মুখে প্রচুর ভাত তরকারি দেখিয়া সে মনে মনে বড়ই আক্ষেপ করিল, কিন্তু গত বিষয়ের অনু-শোচনায় কোন ফল নাই জানিয়া এবং চূড়ামণি-পত্নীকে সম্মুখে দেখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক ব্রাহ্মণের উপবিষ্ট কাষ্ঠাসন তুলিয়া দিয়া ধরাসনে উপবেশনানন্তর আহারে প্রবৃত্ত হইল। ভোলানাথ দাইল তরকারি যাহা খাইতেছে, তাহারই রসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত হইতেছে, কিন্তু ইতঃপূর্ব্বেই জলপান করিয়া তাহার উদর পূরিয়া গিয়াছিল, একারণ অধিক গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। সম্মুখে চূড়ামণি মহাশয় ভোলানাথকে "এটা খাও ওটা খাও" বলিয়া আপ্যায়িত করিতেছেন, কিন্তু ভোলানাথের সাধে বাধ হইয়াছে। চূড়ামণি মহাশয়ের বাটীতে প্রসাদ গ্রহণে তাহার একান্ত সাধ ছিল, অনর্থক কতকটা জল খাইয়া তাহাকে সে খাদ্যগ্রহণে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে, এখন চূড়ামণি মহাশয়ের আকিঞ্চনে সে উদরের অতিরিক্ত পরিমাণ ভোজ্য কিরূপে গ্রহণ করিতে পারে? অথচ খাদ্য সামগ্রীর সুমধুর আস্বাদনে তাহার রসনা আপ্লুত হইতেছে। সে মনে মনে বিশেষ অনুতপ্ত হইলেও মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলিতে পারিতেছে না।

ভোলানাথের ধ্রুব বিশ্বাস,—চূড়ামণি মহাশয় তাহাকে উত্তমরূপে আহার করাইবার অভিপ্রায়েই খাদ্য সামগ্রীর এরূপ আয়োজন করিয়াছেন, তাহাকে জল খাওয়াইয়া আহার গ্রহণে বঞ্চিত করিবেন, এরূপ অভিসন্ধি তাঁহার ছিল না; কিন্তু ভোলা দেবতার প্রসাদ চরণামৃতের কতক গ্রহণ কতক রাখিয়া খাওয়া কর্ত্তব্য জ্ঞান করে নাই, এই জন্যই পাত্রস্থ সমস্ত পানীয় উদরসাৎ করিয়াছিল। ভোলানাথের পাত্রে খাদ্য সামগ্রী সমধিক পরিমাণে পড়িয়া রহিল দেখিয়া ব্রাহ্মণ অন্তঃকরণে তৃপ্তি লাভ করিলেন না, নিজের অবিমৃষ্যকারি-তায় ভোলানাথের খাওয়া হইল না স্থির বুঝিয়া তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। দেব-দ্বিজে ভোলানাথের অচলা ভক্তি, তৎপ্রদত্ত চরণামৃত কণামাত্র ভূমিসাৎ না করিয়া ভোলা সমস্তই সাগ্রহে সযত্নে উদরসাৎ করিয়াছিল। চূড়ামণি মহাশয়ের অনুরোধে ভোলানাথ যত পারিল, খাদ্য সামগ্রী উদর পূর্ণ করিয়া ভক্ষণ করিল। আহারান্তে গাত্রোত্থানকালে চূড়ামণিকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিল—"চরণামৃত।"

চূড়ামণি মহাশয় বুঝিলেন, অতিরিক্ত পানীয়-গ্রহণে ভোলানাথের আহারের পক্ষে ব্যাঘাত ঘটিল, একারণ তাহাকে আর এক দিন প্রসাদ গ্রহণে আকিঞ্চন করিলেন।

শ্রীরাধানাথ মিত্র।

গঙ্গা।

অয়ি পতিতোদ্ধারিণী-গঙ্গে!
হিরণ্যগর্ভ-বিভোর-বিগলিত
দ্রবীভূত মাধব, কমণ্ডলু পূরে
রাখিল আপন সঙ্গে!

বিখ্যাত-সৌর-সগর-বংশ
মুনি-ক্রোধ-নয়নে পেয়েছিল ধ্বংস
দিলীপ-নন্দন-বন্দন-মুগ্ধ
ইন্দ্র ত্রিলোচন ব্রহ্মা জনার্দ্দন
অর্পিল মর্ত্তে আনিতে সঙ্গে।

যুগ-ব্যাপী-সুমেরু-শিখর-বিহারিণী,
কৈলাস-চূড়ে সঞ্চর-কারিণী,
মর্ত্ত-বাহিনী কল-কল-ধারে,
মেদিনী টল-মল-কম্পিত ভারে,
ধূর্জ্জটি-জটে ছল-ছল কল-কল
আর যুগ ভাব-বিভঙ্গে।

চতুষ্টয় দিক চারিটী বাহিনী
করিল ভোগবতী পাতাল-গামিনী
পদ্ম-মুনি সাথে পূরব চারিণী
জহ্নু-জঠর-বাস পরিহরি' ভ্রমণ
সুরধুনী ভগীরথ সঙ্গে।

শত-ধার-বাহিনী মৃদুল-মন্দা
ভূর্লোক বাহিয়া অলকনন্দা
সগর-বংশ উদ্ধার-কারিণী
কাণ্ডার মোক্ষ-পদ-বিধায়িনী
পাপ-বিনাশিনী পৃথ্বি-বিহারিণী
সাগর-গামিনী রঙ্গে।

———

আলোচনা।

জাপানের ষষ্ঠী দেবতা।

ষষ্ঠী ঠাকুরাণী আমাদের দেশের শিশুকুলের রক্ষয়িত্রী দেবী। শিশুগণের জীবন-মরণ ইঁহারই উপর নির্ভর করিয়া থাকে। জাপানেও ষষ্ঠী আছেন; কিন্তু জাপানের ষষ্ঠী—দেবী নহেন, দেবতা; তিনি পুরুষ; তাঁহার নাম—জিজো। ইনি জাপানের বালক বালিকাগণের ভাগ্য-বিধাতা।

জাপানের সুপ্রসিদ্ধ ইয়াকোহামা নগরের উপকণ্ঠে এক ক্ষুদ্র গিরি-শিখরে জাপানী ষষ্ঠী জিজো দেবের মন্দির অবস্থিত। এই মন্দিরের চতুষ্পার্শে শারি শারি চেরী বৃক্ষ। নগরের যে সকল বালক বালিকা অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়, তাহাদিগকে জিজোর মন্দির সান্নিধ্যে—এই সকল চেরী-বৃক্ষমূলে নিহিত করা হইয়া থাকে;—বসন্তকালে নিহত বালক-বালিকাগণের সমাধিসমূহ যখন রাশি রাশি চেরী পুষ্পে সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠে, তখনকার দৃশ্য বর্ণনাতীত!

কথিত আছে, মৃত বালক-বালিকাগণ রাত্রিকালে সমাধিস্থান হইতে উঠিয়া জিজোর সহিত খেলা করে।—এই সময় এনি-নামক দানবরাজের দুর্দ্ধর্ষ পুত্রগণ জিজোর সহচর শিশুগণকে আক্রমণ করিয়া থাকে; কিন্তু জিজো আক্রান্ত শিশুদিগকে স্বীয় বস্ত্রাভ্যন্তরে এমন ভাবে লুকাইয়া ফেলেন যে, দানব পুত্রগণ তাহাদের অস্তিত্বে সন্দিহান হইয়া স্বালয়ে প্রস্থান করিয়া থাকে। বসন্তকালে জাপানে বিশেষ সমারোহ সহকারে জিজোর অর্চ্চনা হইয়া থাকে।

দেবী সরস্বতীর প্রতিমা আবিষ্কার।

সম্প্রতি গয়ায় বিষ্ণুপাদ-মন্দিরের সান্নিধ্যে দেবী সরস্বতীর চতুর্ভুজা, বীণা-পুস্তকহস্তা, স্মিতবদনা এক প্রস্তর-প্রতিমা আবিষ্কৃত হইয়াছে। জনৈক ইংরেজ অধ্যাপক এই নবাবিষ্কৃত প্রাচীন প্রতিমার নামকরণ করিয়াছেন,—The Goddes of learning; এই প্রতিমা বুদ্ধ গয়ার বুদ্ধ-মন্দির নির্ম্মাণের সমকালে উৎকীর্ণ বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করিয়াছেন। গয়ায় দেবী বাগীশ্বরী নামেই প্রসিদ্ধা। ইহা অপেক্ষা দেবীর প্রাচীন প্রতিমা এ পর্য্যন্ত আর কোথায়ও আবিষ্কৃত হয় নাই। স্থানান্তরে এই প্রাচীন প্রতিমার প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইল।

শিক্ষা-সমস্যা।

প্রাইমারী শিক্ষার প্রবর্ত্তন লইয়া দেশে বেশ একটুখানি সমস্যা জাগিয়া উঠিয়াছে। এমন কি, ব্যাপারটী এখন বৈদ্য-সঙ্কটে দাঁড়াইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না!—

অনেকেই ইহার আলোচনায় হাত দিয়াছেন। আমরাও আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি লইয়াই কিছু বলিতে চাহিলে বোধ হয় ততটা দোষের বিষয় হইবে না।

একদল বলিতেছেন,—দেশে সেই সাবেকী শুভঙ্করী মানসাঙ্ক ধারাপাত ও সঙ্গে সঙ্গে কিছু ধর্ম্মভাব দ্বারা শিক্ষা প্রচলন করা। আর একদল বলিতেছেন,—নব্য জ্ঞান বিজ্ঞান এবং উদ্ভিদ বিদ্যা ও স্বাস্থ্য বিদ্যাও কিছু কিছু প্রাথমিক শিক্ষায় প্রচলিত হউক!

ফলে দুইদলে বেশ মসী-যুদ্ধও হইয়া গিয়াছে। অনেকে আবার দেশের আপামর সাধারণ নিম্নশ্রেণী মাত্রেরই শিক্ষায় বিরোধী, বস্তুতঃ সংশয়টা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে; কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে বোঝা যাইবে,—এ বিষয়ে আমাদের গোলমাল করিবার কিছুই নাই। যখন একথা সর্ব্ববাদি-সম্মতি ক্রমে স্বীকৃত হইয়া গিয়াছে যে, বিনা শিক্ষায় কোন দেশ বা কোন জাতি উন্নত হইতে পারে নাই—তখন রাজার কাছে এই কথাটাই সর্ব্ববাদি-সম্মতি ক্রমে পরিগৃহীত হওয়া ঠিক নয় কি? আমাদের যাই হোক একটা "শিক্ষা চাই" তা সে কালের রীতিতেই কি জানি, কি একালের রীতিতেই বা কি জানি—

মানুষকে মনুষ্যত্বের দিকে টানিয়া আনাই যদি প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য হয়, তবে আমাদেরও প্রার্থনা যে বিফলতার দিকে না যাইয়া সফলতার দিকে অগ্রসর হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কারণ, যাহা শ্রেয়ঃ ও মঙ্গলকর, তাহা ভগবানেরও অভিপ্রেত। কেহ যদি আশঙ্কা করেন—সামান্য লেখা পড়া শিখিয়া দেশের লোক মামলা মোকদ্দমাবাজ, জোচ্চোর হইয়া যাইবে, তাহা হইলে উচ্চ শিক্ষাতেও যে সে আশঙ্কা নাই, তাহার প্রমাণ কি? অনেক উচ্চ শিক্ষিত লোকও ত মামলা করিয়া থাকেন। একরকম বলিতে গেলে—এল, এ,

বি, এ, পাশ করা উকীল মোক্তারগণই দেশের সর্ব্বপ্রকার মামলা মোকদ্দমার নেতা।

অল্প শিক্ষায় সনাতন ধর্ম্মভাব স্থায়ী হইবে না এ আশঙ্কাও অমূলক। যাহা সত্য—যাহা শাশ্বত—যাহা বিশ্বহিতের বোধদ্যোতক, তাহাই যদি ধর্ম্ম হয়, তবে তাহা চিরস্থায়ী থাকিবেই। তবে লোকে অন্ধভাবে যে শুধু বাহ্য আচারের অনুসরণ করিয়া চলিবে না, এ কথাটা ঠিক!

অনেকে বলিবেন—তাহা হইলে সনাতনত্বের লোপ পাইবে তাহার উপায়? কিন্তু আমরা বলি,—মানবসমাজ চির পরিবর্ত্তনশীল। একবার অতীত যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে না কি,—সেই অতীত অর্দ্ধ তামস যুগের ধর্ম্মভাব সমাজে ঠিক সেই প্রকারই প্রচলিত নাই; এমন কি, তাহার আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। তাই বলিয়া কেহ ভাবিয়া বসিবেন না, আমরা একবারে পরিবর্ত্তনেরই প্রয়াসী। আমরা চাই—ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গড়িয়া পিটিয়া যেমন করিয়া হউক, দেশের মানুষগুলা মনুষ্যত্বের পথে প্রধাবিত হউক। "আত্ম-বিস্মৃত" জাতি আবার মানুষ হউক। ইহাতে কাহারও যদি ব্যক্তিগত স্বার্থে বাধা পড়ে, তবে সে দোহাই আর চলিবে না। যেমন করিয়া হউক, চারিদিক হইতে দেশে যখন একটা জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে, এবং সকল মানুষ যে এক মহামানবেরই অংশীভূত—এই একটা সুর যখন আকাশ বাতাস প্লাবিয়া স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছে, তখন ভাবের ঘরে ফাঁকি আর খাটিবে না। এমন এক দিন ছিল, যখন মানুষকে পশুর মত খাটাইয়াও মানুষের আশা মিটে নাই। গরু ভেড়ার দামেই মানুষ বিকাইয়াছে; কিন্তু আজ কালের গতি ফিরিয়াছে, শিক্ষিত লোকেরাও বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন,—লেখা পড়া শিখিয়া দেশে যদি কুলীর অভাব হয়, তবে আমরাই নিজে ভাল কুলী হইব, আর শত গুণে স্বাবলম্বী হইব।

দেশে বিলাসিতার বৃদ্ধির আশঙ্কা? কিন্তু তাহাও ভুল। কালচক্র যদি মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে এ বিলাসিতাটাও স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। লেখা পড়ার গন্ধমাত্র হীন স্থলেও যদি বাবুত্বের পূর্ণপ্রভাব প্রস্ফুটিত হয়, তবে লেখা পড়া শিখিলেই যে তাহা একেবারে কমিবে, তাহার আশা করা যায় না; কিন্তু দেশে যদি বিলাসিতা কমাইতে পারা যায়—তাহা এই লেখা পড়া শিক্ষা হইতেই হইবে। আত্মবোধ বলিয়া জিনিষটা যতদিন দেশের

মানুষের মনে মুদ্রিত না হয়—তত দিন মানুষ যে প্রতিপদেই অধঃপতনের দিকে নামিয়া যাইবে; এ আশঙ্কা একেবারেই সমূলক!—কিন্তু এই আত্ম বোধ জাগাইতে হইলে শিক্ষাই মাত্র প্রকৃত পন্থা, অন্য পথ নাই।

প্রাইমারীশিক্ষার দিকে আমাদের একটু বেশী মাত্রায় ওকালতী দেখিয়া কেহ যদি ভাবিয়া বসেন, আমরাও গড্ডলিকা প্রবাহে ভাসিয়াছি, তাহা হইলে নাচার;—সত্যই আমরা দেশের আপামর সাধারণ সকলকারই শিক্ষা চাই। কুশিক্ষা যে নয় একথা নিশ্চিত।

সকল বিষয়েই দেশের লোকগুলার মনে একটু বোধ জাগ্রত হউক, ইহাই আমাদের কামনা। তাহার জন্য যদি শুভঙ্করী মানসাঙ্কের সঙ্গে সঙ্গে একটু স্বাস্থ্য-শিক্ষা একটু উদ্ভিদ-বিদ্যা চলিয়া যায়,—আমাদের আপত্তি নাই। রামায়ণ মহাভারতের পুণ্য কথার সঙ্গে যদি, হামির গারবিলডীর পুণ্য চরিতকাহিনী জড়িত হইয়া যায়, তাহা হইলেও আমরা অসংলগ্ন বলিব না;—শিক্ষা ত বটে!

এক চোখা দৃষ্টিতে দেখিলে ভাল জিনিষের মধ্য হইতেও মন্দ বাহির করিতে পারা যায়,—তাই লইয়া আপনার দৃষ্টিটীরই উচ্চকণ্ঠে অভ্রান্ততার প্রচার করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়। এমন যে পূর্ণিমার শশী, তাঁহারও মধ্য হইতে কত খুঁত বাহির হয়। এমন কি বৈজ্ঞানিকেরা কহেন, তিনি খুঁতে ভরা!—

লেখা পড়া শিখিয়া কেহ যদি একটু বাবুগিরী করিল, তাই লইয়া সোর-গোল করা এবং সবাই তাহা হইলে বাবুত্বেই দীক্ষিত হইবে এই আশঙ্কায় শিক্ষা-প্রচারের দিকে একেবারেই প্রতিকূল মত দেওয়া, ইহার অপেক্ষা মারাত্মক ভ্রম আর কিছুই হইতে পারে না।

অতীত কেতাবিতী শিক্ষার যুগেও কি আমাদের সমাজে বিলাসিতা ছিল না? নিশ্চয় ছিল। সৌন্দর্য্যের বোধ যে দিন হইতে মানুষের মনে জাগ্রত হইয়াছে, সেই দিন হইতে বিলাসিতা উঁকি মারিয়াছে, যিনি যত বড়ই পণ্ডিত হউন, অতীত কালে দেশে যে বিলাসিতা ছিল না, একথা কেহই জোর করিয়া বলিতে পারিবেন না? তাহা হইলে আর্য্য সভ্যতারই অর্দ্ধেক মিথ্যা হইয়া যায়। তবে, সেকালে সিকি পয়সার চুরুট ও নাকে সোণার চশমা যে ছিল না, একথা ঠিক।—কিন্তু গোড়াতেই বলিয়াছি, কালের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তথাপি এই বাবুয়ানীর মধ্য হইতেও কি আমরা মনুষ্যত্বের পরিচয় পাই

নাই? অৰ্দ্ধোদয় যোগে বন্যাপীড়িত অঞ্চলে স্বেচ্ছাসেবকগণের কার্য্য-কলাপ এ বিষয়ে তাহার উজ্জ্বল সাক্ষী।

তাই বলিয়া কেহ মনে করিবেন না, আমরা বাবুগিরীরই সমর্থন করিতেছি। আমাদের ইহাই বক্তব্য যে, যদি দেশের লোকগুলাকে ঠিক বুঝাইয়া দিতে পারা যায়—তাহারা কোন দেশের লোক,—তাহাদের অতীতই বা কি,—বর্ত্তমানই বা কি? তাহা হইলে বোধ হয়, চীৎকারও করিতে হইবে না।—আপনা হইতেই যাহা শ্রেয়ঃ তাহাই বহিয়া যাইবে।

মোট কথা কালোচিত শিক্ষা চাই, গোবরগণেশ গোচ ভাল মানুষ গঠিবার পক্ষে ও জুজুর ভয় মানাইবার পক্ষে শিক্ষার সে এক দিন ছিল। এখন যদি কাহাকে সেই শিক্ষা দেওয়া যায় যে, ডান গালটীতে মারিলে বাঁ গালটী পাতিয়া দিবে, তাহা হইলে শ্রীমদ্ভাগবতের সেই সর্পের কথাই মনে পড়িবে না কি?—ভীষণ জীবন-সংগ্রামের দিনে দুর্ব্বল নিরীহ গোবেচারা হইয়া চলিলে নিস্তার কোথায়? একটা দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাই। এই যে চক্ষের সম্মুখে শত শত নিরীহ শ্রমজীবী মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া কষ্টে দিন গুজরাণ করিতেছে, ইহার পরিশ্রমের উচিত মূল্য কি তাহারা পাইতেছে? বাবুদের গাড়ী ঘোড়ার এমন কি দোল দুর্গোৎসবের খরচাটাই কি তাহারা যোগাইতেছে না?—তাহারা একটু শিক্ষা পাইলে এতটা ফাঁকি কি চলিত?—স্বচক্ষেই কত দেখা গিয়াছে, সারাদিন হাড় ভাঙ্গা খাটুনি খাটিয়াও কত হতভাগ্যের পূরা মজুরি মিলে নাই। সামান্য একটু দোষে তাহার দিনের রোজ চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের একটু চোক মুখ থাকিলে এতটা অন্যায়—অবাধে দেশের উপর দিয়া কখনই বহিয়া যাইত না!

দরিদ্র শ্রমজীবী সাধারণই দেশের বাহুবল, তাহারাই যদি ফাঁকিতে পড়িয়া অনাহারে ও অর্দ্ধাহারে কাটায়, তবে দেশের মঙ্গল কোথায়?

অনেকে বঙ্গদেশের কৃষকদের স্বচ্ছল অবস্থার কথা বলেন। যদি সময় ও স্থান পাই, তবে দেখাইব—বঙ্গদেশের কৃষক সাধারণের অবস্থা ভাল নয়—তাহারাও শিক্ষার অভাবে তাহাদের পরিশ্রমের পূর্ণ মূল্য হইতে বঞ্চিত হইতেছে।—

পরিশেষে আমাদের সানুনয় নিবেদন—গোখ্‌লে প্রবর্ত্তিত শিক্ষা 'আইন যদি দেশের সর্ব্বত্র প্রচলিত হয়, তবে হউক!—বাদ প্রতিবাদ করিয়া যজ্ঞ পণ্ড করিবার প্রয়োজন নাই। নিজের সামান্য সুবিধা ও স্বার্থের দিকে চাহিয়া

দেশের বড় স্বার্থের পথে কণ্টক রোপণ করিতে যাওয়া মানুষের কায নয়, একথা মুক্তকণ্ঠেই বলা যায়। বারান্তরে আরও বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীশ্রীপতিমোহন ঘোষ।

আবাহন।

সুর—বেহাগ, তাল—একতালা।

আজি, গেঁথেছি যতনে চিকণ ফুলমালা
তোমার চরণ'পরে করিবারে দান,
এস মোহন-সাজে হৃদয়-বন-মাঝে
প্রাণের আকুলতা হ'ক্ অবসান।
গগন-বারিধি-মাঝে ভাসিছে চন্দ্রমা ;
শ্যামলা ধরণী-গায় ঝরিছে সুষমা ;
হাসে পুলকে নিশি,
সোহাগে হাসিছে দিশি,
চারিদিকে হাসি-রাশি
হাসি ভরা প্রাণ।
জ্যোছনা মাখিয়ে সকল গায়,
আমোদ-হরষে আকাশ চায় ;
ফুল্ল লতিকা দোলে
সু-শোভিত নানা ফুলে
মৃদুল সমীর ধীরে
ধরিয়াছে তান ;
এস হে হৃদয়েশ !
করুণা দানি' এস
জানে না আকুল হৃদি আবাহন গান।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষাল।

বিবাহে বিপত্তি।

(১)

"হ্যাঁলা পোড়ারমুখী, তুই এখানে ব'সে, আর আমি সারা সহর খুঁজে মর্‌ছি!"

"কেন ভাই এত খুঁজ্‌ছিস্?"

"মরণ আর কি! ঐ যে বলে, 'যার বিয়ে তার মনে নাই, পাড়া পড়সীর ঘুম নাই।' এ যে দেখি তাই হ'ল!"

এক ষোড়শী সুন্দরীর সহিত, একটী চতুর্দ্দশবর্ষীয়া কিশোরীর এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল। যিনি ষোড়শী তাঁহার নাম পদ্মাবতী, অপরা এলোকেশী। উভয়েই সুন্দরী, উভয়েরই বর্ণ বর্ষাবিধৌত নবমল্লিকার ন্যায়। কিন্তু এ সৌন্দর্য্যে পার্থক্য আছে। একজনের যৌবনের পূর্ণ জোয়ার, নদী কূলে কূলে ভরিয়া উঠিয়াছে, শরীর যেন সে প্রবাহ ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। অপরা বসন্ত-মলয়-সমীরান্দোলিতা অপূর্ণা কল্লোলিনী! দেহে যৌবনের প্রথম বাঁশরী বাজিয়াছে, কূলপ্লাবী প্রবাহের প্রথম সাড়া পাওয়া গিয়াছে, দেহ পূর্ণতার দিকে অগ্রসর অথচ এখনও পূর্ণ হয় নাই! সে সৌন্দর্য্য উষার ললাটে অরুণের প্রথম কিরণচ্ছটার ন্যায়,—স্ফুটনোন্মুখ গোলাপ-কলিকার অভ্যন্তরস্থ বর্ণ-বিভার ন্যায় নির্ম্মল, স্নিগ্ধ, মনোমুগ্ধকর। বাক্‌পটু শিশু অপেক্ষা অস্ফুটবাক্ শিশুর কথা যেমন মধুরতর, পূর্ণযৌবনা অপেক্ষা এই কিশোর-যৌবনের সন্ধিস্থল-সমাগতার সৌন্দর্য্য তদ্রূপ অধিকতর মনোমুগ্ধকারী! কিন্তু আজি এই অপূর্ব্ব সুন্দরীর মুখখানি ম্লান, যেন বাসন্তীপূর্ণিমায় গ্রহণ লাগিয়াছে।

পদ্মাবতী বলিল, "এখন চল্ তোকে সাজাবার জন্য ডাক্‌চে।"

এলোকেশী। সেজে কি হবে ভাই, আমি এম্‌নিই থাক্‌বো।

পদ্মা। এম্‌নি বেশেই বেরবি নাকি?

এলো। তা'তে ক্ষতি কি? তাদের পছন্দ না হলে যে ফিরে যাবে এ সম্ভাবনা তো নাই, তবে আর তোদের ভয় কি? আমাকে সকলে মিলে এম্‌নি হাতে ফেলে দিচ্ছিস্ যে, যম ছাড়া উদ্ধার পাবার কোনও উপায় নাই।

বলিতে বলিতে এলোকেশীর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া গেল। চক্ষে জল দেখিয়া

পদ্মাবতীর হৃদয় ব্যথিত হইল, বলিল, "তা কি ক'রবি ভাই, মেয়ে মানুষের অদৃষ্ট ছাড়া আর উপায় কি? ছি! চোখের জল ফেল্‌তে নাই, তুই যদি এমন করিস্ তোর বাপের কি হবে তা'কি বুঝ্‌ছিস্ না?"

এলো। তা জানি, বাবার ভিটে পর্য্যন্ত বিকিয়ে যাবে। আমি বাপ মার অবাধ্য হ'ব না; তুই যা ভাই, আমি একটু পরে যাচ্ছি।

পদ্মাবতী চলিয়া গেল। তখন সেই সুন্দরী কিশোরী, ভূমিতে জানু পাতিয়া অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে বলিতে লাগিল,—"ভগবান্! এ বিপদে আমায় রক্ষা কর, তুমি ব্যতীত আমায় আর কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না। অবলা-বধে কি তোমার এত ইচ্ছা দয়াময়! তুমি যদি আমায় রক্ষা না কর, তবে আমি মরিব।"

(২)

নীলাম্বর বসু ইচ্ছাপুর গ্রামের একজন সম্পন্ন গৃহস্থ। বয়স প্রায় চল্লিশ বৎসর। পরিবার-বর্গের মধ্যে গৃহিণী, দুইটী পুত্র ও একটী কন্যা। নীলাম্বর বাবুর পিতামহ এই গ্রামে আসিয়া বাস আরম্ভ করেন। জমী-জমা যথেষ্ট করিয়াছিলেন, এক সময়ে গ্রামের মধ্যে তাঁহারাই বিশেষ সম্পন্ন ছিলেন।

এখন সে অবস্থার ভাটা পড়িয়াছে। মামলা মকদ্দমায় নীলাম্বর বাবুর সর্ব্বনাশ হইয়াছে. জোত-জমা অধিকাংশ গিয়াছে; যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহাতে কোনও রূপে সম্ভ্রম রক্ষা হইতে পারে। কিন্তু ঋণ যথেষ্ট, পরিশোধের কোনও উপায় দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। এই নীলাম্বর বাবুর কন্যাই আমাদের গল্পের এলোকেশী। এলোকেশী অবিবাহিতা, অর্থের অভাবে আজিও তাহার বিবাহ হয় নাই, উপস্থিত হইবারও কোনও সম্ভাবনা দেখা যাইতেছিল না।

ইচ্ছাপুর গ্রামের অনতিদূরে দেবগ্রাম নামে একটী পল্লী আছে। কানাইলাল দত্ত সেই স্থানের অধিবাসী। কানাই বাবু মহাজন, দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে আপনার ব্যবসা চালাইতেছেন। দেবগ্রামের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে তাঁহার ক্ষমতা অসীম। কানাই বাবুর বিশেষ গুণ এই যে, কেহ তাঁহার নিকট একবার ঋণ গ্রহণ করিলে, সে আর সহজে নিষ্কৃতি পাইত না। ধীরে ধীরে অধমর্ণের সমুদয় সম্পত্তি যায় ভিটা পর্য্যন্ত গ্রাস করিয়া তিনি তাহাকে ছাড়িয়া দিতেন। কানাই বাবু স্বভাবতঃ ক্রূর, অত্যাচারী ও পাষাণ-হৃদয়বিশিষ্ট ছিলেন। কানাই বাবু বিপত্নীক।

মকদ্দমা উপলক্ষে নীলাম্বর বাবু কানাই বাবুর নিকট ঋণ করিয়াছেন। সুদে আসলে টাকা আজ পাঁচ হাজারে দাঁড়াইয়াছে। নীলাম্বর বাবু চতুর্দ্দিক আঁধার দেখিতেছেন, ভিটা বাঁচাইবার কোনও উপায় দেখিতে পাইতেছেন না।

একদিন সন্ধ্যার পর গৃহিণী নীলাম্বর বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁগা, আজ তোমার মন অমন ভারী ভারী কেন? আজ সারাদিন যেন কি ভাব্‌ছ?

নীলাম্বর। অনেক ভাবনাই এসে যুটেছে, কি যে করিব, ভেবে পাচ্ছি না; ব'স,—বল্‌ছি।

গৃহিণী নিকটে উপবেশন করিলে, নীলাম্বর বাবু বলিলেন, "কানাই বাবুর ঋণ পরিশোধের তো কোনও উপায় দেখ্‌তে পাচ্ছি না।"

গৃহিণী। তাঁর পাওনা কত হ'য়েছে?

নীলাম্বর। কাল তিনি আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন, সুদে আসলে পাঁচ হাজার টাকা হ'য়েছে।

গৃ। এত হ'য়েছে! এত কি ক'রে হ'ল?

নীলা। সুদ খুব বেশী, এখন কি ক'র্‌ব তাই ভাব্‌ছি।

গৃ। তিনি কি ব'ল্লেন?

নীলা। তিনি সময় দিতে একেবারেই অসম্মত! আমি তাঁকে কত মিনতি ক'রে বল্লেম যে, একটা কিস্তিবন্দী ক'রে দিন, আমি ধীরে ধীরে সব শোধ কর্‌বো, তা কিছুতেই সম্মত হলেন না, ঠিক সময়ে টাকা না দিতে পারিলে নালিশ ক'রবেন।

গৃ। তবে কি হ'বে?

নীলা। নালিশ হ'লে সর্ব্বস্ব যাবে, ভিটে পর্য্যন্ত থাক্‌বে না, গাছতলায় দাঁড়াতে হ'বে।

গৃহিণীর চক্ষু দিয়া দরদরধারে জল বহিতে লাগিল। বলিলেন, "হা, ভগবান, তবে আমাদের কি হ'বে? ছেলে পুলে নিয়ে কোথায় দাঁড়াব? তা হ্যাঁগা, কোনও উপায় হ'বে না কি? আর কোথাও টাকা নিয়ে ওর টাকাটা শোধ করে দিলে হয় না?"

নীলা। তাই বা কি করে হয়, এ দেশে বড় মহাজন আর কে আছে? কিন্তু কানাই বাবু আজ একটা কথা ব'লে পাঠিয়েছেন, যদি আমরা সে কথা শুনি, তবে তিনি আমাদের একেবারে ছাড়িয়া দিবেন।

গৃহিণী। কি কথা ?

নীলা। এলোকেশীর সহিত তাঁর বিবাহ দিতে হ'বে।

গৃহিণীর মস্তকে বজ্রপাত হইল ? তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ওমা আমার কচি মেয়ের সঙ্গে সেই পঞ্চাশ বছরের বুড়োর বিয়ে দিতে হ'বে ? না গো—ভিক্ষা করিয়া খাই তাও ভাল, তবু অমন হারামজাদার হাতে মেয়ে দিতে পার্‌বো না।

নীলা। আমি নিরুপায়, আমার কিছু করবার ক্ষমতা নাই। কিন্তু তুমি অত ভাবছ কেন ? মেয়ের খাবার প'রবার তো কোন কষ্ট থাক্‌বে না।

গৃহিণী। ওগো তুমি বল কি ? কেশী যে আমার দুধের মেয়ে, সে যে এখনও সংসারের কিছুই জানে না। পঞ্চাশ বছরের বুড়োর হাতে প'ড়ে তার কি সুখ হ'বে ? টাকা নিয়ে কি মেয়ে আমার বিছিয়ে শোবে ? আজ বাদে কাল যে শ্মশানে যাবে. কোন্ প্রাণে তার হাতে মেয়ে সঁপে দিবে ?

নীলা। আমার কি আর বড় সাধ ? তবে কি ক'রবো, আজি যদি রাজী না হই, আমার মাথা রাখবার জায়গা থাক্‌বে না ? তখন মেয়ের বিয়ে দিবই বা কি ক'রে ? ভিটে মাটি শূন্য লোকের ঘরে, কোন্ গৃহস্থ ঘরের ছেলে বিয়ে করতে আস্‌বে ?

গৃহিণী। ওগো, সে যে ডাকাত, সে যে কত লোককে মেরে খুন করেছে, কত গেরস্তর বৌ ঝীর সর্ব্বনাশ করেছে ; আমার মেয়ের গায়ে টুসি মারলে রক্ত পড়ে, অমন ননীর পুতুলকে কশাইয়ের হাতে তুলে দিবে ?

গৃহিণীর অশ্রুবর্ষণই সার। কানাই বাবু এলোকেশীর রূপ গুণের কথা শুনিয়া তাহাকে লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। এতদিনে সুবিধা পাইয়া তিনি তাঁহার ভীষণ অস্ত্র উত্তোলন করিয়াছেন,—হয় এলোকেশী লাভ হইবে,—নতুবা নীলাম্বর বাবুর সর্ব্বনাশ সুনিশ্চিত।

কানাই বাবুর জয় হইয়াছে।—নীলাম্বর বাবুকে বিবাহে সম্মতি দিতে হইয়াছে। এলোকেশী বিবাহসংবাদে মর্ম্মাহত হইয়াছে, তাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সে বিলক্ষণ বুঝিয়াছে, এ বিবাহ অপেক্ষা তাহার পক্ষে মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। বালিকা ভগবানের চরণে কাঁদিয়া দিন কাটাইতেছে, কিন্তু উদ্ধারের কোনও সম্ভাবনাই দেখিতে পাইতেছে না। হায়, তাহার অদৃষ্টে কি এই ছিল ! কানাই বাবু যে যথারীতি কন্যা দেখিতে আসিয়া তাহার রূপে গুণে একেবারেই মুগ্ধ হইয়াছেন, একথা বলাই বাহুল্য।

(৩)

নীলাম্বর বাবুর গৃহের অনতিদূরে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। পুষ্করিণীর তীর নানাবিধ বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ। দুই পার্শ্বে দুইটী বাঁধান ঘাট। গ্রামের ছেলে মেয়েরা এই পুষ্করিণীতে স্নানাদি করিয়া থাকে।

মধ্যাহ্নকাল, রৌদ্রের কিরণ অতিশয় প্রখর হইয়াছে। গ্রামের প্রায় সকলেই এখন বিশ্রাম করিতেছে—পথে, ঘাটে কাহাকেও দেখা যাইতেছে না;—এমন সময়ে একটী যুবক বন্দুক স্কন্ধে লইয়া এই পুষ্করিণীর তীরে উপস্থিত হইলেন। যুবকের বয়ঃক্রম অনুমান দ্বাবিংশতি বৎসর, দীর্ঘ উন্নত দেহ, সৌষ্ঠবময় বিশাল উজ্জ্বল চক্ষু, দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশদাম গুচ্ছে গুচ্ছে স্কন্ধোপরি আসিয়া পড়িয়াছে। বেশ আড়ম্বরহীন, অথচ পারিপাট্যের কোনও বিশেষ অভাব ছিল না। যুবক বহুদূর হইতে একটী পক্ষীর অনুসরণ করিয়া এপর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

পুষ্করিণীর তীরে উঠিবামাত্র, একটী বৃক্ষতলে যুবকের দৃষ্টি নিপতিত হইল। তিনি দেখিলেন, এক অনিন্দ্যসুন্দরী কিশোরী বৃক্ষতলে বসিয়া আছে। বালিকা প্রায় বাহ্যজ্ঞানহত, তাহার দুই চক্ষু দিয়া জলধারা বহিতেছে। যুবক মনে মনে ভাবিলেন, এ বালিকা কে? তিনি ধীরে ধীরে বালিকার নিকটবর্ত্তী হইলেন, তথাপি সে তাহা জানিতে পারিল না। এই সুন্দরীই আমাদের এলোকেশী।

কতক্ষণ পরে বালিকা নিকটে অপরিচিত মনুষ্য দেখিয়া চমকিয়া উঠিল,—সে চক্ষু তুলিয়া চাহিবামাত্র চারিচক্ষুর সম্মিলন হইল! সে দৃষ্টি মুহূর্ত্তমাত্র—কিন্তু সেই এক মুহূর্ত্তেই এলোকেশীর হৃদয় একেবারে তোলপাড় হইয়া গেল। এ যুবক কে! কেন এখানে আসিয়াছে! এমন দেবতুল্য মূর্ত্তি যাহার, সে বোধ হয় খুব দয়াবান। হতভাগিনীর উদ্ধারার্থেই কি এই দেবমূর্ত্তি এসময়ে এখানে উপস্থিত হইয়াছে! সে পুনর্ব্বার চোখ তুলিয়া দেখিল, আবার চারিচক্ষের সম্মিলন। কি লজ্জা! কিন্তু এলোকেশীর গতিশক্তি রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, সে সেস্থান হইতে সরিতে পারিতেছে না।

যুবকের বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই যে, বালিকা কোনও দারুণ মর্ম্মব্যথায় পীড়িত। তিনি বিস্মিত হইয়া বালিকাকে দেখিতেছিলেন, এমন সুন্দরী আর কখনও তাঁহার চক্ষে পড়ে নাই। তাহার মুখে কি সরলতা, কি নম্রতা ব্যক্ত হইতেছিল! এমন সুশীলার জীবনে কি কোনও ব্যথা থাকিতে পারে?

বালিকাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া তিনি ভাবিলেন, বোধ হয় সে কিছু বলিতে চাহে, কিন্তু লজ্জায় বলিতে পারিতেছে না, সুতরাং তিনি অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "অপরিচিত হইয়াও আপনার সহিত কথা কহিতেছি, মার্জ্জনা করিবেন, কিন্তু বোধ হইতেছে, আপনার কিছু বলিবার আছে, যদি কিছু প্রয়োজন হয়, অনুমতি করুন।"

কি মধুর স্বর! এলোকেশীর কর্ণে এমন সুমধুর আশ্বাসবাণী আর কখনও প্রবেশ করে নাই। সে কি বলিবে ভাবিয়া পাইতেছে না, লজ্জায় তাহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে; বলিবার অনেক কথা আছে, কিন্তু পোড়া মুখে যে কোনও কথা বাহির হয় না।

যুবক পুনরপি বলিলেন, "এস্থানে আর কেহ নাই, আপনার কথা আর কাহারও কর্ণে প্রবেশ করিবে সে সম্ভাবনা নাই, বুঝিতে পারিতেছি আপনি বিপদাপন্ন, বিন্দু পরিমাণে আপনার সাহায্য করিতে পারিলেও আনন্দিত হইব।"

এবার এলোকেশীর কথা ফুটিল, বলিল,—"আপনি কে!"

যুবক। পরিচয়ের এখন প্রয়োজন নাই, যদি কখনও আবশ্যক হয়, জানিতে পারিবেন। তবে এখন এই মাত্র বলিতে পারি—অর্থে, সামর্থ্যে যদি কোনও উপকারের সম্ভাবনা থাকে, আমি তাহাতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত!

এলো। আমি ঘোর বিপদাপন্ন, যদি আমার উদ্ধার না হয়, তবে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

যুবক। যদি বাধা না থাকে, তবে আমাকে বিপদের কথা বলুন।

এলোকেশী ভাবিতেছিল, বলিবে কি না? কে যেন তাহাকে বলিতেছিল, "বল, তোমার মঙ্গল হইবে।" যুবককে দেখিবামাত্র তাহার হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইয়াছে, ইনি তাহাকে রক্ষা করিবেন বলিয়া ভরসা আসিয়াছে।

যুবকের কথার উত্তরে এলোকেশী বলিল, "একজনের হাতে আমার জীবন সমর্পিত হইবার উপক্রম হইয়াছে, কিন্তু তাহার হাতে যাওয়া অপেক্ষা আমার মরণই মঙ্গল।"

যুবক বুঝিতে পারিলেন, বলিলেন, "আপনার পিতা-মাতার সম্মতিতে অবশ্য এ কার্য্য হইতেছে?"

এলো। হ্যাঁ।

যুবক। তবে আপনার এ ধারণা কেন?

এলো। তাহার উপর আমার বিন্দুমাত্রও ভক্তি নাই।

যুবক। কেন?

এলো। শিশুকাল হইতে সে ব্যক্তির দুষ্কর্ম্মের পরিচয় পাইয়া আসিতেছি, শিশুকাল হইতেই তাহাকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছি, সে ঘোর অত্যাচারী, পরপীড়ক, সতীর অবমাননাকারী।

যুবক শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "তবে আপনার পিতা-মাতা এ বিষয়ে সম্মত কেন?"

এলো। তাঁহারা নিরুপায়, আমার পিতা সে ব্যক্তির নিকট ঋণী, পিতা এ বিষয়ে সম্মত না হইলে আমাদের সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে, সে আমাদের ঘর বাড়ী সমস্ত বিক্রয় করিয়া লইবে, সেই হৃদয়-হীন ব্যক্তির নিকট বিন্দু মাত্রও দয়ার আশা নাই!

যুবক কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, "আপনাদের ঋণ কত?"

এলো। তাহা আমি ঠিক জানি না।

তারপর বালিকার পিতার নাম ধাম জানিয়া লইয়া যুবক বলিলেন "ভগবানের উপর নির্ভর করুন, আপনার ন্যায় সরলাকে তিনি নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন। আপনার নিকট আমার এই মাত্র প্রার্থনা, আমাদের এই সাক্ষাতের বিবরণ কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না, এবং আরও একটী অনুরোধ, অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে বিস্মৃত হইবেন না। ভগবান আপনাকে কুশলে রাখুন, আমি আপাততঃ বিদায় হইতেছি।"

যুবকের কণ্ঠস্বরে কথাগুলি ব্যতীত বোধ হয় আরও কিছু ব্যক্ত হইতেছিল। কথাগুলি শুনিয়া এলোকেশী আবার যুবকের প্রতি চাহিয়া দেখিল, আবার চারিচক্ষু সম্মিলিত হইল! যুবক দেখিলেন, বালিকার বিশাল নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ! মনে মনে বলিলেন, তোমার নয়নজল মুছাইতে পারিলে জন্ম সার্থক মনে করিব, যে ব্যক্তি তোমার ন্যায় সুশীলার হৃদয়লাভ করিতে পারে, সেই যথার্থ সৌভাগ্যবান্।

(৪)

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর এক সপ্তাহ অতীত হইয়াছে। এই কয়দিন এলোকেশী এক মুহূর্ত্তের জন্যও যুবককে ভুলিতে পারে নাই। সে কথা কি ভুলিবার? সে যে বড় আশা পাইয়াছে, সে যে উদ্ধার পাইবে, সে বিষয়ে কি

আর সন্দেহ হইতে পারে? এমন দেবতুল্য মূর্ত্তি যাহার, সে কি কখনও বৃথা আশ্বাস দিতে পারে? এলোকেশী কখনও এমন কথা মনে স্থান দিতে পারে না।

এক সপ্তাহ অতীত হইয়া গেল। কাল এলোকেশীর বিবাহ, তথাপি যখন সেই যুবকের কোনও কথা শুনিতে পাওয়া গেল না, তখন এলোকেশীর আবার বিষম চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইল। তবে কি তিনি কিছু করিলেন না? তাহার ন্যায় হতভাগিনীর জন্য তিনি কেনই বা এত করিতে যাইবেন? তাঁহার আশ্বাস প্রদান কি কেবল মুখের কথা? তিনি কি হতভাগিনীকে প্রতারণা করিলেন? না, না, এলোকেশী তাঁহাকে কখনই প্রবঞ্চক ভাবিতে পারিবে না। তিনি বোধ হয় অক্ষম, তাহাদিগকে সাহায্য করিবার মত সামর্থ্য হয় ত তাঁহার নাই? শক্তিতে না কুলাইলে তিনিই বা কি করিবেন? এই কয়দিন এলোকেশী কেবল তাঁহাকেই ভাবিয়াছে, তিনি যে খুব ভদ্র, খুব দয়ালু, সে বিষয়ে তাহার কোনও সন্দেহ নাই। হতভাগিনীর কপালে যাহাই ঘটুক না কেন, তাঁহাকে সে কখনই মন্দ ভাবিবে না।

আবার এলোকেশীর মনে চিন্তা আসিল,—তবু তিনি একটা খবরই বা দিলেন না কেন? তা যদি কিছু করিতে না পারেন, তবে শুধু শুধু খবর দিয়াই বা কি হইবে? কিছু করিতে পারিলেন না বলিয়া কি তাঁহার মনে কষ্ট হয় নাই? তা হয়েছে বৈ কি? কষ্ট হয় নাই এ কথা এলোকেশী ভাবিতে পারে না। সে ভাবিতেছে, হতভাগিনীর জন্য নিশ্চয় তাঁহার মনে কষ্ট হইয়াছে, লজ্জা হইয়াছে! হায়, সে কি কেবল অন্যের মনে কষ্ট দিবার জন্যই জন্মিয়াছিল? সে কি আর একবার তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না? আর একবার দেখা পাইলেই বা কি হইবে? কি হইবে তাহা সে জানে না, তবু তার প্রাণ, আর একবার তাঁহাকে দেখিতে চায়?

এলোকেশীর পিতা-মাতা, মহা উৎসাহে বিবাহের আয়োজন করিতেছেন। এলোকেশী ভাবিতেছে, এত উৎসাহ কেন? তাহার মাতার মন দুঃখে পূর্ণ ছিল, এই সম্বন্ধ হওয়া অবধি, তিনি কতবার চক্ষের জল ফেলিয়াছেন, সহসা তাঁহার মনে এত উৎসাহ কিরূপে আসিল? গতরাত্রে তাহার মা বলিতেছিলেন, "মা তুই বড় সৌভাগ্যবতী, ভাবিস্ না মা, ভগবান্ তোর মঙ্গল করিবেন।" মা এমন কথা বলিলেন কেন? তবে কি তিনি কোনও কিছু করিতেছেন? তাই বা কি করিয়া হইবে? এলোকেশী শুনিয়াছে,

কানাই বাবুর বাড়ীতেও খুব আয়োজন চলিতেছে। এইরূপ নানাবিধ চিন্তায় তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ।

একদিন কাটিয়া গেল। অদ্য বিবাহ। নীলাম্বর বাবুর গৃহে অনেক আত্মীয়-স্বজনের সমাগম হইয়াছে; কর্ত্তা, গৃহিণী প্রফুল্ল মনে সকলকে অভ্যর্থনা করিতেছেন। প্রচুর খাদ্যাদির আয়োজন হইয়াছে, ছোট ছোট ছেলে মেয়ের ছুটাছুটি আনন্দ কোলাহলে বাড়ী পরিপূর্ণ। আর এলোকেশী! সমবয়স্কারা এলোকেশীকে ঘেরিয়া রহিয়াছে, কত আমোদ করিতেছে, কিন্তু তাহার হৃদয় বিষণ্ণ! সে ভাবিতেছে, হায়, অদৃষ্টে কি এই ছিল, তিনি,—সেই দেবতা,—তিনিও কি আমার উদ্ধারে সমর্থ হইলেন না!

সন্ধ্যা সমাগত। আত্মীয়া পাড়ার মেয়েরা ক'নে সাজাইতে বসিয়া গেল। গুরুস্থানীয়ারা বলিতে লাগিলেন, "মা, দুঃখ কর কেন মা? বড় ঘরের বৌ হ'তে যাচ্ছ, সুখে থাক্‌বে, খাবার প'রবার কখনও কষ্ট থাক্‌বে না। জামাইএর বয়স কিছু বেশী, তাতে দোষ কি! মেয়ে ছেলে সুখে থাক্‌লেই যথেষ্ট, তোমার টাকা কড়ি গহনা কাপড় যথেষ্ট হ'বে।" সমবয়স্কারা বলিতেছিল, "ভাই, বড় ঘরের বৌ হ'তে চল্লি, আমাদের তো মনে থাক্‌বে? এখন মুখে হাসি নাই, তখন হ'য়তো গরিব ব'লে চেয়ে দেখ্‌বি না! কানাই বাবুর বয়স কিছু বেশী, তাতে দুঃখ কেন ভাই, ঐ কুমুদিনীর স্বামীর বয়স খুব বেশী, কিন্তু সে কেমন সুখে আছে; স্বামীর অবস্থা ভাল, নূতন নূতন গহনায় তার গা ভ'রে যাচ্ছে। কানাই বাবুর টাকা কড়ি বেশ আছে, তোকে আদর যত্ন ক'রবেন বৈ কি!" কিন্তু এলোকেশীর কর্ণে এ সমস্ত কথা প্রবেশ করিতেছিল কি না সন্দেহ, তাহার হৃদয়ে যাহা হইতেছিল—সে কথা কে বুঝিবে?

যথাসময়ে বাদ্যাড়ম্বর সহ বর আসিয়া উপস্থিত হইল। কানাই বাবু যথাসাধ্য সাজসজ্জা করিতে ত্রুটি করেন নাই। নবীনা সুন্দরী রমণী বিবাহ করিবেন, তাঁহার হৃদয়ে আনন্দ ধরিতেছিল না। আনন্দ হইবারই কথা, সে অঞ্চলে এলোকেশীর ন্যায় সুন্দরী আর কেহ ছিল না।

লগ্ন উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে নীলাম্বর বাবু, কানাই বাবুকে লইয়া কক্ষান্তরে গমন করিলেন। এই কক্ষে উপস্থিত হইয়া কানাই বাবু, বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে এক খানি কাগজ বাহির করিয়া নীলাম্বর বাবুর হস্তে প্রদান করিলেন। এই কাগজ খানি নীলাম্বর বাবুর পাঁচ হাজার টাকার ঋণের অমসুক। কথা

ছিল, বিবাহের পূর্ব্বে কানাই বাবু তমসুক খানি ফেরত দিবেন। তমসুক ফেরত দেওয়া হইলে পর, তাঁহারা পূর্ব্ব কক্ষে ফিরিয়া আসিলেন।

লগ্ন উপস্থিত-প্রায়। কানাই বাবুকে ভিন্ন কক্ষে লইয়া যাওয়া হইল। কিন্তু দেখা গেল, সে কক্ষে বিবাহের কোনরূপ আয়োজন নাই। একটী টেবিলের উপর কয়েকখানি কাগজ, দোয়াত, কলম প্রভৃতি রহিয়াছে, পার্শ্বে একখানি চেয়ারে এক সৌম্যমূর্ত্তি প্রবীণ ব্যক্তি উপবিষ্ট রহিয়াছেন।

কানাই বাবু বিস্মিত হইয়া নীলাম্বর বাবুর প্রতি চাহিয়া দেখিলেন, নীলাম্বর বাবু বলিলেন, "কানাই বাবু, বিবাহে আপনাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে আমি সম্মত নহি।"

ক্রোধে কানাই বাবুর চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "কি, আমার সহিত প্রতারণা? তমসুক ফেরত পাইয়া কন্যাদানে অস্বীকার? সাবধান, যদি রক্ষা পাইতে চাও, আমার কথানুসারে কার্য্য কর, নতুবা আমি সর্ব্বনাশ করিব।"

তখন সেই প্রবীণ ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "কানাই বাবু, আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে নীলাম্বর বাবুর ইচ্ছা নাই,—ঐ টেবিলের উপর আপনার প্রাপ্য টাকা রহিয়াছে গ্রহণ করুন, টাকার পরিবর্ত্তে কন্যালাভ এ ক্ষেত্রে অসম্ভব!"

রাগে কানাই বাবু একেবারে অন্ধ হইয়া গেলেন, বলিলেন, "আপনি কে মশা'য় এখানে দালালি করিতে আসিয়াছেন?"

মৃদুহাস্যে প্রবীণ ব্যক্তি বলিলেন, "আমার নাম শ্রীদেবেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী, এ ক্ষুদ্র ব্যক্তির নাম বোধ হয় আপনার অজ্ঞাত নহে।"

দেবেন্দ্রকুমার! কি সর্ব্বনাশ! রায়পুরের জমীদারের দেওয়ান মহাশয়ের নাম সে অঞ্চলে কাহারও অজ্ঞাত ছিল না। তাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের কথা সকলেরই সুবিদিত ছিল। সেই প্রবলপ্রতাপান্বিত দেবেন্দ্রকুমার, এই দীন দরিদ্র নীলাম্বর বাবুর পক্ষে! কানাই বাবু একেবারে নীরব, বজ্রাহতের ন্যায় স্পন্দহীন!

দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন, "কানাই বাবু, বুঝিতে পারিতেছেন নীলাম্বর বাবুকে আপনার হস্ত হইতে রক্ষা করিতে আমার সামর্থ্য আছে? আপনার টাকা বুঝিয়া লইয়া অবিলম্বে এই স্থান হইতে প্রস্থান করুন, নতুবা আমি আপনাকে যাইতে বাধ্য করিব।"

মন্ত্রাহত ভুজঙ্গের ন্যায় শক্তিহীন কানাই বাবু, টাকা লইয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন।

তখন নীলাম্বর বাবু করযোড়ে দেবেন্দ্র বাবুকে কহিলেন, "কি বলিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব জানি না, আপনি অদ্য আমার মান ও প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন।"

দেবেন্দ্র বাবু উত্তর করিলেন, "কোনও কথা বলিবার প্রয়োজন নাই, নীলাম্বর বাবু, আপনার সুশীলা কন্যার নিকট আমার পুত্র যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তাহা রক্ষা করিয়া আমিই যথেষ্ট সুখী হইয়াছি।"

দূরে বাদ্যধ্বনি শোনা গেল। দেবেন্দ্র বাবু বলিয়া উঠিলেন, নীলাম্বর বাবু, আপনার জামাতা সমাগতপ্রায়!

(৫)

বিদ্যুদ্বেগে কথা ছড়াইয়া পড়িল। সকলে বিস্মিত হইয়া শুনিল, রায়-পুরের দেওয়ান দেবেন্দ্র বাবু, নীলাম্বর বাবুর ঋণ পরিশোধ করিয়া দিয়া কানাই বাবুকে বিদায় দিয়াছেন। তাঁহারই পুত্র শ্রীমান্ ভূপেন্দ্রকুমারের সহিত এলোকেশীর বিবাহ হইবে। গ্রামের সকলেই বর দেখিবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িল! বিস্ময় ও আনন্দের স্রোত বহিতে লাগিল!

আর এলোকেশী! সে এতক্ষণ একস্থানে বসিয়া ছিল। এ ঘটনার কিছুই জানিতে পারে নাই, তবে বুঝিতে পারিতেছিল, বাহিরে কোনও কাণ্ড হই-তেছে! তবে কি তিনিই কোনও কিছু করিতেছেন? হতভাগিনীর কি উদ্ধার হইবে? তাহার মনে কত চিন্তা উঠিতেছিল, পড়িতেছিল। এমন সময়ে পদ্মাবতী ছুটিয়া আসিয়া, তাহার পৃষ্ঠে দুই কিল বসাইয়া দিয়া বলিল, "পোড়ারমুখী, এত কাণ্ড হইয়াছে, আর তুই আমাকে একটু আঁচও দিস্ নাই!"

এলোকেশীর বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল, বলিল,—"কি হয়েছে ভাই আমি ত কিছুই জানি না।"

পদ্মা। নে নেকি, আর অত ঠাট্ ক'রতে হ'বে না।

এলো। না ভাই, সত্যি বল্‌ছি আমি কিছু জানি না।

পদ্মা। ওমা, বলিস্ কি লো? তুই কিছু জানিস্ না? অত বড় দেও-য়ানের ছেলে তোকে বিয়ে করতে চায়, তার বাবা কানাই বাবুর টাকা শোধ ক'রে দিয়ে, তাকে এখান হতে বিদায় করে দিয়েছে;—আহা, বাবুর বর

সাজাই সার হ'ল! তোর বরকে লুকিয়ে দেখে এনুম, কি সুন্দর ছেলে! তোর রূপ দেখ্‌লে মুনি-ঋষির মন টলে যায়,—সে অত বড় লোকের ছেলে, তোকে না দেখেই যে বিয়ে করতে চেয়েছে,—একথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না। তুই নিশ্চয় সব জানিস্‌, সে নিশ্চয় তোকে কোথাও দেখেছিল, আর তার মুণ্ডুটা ঘুরে গেছে,—বল্‌ পোড়ারমুখী, আমার কাছে লুকোবি!

এলোকেশী নীরব। সে কোনও কথা বলিবে না, পদ্মাবতীও ছাড়িবে না। শেষে এলোকেশীকে সমস্ত ঘটনা বলিতে হইল। পদ্মাবতী শুনিয়া বলিল, "ওমা তাই'ত বলি, এ যোগাযোগ হ'ল কি ক'রে! সাবাস্‌ মেয়ে যা হ'ক! হ্যাঁলা, অজানা অশোনা ছেলে, ফুট্‌ফুটে দেখেই কি ক'রে গলা ধ'রে সোহাগ কত্তে গেলি?"

কৃত্রিম কোপে পদ্মাবতীকে একটী চিম্‌টি কাটিয়া এলোকেশী বলিল, "মর্‌ তুই পোড়ারমুখী, গোল্লায় যা, যা মুখে আস্‌ছে তাই বল্‌ছিস্‌!"

হাসিতে হাসিতে পদ্মাবতী বলিল, "দাঁড়া ভাই, দু'দিন র'য়ে ব'সেই মর্‌তে দে, আজ ম'র্‌লে তোর বাসর জাগ্‌বে কে?"

যথাসময়ে বিবাহ হইয়া গেল। শুভ দৃষ্টির সময় আবার চারি চক্ষুর সম্মিলন হইল! এলোকেশী দেখিতে পাইল, সে তাহার বাঞ্ছিত দেব-পদেই স্থান পাইয়াছে। তারপর বাসর। আমরা এ বাসরের বর্ণনা করিতে একেবারেই অক্ষম, শুনিয়াছি সে দিন শ্রীমান ভূপেন্দ্রকুমারকে পদ্মাবতীর হাতে বড় নাকাল হইতে হইয়াছিল।

ফুলশয্যার দিন, ভূপেন্দ্রকুমার এলোকেশীকে কথা কহাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সমস্তই বৃথা হইল! এলোকেশী ভাবিতেছিল, কি প্রকারে কথা কহিবে, বড় লজ্জা করে। সে দিন বিপদে পড়িয়া মুখরার ন্যায় কত কথা বলিয়াছে, আজ তাহা স্মরণ করিয়া লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল! ভূপেন্দ্র দেখিলেন, এ উপায়ে হইবে না, অন্য পথ অবলম্বন করিতে হইবে;—তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "ভদ্রে! তবে বোধ হয় এখনও আপনার কার্য্য সম্পূর্ণ করিতে পারি নাই, যদি আরও কোন প্রয়োজন থাকে, অনুমতি করুন, আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া সুখী হইব!"

এবার আর এলোকেশী চুপ্‌ করিয়া থাকিতে পারিল না, ধীরে ধীরে উত্তর করিল, "আমি দাসী, দাসীকে এত লজ্জা দিবেন না।"

বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। দুই হস্তে এলোকেশীকে তুলিয়া ধরিয়া ভূপেন্দ্রকুমার,

সাদরে সেই কোমল, প্রেমবিহ্বল, দেহলতাখানি বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন, সেই ফুল্লকুসুমতুল্য, সুধাপরিপূর্ণ, কম্পিত ওষ্ঠযুগলে তাঁহার ওষ্ঠ সম্মিলিত হইল।

ভূপেন্দ্র বলিলেন, "দাসী! কে বলিল দাসী! এমন মনোমোহিনী মূর্ত্তি যাহার, সে কি কখনও দাসী হইতে পারে? তুমি আমার রাণী, আমার হৃদয়-রাজ্যের অধীশ্বরী! বল, প্রিয়তমে, আমাকে পাইয়া সুখী হইয়াছ?"

এলোকেশী কোনও কথা বলিতে পারিল না, ঝর ঝর করিয়া তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল, সে স্বামীর বক্ষে মুখ লুকাইল!

শ্রীঃ——

পাচ্ছ নাকো দেখা গো।

যেমন চম্‌কে উঠে চিকুর ক্ষণিক
জলদ-বক্ষ ভাতিয়া;—
তেমন তিলেক তরে উঠেছিল
হৃদয় তব মাতিয়া।

মাতাল মতন বরষা নদী
দুদিন চলে ছুটিয়া,—
তব মত্ত প্রণয় উঠেছিল
তেম্‌নি ক'দিন ফুটিয়া।

যেমন ছিলাম তেম্‌নি আছি,
নাইকো কোথা ভুল;
বিরাট বপু সূক্ষ্ম এখন,—
চক্ষু তাহার মূল।

তখন বিশ্বব্যাপী বিরাট দেহ
গড়্‌তে গিয়ে সখা গো,—
এমন ক্ষুদ্র করি দিচ্ছ ফেলি,
পাচ্ছ নাকো দেখা গো।

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।

আকবর।

(ঐতিহাসিক চিত্র।)

যাঁহার সর্ব্ববাদিসম্মত শাসনে মোগল সাম্রাজ্য ভারতে উন্নতি লাভ করিয়াছিল,—যিনি হিন্দু মুসলমান, পার্শী খ্রীষ্টিয়ান সকলের প্রতি সমদর্শী ছিলেন—আজিও যাঁহার নাম ভক্তি-গদগদকণ্ঠে জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে লক্ষ লক্ষ নরনারী কীর্ত্তন করে, সেই প্রাতঃস্মরণীয় ভুবনবিখ্যাত অক্ষয় কীর্ত্তিস্থল আকবরের সংক্ষিপ্ত চরিত্র জানিতে কাহার হৃদয়ে না দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা হয়? বিচ্ছিন্ন, বিধ্বস্ত, চূর্ণ বিচূর্ণ মোগল-সাম্রাজ্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থি পঞ্জরগুলি একত্র সংগ্রহ করিয়া আকবর এক শাসনাধীনে অবস্থিত এক বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন—রাজা প্রজার প্রতিনিধি এবং প্রকৃতিপুঞ্জের মনোরঞ্জনই রাজার কর্ত্তব্য। * তাই আমরা যখনই সেই নরপতির জীবনের কার্য্যপ্রণালী বিশ্লেষণ করি, তখনই দেখিতে পাই তিনি অনন্যসাধারণ।

আকবর তাঁহার শিক্ষিত ও উদারচেতা বন্ধু ফৈজী ও আবুল ফজলের মতামত বড়ই আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করিতেন। উক্ত মহাত্মাদ্বয়ের শিক্ষা দীক্ষা আকবরের ব্যক্তিগত জীবনে বিশেষ আধিপত্যও স্থাপন করিয়াছিল। তিনি বিদ্যা ও জ্ঞানলাভের জন্য প্রকৃত উৎসুক ব্যক্তিকে উৎসাহিত করিতেন, কিন্তু ছলনা বা ভণ্ডামী তাঁহার চক্ষুঃশূল ছিল। এই জন্যই তিনি তাঁহার সভা হইতে ভণ্ড "উলামা দিগকে" বিতাড়িত করিয়াছিলেন। অধ্যাপক ব্লক্‌ম্যান (Prof Blockman) বলেন, "তিনি আত্মম্ভরিতা ও শিক্ষাভিমানিতাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন।" এইজন্য কেহ কেহ মনে করেন, তিনি বিদ্যা-শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করিতেন না; কিন্তু এরূপ উক্তির মূলে আদৌ সত্য নিহিত নাই। কারণ, আকবর যদি শিক্ষিত লোকদিগের প্রতি ঔদাসীন্যই প্রকাশ করিতেন, তবে খান্-ই-আজম্ মির্জ্জা, মির্জ্জা আব্দুর্রহিম, নিজামুদ্দীন আহম্মদ এবং ঐতিহাসিক বদৌনী প্রভৃতি তাঁহার দরবারে এতদূর প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতেন না। আকবর শিক্ষা বিস্তারে এতদূর আগ্রহান্বিত ছিলেন যে, তিনি দেশ বিদেশ হইতে পুস্তক সংগ্রহ করিয়া তাঁহার বিশাল পুস্তকাগার সুসজ্জিত করিতেন। কোন হিন্দু-প্রণীত মৌলিকগ্রন্থ দেখিলেই

---

* আইন—ই—আকবরী।

তিনি তাঁহার সুশিক্ষিত সভাসদ্ দ্বারা পারশ্য ভাষায় অনুবাদ করাইয়া তাহার মর্ম্ম শ্রবণ করিতেন। আইন-ই-আকবরী প্রণেতা বলেন যে, আকবর প্রতিদিন যোগ্য পাঠকদ্বারা নানাবিধ পুস্তক পাঠ করাইয়া শ্রবণ করিতেন এবং যেদিন যে পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পড়া হইত, তিনি স্বহস্তে সেই পৃষ্ঠায় পেন্‌সিলের চিহ্ন অঙ্কিত করিতেন। অধিকন্তু পারশ্রমিকরূপে সুবর্ণ বা রজতমুদ্রা দান করিয়া পাঠককে উৎসাহিত করিতেন।

আকবর ব্রাহ্মণদিগকে বলপূর্ব্বক ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করিতেন, এইরূপ মন্তব্য কোন কোন ঐতিহাসিকের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা এমন কথা বলিতেছি না যে, এই মন্তব্য ভিত্তিহীন। কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান ও বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আকবর যখন বৈরামের কর্ত্তৃত্বাধীনে ছিলেন এবং বৈরামই যখন প্রকৃতপক্ষে রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন; তখন তাঁহার প্ররোচনায় আকবর এইরূপ পক্ষপাতিত্ব করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে বৈরামকে তিনি মক্কা প্রেরণ করিয়া স্বয়ং দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই তিনি হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিকে সমভাবে রাজকার্য্যে নিয়োগ করিতে ঘোষণা করিলেন। ঘোষণাবাণী তিনি আজীবন প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রাজত্বের সপ্তম বর্ষে অর্থাৎ যখন তিনি একবিংশতি-বর্ষীয় তরুণ যুবক, তখন তিনি বিজিত জাতির স্ত্রী, পুত্র বা সহচর অনুচরগণকে বলপূর্ব্বক বিক্রয় করিতে বা জেতৃ-সৈন্যগণের ক্রীতদাসরূপে রাখিতে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করেন। তাঁহার এই নিষেধাজ্ঞা প্রচারের ফলে বিজিত জাতির স্ত্রী, পুত্র, ভৃত্য, অনুচরেরা স্ব স্ব অভিপ্রেত স্থানে যাইতে স্বাধীনতা লাভ করে। তিনি বলিতেন, "পিতা রাজদ্রোহ করিলে কিম্বা স্বামী অন্যায় করিলে তজ্জন্য পুত্র বা স্ত্রী ধৃত, বন্দী বা ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত বা রক্ষিত হইবে কেন?"

আকবরের পূর্ব্বতন আফগান নৃপতিগণ সকলেই তীর্থযাত্রী হিন্দুদিগের নিকট হইতে কর আদায় করিয়া তদ্দ্বারা রাজ-কোষের অর্থবল বর্দ্ধন করিতেন। আকবর এই করপ্রথা নিতান্ত অন্যায় বুঝিয়া শত শত মুসলমানের আপত্তিতে কর্ণপাত না করিয়া ইহা উঠাইয়া দিয়াছিলেন।

প্রাগুক্ত তীর্থকর ছাড়া তাঁহারা বিধর্ম্মী হিন্দুদিগের উপর "জিজিয়া" নামে আর একটী কর স্থাপন করিয়াছিলেন। "তারিক্-ই-ফিরাজসাহি" গ্রন্থের লেখক বলেন যে, এই জিজিয়া কর আদায় করিবার সময় দেওয়ানের কর

সংগ্রাহকগণ হিন্দুর মুখে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিত। আকবর এই নিষ্ঠুর জিজিয়া কর তুলিয়া দিয়া মহানুভবতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন।

হিন্দু বালবিধবার তপ্ত অশ্রু দর্শনে সদয় সম্রাট্ আকবরের হৃদয় অনেক সময় জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইত। তিনি বিনীতভাবে হিন্দুসমাজের মধ্যে বাল-বিধবার পুনর্বিবাহের প্রথা আইন সঙ্গত বলিয়া ঘোষণা করেন। এই ঘোষণা কোন কোন বিজ্ঞ, রক্ষণশীল হিন্দুর মতের প্রতিকূল হইলেও ইহা সেই দয়াবান্ সম্রাটের প্রজার দুঃখ দূর করিবার প্রবল বাসনার অভিব্যক্তি,—সন্দেহ নাই। তিনি যজ্ঞাদিতে ও ক্রিয়া কর্ম্মাদির অনুষ্ঠানে প্রাণিবধ নিষেধ করেন এবং বিচারের পূর্ব্বে শপথ গ্রহণ প্রথাও অন্যায় বলিয়া ঘোষণা করেন। আকবর অত্যধিক মাত্রায় উপাসনা, উপবাস, ভিক্ষাবৃত্তি, তীর্থযাত্রা প্রভৃতি কার্য্যে প্রজাপুঞ্জকে অনুৎসাহিত করেন, কিন্তু তিনি কখনও এগুলি করিতে নিষেধ করেন নাই। তিনি হিন্দুদিগের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য গোবধ নিষেধ করেন। পক্ষান্তরে তিনি বরাহ মাংস ভক্ষণে অনুকূল মত প্রকাশ করেন। মুসলমানেরা কুকুরকে অস্পৃশ্য বলিয়া মনে করিতেন এবং এখনও প্রকৃত মুসলমান কুকুরকে পবিত্র বলিয়া মনে করেন না; কিন্তু আকবর কুকুরকে পবিত্র বলিয়া ঘোষণা করেন। মুসলমানের নিকট সুরা অপবিত্র অশুদ্ধ, আকবর মুসলমানদিগকে অল্পমাত্রায় মদ্যপানে উৎসাহিত করেন।

১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে আকবর তাঁহার সভাসদ্ মুসলমানগণের মধ্যে শ্মশ্রু গুল্‌ফ লুপ্ত করিবার প্রথা প্রচলন করেন। ইহাতে রক্ষণশীল মুসলমান সম্প্রদায় সম্রাটের উপর মনে মনে সাতিশয় অসন্তুষ্ট হন।

এইরূপে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, আকবর গতানুগতিকের অনুসরণ করিতে ভাল বাসিতেন না। তাঁহার ব্যক্তিত্বটুকু স্বাতন্ত্র্যটুকু তিনি পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

আকবর ক্ষমাশীল,—ধৈর্য্যসম্পন্ন—মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার প্রিয়বন্ধু আবুলফজলের হন্তা জাহাঙ্গীরকে উত্তরাধিকার সূত্রে রাজসিংহাসন প্রদানের উদাহরণের বিষয় চিন্তা করিলে এ কথার যাথার্থ্য সকলে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তিনি জানিতেন, ভগবান পাপীর শাস্তিদাতা। তাই তিনি নিষ্ঠুর জাহাঙ্গীরকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারীরূপে মনোনীত করিয়া দেখাইলেন যে, নরহত্যার শাস্তি জাহাঙ্গীরকে দেহান্তে ভগবান দিবেন, তিনি পিতা

হইয়া পিতার উপযুক্ত কার্য্য করিয়া যাইবেন। পাঠকবর্গ জানেন, আবুল ফজল আকবরের জীবনের জীবন ছিলেন। এমন জীবন-বন্ধুর হন্তার অপরাধ মার্জ্জনা, আবার তাহাকেই সিংহাসন প্রদান করা কম ধৈর্য্য শক্তির পরিচয় নহে!

আকবর উদারচেতা হইলেও তিনি "কুসংস্কারকে" পরিবর্জ্জন করিতে পারেন নাই। তিনি শুভদিন মানিতেন। মিঃ ব্লকম্যান্ বলেন যে, তিনি "জরোয়াষ্টার" ধর্ম্মনীতি পড়িয়া এইরূপ বিশ্বাসপরায়ণ হইয়াছিলেন। বদৌনীও ব্লকম্যানের কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।

আকবর ময়দানে ক্রীড়া করিতে বিশেষতঃ মৃগয়া করিতে বড় ভালবাসিতেন। কিন্তু জাহাঙ্গীরের জন্মের পর তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কখনও শুক্রবারে মৃগয়া করেন নাই। কারণ, 'তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যদি জাহাঙ্গীরজননী নিরাপদে প্রসব করেন, তবে তিনি কখনও পবিত্র শুক্রবারে শীকার করিবেন না;' বলা বাহুল্য এই প্রতিজ্ঞা ভীষ্মের প্রতিজ্ঞার ন্যায় তিনি আজীবন পালন করিয়া গিয়াছেন।

আকবর সঙ্গীত শ্রবণে বড়ই আমোদিত হইতেন। আবুল ফজল বলেন যে, সম্রাট্ স্বয়ং একজন সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীতরচয়িতা ছিলেন। আকবর স্বয়ং দুই শতাধিক সঙ্গীত রচনা করেন।

আকবর মোটামুটি খাদ্য খাইতেন। দৈনিক একবারমাত্র আহার করিতেন। তিনি মাংসাদি বড় পছন্দ করিতেন না, এমন কি কয়েক মাস যাবৎ একক্রমে মাংস ভক্ষণ না করিয়া থাকিতেন। আকবর ফলমূলাদির অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। এই ফলোৎপাদনের জন্য তিনি কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইরাণ ও তাহারণ হইতে কৃষিবিদ্যাপরায়ণ লোক আনিয়া তিনি আগ্রা ও ফতেপুর সিক্রীতে সুমিষ্ট ফলের বাগান রচনা করিতেন। কাবুল, কান্দাহার, কাশ্মীর এবং এমন কি সমরখন্দ হইতে সুমিষ্ট সরস ফল সমূহ সম্রাটের জন্য আনীত হইত।

আকবর অধিক রাত্রি কথোপকথন ও তর্কবিতর্কে যাপন করিতেন। নিশাশেষে সঙ্গীতজ্ঞগণ সুললিতস্বরে গান করিয়া সম্রাটের কর্ণে অমিয়ধারা বর্ষণ করিত। প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া সম্রাট্ অবগাহন স্নান করনানন্তর সভাসদগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। মধ্যাহ্ন কাল পর্য্যন্ত তিনি নানাবিধ রাজকার্য্য করিয়া আহার্য্য ভক্ষণ করিতেন। অপরাহ্নকালে সম্রাট্ নিদ্রা

যাইতেন। কখনও কখনও বা সম্রাট্ প্রভাতে ময়দান ক্রীড়া ও সন্ধ্যাকালে “চৌহান” ক্রীড়া করিতেন। মাধ্যাহ্নিক ভোজনের পরবর্ত্তী সময়টুকু সম্রাটের বিশ্রামের সময় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল।

আকবর দুর্দ্দমনীয় রাজপুত শক্তিকে প্রীতির হেমশৃঙ্খলে বাঁধিবার উদ্দেশ্যে অম্বর বা জয়পুরের ভগবানদাসের ভগ্নীর পাণিগ্রহণ করেন। কর্ণেল টড ভগবানদাসকে আকবরের বন্ধু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

কর্ণেল টড্ আকবর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—“আকবর মোগল সাম্রাজ্যের প্রকৃত ভিত্তিস্থাপক এবং দুর্দ্ধর্ষ রাজশক্তির সর্ব্বপ্রথম বিজেতা।” আকবর রাজপুতনায় শাসনশক্তি পরিচালনার উদ্দেশ্যে সে দেশ জয় করেন নাই। যাহাতে সমগ্র ভারত সাম্রাজ্যে অনাবিল শান্তি বিরাজ করে, এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়াই তিনি রাজপুত জাতির উন্নত শির অবনত করেন।

আকবরের অনেক পত্নী ছিল। তন্মধ্যে আটটী পত্নীর নাম সমধিক প্রসিদ্ধ। এই আটটী পত্নীর মধ্যে দুইটী রাজপুতবংশীয়া।

সম্রাট্ আকবরের শাসন প্রণালী-আদির বিস্তারিত বিবরণ এরূপ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কতকটা গোষ্পদে সমুদ্র কল্পনার ন্যায় অসম্ভব। আকবর ব্যক্তিগত জীবনে আড়ম্বরবিহীন হইলেও তিনি একজন সমৃদ্ধি-সম্পন্ন সম্রাট্ ছিলেন। তিনি জানিতেন যে, প্রজাসাধারণ রাজাকে একটী অপার্থিব বিস্ময়কর বস্তু বলিয়া জানে—তাহারা রাজার গৃহে জগতের বিস্ময়কর বস্তু দেখিতে চায়, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আকবর সম্রাটোচিত সমৃদ্ধি প্রকাশে কার্পণ্য প্রকাশ করিতেন না। এ দেশীয় ঐতিহাসিকেরা বলেন যে, আকবরের পাঁচ সহস্র হস্তী, দ্বাদশ সহস্র আরোহণোপযোগী অশ্ব এবং নানাবিধ চিত্র-বিচিত্র শিবির ছিল। বিশেষ বিশেষ উৎসবের সময় সম্রাট্ সুরঞ্জিত শিবিরের মধ্যে বসিয়া দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোকসমূহের অভ্যর্থনা করিতেন। সেই দিন সম্রাট্ তুলাদণ্ডে ওজনার্থ উত্থিত হইতেন, যে সমস্ত বহুমূল্য পদার্থদ্বারা সম্রাট্ তুলিত হইতেন, সে সমস্ত দর্শকদিগের মধ্যে বিতরণ করা হইত। সেই উৎসবের দিন সম্রাটের যত বৎসর বয়স হইত, তদনুযায়ী মেষ, ছাগল, মোরগ প্রভৃতি প্রাণী বিতরণ করা হইত এবং ছাড়িয়া দেওয়া হইত।

উৎসবের দিনে সম্রাট্ স্বহস্তে বাদাম এবং অন্যান্য ফল সভাসদ্‌গণের মধ্যে বিতরণ করিতেন। উৎসবের প্রধান দিবসে সম্রাট্ মণিরত্ন-খচিত সিংহাসনে উপবেশন করিতেন, আর তাঁহার সম্মুখদিয়া সুসজ্জিত হস্তী, গণ্ডার, ব্যাঘ্র,

শিকারী কুকুর প্রভৃতি নানাজাতীয় পশুসমন্বিত মিছিল চলিয়া যাইত। মিঃ হকিন্, মিঃ রো, মিঃ টেরী প্রমুখ বৈদেশিক পর্য্যটকগণও এইরূপ পশু দ্বারা গঠিত শোভাযাত্রা আকবরের পুত্র ও উত্তরাধিকারীদিগের শাসনকালে স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। বিশেষ বিশেষ উৎসবের দিনেই কেবল আকবরকে এইরূপ আড়ম্বরপূর্ণ দেখা যাইত, অন্য সময়ে তিনি আড়ম্বর শূন্য, সাদা সিদে লোকের ন্যায় অবস্থান করিতেন।

একই শাসনচ্ছত্রতলে ভারত সাম্রাজ্যকে আনয়ন করাই আকবরের উদ্দেশ্য ছিল। তিনি বাল্যাবধি জানিতেন—ভারতে অসংখ্য জাতি, তাহাদের ধর্ম্ম বিভিন্ন; সুতরাং এই অসংখ্য জাতি কখনও একই ধর্ম্মাবলম্বী হইবে না। প্রত্যেক ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করিয়া যে রাজা রাজত্ব করিতে পারিবেন, তিনিই ভারতীয় প্রজার হৃদয়াধিকার করিতে পারিবেন, এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া আকবর সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বীকেই সমভাবে দেখিতেন।

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

অনাথ বালক।

(১)

নিদাঘে দু'পুর বেলা, প্রখর কিরণ-মালা,
উপর গগনে থাকি ছড়ায় ভাস্কর।
তাপেতে পৃথিবী ফাটে, কার সাধ্য পথে হাঁটে,
অসহ্য উত্তাপে ক্লান্ত যত চরাচর॥

(২)

পথের পথিক যত, বৃক্ষতলে সমাগত,
প্রাণ হয় ওষ্ঠাগত থাকি পিপাসায়।
উদরান্ন চেষ্টা করি, নিজের কুটীরে ফিরি,
আইসে দরিদ্র যত উদর জ্বালায়॥

(৩)

ধনীর সন্তান যারা, ধবল পালঙ্কে তারা,
কোমল শরীর রেখে সুখে নিদ্রা যায়।

পাখার শীতল বায়, গাত্রঘর্ম্ম দূরে যায়,
"রোজ ওয়াটার" আসি সুগন্ধে মাতায়॥

(৪)

এ হেন উত্তাপ ভোগি, উদর পোষণ-লাগি,
দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছে অনাথ বালক।
"মাতঃ! ভিক্ষা দাও" ব'লে ডাকিছে করুণ বোলে,
দহিছে জঠর তার জ্বলন্ত পাবক॥

(৫)

জীর্ণ বাস, শীর্ণ কায়, হেরে হিয়া ফেটে যায়,
সত্য কিরে হও তুমি অনাথ বালক?
তোর কি নাহিক কেহ? না পাও মায়ের স্নেহ?
নাহি পিতা, ভাই, বোন, পোষক, রক্ষক?

(৬)

জনক জননী গৃহে, যদ্যপি তোমার রহে,
তবে মোরে বল দেখি অনাথ সন্তান।
প্রখর রৌদ্রের তেজে, ননীর পুতুল ত্যজে,
কেমনে গৃহেতে থাকে ধরিয়া পরাণ॥

(৭)

প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-করে, কালিমা বরণ ধরে,
চারু চন্দ্রাননে তোর অনাথ বালক।
ধূলিতে ধূসর দেহ, না চাহে স্নেহেতে কেহ?
ধরাতে থাকিতে এত জননী জনক?

(৮)

জনক জননী তোরা, আসিয়া দেখহ ত্বরা,
তোদের দ্বারেতে এক অনাথ সন্তান।
বাস, অন্নোদক দিয়ে, শীতলি তাহার হিয়ে,
লভ গো ধরণী-মাঝে যশের বাখান॥

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ দাস।

বিবাহ-রহস্য।

লিলির বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে; কেবল দিন দেখিয়া একার্য্য সমাধা করিলেই হয়। লিলির পিতামাতা এ শুভকার্য্য যত শীঘ্র মিটিয়া যায়, ততই মঙ্গল বিবেচনায় কেবল সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছেন। লিলির ভাবী স্বামী আর্থার এখন লিলির বাটীর অনতিদূরে নিজগ্রাম ত্যাগ করিয়া অবস্থান করিতেছেন ও প্রতিদিনই লিলির কাছে আসিয়া তাহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ ও প্রেমালাপ করিয়া যাইতেছেন; লিলির অঙ্গুলীতে ভাবিস্বামী-প্রদত্ত একটী মূল্যবান হীরকাঙ্গুরী শোভা পাইতেছে; অপর আর একটী স্বামীর অঙ্গুলীতে বিবাহের চিহ্ন প্রকাশ করিতেছে।

বিবাহ হইতে আর দুই তিন দিন বাকি আছে মাত্র! ঠিক সন্ধ্যার প্রাক্কালে যথারীতি আর্থার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। লিলির আর আনন্দ ধরে না—বিবাহের দিন যতই নিকটবর্ত্তী হইতেছে, লিলির ক্ষুদ্র হৃদয়টুকুর আনন্দবেগ ততই বাড়িতেছে; লিলি প্রিয়তম আর্থারের হাত ধরিয়া আপনাদের বাগানে প্রবেশ করিয়া কুঞ্জমধ্যস্থ প্রস্তরময়ী বেদিকার উপর একত্রে উপবেশন করিল। স্থানটী অতি মনোরম ও নির্জ্জন বলিয়া উভয়ে নিঃসঙ্কোচে প্রেমালাপে মত্ত হইল! এদিকে লিলির ছোট বোনটী মিস্ রোজ লিলিকে পাঠাগারে না দেখিতে পাইয়া বাগানে তাহাদের অন্বেষণে গমন করিল। সে ভাবিল, দিদি যখন পাঠাগারে নাই, তখন নিশ্চয়ই সান্ধ্য-ভ্রমণের জন্য বাগানেই গিয়াছে; বালিকার অনুমান সত্য হইল! বাগানে যাইয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবামাত্র কুঞ্জবন মধ্যে যুগলমূর্ত্তির দর্শনলাভ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিল। প্রেমিক প্রেমিকা রোজকে দেখিয়া আপনাদের মনের ভাব কতকটা গোপন করিয়া তাহাকে সাদরে চুম্বন করতঃ বলিল, দেখ দেখি আমরা কেমন নির্জ্জনে এখানে বসিয়া আছি! তুমি আমাদের উভয়কে দেখিতে না পাইয়া আমাদের খোঁজ কর কি না জানিবার জন্যই আমরা হেথায় লুকাইয়া আছি! সরলা বালিকা তাহাদের মনোভাব কিছুই বুঝিতে পারিল না; পরন্তু তাহাদের এই বাহ্যিক সাদর আলাপে পরিতুষ্টা হইয়া আহ্লাদে গদ্‌গদভাবে কহিতে লাগিল; "আমিও কেমন তোমাদের ধরিয়াছি!" আর্থার প্রেমালাপে বিঘ্ন উপস্থিত দেখিয়া রোজকে সে স্থান হইতে সরাইবার জন্য

আপনার কোটের পকেটে হাত দিয়া অন্যমনস্কভাবে একটী ক্ষুদ্র মখমল মণ্ডিত বাক্স বাহির করিয়া তাহাকে উপহার দিয়া বলিলেন, রোজ! এই সেফ্‌টি পিনটী লইয়া গিয়া যে কোন স্থানে তোমার অভিরুচি, লুকাইয়া রাখিয়া আইস—আমরা উভয়েই উহা বাহির করিয়া দিব! তুমি যেমন আমাদের ধরিয়াছ, আমরাও সেইরূপ তোমার লুকান দ্রব্যটী বাহির করিব। সরলা রোজ তাহাদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সেফ্‌টিপিনের বাক্সটী লইয়া বলিল, বেশ আমি ইহা লুকাইয়া রাখিয়া আসিতেছি, দেখিব তোমরা কেমন করিয়া বাহির করিয়া দাও; আমি না আসা পর্য্যন্ত তোমরা এখানে অবস্থান কর, আমি আসিয়া বলিলে তবে তোমরা যাইবে নতুবা উঠিও না। রোজের কথায় লিলি বলিল, বেশ আমরা উঠিব না—তুমি লুকাইয়া রাখিয়া আইস। বালিকা পিনটী লইয়া প্রস্থান করিল, প্রেমোন্মত্ত যুবক এতক্ষণে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন ও পুনরায় প্রেমালাপে মত্ত হইলেন।

এদিকে রোজ সেফ্‌টিপিনের বাক্সটী খুলিয়া দেখিল যে, তাহার মধ্যে আরও একটী অঙ্গুরী রহিয়াছে, বালিকা তাহা দেখিয়া পরমানন্দে আপন অঙ্গুলীতে পরিল ও অন্যমনস্কে রন্ধনশালায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, রন্ধনশালার অধিস্বামিনী বিবাহের কেক তৈয়ারী করিবার জন্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের পরিতুষ্টি সাধনোদ্দেশে নানারূপ জল্পনা কল্পনা করিতেছে। রোজকে অসময়ে উপস্থিত দেখিয়া পাচিকাঠাকুরাণী সহাস্যে কহিল, রোজ! তোমার দিদির বিবাহের জন্য যে কেক তৈয়ারী করিতেছি—তোমার বিবাহের সময় তাহা অপেক্ষা আরও উত্তম কেক তৈয়ারী করিব; তাহার জন্য আমাদের পরিশ্রমের পুরস্কার এখন হইতে জমাইয়া রাখ। বালিকা হাসিয়া কহিল,—দূর—আমার বিবাহের ঢের দেরী! অধিস্বামিনী হাসিয়া কহিল—দূর কেন? তোমার বিবাহ খুব শীঘ্রই হইবে! আমি তোমার মনোমত বর খুঁজিয়া আনিব; এই বলিয়া ময়দা মাখিতে মাখিতে ডিম আনিবার জন্য গৃহান্তরে গমন করিল। রোজ এই অবসরে বালিকা-সুলভ-চপলতা প্রযুক্ত ময়দার পাত্রে হাত দিয়া ময়দা মাখিতে আরম্ভ করিয়া দিল। বালিকার কোমল হস্তে ময়দা জড়াইয়া ধরিল; বালিকাও অধিস্বামিনীর আগমন ভয়ে ভীতা হইয়া আপন হস্ত হইতে ময়দা ছাড়াইতে লাগিল; ইত্যবসরে পাচিকা দেবী তথায় অবতীর্ণ হইয়া, বালিকার এরূপ কার্য্যে তিরস্কার করিয়া তাহার হাত হইতে ময়দা ছাড়াইতে লাগিল; ও তাহার মাতাকে বলিয়া দিয়া

তাহাকে আরও তিরস্কার করাইবার জন্য আরও ভয় দেখাইল। বালিকা মাতার নামে ভয়-বিহ্বলা হইয়া দ্রুতপদে তথা হইতে প্রস্থান করিল। অধি-স্বামিনী 'অবাধ্য মেয়ে আমার সমস্ত পণ্ড করিয়া দিল', বলিয়া আবার ময়দা মাখিতে আরম্ভ করিল! রোজ মাতার নামে এতদূর ভীতা হইয়াছিল যে, অঙ্গুরী ও সেফ্‌টিপিনের কথা তাহার তিল মাত্রও মনে ছিল না!

আজ বৈকালে লিলির বিবাহ। প্রাতঃকাল হইতেই লিলি অভিনব সাজ-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া অভ্যাগতগণের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছে। যুবক আর্থারের অবস্থাও লিলির অনুরূপ। উভয়েরই মনোভাব আজ যে কিরূপ, তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না, ভুক্তভোগী মাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারি-বেন! উভয়েই সেই শুভ সময়ের ও শুভ মিলনের প্রতীক্ষায় উদ্বিগ্ন! কি করিয়া সময়টুকু কাটিবে—চারি চক্ষু ও চারি হস্ত এক হইবে, উভয়েই ইহা মনের ভিতর তোলাপাড়া করিতেছে। আজ রোজেরও আনন্দ ধরে না! রোজের পিতা-মাতা নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সাদর সম্ভাষণের নানারূপ আয়োজন করিতেছেন; দাস দাসীগণ সকলেই শশব্যস্ত! পূর্ব্বকথিত দ্রৌপদী-স্বরূপিণী পাচিকা ফুলরাণী নানারূপ খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া সকলকে পরিতোষরূপে ভোজন করাইবে ও আপনার সুনাম কিনিবে;—এই আশার প্রতীক্ষা করিয়া সময়ের অপেক্ষা করিতেছে।

শুভক্ষণে নিমন্ত্রিত নর-নারীবৃন্দ নবদম্পতীকে সঙ্গে লইয়া গির্জ্জায় উপ-স্থিত হইল। আজ গির্জ্জার চারিধার পুষ্পমালায় সুশোভিত; ধর্ম্মযাজক মহাশয় এই শুভ সময়ের প্রতীক্ষায় অনবরত ঘড়ি খুলিতেছেন ও সকলের আগমন অপেক্ষা করিতেছিলেন,—এতক্ষণে সকলকে সমবেত দেখিয়া শুভ-কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত সমস্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন।

বিবাহ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই পাদ্রী মহাশয় বরের নিকট হইতে প্রস্তাবিত অঙ্গুরীটী চাহিলেন! আর্থার পকেটে হাত দিয়াই চক্ষু কপালে তুলিলেন; সমাগত সকলেই আর্থারের মুখভাব নিরীক্ষণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। আর্থার বলিয়া উঠিলেন--আমি ভুলক্রমে অঙ্গুরীটী আমার অন্য কোটের পকেটে রাখিয়া আসিয়াছি; যদি আনিতে অনুমতি হয়, আমি এখনই লইয়া আসিতে পারি! অনেকেই অঙ্গুরীয়কটী আনিবার বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই বলিয়া উঠিল; আবার অনেকেই বলিল, উহার বিশেষ প্রয়োজন আছে। ধর্ম্ম সঙ্গত কার্য্যে কোনরূপ বাধা, বিঘ্ন, ভ্রম কিছুই ঘটিতে পারে না; আর্থারকে

অঙ্গুরীটী আনিতে হইবে—বিনা অঙ্গুরীতে বিবাহ হইতেই পারে না; নবদম্পতীর শুভাশুভের প্রতি লক্ষ্য করা আমাদের সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য; শুভ কার্য্যে কোনরূপ অশুভের সূচনা হইলে ভবিষ্যতে নানা অশুভ সঙ্ঘটনের সম্ভাবনা আছে। পাদ্রী মহাশয়ও এই মতে রায় দিলেন, সুতরাং সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে বিবাহ কার্য্য কিছুক্ষণের জন্য স্থগিত করা হইল! আর্থার দ্রুতপদে অঙ্গুরীটি আনিবার জন্য উর্দ্ধশ্বাসে গৃহাভিমুখে ছুটিলেন! যুবতীর প্রেমলাভের আশায় যুবক এখন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য, উন্মত্ত! ঘৃণা—লজ্জা—ভয়—মানবিরহিত! পথদিয়া বরবেশে এইরূপভাবে আর্থারকে দৌড়াইতে দেখিয়া অনেকেই নানারূপ বিদ্রূপ করিতে লাগিল; কিন্তু যুবকের কর্ণপাতও নাই। কাহারও প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আর্থার একেবারে আপন গৃহে প্রবেশ করিয়া, অনুমিত জামাটীর পকেটে হাত দিয়াই একেবারে বসিয়া পড়িলেন; সর্ব্ব শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইল! মাথা ঘুরিয়া গেল! চক্ষু অন্ধকার দেখিল। হায়, হায়, কি হইল, বলিয়া যুবক একেবারে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। অন্যান্য সকল জামার পকেট পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিলেন। গৃহস্থিত সকল জিনিষ পত্র পাতি পাতি করিয়া অন্বেষণ করিয়াও অঙ্গুরীয়কের সন্ধান কোথাও মিলিল না। যুবক একেবারে অস্থির হইয়া পড়িলেন; হায় কি করিলাম, অঙ্গুরীয়কটী কোথায় ফেলিলাম! কে আমার সাধে বাদ সাধিল; কে আমার প্রতি এমন শত্রুতাচরণ করিল! হায়! কে আমায় লিলি-লাভের আশায় বঞ্চিত করিল, বলিয়া আপন কেশ-পাশ ছিন্ন করিতে লাগিলেন; শিরে বারংবার করাঘাত করিতে লাগিলেন।

রাত্রি ৯টা বাজিয়া গেল, তবুও বর ফিরিল না দেখিয়া গির্জ্জামধ্যস্থিত সকলেই যারপর নাই আশ্চর্য্যান্বিত হইল; অনেকে অনেক প্রকার অভিমত প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। এ দিকে ক'নে কলাবনে দাঁড়াইয়া বরের শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতেছে; আর্থারের সম্বন্ধে কত কি মনে ভাবিতেছে! সরলা রোজ আর্থার কেন আসিতেছে না, দিদিমণিকে কেন শীঘ্র শীঘ্র বিবাহ করিয়া ফেলিতেছে না—এত রাত্রি হইল, এবার আমি যে ঘুমাইয়া পড়িব; আমার ক্ষুধা পাইয়াছে, শীঘ্র শীঘ্র বিবাহ না হইলে আমি যে কিছুই খাইতে পাইব না, ইত্যাদি নানারূপ ভাবিতে ভাবিতে একবার লিলির কাছে যাইতেছে, কিন্তু হায়, ভয়ে দিদিমণির সহিত কথা কহিতে পারিতেছে না; পাছে দিদিমণি বিরক্তি বোধ করেন, এই ভয়েও দিদিমণিকে আর্থারের সম্বন্ধে কোন

কথাই জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছে না বলিয়া এক মহাবিপদেই পড়িয়াছে, তাহার প্রফুল্ল মুখখানি ক্রমেই ম্লানভাবাপন্ন হইয়া আসিতেছে।

এদিকে লিলির পিতামাতা আত্মীয়-স্বজন সকলেই মহাভাবনায় পড়িয়াছেন; লিলি বুদ্ধিমতী, নানাজনের নানারূপ অভিমতে একেবারে লজ্জায় ম্রিয়মাণা হইয়া পড়িয়াছে এবং যুবককে এ ঘোর বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য ভগবানের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করিতেছে! হায় দশটা বাজিল, —এখনও আর্থারের দেখা নাই! নিমন্ত্রিত অনেকেই আপন আপন গৃহে ফিরিবার জন্য ব্যস্ততা প্রকাশ করিতে লাগিল।

আর্থার ভগ্নমনে গৃহত্যাগ করিয়া পথে পদার্পণ করিয়াছেন, কি করিলে কি হইবে, ইহা তাঁহার এখন একেবারে জ্ঞান নাই; এতদূর উন্মত্ত যে ভাল কি মন্দ এখন তাহার কোন দিকেই লক্ষ্য নাই; যুবকের মন লিলির দিকে দৌড়িয়াছে। আর কি রক্ষা আছে! রমণীর মোহিনী মায়ায় যুবক আজ মোহিত—হিতাহিতজ্ঞানশূন্য—উন্মত্ত!

পথে যাইতে যাইতে হঠাৎ কোন জহরতের দোকানের প্রতি যুবকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল! প্রেমের আবেগে ও চিত্তচাঞ্চল্যে অমনি দোকানের ফটকের নিকট ঊর্দ্ধশ্বাসে যাইয়া দেখিলেন—দুর্ভাগ্য বশতঃ দোকানখানি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যুবক মনে করিয়াছিলেন,—না হয় আর একটী অঙ্গুরী পুনরায় ক্রয় করিয়া গির্জ্জায় লইয়া যাইবেন, কিন্তু হায়! তাহা ঘটিয়াও ঘটিল না, অঙ্গুরী লাভের বাসনা যুবকের হৃদয়ে এত বলবতী যে, যুবক দোকানের সার্শি ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন; ইত্যবসরে জনৈক কনষ্টেবল আসিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইল ও যুবকের কার্য্যকলাপ গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া তাহার হাত ধরিল। যুবক হাত ধরিও না, ছাড়িয়া দাও, বলিয়া তাহার প্রতি ভ্রূকুটীপাত করিলেন। কনষ্টেবল জিজ্ঞাসা করিল,—তুমি এমন সময়ে এই জহরতের দোকানে কি মানসে আসিয়াছ ও কি অভিপ্রায়ে দরজায় ধাক্কা মারিতেছ? উত্তরে প্রেমোন্মত্ত যুবক তাহার নিকট সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিলেন। কনষ্টেবল তাহার পোষাক পরিচ্ছদ দর্শনে তাহাকে ভদ্রলোক বিবেচনা করিয়া, শেষে পাগল ভ্রমে কেবল গলাধাক্কা দিয়াই সে স্থান হইতে তাড়াইয়া দিল। যুবকও ভগ্নমনোরথ হইয়া গির্জ্জার দিকে গমন করিতে লাগিলেন।

সময় কাহারও বশীভূত নয়! ক্রমে রাত্রি ১২টা বাজিল, উপস্থিত নিমন্ত্রিত নরনারীবৃন্দ যুবকের চরিত্রের উপর সন্দিহান হইয়া সকলে একে

একে প্রস্থান করিতে আরম্ভ করিল, এমন সময়ে আর্থার উন্মত্তভাবে সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। তাহাকে দেখিয়া সকলেই বলিয়া উঠিল—"এত বিলম্ব কেন? এত বিলম্ব কেন?" পাদ্রী মহাশয় বিবাহের সময় উত্তীর্ণ দেখিয়া সকলকে গির্জ্জা ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলে সকলেই একে একে গির্জ্জা ত্যাগ করিল! লিলির পিতমাতা আত্মীয়-স্বজন লিলিকে ও আর্থারকে লইয়া গৃহে গমন করিলেন!

লিলির পিতামাতা আত্মীয়-স্বজন আর্থারের মুখে সমস্ত ঘটনা শুনিয়া যারপর নাই দুঃখিত হইলেন ও আর্থারকে নানা প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। লিলির সহিত যে তাহার বিবাহ নিশ্চয়ই হইবে, তাহা তাঁহাকে বলিলেন; কিন্তু শুভকার্য্যে এইরূপ অসম্ভাবিত বিঘ্ন উপস্থিত দেখিয়া সকলেই নানারূপ অশুভ আশঙ্কা করিতে লাগিল। এই ব্যাপারে রোজের মুখে আর কথাবার্ত্তা নাই; বালিকা একেবারেই নির্ব্বাক্। আর্থার সকলের পিছু পিছু বেড়াইতেছেন ও সকলের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল নয়নে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। রাত্রি অধিক হইল দেখিয়া সকলে ভোজনাগারে প্রবেশ করিল ও বিবাহের নিমিত্ত যে কেক তৈয়ারী হইয়াছিল, তাহাই প্রথমে ভোজন করিতে মনস্থ করিল। কেক ভোজন করিবার উদ্দেশ্য এই যে, আর্থার ও লিলির বিবাহ নিশ্চিত—এই বিষয় সকলকে জ্ঞাপন করা! আর্থার, লিলি ও রোজকে লইয়া সকলেই কেক উদরসাৎ করিতে আরম্ভ করিল; হঠাৎ লিলির পিতার মুখে কি যেন আটকাইয়া গেল! লিলির পিতা মুখ হইতে চর্ব্বিত কেক বাহির করিয়া দেখিলেন যে, একটী সেফ্‌টিপিন! তিনি দেখিয়াই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন—এ পিন কোথা হইতে কিরূপে খাদ্যদ্রব্যের সহিত মিশিল, তখন তাহারই গবেষণা আরম্ভ হইল। এমন সময়ে আর্থারের মুখেও আবার কি যেন ঠেকিল, আর্থারও অমনি মুখ হইতে বাহির করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার সেই বিবাহের প্রস্তাবিত অঙ্গুরী! আর্থার আনন্দে আত্মহারা হইয়া, হারাধন ফিরিয়া পাইলেন বলিয়া, একেবারে উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন, লিলির পিতার মুখ হইতে বহিষ্কৃত সেফ্‌টী-পিন দেখিয়া সকলে যতদূর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন, এখন আর্থারের মুখ হইতে বিবাহের প্রস্তাবিত যৌতুক অঙ্গুরীয়ক বাহির হইল দেখিয়া কাহারও বিস্ময়ের সীমা রহিল না! পাচিকা দেবী এই ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার অবলোকন করিয়া ভীতা ও বিস্মিতা হইয়া নির্ব্বাক অবস্থায় দণ্ডায়মান রহিল! তাহার

যেন জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পাইল। আর্থার সেই স্থানে আর ক্ষণমাত্র কালবিলম্ব না করিয়া মুখমধ্যস্থিত খাদ্যদ্রব্য চিবাইতে চিবাইতে একেবারে পাদ্রী সাহেবের বাটীর দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

রাত্রি প্রায় ২টা বাজিয়াছে, আর্থার পাদ্রী মহাশয়ের বাটীর দ্বারে অনেকক্ষণ ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে ডাকিতে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগিলেন; যুবক এখন আহ্লাদে আত্মহারা, এখন আর তাহাকে পায় কে! পাদ্রীমহাশয় উপর তলায় কুম্ভকর্ণের ন্যায় নিদ্রা যাইতেছেন—অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি জানালা খুলিয়া পথের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এত রাত্রে কেহে তুমি? কি মনে করিয়া আমায় ডাকাডাকি করিতেছ? এরূপ অসময়ে আমাকে ডাকিবার উদ্দেশ্য কি? পাদ্রীমহাশয় কাঁচা ঘুমে উঠিয়াছেন বলিয়া তাঁহার মেজাজ বড়ই খারাপ হইয়া গিয়াছে, তিনি আর্থারকে চিনিতে পারিয়াও নিতান্ত রুষ্টভাবে তাহাকে অনেক তিরস্কার করিলেন, কিন্তু আর্থারও ছাড়িবার পাত্র নন—অঙ্গুরীটী দেখাইয়া বলিলেন—আমি অঙ্গুরী পাইয়াছি, শীঘ্র আসিয়া আমাদের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করুন। পাদ্রী মহাশয় তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া পাগল বিবেচনায় তাহার সহিত অধিক বাক্‌বিতণ্ডা করা নিষ্ফল মনে করিলেন ও ক্রুদ্ধভাবে সজোরে জানালা বন্ধ করিয়া পুনরায় শয়ন করিলেন। আর্থার পুনর্ব্বার দরজায় সজোরে ধাক্কা দিতে লাগিলেন এবং অতি অল্পক্ষণ মধ্যেই দরজা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশলাভে সমর্থ হইয়াই একেবারে পাদ্রীমহাশয়ের শয়নকক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও সকল ঘটনা বিবৃত করিয়া তাঁহাকে তাহার সহিত তখনই যাইবার জন্য কাতরে অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

পাদ্রীমহাশয় তাহার কথায় হাস্যসম্বরণ করিতে পারিলেন না; কিন্তু নিজের অসৌজন্যনিবন্ধন দরজাটী খুলিয়া না দেওয়ার জন্যই যে উহা ভাঙ্গিয়াছে, ইহাতে বড়ই ব্যথিত হইলেন! যাহা হউক, তিনি এখন কোন গতিকে আর্থারকে বিদায় করিবার জন্যই বলিলেন—আর্থার! তুমি কি পাগল হইয়াছ; এত রাত্রে কি কখন কাহারও বিবাহ হইয়াছে শুনিয়াছ? এরূপ অসময়ে বিবাহকার্য্য কিরূপে সম্পন্ন হইবে? আমিই বা কিরূপে শুভকার্য্যে অশুভের সূচনা করিব? তুমি এখন যাও, আমি শীঘ্রই শুভদিন স্থির করিয়া তোমাদের মিলন করিয়া দিব। পাদ্রীমহাশয় কাহাকে সান্ত্বনা দিতেছেন! কে

সান্ত্বনা মানিবে! যুবক শেষে তাঁহার হাত ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিলেন। যুবকের প্রেমের বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে—কে তাহার গতি রোধ করিবে? যুবক অবশেষে বলিয়া উঠিলেন—আমি কিছুতেই শুনিব না, আপনাকে যাইতেই হইবে; আজই আমাদের মিলন করিয়া দিতেই হইবে, নতুবা আমি এখনই আপনার নিকট আত্মহত্যা করিব, আমায় নিরাশ করিবেন না— আত্মহত্যা-মহাপাপে আমাকে লিপ্ত করিয়া জীবহত্যার পাপে আপনার সমস্ত সঞ্চিত পুণ্যরাশি পণ্ড করিবেন না, আসুন—শুভকার্য্যে আর বিলম্ব করিবেন না, আপনাকে যাইতেই হইবে। আমি গির্জ্জায় যাইতে চাহি না— আমার শ্বশুর মহাশয়ের বাটীতেই শুভ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া চলিয়া আসুন; এই আমার মিনতি। এই বলিয়া পাদ্রী মহাশয়কে শয্যা হইতে সজোরে নিম্নে অবতরণ করাইলে পাদ্রী মহাশয় বলিয়া উঠিলেন,—তুমি কর কি হে? আমায় ফেলিয়া দিবে না কি? দাঁড়াও স্থির হও; জোর করিয়া আমায় লইয়া যাইতে চাও না কি? বল দেখি, এখন আমি এই বেশে কি করিয়া যাই? আর্থার অমনি পাদ্রী মহাশয়ের কোটটী আলনা হইতে লইয়া তাঁহাকে পরাইয়া দিলেন ও মাথায় টুপিটী চাপাইয়া দিয়া বলিলেন,—আর কিছুরই প্রয়োজন নাই, ইহাতেই হইবে। আপনার পোষাক পরিচ্ছদের আর কোনরূপ জাঁকজমক করিতে হইবে না, এখন আসুন; এই কথা বলিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া সজোরে টানিয়া একেবারে শয়ন কক্ষের বাহিরে বারান্দায় আনিয়া উপস্থিত করিলেন; পাদ্রীমহাশয় প্রমাদ গণিয়া আর ইতস্ততঃ না করিয়া যুবকের সহিত একেবারে লিলির পিতার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন ও যাহোক করিয়া প্রেমোন্মত্ত যুবকের মনোরথ পূর্ণ করিবার জন্য বিবাহের আয়োজন করিয়া বলিলেন— এখানে বাইবেল আছে? লিলির ছোট ভগ্নী বালিকা রোজ তখনও জাগিয়া ছিল। পাদ্রী মহাশয়ের মুখ হইতে বাইবেল বাক্যটী সমস্ত নিঃসরণ হইতে না হইতেই বালিকা তাহার ক্ষুদ্র বাইবেলখানি আনিয়া উপস্থিত করিয়া বিবাহ-বিহ্বল দুইটী প্রাণ একত্রিত হইবার শেষ অভাব পূর্ণ করিল। পাদ্রী-মহাশয় অগত্যা ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া তাহাদের বিবাহকার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক নিদ্রাবেশে চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে আপন আবাসে প্রত্যাগমন করিলেন। লিলি ও আর্থারের বিবাহ একপ্রকার সম্পন্ন হইয়া গেল, উপস্থিত সকলেই নবদম্পতীর শুভকামনায় পরম পিতা পরমেশ্বরের নিকট আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন! সকলেরই উদ্বেগ-কঠিন ভাবনা মিটিল—আশাও পূর্ণ হইল!

প্রিয় পাঠক! এখন অঙ্গুরী ও সেফ্‌টিপিন কি প্রকারে 'কেকের ভিতর আসিল, তাহা বোধ হয় বুঝিতে আর কাহারও বাকি নাই। নবদম্পতীর শুভ-মিলনে আসুন আমরাও শুভাশীর্ব্বাদ করিয়া ক্ষান্ত হই। লিলির মনে বোধ হয় কেরোসিন তৈলের কথাটা উদয় হয় নাই তাই রক্ষা, নচেৎ আজ কালকার মেয়েদের প্রবর্ত্তিত নূতর ফ্যাসানের আত্মহত্যা করিয়া বিবাহ বঞ্চিতাই থাকিতে হইত।

শ্রীননীলাল সুর।

সন্ধ্যার প্রতি।

ওগো সন্ধ্যে! রজনীর প্রিয় সহচরী
এলাইয়া কৃষ্ণ কেশ পরিয়া ললাটে
সন্ধ্যা-তারকার "টিপ" (আহা মরি মরি!!)
আসিলে কি হেরি'সূর্য্য বসিলেন পাটে?
শান্তিময়ী যামিনীর অগ্রদূতী রূপে,
শান্তি বারিপূর্ণ কুম্ভ বাঁধি বাহু-পাশে,
কোন্ স্বর্গ হ'তে এলে হেথা চুপে চুপে,
তাপ-দগ্ধা ধরণীর গাত্র-দাহ-নাশে?
যদি এলে দয়া করি ক্ষণেক দাঁড়াও
ঠেলিয়ো না অভাগার করুণ মিনতি,
বেশী না;—দুঃখের দুটো কথা শুনে যাও,
ব'লে দাও, "অভাগার কি হইবে গতি?"
জুড়ালে, ঘুচালে সন্ধ্যে! ধরণীর দুখ,
জুড়া'তে পারিলে কই এ দগধ-বুক?

শ্রীপ্রিয়বল্লভ সরকার ভারতী, সরস্বতী।

শিক্ষার দোষ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

চরিত্রানুমান।

শ্বাশুড়ী-বৌয়ে গৃহমধ্যে বসিয়া হীরালাল যে সংবাদ প্রদান করিয়া গেল, তাহার মীমাংসা করিবার ব্যর্থ চেষ্টায় নিযুক্ত হইলেন।

শ্বাশুড়ী বলিলেন,—"কি জানি মা, হীরু যা ব'লে গেল, শুনে ভয়ও হয়।"

ম্লানমুখে বধূ বলিল,—"কিসের ভয় মা?"

শ্বাশুড়ী। কলিকাতা যায়গা যে ভাল নয়।

বধূ। মন্দ কিসে মা,—সেখানে ত আ'জ কা'ল সকল দেশের লোক চাকুরী করিতেছে—ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেছে।

শ্বাশুড়ী। আমাদের অদৃষ্ট মন্দ!

বধূ। বালাই,—তোমার অদৃষ্ট মন্দ হবে কেন মা? তোমার ছেলে অসৎ নয়!

শ্বাশুড়ী। তবে হীরু অমন কথা বলিল কেন?

বধূ। কৈ, না,—হীরু ত তাঁর চরিত্রে কোন দোষারোপ করে নাই। তবে বাবুগিরি করিতেছেন—ইহাতেই লোকে সন্দেহ করিতেছে। কিন্তু বাবুগিরি করিলেই কি চরিত্র খারাপ হয় মা? সহর যায়গায় থাকা—পাঁচজন ভদ্রলোকের সঙ্গে মিশিয়া থাকিতে হয়,—কাযেই একটু ভদ্রলোকের মত থাকা আবশ্যক। তাতে এমন কি দোষ হইয়াছে?

শ্বাশুড়ী অনেকক্ষণ নিস্তব্ধে থাকিলেন। নীরবে নিস্তব্ধে অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। তারপরে প্রসন্নমুখে বলিলেন,—"না বউ মা, ননি আমার কোন দোষে দোষী নয়,—মা'র প্রাণ, সামান্ত আশঙ্কায় বিচলিত হয়!"

বধূ। তাই—

শ্বাশুড়ী। আর এককথা—

বধূ। কি মা?

শ্বাশুড়ী। মতিদাস হাটে যাবে,—তার কাছে, তোমার একযোড়া কাপড় আনিতে দিয়া আসি। তোমার একেবারে কাপড় নেই।

বধূ। তোমারও ত নাই মা।

শ্বাশুড়ী। মোটে দশটাকা পুঁজি—এরমধ্যে আবার আমার কাপড় আনিতে দিলে খাব কি ?

বধূ। আমার একখানা আর তোমার একখানা আনিতে দাও।

শ্বাশুড়ী। তোমার যে মোটে নাই মা। একখানাতে কি হইবে ?

বধূ। আপাততঃ দুই শ্বাশুড়ী-বৌয়ের দু'খানা আসুক—পরে কলিকাতা হ'তে টাকা আসিলে আবার আনাইলেই হইবে।

শ্বাশুড়ী। তবে যাই মা, সন্ধ্যা হ'য়ে এল—এর পর সে চলে যাবে। কিছু চা'ল ডা'ল ও তরকারি আনাইবার ব্যবস্থাও করিয়া আসিব।

বধূ। হুঁ।

শ্বাশুড়ী চলিয়া গেলেন। তখন বধূ সেখানে পা ছড়াইয়া বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। বর্ষাচ্ছন্ন শ্রাবণের দিবসের মত সে মুখ ক্রমে অন্ধকার হইয়া উঠিল।

সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল,—"সত্যই কি তিনি চরিত্র হারাইতে বসিয়াছেন! আমি শ্বাশুড়ীকে প্রবোধ দিলাম, কোন ভয় নাই—চিন্তা নাই; তিনি কেন চরিত্র হারাইবেন ? কিন্তু—

কিন্তু আবার কি ছাই! তিনি দেবতা—আমার দেবতা—আমার আদরের দেবতা—দেবতার দোষ ভাবনা করা কি উচিত! ছি!! আমি বড় দুর্ব্বলহৃদয়া। কিন্তু—

আবার কিন্তু কি ? সত্যই কি তিনি অসম্ভাবিত বাবুগিরি লইয়া ব্যস্ত থাকেন! তিনি যে আগে ও সকলের একেবারে বিপক্ষে ছিলেন! হঠাৎ এ পরিবর্ত্তন কেন হইল ? কিসের জন্য হইল ?

আগে অভাগীর পত্রের উত্তর দিতে একদিনও বিলম্ব করিতেন না,—এখন দুই তিন খানা পত্র না গেলে আর একখানার উত্তর আসে না। কেন এমন হইল—কিসের জন্যে এমন হইল!

আগে মাসের প্রথম সপ্তাহ উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই টাকা পাঠাইতেন,—এখন দু'তিন মাস না গেলে আর কিছু পাঠান না।

আগে কোন প্রকারে দুই চারি দিনের ছুটি পাইলে বাড়ী আসিতেন, এখন তাহা আসেন না। কেন এমন হইল,—কিসের জন্যে এমন হইল ?

তবে কি সত্যই হতভাগীর কপাল ভাঙ্গিয়াছে। সত্যই দেবতা দানব হইয়াছেন!

ভাল, যদি তাঁহার চরিত্র মন্দ হয়, তবে আমি কি করিব?

মনে মনে সে কথার মীমাংসা-চেষ্টা করিল, কিন্তু কোন কিছুই স্থির করিতে পারিল না। সেকালের অশিক্ষিতা বধূ হইলে কাঁদিয়া বুক ভাসাইত। একালে শিক্ষিতা বধূ—সে জানে ভালবাসা—বিনিময়।

যদি তিনি পায়ে ঠেলিয়া ফেলেন—পায়ে ফুটা কাঁটার মত যদি দূর করিয়া দেন, কি করিব! ভ্রমর কি করিয়াছিল—সূর্য্যমুখী কি করিয়াছিল!

কিন্তু তাহার মনে হইল না,—সীতা কি করিয়াছিল, দময়ন্তী কি করিয়াছিল, —চিন্তা কি করিয়াছিল—শৈব্যা কি করিয়াছিল!

এই সময় তাহার শ্বাশুড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে,—সন্ধ্যার আঁধারে দিগন্ত ভরিয়া পড়িয়াছে, এবং বৃক্ষ-বল্লরীবহুল পল্লী-বক্ষে ধীর মলয় বহিতেছে ও আকাশে বহু সহস্র তারকা উঠিয়া চাঁদের আশে বসিয়া আছে।

শ্বাশুড়ী গৃহ-প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তখনও সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালা হয় নাই। বধূ যেখানে বসিয়াছিল, সেই স্থানেই বসিয়া আছে—এবং তিনি যে গৃহপ্রবেশ করিলেন, ইহা তাহার গোচরীভূতই হইল না।

শ্বাশুড়ী বুঝিলেন, বৌমা মুখে যাহাই বলুক,—ননির এই সংবাদে সে বিচলিত হইয়াছে। ননির চিন্তায় সে বড় চিন্তান্বিত হইয়া পড়িয়াছে।

তিনি ডাকিলেন—"বৌমা!"

বৌমার চমক হইল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া চোখে মুখে স্বাভাবিকতার অবস্থা ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিয়া বলিল,—"কেন মা?"

শ্বাশুড়ী। সন্ধ্যা উৎরে গেছে—প্রদীপ দাও নাই?

বধূ। হঠাৎ মাথা ঘুরে কেমন অজ্ঞান মত হ'য়ে গেছিলুম মা।

শ্বাশুড়ী। তা'—অত ভাবনা কেন মা! এই যে আমাকে বুঝালি মা! যদিই তেমন হয়, বেটাছেলে সেরে যাবে।

বধূ। তা হবে কেন,—ছিঃ!

বধূ তাড়াতাড়ি প্রদীপ জ্বালিল। গৃহদেওয়ালে লম্বিত কালিকাদেবীর ছবির চরণে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া শ্বাশুড়ী ডাকিলেন,—"বৌ মা!"

বধূ। কেন মা?

শ্বাশুড়ী। হীরু কেমন লোক ?

বধূ। তা' আমি কি জানি মা ?

শ্বাশুড়ী। মতিদাসের মুখে একটা কথা শুনে, আমার যে ভয় হচ্ছে মা।

বধূ। কি কথা মা ?

শ্বাশুড়ী। আমি মতিদাসকে নোটখানা দিয়ে বল্লুম, দু'খানা কাপড়-- আর দশসের চা'ল, দু'সের ডা'ল ও কিছু লবণ এবং তরকারি এন।

বধূ। তারপর ?

শ্বাশুড়ী। সে নোটখানা হাতে কোরে একটু হেসে বলিল,—নোটখানা বুঝি হীরুবাবু দিয়েছেন ?

বধূ। ও মা ;—সে তা' কি ক'রে বুঝ্‌লো ?

শ্বাশুড়ী। তাতেই ত ব'লছি—হীরুর মতলব ভাল নয়। সেই হীরুই মতি দাসের কাছে গল্প ক'রে গেছে—ঠাকরুণদের খাওয়া-দাওয়া চ'লছে না— আমি একখানা দশটাকার নোট সাহায্য ক'রে এসেছি।

বধূ। সাহায্য ! কেন, তার সাহায্য আমরা নিতে গেলাম কেন ?

শ্বাশুড়ী। আমিও ত গোড়ায়—তার মুখের উপর ব'লেছি, আমরা ঋণ বা সাহায্য লইব না—বরং উপবাস ক'রে শুকিয়ে মরিব, সেও ভাল। সে তখন ব'লে গেল, খাজনা আদায় ক'রে তা থেকে কেটে নেব।

বধূ। মতি দাসকে সে কথা বলিলে ?

শ্বাশুড়ী। হ্যাঁ।

বধূ। সে কি বলিল ?

শ্বাশুড়ী। সে বলিল,—ও লোক ভাল নয়। ওর সংশ্রবে বড় যাবেন না।

বধূ। আমারও তা' মনে হয়। ওর তাকানি-টাকানি যেন চাষার মত।

শ্বাশুড়ী তাহাতে সায় দিয়া রুদ্রাক্ষের মালা পাড়িয়া লইয়া বারেণ্ডায় চলিয়া গেলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

নেপাল মণ্ডল।

পর দিবস সকালে যখন সাংসারিক কার্য্য সমাপ্ত করিয়া শ্বাশুড়ী-বৌয়ে স্নান করিতে যাইবার উদ্‌যোগ করিতেছিলেন,—সেই সময় নেপাল মণ্ডল আসিয়া ডাকিল—"মা ঠাকরুণ।"

নেপাল মণ্ডল এই গ্রামবাসী, জাতিতে মুসলমান। বয়স প্রায় সত্তর বৎসরের কাছাকাছি,—মুখের দাড়ি গোঁফ প্রায় সব পাকিয়া গিয়াছে, কিন্তু দাঁতগুলি সমস্তই বজায় আছে। দেহ মাংসল ও সুদৃঢ়। নেপাল ননিলালদের প্রজা—বৎসরে সতের টাকা তের আনা তিন পয়সার জমা রাখে।

নেপালের গলার স্বর শুনিয়াই ননির মাতা চিনিতে পারিলেন, এবং তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলেন।

নেপাল সেলাম করিল। মাঠাকুরুণ একখানা চট বাহির করিয়া বসিতে দিলেন। সে প্রাঙ্গণে উপবেশন করিল। ননির মাতা বলিলেন,—"নেপাল, ভাল আছ?"

নেপাল কিছু গম্ভীরভাবে বলিল,—"ভাল আর কৈ মাঠাকুরুণ, নানাদিকে নানা জ্বালা।"

ন-মা। সংসারে জ্বালা বৈ আর কি আছে নেপাল! সাধে কি আর সাধু মহান্তেরা বাস ছাড়িয়া বনবাসী হন? এবার 'খন্দ-কুটো' (রবিশস্য) কেমন হ'ল?

নেপাল। নিতান্ত মন্দ নয়।

ন-মা। কৈ,—আমাদের যে বার্ষিক কিছু গম, কিছু ছোলা দাও—তা কৈ? আর তোমার জমীতে নাকি লঙ্কা হ'য়েছে—আমাদের লঙ্কা নাই; চাট্টি যদি পাঠিয়ে দাও।

নেপাল। আর কেন মা, আমাদের কাছে জিনিষ-পত্র চাও—তোমাদের সঙ্গে সম্বন্ধ ঘুচে গিয়াছে ত। বুড়ো কর্ত্তাদের আমোল থেকে, প্রজা ছিলাম—কখন খাজনা বাকিও পড়েনি,—দেনা-পাওনার কোন গোলযোগও হয়নি;—আর যখন যা ব'লেছ—তাই শুনেছি। আপদে-বিপদে জান কবুল কোরে ছুটে এসেছি। কিন্তু এখন—যখন পায়ে ঠেলেছ—তখন আর কি করিব মা! তবে লঙ্কা দু'টি চাচ্চ—পাঠিয়ে দেব; কিন্তু গম বা ছোলা ত দিতে পারিব না।

ন-মা। সে কি নেপাল—তুমি কি বলিতেছ, আমি কিছুই বুঝিতে পারচি না?

নেপাল। তোমরা ত তোমাদের সম্পত্তি হীরু বাবুদের পত্তনি দিয়েছ?

ন-মা। কে বলিল?

নেপাল। বলিবে কি গো,—তিনি যে আপনাদের সব প্রজার নিকট খাজনা পত্র আদায় করিতে আরম্ভ কোরেছেন।

ন-মা। সে ভার আমরা দিয়েছি।

নেপাল। কেন?

ন-মা। ননি আমার বাড়ী থাকে না—

নেপাল। তাই কি? আপনি ত বাড়ী বসেই খাজনা পাচ্ছিলেন।

ন-মা। না বাবা, সকলে শুধ্‌রে দেয় না। ডাক্‌লে অনেকে আসেও না।

নেপাল। তাই হীরু বাবু আদায় ক'রে দেবে?

ন-মা। হ্যাঁ।

নেপাল। তবে তিনি ও কথা বলেন কেন?

ন-মা। কি বলেন?

নেপাল। তিনি যে বলেন, বিষয় এখন আমার—এক পয়সাও কেউ আর ঠাকৃরুণ বা তাঁহার ছেলের হাতে দিস্ না। দিলে দুনো দিতে হবে।

ন-মা। ওমা, সে কি! এমন ত শুনিনি। তবে ননি এই ব'লে গিয়েছিল যে, মা যাহা আদায় পত্র করিতে না পারিবেন, হীরু—ভাই, তুমি সেই প্রজাকে ডাকিয়া যাতে আদায় হয়, তা' ক'রে দিও।

নেপাল। না মা,—সে সেরূপ বলে না। আমাকে কাল সন্ধ্যা বেলা পেয়াদা দিয়ে ধরে নিয়ে গেছিল—

ন-মা। তার পর?

নেপাল। তারপর ব'ল্লে খাজনা দে।

ন-মা। তুমি কি বল্লে?

নেপাল। আমি ব'ল্লাম, খাজনা আমি মিটিয়ে দিয়েছি। সে জিজ্ঞাসা করিল, কবে? আমি ব'ল্লাম, আজ সাত দিন হ'ল। সে বলিল, কার কাছে দিয়েছিস্;—আমি বল্লাম, মাঠাকৃরুণের হাতে। সেই কথা শুনে—সে চক্ষু রক্তবর্ণ ক'রে ব'ল্লে, কেন দিলি? আমি বল্লাম—সামান্য একটাকা ক'আনা বাকি ছিল, তাঁর হাতে চিরদিন দিয়ে আস্‌ছি—তাঁদের বিষয়, কাযেই দিয়েছি। সে আরও উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিল,—আমি যে তোকে বারণ কোরে দিয়েছি—খাজনা-পত্র আমাকে দিবি—বিষয় এখন আমার।

ন-মা। ও মা, আমি যাব কোথা? তা' আজ'ই আমি তাকে বারণ কোরে দেবো—আর তার খাজনা আদায় কোরে দিয়ে কায নেই। কি সর্ব্বনেশে লোক মা!

নেপাল। এখন আপনার কাছে যে টাকা দিয়াছি, সে তার রসিদ

দেখ্‌তে চায়। না দেখালে ঐ টাকা আমাকে আবার দিতে হবে। আর গম ছোলা প্রভৃতি যা দিয়ে থাকি, তা' তার বাড়ী পাঠিয়ে দিতে হবে।

ন-মা। না নেপাল, তুমি তা' দিয়ো না। আমি আ'জই তাকে ডেকে আমার বিষয়ের কাছে যাতে না যায়, তা ক'রে দেব এখন।

নেপাল। দেখ'মা,—কলিকাল! কাকেও বিশ্বাস কর্ত্তে নাই। ওদের এখন সময় ভাল—জমীদারের কাযটা হাতে আছে। বিষয় দখল নিতে নিতে শেষে একটা বিপদে ফেল্‌বে। অতএব সাবধান হইয়ো।

ন-মা। সে আর আমায় ব'ল্‌তে হবে না। আমি তা বুঝে গেছি।

নেপাল। একখানা রসিদ দেবেন কি?

ন-মা। কেন গো,—কখনও খাজনা দিয়ে রসিদ কি দাখিলা নিয়েছ?

নেপাল। না মাঠাকুরুণ, তা ত কখনও নিই নি, কিন্তু হীরু বাবুকে যে রসিদ দেখাতে না পার্‌লে ছাড়্‌ছে না।

ন-মা। কিসের হীরু বাবু—আমার বিষয়, সে কে? তার কর্ত্তৃত্ব আ'জ— আমি দূর ক'রে দেব এখন।

তখন নেপাল মণ্ডল উঠিয়া সেলাম করিল এবং সাবধান হইবার জন্য পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিয়া চলিয়া গেল।

ননির মাতা গৃহে গমন করিয়া বধূকে বলিলেন,—"শুন্‌লি মা, হীরুর কথা শুন্‌লি?"

বধূ তখন মেঝেয় পা ছড়াইয়া বসিয়া তাহার আগুল্‌ফ লম্বিত কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদামে তৈল ম্রক্ষণ করিতেছিল। সে বলিল,—"শুন্‌লেম।"

ন-মা। এখন উপায় কি?

বধূ। তাকে ডেকে ব'লে দাও, তার আর বিষয়ের কাছে যেয়ে কায নাই।

ন-মা। তা' আবার ব'লবো না! আমার ইচ্ছে হ'চ্চে, এখনি গিয়ে তাকে বারণ ক'রে দিয়ে আসি।

বধূ। তাড়াতাড়ির বিশেষ প্রয়োজন নেই। তাকে খবর দাও, আসুক। তারপরে একটু ভদ্দরভাবে বারণ কোরে দিয়ো।

শ্বাশুড়ী। তুমি কি স্নানে যাচ্চো?

বধূ। হ্যাঁ। তুমিও চল।

শ্বাশুড়ী। আমি একটু পরে যাব এখন—তুমি যাও, আমি শ্যামা গোয়া-

লিনীকে হীরুর কাছে পাঠিয়ে দিয়ে আসি। সে ব'লে আস্বক, বিকালে যেন অবশ্য অবশ্য হীরু আসে।

বধূ আর কোন কথা কহিল না। শ্বাশুড়ী বধুর তেল মাখা সমাপ্ত হইলে যখন সে কলসী লইয়া স্নানার্থে পুষ্করিণীতে গমন করিল, তখন তিনি শ্যামার নিকট গমন করিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

পারের গান।

(ও তুই) পারে যাবি কবে ?
ভবনদী, পারে যদি,
যেতে চাস্ এবে,—
এখন হ'তে, বিধিমতে
চেষ্টা কর্ তবে।
তা'না হ'লে, গণ্ডগোলে,
পড়্‌তে হবে শেষে,
(তোর) শুভলগণ, শুভক্ষণ
সবই যাবে ভেসে।
(তখন) কেঁদে কেঁদে, আৰ্ত্তনাদে,
ফল্‌বে নাক'ফল;
(কা'রো) সময় হায়, হাত ধরা নয়,
কি কর্‌বি বল!
(তাই) ভবনদী, পারে যদি,
যেতে চাস্ এবে,—
এখন হ'তে, বিধিমতে
চেষ্টা কর্ তবে॥

(ওরে) খেয়া ঘাটে, খেয়ার "বোটে",
সবাই হ'চ্ছে পার।
শক্ত মাঝি, কাজের কাজি,
বাচ্ছে ধীরে দাঁড়॥
ঘাটে বড়, তুফান খর,
তায় এসেছে বান।
তৃণটী প'ড়ে, স্রোতের তোড়ে
হ'চ্ছে খান্-খান্॥
ভয়ে সবার, বার-বার,
ওষ্ঠাগত প্রাণ;
তরী ডুবে যদি, তবে
নাইক পরিত্রাণ॥
তুফান দেখে মিছে-মিছে
ভয় ক'র না ভাই।
সাহস ক'রে, "বোটে" চ'ড়ে
পারে যাওয়া চাই॥
চেষ্টা ক'র্‌লে, ইচ্ছা থাক্‌লে,
কঠিন কিছু নাই।
অসাধ্য যা', সুসাধ্য তা',
জানিও সদাই।
বাজে-বাজে, মিছা কাজে,
ব'সে থেক'না এবে।
এখন হ'তে, বিধিমতে
চেষ্টা কর তবে॥
(নইলে) পারে যাবি কবে?

শ্রীজ্ঞানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

পলাশী ও মুর্শিদাবাদ ভ্রমণ।

(১)

শুভ ৺মহাষষ্ঠীর দিন রাত্রি ৯।৷৹ টার সময় আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সহ সিয়ালদহ ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। আমার গন্তব্যস্থানের গাড়ী রাত্রি ১০।৷৹ সাড়ে দশঘটিকার সময় ছাড়িবে। যাত্রীদিগের বিশ্রামাগারে (Passenger's Waiting Hall) এত জনতা হইয়াছে যে, লোকের ভিড়ে সদ্দিগর্ম্মী হইবার উপক্রম হইয়াছে। আমি অতিকষ্টে জনতা ভেদ করিয়া টিকিট ঘরের দিকে অগ্রসর হইলাম; কিন্তু টিকিট দিবার জানালার নিকট হইতে প্রায় ৩।৪ হাত তফাতে আসিয়া আর কোনও ক্রমেই অগ্রসর হইতে পারিলাম না। একে ৺পূজার ছুটী; তদুপরি আর শুভষষ্ঠী; সুতরাং সরকারী আফিসের ও সওদাগরী আফিস সমূহের সকল কর্ম্মচারীই ছুটী পাইয়াছেন। কেহ বা স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজন সহ বাটী যাইতেছেন; তাঁহার সঙ্গে তদনুযায়ী মাল পত্রও আছে;—তিনি চীৎকার করিয়া টিকিট বাবুকে (Booking clerk) বলিতেছেন, মশাই আমার মুড়াগাছার ৩ খানা ফুল ২ খানা হাফ্। কেহবা একক অবস্থায় বৃহৎ বৃহৎ ২।৩ টা পুটুলি লইয়া সঙ্গী লোকাভাবে মেঝের একস্থানে নামাইয়া, ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে এদিক ওদিক চাহিতেছেন—নিকটস্থ কাহাকেও বা, তাঁহার গন্তব্যস্থানের একখানি টিকিট খরিদ করিয়া দিবার জন্য 'কাকুতি মিনতি' করিতেছেন। কেহ হয় তো বন্ধু-বান্ধবসহ ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন; সুতরাং সদলবলে বুকে সিল্কের চাদর আঁটিয়া, আস্তিন গুটাইয়া ভিড় ঠেলিবার বৃথা প্রয়াস করিতেছেন। আবার কেহ বা, শ্বশুর বাটী যাইবেন,—তদনুযায়ী বেশভূষা করিয়া আসিয়া সর্ব্বপশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁর টিকিট লওয়ার আগ্রহও আছে, আবার মনে ভয়ও আছে, পাছে এই ভিড়ের মধ্যে ঢুকিলে, তাঁর 'সাধের তেরী,' 'কোঁচার ফুল' ও জামাটীর—চারি আনা খরচ করিয়া 'ইস্তিরী'টুকু ভাঙ্গিয়া চুরিয়া খারাপ হইয়া যায়! তিনি মধ্যে মধ্যে এদিক ওদিক চাহিতেছেন, আর সযত্ন-রক্ষিত শ্মশ্রু ও গুম্ফের 'আকুঞ্চন বিস্ফারণ' করিতে করিতে মনে মনে রেলওয়ে কোম্পানীর, তথা কোম্পানীর বেতনভোগী কর্ম্মচারীবৃন্দের—পিতৃপুরুষ উদ্ধার করিতেছেন।

(২)

এদিকে আবার বুকিং আফিসের ভিতরে এক বিরাট ব্যাপার। জানালার নিকট দাঁড়াইয়া টিকিট বাবুটী, বিকট মুখভঙ্গী ও তর্জ্জন গর্জ্জন সহ যাত্রীদিগকে ধমকাইতেছেন;—তাঁর নিকট ইতর, ভদ্র, ছোট বড়, ধনী বা গরিব এ সকলের কোনও তারতম্য নাই। সকলকেই 'তুমি' সম্বোধন করিয়া 'কোথাকার টিকিট চাই' ইত্যাদিরূপ জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া আপ্যায়িত করিতেছেন। যাত্রীরা সেই পুরুষ-পুঙ্গব-মুখ-নিঃসৃত বাণী শ্রবণ করিয়া 'যেন কতই কৃতার্থ হইয়াছি' এইরূপ ভাবে নিজ নিজ দেয় ভাড়া দিতেছেন। টিকিট বাবুটীও একটু সুবিধামত লোক বুঝিয়া, দুই টাকা পাঁচ আনার স্থলে দুই টাকা পনের আনা আদায় করিতেছেন। এতদুত্তরে কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলেই, তৎক্ষণাৎ তাহাকে 'হটো'! বলিয়া—অন্য এক ব্যক্তির নিকট হইতে ভাড়ার টাকা আদায় করিতেছেন।

শুধু যে এই সব কাণ্ড, তাহা নহে; এতদুপরি আবার পুলিশ প্রহরীর জুলুম। একজন রেলওয়ে পুলিশ কনষ্টেবল, সেই ভিড়ের মধ্যস্থলে বীরগর্ব্বে দাঁড়াইয়া প্রত্যেক লোকের নিকট হইতে কিছু কিছু দক্ষিণা আদায় করিয়া, তবে তাহাকে টিকিট ক্রয় করিবার স্থানের (রেলিংএর মধ্যে) নিকট প্রবেশ করিবার অধিকার দিতেছে। ইহারা 'শান্তিরক্ষক' বলিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট পরিচিত,—কিন্তু শান্তিরক্ষা করা তো দূরের কথা, বরং ইহারাই অশান্তি উৎপাদন করে। সম্ভবতঃ ইহারা না থাকিলে লোকে নিরুপদ্রবে যাতায়াতের সুবিধা করিয়া লইতে পারে।

ক্ষণকাল এই সমস্ত ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া একটু ভিড় কমিলে পর, কোনও গতিকে সেই কাটা জানালার সম্মুখে আসিয়া, একখানি পলাশীর টিকিট ক্রয় করিয়া, 'ফটক' (Gate) পার হইয়া—প্ল্যাটফরমে উপনীত হইলাম; কিন্তু ট্রেণে উঠিতে গিয়া দেখি যে সে এক বিষম ব্যাপার! পাঠকদিগের মধ্যে অনেকেই ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন—সুতরাং অনর্থক লেখনী চালাইয়া, প্রবন্ধ-কলেবর বৃদ্ধি করিয়া সহৃদয় পাঠকবর্গের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইতে ইচ্ছুক নহি। আমি অতিকষ্টে একখানি কামরাতে স্থান পাইলাম। গাড়ীতে লেখা আছে "দশজন বসিবেক," কিন্তু দশজনের স্থলে আমরা ১৭ জন যাত্রী বসিয়া ও দাঁড়াইয়া আছি। এ ছাড়া সকলেরই অল্প বিস্তর 'মোট-মাটারী' আছে। তৎপর দিবস ভোর ৪ টার সময় গাড়ী পলাশী ষ্টেশনে

পৌঁছিল। তখনও রাত্রি ছিল, সুতরাং বাধ্য হইয়া ষ্টেশনেই অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ঊষা-সমাগমে, ষ্টেশন সন্নিকটস্থ একটী পুষ্করিণীতে হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া একজন দোকানদারকে 'পলাশী প্রাঙ্গণের' কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে ব্যক্তি একটী বাঁধা রাস্তা দেখাইয়া দিলে, সেই রাস্তা ধরিয়া চলিতে লাগিলাম। অনুমান দুই মাইল পথ গমন করিয়া একস্থানে (এই স্থানে রাস্তাও শেষ হইয়াছে) একটী ছোট 'মনুমেণ্ট' বা স্মৃতিমন্দির দেখিতে পাইলাম ; ইহারই অতি নিকটে একটী সুপরিষ্কৃত বাংলাও আছে। তাহার একজন রক্ষকও নিযুক্ত আছে। তাহাকে কিছু পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া এই 'বাংলাতেই স্থান পাইলাম। তাহারই সাহায্যে গ্রাম হইতে কিছু মিষ্টান্ন আনাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলাম। পরে তথা হইতে বাহির হইয়া খুব খানিকটা ঘুরিয়া আসিলাম। ইদানীন্তন পশ্চিম বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট বাহাদুর (Liutenant Governor—Sir—John woodborn M, A. I. C. S, C. S, I.) মহোদয় কৃপা করিয়া এই স্মৃতিমন্দিরটী নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। পলাশী ষ্টেশন হইতে এখান পর্য্যন্ত বাঁধা রাস্তাটীও ইঁহা কর্ত্তৃক—গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে কয়েকটী ছোট ছোট ইষ্টকস্তম্ভও দেখিলাম। ইহাতে কিছুই লেখা নাই। ইহার কিছু দূরে গঙ্গার 'চর' বা 'বাওর'। এখানে খুব পটোল জন্মিয়া থাকে।

(৩)

এখান হইতে ফিরিয়া ষ্টেশনে পৌঁছিতে ১১ টা বাজিয়া গেল। ষ্টেশনে পৌঁছিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে জনৈক রেলকর্ম্মচারীর নিকট আত্মনিবেদন করিয়া তাঁহার বাসায় উঠিলাম। তিনি আমাকে পরম পরিতোষের সহিত স্নানাহার করাইলেন ও তৎপরে নিদ্রার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া সে সময়ে আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। দুঃখের বিষয় তাঁহার নামটী আমার মনে নাই। বেলা ৪টার সময় উঠিয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম ও বহরমপুরের একখানি টিকিট ক্রয় করিয়া ট্রেণে উঠিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরেই গাড়ী বহরম-কোর্ট ষ্টেশনে পৌঁছিল। গাড়ী হইতে নামিয়া টিকিট কলেকটার বাবুর হস্তে টিকিট দিয়া বাহিরে আসিলাম ও একখানি অশ্বযান ভাড়া করিয়া অত্রস্থ 'কলেজ-হোষ্টেলে' উপনীত হইলাম। 'হোষ্টেলে' যদিও এখন পূজার ছুটী—তথাপি কয়েকটী ভদ্র সন্তান এখনও আছেন দেখিলাম। আমি কাহারও নাম, ধাম জানি না। কাহার সহিত

কোনওরূপ আলাপ পরিচয় নাই, তথাপি সাহসে ভর করিয়া—তাঁহাদিগকে কহিলাম "আমি বিদেশী লোক, এখানে বেড়াইতে আসিয়াছি, কোথাও পরিচয় জানা নাই, সুতরাং অনুগ্রহ করিয়া যদি একটু থাকিবার স্থান দেন তবে সুখী হই"। তাঁহারা এই কথাতে বেশ সন্তুষ্টচিত্তে আমাকে বসাইলেন। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামান্তে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া জলযোগ ও 'চা' পান সমাপ্ত করিয়া তাঁহাদিগের সহিত একটু বেড়াইয়া আসিলাম। তৎপরে আহারাদি সমাপ্ত করিয়া শয়ন করিলাম। পথশ্রমে কাতর ছিলাম বলিয়া শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম।

(৪)

পরদিন প্রাতঃকালে একটী বাবু আমাকে জাগাইয়া দিলেন। এই বাবুটীর নাম শ্রীযুত কিরণলাল মিত্র। ইনি এফ্, এ ক্লাসের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন। ইঁহারই সহিত আমার বেশীরকম আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। আমি গাত্রোত্থান করিয়া নিত্যকর্ম্ম সমাধা করিয়া স্নান ও আহার সমাপ্ত করিলাম। আজ শুভ মহাষ্টমী পূজা। "দেশে থাকিলে প্রতিমাদর্শনাদি করিতে পারিতাম—এবারে বোধহয় মা'র চরণ দর্শন এ হতভাগ্যের ভাগ্যে ঘটিবে না" এই কথা বলাতে শ্রীযুত কিরণ বাবু বলিলেন "আজ সন্ধ্যাবেলা আপনাকে প্রতিমা দর্শন করাইয়া আনিব"। আমি এতদুত্তরে কহিলাম "আমি কয়দিন হইতে শুয়ে ঘুমিয়ে কাটাইতেছি। অনর্থক আপনাকে কষ্ট দিতেছি। আজ বৈকালে সহর পরিদর্শন করিতে লইয়া যাইবেন;—কাল প্রাতে প্রতিমা দর্শন করিয়া আপনাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিব"। ইহাতে তিনি বলিলেন যে "আপনি কখনও এখানে আসেন নাই; যদি বেড়াইতেই আসিয়াছেন, তবে না হয় দু-চারিদিন থাকলেনই বা। তাহাতে আর এমন কি ক্ষতি হইবে?"

যাহা হউক, বৈকালে সহরভ্রমণে বাহির হইলাম। বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ জিলার হেডকোয়ার্টার—এখানে জজ সাহেবের 'কুঠী' বিশেষ মনোরম। সহরটীর মধ্যে 'গোরাবাজার' নামক স্থানটীতেই লোকবসতি অধিক। তা ছাড়া পতিত ময়দান অনেক আছে। ঠিক গঙ্গার উপরেই সহরটী অবস্থিত; যেন ছবিখানি! এখানে এখন গঙ্গার জল অনেক কমিয়া গিয়াছে। রাস্তা ঘাট বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। শীতকালে গোরাসৈন্যদিগের 'কুচকাওয়াজ' হয়। এখানে জলের কল আছে। ইহার অর্দ্ধেক ব্যয়—মহামাননীয়

কাশিমবাজারাধিপতি প্রদান করিয়াছেন এবং ইঁহারই ঐকান্তিক চেষ্টায় ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে (Bengal Central Runatic Assylum) পাগলা গারদ আছে। পাগলা গারদের ভিতরের দৃশ্য বড়ই হাস্যোদ্দীপক। কেহ হাস্য, কেহ গান, কেহ বাজনা, কেহ গালাগালি করিতেছে। কেহ বা ইংরাজি ধরণের বক্তৃতা দিয়া, দর্শককে, তাহাদের বলিবার 'তারিফ' আছে কি না, জিজ্ঞাসা করিতেছে। তৎপরে জেলখানা পরিদর্শন করিলাম। ইহার অনতিদূরে খাগড়া বলিয়া একটী স্থান আছে। এখানকার কাংস্য নির্ম্মিত বাসন চিরপ্রসিদ্ধ।

এখানে একটী কথা বলা আবশ্যক যে,—শ্রীযুত কিরণ বাবুর সাহায্য না পাইলে আমি, পাগলা গারদ ও জেলখানা পরিদর্শনের সুবিধা করিতে পারিতাম না। কারণ এই দুই স্থানে সাধারণের প্রবেশাধিকার নাই।

এই সমস্ত পরিদর্শন সমাপ্ত হইলে সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরিলাম। পরদিন প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করিয়া অত্রস্থ উকিল ধনকুবের সদৃশ শ্রীযুক্ত রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর মহাশয়ের বাটীতে প্রতিমা দর্শনের জন্য গমন করিলাম। তাঁহার বাটীর 'গেটের' উপরে সুবৃহৎ নহবত খানায় সানাই-ওয়ালারা, বিজয়া সূচক "নবমী নিশিগো তুমি পোহাওনা আজি আর" গান গুলি অতি করুণসুরে আলাপ করিতেছে। এখানে প্রতিমাদর্শন সমাপ্ত করিয়া ফিরিলাম। তৎপরে স্থানীয় কলেজ দেখিলাম। এই কলেজটী পুণ্যাত্মা, পরদুঃখকাতরা মহারাণী স্বর্ণময়ী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখনও কাশিম বাজারাধিপতি ইহার ব্যয়ভার বহন করিয়া থাকেন। কলেজ বাড়ীটী অনেকটা গথদিগের আমলের বাটীর ন্যায়।

ঠিক গঙ্গার উপরেই অবস্থিত বলিয়া ইহার দৃশ্য আরও সুন্দর। খৃষ্টাব্দ ১৮৫৭ সালে, মে মাসে যখন সিপাহী বিদ্রোহ হয়, তখন এই স্থানেই তাহার প্রথম অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছিল। এখানকার সিপাহীরাই প্রথমে উত্তেজিত হইয়া উঠে, পরে সেই সংবাদ বারাকপুর প্রভৃতি স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। যে স্থানে সিপাহীদিগের 'বারাক' ছিল, সেই স্থানেরই উপরে এই কলেজবাটী নির্ম্মিত হইয়াছে। কেবলমাত্র তৎসাময়িক একটী মন্দির এখনও 'অতীতের সাক্ষী' স্বরূপ বর্ত্তমান আছে। যাহা হউক, এখানকার পরিদর্শন সমাপ্ত করিয়া আজও এখানে নিশাযাপন করিলাম। পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়া ষ্টেশনাভিমুখে চলিলাম। শ্রীযুত কিরণ বাবু আমার সহিত কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত আসিয়া বিদায়

লইলেন। এই কয়দিনেই ইহার সহিত বেশ ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়াই বিদায়-কালীন কষ্টের আধিক্য মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে পারিয়াছিলাম। ষ্টেশনে আসিয়া টিকিট করিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে 'বাষ্পযান' মুর্শিদাবাদ পৌঁছিল।

(৫)

দিল্লির বাদসাহ সাহ আলমগীর ঔরঙ্গজেব মৃত্যুমুখে পতিত হইলে (৯২ বৎসর বয়সে) তদীয় দুই পুত্র (কামবক্স ও মৌজ্জাম) মধ্যে অত্যন্ত বিবাদ বাধিয়া উঠে। তাহার ফলে কনিষ্ঠ কামবক্সের মৃত্যু ঘটে ও জ্যেষ্ঠ মৌজ্জাম 'বাহাদুর সা' নাম ধারণ করিয়া কয়েকদিন রাজত্ব করেন। সেই সময়ে বঙ্গদেশের নানাস্থানে প্রজা ও জমীদারগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠেন; ঢাকা, পাটনা, আজিমাবাদ, দৌলতাবাদ, উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থানের মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণ ইহাতে বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিলেন। আবার তদুপরি মহারাষ্ট্রদিগের দারুণ অত্যাচার (যাহা সর্ব্বসাধারণের নিকট বর্গির হাঙ্গামা বলিয়া পরিচিত আছে) সমগ্র প্রদেশকে একেবারে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। বাহাদুর সা এই সমস্ত নিবারণ করিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু হঠাৎ তাঁহার অকালমৃত্যু ঘটে। তৎপুত্র 'জিহান্দর সা' বা জিহাদার সা বাহাদুর (Jehandor Shah) 'সাহ আলম ১ম' এই আখ্যা লইয়া রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। ইনিই দিল্লীর শেষ স্বাধীন সম্রাট্ বা বাদসাহ বলিয়া পরিচিত। অনেকের অনুমান যে 'সাহ আলম ২য়' এই আখ্যায় আরও একজন বাদসাহ ছিলেন। তিনি,—বঙ্গবিজেতা লর্ড ক্লাইবের সময় বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসলেখক মহাত্মা মার্সম্যান প্রণীত (Marsman's History of Bengal) ইতিহাসে সেরূপ উল্লেখ নাই। যাহা হউক, পূর্ব্বকথিত সম্রাট্ ১ম সাহ আলম, স্বকীয় তীক্ষ্ণদর্শিতার বলে বঙ্গের অবস্থা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সেইজন্য তিনি মুর্শিদকুলি খাঁ (Moorseedkooly khan) নামক একজন সুদক্ষ কর্ম্মচারীকে সুবে বাংলার (বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার) নাজিম নবাব (একাধারে রাজস্ব আদায়কর্ত্তা ও শাসনকর্ত্তা) করিয়া এদেশে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি মুকসুদাবাদে (পূর্ব্বে এই স্থানের ঐ নাম ছিল) ঢাকা হইতে রাজধানী উঠাইয়া আনিয়া, নিজের নামানুসারে 'মুর্শিদাবাদ' নাম দিয়া এই স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। তদবধি এই স্থানেই পরবর্ত্তী নবাব বাহাদুরগণের রাজধানী স্থাপিত

ছিল। মুর্শিদকুলি খাঁর পূর্ব্বে বঙ্গের রাজস্ব-বিভাগ ও শাসন-বিভাগ স্বতন্ত্র ছিল। মহম্মদ ইব্রাহিম রাজস্ব আদায়কর্ত্তা (Collector) বা নায়েব নবাব ও অপর এক ব্যক্তি শাসনকর্ত্তা ছিলেন। মুর্শিদকুলি খাঁর সময় হইতে এই দুই পদ এক হয়। মহাত্মা সৈয়দ গোলাম হোসেন প্রণীত মুতাক্ষরীণ পাঠে জানা যায় যে, পূর্ব্বে এই মুর্শিদকুলি খাঁ একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন; পরে উদরান্নের নিমিত্ত রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া সামান্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। পরে স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধি প্রভাবে ও কার্য্যদক্ষতার গুণে, ক্রমে উচ্চ রাজকর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। শুনা যায় যে, তিনি এই সময়ে কোনও উজির-পুত্রীর রূপে মুগ্ধ হইয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন ও সেই উজির-পুত্রীকে বিবাহ করেন। তাহার পরে ভাগ্য সুপ্রসন্ন হওয়াতে নবাব বাহাদুর হইয়া এদেশে আসেন। তিনি বেশ বিচক্ষণ, প্রজাশাসক ছিলেন। বঙ্গদেশের জমীদার প্রজাবর্গ ও চাকলাদারদিগকে—কাহাকেও বা মিষ্ট কথায়, কাহাকেও বা শাস্তি দিয়া নিজ বশ্যতা স্বীকার করাইয়াছিলেন। 'হিন্দুরা দক্ষ প্রজাশাসক' এই বিশ্বাস তাঁহার মনোমধ্যে দৃঢ় হওয়াতে, তিনি অনেক জমীদারকে যথাযোগ্য সম্মান দানে আপ্যায়িত ও পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। মোটের উপর তাঁহার শাসন সময়ে বঙ্গদেশের অবস্থা খুব ভালই ছিল বলিতে হইবে। প্রতিবৎসর নিয়মিতরূপে দিল্লিতে রাজকর পাঠাইতেন বটে, কিন্তু অন্যান্য অনেক বিষয়েই সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় জামাতা সরফ-রাজ খাঁ নবাব হয়েন। শুনা যায়, ইঁহারই রাজত্ব সময়ে এক টাকাতে আটমণ চাউল বিক্রয় হইত। কিন্তু গ্রহ-বৈগুণ্যবশতঃ, তাঁহারই অধীনস্থ কর্ম্মচারীর (হাজি আহম্মদ বেগ্) চক্রান্তদ্বারা রাজ্যচ্যুত হন। এই হাজি আহম্মদ বেগ, ইতিহাস-বিখ্যাত বিপুল-বিক্রমশালী সুশাসক নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর সহোদর ছিলেন। যদিও নবাব আলিবর্দ্দী বেগ্ খাঁ অসৎ উপায়ে রাজ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার প্রজাবাৎসল্য খুব বেশী ছিল। প্রজার জন্য তিনি সমস্ত-জীবনই যুদ্ধকার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। যাহা হউক, ইহা ইতিহাস আলোচনার স্থান নহে বিবেচনায় পরিত্যাগ করিলাম, তবে সম্ভবতঃ ইহাতে পাঠকবর্গের অপকার না হইয়া উপকারই হইবে।

(৬)

ষ্টেশন হইতে অনুমান ২ মাইল রাস্তা গমন করার পর নগরে পৌঁছিলাম। একটী ভদ্র লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, বেলা সাড়ে নয় ঘটিকার

পর কাছারী বসিলে তবে, নবাব পুরীতে (Murshidabad Musimen Palace) প্রবেশ করিবার পাশ বা পাঞ্জা পাওয়া যাইবে। কিন্তু "আমাকে অদ্যই ফিরিতে হইবে; কলিকাতা হইতে কেবলমাত্র নবাব-প্রাসাদ দর্শন করিবার নিমিত্তই এইস্থানে আসিয়াছি; বিদেশী লোক; কোথাও থাকিবার ঠিক নাই" ইত্যাদি বলাতে সেই লোকটী কহিলেন "নবাব বাহাদুরের এক ভ্রাতা ঐ ফুলবাগানে বেড়াইতেছেন; তাঁহার নিকট গিয়া সমস্ত বলুন; তিনি যদি দ্বারবান দ্বারা বলিয়া পাঠান, তবেই সুবিধা, নতুবা অন্য কোন উপায় দেখিতেছি না" এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। আমি তাঁহার কথানুযায়ী যেখানে নবাব বাহাদুরের ভ্রাতা পায়চারী করিতেছিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া 'সেলাম' করিয়া দাঁড়াইলাম। তিনিও প্রতিদান করিয়া 'আমি কি চাই' (What do you want Babu?) তাহা ইংরাজি ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন।

তখন আমি বিনীতভাবে আমার বক্তব্য নিবেদন করিলাম। তিনি তৎ-শ্রবণে একজন আরদালিকে কি বলিয়া দিয়া আমাকে তাহার অনুগমন করিতে বলিলেন। আমি পুনরায় তাঁহাকে বিদায়সূচক সম্ভ্রম দেখাইয়া, পূর্ব্ব কথিত আরদালির সহিত চলিলাম। খানিকটা গিয়াই সে একজন দ্বারবানকে সমস্ত বলিয়া চলিয়া গেল। তখন সেই দ্বারবান আমাকে একখানি 'পাঞ্জা' প্রদান করিল ও সঙ্গে করিয়া প্রাসাদে উঠিতে লাগিল। উঠিবার পূর্ব্বেই বিনামা খুলিয়া নীচে রাখিয়া যাইতে হয়। প্রায় ১৷৷০ দেড় ঘণ্টা ধরিয়া সে সমস্ত দেখাইয়া আনিল। দর্শনযোগ্য জিনিষ সমূহের মধ্যে দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত পালঙ্ক কোচ প্রভৃতি, শ্বেত প্রস্তর-নির্ম্মিত নানারকম প্রতিমূর্ত্তি, কাঁচ-নির্ম্মিত একটী শত শাখাযুক্ত 'ঝাড়' বা আলোকাধার ও পূর্ব্ববর্ত্তী নবাব বাহাদুর, বেগম সাহেব ও বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের তৈলচিত্র সকল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, শতদ্বারযুক্ত ইমাম বাড়ী, তোপখানা, ফুলবাগান, চিড়িয়াখানা প্রভৃতি দর্শন করিলাম। বেলা অনুমান দ্বিপ্রহরেক হইয়া উঠিল; সুতরাং অবিলম্বে একটী দোকানে প্রবেশ করিয়া ক্ষুধা শান্তি করিলাম। এখানকার 'ছানাবড়া' অতি উৎকৃষ্ট। আমি অতঃপর গঙ্গা-তীরে উপস্থিত হইলাম ও পরপারে অবস্থিত—বঙ্গের শেষ স্বাধীন-নবাব সিরাজদ্দৌলার সমাধিমন্দির উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম। বেশ সুপরিষ্কৃত স্থানে ফুলবাগানের মধ্যে ইহা অবস্থিত। যাঁর ভয়ে একদিন সমগ্র বঙ্গদেশ,

সুদূর বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের বড় বড় রাজা, জমীদার এমন কি সুচতুর লর্ড ক্লাইভ ও তীক্ষ্ণদর্শী নবাব আলিবর্দ্দী পর্য্যন্ত সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিতেন, সেই আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার 'কালান্তক' সম প্রভূত-শক্তিশালী নবাব সিরাজ-দ্দৌলার এই সমাধি মন্দির। প্রতিমাসে মাত্র চারি আনার তৈল, এই সমাধি মন্দিরে প্রতি সন্ধ্যায় প্রদীপ প্রদানের জন্য প্রদত্ত হয়। ইহার এক জন রক্ষকও নিযুক্ত আছে। হীরাঝিল, মতিঝিল, খোসবাগ, আমিনাবাগ প্রভৃতি ইতিহাস-বর্ণিত বিশাল সৌধসকল এখন লুপ্তপ্রায়।

আমার পরিদর্শন সমাপ্ত হইলে পুনরায় নৌকাযোগে পার হইয়া মুর্শিদা-বাদে পৌঁছিলাম।

মুর্শিদাবাদ বেশ সমৃদ্ধিশালী নগর বলিয়া অনুমিত হইল। এই জেলার উত্তর পূর্ব্বে গঙ্গানদী মালদহ জেলা ও রাজসাহী জেলাকে বিভক্ত করিয়াছে। দক্ষিণে নদীয়া ও বর্দ্ধমান জিলা; পশ্চিমে বীরভূম ও সাঁওতাল পরগণা জিলা; ১৯০১ সালের লোক গণনায় (Cencus report) জানা গিয়াছে যে ১,২২,৬৯০ (এক লক্ষ বাইশ হাজার ছয় শত নব্বই) জন লোক মুর্শিদা-বাদ জিলায় বাস করেন। এখানকার 'বালাপোষ' ও 'বংশযষ্টি' বিশেষ উল্লেখযোগ্য বস্তু। আমি বেলা ৪ টার সময়ে ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া রাত্রি ৯ টার ট্রেণে উঠিয়া তৎপরদিবস প্রাতঃকালে বাটী পৌঁছিয়াছিলাম। ইতি।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

বদ্ধ।

পরপদানত বদ্ধ জ্ঞানলিপ্সু মহাজন,
তেজস্বিতা উদারতা হারায়ে স্বকীয়;
শক্তি-ভক্তি-মুক্তিলাভে হয় না সক্ষম।
শৃঙ্খলে আবদ্ধ ব্যাঘ্র নিজবাস স্বাধীনতা ছাড়ি'
নিত্য নব উগ্রবীর্য্য আহার্য্যে লালিত
স্বাভাবিক কর্ম্মপটু হয় কি কখন?

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ।

ফল কথা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পূর্ব্বে যে সকল যুক্তি ও বচন প্রমাণাদি প্রদর্শিত হইয়াছে, সে সমস্তের সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, অহর্গণ হইতে গণিত বা সাধিত গ্রহ মধ্যগ্রহ এবং উক্ত মধ্যগ্রহ হইতে সাধিত যে তিথি, তাহাই মধ্যতিথি। মন্দফলদ্বারা সাধিত গ্রহ ও তিথি,—যাহা আমরা পঞ্জিকায় ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহাই স্ফুটতিথি এবং উহাই দৃষ্টগ্রহাদির সহিত ঐক্য হইবে; সুতরাং উক্ত তিথিই সনাতন আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী মানবগণের ধর্ম্মকার্য্যসমূহে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সিদ্ধান্ত শিরোমণি গ্রন্থে উক্ত হইয়াছেঃ—

ইদানীং স্পষ্টগতি র্ব্যাখ্যায়তে। তত্রাদৌ তদারম্ভপ্রয়োজন মাহ।—

যাত্রাবিবাহোৎসব-জাতকাদৌ
খেটৈঃ স্ফুটৈরেব ফলস্ফুটত্বম্।
স্যাৎ প্রোচ্যতে তেন নভশ্চরাণাং
স্ফুটক্রিয়া দৃগ্‌গণিতৈক্যকৃদ্যা।

ইহার ভাবার্থ এই যে, গণিত ফল ও দৃষ্ট ফলের ঐক্য হইলে যে গ্রহস্ফুট লব্ধ হইবে, তাহাই যাত্রা, বিবাহ ও উৎসবাদিতে ব্যবহার্য্য। মহামতি গণেশ দৈবজ্ঞও বহু গবেষণার পরে এই কথাই স্বীকার করিয়াছেন।—

সৌরার্কোঽপি বিধূচ্চ-মংক-কলিকো নাজ্ঞোগুরুস্ত্বার্য্যজো-
ঽস্যগ্রাহ্ন চ কজ্ঞং জ্ঞকেন্দ্রকমথার্য্যো সেষু ভাগঃ শনিঃ।
শৌক্রং কেন্দ্রমজার্য্য মধ্যগমিতীমে যান্তি দৃকৃতুল্যতাং
সিদ্ধৈস্তৈরিহপর্ব্বধর্ম্মনয়সৎকার্য্যাদিকং ত্বাদিশেৎ॥

মল্লারিও এই মত সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়াছেন। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপে সাধিত এই সকল গ্রহ দৃক্‌তুল্যতা অর্থাৎ গণিত ফলের সহিত দৃষ্ট ফলের একতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এবং গ্রহণ, উদয়, অস্ত ও জাতকাদি বিষয়ে গ্রহগণের সাধন করিতে হইলে তাহা বহু গ্রন্থ হইতে আহরণ করিতে হয়, ইহা দর্শন করিয়া আচার্য্যমহোদয় উক্ত কার্য্য সকলের লাঘবার্থ এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই রীতি অনুসারে সাধিত গ্রহাদিদ্বারাই পর্ব্বধর্ম্মাদি কার্য্য

সকল সিদ্ধ হইয়া থাকে। পর্ব্ব অর্থে গ্রহণ, ধর্ম্ম অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠান—একাদশী ব্রত প্রভৃতি, নয়—নীতিশাস্ত্র অর্থাৎ রাজনীতি দণ্ডনীতি প্রভৃতি, সৎকার্য্য—শুভকার্য্য অর্থাৎ ব্রতবন্ধবিবাহাদি। এই সমস্ত কার্য্য এই রীতি অনুসারে সমুৎপন্ন তিথ্যাদিদ্বারাই সাধন করিবে। ইহার ভাব এই যে, এই তিথি হইতেই একাদশ্যাদি নির্ণয় করিবে। জাতকাদিতেও অত্রত্য গ্রহসকলই গ্রাহ্য, যে হেতু দৃষ্টফল ও গণিতফলের একতা থাকিয়া যে তিথি সাধিত হইবে, তাহাই ধর্ম্ম-কর্ম্মাদিতে ব্যবহার্য্য। পুনশ্চ—

যস্মিন্ পক্ষে যত্র কালে যেন দৃগ্ গণিতৈক্যকম্।
দৃশ্যতে তেন পক্ষেণ কুর্য্যাত্তিথ্যাদিনির্ণয়ম্॥

আমরা বেদাঙ্গীভূত জ্যোতিঃশাস্ত্রের মত বা প্রমাণাদি অত্যধিক থাকিলেও—এই পর্য্যন্তই উদ্ধৃত করিলাম, অন্যথা প্রবন্ধ-বাহুল্যভয় সর্ব্বথা অনিবার্য্য। এক্ষণে সনাতন বেদশাস্ত্র এ বিষয়ে কি উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহারই কতকটা আভাসমাত্র পাঠকবর্গের গোচর করিয়া আমরা এ প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

শতপথ ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে যে—

স বৈ পৌর্ণমাসেনোপবৎস্যন্ ন সত্রা সুহিতঽইব স্যাত্তেনেদমুদরমসুর্য্যং ব্রীনাত্যাহুতিভিঃ প্রাতর্দ্দেবমেষ উ পৌর্ণমাসস্যোপচারঃ। স বৈ সম্প্রত্যোপবসেৎ। সম্প্রতি বৃত্রং হনানি সম্প্রতি দ্বিষন্তং ভ্রাতৃব্যং হনানীতি।

স বা উত্তরামুপবসেৎ। সমিব বা এষ ক্রমতে যঃ সম্প্রত্যুপবসত্যনদ্ধা বৈ সংক্রান্তয়োর্যদীতরো বেতরমভিভবতীতরো বেতরমথ য উত্তরামুপবসতি।

স সংহিতৈঃ পর্ব্বভিঃ। ইদমন্নাদ্যমভ্যুত্তস্থৌ যদিদং প্রজাপতেরন্নাদ্যং স যো হৈবং বিদ্বান্ সম্প্রত্যুপবসতি সম্প্রতি হৈব প্রজাপতেঃ পর্ব্ব ভিষজ্যত্যবতি হৈনং প্রজাপতিঃ সহএব মেবান্নাদো ভবতি য হ এবং বিদ্বান্ সম্প্রত্যুবসতি তস্মাদু সম্প্রত্যেবোপবসেৎ ইত্যাদি।

বেদবিৎ সায়ণাচার্য্য ভাষ্য করিয়াছেন, যথাঃ—

স বা উত্তরামিতি। ন পূর্ব্বাং পৌর্ণমাসীমুপবসেৎ, উত্তরামেব।—

উত্তরোপবাসপক্ষে গুণ প্রদর্শিত হইতেছে, যথাঃ—

অথ য উত্তরামিত্যাদি। যথা কশ্চিৎ পররাষ্ট্রং প্রাপ্য প্রতিমুখং পলায়মানং হননোদ্যোগরহিতং সম্যক্ চূর্ণিতং করোতি তদুত্তরং পেষণমপ্যেবং ভবতি প্রতিনিবৃত্তস্যোত্তরপক্ষস্যাক্রান্তপ্রায়ত্বাৎ। "য উত্তরামিতি পুনরুপসংহারঃ"।

ইত্থং পক্ষান্তরং সোপপত্তিকমভিধায় প্রথমং পক্ষং সিদ্ধান্তয়িতুং পুনরুপাদত্তে—"স বৈ সম্প্রত্যেবোপবসেদিতি"।

সম্প্রতি উপবাসযোগ্য পর্ব্ব নির্ণীত হইতেছে, 'সম্প্রতি' ইত্যাদি।

সম্প্রতি হৈব পর্ব্ববিস্রংসনসমকালএব প্রজাপতেঃ পর্ব্ব সম্প্রতি উপবসন্ চিকিৎসিতবান্ ভবতি তথৈব সম্প্রত্যুপবাসিনং রক্ষন্তি। প্রজাপতিবৎ স্বয়মপি সর্ব্বান্নাদো ভবন্তি।

এস্থলে সম্প্রতি শব্দের অর্থ—ঠিক্ পূর্ণিমাকাল। ধর্ম্মশাস্ত্রে তিথির উল্লেখ হইলেই তাহা স্ফুট তিথি ধরিতে হইবে; অর্থাৎ যে তিথি পঞ্জিকাগণনায় প্রচলিত, সেই তিথিই ধরিতে হইবে, কাল্পনিক মধ্য তিথি নহে। পুনশ্চ—

তে দেবা অব্রুবন্। ন বা ইমমন্যং সোমাদ্ধিমুয়াৎ সোমমেবাস্মৈ সম্ভরাস্ম সোমং সমভরন্নেষ বৈ সোমো রাজা দেবানামন্নং যচ্চন্দ্রমাঃ স যত্রৈষ এতাং রাত্রিং ন পুরস্তান্ন পশ্চান্ন দদৃশে তদিমং লোকমাগচ্ছন্তি স হ হৈবাপশ্চৌষধীশ্চ প্রবিশতি—স বৈ দেবানাং বস্বন্নং হ্যেষাং তদ্যদেষ এতাং রাত্রিমিহামা বসতি তস্মাদমাবাস্যা নাম।

সায়ণভাষ্য—

চন্দ্রমসোঽবোষধিসহবাসপ্রসঙ্গাৎ অমাবাস্যাশব্দং নির্ব্বক্তি—তদ্‌যদেষইতি। ইহ ভূলোকে এতাং রাত্রিং অপরিদৃষ্টচন্দ্রায়াং রাত্রৌ সাকল্যেন অমা বসতি অমা সহ বসতি অবোষধি চন্দ্রমসামস্যাং তিথৌ সহবাসাৎ সা তিথিঃ অমাবাস্যা নাম অভবৎ।

অপিচ—

তদ্ধোকে দৃষ্ট্বোপবসন্তি। শ্বো নোদেতেত্যাদৌ হৈব দেবানামবিক্ষীণমন্নং ভবত্যথৈভ্যো বয়মিত উপ প্রদাস্যাম ইতি তদ্ধি সমৃদ্ধং যদক্ষীণ এব পূর্ব্বস্মিন্নন্নেঽথাপরমন্নমাগচ্ছন্তি স হ বহ্বন্নঽএব ভবত্যসোমযাজীতু ক্ষীরযাজ্যদো হৈব সোমো রাজা ভবতি।

যদহন্ত্বেবৈষঃ। ন পুরস্তান্ন পশ্চাদ্‌দৃশ্যেত তদহরুপবসেত্তর্হি হ্যেষ ইমং লোকমাগচ্ছতি তস্মিন্নিহ বসতি।

অস্তামাবাস্যেতি মন্যমান উপবসতি। অথৈষ পশ্চাদ্দদৃশে ইত্যাদি।

সোঽস্তামাবাস্যেতি মন্যমান উপবসতি। অথৈষ পশ্চাদ্দদৃশে ইত্যাদি।

এই সকল প্রমাণদ্বারা স্পষ্টই পরিলক্ষিত হয় যে, বেদশাস্ত্রে দৃক্‌সিদ্ধিরই প্রামাণ্য, ইহাদ্বারা পারিভাষিক দৃক্‌সিদ্ধি প্রমাণ করা যায় না। বেদ যে

স্থানেই তিথির উল্লেখ করিয়াছেন, সেই স্থলেই দৃক্‌সিদ্ধ তিথি উল্লিখিত হইয়াছে অর্থাৎ গণিত-ফলসাধিত তিথি দৃষ্ট ফলের সহিত ঐক্য হইলেই তাহা ধর্ম্মকার্য্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। দৃগ্‌গণিতের অর্থাৎ দৃষ্ট ফলের সহিত গণিত ফলের ঐক্য না হইলে তথায় গণিত ফল কার্য্যকারী হয় নহে, দৃষ্ট ফলেরই প্রাধান্য ; সুতরাং দৃক্‌সিদ্ধ তিথিই বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে এবং উহাই যে আর্য্যগণের ধর্ম্মকর্ম্মাদিতে সর্ব্বথা ব্যবহার্য্য, ইহা নিঃসন্দেহ।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী মানব সকলের একমাত্র গৌরব সেই সনাতন জ্যোতিঃশাস্ত্রে যখন এক ভিন্ন দ্বিতীয় তিথির ব্যবহার বা প্রমাণাদি কিছুই পরিলক্ষিত হয় না, তখন ঐ তিথিই ধর্ম্ম কার্য্যোপযোগী। শ্রুতি প্রমাণেও দেখা যাইতেছে যে, দৃকসিদ্ধ তিথিই ধর্ম্মকর্ম্মোপযোগী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বস্তুতঃ পারিভাষিক তিথি বলিয়া কোনও উল্লেখ জ্যোতিঃ-শাস্ত্রে দেখা যায় না। সুতরাং গণিত ও দৃষ্ট ফলের ঐক্যমতে সাধিত যে তিথি, তাহাই স্ফুটতিথি ও তাহাই ধর্ম্মকার্য্যে ব্যবহৃত হওয়া সর্ব্ববাদিসম্মত বলিয়াই আমরা মনে করিতেছি।

পক্ষান্তরে, যদি কল্পিত মধ্যতিথিই ধর্ম্ম কর্ম্মাদির উপযোগী হয়, তাহা হইলে গ্রহণ-কালীন তিথিও মধ্যতিথি বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। অথবা গ্রহণকালীন তিথি যদি স্ফুট তিথি হয়, তাহা হইলে স্ফুট তিথিই ধর্ম্ম-কর্ম্মোপযোগী। তাদৃশ স্ফুট তিথি অবলম্বন করিয়াই আমাদের ধর্ম্মকার্য্যাদি সকল সম্পাদন করা একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, গ্রহণকাল সম্বন্ধেও নানা পঞ্জিকার নানা মত ; এমন কি, দুইখানি পঞ্জিকার মতও প্রায়ই একরূপ দেখা যায় না। পঞ্জিকাকারগণ বোধ হয়, "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং" এই মতের সমর্থন প্রয়াসেই একান্ত ব্যগ্রভাব অবলম্বন করেন, অথবা ইহারই সুচারুরূপে সমর্থন করিয়া আসিতেছেন ;—ইহাতে সাধারণের ইষ্ট কি অনিষ্ট, যাত্রা বিবাহোৎসবাদি কর্ম্মসকল শাস্ত্রানুমোদিত যথাকালে সম্পাদিত হয় কি না, এ সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। কাযেই যদি পঞ্জিকাকারগণের—অন্ততঃ দুই তিন জনেরও এক মত না হয়, প্রতি পঞ্জিকাতেই যদি অল্পবিস্তর সামঞ্জস্যের অভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তবে আমরা ইহাকে ভুল বলিব না ত কি বলিব! অবশ্য কাহার ভুল, কোন পঞ্জিকাখানি বিশুদ্ধ, এ বিষয় নির্দ্ধারণের বিচারণা-স্থল এ নয়, অথবা আমরা তাহাতে তত সমুৎসুক নহি। তবে অন্ততঃ এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, আজ

কসিতে যাইয়া ভিন্ন ভিন্ন উপায় অবলম্বন করিলেও ফল সকলেরই এক হইবে, তাহাতে কোনও ব্যতিক্রমের সম্ভাবনা একেবারেই অসম্ভব।

যদি পঞ্জিকা-গণনায়ই ভুল থাকিল, এবং উক্ত ভুলকেই মূল বলিয়া তদনুসারেই ক্রিয়া কর্ম্ম চলিতে থাকে, তবে প্রকৃত কালে ধর্ম্ম-কর্ম্মাদির অনুষ্ঠানের অভাব অনিবার্য্য হইয়া পড়ে; সুতরাং শাস্ত্রানুসারে আমাদের সমস্ত শ্রমই যে 'হস্তিস্নানবৎ' পণ্ড হইয়া যাইতেছে বা যাইবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি আছে? গ্রহণকালই যে ধর্ম্মোপযোগী ও বহুফলপ্রদায়ক, ইহা প্রমাণিত ও সর্ব্ববাদিসম্মত, এজন্য শাস্ত্রীয় বচন-প্রমাণাদি উদ্ধারের বোধ হয় তত আবশ্যক নাই।

বস্তুতঃ, শাস্ত্রানুসারে গণিত গ্রহণাদিকালেরই যখন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তখন মধ্যতিথি বা স্ফুট তিথি ধর্ম্ম-কর্ম্মোপযোগী, এ বিষয়ে তর্কবাদই নিষ্ফল, বৃথা বিড়ম্বনামাত্র। কালনিরূপণ ঠিক না হওয়াতে আমাদের সমস্ত কার্য্যই পণ্ড হইয়া যাইতেছে; এমন কি, ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত-কৃত্য পর্য্যন্তও নিষ্ফল হইতেছে। শুভাশুভকাল-নির্ণয়, বিবাহাদি কাল জ্ঞান, জন্ম-মৃত্যু-সময়-নিরূপণ, দশাভোগ, উপনয়নকাল, ঋতুবিশেষে কৃত্য যাগাদি, দর্শপূর্ণমাস যাগ প্রভৃতি শ্রৌত স্মার্ত্ত সকল কর্ম্মই প্রকৃতকালে অনুষ্ঠিত হয় না বলিয়া আমরা তাহার ফললাভে বঞ্চিত হইতেছি, ইহা কি সামান্য আক্ষেপের বিষয়! যথাসময়ে শাস্ত্রানুসারে সৎকার্য্যাদি স্বনুষ্ঠিত হইলে তজ্জন্য অপূর্ব্ববিশেষের উৎপত্তি অবশ্যম্ভাবিনী; কিন্তু উপযুক্ত কালের নিশ্চয়তার অভাবে অনুষ্ঠেয় কার্য্যাদি অকালে অর্থাৎ বিরুদ্ধকালে—অসময়ে অনুষ্ঠিত হইলে তাহা হইতে অনুষ্ঠাতার অপূর্ব্ব বিশেষের উৎপত্তি ত দূরের কথা, প্রত্যুত বিপত্তিরই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। সুতরাং এখন আমরা যাই কোথা? এ যে "পরাপরাধেন পরাপমানম্" হইয়া উঠিয়াছে! জ্যোতিঃশাস্ত্রে পারদর্শী বঙ্গের কৃতী সন্তানগণ সামান্য একটু চেষ্টা করিলেই আপন আপন কৃতিত্ব বজায় রাখিয়া ইহার সমুচিত প্রতিকারে সমর্থ হইতে পারেন। নিজের কৃতিত্ব বজায় রাখিতে যাইয়া সাধারণের অসুবিধা বিধানপূর্ব্বক মূলে ভুল করা উপযুক্ত হইতেছে কি? সময় নিরূপণ না হইলে আমাদের সমস্তই ভুল হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে। কারণ, ইহা অতি সহজেই বুঝা যাইতেছে যে, শুভমুহূর্ত্তের পরই অশুভ মুহূর্ত্ত আসিতে পারে বা কালচক্রের নিয়মানুসারে আসিতেছে, সুতরাং অশুভ মুহূর্ত্তে শুভকার্য্য সম্পাদিত হইলে অর্থাৎ বিবাহোৎসবাদি শুভকার্য্য

সকল শাস্ত্রানুমোদিত যথাকালে সম্পাদিত না হইয়া অযথাকালে অনুষ্ঠিত হইলে শুভকার্য্যেও যে অশুভবিশেষের উৎপত্তি হইবে, ইহা সর্ব্বথা অনিবার্য্য। সুতরাং স্ফুটকাল নিশ্চয় করাই অবশ্য কর্ত্তব্য।

অতএব শাস্ত্রনিপুণ পঞ্জিকাকারগণের নিকট সানুনয় প্রার্থনা যে, তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক স্ব স্ব অভিমান পরিত্যাগ করিয়া পঞ্জিকা-সংস্কার করণানন্তর কৃতি-সাধারণের ঐকমত্য স্থাপন করুন। শাস্ত্রের গৌরব রক্ষিত হউক,—যথা-কালোচিত ক্রিয়া-কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিয়া সর্ব্বসাধারণে নিরুপদ্রবে সুখে অবস্থান করুক,—মর্ত্ত্যধাম স্বর্গধামে পরিণত হউক। কিমধিকমিতি।

শ্রীকালীকণ্ঠ কাব্যতীর্থ।

বর্ষা।

১

গম্ভীর শ্যামল ঘোর জলপূর্ণ ঘন,
আবরিত করিয়াছে বসুধার মুখ;
কালিমা আঁধার-রাশি—ওই অনুপম
বেড়েছে নয়নে; হৃদে নাহি তিল-সুখ।

২

যাতনা-পীড়িত হিয়া, ছল ছল আঁখি,
ঝির ঝির ঝরিতেছে বাদলের ঝারা;
সিক্ত-বাস পরিহিত হেরি শাখা শাখী,
বিলুলিত থাকি থাকি, ঝরে বারি-ধারা।

৩

কাননে বিটপি-রাজি স্বিন্ন জল-ধারে,
পিচ্ছিল বরষা-ছাতা করেছে আশ্রয়;
শ্যামল নবীন তৃণ, বৃষ্টি-ধারা-ভারে
মেদিনী-শয়ন'পরে, যেন নিরাশ্রয়।

৪

খাল বিল সরোবর মেঘ-পুষ্প-ভারে
পরিপূর্ণ, ধরিয়াছে গম্ভীর মূরতি ;
ছত্রাক ও গুল্মচয় হেরি চারিধারে
শ্যামলা মেদিনী-বাসে করিছে বসতি।

৫

মাঠ ঘাট বাটগুলি কর্দ্দম-পূরিত
হেরি নিরানন্দময় আজি বনস্থলী ;
শ্যামলা প্রকৃতি মঞ্জু-বেশ ধূসরিত ;
সান্ধ্য-বাতে পত্র যথা, কাঁপে ফুল-কলি।

৬

বৃক্ষের শাখায় দুটী বায়সী বায়স,
বসি' কাঁপিতেছে ওই হ'য়ে মুখোমুখি
রব শূন্য ; ঝাড়ে পাখা, আনন বিরস,
ঝঞ্ঝাবাত বৃষ্টিপাতে হইয়ে অসুখী।

৭

কণ্টক-বেষ্টিত-তনু সুগন্ধ-আবাস
কেতকী-কুসুম-কলি হ'য়ে কুসুমিত ;—
ব্যথিতা সঙ্গিনী, তাই সুমধুর বাস
দানি' বুঝি করিবারে চায় বিনোদিত ?

৮

সিত-শুভ্র-কেশর-বেষ্টিত নীপ-মূল
অনুপ সুষমা-রাশি করে বিকিরণ ;
লাজ দিয়ে বিহঙ্গমে, পতঙ্গমকুল—
বরষার সহচর, উড়ে ফুল্ল-মন।

৯

চঞ্চলা-পতাকা উড়ে ক্বচিৎ চমকি'
ঝলসিয়া দিকচয়ে উজ্জ্বল বিভায় ;
ক্বচিৎ নিনাদে দেয়া গুড়্ গুড়্ ডাকি,
ত্রাসিত সকল জীব কম্পান্বিত-কায়।

১০

বিহগ, শাবক-সনে বসি' নীড়-বাসে,
গণিতেছে পরমাদ পক্ষ-আচ্ছাদিয়া ;—
অনাহার, নাহি চিন্তা, কাটে উপবাসে,
তথাপি না যায় কোথা একাকী ফেলিয়া।

১১

নয়ন-রঞ্জন-বল্লী মৃত্তিকা-শয়নে
শায়িতা, আশ্রয়-হীনা, সরমে মরিয়া ;
অবিশ্রান্ত ধারা-পাতে আকুল মরমে,
সহকার বুঝি তারে দিয়াছে ঠেলিয়া !

১২

হতেছে প্রবল ধারে ধারা বরিষণ ;
বীতরাগ বিহঙ্গম, সঙ্গীতের স্রোত
না ছড়ায় ;—গুরু দুঃখ-সাগরে মগন ;
কুসুম সুবাস মাখি' বায়ু ওতপ্রোত।

১৩

প্রভাত-পবন-স্পর্শে শিহরিত-কায়,
লাজ ভয়ে তেয়াগিয়া বিটপ-আসন,
বৃতি-পাশে শেফালিকা ঝড়িয়া গড়ায় ;
বিচ্ছেদ-বিধুরা বালা শোকেতে মগন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষাল।

সমালোচনা।

আমাদের জনৈক বন্ধু দি, নিউ, ফরমুলা কোম্পানী কৃত 'আলছারীণ' 'দদ্রুলীন' ও এণ্টাসিডি নামক কয়েকটী ঔষধ ব্যবহার করিয়া আশাতীত ফল লাভ করিয়াছেন। বিলাতী ঔষধের সহিত দেশীয় গাছ গাছড়ার সংমিশ্রণে প্রস্তুত প্রত্যক্ষ, ফলপ্রদ এতাদৃশ ঔষধ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না।

কোম্পানী সম্প্রতি কলিকাতা হইতে কারখানাটী উঠাইয়া লইয়া মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত কান্দী মহকুমায় স্থাপন করিয়াছেন। আমরা উক্ত ঔষধগুলি পেটেণ্টের বাজারে যশোলাভ করিলে বিশেষ সুখী হইব।